আশরাফুল হিদায়া

বাংলা

লেখকবৃন্দ

মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আবূ বকর
মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর

মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ
মুহাদ্দিস, জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা

সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

পরিবেশক

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকবৃন্দের প্রয়াস

। মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান

كتاب البيوع -এর শুরু থেকে باب خيار العيب -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা আবু বকর

باب البيع الفاسد থেকে باب المرابحة والتولية -এর শেষ পর্যন্ত।

। মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ

باب الربوا থেকে كتاب الصرف -এর শেষ পর্যন্ত।

আশরাফুল হিদায়া বাংলা

সম্পাদনায় ❖ মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামেয়া শারঈয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমূদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ❖ ৬৫০.০০ [ছয়শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين - اما بعد :

ফিকহে হানাফীতে হিদায়া গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। এ গুরুত্বের বিবেচনায়ই গ্রন্থখানি শত শত বছর ধরে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এবং সোয়া আটশ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি ফিকহশাস্ত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে সারা বিশ্বে পঠিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। খোদ আরবি ভাষায় গ্রন্থখানির ভাষ্য প্রণীত হয়েছে সবচেয়ে বেশি; প্রায় অর্ধ শতকের মতো। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এর আংশিক অনুবাদ এবং ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সুখের কথা যে, একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকেও প্রকাশিত হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য শুধু অনুবাদের সাহায্যে হিদায়ার মতো গ্রন্থ ভালভাবে বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই এর একখানা নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, যা এখনো পর্যন্ত পূরণ হয়নি। উর্দু ভাষায়ও 'আইনুল হিদায়া' নামে এর একখানা সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ এবং 'আশরাফুল হিদায়া' নামে একখানা সবিশদ অপূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বেশ সমাদৃত হয়েছে।

ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব একজন বড় ও সাহসী হৃদয়ের মানুষ। তিনি বিশাল সাহস নিয়ে হিদায়া'র একখানা পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করা ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে উর্দু ভাষ্যগ্রন্থ আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা করেন এবং মরহুম হযরত মাওলানা ইসহাক ফরিদী (র.)-এর তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশের কাজে হাত দেন। ইতোমধ্যে তার দু' খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। হিদায়া আখেরাইনের ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে আমার তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ প্রকাশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে আমি তাঁকে আখেরাইনের জন্য উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ না করে হিদায়া'র প্রধান আরবি ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' ও 'আল-বিনায়া' সামনে রেখে প্রয়োজনবোধে উর্দু আশরাফুল হিদায়া থেকে সাহায্য নিয়ে একখানা মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করানোর পরামর্শ দেই। সে মোতাবেক তিনি আমাকে ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া ও উর্দু আশরাফুল হিদায়া– এ তিনটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সরবরাহ করেন। আমি গ্রন্থখানির একটি মৌলিক ভাষ্য প্রণয়নের কিছু মূলনীতি তৈরি করি এবং এ কাজের জন্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ও এক সময়কার তিনজন মেধাবী ছাত্র, যাঁরা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন, তাঁদেরকে মনোনীত করে তাঁদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করি। তাঁরা হলেন, মাওলানা মুঃ অছিউর রহমান, মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা; মাওলানা আবূ বকর, মুহাদ্দিস, দারুল উলূম টঙ্গী, গাজীপুর এবং মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ, মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, গুলশান, ঢাকা।

তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপরিউক্ত তিনটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ সামনে রেখে হিদায়া'র একখানা সহজবোধ্য, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং আমি গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে দিয়েছি। সুতরাং হিদায়া আউয়ালাইনের ভাষ্যগ্রন্থ 'আশরাফুল হিদায়া বাংলা সংস্করণ' উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ হলেও আখেরাইনের ভাষ্য অংশটি উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র অনুবাদ নয়; বরং এটি হিদায়া আখেরাইনের একখানা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ।

এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও একে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণের ব্যাপারে আমার একটুখানি কৈফিয়ত আছে। একটি স্বতন্ত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এর আশরাফুল হিদায়া নামকরণে আমার জোর আপত্তি ছিল, কিন্তু জনাব প্রকাশক মহোদয়ের আবদার ছিল 'আশরাফুল হিদায়া' নামটি ধরে রাখার। কারণ, তিনি ইতঃপূর্বে 'আশরাফুল হিদায়া' নামক ভাষ্যগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং এ নামে আউয়ালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উর্দু আশরাফুল হিদায়া'র দু খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশও করে ফেলেছেন। তাই তাঁর আবদার রক্ষার্থে 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণে সম্মত হই। অবশ্য এর পক্ষে একটি যুক্তিও পেয়ে যাই যে, কখনো দেখা যায়, দুজন পৃথক পিতার দু' সন্তানের নাম একই হয়ে থাকে, তাই বলে দু' সন্তান তো আর এক হয়ে যায় না। পূর্ববর্তীদের রচনাবলিতেও আমরা এরূপ দেখতে পাই যে, একই নামে পৃথক দুই বা ততোধিক লেখক পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই 'আশরাফুল হিদায়া' নামকরণকে অনুচিত বলা যায় না। অন্যের রাখা কোনো একটি নাম কারও পছন্দ হলে সে নামটি তো অন্য কেউ ধার করেও নিতে পারে। সমাজের অনেকে এমন তো নেয়ও। এতে তেমন অসুবিধার তো কিছু নেই।

হিদায়া গ্রন্থখানি এমনিতেই একটি সমুদ্র। তার একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ তৈরি করা কত বড় কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য লেখকবৃন্দ, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই অটুট ধৈর্য, নিরলস শ্রম ও পর্যাপ্ত সময় এবং সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার তৌফিকপ্রাপ্তির বড় প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে সব কিছু সহজ করে দিয়েছেন। এজন্য সকল প্রশংসা তাঁরই।

হে মহান করুণাময় আল্লাহ! আমাদের সবাইকে এবং সকল মানুষকে সকল নেক কাজে ইখলাস দান করুন। বিশেষ করে এ বিশাল কাজটির রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন, প্রকাশনা ইত্যাদির সাথে যারা জড়িত ছিলেন এবং আছেন, তাদের সবার শ্রমটুকু কেবল দুনিয়ার জন্য না বানিয়ে আপনার প্রিয় দীনের উপকারার্থে কাজে লাগিয়ে সকলের পরকালের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের সবাইকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন। হে আল্লাহ! পরকালের পুরস্কারপ্রাপ্তিই বড় প্রাপ্তি। আমাদের শ্রম-সুনাম সবটুকু আপনার জন্য কবুল করে নিন। আপনি আমাদের কাউকে পরকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা সবাই আপনার অনুগ্রহের ভিখারি। আপনি একমাত্র দয়ালু দাতা।

আরজগুজার

[মাওলানা আহমদ মায়মূন]

মুহাদ্দিস, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

প্রকাশ থাকে যে, শরিয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধান বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। কিছু বিধান খালেস ইবাদত। যেমন– নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ। কিছু বিধান নিরেট লেনদেন সংক্রান্ত, যা সর্বাংশে বান্দার সাথে জড়িত। আর কিছু বিধান ইবাদতও, আবার লেনদেনও। যেমন– বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আলফারগানী (র.) [মৃ. ৫৯৩ হি.] সর্বপ্রথম [হিদায়ার ১ম খণ্ডে] খালেস ইবাদতের বর্ণনা দেন। এরপর [২য় খণ্ডে] এমন বিষয়াদির বর্ণনা দেন যেগুলো ইবাদতও এবং লেনদেনও। এখানে অর্থাৎ ৩য় খণ্ডে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় থেকে তিনি নিরেট লেনদেন-বিষয়ক বিধানসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন।

গ্রন্থকার (র.) ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়কে ওয়াকফ অধ্যায়ের পরে স্থান দিয়েছেন। এ দু অধ্যায়ের মাঝে যোগসূত্র হলো, ক্রয়-বিক্রয় এবং ওয়াকফ দুটোই যদি শুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয় তাহলে ওয়াকফকৃত সম্পত্তি ও বিক্রীত পণ্য মালিকের মালিকানা থেকে খারিজ হয়ে যায়। তবে ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নতুন করে কেউ মালিক হয় না। কিন্তু ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং মালিকানা খারিজ হওয়ার বিচারে উভয়টা এক, কিন্তু ওয়াকফকৃত সম্পত্তির নতুন করে যেহেতু কেউ মালিক হয় না তাই তা একক (بَسِيْط) -এর পর্যায়ে, আর ক্রয়-বিক্রয় যৌগিক (مُرَكَّبْ) -এর পর্যায়ে। আর বাস্তবে এককের স্থান আগে বিধায় গ্রন্থকার প্রথমে ওয়াকফের এরপর ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

بُيُوْعٌ শব্দটি بَيْعٌ -এর বহুবচন। بَيْعٌ শব্দটি ক্রিয়ামূল (مَصْدَرْ)। এর দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থকার এ শব্দটিকে বহুবচন রূপে উল্লেখ করেছেন। এর দুটি উত্তর হতে পারে।

এক. بَيْعٌ শব্দটি ইসমে মাফঊল তথা مَبِيْعٌ [বিক্রীত বা বিক্রয়যোগ্য পণ্য] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিক্রীত বা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের শ্রেণী ও প্রকার অনেক। তাই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. بَيْعٌ শব্দটি অবশ্যই ক্রিয়ামূল। কিন্তু بَيْعٌ [ক্রয়-বিক্রয়] এর প্রকার বিবিধ হওয়ার কারণে শব্দটিকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

بَيْعٌ শব্দটি দুই বিপরীতমুখী অর্থ প্রদান করে অর্থাৎ অভিধানে بَيْعٌ শব্দটি إِخْرَاجُ الشَّئِ عَنِ الْمِلْكِ بِمَالٍ এবং إِدْخَالُ الشَّئِ فِى الْمِلْكِ بِمَالٍ তথা মালের বিনিময়ে কোনো জিনিসকে মালিকানা থেকে বের করা এবং মালের বিনিময়ে কোনো জিনিসকে 'মালিকানায় আনয়ন করা' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক কথায় শব্দটি বিক্রয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়, ক্রয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ - এ হাদীসে শব্দটি বিক্রয় অর্থে এবং لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلٰى بَيْعِ أَخِيْهِ - এ হাদীসে শব্দটি ক্রয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম হাদীসের অর্থ : مَبِيْعٌ ও ثَمَنٌ [পণ্য ও বিনিময়] যদি ভিন্ন শ্রেণীর হয় তাহলে যেভাবে ইচ্ছা [কম/বেশি] করে তোমরা বিক্রয় কর। দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ : তোমাদের কেউ যেন তার অপর ভাইয়ের ক্রয়-আলোচনার মুহূর্তে ক্রয়ের প্রস্তাব না করে।

এরূপভাবে شِرَاءٌ ও اِشْتِرَاءٌ শব্দদ্বয়ও দুই বিপরীতমুখী অর্থ তথা ক্রয় ও বিক্রয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ [মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্মা-বিক্রয় করে থাকে] এবং بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ [তা কত নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে] এ দু'আয়াতে শব্দ দুটি বিক্রয় অর্থে, আর নিম্নোক্ত আয়াতাংশে ক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ [তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট !]

শরিয়তের পরিভাষায় مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ بِطَرِيْقِ التِّجَارَةِ - পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায়িক উপায়ে মালের দ্বারা মালের বিনিময় করাকে بَيْع বলে। মালের দ্বারা মালের বিনিময় করা মানে ক্রেতাকে পণ্যের এবং বিক্রেতাকে পণ্যমূল্যের মালিক বানিয়ে দেওয়া। সুতরাং ইজারা ও বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের (بَيْع) অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ ইজারা হলো مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَنَافِعِ আর বিবাহ হলো مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْبُضْعِ ক্রয়-বিক্রয়ে পারস্পরিক সম্মতি জরুরি বিধায় জবরদস্তিমূলক বেচাকেনা ও ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞায় পড়ে না। বিনিময় প্রদানের শর্তে যে সব উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করা হয় তাও ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা থেকে খারেজ হয়ে যায়। কারণ তাতে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ পাওয়া গেলেও ব্যবসায়িক উপায় অনুপস্থিত। ইসলামি শরিয়তে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেনের একটি বৈধ পদ্ধতি। এর বৈধতা শরিয়তের দলিল তথা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না ; তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ।" [সূরা নিসা : ২৯] এ আয়াত থেকে বুঝা যায় পারস্পরিক সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ।

(٢) اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا .

"আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"-[সূরা বাকারা : ২৭৫] এ আয়াত থেকেও ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে বলা হয়েছে,

(١) عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ غَرْزَةَ قَالَ كُنَّا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُسَمّٰى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشَوِّبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ -

হযরত কায়স ইবনে আবী গযরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আমাদের ব্যবসায়ী দলকে সামাসিরাহ বলা হতো। একদা রাসূল ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তদপেক্ষা সুন্দর একটি নামে আমাদেরকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, হে ব্যবসায়ীগণ ! ক্রয়-বিক্রয়ে কসম ও অর্থহীন কথাবার্তা হয়ে থাকে, তাই তোমরা নিজেদের ক্রয়-বিক্রয়কে সদকার সাথে মিলিয়ে নাও। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়কালে যে সব অপ্রয়োজনীয় কসম ও অর্থহীন কথা বা কাজ হয়ে যায় তার কাফ্ফারা স্বরূপ তোমরা কিছু সদকা কর।-[আবূ দাউদ, ১খণ্ড, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়] অন্য রিওয়ায়াতে আছে- يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْاِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشَوِّبُوْا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ .

হে ব্যবসায়ীগণ! ক্রয়-বিক্রয়কালে শয়তানের আগমন ঘটে এবং বিভিন্ন গুনাহ হয়ে যায়, তাই তোমরা তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সদকাকে মিলিয়ে নাও। -[তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২২৯]

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী [-র হাশর] নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে হবে। -[তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২২৯]

(٣) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُوْنَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَفَعُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ -

হযরত রিফাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে ঈদগাহে গমন করেন। হুজুর ﷺ দেখলেন, লোকেরা বেচাকেনা করছে। তখন তিনি তাদের ডাকলেন- হে ব্যবসায়ীগণ! তাঁরা সকলে তাঁর ডাকে সাড়া দিল এবং তাঁদের ঘাড় উচিয়ে ও চোখ তুলে তার প্রতি তাকাল। তখন তিনি বললেন, ব্যবসায়ীদেরকে কিয়ামতের দিন অপরাধী অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। অবশ্য তারা ব্যতিক্রম যারা আল্লাহকে ভয় করে, নেক কাজ করে এবং সত্য কথা বলে।

–[তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ২৩০]

প্রথমোক্ত হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে সদকা করার উপদেশ দান করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসে সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ীর মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনটি হাদীসই ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা প্রমাণ করে।

ইজমা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে আসছেন। প্রায় সকল সীরাত লেখক লিখেছেন যে, নবুয়ত লাভের পনের বছর পূর্বে স্বয়ং নবী করীম ﷺ ব্যবসা করেছেন। বহু প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্বাস (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) প্রমুখ সাহাবী ব্যবসা করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন শস্য ব্যবসায়ী। হযরত উসমান (রা.) কাপড় ও খেজুরের ব্যবসা করতেন। হযরত আব্বাস (রা.) আতর এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ঘি ও পনিরের ব্যবসা করতেন। মোল্লা আলী কারী (র.) লিখেছেন, হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে জিহাদের [গনিমতে মালের] পর সর্বোত্তম উপার্জন হলো ব্যবসা। এরপর কৃষি, এরপর শিল্প ও কারিগরী। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম পেশা হলো কেতাবাত [হস্তলিপির কাজ]–[শরহে নুকায়া]

ক্রয়–বিক্রয় বৈধ হওয়ার কারণ : تَعَلُّقُ الْبَقَاءِ الْمَعْلُوْمِ فِيْهِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى وَجْهٍ جَمِيْلٍ

অর্থাৎ সুন্দর উপায়ে মানুষের জীবন-যাপনের প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়কে শরিয়ত বৈধ করেছে। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তা সব এক ব্যক্তির পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয় না। কেউ এক জিনিস তৈরি করে, কেউ অন্য জিনিস তৈরি করে। একজন কৃষক ধান উৎপাদন করে, অপরজন গম উৎপাদন করে। জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী থাকে। তাই নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসটি আরেকজন থেকে বৈধ উপায়ে গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরিয়ত আদান-প্রদান তথা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছে।

ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম : ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে আর বিক্রেতা বিনিময়ের মালিক হবে।

ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত :

১. ক্রেতা ও বিক্রেতা বোধ-বুদ্ধির অধিকারী (اَلْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ) হওয়া।

২. পণ্য মূল্যমানসম্পন্ন (اَلْمَالُ الْمُتَقَوَّمُ) হওয়া।

৩. পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতাকে সোপর্দ করা যায় (مَقْدُوْرُ التَّسْلِيْمِ) এরূপ হওয়া।

৪. ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ (اَلْإِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ) অতীতকালীন (مَاضِىْ) শব্দযোগে হওয়া।

৫. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি (اَلتَّرَاضِىْ) থাকা।

ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন : ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন ছয়টি।
১. ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব (اَلْإِيْجَابُ);
২. প্রস্তাব গ্রহণ (اَلْقَبُوْلُ);
৩. পণ্য (اَلْمَبِيْعُ);
৪. বিনিময় (اَلثَّمَنُ);
৫. ক্রেতা (اَلْمُشْتَرِىْ);
৬. বিক্রেতা (اَلْبَائِعُ)।

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকার : ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া ও না হওয়ার হিসেবে তা দু'প্রকার–
১. مُنْعَقِدْ : যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়।
২. غَيْرُ مُنْعَقِدْ : যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। এ প্রকারের অপর নাম (اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ)
প্রথমোক্ত প্রকার আবার চার প্রকার– ১. সহীহ ২. ফাসেদ ৩. মাকরূহ ৪. মওকূফ।

সহীহ (اَلصَّحِيْحُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ يَصِحُّ أَصْلًا وَوَصْفًا যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুসঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ। মৌলিক বলতে বুঝায় ক্রয়-বিক্রয়ের উপরোক্ত রুকন সমূহের বিদ্যমানতা। আর আনুষঙ্গিক বলতে বুঝায় রোকনের পরিপূরক বিষয়সমূহ, যেমন ইজাব কবুলের সময় দ্রব্য বা বিনিময়ের পরিমাণ উহ্য না রাখা, বিনিময় পরিশোধের অনির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য না করা, পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্রেতাকে সোপর্দ করা যায় এরূপ হওয়া, বিনিময়-চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত কোনো শর্ত আরোপ না করা ইত্যাদি। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ইজাব কবুল হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা পণ্যের, আর বিক্রেতা বিনিময়ের মালিক হয়ে যাবে।

ফাসেদ (اَلْفَاسِدُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ يَصِحُّ اَصْلًا لَا وَصْفًا - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিকত্বের বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিচারে অশুদ্ধ। যেমন, বিক্রীত পণ্য কিছুদিনের জন্য বিক্রেতার ভোগ-ব্যবহারে থাকবে, ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত এ ধরনের কোনো শর্ত আরোপ করা, যেদিন তুফান আসবে সেদিন মূল্য পরিশোধ করবে, এরূপ অনির্দিষ্ট মেয়াদ বিনিময় পরিশোধের জন্য ধার্য করা ইত্যাদি। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ইজাব কবুলের পর ক্রেতা পণ্যদ্রব্য করায়ত্ত করে নিলে সে তার মালিক হবে। তবে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলাই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কর্তব্য। নতুবা তা সুদী কারবার বলে গণ্য হবে। –[ইমদাদুল ফাতওয়া]

মাকরূহ (اَلْمَكْرُوْهُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ يَصِحُّ أَصْلًا وَوَصْفًا وَقَدْ جَاوَرَهُ نَهْىٌ عَنْهُ - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ কিন্তু এ সম্পর্কে হাদীসে কোনো নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যেমন, জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে গুনাহগার হবে।

বাতিল (اَلْبَاطِلُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ لَا يَصِحُّ اَصْلًا وَلَا وَصْفًا - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক বিবেচনাতেই অশুদ্ধ। যেমন, মাল নয় এমন জিনিস উদাহরণত: লাশ, স্বাধীন মানুষ ইত্যাদি বিক্রয় করা।

কার্যকর হওয়া না হওয়ার বিচারে আবার ক্রয়-বিক্রয় দু'প্রকার। ১. اَلنَّافِذُ [কার্যকরী] ২. غَيْرُ النَّافِذ [অকার্যকরী]। এ প্রকার হলো اَلْبَيْعُ الْمَوْقُوْفُ [মওকূফ ক্রয়-বিক্রয়]। প্রথমোক্ত প্রকার আবার দু'প্রকার–
১. لَازِمٌ [লাযেম]; ২. غَيْرُ لَازِمٌ [গায়রে লাযেম]।

মওকূফ (اَلْمَوْقُوْفُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ يَصِحُّ أَصْلًا وَوَصْفًا وَيُفِيْدُ الْمِلْكَ عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَقُّفِ - যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুসঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু পণ্যদ্রব্য অন্যের মালিকানাধীন। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম হলো, মালিক সম্মত হলে তা কার্যকর হবে। নচেৎ বাতিল হয়ে যাবে।

লাযেম (لَازِمْ) : هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الْعَارِىْ مِنَ الْخِيَارَاتِ - যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্যই ইজাব কবুলের পর অপরজনের সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার কোনোরূপ এখতিয়ার নেই।

গায়রে লাযেম (غَيْرُ لَازِمْ) : هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارَاتُ - যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতা কিংবা উভয়ের জন্যই ইজাব কবুলের পর অপরজনের সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকে। আর এ ধরনের এখতিয়ার চার প্রকার– ১. خِيَارُ الشَّرْطِ ২. خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ৩. خِيَارُ الْعَيْبِ ৪. خِيَارُ لِسَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ - প্রতিটির সংজ্ঞা সামনে আসবে।

নিহায়া গ্রন্থকার লিখেছেন, ক্রয়-বিক্রয় আট প্রকার। পণ্যদ্রব্যের বিচারে চার প্রকার। বিনিময় দ্রব্যের বিচারে চার প্রকার। পণ্যদ্রব্যের বিচারে চার প্রকার হলো–১. মুকায়াদাহ (اَلْمُقَايَضَةُ) ২. সরফ (اَلصَّرْفُ) ৩. মুতলাক (اَلْمُطْلَقُ) (৪) সলম (اَلسَّلَمُ)

মুকায়াদাহ (اَلْمُقَايَضَةُ) : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন, খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে কাপড় বিক্রি করা।

সরফ (اَلصَّرْفُ) : بَيْعُ الثَّمَنِ الْمُطْلَقِ بِالثَّمَنِ الْمُطْلَقِ - মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। যেমন, স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা। [বর্তমান যুগে যেমন– টাকার বিনিময়ে রিয়াল ক্রয়-বিক্রয় করা।]

মুতলাক (اَلْمُطْلَقُ) : بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ - নগদ হোক কিংবা বাকি হোক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় করা। যেমন, টাকার বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

সলম (اَلسَّلَمُ) : بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ - দ্রব্য বাকি রেখে মূল্য অগ্রিম প্রদান করা। যেমন, উৎপাদনের পর উৎপাদনকারী ক্রেতাকে এক মণ ধান প্রদান করবে, সে বাবদ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা।

বিনিময় দ্রব্যের বিচারে চার প্রকার হলো– ১. মুসাওয়ামা ২. মুরাবাহা ৩. তাওলিয়া ৪. ওয়াযী'আ।

মুসাওয়ামা (اَلْمُسَاوَمَةُ) : اَلْبَيْعُ الَّذِىْ لَا تُنْتَسَبُ إِلَى الثَّمَنِ السَّابِقِ - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। বরং দর কষাকষির পর ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে যে মূল্য ধার্য হয় তাই বিনিময়মূল্য হয়ে থাকে।

মুরাবাহা (اَلْمُرَابَحَةُ) : اَلْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বের ক্রয় মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং ক্রয়-মূল্যের চেয়ে কিছুটা লাভে বিক্রি করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে বার টাকায় বিক্রি করা।

তাওলিয়া (اَلتَّوْلِيَةُ) : اَلْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বে ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং পূর্বের ক্রয়-মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে দশ টাকায় বিক্রি করা।

ওয়াযীআ (اَلْوَضِيْعَةُ) : وَهُوَ بَيْعٌ بِالنُّقْصَانِ عَنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ - যে বেচাকেনায় বিনিময় মূল্য ধার্য করার ক্ষেত্রে পূর্বের ক্রয়-মূল্যের প্রতি লক্ষ্য থাকে এবং পূর্বের ক্রয়-মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রি করা হয়। যেমন, দশ টাকায় কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আট টাকায় বিক্রয় করা।

قَالَ : اَلْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ إِذَا كَانَا بِلَفْظَيِ الْمَاضِيْ مِثْلُ أَنْ يَّقُوْلَ أَحَدُهُمَا بِعْتُ وَالْاٰخَرُ اِشْتَرَيْتُ لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنْشَاءُ تَصَرُّفٍ وَالْإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوْعُ لِلْإِخْبَارِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِيْهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ رَضِيْتُ بِكَذَا اَوْ اَعْطَيْتُكَ بِكَذَا اَوْ خُذْهُ بِكَذَا فِيْ مَعْنٰى قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّيْ مَعْنَاهُ وَالْمَعْنٰى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِيْ هٰذِهِ الْعُقُوْدِ وَلِهٰذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِيْ فِى النَّفِيْسِ وَالْخَسِيْسِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِتَحَقُّقِ الْمُرَاضَاةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী বলেন, ক্রয়-বিক্রয় [চুক্তি] ইজাব ও কবুল [প্রস্তাবকরণ ও প্রস্তাব গ্রহণ] দ্বারা সম্পাদিত হয়, যখন উভয়টি অতীতকাল বাচক (مَاضِيْ) শব্দযোগে হয়। যেমন, ক্রেতা-বিক্রেতার একজন বলল, আমি বিক্রি করলাম, অপরজন বলল, আমি ক্রয় করলাম। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হলো একটি নতুন লেনদেনের সৃষ্টি (إِنْشَاءُ تَصَرُّفٍ)। আর নতুন [লেনদেন] সৃষ্টি [-র বিধান] শরিয়ত দ্বারা জানা যায়। খবর প্রদানের জন্য গঠিত ক্রিয়ারূপ কখনো কখনো [শরিয়ত কর্তৃক] নতুন [লেনদেন] সৃষ্টির জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং [অতীতকাল বাচক শব্দ যদিও খবর প্রদানের জন্য, কিন্তু] তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। ক্রয়-বিক্রয় [চুক্তি] এমন দু'শব্দ দ্বারা সম্পাদিত হয় না, যার একটি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ। অবশ্য বিবাহের ব্যাপারটি ভিন্ন। এ দু'টোর পার্থক্যের বর্ণনা পিছনে গেছে। "আমি এত টাকায় সন্তুষ্ট" বা "আমি এত টাকার বিনিময়ে তোমাকে প্রদান করলাম" বা "তুমি এত টাকার বিনিময়ে এটা গ্রহণ কর" ক্রেতা-বিক্রেতার এ সব উক্তি- আমি বিক্রি করলাম এবং আমি ক্রয় করলাম উক্তির অর্থেই গণ্য হবে। কারণ, উক্ত উক্তিগুলো এ অর্থই ব্যক্ত করে। আর এ ধরনের চুক্তিতে মর্মার্থই ধর্তব্য। তাইতো বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কম দামী ও বেশি দামী সব জিনিসই মৌখিক ইজাব ও কবুল ছাড়া পণ্য ও বিনিময় আদান-প্রদানেই ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। কারণ পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنْعِقَادْ হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার একজনের কথা আরেকজনের কথার সাথে শরিয়ত নির্দেশিত উপায়ে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা, যাতে মহল্ল তথা পণ্যের উপর তার ক্রিয়া প্রকাশ পায় অর্থাৎ পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে খারিজ হয়ে ক্রেতার মালিকানায় চলে আসে। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যিনি প্রথমে ক্রয়-বিক্রয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন তাকে مُوْجِبْ [প্রস্তাবক] আর তার প্রস্তাবকে اِيْجَابْ বলে। প্রস্তাব গ্রহণ করাকে কবুল (قَبُوْلْ) বলে।

ক্রয়-বিক্রয় ইজাব ও কবুল দ্বারা সম্পাদিত হয়। তবে শর্ত হলো ইজাব ও কবুল অতীতকাল বাচক (مَاضِيْ) শব্দযোগে হতে হবে। শব্দ গঠনকারীগণ অতীতকাল বাচক শব্দকে কোনো সংঘটিত বিষয় বা ঘটনার সংবাদ প্রদানের (اِخْبَارْ) জন্য গঠন করেছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি اِخْبَارْ-এর প্রকারভুক্ত নয়। বরং তা এক প্রকার ইনশা। ইনশা হলো إِثْبَاتُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ

ثَابِتًا সম্পাদিত নয় এমন কোনো বিষয় সম্পাদন করা। আর ইজাব কবুলের মাধ্যমে নতুন করে একটি বিষয় সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের, আর বিক্রেতা বিনিময় দ্রব্য বা অর্থের মালিক হয়। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি إِنْشَاءٌ -এর প্রকারভুক্ত। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য إِخْبَارٌ -এর শব্দ কেন ব্যবহার করা হবে? হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটাই যুক্তিযুক্ত ছিল যে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি إِنْشَاءٌ -এর জন্য গঠন করা শব্দযোগে হবে। কিন্তু শব্দ গঠনকারীরা إِنْشَاءٌ -এর জন্য কোনো শব্দ গঠন করেননি। আর শরিয়ত আভিধানিকভাবে إِخْبَارٌ -এর জন্য গঠিত শব্দকে কখনো কখনো إِنْشَاءٌ -এর জন্য ব্যবহার করেছে। তাই اِشْتَرَيْتُ وَ بِعْتُ শব্দদ্বয় إِخْبَارٌ -এর জন্য হলেও তা দ্বারা إِنْشَاءٌ তথা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে। কারণ إِنْشَاءٌ তথা নতুন লেনদেন চুক্তির বিধান শরিয়ত দ্বারাই জানা যায়।

হিদায়া গ্রন্থাকার বলেন, এমন দু'শব্দযোগে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না, যার একটি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ (مُسْتَقْبِل) আর অপরটি অতীতকাল বাচক শব্দ। ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ মানে فِعْل مُضَارِعٌ যেমন, বিক্রেতা বলল, أَبِيعُ আর ক্রেতা বলল اِشْتَرَيْتُ। হুজুর ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অতীতকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই ক্রয়-বিক্রয় অতীতকালীন শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ হবে। দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ বিক্রেতার পক্ষ থেকে হয়, উদাহরণত: সে বলল, أَبِيعُ [আমি বিক্রি করব] আর ক্রেতা বলল اِشْتَرَيْتُ তাহলে এটা বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয়ের ওয়াদা হলো। বিক্রয়ের প্রস্তাব হয়নি। আর ওয়াদা দ্বারা বিক্রি সংঘটিত হয় না। আর যদি ভবিষ্যতকাল বাচক শব্দ ক্রেতার পক্ষ থেকে হয়, উদাহরণত বিক্রেতা বলল, আমি বিক্রি করলাম, আর ক্রেতা বলল, আমি ক্রয় করব, তাহলে এটা দরদাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হলো। বিক্রেতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি।

তবে مُسْتَقْبِلٌ শব্দের উপরোক্ত উদ্দেশ্য গ্রহণ করলে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। مُضَارِعٌ যেমন ভবিষ্যত কালের অর্থ দেয় তেমনি বর্তমান কালেরও অর্থ দেয়। বরং বর্তমান কালই আসল। তাই তো ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজন مُضَارِعٌ শব্দ ব্যবহার করলে এবং তা দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নিলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়। ইমাম তহাবী ও আল্লামা সায়রাফী (র.) এ কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তখন ওয়াদাও হয় না, দরদামের ইচ্ছাও ব্যক্ত করা হয় না। তাই مُسْتَقْبِلٌ শব্দ দ্বারা مُضَارِعٌ উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়।

এ আপত্তির জবাবে ব্যাখ্যাকারদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, مُضَارِعٌ -এর শুরুতে যদি س বা سَوْفَ থাকে তাহলে তা ভবিষ্যত কালের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে مُسْتَقْبِلٌ শব্দ দ্বারা এরূপ فِعْل مُضَارِعٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজন যদি س বা سَوْفَ যুক্ত مُضَارِعٌ ব্যবহার করে তাহলে এরূপ ইজাব কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। কিন্তু س বা سَوْفَ ব্যতিরেকে যদি مُضَارِعٌ ব্যবহার করে আর তা দ্বারা বর্তমান কাল উদ্দেশ্য করে তাহলে এরূপ ইজাব বা কবুল দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হিদায়ার ইবারতের مُسْتَقْبِلٌ দ্বারা أَمْر -এর ক্রিয়ারূপ উদ্দেশ্য। بِخِلَافِ النِّكَاحِ কথাটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে। কারণ [দ্বিতীয় খণ্ডে] বিবাহ অধ্যায়ের শুরুতে হিদায়া গ্রন্থকার أَمْر -এর ক্রিয়ারূপ দ্বারা مُسْتَقْبِلٌ -এর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيْ وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلَ زَوِّجْنِيْ অতএব এখানেও أَمْر -এর ক্রিয়ারূপই উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজন যদি অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার করে আর অপরজন أَمْر -এর সীগাহ্ ব্যবহার করে, যেমন একজন বলল, بِعْنِيْ هٰذَا الثَّوْبَ بِمِائَةِ تَاكَا -এ কাপড়টি একশ টাকার বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি কর। অপরজন বলল بِعْتُكَ আমি বিক্রি করলাম। এতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে না। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে যদি কোনো কোনো পুরুষকে বলে زَوِّجْنِيْ তুমি আমাকে বিবাহ কর। আর পুরুষ বলে زَوَّجْتُكَ আমি তোমাকে বিবাহ করলাম, তাহলে বিবাহ হয়ে যাবে। এ দু'টোর মাঝে পার্থক্যের কারণ

হলো, زَوِّجْنِى [আমাকে বিবাহ কর] শব্দ বলে বিবাহের উকিল বানানো হয়। আর بِعْنِى [আমার কাছে বিক্রয় কর] বলে বিক্রয়ের উকিল বানানো হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে উকিল একাই ইজাব ও কবুল উভয়টা করতে পারে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে তা পারে না। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অধিকার বা লেনদেনের সম্পর্ক হয় তা উকিলের সাথে হয়। ক্রেতা উকিল থেকে তার পণ্য উসূল করে এবং মূল্য উকিলকেই পরিশোধ করে। কিন্তু বিবাহে এ সম্পর্ক হয় মুআক্কেলের (مُوَكِّلْ) সাথে। স্বামী স্ত্রী থেকে তার অধিকার দাবি করে এবং মহরানা তাকেই পরিশোধ করে, উকিলকে নয়। সুতরাং বিবাহের উকিল যদি নিজেই ইজাব কবুল উভয়টা করে এতে জটিলতা সৃষ্টি হয় না। কারণ সে ক্ষেত্রে উকিল হবেন (مُطَالِبْ) অধিকারের দাবিদার, আর অধিকার দাবি করবেন মুআক্কেলের কাছে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল যদি নিজেই ইজাব কবুল উভয়টা করেন তাহলে তিনি নিজেই ক্রেতা হলেন আবার নিজেই বিক্রেতা হলেন, তিনিই (مُطَالِبْ) অধিকারের দাবিদার হচ্ছেন এবং তার কাছেই অধিকার দাবি করা হচ্ছে। তিনিই মালিক (مُتَمَلِّكْ) হচ্ছেন এবং তিনিই মালিক বানিয়ে (مُمَلِّكْ) দিচ্ছেন। আর এক ব্যক্তি উভয়টা হতে পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ক্রয়-বিক্রয়ে একব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয়টা করতে পারে না। অতএব বিবাহের ইজাব কবুলের কোনো একটি যদি ভবিষ্যতকালীন তথা أَمْرٌ -এর শব্দ হয় তাহলে তা দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ইজাব কবুলের কোনো একটি শব্দ ভবিষ্যতকালীন তথা أَمْر -এর শব্দ হলে তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে না।

قَوْلُهُ : رَضِيْتُ بِكَذَا الخ হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন بِعْتُ وَ اِشْتَرَيْتُ শব্দের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অর্থ ও ভাব ব্যক্ত করে এমন যে কোনো শব্দ দ্বারাই তা সম্পাদিত হতে পারে। সুতরাং কেউ বলল بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا بِكَذَا আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম আর অপরজন বলল رَضِيْتُ আমি সম্মত আছি। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। এরূপভাবে কেউ বলল, أَعْطَيْتُكَ هٰذَا بِكَذَا আমি তোমাকে এ দ্রব্যটি এত টাকার বিনিময়ে দিলাম, আর ক্রেতা বলল, اِشْتَرَيْتُ আমি ক্রয় করলাম বা قَبِلْتُ আমি গ্রহণ করলাম। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। কেউ বলল, اِشْتَرَيْتُ هٰذَا مِنْكَ بِكَذَا আমি এত টাকার বিনিময়ে এ দ্রব্যটি ক্রয় করলাম আর বিক্রেতা বলল خُذْهُ ঠিক আছে, নাও। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে। মোটকথা, بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ -এর ভাব ব্যক্ত করে, ইজাব কবুল এমন যে কোনো শব্দে হলেই হবে। কারণ শরিয়ত অনুমোদিত এ সব চুক্তিতে অর্থ ও ভাবই আসল। আর এ জন্যই بَيْعٌ بِالتَّعَاطِىْ জায়েজ। بَيْعٌ بِالتَّعَاطِىْ হলো, ক্রেতা দোকানে যেয়ে নির্দিষ্ট পণ্যটি তুলে নিল বা দোকানদারকে দিতে বলল। তার দাম জানা আছে, সে টাকা দিল, দোকানদার টাকা নিল। মৌখিকভাবে দু'জনের মাঝে কোনো কথাই হলো না। কার্যত আদান-প্রদান হলো। এ ক্রয়-বিক্রয় দামী, কমদামী সব পণ্যেই জায়েজ। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ এখানে পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া গেছে। অবশ্য ইমাম কারখী (রা.) কমদামী জিনিসে এ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বলেন। কিন্তু বেশি দামী জিনিসে বৈধ বলেন না।

اَلنَّفِيْس হলো দামী ও মূল্যবান দ্রব্য। আর اَلْخَسِيْس হলো কম দামী ও তুচ্ছ পণ্য। কেউ কেউ বলেন, যে দ্রব্য চোর চুরি করলে শাস্তি স্বরূপ তার হাত কাটা যায় এ পরিমাণ মূল্যের হয় তা হলো اَلنَّفِيْس ধরা হবে। আর এ পরিমাণের চেয়ে কম মূল্যের হলে তা اَلْخَسِيْس বলে গণ্য হবে।

قَالَ : وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْأَخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِى الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَهٰذَا خِيَارُ الْقَبُوْلِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُوْنِ قَبُوْلِ الْأُخَرِ فَلِلْمُوْجِبِ أَنْ يَرْجِعَ لِخُلُوِّهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلٰى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ فَاعْتُبِرَتْ سَاعَاتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً دَفْعًا لِلْعُسْرِ وَتَحْقِيْقًا لِلْيُسْرِ وَالْكِتَابُ كَالْخِطَابِ وَكَذَا الْإِرْسَالُ حَتّٰى أُعْتُبِرَ مَجْلِسُ بُلُوْغِ الْكِتَابِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ فِىْ بَعْضِ الْمَبِيْعِ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرٰى بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِعَدَمِ رِضَاءِ الْأُخَرِ بِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ إِلَّا إِذَا بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَفْقَاتٌ مَعْنًى ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "যখন চুক্তির দুই পক্ষের একজন [ক্রয় বা বিক্রয়ের] প্রস্তাব করে তখন অপরজনের জন্য মজলিসে থাকা পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে; সে ইচ্ছা করলে কবুল করতে পারে, ইচ্ছা করলে প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে পারে।" আর এটাকেই খিয়ারে কবুল বলে। কারণ [প্রস্তাবের পর] যদি তার জন্য [প্রস্তাব প্রত্যাখানের] এখতিয়ার না থাকে তাহলে তার সম্মতি ব্যতিরেকে তার উপর ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান আরোপিত হবে ; যখন অপরজনের কবুল ব্যতীত প্রস্তাব হুকুমের [মালিকানার] ফায়দা দিল না তখন প্রস্তাবকারীর জন্যও তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ প্রস্তাব ফেরত নেওয়াটা অপরজনের অধিকার ক্ষুণ্ন করা থেকে মুক্ত। আর খেয়ারে কবুল মজলিসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। কারণ মজলিস বিবিধ বিষয়কে একত্র করে। সুতরাং কঠোরতা দূর করা এবং সহজতা খুঁজে বের করার জন্য মজলিসের মুহূর্তগুলোকে একটি মুহূর্ত গণ্য করা হয়েছে। চিঠিপত্র বা দূতের মাধ্যমে পেশকৃত ইজাবের ব্যাপারটিও এরূপ। অতএব, পত্র পৌঁছার এবং দূতের সংবাদ ব্যক্ত করার মজলিস ধর্তব্য হবে। কবুলকারীর জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের কিয়দাংশে প্রস্তাব কবুল করা বৈধ নয় এবং প্রস্তাবিত মূল্যের কিছু অংশের বিনিময়ে বিক্রয় পণ্য কবুল করা বৈধ নয়। কারণ, [পণ্যের কিয়দাংশ বিক্রিতে] চুক্তি বিভাগ হয়ে যায়, আর এতে অপরজনের [বিক্রেতার] সম্মতি নেই। অবশ্য [পণ্য আলাদা আলাদা হলে] প্রতিটির পৃথক পৃথক মূল্য [আগে থেকে] বলে দিলে [পণ্যের কিয়দাংশে প্রস্তাব কবুল করা] বৈধ হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে কার্যত প্রতিটি পৃথক পৃথক চুক্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে চারটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। যথা–

১. খেয়ারে কবুল কাকে বলে এবং তার যৌক্তিকতা কি?

২. মজলিসের শেষ পর্যন্ত খেয়ারে কবুলের সুযোগ কেন ?

৩. পত্র বা দূত মাধ্যমে অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খেয়ারে কবুলের সময় কতটুকু ?

৪. প্রস্তাবিত পণ্যের কিয়দংশে বা আংশিক মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় কিনা ?

এক. ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়জনের কোনো একজন যদি ইজাব করে; উদাহরণত : বিক্রেতা বলল, بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا بِأَلْفٍ আমি তোমার কাছে এ পণ্যটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে অপরজনের অর্থাৎ ক্রেতার মজলিসে থাকা পর্যন্ত তা গ্রহণ বা প্রত্যাখানের এখতিয়ার থাকে। সে ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত মূল্যে পণ্য গ্রহণ করবে, অথবা তা প্রত্যাখান করবে। এ এখতিয়ারকে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় খেয়ারে কবুল (خِيَارُ الْقَبُوْلِ) বলা হয়। এর যৌক্তিকতা হলো, যদি প্রস্তাবের পর অপর পক্ষের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা, না করার এখতিয়ার না থাকে তাহলে তার সম্মতি ছাড়াই চুক্তির হুকুম তথা প্রস্তাবিত পণ্যের মালিকানা তার উপর আরোপিত হবে। বাধ্যতামূলকভাবে সে মালিক হবে। অথচ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময় করাকেই ক্রয়-বিক্রয় বলে। তাই ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজনের প্রস্তাবের পর অপর পক্ষ কবুল করা বা না করার এখতিয়ার লাভ করবে।

অপর পক্ষের কবুল করার আগ পর্যন্ত যেহেতু প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হুকুমের ফায়দা দেয় না অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের এবং বিক্রেতা বিনিময়মূল্যের মালিক হয় না, তাই কবুলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রস্তাবকারীর জন্য, প্রস্তাবকারী ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা হোক, তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ প্রস্তাবের দ্বারা অপরজনের পণ্যে বা মূল্যে মালিকানা বা মালিকানার অধিকার সাব্যস্ত হয় না। তাই প্রস্তাব ফেরত নেওয়া হলে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিক্রেতার প্রস্তাবের দ্বারা পণ্যে ক্রেতার মালিকানা বা মালিকানার অধিকার সাব্যস্ত না হলেও কবুলের মাধ্যমে পণ্যের মালিক হওয়ার অধিকার (حَقُّ تَمَلُّكٍ) তো সাব্যস্ত হয়। তাই প্রস্তাব ফেরত নেওয়া হলে ক্রেতার এ অধিকার তো ক্ষুণ্ন হবে ?

এর উত্তর হলো,

১. যখন বিক্রেতার প্রস্তাবে পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না তখন পণ্যের প্রকৃত মালিকানা তথা حَقِيْقَتُ مِلْكٍ বিক্রেতারই থাকে। ক্রেতার জন্য শুধু حَقُّ تَمَلُّكٍ তথা কবুলের মাধ্যমে মালিক হওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর حَقِيْقَتُ مِلْكٍ বেশি শক্তিশালী حَقُّ تَمَلُّكٍ -এর চেয়ে। সুতরাং বিক্রেতাকে যদি তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার দেওয়া না হয় তাহলে কম শক্তিশালী অর্থাৎ ক্রেতার حَقُّ تَمَلُّكٍ -এর জন্য বেশি শক্তিশালী অর্থাৎ বিক্রেতার حَقِيْقَتُ مِلْكٍ কে বাতিল করা হয়। আর এটা সঙ্গত নয় যে, অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালীর জন্য বেশি শক্তিশালী বিষয়কে বাতিল করা হবে। তাই বিক্রেতাকে তার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২. তাছাড়া ক্রেতার জন্য حَقُّ تَمَلُّكٍ সাব্যস্ত হয় বিক্রেতার পক্ষ থেকেই। সুতরাং তার حَقُّ تَمَلُّكٍ সাব্যস্তের অধিকার যেরূপ আছে তেমনি তা বাতিল করার অধিকারও থাকবে।

শেষোক্ত উত্তরের উপর প্রশ্ন হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যাকাত উসূলকারীর কাছে তার মালের যাকাত বাবদ মাল বা অর্থ জমা করে তবে সেই মাল বা অর্থে ফকিরদের حَقُّ تَمَلُّكٍ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তা ফেরত নেওয়া তার জন্য জায়েজ নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার حَقُّ تَمَلُّكٍ -এর কারণে বিক্রেতার প্রস্তাব ফেরত নেওয়ার অধিকার না থাকা উচিত।

এর উত্তর হলো,

১. উপরিউক্ত যাকাতের মাসআলার সাথে আলোচ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলার পার্থক্য আছে। উপরোক্ত মাসআলায় اَصْلٌ অর্থাৎ নেসাব বিদ্যমান আছে। وَصْفٌ অর্থাৎ মালের বর্ধিষ্ণুতা প্রমাণিত। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় اَصْلٌ বিদ্যমান নেই, বরং اَصْلٌ -এর একাংশ অর্থাৎ ইজাব আছে।

২. তাছাড়া যাকাত আদায়কারী যখন যাকাত উসূলকারীর কাছে তার যাকাত অর্পণ করে তখন তার حَقِيْقَتْ مِلْكٌ অর্থাৎ মালিকানা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলায় বিক্রেতার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তার মালিকানা শেষ হয় না।

দুই. قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ الخ : এ ইবারতে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখানের এখতিয়ারকে মজলিসের সাথে কেন সীমাবদ্ধ করা হয়েছে? আর এখতিয়ার মজলিসের শেষ পর্যন্ত কেন বলবৎ থাকবে?

প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে– ইজাবের পর কবুলের তিনটি সুরত হতে পারে।

১. ইজাবের সাথে সাথেই কবুল করা আবশ্যক। তা না হলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে।

২. মজলিসের সাথে কবুল করার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত হবে না। মজলিস শেষ হওয়ার আগে কবুল করুক বা পরে করুক উভয় অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে।

৩. প্রস্তাবের পর মজলিসের শেষ পর্যন্ত কবুল করার এখতিয়ার থাকবে।

ইজাব যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে হয় প্রথম সুরতে ক্রেতার সমস্যা হবে। কারণ তখন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকবে না। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে কবুল করতে হবে। দ্বিতীয় সুরতে বিক্রেতার সমস্যা হবে। কারণ তখন তাকে মজলিসের পরেও দীর্ঘ সময় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে। তৃতীয় সুরতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই সুবিধা। কারণ ক্রেতা মজলিসের ভিতরে থেকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পাবে আর বিক্রেতার মজলিসের পরে অপেক্ষা করতে হবে না। আর মজলিস একাধিক বিষয়কে সমন্বিত করে। তাই তো কোনো ব্যক্তি যদি এক মজলিসে তিলাওয়াতে সেজদাকে বারবার পড়ে তাহলে একটি সেজদাই ওয়াজিব হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সুবিধার জন্য এবং উভয় থেকে কষ্ট লাঘব করার জন্য মজলিসের মুহূর্তগুলোকে একটি মুহূর্ত গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মজলিসের শেষ মুহূর্তে কবুল করা আর ইজাবের সাথে সাথে কবুল করা একই কথা। তাই খেয়ারে কবুল মজলিসের শেষ পর্যন্ত বাকি থাকবে।

তিন. হিদায়া গ্রন্থকার (রা.) বলেন,"অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পত্র মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা বা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা উপস্থিত ব্যক্তিকে প্রস্তাব পেশ করার মতোই"। কারণ নবী করীম ﷺ সরাসরিও দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, পত্র মাধ্যমেও দাওয়াত দিয়েছেন। যদি পত্র মারফত দাওয়াত সরাসরি দাওয়াতের মতো না হতো তাহলে তিনি পত্র মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন না। পত্র মারফত বা দূত মুখে ইজাবের খেয়ারে কবুলে পত্র পৌঁছা বা দূত মুখে সংবাদ শোনার মজসিল ধর্তব্য হবে। পত্র মাধ্যমে ইজাবের ধরন : শামিল সিনানকে লিখল, أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ بِعْتُ أَرْضِيْ فُلَانَةً مِنْكَ بِأَلْفِ تَاكَا 'আমি আমার অমুক জমিটি তোমার কাছে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।' যখন পত্রটি সিনানের কাছে পৌঁছবে, সে তা পড়বে ও তার মমার্থ বুঝবে এবং মজলিসে থাকা অবস্থায় কবুল করবে, তখন চুক্তি সম্পন্ন হবে। দূত মুখে ইজাবের ধরন : ফরীদ খলীলকে বলল, إِذْهَبْ إِلَى وَحِيْدٍ وَقُلْ لَهُ أَنَّ فَرِيْدًا بَاعَ أَرْضَهُ فُلَانَةً مِنْكَ بِأَلْفٍ 'তুমি ওয়াহীদের কাছে যাও এবং তাকে বল যে, ফরীদ তোমার কাছে তার অমুক জমিটি এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে।' খলীল এসে যখন ওয়াহীদকে এ কথা জানাবে এবং ওয়াহীদ ঐ মজলিসে থাকা অবস্থায় বলবে, আমি ক্রয় করলাম বা আমি সম্মত আছি তখন এ চুক্তি সম্পন্ন হবে। মজলিস খতমের পর বললে চুক্তি সম্পাদিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে পত্র মাধ্যমে ইজাবের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হবে কিনা এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে যদি ইজাবের নিয়তে পত্র লিখে তাহলে বিক্রয় চুক্তি (عَقْد) সম্পাদিত হবে। তা না হলে হবে না। আর দূত মাধ্যমে ইজাবের দ্বারা বিক্রয়-চুক্তি (عَقْد) সম্পাদিত হবে।

মাসআলা : দূত মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণের পর দূতের অজ্ঞান্তে কবুলের পূর্বে প্রস্তাব ফেরত নেওয়া শুদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে পত্র মারফত প্রস্তাব পাঠানোর পর কবুলের পূর্বে প্রস্তাব ফেরত নেওয়া শুদ্ধ হবে। -[মুজতবা ও শরহুত তহাবী]

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি লিখে পাঠায় যে, بِعْنِى هٰذَا بِكَذَا "তুমি আমার কাছে অমুক পণ্য এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি কর।" উত্তরে যদি সে লিখে জানায় যে, আমি বিক্রি করলাম, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রথমোক্ত ব্যক্তি জবাবে না বলে যে, আমি ক্রয় করলাম বা আমি সম্মত আছি। কারণ, তা না হলে উভয় দিক থেকে مَاضِى -এর শব্দ হয় না।

চার. কবুলকারীর জন্য প্রস্তাবিত পণ্যের কিয়দাংশে প্রস্তাব গ্রহণ করার এখতিয়ার নেই। উদাহরণত: বিক্রেতা বলল, "আমি তোমার কাছে এক হাজার টাকার বিনিময়ে এ দু'টি পণ্য বিক্রি করলাম।" তাহলে ক্রেতার জন্য এখতিয়ার নেই যে, সে বলবে, "আমি একটি পণ্য পাঁচশ' টাকায় গ্রহণ করলাম।" এরূপভাবে ক্রেতা যদি বলে, "আমি এ দু'টি পণ্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম।" তাহলে বিক্রেতার জন্য এটা বলার এখতিয়ার নেই যে, "আমি একটি পণ্য এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।" কারণ এখতিয়ার থাকলে চুক্তির (صَفْقَةٌ) ধরন পাল্টে যাবে। প্রস্তাবকারী যদি বিক্রেতা হয় আর ক্রেতা পণ্যের কিছু অংশে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহলে অবশিষ্ট পণ্যের জন্য বিক্রেতাকে নতুন করে ক্রেতা খুঁজতে হবে। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা ভাল-খারাপ পণ্য মিলিয়ে বিক্রি করে। যাতে ভালগুলোর সাথে খারাপগুলোও চালিয়ে দেওয়া যায়। ক্রেতার জন্য কিছু অংশে প্রস্তাব বৈধ হলে ক্রেতা বেছে বেছে ভাল পণ্যগুলো নিবে। আর খারাপগুলো থেকে যাবে। এতে বিক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর যদি প্রস্তাবকারী ক্রেতা হয় আর বিক্রেতা কিছু পণ্যে প্রস্তাব কবুল করে তাহলে ক্রেতার চাহিদার অবশিষ্ট পণ্যের জন্য তার আরেকজন বিক্রেতার সন্ধান করতে হবে। তাছাড়া এক সাথে বেশি পণ্য ক্রয়ে যে সুবিধা পাওয়া যায় তা ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় করলে অনেক ক্ষেত্রে সে সুবিধা পাওয়া যায় না। এছাড়া ক্রেতা একটি পণ্যের বিনিময়ে এক হাজার টাকা দিতে সম্মত নয়। এরূপভাবে পণ্যকে প্রস্তাবিত মূল্যের কিছু অংশের বিনিময়ে কবুল করাও বৈধ নয়। উদাহরণত: বিক্রেতা বলল, "আমি তোমার কাছে এ জমিটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম।" তাহলে ক্রেতার এটা বলার এখতিয়ার নেই যে, "আমি পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে কবুল করলাম।" কারণ মূল্য সংকোচনে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর এতে সে সম্মত নয়।

মাসআলা : বিক্রেতা একটি জমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করার প্রস্তাব দিল। ক্রেতা তা পাঁচশ টাকার বিনিময়ে কবুল করল। বিক্রেতা ঐ মজলিসে থেকেই তাতে সম্মত হলো। তাহলে এ বিক্রয়-চুক্তি (عَقْدٌ) শুদ্ধ হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে জমিটি কবুল করাকে মূলত ইজাব আর বিক্রেতার তাতে সম্মত হওয়াকে কবুল গণ্য করা হবে। আর বিক্রেতার প্রথমোক্ত ইজাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, যদি একই ইজাবে একাধিক পণ্যের উল্লেখ করা হয় এবং প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন মূল্য বলে দেওয়া হয় তাহলে ক্রেতার কিছু পণ্য কবুল করা শুদ্ধ হবে। যেমন, বিক্রেতা বলল, "আমি আমার এ দু'টি জমি বিক্রি করলাম; এটা একশ' টাকা আর ওটা দেড়শ' টাকা।" ক্রেতা বলল, 'আমি এ [শেষোক্ত] জমিটি দেড়শ' টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম' তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কারণ এক্ষেত্রে একই ইজাবে একাধিক পণ্যের উল্লেখ করলেও পরোক্ষভাবে চুক্তি অনেকগুলো। সুতরাং পণ্যের কিছু অংশে কবুল করলেও চুক্তির (صَفْقَةٌ) ধরন পাল্টে যাচ্ছে না। আর যেহেতু চুক্তির ধরন পরিবর্তন হচ্ছে না তাই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

وَأَيُّهُمَا قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُوْلِ بَطَلَ الْإِيْجَابُ ، لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيْلُ الْإِعْرَاضِ وَالرُّجُوْعِ وَلَهُ ذٰلِكَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا .

অনুবাদ : তাদের কোনো একজন কবুলের পূর্বে মজলিস থেকে উঠে গেলে ইজাব বাতিল [অকার্যকর] হয়ে যাবে। কারণ [মজলিস থেকে] উঠে যাওয়া [কবুলকে] উপেক্ষা করা এবং [ইজাব থেকে] ফিরে আসার প্রমাণ। আর এ অধিকার তার আছে। এটা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে কখন ইজাব বাতিল হবে তা আলোচিত হয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে একজনের ইজাবের পর অপরজনের কবুল করার এখতিয়ার থাকে। যদি কবুল করার আগে কোনো একজন মজলিস থেকে উঠে বা দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ আলোচনার মাঝ থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া অসম্মতি ও অনাগ্রহের প্রমাণ বহন করে। যদি ইজাবকারী দাঁড়িয়ে যায়, তা তার ইজাব প্রত্যাহারের প্রমাণ বহন করে। আর কবুলের পূর্বে ইজাব প্রত্যাহারের তার এখতিয়ার আছে। আর যদি অপর পক্ষ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তা কবুলের প্রতি তার অনাগ্রহ ও অসম্মতির (إِعْرَاضْ) প্রমাণ বহন করে। আর কবুল না করার অর্থাৎ ইজাব প্রত্যাখান করার তার এখতিয়ার আছে।

আল্লামা আইনী (র.) তাঁর বিনায়া গ্রন্থে قِيْلَ শব্দে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, ইজাবের স্থান ছেড়ে চলে যাওয়া। অবশ্য সাধারণভাবে সকল কিতাবে শুধু দাঁড়িয়ে যাওয়াকেই অসম্মতি ও অনাগ্রহের প্রমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শায়খুল ইসলাম খাহার যাদাহ (র.) শরহুল জামেইস সাগীরে উল্লেখ করেছেন, শুধু দাঁড়ানোটা অনাগ্রহ ও অসম্মতির দলিল নয়। বরং স্থান ছেড়ে চলে যাওয়াটা অনাগ্রহ ও অসম্মতির দলিল। তাই বিক্রেতা যদি ইজাবের স্থান থেকে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু এখানো ঐ স্থান ছেড়ে যায়নি, এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা কবুল করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। শুধু দাঁড়ানোতে ইজাব বাতিল হবে না। তাছাড়া ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ -এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইজাবের স্থান ছেড়ে যাওয়া শর্ত। কারণ স্থান ছেড়ে গেলেই قِيَامْ عَنْهُ হয়। যদি স্থান ছেড়ে যাওয়া শর্ত না হতো তাহলে قَامَ عَنْهُ না বলে قَامَ فِيْهِ বলা হতো।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইজাব প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার যেমন মৌখিক বলার দ্বারা ঘটে, তেমনি কাজ বা আচরণের মাধ্যমেও তা ঘটে থাকে।

মাসআলা : শরহুত তহাবী গ্রন্থে আছে, দু'ব্যক্তি এক সঙ্গে হাঁটছে কিংবা একই বাহনে অথবা একাধিক বাহনে চলছে, এমতাবস্থায় যদি একজন ইজাব করে, তাহলে অপরজন যদি ইজাবকারীর ইজাবের সাথে সাথে কবুল করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর যদি সামান্যতম বিলম্বও হয়, একই বিষয়ে ও একই বাহনে থাকা সত্ত্বেও চুক্তি শুদ্ধ হবে না। কারণ দুই বক্তব্য অর্থাৎ ইজাব ও কবুলের মাঝে যখন পথ চলা কিংবা একসাথে বা আগে পরে হাঁটা পাওয়া গেল, তা সামান্য হলেও, এতে মজলিস পরিবর্তন হয়ে গেল এবং চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার আগেই অনাগ্রহ ও অসম্মতি (إِعْرَاضْ) পাওয়া গেল। তাই ইজাব বাতিল হয়ে গেছে।

মাসআলা : যদি বাহ্যিকভাবে মজলিস পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ স্থান ছেড়ে কেউ যায়নি; কিন্তু আলোচনা বা কাজ পাল্টে যায়, এটাকে মজলিস পরিবর্তন ধরা হবে। এর দ্বারা ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। মোটকথা, প্রস্তাবের প্রতি অনাগ্রহ ও অসম্মতি (إِعْرَاضْ) বোঝা গেলেই মজলিস বাতিল হয়ে যাবে।

وَإِذَا حَصَلَ الْإِيْجَابُ وَالْقَبُوْلُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَنَا أَنَّ فِي الْفَسْخِ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ فَلَا يَجُوْزُ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى خِيَارِ الْقَبُوْلِ وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِعَانِ فِيْ حَالَةِ الْمُبَاشَرَةِ لَا بَعْدَهَا أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالتَّفَرُّقُ فِيْهِ تَفَرُّقُ الْأَقْوَالِ .

অনুবাদ : যখন ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হবে তখন বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। এরপর ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো জন্যই [তা অমান্য] করার এখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য পণ্যের কোনো দোষ-ত্রুটি [প্রকাশ পেলে] কিংবা না দেখে কেনার কারণে [দেখার পর তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার থাকবে।] ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [ইজাব ও কবুলের পর] ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে। কারণ, হুজুর ﷺ বলেন, ক্রেতা -বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ে এখতিয়ার পাবে। আমাদের দলিল হলো, [ইজাব কবুলের পর] বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করলে তাতে অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। সুতরাং তা জায়েজ নেই। উপরোক্ত হাদীসটি খেয়ারে কবুলের জন্য প্রযোজ্য। আর হাদীসে এর প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। কারণ, তাদের দু'জনকে ক্রেত-বিক্রেতা তখনই বলা হয়, যখন তারা ইজাব ও কবুল করছে। ইজাব কবুলের পর নয়। [ইজাব কবুলের পর তারা অপরিচিত ব্যক্তির মতো।] অথবা হাদীসটি থেকে [অন্য অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকলেও] খেয়ার কবুলের অর্থ গ্রহণের অবকাশও আছে [অন্য অর্থ গ্রহণ করার চেয়ে খেয়ারে কবুলের অর্থ গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত শ্রেয় বিধায়] এ অর্থেই হাদীসটিকে প্রয়োগ করা হবে। আর বিচ্ছিন্নতা মানে মৌখিক কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে খেয়ারে মজলিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুরতে মাসআলা : ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে যে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার শারীরিক পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের তা ভঙ্গ করার এখতিয়ারকে খেয়ারে মজলিস বলা হয়। আমাদের মতে যখন ইজাব ও কবুল সম্পন্ন হবে তখন বিক্রয়-চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক হবে এবং কারো জন্যই এ চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকবে না। তবে পণ্য হস্তগত করার পর যদি ক্রেতা পণ্যে এমন কোনো দোষ খুঁজে পায় যা হস্তগত করার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল কিংবা ক্রেতা যদি পণ্য না দেখে ক্রয় করে, তবে প্রথমোক্ত সুরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব (خِيَارُ عَيْبٍ) লাভ করবে অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ত্রুটিযুক্ত সেই পণ্য রেখে দেবে, অথবা ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে মূল্য বাবদ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ তুলে নিবে। আর শেষোক্ত সুরতে দেখার পর খেয়ারে রুয়ত (خِيَارُ رُؤْيَةٍ) অর্থাৎ তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। এক কথায় আমাদের মতে ক্রেতা বিক্রেতা কারো জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও এটি।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্যই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাঁদের দলিল নিম্নোক্ত হাদীস। হাদীসটি শব্দের কিছুটা পার্থক্যসহ আইম্মায়ে সিত্তাহ হযরত নাফে' (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিদায়া গ্রন্থকার যে শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা নাসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে। হাদীসটি এই–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

"ক্রেতা-বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়।" এ হাদীসের দুটি শব্দ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا ও اَلْمُتَبَايِعَانِ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। مُتَبَايِعَانِ মানে ক্রেতা ও বিক্রেতা। ইজাব ও কবুলের পর এ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর تَفَرُّقٌ মানে পৃথক হওয়া। এর দ্বারা শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ দাঁড়ায়, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ইজাব কবুলের পর শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এখতিয়ার পাবে। শারীরিকভাবে হওয়ার পর এখতিয়ার পাবে না। আর ইজাব কবুলের পর শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে এখতিয়ার থাকে তাই তো খেয়ারে মজলিস। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বিক্রয়-চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর খেয়ারে মজলিস পাবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّ فِى الْفَسْخِ اِبْطَالُ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার আমাদের মাযহাবের পক্ষে আকলী দলিল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, ইজাব কবুলের দ্বারা বিক্রয়-চুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্যের। আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক হয়ে গেছে। এখন ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে এ চুক্তি ভঙ্গের এখতিয়ার দেওয়া হলে এবং তার ভিত্তিতে সে চুক্তি ভঙ্গ করলে অপরজনের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে। আর এতে অপরজনের সম্মতি নেই। সুতরাং তা বৈধ নয়।

আল্লামা আইনী (র.) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রা.) -এর মাযহাবের পক্ষে পেশ করা হলো সহীহ হাদীস আর গ্রন্থকার স্বীয় মাযহাবের পক্ষে পেশ করেছেন আকলী দলিল প্রতিপক্ষের দলিলের পাল্টা দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের দলিল উপস্থাপন করাই সঙ্গত ছিল। অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম তাই করেছেন।

আমাদের দলিল : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।'– [মায়েদা : ১] ইজাব কবুল নিষ্পন্ন ক্রয়-বিক্রয়ও একটি চুক্তি। তাই আয়াতের নির্দেশ মতে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। যদি খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হয় তাহলে চুক্তি রক্ষা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আয়াতের নির্দেশ অমান্য করা হয়। অতএব, খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

দ্বিতীয় দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ 'তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষ্য রেখ।'– [বাকারা : ২৬৮] এ আয়াতে সাক্ষ্য দ্বারা বিক্রয়-চুক্তিকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ বিক্রয়কে অস্বীকার করতে না পারে। খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সুদৃঢ় করার বিষয়টি ব্যাহত হয়। এতে কুরআনের নির্দেশকে অকার্যকর করা হয়। তাই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

তৃতীয় দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী– اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ "মুসলমানগণ তাদের কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।" ইজাব ও কবুলের দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পণ্য ও বিনিময় মূল্য তাদের মালিকানা থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তা নিজের উপর আবশ্যক করেছে। যদি খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত করা হয় তাহলে হাদীসের নির্দেশ পালন হয় না। তাই খেয়ারে মজলিস সাব্যস্ত হবে না।

চতুর্থ দলিল : হুজুর ﷺ হযরত হিব্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আল আনসারী (রা.)-কে বলেছিলেন, اِذَا اشْتَرَيْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِىَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ "যখন তুমি ক্রয় কর তখন তুমি বলে নাও যে, কোনো প্রতারণা নেই, আমার

তিনদিনের খেয়ার (خِيَارُ شَرْطٍ) থাকবে।" এ থেকে বুঝা যায় যে, ইজাব কবুলের সাথে সাথে বিক্রয়-চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلٰى خِيَارِ الْقَبُوْلِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদীসটির উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ হাদীসে মূলত: খেয়ারে কবুলের কথা বলা হয়েছে; খেয়ারে মজলিসের কথা নয়। হাদীসের পূর্বাপর অবস্থা তাই প্রমাণ করে। কারণ مُتَبَايِعَانِ শব্দটি ইসমে ফায়েল (اِسْمُ فَاعِلْ) দ্বিবচন। অর্থ ক্রেতা-বিক্রেতা। একবচন مُتَبَايِعْ কারবারী দু'জনকে তিন অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়–

১. কারবারী দু'জনের মাঝে কেনাবেচার কোনো কথা হয়নি, তারা কেনাবেচার কেবল ইচ্ছা করেছে। একটু পরে ক্রেতা-বিক্রেতা হবে (مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ) -এ হিসেবে রূপক অর্থে তাদেরকে (مُتَبَايِعَانِ) ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়।
২. ইজাব কবুল সম্পন্ন হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থায় একটু আগে ক্রেতা-বিক্রেতা ছিল (مَاكَانَ عَلَيْهِ) এ হিসেবে রূপক অর্থে তাদেরকে (مُتَبَايِعَانِ) ক্রেতা-বিক্রেতা বলা যায়।
৩. কারবারীদ্বয় বেচাকেনার আলোচনায় লিপ্ত অর্থাৎ একজন বলেছে بِعْنِىْ তুমি আমার কাছে বিক্রি কর। আর অপরজন বলেছে بِعْتُ আমি বিক্রি করলাম। এরপর দু'জনই মজলিসে থাকা পর্যন্ত এখতিয়ার লাভ করবে। বিক্রেতা এখতিয়ার পাবে সে যা বলেছে তা স্থির রাখার কিংবা তা প্রত্যাহার করার, আর ক্রেতা এখতিয়ার পাবে বিক্রেতার প্রস্তাব কবুল করার বা প্রত্যাখ্যান করার।

এ তৃতীয় অবস্থায় কারবারীদ্বয় প্রকৃত ক্রেতা-বিক্রেতা। কারণ ইসমে ফায়েল মূলত বর্তমানের (حَالْ)-এর অর্থ প্রদান করে। রূপক অর্থে অতীত ও ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। আর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম। তাই হাদীসে مُتَبَايِعَانِ -এর তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ একজনের ইজাবের পর অপরজনের কবুলের পূর্ব পর্যন্ত কারবারীদ্বয় ক্রেতা-বিক্রেতা। তাদের উভয়ের বিচ্ছিন্নতার পূর্ব পর্যন্ত এখতিয়ার থাকবে। ইজাবকারী তার ইজাব স্থির রাখা কিংবা প্রত্যাহার করার এখতিয়ার পাবে, আর অপরজন কবুল করা বা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার পাবে। আর এটাই খেয়ারে কবুল। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হাদীসে খেয়ারে কবুলের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে দলিল হতে পারে না।

اَوْ يَحْتَمِلُهُ الخ বলে হিদায়া গ্রন্থকার হাদীসটির দ্বিতীয় আরেকটি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, হাদীসের خِيَارْ শব্দ দ্বারা নিশ্চিতভাবে যদি খেয়ারে কবুল উদ্দেশ্য নাও হয় তবু খেয়ারে কবুলের অর্থ গ্রহণের অবকাশ তো আছে। আবার খেয়ারে মজলিসের অর্থ গ্রহণের অবকাশও আছে। কিন্তু খেয়ারে মজলিস উদ্দেশ্য নিলে যেহেতু অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয় তাই খেয়ারে কবুল উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। আর হাদীসের تَفَرُّقْ শব্দ দ্বারা تَفَرُّقْ بِالْاَقْوَالِ কথাবার্তার বিচ্ছিন্নতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কারবারীদ্বয় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ারে কবুল বাকি থাকবে।

তাছাড়া ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার পরের মুহূর্ত হলো ইকালা (اَلْاِقَالَةُ) -এর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ইজাব কবুল সম্পন্ন হওয়ার পর যদি ইকালার সুযোগ দিতে না চাইতেন তাহলে হেঁটে স্বস্থান থেকে সরে যেতেন। [মুসলিম] এ থেকে বুঝা যায় যে, ইজাব কবুলের পর ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ খেয়ার পাবে না।

قَالَ : وَالْأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ كِفَايَةً فِي التَّعْرِيْفِ وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ فِيْهِ لَا تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَالْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ مَعْرُوفَةَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ وَالتَّسَلُّمَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ وَهٰذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيْمُ وَالتَّسَلُّمُ وَكُلُّ جَهَالَةٍ هٰذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ هٰذَا هُوَ الْأَصْلُ قَالَ : وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُوْمًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَ رَهَنَهُ دِرْعَهُ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْأَجَلُ مَعْلُوْمًا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيْهِ مَانِعَةٌ عَنِ التَّسْلِيْمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ فَهٰذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِيْ قَرِيْبِ الْمُدَّةِ وَهٰذَا يُسَلِّمُ فِيْ بَعِيْدِهَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সব পণ্যের দিকে ইশারা করা হয়, বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য তার পরিমাণ জানা জরুরি নয়। কারণ নির্দিষ্টতার জন্য ইশারাই যথেষ্ট। [তবে পরিমাণ অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু] তার পরিমাণ গুণের অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত করে না। ইশারাকৃত নয় এমন বিনিময়মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়, যদি না পরিমাণ ও গুণগত মান জানা থাকে। কারণ বিক্রয়-চুক্তির বিধানানুসারে [বিনিময় মূল্য] হস্তান্তর করা এবং হস্তগত করা ওয়াজিব। আর এ ধরনের অজ্ঞতা যেহেতু ঝগড়ার কারণ হয় তাই হস্তান্তর করা এবং হস্তগত করা বাধাগ্রস্ত হয়। আর এ ধরনের প্রতিটি অজ্ঞতাই [ক্রয়-বিক্রয়ের] বৈধতাকে রহিত করে। এটা মৌলনীতি। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নগদমূল্যে এবং যদি মেয়াদ ধার্য হয় তাহলে বাকিমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কারণ "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণী [নগদ বা বাকির] শর্তমুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ইহুদি থেকে মেয়াদ ধার্য করে বাকিতে খাবার ক্রয় করেছিলেন এবং তার কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। [ক্রয়-বিক্রয় বাকিমূল্যে হলে মূল্য পরিশোধের] মেয়াদ অবশ্যই ধার্য হতে হবে। কারণ, মেয়াদের অজ্ঞতা হস্তান্তরকে বাধাগ্রস্ত করে, যা বিক্রয়-চুক্তির বিধানানুসারে আবশ্যক। [মেয়াদ সুনির্দিষ্ট না হলে] এ ব্যক্তি [বিক্রেতা] ক্রেতার কাছে মূল্য চাইবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, আর ঐ ব্যক্তি [ক্রেতা] দিবে বিলম্ব করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য পণ্য (مَبِيْع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَنْ) নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। কারণ অনির্দিষ্টতা ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। অবশ্য ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে পরিমাণ অজানা থেকে যায়। কিন্তু পরিমাণের অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ে কেউ যদি পণ্য বা তার

বিনিময়ের পরিমাণ ও গুণাগুণ মৌখিকভাবে উল্লেখ না করে ইশারায় দেখিয়ে দেয়; উদাহরণত: একটি গমের স্তূপ দেখিয়ে এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলল, আমি গমের এ স্তূপ আমার হাতের এ টাকাগুলোর বিনিময়ে ক্রয় করলাম। অথচ ক্রেতার গমের পরিমাণ জানা নেই এবং বিক্রেতার টাকার পরিমাণ জানা নেই, তা সত্ত্বেও উভয়পক্ষ এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে সম্মত হয় তাহলে এ বেচাকেনা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো, পণ্য ও বিনিময়মূল্য যে সব মালে সুদ হয় এমন মাল (اَمْوَالٌ رِبَوِيَة) হলে উভয়টা এক জাতীয় না হতে হবে। কারণ সেক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশি হওয়ার কারণে সুদের আশঙ্কা থাকে। আর সুদ যেমন হারাম তেমনি যে বিষয়ে সুদের আশঙ্কা থাকে তাও হারাম।

২. قَوْلُهُ وَالْاَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَا تَصِحُّ اِلَّا اَنْ الخ : যদি বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) নির্দিষ্ট করা না হয়, ইশারার মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা হয়নি, পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা হয়নি, উদাহরণত: কেউ বলল, আমি স্বর্ণের বা টাকার বিনিময়ে এ দ্রব্যটি ক্রয় করলাম। কিন্তু সে স্বর্ণ বা টাকার পরিমাণ ও গুণাগুণ উল্লেখ করল না, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়। পরিমাণ মানে হলো, টাকার নির্দিষ্ট অংক বা দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ। আর গুণাগুণ মানে হলো, দিনার কি ইরাকী বা ইয়ামেনী, ভাল বা খারাপ ইত্যাদি। মোটকথা, ইশারাকৃত নয় এমন বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকলে বিক্রয় শুদ্ধ নয়। কারণ বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর বিক্রেতার জন্য পণ্য (مَبِيعٌ) হস্তান্তর এবং বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) হস্তগত করা, আর ক্রেতার জন্য পণ্য হস্তগত করা এবং বিনিময়মূল্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব। যদি বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকে এবং ইশারাকৃতও না হয় তাহলে তা ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। পরিমাণ অজানা থাকার ক্ষেত্রে বিক্রেতা বেশি পরিমাণ মূল্য দাবি করবে আর ক্রেতা কম দিতে চাইবে। গুণাগুণ অজানা থাকলে বিক্রেতা ثَمَنٌ جَيِّدٌ তথা নিখুঁত বিনিময়মূল্য দাবি করবে, আর ক্রেতা ثَمَنٌ رَدِىٌّ তথা খুঁত আছে এমন বিনিময়মূল্য দিতে চাইবে। এতে করে হস্তান্তর ও হস্তগত করা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই বিনিময়মূল্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা না থাকলে এবং ইশারার মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট করা না হলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَكُلُّ جَهَالَةٍ هٰذَا الخ : হিদায়া গ্রন্থকার এ ইবারতে একটি মূলনীতি বলেছেন। মূলনীতিটি হলো, ক্রয়-বিক্রয়ে যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِى اِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় তা সর্বসম্মতভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতাকে রহিত করে। কিন্তু যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা ক্রয়-বিক্রয়ের শুদ্ধতাকে রহিত করে না। যেমন, কেউ দু'টি ঘোড়ার একটি বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার দিল। এ ক্ষেত্রে কোন ঘোড়াটি বিক্রয় পণ্য তা অজ্ঞাত। কিন্তু এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِى اِلَى الْمُنَازَعَةِ) নয় বিধায় এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। সামনে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের বহু উদাহরণ আসবে যা পণ্যের অনির্দিষ্টতা কিংবা বিনিময়মূল্যের অনির্দিষ্টতা বা বিনিময়মূল্য পরিশোধের সময়কালের অনির্দিষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে শুদ্ধ নয়।

তিন. قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ الخ : ক্রয়-বিক্রয় নগদমূল্যে জায়েজ, বাকিমূল্যেও জায়েজ। এটা ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ সুনির্দিষ্টভাবে ধার্য করা আবশ্যক। কারণ সময় নির্দিষ্ট না হলে মূল্য পরিশোধ নিয়ে ঝামেলা হবে। বিক্রেতা স্বল্প সময়ের মধ্যেই মূল্য পরিশোধ করার দাবি করবে। আর ক্রেতা বিলম্ব করে পরিশোধ করতে চাইবে। এতে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে।

নগদ ও বাকি উভয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ, এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার দু'টি দলিল পেশ করেছেন–

১. আল্লাহর বাণী– اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন।"– [বাকারা : ২৭৫] এ আয়াতে নগদ ও বাকি বিক্রয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং উভয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম: রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইহুদি থেকে বাকিতে খাবার ক্রয় করেছেন এবং তার কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছেন। সুতরাং বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আসওয়াদ (র.)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। বিক্রেতা ইহুদি বনী যফর গোত্রের লোক ছিল। তার নাম ছিল আবুশ শাহম। –[বায়হাকী]

قَالَ : وَمَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِى الْبَيْعِ كَانَ عَلٰى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ وَفِيْهِ التَّحَرِّىْ لِلْجَوَازِ فَيُصْرَفُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَتِ النُّقُوْدُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدَهَا وَهٰذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِى الرَّوَاجِ سَوَاءً لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ إِلَّا أَنْ تَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ بِالْبَيَانِ أَوْ يَكُوْنَ أَحَدُهَا اَغْلَبَ وَاَرْوَجَ فَحِيْنَئِذٍ يُصْرَفُ إِلَيْهِ تَحَرِّيًا لِلْجَوَازِ وَهٰذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِى الْمَالِيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيْهَا كَالثُّنَائِىْ وَالثُّلَاثِىْ وَالنُّصْرَتِىْ الْيَوْمَ بِسَمَرْقَنْدَ ، وَالْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَدَالِىْ بِفَرْغَانَةَ جَازَ الْبَيْعُ إِذَا أُطْلِقَ إِسْمُ الدِّرْهَمِ كَذَا قَالُوْا وَيَنْصَرِفُ إِلٰى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَىِّ نَوْعٍ كَانَ لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ وَلَا إِخْتِلَافَ فِى الْمَالِيَّةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "ক্রয়-বিক্রয়ে কেউ মুদ্রাকে মুতলাক রাখলে [অর্থাৎ পরিমাণ উল্লেখ করেছে, কিন্তু গুণাগুণ উল্লেখ করেনি] শহরের সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রায় ক্রয়-বিক্রয় হবে। কারণ, লোক সমাজে এটাই পরিচিত। আর এভাবেই এ ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার একটি পথ খোঁজা যায়। অতএব, ঐ মুদ্রার সাথেই বিক্রয়কে সম্পৃক্ত করা হবে। কিন্তু মুদ্রার মান যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ; যদি না তার কোনো একটার কথা ক্রেতা বলে দেয়। আর এটা তখন হবে, যখন এক পরিমাণের সবগুলো মুদ্রাই প্রচলনে সমান। [এ সুরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ।] কারণ, [এ ক্ষেত্রে] অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হবে। [বিক্রেতা বেশি মানের মুদ্রাটি দাবি করবে, আর ক্রেতা দিতে চাইবে কম মানের মুদ্রা।] তবে কোনটা তা নির্দিষ্ট করে বলে দিলে অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। অথবা [মুদ্রার মান ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে] কোনোটা বেশি প্রচলিত [আর কোনোটা কম।] বৈধতার পথ খোঁজা হিসেবে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে [অর্থাৎ সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাটি দিলে ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।] আর এটা তখন হবে, যখন একই পরিমাণ মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর যদি মান সমান হয় [এবং প্রচলনও সমান] যেমন সমরকন্দের বর্তমান সুনাঈ, সুলাসী ও নুসরাতী মুদ্রা ফারগানার আদুলী অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে শুধু দিরহামের পরিমাণ উল্লেখ করে থাকলেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। মাশায়েখে কেরাম এরূপই বলেছেন। এবং যে প্রকারের দিকে ইচ্ছা ঐ পরিমাণকে ফিরানো যাবে [অর্থাৎ সুনাঈ, সুলাসী ও নুসরাতীর যে কোনো একটা দিয়ে ঐ পরিমাণ পরিশোধ করলেই হবে।] কারণ [এগুলোর] প্রচলনে ভিন্নতা এবং মানে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য ইবারতে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কোনো ক্রেতা বিনিময়মূল্য হিসেবে মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করল, কিন্তু মুদ্রার শ্রেণী ও মান উল্লেখ করল না, উদাহরণত ক্রেতা বলল, "আমি এ দ্রব্যটি দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলাম" কিন্তু দিরহামগুলো কি বুখারী, না সমরকন্দী তা উল্লেখ করল না, এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে কি না? উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগে কোনো কোনো অঞ্চলে একাধিক রকমের

মুদ্রার প্রচলন ছিল। এক দেশের মুদ্রা পার্শ্ববর্তী দেশে প্রচলিত ছিল। দেশের অন্তর্গত প্রতিটি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশের বাজারজাতকৃত মুদ্রা এক একটা ভিন্ন রকমের মুদ্রা হিসেবে বিবেচিত হতো। আর মুদ্রাগুলোর মৌল উপাদান ও নাম অভিন্ন হতো বিধায় বাহ্যিক পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের/দেশের দিকে সম্পর্কিত করা হতো। যেমন বলা হতো, বুখারী দিরহাম, সমরকন্দী দিরহাম। আজকালও পৃথিবীতে এমন বহু অঞ্চল আছে, যেখানে সাধারণ বাজারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার প্রচলন আছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে, আমি এ কিতাবটি এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করলাম, কিন্তু দিরহামের প্রকার উল্লেখ করল না, তাহলে এ দিরহাম কোন রকমের দিরহাম বলে বিবেচিত হবে ?

এ মাসআলায় চারটি সুরত হতে পারে–

১. প্রচলিত সকল প্রকার দিরহামের মান সমান এবং সবগুলো ঐ অঞ্চলে সমভাবে প্রচলিত।

২. প্রচলিত সকল প্রকার দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রচলনও ভিন্ন ভিন্ন; কোনোটা বেশি প্রচলিত, কোনোটা অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত। এটা কিতাবে বর্ণিত তৃতীয় সুরত।

৩. সকল প্রকার দিরহামের মান সমান, কিন্তু প্রচলন ভিন্ন ভিন্ন; কোনোটা বেশি প্রচলিত, কোনোটা কম প্রচলিত। এটা কিতাবে বর্ণিত প্রথম সুরত।

৪. সকল প্রকার দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু প্রচলন সবগুলোর সমান। এটা কিতাবে বর্ণিত দ্বিতীয় সুরত।

প্রথম সুরতে বিক্রয় শুদ্ধ। যে কোনো প্রকারের এক দিরহাম দিলেই চলবে। কারণ সকল প্রকার দিরহামের মান ও প্রচলন সমান। ফলে ঝগড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সুরতে শহরের সর্বাধিক প্রচলিত দিরহাম অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হবে। দ্বিতীয় সুরতে দিরহামের মান ভিন্ন ভিন্ন হলেও সর্বাধিক প্রচলিত দিরহামের উপর ক্রয়-বিক্রয় হবে দু'কারণে।

১. সমাজের মানুষের লেনদেন যে দিরহামে সবচেয়ে বেশি, সাধারণভাবে দিরহাম বলতে তাই বুঝানো হয়ে থাকে। কায়দা আছে اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ "প্রচলিত ও পরিচিত বিষয় শর্তকৃত বিষয়ের পর্যায়ে।" তাই শর্ত করে দেওয়ার কারণে ক্রেতার উপর যেমন শর্তকৃত মুদ্রা আবশ্যক হতো, তেমনি শর্তমুক্ত অবস্থায় পরিচিত ও প্রচলিত মুদ্রা আবশ্যক হবে।

২. এ প্রক্রিয়া আলোচ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজের একটি পথ বের করার চেষ্টা। তাই সর্বাধিক প্রচলিত দিরহামই ক্রেতার উদ্দেশ্য বলে ধরা হবে।

■ তৃতীয় সুরতে যেহেতু সব দিরহামের মান সমান তাই সর্বাধিক প্রচলিত দিরহাম দিলেই ঝগড়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। আর এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়ের বৈধতা খোঁজা হয়। আকেল ও বালেগ মুসলমানের কথা ও কর্মকে যথাসম্ভব বৈধতার উপর প্রয়োগ করা উচিত।

■ চতুর্থ সুরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হবে। কারণ, সব দিরহামের প্রচলন সমান, কিন্তু মান ভিন্ন ভিন্ন; এটা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِىْ اِلَى الْمُنَازَعَةِ) হবে। বিক্রেতা বেশি মানেরটা দাবি করবে, আর ক্রেতা কম মানেরটা দিতে চাইবে। অবশ্য এ সুরতে মজলিস শেষ হওয়ার আগেই যদি ক্রেতা কোন দিরহামের কথা সে বলেছে তা নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কারণ বলে দেওয়ার দ্বারা অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيْهَا كَالثُّنَائِىْ الخ : কয়েক প্রকার মুদ্রার মান সমান হওয়ার উদাহরণ হলো, আজকাল [হিদায়া গ্রন্থকারের সময়কাল] যেমন সমরকন্দে নুসরতী, সুনাঈ ও সুলাসী তিন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত এবং তিনটির মান সমান। পুরা এক দিরহামকে নুসরতী বলা হয়। সমরকন্দের শাসক নুসরত উদ্দীনের দিকে সম্বন্ধ করে এ মুদ্রার নাম রাখা হয়েছে নুসরাতী। আর সুনাঈ হলো ঐ মুদ্রা যা দুটি মিলে এক দিরহাম হয়। আর সুলাসী হলো যা তিনটি মিলে এক দিরহাম হয়। অতএব কেউ যদি সমরকন্দে দশ দিরহামের বিনিময়ে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা ইচ্ছে করলে নুসরাতী দশটি দিবে, কিংবা সুনাঈ বিশটি দিবে বা সুলাসী ত্রিশটি দিবে। আজকাল বাংলাদেশে যেরূপ দশ টাকায় কোনো জিনিস ক্রয় করলে ক্রেতা দশ টাকাও দিতে পারে, বিশটি আধুলিও দিতে পারে, চল্লিশটি সিকিও দিতে পারে; যে কোনো ভাবে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, খুচরা পয়সার কারণে মানের দিক থেকে কোনোরূপ সমস্যা না হতে হবে। এ ধরনের ভিন্নতা ফারগানার আধালী [দিরহাম] মুদ্রায় আছে। ট্রান্স অক্সিয়ানার (مَاوَرَاءُ النَّهْرِ) ফুকাহায়ে কেরামগণ দিরহামকে আধালী বলতেন। –[বেনায়া]

ফায়দা : শহরের সর্বাধিক প্রচলিত বলতে ঐ শহর বুঝাবে যেখানে বিক্রয় চুক্তি হবে। ক্রেতা বা বিক্রেতার শহর নয়।

قَالَ : وَيَجُوْزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوْبِ مُكَايَلَةً وَ مُجَازَفَةً وَهٰذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ يَدًا بِيَدٍ بِخِلَافِ ما إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيْهِ مِنْ إِحْتِمَالِ الرِّبٰوا وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهَ جَهَالَةَ الْقِيْمَةِ قَالَ : وَيَجُوْزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، وَبِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا أَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيْهِ التَّسْلِيْمُ فَيَنْدُرُ هَلَاكُهُ قَبْلَهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ فِيْهِ مُتَأَخِّرٌ وَالْهَلَاكُ لَيْسَ بِنَادِرٍ قَبْلَهُ، فَيَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ، وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا، وَ الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "গম ও অন্যান্য শস্য পাত্র মাপে এবং অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ আছে।" অবশ্য অনুমান করে বিক্রয় তখন জায়েজ, যখন তাকে বিক্রেতা ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন পণ্য ও বিনিময়মূল্য ভিন্ন জাতীয় হবে তখন হাতে হাতে লেনদেন করে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি] করে বিক্রি কর। পক্ষান্তরে যখন পণ্যকে সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করবে [তখন তা শুদ্ধ হবে না।] কারণ তাতে সুদের আশঙ্কা আছে। [পণ্য ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার] আরেকটি কারণ হচ্ছে, [পণ্য বা বিনিময়মূল্যের পরিমাণের] অজ্ঞতা হস্তান্তর ও হস্তগত করার প্রতিবন্ধক নয়। তাই এটা পণ্যের বাজার দর না জানার মতোই হলো। [পণ্যের বাজার দর জানা না থাকলেও বিক্রয় জায়েজ।] ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "নির্দিষ্ট পাত্রের [পরিমাপে] যার পরিমাণ জানা নেই এবং নির্দিষ্ট পাথরের ওজনে যার পরিমাণ জানা নেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে। যেহেতু এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য হস্তান্তর নগদ হয় আর হস্তান্তরের পূর্বে নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়ার ঘটনা সাধারণত ঘটে না, তাই পরিমাণের এ অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে পৌঁছায় না। পক্ষান্তরে বাইয়ে সালাম [নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে জায়েজ নেই।] কারণ তাতে হস্তান্তর বিলম্ব হয়। আর হস্তান্তরের আগে ঐ পাত্র বা পাথরের ধ্বংস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত আছে যে, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়েও এটা [নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে বিক্রয়] জায়েজ নেই। তবে প্রথমোক্ত মত বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوْبِ مُكَايَلَةً الخ : طَعَامٌ শব্দের উদ্দেশ্য হলো গম ও আটা, আর حُبُوْبٌ শব্দের উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য শস্য-ফসল। ব্যাকরণবিদ খলীল (র.) বলেন, আরবদের ভাষায় طَعَامٌ বলতে গমকেই বুঝায়। [বিনায়া] হাদীসে

এসেছে, كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গম, আটা ও অন্যান্য শস্য-ফসল পাত্র মেপেও বিক্রয় জায়েজ, অনুমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, তবে অনুমান করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, পণ্য (مَبِيْع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَن) এক জাতীয় না হতে হবে। যদি এক জাতীয় হয় তাহলে অনুমান করে বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ, অনুমান করে বিক্রি করা হলে কমবেশি হতে পারে। আর এক জাতীয় দ্রব্যে কমবেশি হলে তা সুদ হয়। সুদ যেরূপ হারাম, তেমনি যে সব ক্ষেত্রে সুদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাও হারাম। তাই অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ নেই।

ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় জায়েজ– এ সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার দু'টি দলিল পেশ করেছেন। একটি নকলী দলিল, অপরটি আকলী দলিল।

নকলী দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস– إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُوْنَ يَدًا بِيَدٍ অর্থাৎ "যখন পণ্য ও বিনিময়মূল্য ভিন্ন জাতীয় হবে তখন হাতে হাতে লেনদেন করে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি] করে বিক্রয় কর।"

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী (র.) বলেন, আমি বর্ণিত শব্দে হাদীসটি কোথাও পাইনি। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকারের বর্ণিত শব্দে হাদীসটি গরীব (غَرِيْب)। মুসলিম শরীফে হাদীসটি নিম্নবর্ণিত শব্দে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা.)-এর সূত্রে সংকলিত হয়েছে

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ هٰذِهٖ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান করে এবং হাতে হাতে বিক্রয় জায়েজ। এসব দ্রব্যের বিক্রয় যদি [সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে না হয়ে] ভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে হয় তাহলে হাতে হাতে করে হলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর। এ হাদীসে সুদ হয় এমন মালে (أَمْوَال رَبَوِيَّة) পণ্য ও বিনিময়মূল্য এক জাতীয় না হলে যেভাবে ইচ্ছা, কমবেশি করে, পরিমাপ করে বা অনুমান করে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে আদান-প্রদান হবে নগদ, বিক্রয়-মজলিসে পণ্য (مَبِيْع) ও পণ্যের বিনিময় (ثَمَن) হস্তগত করতে হবে। বাকিতে আদান-প্রদান নিষেধ করা হয়েছে।

আকলী দলিল : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, অনুমান করে বিক্রয়ের সুরতে পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণের অজ্ঞতা হস্তান্তর করা ও হস্তগত করার প্রতিবন্ধক নয়। আর ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ সাব্যস্ত করে ঐ অজ্ঞতা, যা হস্তান্তর ও হস্তগত করার প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং এ অজ্ঞতা পণ্যের বাজার দর (قِيْمَة) না জানার মতোই হলো। উদাহরণত কেউ দশ টাকার বিনিময়ে একটি কলম কিনল। কিন্তু তার জানা নেই এর বাজার দর (قِيْمَة) কত, দশ টাকার চেয়ে বেশি, না কম। পণ্যের বাজার দর (قِيْمَة) সম্পর্কে অজ্ঞতা (مُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَة) ঝগড়ার কারণ না হওয়ার কারণে যেমনিভাবে সকলের মতেই তা বৈধতার প্রতিবন্ধক নয়, তেমনিভাবে এখানেও পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ না হওয়ার কারণে তা বৈধতার প্রতিবন্ধক হবে না।

ফায়দা : দ্রব্যের বাজার দরকে কীমত (قِيْمَةٌ) আর ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে দ্রব্যের যে মূল্য নির্ধারণ হয় তাকে সমন (ثَمَنٌ) বলে।

قَوْلُهُ قَالَ وَيَجُوْزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ الخ : সুরতে মাসআলা হলো, নির্দিষ্ট পাত্র, তাতে কি পরিমাণ চাউল বা আটা ইত্যাদি ধরে, তার ধারণক্ষমতা কতটুকু তা জানা নেই অথবা নির্দিষ্ট পাথর যার ওজন জানা নেই, এমন পাত্র ও পাথরের পরিমাপে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। উদাহরণত এক ব্যক্তি একটি গামলা দেখিয়ে বলল, আমি দশ টাকায় এ গামলা ভর্তি গম দিব অথবা কোনো একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, আমি দশ টাকায় এ পাথরের ওজন পরিমাণ চাল দিব তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। অথচ গামলায় কি পরিমাণ গম ধরবে এবং পাথরের ওজন কতটুকু তা ক্রেতা-বিক্রেতা কারোই জানা নেই।

এর দলিল হলো, যদিও এ ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের (مَبِيْعٌ) পরিমাণ অজ্ঞাত, কিন্তু এ অজ্ঞতা (مُفْضِىْ اِلَى الْمُنَازَعَةِ) ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ, বেচাকেনায় পণ্যকে উপস্থিত হস্তান্তর করা হয়। আর হস্তান্তরের আগে ঐ পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়াটা বিরল। তাই সহজেই বিক্রেতা ঐ পাত্র বা পাথর দ্বারা মেপে ক্রেতাকে পণ্য সোপর্দ করে দিবে। ফলে কোনোরূপ ঝগড়া সৃষ্টি হবে না। আর ঝগড়া সৃষ্টির যখন কোনো আশঙ্কা নেই তখন বেচাকেনাও শুদ্ধ হবে। কিন্তু বাইয়ে সালাম [যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময়মূল্য আগে দেওয়া হয়, আর উৎপাদনের পর বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তর করে] এ ধরনের পাত্র বা পাথরের পরিমাপে জায়েজ নেই। কারণ বাইয়ে সালামে পণ্য হস্তান্তর বিলম্বিত হয়। আর ততদিনে নির্দিষ্ট করা পাত্র বা পাথর ধ্বংস হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর তাই যদি ঘটে তাহলে বিক্রেতার পণ্য হস্তান্তর বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। ক্রেতা (مُسْلَمٌ اِلَيْهِ) বলবে, নির্দিষ্ট করা পাত্রটি বড় ছিল, আর বিক্রেতা (رَبُّ السَّلَمِ) বলবে, ঐ পাত্রটি আরো ছোট ছিল। আর যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় তা বেচাকেনাকে ফাসেদ করে। তাই নির্দিষ্ট পাত্র বা পাথরের পরিমাপে বাইয়ে সালাম শুদ্ধ নয়।

ফায়দা : যে সব পাত্র কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরি, যা সাধারণত চাপ দিলে বা ব্যবহারে প্রশস্ত হয় না, যেমন, এলুমিনিয়াম, কাঠ, বাঁশ, সিলভার, লোহা প্রভৃতি উপাদানে তৈরি পাত্র, এমন সুনির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাপে বিক্রয় জায়েজ আছে। কিন্তু যে সব পাত্র ব্যবহারে বা চাপ দিলে প্রশস্ত হয়, যেমন পাট, তুলা, রাবার, পলিথিনজাত পাত্রাদি দ্বারা বিক্রয় দুরস্ত নয়।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি রিওয়ায়াত আছে যে, নির্দিষ্ট পাত্র বা নির্দিষ্ট পাথর যার পরিমাণ জানা নেই তার পরিমাপে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নেই। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমত অর্থাৎ জায়েজ হওয়ার মতামতই অধিক শুদ্ধ ও অধিক শক্তিশালী।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيْزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ فِىْ قَفِيْزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ إِلَّا أَنْ يُسَمِّىَ جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا ، وَقَالَا يَجُوْزُ فِى الْوَجْهَيْنِ، لَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ إِلَى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيْعِ وَالثَّمَنِ فَيُصْرَفُ إِلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ مَعْلُوْمٌ إِلَّا أَنْ تَزُوْلَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيَةِ جَمِيْعِ الْقُفْزَانِ اَوْ بِالْكَيْلِ فِى الْمَجْلِسِ، وَصَارَ هٰذَا كَمَا لَوْأَقَرَّ وَقَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُلُّ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ عَلٰى أَنَّ الْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ ثُمَّ إِذَا جَازَ فِىْ قَفِيْزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ فَلِلْمُشْتَرِىْ الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا كِيْلَ فِى الْمَجْلِسِ أَوْ سُمِّىَ جُمْلَةُ قُفْزَانِهَا لِأَنَّهُ عَلِمَ بِذٰلِكَ الْآنَ . فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا إِذَا رَآهُ، وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ وَقْتَ الْبَيْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি খাদ্যশষ্যের স্তুপ প্রতি নির্দিষ্ট পাত্র এক দিরহাম দরে বিক্রি করল, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার এ বিক্রয় শুধুমাত্র এক কফিযের মাঝে দুরস্ত হবে। তবে স্তুপের নির্দিষ্ট পাত্রের মোট সংখ্যা উল্লেখ করলে [স্তুপের সব খাদ্য শস্যই বিক্রয় জায়েজ হবে]। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয় সুরতেই [সকল কফিযে] বিক্রয় জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ক্রয়-বিক্রয়কে সম্পূর্ণ স্তুপের ক্ষেত্রে কার্যকর করা অসম্ভব। কারণ পণ্য (مَبِيْع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَنْ) উভয়টা অজ্ঞাত (مَجْهُوْل)। সুতরাং সর্বনিম্ন পরিমাণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে। আর সর্বনিম্ন পরিমাণটা জানাও আছে। তবে মোট কয় পাত্রে তার সংখ্যা বলে দেওয়ার দ্বারা বা উপস্থিত মেপে নেওয়ার দ্বারা এ অজ্ঞতা (جَهَالَة) দূর হয়ে যায়। এ মাসআলাটি হয়ে গেল যেমন কেউ স্বীকারোক্তি করল যে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে সব দিরহাম পাবে। তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার উপর এক দিরহাম আবশ্যক হবে। সাহেবাঈন (র.)-এর দলিল হলো, অজ্ঞতা দূর করার বিষয়টি তাদের এখতিয়ারভুক্ত। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন কেউ দু'টি গোলামের একটি বিক্রি করল এ শর্তে যে, ক্রেতা [যে কোন একটি নির্দিষ্ট করার] এখতিয়ার পাবে। পর কথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (রা.) -এর মতে যখন এক পাত্রে বিক্রয় জায়েয, তখন ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ তার উপর বিক্রয়-চুক্তি বিভক্ত হয়ে গেছে। এরূপভাবে [এখতিয়ার পাবে] যখন মজলিসে পরিমাপ করা হবে অথবা মোট কয় পাত্র সে সংখ্যা উল্লেখ করা হবে। কারণ সে এখনি [পণ্য ও বিনিময়মূল্য সম্পর্কে] অবগত হলো। সুতরাং তার এখতিয়ার থাকবে। যেরূপ [এখতিয়ার থাকে] ক্রেতার পণ্য দেখার পর, অথচ সে ক্রয়কালে পণ্য দেখেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি খাদ্যশস্যের স্তুপ প্রতি কফিয [একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ] এক দিরহাম দরে বিক্রয় করে, কিন্তু স্তুপে মোট কত কফিয আছে তা উল্লেখ না করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক কফিযে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর অবশিষ্ট শস্যে বিক্রয় বাতিল হবে। যদি মোট কফিয সংখ্যা উল্লেখ করে অথবা প্রতি কফিয এক দিরহাম দরে বিক্রয়ের প্রস্তাবের পর উপস্থিত মেপে নেয় তাহলে সকল কফিযেই বিক্রয় জায়েজ হবে। সাহেবাঈন [ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)] বলেন, উভয় সুরতেই সমুদয় শস্য বিক্রয় জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমতই এটিই।

قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ إِلَى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে দলিল : সর্বমোট কত কফিয তা ইজাবের সময় উল্লেখ করা না হলে পণ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) থেকে যায়। আর যেহেতু পণ্যের পরিমাপের উপর ভিত্তি করেই মূল্যের অংক নির্ধারিত হবে তাই বিনিময়মূল্যের পরিমাণও অজ্ঞাত থেকে যায়। পণ্য (مَبِيْع) ও বিনিময়মূল্য (ثَمَنْ) উভয়টা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট (مَجْهُوْل) থাকার কারণে পুরা শস্যস্তুপের বিক্রয় সম্ভব নয়। কিন্তু স্তুপের মধ্যে ন্যূনতম এক কফিয পরিমাণ শস্য থাকাটা যেহেতু নিশ্চিত তাইএক কফিযের মাঝে বিক্রয় শুদ্ধ সাব্যস্ত হবে। কারণ كُلٌّ শব্দকে যখন এমন কিছুর দিকে সম্বন্ধ (إِضَافَتْ) করা হয় যার শেষ (إِنْتِهَاءْ) জানা নেই তখন তা সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগ হয়। আলোচ্য মাসআলায় كُلٌّ কে قَفِيْز -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মোট কফিয জানা নেই। তাই এক কফিযের বিক্রয় দুরস্ত হবে। তবে ইজাবের পর যদি স্তুপে সর্বমোট কত কফিয আছে বিক্রেতা তা জানিয়ে দেয় কিংবা উপস্থিত মেপে নির্ধারণ করে নেয় তাহলে পণ্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়ার কারণে পুরা খাদ্যস্তুপই বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ وَصَارَ هٰذَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ الخ : كُلٌّ শব্দকে শেষ (إِنْتِهَاءْ) জানা নেই এমন কিছুর দিকে সম্বন্ধ (إِضَافَتْ) করা হলে তা যে সর্বনিম্ন পরিমাণের উপর প্রয়োগ হয় এর পক্ষে হিদায়া গ্রন্থকার উদাহরণ পেশ করেছেন। কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার কাছে كُلُّ دِرْهَمٍ [সব দিরহাম] পাবে তাহলে সর্বসম্মতভাবে এর দ্বারা তার উপর এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও এক কফিযে বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا الخ :

সাহেবাইন (র.) -এর পক্ষে দলিল : সাহেবাইন (র.) -এর মতে শস্যের মোট পরিমাণ উল্লেখ করা হোক বা না হোক উভয় সুরতে সমুদয় শস্যের বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কারণ এখানে দ্রব্য ও বিনিময়মূল্যের পরিমাণে যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা (جَهَالَةْ) রয়েছে তা দূর করার ব্যবস্থা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে। ক্রেতা-বিক্রেতার যে কেউ উপস্থিত মেপে তা দূর করতে পারে। আর যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দূর করা ক্রেতা-বিক্রয়ের আয়ত্তের ভিতরে তা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি তার দুটি গোলাম দেখিয়ে বলল, আমি এ দু'গোলামের একটিকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম, তবে দুটির যে কোনো একটি পছন্দ করার এখতিয়ার ক্রেতার থাকবে। এ ক্ষেত্রে পণ্য অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) কিন্তু এ অজ্ঞতা দূর করা যেহেতু ক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে এবং তা ঝগড়ার কারণ নয় (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةْ) তাই এ বিক্রয় শুদ্ধ হবে। ক্রেতা যে কোনো একটিকে পছন্দ করে নিবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও যেহেতু অজ্ঞতা (جَهَالَةْ) দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে এবং এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ নয় তাই সমুদয় শস্যে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের উপর ফাতওয়া।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا جَازَ فِىْ قَفِيْزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে যেহেতু সমুদয় শস্যের স্থলে এক কফিয শস্যে বিক্রয় শুদ্ধ হবে তাই ক্রেতার তা গ্রহণ করার বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কারণ তার চুক্তির (صَفْقَةْ) ধরন পাল্টে গেছে। তাই সে তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিক্রেতার চুক্তির ধরনও তো পাল্টে গেছে। তাহলে সে কেন এখতিয়ার পাবে না ? এর উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ, বিক্রেতার চুক্তির ধরন পাল্টে গেছে। কিন্তু এ পরিবর্তন তো তার পক্ষ থেকেই হয়েছে। সে মোট কফিযের পরিমাণ উল্লেখ করেনি, কিংবা উপস্থিত মেপে তা নির্ধারণ করেনি, তাই এ পরিবর্তনে সে অবশ্যই সম্মত আছে। আর যখন চুক্তির ধরন পরিবর্তনে সে সম্মত আছে তখন তাকে পুনরায় এখতিয়ার দেওয়ার কি অর্থ ?

এরূপভাবে যখন বিক্রেতা মোট কফিযের সংখ্যা উল্লেখ করবে কিংবা উপস্থিত মেপে কফিযের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তখনও ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ সে এখনি পণ্যের পরিমাণ ও বিনিময়মূল্যের অংক সম্পর্কে অবগত হলো। তার এ পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন নাও হতে পারে কিংবা এ পরিমাণ অর্থ সে ব্যয় করতে রাজি নয় কিংবা পরিমাণ তার ধারণার চেয়ে কম। ফলে প্রয়োজন পূরণের জন্য তার অন্যত্র থেকে অবশিষ্ট শস্য ক্রয় করতে হবে। খুচরা ক্রয়ে তার খরচ বেশি পড়তে পারে, ইত্যাদি সমস্যার কারণে সে তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। যেমন কোনো ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু ক্রয়কালে সে তা দেখেনি। দেখার পর তার ধারণার চেয়ে পণ্যের মান খারাপ হতে পারে। আর এতে সে সম্মত নয়। তাই সে সর্বসম্মতভাবে তা রাখা বা না রাখার এখতিয়ার পাবে। তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা এখতিয়ার পাবে।

وَمَنْ بَاعَ قَطِيْعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِيْ جَمِيْعِهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَكَذٰلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ، وَكَذَا كُلُّ مَعْدُوْدٍ مُتَفَاوِتٍ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوْزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ لِمَا بَيَّنَّا، غَيْرَ أَنَّ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيْعٍ وَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوْزُ لِلتَّفَاوُتِ، وَبَيْعُ قَفِيْزٍ مِنْ صُبْرَةٍ يَجُوْزُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ، فَلَا تُفْضِيْ الْجَهَالَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِيْهِ، وَتُفْضِيْ إِلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ.

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন,] কেউ যদি একপাল ছাগল প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রি করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সমস্ত ছাগলের বিক্রয় অশুদ্ধ হবে। এরূপভাবে কেউ যদি গজ হিসেবে [এক থান] কাপড় বিক্রয় করে, প্রতি গজ এক দিরহাম দরে 'কিন্তু [কাপড়] মোট কত গজ আছে তা উল্লেখ করেনি [তাহলে এক গজ কাপড়েও বিক্রি শুদ্ধ হবে না।'] গণনা করে বিক্রয় হয় এমন যে সব দ্রব্যের এককের মাঝে [দামে] পার্থক্য হয় সেগুলোর বিধানও এরূপই। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সবগুলোতে বিক্রয় জায়েজ। কারণ আমরা পিছনে বলেছি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পূর্বোক্ত দলিল অনুসারে একটিতে বিক্রয় কার্যকর হবে। কিন্তু পালের একটি ছাগল এবং থানের এক গজ বিক্রয় [পালের একক ও থানের গজের পরস্পরে দামের] পার্থক্যের কারণে জায়েজ নেই। তবে স্তূপের এক কফিয বিক্রয় জায়েজ। কারণ [স্তূপীকৃত পণ্যের পরস্পরে] পার্থক্য নেই। তাই তাতে অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত করবে না। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলায় [ছাগলের পাল ও থানের কাপড় বিক্রয়ে] অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে পৌঁছাবে। অতএব [উভয় মাসআলার] পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি একপাল ছাগল প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রয় করে, উদাহরণত সে বলল, আমি ছাগলের এ পালটি বিক্রি করলাম, প্রতিটির মূল্য এক দিরহাম, কিন্তু সে পালে মোট কতগুলো ছাগল আছে তা উল্লেখ করেনি। এরূপভাবে কেউ যদি থান কাপড় গজ হিসেবে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে বিক্রি করে উদাহরণত সে বলল, আমি এ কাপড়টি বিক্রি করলাম, প্রতি গজ এক দিরহাম, কিন্তু থানে মোট কত গজ কাপড় আছে তা উল্লেখ করল না, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সমস্ত ছাগলে এবং সমস্ত কাপড়ে বিক্রয় অশুদ্ধ হবে। একটি ছাগলেও এবং এক গজেও বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এরূপভাবে যে সব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয় কিন্তু দ্রব্যের এককের মাঝে দামে পার্থক্য হয়, যেমন লাউ, তরমুজ, আনারস ইত্যাদি, এগুলোর স্তূপও প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রি করলে, যদি মোট সংখ্যা না বলে, একটিতেও বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন , এ মাসআলায় তিনটি সুরত রয়েছে–

১. মোট কত গজ বা কতটি ছাগল উল্লেখ করেছে। এরপর বলেছে, প্রতিটি ছাগল বা প্রতি গজ কাপড় এক দিরহাম করে, কিন্তু মোট মূল্য কত আসে তা উল্লেখ করেনি। এ সুরতে সমস্ত পালে এবং সমস্ত থানে বিক্রয় জায়েজ। কারণ পণ্যদ্রব্যও নির্দিষ্ট এবং বিনিময়মূল্যও নির্দিষ্ট।

২. মোট কত টাকা মূল্য আসে তা উল্লেখ করেছে, কিন্তু থানে মোট কত গজ কাপড় বা পালে মোট কতটি ছাগল তা উল্লেখ করেনি। এরপর বলেছে, প্রতিটি ছাগল বা প্রতি গজ কাপড় এক দিরহাম। এ সুরতেও সমস্ত পালে এবং সমস্ত থানে বিক্রয় জায়েজ। কারণ যখন মোট মূল্য উল্লেখ করার পর প্রতিটি ছাগলের বা প্রতি গজ কাপড়েরর মূল্য বলে দিল এতে পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে কত গজ কাপড় আছে তা বুঝা যায়।

৩. পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে মোট কত গজ কাপড় আছে এবং মোট মূল্য কত আসে কোনোটিই বলেনি। শুধু প্রতিটি ছাগলের বা প্রতি গজ কাপড়ের মূল্য বলেছে। এটাই কিতাবের মাসআলা। এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একটি ছাগলেও এবং এক গজ কাপড়েও বিক্রয় শুদ্ধ নয়। খাদ্যস্তুপ প্রতি কফিয এক দিরহাম দরে বিক্রয়ের যে মাসআলা পূর্বে গেছে সে অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে একটি ছাগল এবং এক গজ কাপড়ে বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু দু'টি মাসআলায় স্পষ্টত পার্থক্য আছে। খাদ্যশস্য স্তুপের সমস্ত শস্য এক রকম। কিন্তু পালের সমস্ত ছাগল এবং থানের সমস্ত গজ এক সমান নয়। ছাগলের মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য স্বীকৃত। আর পূর্বযুগের থান কাপড়ের সব গজ এক রকম হতো না। কোনো গজ ভাল, কোনো গজ খারাপ হতো। এমতাবস্থায় পালের একটি ছাগলের মধ্যে কিংবা থানের এক গজ কাপড়ে যদি বিক্রয় সহীহ ধরা হয় তাহলে সেই একটি ও এক গজ নির্বাচন নিয়ে ঝগড়া বাঁধবে; ক্রেতা চাইবে দেখেশুনে বড় সাইজের একটা নিতে, কাপড়ের যে গজ সবচেয়ে ভাল তা নিতে আর বিক্রেতা চাইবে ছোটখাটো বা মাঝারি একটি দিতে। আর যা ক্রেতা-বিক্রেতাকে ঝগড়ার দিকে পৌছায় (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) তা জায়েজ নেই। তাই পালের একটি ছাগলেও এবং কাপড়ের এক গজেও বিক্রয় জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে খাদ্যশস্যের স্তুপ পুরাটা দামের হিসেবে এক রকম। সেখানে এক কফিয জায়েজ হলে ঝগড়ার আশঙ্কা নেই, বিধায় এক কফিযে বিক্রয় শুদ্ধ।

সাহেবাইন (র.) -এর মতে ছাগলের পুরা পালে এবং কাপড়ের পুরা থানে বিক্রয় জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতই পোষণ করেন। তাদের দলিল হলো, পালে মোট কতটি ছাগল আছে এবং থানে মোট কত গজ আছে এর অজ্ঞতা (جَهَالَةٌ) দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে। উপস্থিত গুণে নিলেই এ অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। আর যে অজ্ঞতা দূর করা ক্রেতা-বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে তা ঝগড়ার কারণ হয় না। তাই তা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

قَالَ : وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيْزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُوْدَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ ، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُوْدِ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো শস্যস্তূপ একশ' কফিয আছে এ শর্তে একশ' দিরহামে ক্রয় করল, অতঃপর শস্য [-র পরিমাণ তার চেয়ে] কম পেল তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে যা উপস্থিত আছে তাই তদনুপাতে দাম দিয়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে বিক্রয়-চুক্তি ভেঙ্গে দিবে। কারণ [বিক্রয়-চুক্তি] পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই তার চুক্তির ধরন পাল্টে গেছে। ফলে বর্তমান পরিমাণ দ্বারা তার সন্তুষ্টি পূরণ হয়নি। আর যদি শস্য [একশ' কফিযের চেয়ে] বেশি পায় তাহলে অতিরিক্ত শস্য বিক্রেতার। কারণ বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে। আর বস্তুর পরিমাণ এখানে তার সিফাত বলে বিবেচিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি খাদ্যশস্যের স্তূপ একশ' কফিয আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে কিন্তু হস্তগত করার সময় তার চেয়ে পরিমাণে কম পায়, উদাহরণত নব্বই কফিয পায়, তাহলে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। যদি সে গ্রহণ করতে চায় তাহলে মওজুদ নব্বই কফিয শস্যকে নব্বই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর যদি বিক্রয়-চুক্তি (عَقْد) ভঙ্গ করতে চায় তা তার জন্য জায়েজ। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও (র.) এ অভিমতই পোষণ করেন। শর্তকৃত পরিমাণের চেয়ে শস্য কম হলে ক্রেতা কেন এখতিয়ার পাবে এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থকার (র.) যে আকলী দলিল পেশ করেছেন, তার সারমর্ম হলো– ক্রেতা চুক্তি করেছে একশ' কফিযের, কিন্তু এখন পাচ্ছে নব্বই কফিয। সে এখনো পণ্য (مَبِيْع) হস্তগত করেনি বিধায় বিক্রয়-চুক্তি এখনো পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি, অথচ তার চুক্তিকৃত পরিমাণে ঘাটতি এসেছে। আর মওজুদ পরিমাণে তথা নব্বই কফিযে সে সন্তুষ্ট নয়। কারণ সে হয়তো একাধিক দোকান থেকে পৃথক পৃথক চুক্তিতে অল্প অল্প না কিনে একই দোকান থেকে এক সাথে একশ' কফিয কেনার ইচ্ছা করে থাকবে। অথচ এ স্থলে পণ্য-ঘাটতি তার সে ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই তাকে উক্ত পণ্য গ্রহণ করা/ না করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য গ্রহণ করতে সম্মত হলে তাকে আনুপাতিক দাম দিলেও চলবে। কারণ খাদ্যশস্য সমমান সম্পন্ন সামগ্রীর (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর এক কফিযের সাথে অন্য কফিযের মূল্যে তারতম্য হয় না। সুতরাং যে পরিমাণ শস্য মওজুদ আছে অর্থাৎ নব্বই কফিয তা নব্বই দিরহামে গ্রহণ করা হলে কোনোরূপ বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।

আর যদি শস্যের পরিমাণ একশ' কফিযের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অতিরিক্তটুকু বিক্রেতার ; তা ক্রেতা নিতে পারবে না। কারণ, বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে। আর যেখানে বিক্রয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সংঘটিত হয় সেখানে অতিরিক্তটুকু তাতে শামিল হয় না। হ্যাঁ, যদি অতিরিক্তটুকু وَصْف হতো তাহলে পণ্যের تَابِعْ হিসেবে শামিল হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর যা অতিরিক্ত হয়েছে তা وَصْف নয়। সুতরাং বিক্রয় চুক্তি তাকে শামিল করবে না।

قَوْلُهُ وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ : মাশায়েখ কেরাম قَدْر ও وَصْف -এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। টুকরা বা ভাগ করার দ্বারা যে সব দ্রব্য দোষযুক্ত হয়ে পড়ে, উদাহরণত: পিস কাপড়, শাড়ি, জুব্বা প্রভৃতি তৈরি পোশাক, এগুলো টুকরা করলে বা এগুলো থেকে এক গজ, আধা গজ কাপড় কেটে নিলে সম্পূর্ণ কাপড়টিই বাতিল হয়ে যায় কিংবা তার মূল্যে ঘাটতি আসে, এধরনের পণ্যে কমবেশি এবং পরিমাপ হলো وَصْف তথা বস্তুর গুণ বা অবস্থা। আর وَصْف -এর বিনিময়ে মূল্য আসে না। وَصْف টা পণ্যের تَابِع হয়ে থাকে। সুতরাং কেউ যদি পিস কাপড় এ শর্তে ক্রয় করে যে, তাতে দশ গজ আছে, কিন্তু মেপে দেখা গেল তাতে এক গজ বেশি আছে তাহলে এ অতিরিক্ত এক গজ ক্রেতা পাবে এবং এর জন্য তাকে অতিরিক্ত কোনো পয়সা দিতে হবে না। কারণ অতিরিক্ত গজটি পণ্যের تَابِع হিসেবে পণ্যের সাথে ক্রেতার মালিকানায় এসে যাবে, আর وَصْف -এর বিপরীতে যেহেতু কোনো মূল্য আসে না তাই বিক্রেতা অতিরিক্ত পয়সা পাবে না।

আর যে সব দ্রব্য টুকরো বা ভাগ করার দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হয় না, উদাহরণত একশ' কফিয শস্য আছে, তা থেকে পাঁচ/ দশ কফিয শস্য আলাদা করলে অবশিষ্ট শস্যগুলো বাতিলও হয় না এবং তার দরও পড়ে যায় না। এমন সব পণ্যে পরিমাপ তথা কমবেশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যমান পাওয়ার উপযোগী। অতএব আলোচ্য মাসআলায় যদি কেউ একশ' কফিয শস্য ক্রয় করার পরে দেখে পাঁচ কফিয বেশি আছে। তাহলে অতিরিক্ত পাঁচ কফিযের মালিকানা বিক্রেতার থাকবে। একশ' কফিয পণ্যের تَابِع হিসেবে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হবে না।

অবশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে وَصْف টা যদি মুখ্য হয়, উদাহরণত তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতি যদি হাত বা ফিট হিসেবে বিক্রয় হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন বলা হলো, এ কাপড়টিতে দশ গজ আছে, দাম একশ' টাকা, প্রতি গজ দশ টাকা, তাহলে وَصْف টা মূল্যমান বা পাওয়ার উপযোগী হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে।

وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى أَنَّهٗ عَشَرَةُ اَذْرُعٍ بِعَشَرَةٍ أَوْ أَرْضًا عَلٰى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَّ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِأَنَّ الذِّرَاعَ وَصْفٌ فِى الثَّوْبِ أَلَا تَرٰى أَنَّهٗ عِبَارَةٌ عَنِ الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهٗ شَيْئٌ مِنَ الثَّمَنِ كَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ فَلِهٰذَا يَأْخُذُهٗ بِكُلِّ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ فَلِهٰذَا يَأْخُذُهٗ بِحِصَّتِهٖ إِلَّا أَنَّهٗ يَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَذْكُوْرِ لِتَغَيُّرِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ فَيَخْتَلُّ الرِّضَا وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِىْ سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِىْ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهٗ صِفَةٌ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهٗ مَعِيْبًا فَإِذَا هُوَ سَلِيْمٌ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি কোনো কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে কিংবা কোনো জমি একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে, অতঃপর সে তা তার চেয়ে কম পায় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, যদি চায় পুরো দাম দিয়ে মওজুদ কাপড় বা জমিটি নিবে, আর যদি চায় [তা] পরিত্যাগ করবে। কারণ কাপড়ে গজ একটি গুণ (وَصْف)। তুমি কি দেখ না যে, গজ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের একটি রূপ। আর গুণের (وَصْف) বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। যেমন প্রাণীর হাত, পা ইত্যাদি। তাই কাপড় বা জমিটি ক্রেতা পুরো দাম দিয়ে নিবে। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলা ভিন্ন। কারণ পরিমাপের বিপরীতে মূল্য হয়। তাই [সে ক্ষেত্রে] মওজুদ শস্যকে গ্রহণ করবে তদনুপাত দাম দিয়ে। তবে [আলোচ্য মাসআলায়] উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ, [উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে] চুক্তিকৃত পণ্য পাল্টে গেছে। ফলে ক্রেতার সম্মতি ক্ষুন্ন হচ্ছে। আর যদি কাপড় বা জমিটিকে ধার্যকৃত গজের চেয়ে বেশি পায় তাহলে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার। এতে বিক্রেতার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কারণ গজ হলো গুণ (وَصْف)। সুতরাং এটা ঐ বেচাকেনার মতো হলো যে, বিক্রেতা একটি ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রয় করেছে, কিন্তু পরে দেখা গেল তা ত্রুটিমুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে দশ দিরহামের বিনিময়ে অথবা একটি জমি একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল, কিন্তু ক্রয়ের পর দেখা গেল তাতে কাপড় বা জমি যথাক্রমে দশ গজ ও একশ' গজের চেয়ে কম আছে, তাহলে ক্রেতা তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। তবে গ্রহণ করলে পুরো দামে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে কাপড় বলতে থান কাপড় বা এমন কাপড় বুঝানো হয়নি, যা থেকে আধা বা এক গজ কাপড় কেটে নিলে তার ক্ষতি সাধিত হয় না এবং দাম কমে যায় না। বরং পিস হিসেবে বিক্রয় হয়, গজ বা হাত হিসেবে নয় এমন কাপড় উদ্দেশ্য। যেমন, জুব্বা, শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রীপিস ইত্যাদি। এ শ্রেণীর বিভিন্ন মাপের কাপড় সাধারণত: একই দামে বেচাকেনা হয়। ১০/ ১১/ ১২ হাতের শাড়ি সমান দরেই বিক্রয় হয়। তাই ইজাবের সময় এ ধরনের কোনো কাপড়ের গজ, ফুট, ইঞ্চি উল্লেখপূর্বক দাম নির্ধারণ করে থাকলেও মোট দাম বিভাজ্য হয়ে প্রতি গজ/ফুট/ইঞ্চির বিপরীতে আরোপিত হয় না। অর্থাৎ ১০ হাত মাপের শাড়ির দাম একশ' টাকা হওয়ার মানে এ নয় যে, এর প্রতি হাতের দাম দশ টাকা। তাই ১০ হাতের জায়গায় ১১ হাত হলে বা ৯ হাত হলে দামে তারতম্য ঘটে না। জমির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। প্রতি শতাংশ/ কাঠা/ গজের বিপরীতে যদি দাম ধার্য না করে মোট জমির দাম ধার্য করা হয় তাহলে পুরো দামটা বিভাজ্য হয়ে প্রতি শতাংশ/ কাঠা/ গজের বিপরীতে আরোপিত হয় না। এ ধরনের কোনো কাপড়, যেমন শাড়ি এগার হাত বলে বিক্রি করার পর যদি দেখা যায় তা দশ হাত কিংবা জমি একশ' হাত বলে বিক্রি করার পর যদি দেখা যায় তা পঁচান্নব্বই হাত তবে ক্রেতার নেওয়া বা না নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে, কিন্তু নিলে পুরো দামেই নিতে হবে।

পুরো দামে কেন নিতে হবে? কারণ জমি ও কাপড়ে গজ হলো وَصْف, আমরা দেখি, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকেই গজ বলে। আর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বস্তুর [গুণ] وَصْف হয়ে থাকে। আর [গুণ] وَصْف -এর বিপরীতে মূল্যের অংশ হয় না অর্থাৎ وَصْف -এর কমবেশিতে দাম কমবেশি হয় না। কারণ এ ধরনের কাপড় ও জমি সাধারণত (وَصْف) গজ/ফিট হিসেবে বিক্রয় হয় না; বরং গোটা বস্তু ধরে বিক্রয় হয়। অতএব যদি ক্রেতা কাপড় বা জমি নিতে চায় তাহলে দাম কম দিতে পারবে না। বরং পুরো দামেই নিতে হবে। যেমন কেউ একটি বাঁদি ক্রয় করল। বাঁদিটি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় তার একটি চোখ কানা হয়ে গেল কিংবা তার কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হলো। চোখ সুস্থ থাকা বা কানা হওয়া এটা وَصْف, এ জন্য ক্রেতা ঐ বাঁদির দাম কম দিতে পারবে না। পুরো দাম দিতে হবে। তবে পূর্বোক্ত মাসআলা এ থেকে ভিন্ন অর্থাৎ একশ' কফিয আছে শর্তে শস্যস্তুপ কেনার পর নব্বই কফিয পেলে সে ক্ষেত্রে পুরো দাম দিতে হয় না। কারণ খাদ্যশস্যে পরিমাপ তথা কমবেশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যমান পাওয়ার উপযোগী।

তবে আলোচ্য মাসআলায় কাপড় বা জমি শর্তকৃত গজের চেয়ে কম পেলে ক্রেতার না নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, ক্রেতা মূলত পণ্যের এ গুণের প্রতি খেয়াল করেই তা খরিদ করতে সম্মত হয়েছিল, অথচ সেটা এখন অবর্তমান। সুতরাং তার সম্মতি ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তাই সে এখতিয়ার পাবে।

আর যদি কাপড় দশ গজের চেয়ে বেশি বা জমি একশ গজের চেয়ে বেশি পায় তাহলে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার হবে। বিক্রেতার দাম নিয়ে আপত্তি তোলার কোনো এখতিয়ার থাকবে না। কারণ وَصْف-এর কমবেশিতে দামে কমবেশি হয় না। আর وَصْف হয় أَصْل-এর تَابِعْ। তাই পণ্যের تَابِعْ হিসেবে অতিরিক্তটুকু ক্রেতার হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হলো, বিক্রেতা একটি দ্রব্যকে ত্রুটিযুক্ত হিসেবে বিক্রি করল, কিন্তু পরে দেখা গেল তা ত্রুটিমুক্ত। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা অতিরিক্ত দাম দাবি করতে পারে না। কারণ ত্রুটিযুক্ত বা ত্রুটিমুক্ত হওয়া وَصْف, আর وَصْف এর বিপরীতে কোনো মূল্য (ثَمَنْ) হয় না।

وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلَىٰ أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، لِأَنَّ الْوَصْفَ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لٰكِنَّهُ صَارَ أَصْلًا بِإِفْرَادِهِ بِذِكْرِ الثَّمَنِ ، فَنُزِّلَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ آخِذًا لِكُلِّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، لِأَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِّيَادَةُ فِى الذَّرْعِ تَلْزَمُهُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ ، فَكَانَ نَفْعًا يَشُوْبُهُ ضَرَرٌ فَيَتَخَيَّرُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ صَارَ أَصْلًا ، وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْأَقَلِّ لَمْ يَكُنْ آخِذًا بِالْمَشْرُوْطِ .

অনুবাদ : যদি বিক্রেতা বলে, আমি কাপড়টি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে, একশ' গজ আছে এ শর্তে একশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, অতঃপর ক্রেতা কাপড়টি তার চেয়ে কম পেল তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে মওজুদ কাপড়টি তদানুপাতিক দাম দিয়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করবে। কারণ, গুণ (وَصْف) যদিও বস্তুর অনুগামী, কিন্তু তার বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণের কারণে তা এখানে মূল বস্তুর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং প্রতি গজ কাপড়কে স্বতন্ত্র একটি কাপড়ের পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে। আর মওজুদ কাপড়কে তদানুপাতিক দাম দিয়ে গ্রহণ করা হবে। কারণ যদি ক্রেতা কাপড়টিকে পুরো দামে গ্রহণ করে তাহলে সে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে গ্রহণকারী হবে না। আর যদি ক্রেতা কাপড়টি [একশ' গজের চেয়ে] বেশি পায় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পুরো কাপড়টি নিবে, ইচ্ছা করলে বিক্রয়-চুক্তি ভঙ্গ করবে। কারণ, অতিরিক্ত গজগুলো যদি তার নিতে হয় তাহলে অতিরিক্ত মূল্য তার উপর আবশ্যক হবে। আর এটা এমন লাভ, যাতে ক্ষতি মিশ্রিত আছে। সুতরাং সে এখতিয়ার পাবে। আর তার উপর অতিরিক্ত মূল্য আবশ্যক হওয়ার কারণ পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গুণ এখানে মূল বস্তুর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আর যদি ক্রেতা তা কম দামে গ্রহণ করে তাহলে সে শর্তানুযায়ী গ্রহণকারী হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোনো ব্যক্তি যদি কাপড় বা জমি গজ/ফিট/হাত হিসেবে বিক্রি করে এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে, যেমন বলল, এ কাপড়টিতে একশ' গজ আছে, দাম একশ' দিরহাম, প্রতি গজ এক দিরহাম, অতঃপর ক্রেতা তা কম পেল, ধরুন নব্বই গজ পেল, তাহলে ক্রেতার তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। যদি গ্রহণ করে তবে মওজুদ কাপড়ের আনুপাতিক মূল্য দিয়ে অর্থাৎ নব্বই গজ নব্বই দিরহাম দিয়ে গ্রহণ করবে।

পূর্বোক্ত মাসআলার সঙ্গে আলোচ্য মাসআলার পার্থক্য হলো, পূর্বোক্ত মাসআলায় স্বতন্ত্রভাবে কাপড়ের প্রতি হাত বা গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি; বরং গোটা কাপড় ধরে বিক্রি করা হয়েছে, আর আলোচ্য মাসাআলায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হলে গজ, যা মূল বস্তুর অনুবর্তী গুণ তা মূল বস্তুর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে। তখন প্রতি গজকে একটি পৃথক কাপড় গণ্য করা হয়। অতএব একশ' গজ একশ' দিরহাম, প্রতি গজ এক দিরহাম -এর অর্থ দাঁড়ায় একশ'টি কাপড় একশ' দিরহাম, প্রতিটি কাপড় এক দিরহাম। এ সূরতে কাপড়ের পরিমাণ কম পাওয়া গেলে, উদাহরণত নব্বই গজ পাওয়া গেলে নব্বই দিরহামের বিনিময়ে নিবে। কারণ, তা না হলে প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পড়বে না। অথচ প্রতি গজ এক দিরহাম দরেই বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

আর যদি কাপড়ের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়, উদাহরণত একশ' দশ গজ পাওয়া গেল তাহলে ক্রেতার তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু গ্রহণ করলে পুরো কাপড়টি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকার কারণ এই যে, ক্রেতা যদি অতিরিক্ত দশ গজ নিতে বাধ্য হয় তাহলে অতিরিক্ত তার আরো দশ দিরহাম দিতে হবে। আর অতিরিক্ত দশ দিরহাম প্রদানে সে সম্মত নয়। অতিরিক্ত দশ গজ পেলে তার লাভ হতো, কিন্তু এটা এমন লাভ যার সঙ্গে ক্রেতাকে দশ দিরহামের ক্ষতিও বহন করতে হবে। অতএব ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। আর ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করলে অতিরিক্ত দশ গজের বিনিময়ে দশ দিরহাম দিতে হবে। কারণ, উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রতি গজের বিনিময়ে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজ أَصْل -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। আর أَصْل এর বিপরীতে মূল্য (ثَمَنٌ) আসে। তাই অতিরিক্ত এ দশ গজের বিপরীতে মূল্য আসবে। আর যদি পুরো একশ' দশ গজ কাপড় একশ' দিরহামে ক্রেতা গ্রহণ করে তাহলে তো প্রতি গজ এক দিরহাম দরে পড়ে না। অথচ প্রতি গজ এক দিরহাম দরে বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, শস্যস্তুপ বিক্রয়ের পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে, যদি একশ' কফিয একশ' দিরহাম দরে বিক্রয় হয় আর পরে ক্রেতা একশ' কফিযের চেয়ে বেশি পায় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে না অর্থাৎ তাকে একশ' কফিয একশ' দিরহাম দিয়ে নিতে হবে এবং অতিরিক্ত কফিয শস্য বিক্রেতার হবে। আর আলোচ্য মাসআলায় দেখা গেল যে, যদি একশ' গজ কাপড় প্রতি গজ এক দিরহাম দরে একশ' দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার পর ক্রেতা একশ' গজের চেয়ে কাপড় বেশি পায় তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে। যদি গ্রহণ করে তাহলে অতিরিক্তটুকুও গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্তটুকু বিক্রেতার হবে না। প্রশ্ন হলো, এ দু'মাসআলায় পার্থক্য কেন? অথচ শস্যস্তুপের মাসআলায় কফিয যেমন قَدْرٌ আলোচ্য মাসআলায় প্রতি গজের বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজও তেমনি 'পরিমাণ' তাহলে পার্থক্য কেন? আল্লামা আইনী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, এ দু'মাসআলার মাঝে পার্থক্য আছে। কাপড়ে অতিরিক্ত গজ যদি বিক্রয়-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিক্রয়-চুক্তি (عَقْد) ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ এক/দু'গজ কাপড় কেটে নিলে মূল কাপড়টি নষ্ট হয়ে যাবে, আর কেটে নেওয়া কাপড় তেমন কোনো কাজেও লাগবে না। পক্ষান্তরে শস্যস্তুপে অতিরিক্ত কফিয যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে বিক্রয়-চুক্তি ফাসেদ হয় না। কারণ, শস্যস্তুপ থেকে অতিরিক্ত কফিয শস্য আলাদা করে নিলে শস্যস্তুপের তাতে ক্ষতি হয় না।

وَمَنِ اشْتَرٰى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) ، وَقَالَا هُوَ جَائِزٌ ، وَإِنِ اشْتَرٰى عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِأَةِ سَهْمٍ جَازَ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا . لَهُمَا أَنَّ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشْرُ الدَّارِ فَأَشْبَهَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ ، وَلَهُ أَنَّ الذِّرَاعَ اِسْمٌ لِمَا يُذْرَعُ بِهِ ، وَاسْتُعِيْرَ لِمَا يَحِلُّهُ الذِّرَاعُ ، وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُوْنَ الْمُشَاعِ ، وَذٰلِكَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ بِخِلَافِ السَّهْمِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ) بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُوْلُهُ الْخَصَّافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ .

অনুবাদ : কোনো ব্যক্তি একশ' গজের বাড়ি বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় করলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ। সাহেবাইন (র.) বলেন, এটা জায়েজ। আর যদি একশ' অংশের দশ অংশ ক্রয় করে তবে সকলের ঐকমত্যে তা জায়েজ। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে– একশ' গজ বাড়ির দশ গজ হলো বাড়ির এক দশমাংশ। সুতরাং তা [একশ' অংশের] দশ অংশের মতো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– গজ হলো ঐ জিনিসের নাম, যা দ্বারা মাপা হয়। যে লাঠি বা ফিতায় গজ ধারণ করে তাকে রূপক অর্থে গজ বলা হয়। আর তা নির্দিষ্ট, অনির্ধারিত নয়। কিন্তু এ নির্দিষ্ট পরিমাণটা [বাড়ির ঠিক কোন স্থানটি তা এ বিক্রয়ে] অজানা। কিন্তু [একশ' অংশের দশ] অংশ [তা থেকে ভিন্ন]। স্থানটি সর্বমোট কত গজের তা ক্রেতা জ্ঞাত থাকুক, আর না থাকুক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাতে কোনো পার্থক্য নেই। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ, [সর্বমোট গজ জানা থাকলেও] অজ্ঞতা থেকে যায়। ইমাম খাস্‌সাফ (র.) যা বলেছেন, তা এর বিপরীত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একশ' গজের বাড়ি বা গোসলখানা থেকে দশ গজ ক্রয় করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ কেনাবেচা জায়েজ নেই। সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। কিন্তু যদি একশ' অংশের বাড়ি বা গোসলখানার দশ অংশ ক্রয় করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে জায়েজ আছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) একশ গজ থেকে দশ গজ ক্রয় করা আর একশ' অংশের দশ অংশ ক্রয় করার মাঝে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু সাহেবাইন (র.) পার্থক্য করেননি। এ মতবিরোধের ভিত্তি মূলত এ কথার উপর যে, একশ' গজের দশ গজ কি একটি নির্ধারিত পরিমাণ (مُعَيَّنٌ), না অনির্ধারিত পরিমাণ (مُشَاعٌ)? সাহেবাইন (র.)-এর মতে অনির্ধারিত পরিমাণ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নির্ধারিত পরিমাণ। একশ' অংশের দশ অংশ যে একটি অনির্ধারিত পরিমাণ এ বিষয়ে সকলে একমত। অনির্ধারিত পরিমাণ মানে দশ অংশ বাড়ির নির্দিষ্ট কোনো দিক বা স্থান জুড়ে নয়; বরং একশ' অংশের বাড়ির পুরো জমিতে তা ছড়িয়ে আছে। উদাহরণত

দু'ব্যক্তি মিলে একশ' টাকার বিনিময়ে একটি বাড়ি ক্রয় করল। একজন দিল নব্বই টাকা, অপরজন দিল দশ টাকা। এখন পুরো বাড়ির প্রতি ইঞ্চি জমিতে দু'জন অংশীদার। তবে একজনের অংশ নব্বই, অপরজনের অংশ দশ। সাহেবাইন (র.)-এর মতে একশ' অংশের দশ অংশ যেমন অনির্ধারিত পরিমাণ, তেমনি একশ' গজের দশ গজও অনির্ধারিত পরিমাণ। একশ' অংশের দশ অংশ বলতে যেমন বাড়ির এক দশমাংশ বুঝায় তেমনি একশ গজের দশ গজ বলতেও বাড়ির এক দশমাংশ বুঝায়। সুতরাং উভয়টার হুকুম এক হবে। একশ' অংশের দশ অংশ বিক্রয় সকলের ঐকমত্যে জায়েজ, সুতরাং একশ' গজের দশ গজও বিক্রয় জায়েজ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একশ' অংশের দশ অংশ আর একশ' গজের দশ গজ এক নয়। একশ' অংশের দশ অংশ অনির্ধারিত (مُشَاعٌ) আর একশ' গজের দশ গজ নির্ধারিত (مُعَيَّنٌ)। কারণ গজ (ذِرَاعٌ) একটি নির্ধারিত পরিমাণ। নির্ধারিত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে গজ বলে। লাঠি বা ফিতা যা দ্বারা গজের পরিমাপ করা হয় তাকে রূপক অর্থে গজ বলে। গজ যেহেতু নির্ধারিত, তাই বিক্রয়ে একশ' গজের দশ গজ বাড়ির ঠিক কোন দিক দিয়ে, তা অজ্ঞাত (مَجْهُوْلٌ)। আর এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضٍ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয়। বিক্রেতা চাইবে বাড়ির যে অংশ পেছনে বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সেদিক থেকে দিতে, আর ক্রেতা চাইবে বাড়ির সামনের অংশে বা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে দিক সেদিক দিয়ে নিতে। আর যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় তা বিক্রয়-চুক্তিকে (عَقْدٌ) ফাসেদ করে দেয়। পক্ষান্তরে একশ' অংশের দশ অংশ বলতে জমির নির্ধারিত কোনো স্থান বুঝায় না। তা সম্পূর্ণ একশ' অংশে ছড়িয়ে থাকে। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ বন্টনের সময় মীমাংসা করে নিবে।

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رح بَيْنَ مَا إِذَا الخ : হেদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বাড়ি বা গোসলখানায় মোট কত গজ জমি আছে তা বিক্রয়কালে উল্লেখ করুক বা না করুক উভয় সুরতে ইমাম আজম (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসেদ। উল্লেখ করার সুরত হলো, বিক্রেতা বলল, আমি এই একশ' গজ বাড়ির দশ গজ বিক্রি করলাম। উল্লেখ না করার সুরত হলো, বিক্রেতা বলল, আমি এ বাড়ির দশ গজ বিক্রি করলাম এবং বাড়িটি সর্বমোট কত গজের উপর আছে তা বলল না। উভয় সুরতে বিক্রয় ফাসিদ এটাই বিশুদ্ধমত। তবে খাস্‌সাফ (র.) বলেন, যদি বাড়িটি ঠিক কত গজের উপর তা যদি জানা না থাকে তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয় তবে বিক্রয় শুদ্ধ হবে।

وَلَوِ اشْتَرٰى عِدْلًا عَلٰى أَنَّهٗ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدَ عَشَرَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الْمَبِيْعِ اَوِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِىْ فَصْلِ النُّقْصَانِ بِقَدْرِهٖ ، وَلَهُ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَجُزْ فِى الزِّيَادَةِ لِجَهَالَةِ الْعَشَرَةِ الْمَبِيْعَةِ ، وَقِيْلَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لَا يَجُوْزُ فِىْ فَصْلِ النُّقْصَانِ اَيْضًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ عَلٰى أَنَّهُمَا هَرَوِيَّانِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌّ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ فِيْهِمَا ، وَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهٗ جَعَلَ الْقَبُوْلَ فِى الْمَرْوِيِّ شَرْطًا لِلْعَقْدِ فِى الْهَرَوِىْ ، وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَلَا قَبُوْلَ يُشْتَرَطُ فِى الْمَعْدُوْمِ ، فَافْتَرَقَا .

অনুবাদ : যদি কেউ কাপড়ের একটি গাঁইট এ শর্তে ক্রয় করে যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, কিন্তু পরে দেখা গেল তাতে নয়টি বা এগারটি কাপড় রয়েছে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ। কারণ [এ ক্ষেত্রে] বিক্রয় পণ্য অথবা বিনিময়মূল্য অজ্ঞাত থাকে। যদি প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য বলে দেয় তাহলে [উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে] কমের সুরতে তদানুপাতিক দামের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার [নেওয়া বা না নেওয়ার] এখতিয়ার থাকবে। কিন্তু বেশির সুরতে বিক্রয় জায়েয নেই। কারণ, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়পণ্য কোন দশটি তা অজ্ঞাত থাকে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, কমের সুরতেও বিক্রয় জায়েজ নেই। কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি এ শর্তে দু'টি কাপড় ক্রয় করে যে, কাপড় দু'টি হিরাতী, কিন্তু পরে দেখা যায় তার একটি মারবী, তাহলে এ ক্ষেত্রে দু'টির কোনোটিতেই বিক্রয় জায়েজ নেই; যদিও প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন দাম উল্লেখ করা হয়। কারণ, বিক্রেতা হিরাতী কাপড়ের বিক্রয়ে মারবী কাপড়ের কবুলকে শর্ত করেছে। আর এটা ফাসিদ শর্ত। পক্ষান্তরে অবিদ্যমান জিনিসে কবুলের শর্ত হয় না। সুতরাং দু' মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عِدْل অর্থ গাঁইট। উটের পিঠে মালামাল বহনের সুবিধার্থে আরবরা রশির দু'মাথায় দু'টি গাঁইট বেঁধে উটের পিঠের দু'দিকে ঝুলিয়ে নিত। এ দু' গাইটকে বলা হতো عِدْلَانِ এর একবচন হলো عِدْل, সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি গাঁইট এ শর্তে ক্রয় করল যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, মূল্য দশ দিরহাম। কিন্তু প্রতিটি কাপড়ের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করল না। ক্রয়ের পর দেখা গেল তাতে কাপড় বেশি বা কম, উদাহরণত এগারটি বা নয়টি আছে। এমতাবস্থায় বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, বেশির সুরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে কাপড় এগারটি হলে একটি কাপড় অতিরিক্ত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত কাপড় কোনটি, আর কোন দশটি বিক্রয়পণ্য তা অজ্ঞাত। আর এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয়। কারণ বিক্রেতা চাইবে ভাল কাপড়টি রেখে দিতে, আর ক্রেতা চাইবে খারাপটি দিতে। আর কমের সুরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে কাপড় নয়টি হলে যে কাপড়টি নেই সেটার মান কিরূপ এবং তার মূল্য কত, আর অবশিষ্ট নয়টির মূল্য কত, তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। আর এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয়। বিক্রেতা যেহেতু মোটমূল্য উল্লেখ করেছে, প্রতিটির বিপরীতে মূল্য উল্লেখ করেনি, তাই হতে পারে যে কাপড়টি নেই সেটা খুবই উন্নত মানের। তারই মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম আর অবশিষ্ট নয়টির মূল্য পাঁচ দিরহাম। আর যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় তা ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়।

হ্যাঁ, বিক্রেতা যদি প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে থাকে তাহলে কমের সুরতে তদানুপাতিক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে এ সুরতে ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ, ক্রেতার দশটি কাপড় প্রয়োজন এবং বিক্রেতার সঙ্গে তার দশটি কাপড় ক্রয়ের চুক্তি হয়েছিল। এখন চুক্তির মধ্যে বিভক্তি দেখা যাচ্ছে। আরেকটি কাপড়ের জন্য তাকে আরেকজন বিক্রেতার শরণাপন্ন হতে হবে। খুচরা কাপড় ক্রয়ে মূল্যও বেশি দিতে হবে। তাই ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। আর বিক্রয় জায়েজ হওয়ার সুরতে প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য উল্লেখ করার কারণে বিদ্যমান নয়টি কাপড়ের মূল্য জানা আছে। তাই ঝগড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু বেশির সুরতে প্রতিটি কাপড়ের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও কোন দশটি বিক্রয়পণ্য তা যেহেতু অজ্ঞাতই থেকে যায় তাই বিক্রয় জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ لَا يَجُوْزُ فِىْ فَصْلِ الخ : মাশায়েখদের কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিলেও কমের সূরতে অর্থাৎ দশটির স্থলে নয়টি কাপড় পাওয়া গেলে বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ নয়টি কাপড় مَوْجُوْد [বিদ্যমান] আর একটি কাপড় مَعْدُوْم [অবিদ্যমান]। আর বিক্রেতা একই চুক্তিতে مَوْجُوْد ও مَعْدُوْم -কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং বিক্রেতা যেন শর্ত দিচ্ছে যে, যদি মওজুদ নয়টি কাপড় ক্রয় করতে হয় তাহলে مَعْدُوْم কাপড়টিও ক্রয় করতে হবে। আর এ ধরনের শর্ত ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়। যেমন– কোনো লোক যদি গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তির আওতায় বিক্রি করে এবং প্রতিটির পৃথক মূল্যও উল্লেখ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোলামেও বিক্রয় জায়েজ নেই। অবশ্য সাহেবাঈন এর বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুক্তি হলো, এভাবে গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে উল্লেখ করার দ্বারা বিক্রেতা যেন শর্ত দিচ্ছে যে, গোলাম ক্রয় করতে হলে স্বাধীন ব্যক্তিকেও ক্রয় করতে হবে। অথচ স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এ ধরনের শর্ত ক্রয়-বিক্রয়কে ফাসিদ করে দেয়। –[আইনী খ. ৭, পৃ. ৫০]

উক্ত মাশায়েখ কেরাম নয়টি কাপড়ের মাসআলাকে জামে সগীরের নিম্নোক্ত মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন। জামে সগীরে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি দু'টি কাপড় এ শর্তে ক্রয় করে যে, উভয়টি হিরাতী কাপড় এবং প্রতিটির পৃথক মূল্যও উল্লেখ করে কিন্তু পরে দেখা যায় একটি হিরাতী অপরটি মারবী তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনটিতেই বিক্রয় জায়েজ নেই। মাশায়েখে কেরাম বলেন, হিরাতী শর্তে দু'টি কাপড় ক্রয় করার পর যখন দেখা গেল একটি মারবী এ সুরতে কাপড় দু'টিই আছে, শুধু একটিতে হিরাতী হওয়ার وَصْف [বৈশিষ্ট্য] অনুপস্থিত। আর দশটি কাপড়ের স্থলে যখন নয়টি পাওয়া গেল এ ক্ষেত্রে দশম কাপড়টিই অনুপস্থিত। অতএব শুধু وَصْف অনুপস্থিত থাকাটা যদি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়ার কারণ হয় তাহলে দশম কাপড়ের অনুপস্থিতি তো যৌক্তিক কারণেই বিক্রয় ফাসিদ হওয়ার কারণ হবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ الخ : সাহেবে হিদায়া বলেন, নয়টি কাপড়ের সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েয নেই বলে মাশায়েখে কেরাম যে উক্তি করেছেন তা শুদ্ধ নয়। কারণ পৃথকভাবে প্রতিটি কাপড়ের মূল্য উল্লেখ করার কারণে নয়টি কাপড়ের বিনিময়মূল্য (ثَمَن) নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে। আর পণ্য (مَبِيْع) এবং বিনিময়মূল্য (ثَمَن) যখন নিশ্চিতভাবে জানা থাকে তখন ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয় না। আর মাশায়েখে কেরামের কেউ কেউ যে জামে সগীরের মাসআলার উপর আলোচ্য মাসআলার কিয়াস করেছেন তাও শুদ্ধ নয়। কারণ দু'মাসআলায় পার্থক্য আছে। হিরাতী শর্তে দু'টি কাড়প ক্রয়ের পর দেখা গেল একটি মারবী। তাহলে যেন বিক্রেতা হিরাতী কাপড়ের বিক্রয়ে মারবী কাপড়ের কবুলকে শর্ত করেছে যে. হিরাতীটা নিতে হলে মারবীটাও নিতে হবে। আর এ শর্ত বিক্রয়-চুক্তির খেলাফ বিধায় তা ফাসিদ। আর কায়দা আছে, ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। তাই এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে এবং হিরাতী ও মারবী কোনোটিতেই বিক্রয় জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে দশটি কাপড়ের স্থলে নয়টি পাওয়া যাওয়ার সুরতে নয়টি কাপড় নিতে হলে অবিদ্যমান (مَعْدُوْم) দশম কাপড়টি নিতে হবে, বিক্রেতা এ শর্ত দিয়েছে তা বলা যায় না। কারণ যেটা নেই (مَعْدُوْم) সেটা নেওয়া (قَبُوْل)-এর শর্ত করবে কিভাবে? বরং যেগুলো আছে সেগুলোই বিক্রেতা বিক্রি করেছে; কোনো শর্তারোপ করেনি। তবে সংখ্যা উল্লেখে তার ভুল হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হলো, জামে সগীরের মাসআলায় আর আলোচ্য মাসআলায় পার্থক্য আছে। আলোচ্য মাসআলাকে জামে সগীরের মাসআলার উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

وَلَوِ اشْتَرٰى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلٰى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، فَإِذَا هُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ ، قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ : يَأْخُذُهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِيْ يَأْخُذُهُ بِتِسْعَةٍ إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، يَأْخُذُهُ بِأَحَدَ عَشَرَ إِنْ شَاءَ ، وَفِي الثَّانِيْ يَأْخُذُهُ بِعَشَرَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي الْأَوَّلِ : يَأْخُذُهُ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ إِنْ شَاءَ ، وَفِي الثَّانِيْ بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ ، وَيُخَيَّرُ ، لِأَنَّ مِنْ ضَرُوْرَةِ مُقَابَلَةِ الذِّرَاعِ بِالدِّرْهَمِ مُقَابَلَةَ نِصْفِهِ بِنِصْفِهِ فَيَجْرِيْ عَلَيْهِ حُكْمُهَا ، وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَمَّا أَفْرَدَ بِكُلِّ ذِرَاعٍ بِبَدَلٍ نُزِّلَ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنْزِلَةَ ثَوْبٍ عَلٰى حِدَةٍ ، وَقَدِ انْتَقَصَ ، وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَنَّ الذِّرَاعَ وَصْفٌ فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَ حُكْمَ الْمِقْدَارِ بِالشَّرْطِ ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ ، فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ ، وَقِيْلَ فِي الْكِرْبَاسِ الَّذِيْ لَا يَتَفَاوَتُ جَوَانِبُهُ لَا يَطِيْبُ لِلْمُشْتَرِيْ مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوْطِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْزُوْنِ حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْفَصْلُ وَعَلٰى هٰذَا قَالُوْا : يَجُوْزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ .

অনুবাদ : কেউ যদি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে একটি কাপড় দশ গজ আছে এ শর্তে ক্রয় করে, পরে দেখা গেল যে, তা সাড়ে দশ গজ বা সাড়ে নয় গজ হয়েছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, প্রথম সূরতে [অর্থাৎ সাড়ে দশ গজ পেলে] ক্রেতা কাপড়টিকে বিনা ইচ্ছাধিকারে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। আর দ্বিতীয় সূরতে [অর্থাৎ সাড়ে নয় গজ পেলে] নয় দিরহামের বিনিময়ে ইচ্ছা হলে গ্রহণ করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, প্রথম সূরতে ক্রেতা [গ্রহণের] ইচ্ছা করলে এগার দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর দ্বিতীয় সুরতে [গ্রহণের] ইচ্ছা করলে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রথম সূরতে ক্রেতা ইচ্ছা করলে সাড়ে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, আর দ্বিতীয় সূরতে সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে এবং সে এখতিয়ার পাবে। কারণ এক গজের বিপরীতে এক দিরহাম হওয়ার জন্য জরুরি হলো আধা গজের বিপরীতে আধা দিরহাম। তাই আধা গজের উপরও তার হুকুম জারি হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– যখন বিক্রেতা প্রতি গজের বিপরীতে বিনিময়মূল্য ধার্য করেছে তখন প্রতি গজ স্বতন্ত্র একটি কাপড়ের মর্যাদা লাভ করেছে। তবে [একটি কাপড়] একটু কম হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– গজ মূলত সিফাত (وَصْف)। তা

পরিমাণের হুকুম ধারণ করেছে শর্তের কারণে। আর শর্তটি গজের সাথে যুক্ত। সুতরাং যখন শর্ত পাওয়া গেল না তখন হুকুম মূলের দিকে ফিরে আসল। কারো কারো মতে, যে সব কাপড়ের বিভিন্ন প্রান্ত মানগতভাবে তারতম্যপূর্ণ নয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য শর্তকৃত পরিমাণের অতিরিক্ত [গজ] হালাল নয়। কারণ, বিচ্ছিন্নকরণ ক্ষতিকর না হওয়ার কারণে তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের পর্যায়র্ভুক্ত। আর এ কারণেই মাশায়েখ কেরাম বলেন, তা থেকে এক গজ বিক্রয় জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সব কাপড় কর্তন করা হলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যেমন, জামা, পায়জামা, পাগড়ি, জুব্বা ইত্যাদি এ ধরনের কোনো কাপড় যদি প্রতি গজ এক দিরহাম দরে দশ গজ আছে এ শর্তে কোনো ব্যক্তি ক্রয় করে, কিন্তু ক্রয়ের পর দেখে তাতে সাড়ে দশ গজ বা সাড়ে নয় গজ আছে তাহলে মাসআলা কি হবে?

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সাড়ে দশ গজের সুরতে ক্রেতা দশ দিরহামের বিনিময়ে কাপড়টি বাধ্যতামূলক গ্রহণ করবে এবং সে কোনোরূপ এখতিয়ার পাবে না। আর সাড়ে নয় গজের সূরতে সে গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কিন্তু গ্রহণ করলে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, দশ গজের স্থলে সাড়ে দশ গজ পাক, আর সাড়ে নয় গজ পাক উভয় সূরতে ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। যদি গ্রহণ করে তাহলে সাড়ে দশ গজ হলে এগার দিরহামের বিনিময়ে, আর সাড়ে নয় গজ হলে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সুরতে সাড়ে দশ দিরহাম এবং সাড়ে নয় গজের সূরতে সাড়ে নয় দিরহামের বিনিময়ে কাপড়টি গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : যখন প্রতি গজের বিপরীতে বিনিময়মূল্য এক দিরহাম ধার্য হলো, তখন গজের প্রতিটি অংশের বিনিময়মূল্য দিরহামের তদানুপাতিক অংশ হবে। আধা গজের বিনিময়ে আধা দিরহাম হবে। এক-চতুর্থাংশ গজের বিনিময়ে এক-চতুর্থাংশ দিরহাম হবে। অতএব বেশির সুরতে অর্থাৎ কাপড়টি সাড়ে দশ গজ হলে সাড়ে দশ দিরহাম মূল্য হবে। কমের সুরতে অর্থাৎ সাড়ে নয় গজ হলে সাড়ে নয় দিরহাম মূল্য হবে। তবে উভয় সুরতেই ক্রেতা কাপড়টি গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ, প্রথম সুরতে তাকে আধা দিরহাম বেশি নিতে হচ্ছে, আর দ্বিতীয় সুরতে তার প্রয়োজনের চেয়ে আধা গজ কাপড় কম হচ্ছে, আর এতে সে সন্তুষ্ট নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর দলিল : এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, কাপড়, তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতিতে গজ/ ফিট/ হাত মূলত وَصْف। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে وَصْف টা যদি মূখ্য হয়, উদাহরণত তৈরি পোশাক, জায়গা-জমি, বাড়ি প্রভৃতি যদি হাত বা ফিট হিসেবে বিক্রি হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত/ গজ বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন বলা হলো, এ কাপড়টিতে দশ গজ আছে, দাম একশ' টাকা, প্রতি গজ দশ টাকা, তাহলে وَصْف টা قَدَرْ তথা أَصْل -এর মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামেও তারতম্য ঘটে। আলোচ্য মাসাআলায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতি গজের বিনিময়ে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে গজ أَصْل -এর মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং দশ গজ কাপড় যেন দশটি স্বতন্ত্র কাপড়। সাড়ে দশ গজের সূরতে ক্রেতা যেন এগারটি কাপড় ক্রয় করল। তবে এগারতম কাপড়টি একটু ছোট। আর সাড়ে নয় গজের সূরতে ক্রেতা যেন দশটি কাপড় ক্রয় করল, তবে দশম কাপড়টি একটু ছোট। অতএব এগারটি কাপড়ের জন্য ক্রেতাকে এগার দিরহাম আর দশটি কাপড়ের জন্য দশ দিরহাম দিতে হবে।

তবে ক্রেতা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ সাড়ে দশ গজের সূরতে এগার দিরহামের বিনিময়ে সে কাপড়টি গ্রহণে বাধ্য হলে যদিও সে আধা গজ কাপড় বেশি পাচ্ছে কিন্তু তাকে অতিরিক্ত এক দিরহামের ক্ষতিও বহন করতে হবে। আর অতিরিক্ত এক দিরহামের ক্ষতি বহনে সে সম্মত নয়। আর সাড়ে নয় গজের সূরতে এখতিয়ার পাওয়ার কারণ হলো, তার কাপড় দরকার দশ গজ। সাড়ে নয় গজে তার প্রয়োজন মিটবে না। তা ছাড়া আধা গজের জন্য সে এক দিরহাম দিতে সম্মত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : কাপড়ে গজ মূলত وَصْف। কিন্তু كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ -এর শর্তের কারণে তা أَصْل -এর মর্যাদা লাভ করেছিল। আর শর্তটি গজের সাথে সংযুক্ত। আধা গজ যেহেতু গজ নয় তাই আধা গজের মধ্যে শর্ত অনুপস্থিত। আর যেহেতু শর্ত অনুপস্থিত তাই হুকুম أَصْل -এর দিকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আধা গজকে وَصْف বলা হবে। আর وَصْف -এর বিপরীতে বিনিময়মূল (ثَمَنٌ) হয় না। তাই দশ গজ ও নয় গজের উপর অতিরিক্ত যে আধা গজ তার বিপরীতে কোনো মূল্য আসবে না। বরং ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সূরতে কাপড়টিকে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং সাড়ে নয় গজের সূরতে নয় দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। এর উপমা হলো, কোনো ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত এ শর্তে কোনো দ্রব্য ক্রয় করার পর দেখল তা দোষমুক্ত। দোষমুক্ত ও ভাল হওয়া একটি وَصْف। এর বিনিময়ে কোনো মূল্য হবে না; বরং এ وَصْف টি ক্রেতা বিনিময়হীনভাবে লাভ করবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রা.) -এর মতে ক্রেতা সাড়ে দশ গজের সূরতে কোনোরূপ এখতিয়ার পাবে না। কারণ অতিরিক্ত আধা গজ গ্রহণে তার কোনো ক্ষতি নেই। বরং আধা গজ উপরি লাভ। আর সাড়ে নয় গজের সুরতে সে গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ নয় গজে তার প্রয়োজন নাও মিটতে পারে; তার দরকার দশ গজ। যদি নয় গজ নিতে সে বাধ্য থাকে তাহলে তা বিক্রয়-চুক্তি মুতাবেক হলো না। আর এতে সে সন্তুষ্ট নয়।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ فِى الْكِرْبَاسِ الَّذِىْ لَا يَتَفَاوَتُ جَوَانِبُهُ لَا يَطِيْبُ الخ : আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, এ ইবারত দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার এই দিকে ইশারা করেছেন যে, পূর্বোক্ত অভিমত তিনটি ঐ সব কাপড়ের ব্যাপারে, যেগুলোর বিভিন্ন প্রান্ত মানগতভাবে তারতম্যপূর্ণ হয়, যেমন, জামা, পাঞ্জাবী, সেলোয়ার, পাগড়ি, জুব্বা প্রভৃতি। এ ধরনের পোশাক থেকে আধা গজ কাপড় কেটে নিলে পুরা কাপড়টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যে সব কাপড়ের একাংশের সাথে অপরাংশের ভিন্নতা থাকে না সে সব কাপড়ে শর্তের অতিরিক্ত গজ ক্রেতার জন্য হালাল নয়। কারণ, অতিরিক্ত অংশটুকু কেটে রেখে দিলে অবশিষ্ট কাপড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই এ ধরনের কাপড়ে গজ, কফিয/কেজি/টন -এর মতো أَصْل। আর কাপড়টি ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মতো। তাই মাশায়েখে কেরাম বলেছেন যে, শস্যস্তূপ থেকে পৃথকভাবে এক কেজি/কফিয শস্য যেমন বিক্রয় জায়েজ, তেমনি এ ধরনের কাপড়েও পৃথকভাবে এক গজ বিক্রয় জায়েজ, যদিও কাপড়ের ঠিক কোন স্থান থেকে কেটে এক গজ দিবে তা নির্ধারিত না হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

فَصْلٌ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ ، لِأَنَّ إِسْمَ الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ فِي الْعُرْفِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ إِتِّصَالَ قَرَارٍ فَيَكُونُ تَبْعًا لَهُ ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْقَرَارِ ، فَأَشْبَهَ الْبِنَاءَ ، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهِ لِلْفَصْلِ ، فَأَشْبَهَ الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهِ -

অনুবাদ : **অনুচ্ছেদ :** যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে বাড়ির ঘরসমূহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও তা উল্লেখ না করে। কারণ, 'বাড়ি' শব্দটি লোক প্রচলনে আঙ্গিনা ও ঘর-দালানকে শামিল করে। তাছাড়া ঘর-দালান বাড়ির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত, তাই তা বাড়ির অনুবর্তী হবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি বিক্রি করে তাহলে তাতে বিদ্যমান খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা [বিক্রয় চুক্তিতে] অন্তর্ভুক্ত হবে; যদিও তার উল্লেখ না করে। কেননা, গাছপালা ও খেজুর বৃক্ষ ভূমির সাথে স্থায়ীত্বভাবে সংযুক্ত। সুতরাং তা ঘর-দালানের মতো। তবে ভূমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ছাড়া ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, ফসল ভূমির সাথে সংযুক্ত পৃথক হওয়ার জন্যই। সুতরাং তা ভূমিতে বিদ্যমান দ্রব্যের মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دار : আমাদের সমাজে বাড়ি বলতে যা বুঝায়, আরবি ভাষা ও আরবদের পরিভাষায় دَارٌ বলতে তাই বুঝায়। অর্থাৎ কয়েকটি ছোট ছোট ঘর, চাতাল, রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বাথরুমের সমন্বিত বসবাসস্থলকে دَارٌ বলে। আর مَنْزِلٌ অর্থ ঘর বা শহরাঞ্চলের বাসা/ফ্লাট; যাতে কয়েকটি কক্ষ, বাথরুম, রান্নাঘর ও বারান্দা থাকে, আঙ্গিনা থাকে না। আর بَيْتٌ হলো এক কক্ষবিশিষ্ট ঘর, যাতে একটি দরজা থাকে। –[সিকায়া, হাশিয়ায়ে হিদায়া থেকে গৃহীত]

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মাসআলাসমূহ দু'টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত–

১. লোকসমাজে যে সব বিষয়কে উল্লেখ করা ছাড়াই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় সেগুলো স্পষ্ট উল্লেখ না করলেও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যে সব জিনিস উল্লেখ করা ছাড়া লোকসমাজে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না সেগুলো মূল পণ্যের অধীন হয়ে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

২. যে সব জিনিস বিক্রয় পণ্যের সাথে অবিচ্ছেদ্য বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। যেমন, দরজার সাথে সংযুক্ত তালা, কড়া এবং বাড়ির ঘর-দুয়ার অথবা বিক্রয় পণ্যের পরিপূরক যেমন– তালার চাবি, বোতলের ছিপি ইত্যাদি এগুলো বিক্রয়কালে উল্লেখিত না হলেও মূল পণ্যের অধীন হয়ে আপনা-আপনি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে পরিপূরক বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত নয়। যেমন, গৃহস্থিত খাট-পালং, ফার্নিচার এবং ক্ষেতের ফসলাদি এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া মূল পণ্যের অধীন হয়ে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। –[ফাতহুল কাদীর : খ. ৬, পৃ. ২৫৯]

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বিক্রয়ে বাড়ির সব ঘর-দুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, লোকসমাজে 'বাড়ি' শব্দটি বাড়ির ভূমি, ঘর-দালান, ভিটে, আঙ্গিনা,

গাছপালা সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া ঘর-দালানগুলো বাড়ির ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। তাই উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলেও তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও তাই বলেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيْهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি ক্রয় করে, আর ঐ ভূমিতে খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা আছে, তাহলে গাছপালা ছোট হোক বা বড় হোক, ফলবান হোক বা ফলহীন হোক, গাছের কথা উল্লেখ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, গাছপালা ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত। সুতরাং তা ঘর-দালানের মতো। ঘর-দালান যেরূপ বাড়ির বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় তেমনি গাছপালাও ভূমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِىْ بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি জমি ক্রয় করে আর ঐ জমিতে ফসল আছে তাহলে ফসল জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি ফসলের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যেমন বলল, আমি ফসলসহ জমিটি ক্রয় করলাম, তাহলেই শুধু অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, ফসল জমির সাথে কেটে পৃথক করার উদ্দেশ্যেই সংযুক্ত হয়ে আছে। তাই এটা বাড়িতে রাখা দ্রব্যের মতো। বাড়ির মালিক তার কাজের জন্য এক হাজার ইট এনে বাড়িতে স্তূপ করেছে। এখন বাড়িটি বিক্রি করে দিলে ইটগুলো যেমন বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না, তেমনিভাবে ফসলও জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, দাসীর গর্ভস্থিত সন্তান, পশু/পাখির গর্ভস্থিত বাছুর/ছানা প্রসবের পর পৃথক হওয়ার জন্যই মায়ের সাথে সংযুক্ত। এতদসত্ত্বেও তা মায়ের বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ উল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী তা অন্তর্ভুক্ত না হওয়া উচিত। এর উত্তরে আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, গর্ভস্থিত বাছুর/ ছানাকে বাড়িতে রাখা মালামাল বা ফসলের উপর কিয়াস করা যাবে না। কারণ বাড়ি বিক্রয়ের পর তা থেকে মালামাল সরানো এবং জমি বিক্রয়ের পর তা থেকে ফসলকে পৃথক করা মানুষের সাধ্যের ভিতরে। কিন্তু মাকে বিক্রয়ের পর তার গর্ভস্থিত বাছুর/ ছানা/ সন্তানকে পৃথক করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই সঙ্গত কারণেই গর্ভস্থিত সন্তান/ বাছুর/ ছানা মায়ের বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। -[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৫৫]

وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً اَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، مَنِ إشْتَرٰى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَن يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَلِأَنَّ الْإِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ ، فَصَارَ كَالزَّرْعِ ، وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ إِقْطَعْهَا ، وَسَلِّمِ الْمَبِيْعَ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيْهَا زَرْعٌ ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِىْ مَشْغُوْلٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ تَفْرِيْغُهُ وَتَسْلِيْمُهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيْهِ مَتَاعٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) ، يُتْرَكُ حَتّٰى يَظْهَرَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَيَسْتَحْصَدَ الزَّرْعُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادُ ، وَفِى الْعَادَةِ اَنْ لَا يُقْطَعَ كَذٰلِكَ ، وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِى الْأَرْضِ زَرْعٌ ، قُلْنَا هُنَاكَ التَّسْلِيْمُ وَاجِبٌ أَيْضًا ، حَتّٰى يُتْرَكَ بِأَجْرٍ ، وَتَسْلِيْمُ الْعِوَضِ كَتَسْلِيْمِ الْمُعَوَّضِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ قِيْمَةٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ فِى الصَّحِيْحِ ، وَيَكُوْنُ فِى الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ ، لِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوْزُ فِىْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ فَلَا يَدْخُلُ فِىْ بَيْعِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ বা অন্য কোনো গাছ, তাতে ফল থাকা অবস্থায় বিক্রি করে তাহলে ফলগুলো বিক্রেতার থাকবে। হ্যাঁ, ক্রেতা যদি [ক্রয়কালে ফলগুলোর] শর্ত করে [তাহলে সে পাবে।] কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি খেজুর গাছ আছে এমন জমি ক্রয় করে তাহলে খেজুর-ফলগুলো বিক্রেতার থাকবে। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা [ক্রয়কালে] শর্ত করে [তাহলে ক্রেতা পাবে।] তাছাড়া [গাছের সাথে ফলের] সংযুক্তি যদিও জন্মগত, কিন্তু তা কর্তনের জন্য, স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়। সুতরাং তা ফসলের মতো হয়ে গেল। অতঃপর বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি ফলগুলো কেটে নাও এবং বিক্রয়পণ্যকে [অর্থাৎ গাছকে ক্রেতার কাছে] অর্পণ কর। এরূপ হুকুম হবে যদি জমিতে ফসল থাকে। কারণ, ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [গাছ/জমি] বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [ফসল/ফল] দ্বারা আবদ্ধ আছে। আর তাকে মুক্ত করা এবং [ক্রেতার কাছে] তা অর্পণ করা বিক্রেতারই কর্তব্য। যেরূপ কর্তব্য বিক্রিত বাড়িতে বিক্রেতার মালামাল থাকলে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফল ও ফসল গাছে রেখে দেওয়া হবে যে পর্যন্ত ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পায় এবং ফসল কাটার সময় হয়। কারণ ওয়াজিব হলো এভাবে অর্পণ করা, যা লোক সমাজে প্রচলিত। আর সামাজিক প্রচলনে এ ধরনের ফল কাটা হয় না। আর এটা জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার সদৃশ হলো। [সে ক্ষেত্রে কাটা পর্যন্ত ফসল জমিতে থাকে।] আমরা বলি, সে ক্ষেত্রেও অর্পণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ভাড়ার বিনিময়ে [জমিতে] ফসল রাখা হয়। আর বিনিময় [ভাড়া] অর্পণ করা বিনিময়দ্রব্য [জমি] অর্পণ করার নামান্তর। বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে ফল যে পর্যায়েরই হোক না কেন,

মূল্যউপযুক্ততা আছে বা নেই তাতে [হুকুমের] কোনো পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থাতেই তা বিক্রেতার। কারণ, দু'টি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুযায়ী যা সামনে আমরা বর্ণনা করব– তা বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং গাছ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা ছাড়া ফলসমূহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি ফল আছে এমন গাছ বিক্রি করে তাহলে ফল বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা গাছ ক্রয়কালে যদি ফলের কথা বলে নেয়, যেমন বলল, আমি ফলসহ গাছটি ক্রয় করলাম, তাহলে ফল ক্রেতা পাবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ কথার পক্ষে আকলী ও নকলী দলিল পেশ করেছেন।

নকলী দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– مَنِ اشْتَرٰى أَرْضًا فِيْهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 'কোনো ব্যক্তি ফলবান খেজুর বৃক্ষ আছে এমন জমি ক্রয় করলে ফলগুলো হবে বিক্রেতার। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা [ফলের] শর্ত করে [তাহলে সে পাবে।]' এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ফলবান গাছ আছে এমন জমি বিক্রি করলে গাছ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও ফলগুলো বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং তা বিক্রেতার থাকবে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী এবং আল্লামা আইনী (র.) বলেছেন, বর্ণিত শব্দে হাদীসটি গরিব। তবে প্রায় এ ধরনের একটি হাদীস আইম্মায়ে সিত্তাহ তাদের কিতাবে হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

"যদি কোনো ব্যক্তি এমন কোনো গোলাম বিক্রি করে যার মাল আছে তবে তার মাল বিক্রেতার থাকবে। অবশ্য ক্রেতা [ক্রয়কালে মালের] শর্ত করলে [তার হবে]। আর কোনো ব্যক্তি যদি পরাগায়নকৃত খেজুর গাছ বিক্রি করে তাহলে ফল বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা শর্ত করে নিলে সে পাবে।" –[দিরায়া, বিনায়া]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, ফলবান গাছ বিক্রি করলে ফলগুলো বিক্রেতার হবে।

আকলী দলিল : সাহেবে হিদায়া বলেন, গাছের সাথে ফলগুলোর সংযুক্তি (اِتِّصَالٌ) যদিও জন্মগত, কিন্তু তা কর্তনের জন্যই; স্থায়ীভাবে গাছে থাকার জন্য (اِتِّصَالُ قَرَارٍ) নয়, তাই তা ফসলের মতো। সুতরাং জমির ফসল যেরূপ জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেরূপ গাছের ফলও গাছ বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং তা বিক্রেতার থেকে যাবে।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اِقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيْعَ الخ : উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, ফল বিক্রেতা পাবে, আর গাছ ক্রেতা পাবে, তখন বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি তোমার ফল কেটে নিয়ে গাছ ক্রেতাকে বুঝিয়ে দাও। এরূপভাবে যে জমিতে ফসল আছে তা বিক্রয়ের পর বিক্রেতাকে বলা হবে, তোমার ফসল কেটে রেখে জমি ক্রেতাকে অর্পণ কর। গাছ/জমি বিক্রয়ের পর তার ফল/ফসল তৎক্ষণাৎ কেটে নিতে হবে। এর দলিল হিসাবে সাহেবে হিদায়া বলেন, ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ গাছ/ জমি বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ ফল/ফসল দ্বারা আটক আছে। আর বিক্রয়ের পর বিক্রয়পণ্যকে সব সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত করে ক্রেতার কাছে অর্পণ করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। যেমন কোনো ব্যক্তি জমি বা বাড়ি বিক্রি করল আর জমি বা বাড়িতে তার মালামাল আছে। এ ক্ষেত্রে যেমন মালামাল সরিয়ে জমি বা বাড়ি খালি করে ক্রেতার কাছে অর্পণ করা ওয়াজিব তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ফল/ ফসল কেটে নিয়ে তৎক্ষণাৎ গাছ বা জমি ক্রেতার কাছে অর্পণ করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হয় তাহলে ফল/ফসল তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়া জরুরি নয়। বরং ফল/ফসল গাছেই থাকবে। যখন ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাবে এবং ফসল কাটার

উপযুক্ত হবে তখন কাটবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এটি। তাদের দলিল এই যে, বিক্রেতার উপর অবশ্যই গাছ/ জমি অর্পণ করা ওয়াজিব; কিন্তু যে অর্পণ লোকসমাজে প্রচলিত সে মতে ওয়াজিব। তাই কেউ যদি রাতে বাড়ি বিক্রি করে আর বাড়িতে মালামাল থাকে তাহলে রাতেই বাড়ি অর্পণ করা ওয়াজিব নয়। বরং মজদুরের উপস্থিতি ও সকাল হওয়ার অপেক্ষা করা হয়। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রচলনে লোকেরা যে ফল এখনও খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি এবং যে ফসল এখনও কাটার উপযুক্ত হয়নি তা কাটে না। তাই আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ফল/ ফসল কাটবে না, ক্রেতা সম্মত থাকুক বা না থাকুক। −[ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬২]

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ الخ : আইম্মায়ে সালাসার পক্ষ থেকে তাদের অভিমতের সমর্থনে একটি উদাহরণ পেশ করা হয় যে, এক ব্যক্তি ফসল করার জন্য জমি ইজারা নিল এবং তাতে ফসল করল। ফসল এখনও কাটার উপযুক্ত হয়নি, কিন্তু ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যেরূপ ফসল কেটে নিয়ে জমি অর্পণ করা তার জন্য ওয়াজিব নয়, বরং কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সে ফসল জমিতে রাখতে পারে, তেমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়া এবং ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত ফল গাছে এবং ফসল জমিতে রাখতে পারবে।

قَوْلُهُ قُلْنَا هُنَاكَ التَّسْلِيْمُ وَاجِبٌ اَيْضًا الخ : আইম্মায়ে সালাসার অভিমতের পক্ষে যে উদাহরণ পেশ করা হয় সে সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ফসল না পাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও জমি ইজারাদাতার কাছে অর্পণ করা ওয়াজিব। আর সে কারণেই ইজারাগ্রহীতা ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত যদি জমিতে রাখতে চায় তবে তাকে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। বিনিময় অর্থাৎ ভাড়া অর্পণ করা আর বিনিময় দ্রব্য অর্থাৎ জমি অর্পণ করা একই কথা। অতএব ইজারার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, অথচ ফসল কাটার উপযুক্ত হয়নি সে ক্ষেত্রেও প্রকারান্তরে জমিই অর্পণ করা হলো।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, কাটার উপযুক্ত না হলে ইজারার ক্ষেত্রে ভাড়ার বিনিময়ে যেরূপ ফসল জমিতে রাখা জায়েজ তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়া এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা থেকে ভাড়ার বিনিময়ে বিক্রেতার জন্য ফল/ ফসল গাছে/ জমিতে রাখা জায়েজ হওয়া উচিত। তা যদি হয় তাহলে প্রকারান্তরে গাছ/ জমি অর্পণ করা হলো, আবার বিক্রেতারও ক্ষতি হলো না। আল্লামা ইবনে হুমাম ও আল্লামা আইনী (র.)-এর উত্তরে বলেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও যখন বিক্রেতা গাছ/ জমি বিক্রি করছে, এতে তৎক্ষণাৎ ফল/ ফসল কেটে নেওয়ার ব্যাপারে তার সম্মতি বুঝা যায়। কারণ, সে জানে বিক্রয়ের পর ক্রেতা তার কাছে স্বীয় মালিকানাধীন গাছ/ জমি ঝামেলামুক্ত অবস্থায় হস্তান্তরের দাবি জানাবে। যেহেতু তার পক্ষ থেকে সম্মতি পাওয়া যায় তাই তাকে ক্রেতা থেকে গাছ/ জমি ইজারা নেওয়ার সুযোগ দান করা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে জমিতে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারাগ্রহীতার পক্ষ থেকে এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি, যা থেকে বুঝা যায় যে, ফসল কাটার উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও সে ফসল কেটে নিয়ে যেতে সম্মত। সুতরাং তাকে ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সুযোগ দান করা ওয়াজিব। আর সামাজিক প্রচলনে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ না পেলে এবং ফসল কাটার উপযুক্ত না হলে ফল/ ফসল কাটা হয় না এ কথা ঠিক নয়। কারণ সামাজিক প্রচলনে বিক্রয়ের পর যেরূপ ফল/ ফসল গাছে রেখে দেওয়া হয় তেমনি তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়ার শর্তও করা হয়। −[ফাতহুল কাদীর, বিনায়া]

قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, "ফল মূল্য মান সম্পন্ন হোক বা না হোক তাতে হুকুমের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী উভয় সূরতে তা বিক্রেতা পাবে।" এ কথার দ্বারা হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা মাশআরী প্রমুখ ফুকাহায়ে কেরামের অভিমতকে নাকচ করেছেন। তাঁরা বলেন, "ফল যদি এত ছোট ছোট হয় যে, তা এখনও মূল্য মান সম্পন্ন হয়নি তাহলে তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।" বিশুদ্ধ অভিমতের যৌক্তিকতা হলো, ফল মূল্য মান সম্পন্ন হোক বা না হোক উভয় সূরতে তা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ। আর যা স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ তা যদি স্থায়ীভাবে যুক্ত না হয় তাহলে অনুবর্তী হয়ে অন্য কোনো বস্তুর বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, যদি উল্লেখ করা না হয় তাহলে ফল ও ফসল গাছ ও জমির বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَأَمَّا إِذَا بِيعَتِ الْأَرْضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ ، وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِيمَةٌ فَقَدْ قِيلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَقَدْ قِيلَ يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَأَنَّ هٰذَا بِنَاءً عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يَنَالَهُ الْمَشَافِرُ وَالْمَنَاجِلُ ، وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْهُمَا وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ ، لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ ، أَمَّا الثَّمَرُ الْمَجْذُوذُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُودُ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ .

অনুবাদ : আর যদি জমি বিক্রি করা হয়, অথচ জমির মালিক জমিতে বীজ বপন করেছে, কিন্তু এখনও বীজ অঙ্কুরিত হয়নি, তাহলে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ বীজ মালামালের মতো রক্ষিত আছে। আর যদি বীজ অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু এখনও তার কোনো মূল্য হয়নি তাহলে কারো মতে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর কারো মতে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভবত এ মতভিন্নতার ভিত্তি হচ্ছে কাস্তে ও [পশুর] ঠোঁটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কিত মতপার্থক্যের উপর। "অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা"র উল্লেখের দ্বারা ফল ও ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফল ও ফসল "অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা"র অংশ নয়। ক্রেতা যদি বলে, বিক্রেতার ভূমিতে এবং গাছে অল্প-বিস্তর যত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা আছে সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ [ক্রয় করলাম] তাহলে ফল ও ফসল পূর্বোক্ত কারণে বিক্রয়-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যদি ক্রেতা "অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা"র কথা উল্লেখ না করে [গাছে ও ভূমিতে বিক্রেতার যা কিছু আছে শুধু এটুকু বলে] তাহলে ফল ও ফসল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর পাড়া ফল এবং কাটা ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া [বিক্রয় চুক্তির] অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তা [জমিতে রাখা] মালামালের মতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক লোক জমি বিক্রি করেছে, কিন্তু এর পূর্বেই সে জমিতে ফসলের বীজ বপন করেছে, তবে বীজ এখনও অঙ্কুরিত হয়নি এবং বিক্রয়কালে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখিত হয়নি তাহলে বীজ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে বীজ জমিতে রক্ষিত মালামাল ও আসবাবপত্রের মতো। জমিতে মালামাল বা আসবাবপত্র থাকাবস্থায় জমি বিক্রি করা হলে মালামাল ও আসবাবপত্র যেরূপ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি বীজও বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর যদি এমন হয় যে, বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, কিন্তু এখনও মূল্যসম্পন্ন হয়নি, সে ক্ষেত্রে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। ফকীহ আবুল কাসিম আস্‌সাফ্‌ফার প্রমুখের মতে, বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর ফকীহ আবূ বকর আল ইসকাফের মতে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।-[বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৯]

গ্রন্থকার (র.) বলেন, সম্ভবত এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে কাস্তে ও পশুর ঠোঁটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল বিক্রয়ের বৈধতা সম্পর্কিত মতপার্থক্যের উপর। যে সকল ফকীহ কাস্তে ও পশুর ঠোঁটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল বিক্রয়কে বৈধ বলেন, মূল্যসম্পন্ন হয়নি এমন অঙ্কুরিত চারাগাছ/ ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না এটা তাদের অভিমত। কারণ পৃথকভাবে যে বস্তুর বিক্রয় বৈধ তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর অনুবর্তী (تَابِعْ) হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না। আর যে সকল ফকীহ কাস্তে ও পশুর ঠোঁটের নাগালে আসার পূর্বে অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল বিক্রয়কে বৈধ বলেন না, তাদের মতামত হলো অঙ্কুরিত চারাগাছ/ফসল যা এখনও মূল্যসম্পন্ন হয়নি তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ পৃথকভাবে যে বস্তুর বিক্রয় বৈধ নয় তা প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই মূল বস্তুর অনুবর্তী (تَابِعْ) হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوْقِ وَالْمَرَافِقِ الخ : কেউ যদি জমি বা গাছ ক্রয়কালে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করে, উদাহরণত ক্রেতা বলল, আমি সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ এ জমিটি বা এ গাছটি ক্রয় করলাম, তাহলে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফসল ও ফল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নয়।

ফসলওয়ালা জমি ও ফলবান বৃক্ষ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত শব্দাবলি চার রকম। যথা–

১. বিক্রেতা বলল, আমি জমি বা গাছ বিক্রি করেছি। অতিরিক্ত কিছু বলল না। এ সূরতে ফসল/ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর দলিল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

২. বিক্রেতা বলল, আমি জমি/গাছ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসহ বিক্রি করলাম। এ সূরতেও ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩. বিক্রেতা বলল, জমি/গাছে আমার অল্প বিস্তার যত অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা আছে সব সহ আমি জমি/গাছ বিক্রি করলাম। এ সুরতে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ ফসল ও ফল অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা নয়।

৪. বিক্রেতা বলল, জমি বা গাছে আমার অল্প বিস্তর যা কিছু আছে সব সহ আমি জমি/ গাছ বিক্রি করলাম। অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলেনি। এ সূরতে ফসল ও ফল বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ এ সূরতে ক্রেতা জমি/গাছ ও সংশ্লিষ্ট সবকিছু ক্রয় করেছে। আর ফসল/ফল জমি ও গাছের সংশ্লিষ্ট বস্তু।

উল্লেখ্য যে, حُقُوْقٌ শব্দটি حَقٌّ-এর বহুবচন। حَقٌّ হলো, বিক্রয়পণ্যের এমন অনুবর্তী জিনিসসমূহ যা অত্যাবশ্যকীয়। যেমন, জমিতে আসার রাস্তা, সেচ দেওয়ার পানি ইত্যাদি। আর مَرَافِقٌ বলতে বুঝায় বিক্রয়পণ্যের এমন অনুবর্তী জিনিসসমূহ যা বিক্রয়পণ্য দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য জরুরি। যেমন পয়ঃ নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি।

قَوْلُهُ أَمَّا الثَّمَرُ الْمَجْذُوْذُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُوْدُ الخ : গাছ থেকে পাড়া ফল এবং কর্তিত ফসল প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়া بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ هُوَ لَهُ فِيْهَا وَمِنْهَا বলার দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, তা জমিতে রাখা মালামালের মতো। জমিতে রাখা মালামাল জমি বিক্রয়ে যেরূপ بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ هُوَ لَهُ فِيْهَا وَمِنْهَا বলার দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না তেমনি কাটা ফল ও কর্তিত ফসলও স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ هُوَ لَهُ فِيْهَا وَمِنْهَا বলার দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا اَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ ، لِاَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوَّمٌ ، إِمَّا لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي الْحَالِ اَوْ فِي الثَّانِي ، وَقَدْ قِيلَ : لَا يَجُوْزُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَالْاَوَّلُ أَصَحُّ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ تَفْرِيْغًا لِمِلْكِ الْبَائِعِ ، وَهٰذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا اَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخِيْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ ، وَهُوَ شُغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ ، اَوْ هُوَ صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ ، وَهُوَ إِعَارَةٌ اَوْ إِجَارَةٌ فِي بَيْعٍ ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرْكِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا إِذَا تَنَاهٰى عِظَمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ (رح) لِمَا قُلْنَا ، وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ (رح) لِلْعَادَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "কেউ যদি এমন ফল বিক্রি করে যার উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি বা প্রকাশ পেয়েছে তাহলে বিক্রয় বৈধ হবে।" কারণ বর্তমানে বা পরবর্তীতে উপকার লাভের যোগ্য হওয়ার কারণে তা মূল্যসম্পন্ন পণ্য। কারো কারো মতে, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে বিক্রয় বৈধ নয়। তবে প্রথমোক্ত অভিমতই বিশুদ্ধতম। সে মতে বিক্রেতার মালিকানাধীন [গাছ] কে [বিক্রয়পণ্য থেকে] মুক্তকরণের জন্য ক্রেতার উপর তৎক্ষণাৎ ফল পেড়ে নেওয়া ওয়াজিব। আর বিক্রয়ের বৈধতা হবে তখনি, যখন ফল শর্তহীনভাবে বা পেড়ে নেওয়ার শর্তে ক্রেতা ক্রয় করে। যদি ক্রেতা ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত করে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, তা এমন শর্ত, যা বিক্রয় চুক্তি দাবি করে না। তা হলো অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে আবদ্ধ রাখা কিংবা এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তি। আর তা হলো বিক্রয় চুক্তির মাঝে ধার দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া। [জমিতে] রেখে দেওয়ার শর্তে ফসল বিক্রি করাটাও পূর্বোক্ত কারণে একই রকম। যখন ফলের বর্ধন পূর্ণ হয় [এবং ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় করা হয়] তখনও পূর্বোক্ত কারণে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় ফাসিদ। তবে লোক প্রচলনের কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তা অনুমোদনযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রন্থকার (র.) উপরোক্ত ইবারতে গাছে থাকাবস্থায় ফল বিক্রির বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا الخ : يَبْدُ ক্রিয়াটি بَدْوٌ থেকে নির্গত। অর্থ প্রকাশ পাওয়া, ফুটে উঠা। আর صَلَاحٌ অর্থ উপযোগিতা। ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا অর্থ এমন ফল, যার উপযোগিতা এখনও প্রকাশ পায়নি, অর্থাৎ যা এখনও মানুষ বা পশুর খাওয়ার উপযোগী হয়নি।

ফলে কখন উপযোগিতা আসে তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী ফিকহবিদদের মতে ফল প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হওয়া (يَأْمَنُ الْعَاهَةَ وَالْفَسَادَ) অর্থাৎ যে সময়টা অতিক্রম করলে

সাধারণত পোকার আক্রমণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায় তাই হলো ফলের উপযোগিতা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যখন ফলে রং ধরে এবং মিষ্টতা আসে তখন তা উপযোগী হয়। -[ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২৬৪]

উল্লেখ্য যে, ফল বিক্রির কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

১. ফল শর্তহীনভাবে বিক্রি করা। বিক্রয়ের পর গাছে রাখা/না রাখা কোনোটির শর্ত করা হয় না।

২. ফল কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রি করা।

৩. বিক্রয়ের পর ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা।

ফলে কয়েকটি পর্যায় রয়েছে : যথা-

১. ফল এখনো প্রকাশ পায়নি, কলি বা ফুল আকারে আছে। এ ধরনের ফল সর্বসম্মতভাবে বিক্রয় জায়েজ নেই। কারণ বিক্রয়পণ্য (مَبِيْع) অজ্ঞাত; আর এ ধরনের অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয়।

২. ফল প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু উপকার লাভের যোগ্য হয়নি। এত ছোট যে, মানুষ বা পশুর খাদ্যের উপযুক্ত হয়নি। শায়খুল ইসলাম খাহার জাদাহ (র.) -এর মতে এ ধরনের ফল বিক্রি জায়েজ নেই। কারণ, তা মূল্যসম্পন্ন পণ্য (مَال مُتَقَوَّمْ) নয়। আর যে পণ্য মূল্যসম্পন্ন নয় তার বিক্রি জায়েজ নেই। ইমাম কুদূরী প্রমুখের মতে জায়েজ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীরের যাকাত অধ্যায়ে "উশর ও খারাজ পরিচ্ছেদে" এদিকেই ইশারা করেছেন। -[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৬২]

৩. উপকার লাভের যোগ্য হয়েছে, কিন্তু এখনও তাতে উপযোগিতা প্রকাশ (بُدُوُّ الصَّلَاحِ) পায়নি। এ ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে সর্বসম্মতভাবে বিক্রি জায়েজ। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে সর্বসম্মতভাবে বিক্রি নাজায়েজ। আর শর্তহীনভাবে বিক্রয়ের বৈধতা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। আর হানাফীদের মতে জায়েজ আছে। তবে ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নিতে হবে। [ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত]

৪. ফলের উপযোগিতা (صَلَاحْ) প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বর্ধন এখনও পূর্ণ হয়নি (لَمْ يَتَنَاهُ عِظَمُهَا) আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের ফল গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হলে সর্বসম্মতভাবে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ। তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে কিংবা শর্তহীনভাবে বিক্রি করা হলে সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। তবে শর্তহীনভাবে ক্রয় করার সুরতে তৎক্ষণাৎ কেটে নিতে হবে।

৫. ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে এবং বর্ধন পূর্ণ হয়েছে (تَنَاهَى عِظَمُهَا)। এ ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ পেড়ে নেওয়ার শর্তে এবং শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) বিক্রয় জায়েজ। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় জায়েজ কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) লোক প্রচলনের কারণে ইসতিহসান হিসেবে জায়েজ বলেছেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতামতও এটি। -[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৬২]

قَوْلُهُ إِمَّا لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فِى الْحَالِ أَوْ فِى الثَّانِىْ الخ : সাহেবে হিদায়া বলেন, উপযোগিতা প্রকাশ পায়নি অথবা উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে উভয় ধরনের ফল তৎক্ষণাৎ কেটে নেওয়ার শর্তে (بِشَرْطِ الْقَطْعِ) বা শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) কেউ বিক্রি করলে তা জায়েজ। কারণ তা মূল্যসম্পন্ন পণ্য (مَال مُتَقَوَّمْ)। যে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পেয়েছে তা এখনি উপকার দানের যোগ্য। আর যে ফলের উপযোগিতা এখনও প্রকাশ পায়নি তা পরবর্তীকালে উপকার দানের যোগ্য। আর যা উপকার দানের যোগ্য তাই মূল্যসম্পন্ন মাল। তবে ক্রেতার উপর তৎক্ষণাত ফল পেড়ে নেওয়া ওয়াজিব। কারণ, তা না হলে বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ গাছ ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু অর্থাৎ ফল দ্বারা আটক থাকে।

অবশ্য শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী ও শায়খুল ইসলাম খাহার জাদাহ (র.)-এর মতে, ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে [অর্থাৎ মানুষ বা পশুর খাবারের উপযুক্ত না হলে] বিক্রি বৈধ নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমত বিশুদ্ধতম।

আর যদি ক্রেতা গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত করে, যেমন ক্রেতা বলল, اِشْتَرَيْتُ الثَّمَرَ عَلٰى أَنِّىْ أَتْرُكُهُ عَلَى النَّخِيْلِ "আমি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে ফলগুলো ক্রয় করলাম", তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কারণ, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তটি বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। বিক্রয় চুক্তি বিক্রয়পণ্য হস্তান্তরিত হওয়াকে তাগাদা করে। অথচ এ সূরতে বিক্রয়পণ্য হস্তান্তরিত না হয়ে অন্যের [বিক্রেতার] মালিকানাধীন গাছকে আবদ্ধ রাখে। কিংবা বলা যায়, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয়টা মূলত এক চুক্তির ভিতরে নতুন আরেকটি চুক্তি। কেননা, ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত এ শর্তের দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. ভাড়ার ভিত্তিতে ফলগুলো গাছে থাকবে। ক্রেতা মালিককে ফলগুলো পাকা পর্যন্ত গাছের ভাড়া দিতে থাকবে। বস্তুত এটা হলো ইজারা চুক্তি।

২. ধারের ভিত্তিতে ফলগুলো গাছে থাকতে দিবে। অর্থাৎ গাছগুলো কিছুদিনের জন্য ধারস্বরূপ ক্রেতার অধিকারে থাকবে। ফল পাড়া হয়ে গেলে মালিককে গাছ ফেরত দিবে। এ ধরনের চুক্তিকে ই'আরা (إِعَارَة) বলা হয়। ইজারা ও ই'আরা (إِجَارَة وَإِعَارَة) উভয়টি স্বতন্ত্র চুক্তি। আর নিয়ম হলো, কোনো চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগে অন্য কোনো চুক্তি তাতে প্রবিষ্ট হলে প্রথম চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যায়। গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয়টা যেহেতু এরকম তাই বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। এরূপভাবে জমিতে রেখে দেওয়ার শর্তে ফসল বিক্রয়ও একই কারণে ফাসিদ হবে। কারণ, সে ক্ষেত্রেও ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [অর্থাৎ ফসল] বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু [অর্থাৎ জমিকে] আবদ্ধ রাখে এবং বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই অন্য আরেকটি চুক্তি তাতে প্রবিষ্ট হয়।

গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে ফল বিক্রয় করা হলে বিক্রয় চুক্তির মাঝে ইজারা বা ই'আরা চুক্তিকে প্রবিষ্ট করানো হয়- সাহেবে হিদায়ার এ কথা সঠিক নয়। কারণ, প্রয়োজন ও প্রচলন না থাকায় গাছকে ইজারা তথা ভাড়ায় দেওয়াও জায়েজ নেই, ই'আরা তথা ধারে দেওয়াও জায়েজ নেই। যখন গাছে ইজারা বা ই'আরা নেই তখন এটাকে চুক্তি বলা যায় না। আর চুক্তি বলা না গেলে চুক্তির মাঝে চুক্তি- এ কথা আসে না। তবে ফসলের ক্ষেত্রে চুক্তির ভিতরে চুক্তি হয়। কারণ জমির ইজারা ও ই'আরা উভয়টি জায়েজ। মোটকথা, গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে ফল বিক্রয় ফাসিদ এজন্য যে, তা বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। –[আইনী, প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا تَنَاهٰى عِظَمُهَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ : ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়ে গেলেও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। আর বিক্রয় চুক্তির বিরোধী শর্ত আরোপ করার কারণে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব এ সূরতেও বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) লোক সমাজে প্রচলনের কারণে ইসতিহসান হিসেবে (إِسْتِحْسَانٌ) এ সূরতে বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। এর উপরই ফতোয়া।

পক্ষান্তরে যে ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি, আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ফল যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করা হয় তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা ফাসিদ। কারণ, বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলের যে অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটবে তা বিক্রয়কালে অবিদ্যমান (مَعْدُوْم)। বিক্রয় চুক্তিতে এ অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হচ্ছে। আর নিয়ম হলো, বিক্রয় চুক্তিতে অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হলে তা ফাসিদ হয়ে যায়। তাই এ সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهُ عَظْمُهَا ، لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الْجُزْءَ الْمَعْدُومَ ، وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ بِمَعْنًى مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ ، وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةٍ ، وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى عَظْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ هٰذَا تَغَيُّرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ ، وَقَدِ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ ، فَبَقِيَ الْإِذْنُ مُعْتَبَرًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ وَتَرَكَهُ حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِلْجَهَالَةِ فَأَوْرَثَتْ خُبْثًا .

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যখন ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি তখন বিষয়টি ভিন্ন। [সকলের ঐকমত্যে তা গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রয় না জায়েজ]। কারণ, তাতে অবিদ্যমান অংশের শর্ত করা হয়। অবিদ্যমান অংশ হলো [বিক্রয়ের পর] যা ভূমি গাছের উপাদান দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ক্রেতা তা শর্তহীনভাবে ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে [গাছে] রেখে দেয় তাহলে বর্ধিত অংশটুকু তার জন্য হালাল হবে। কিন্তু বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া যদি তা [গাছে] রেখে দেয় তাহলে মূলের উপর যা বর্ধিত হয়েছে তা সদকা করে দিবে। কারণ, তা নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে। আর ফলের বর্ধন পূর্ণ হওয়ার পর যদি তা [গাছে] রেখে দেয় তাহলে কিছুই সদকা করবে না। কারণ, এটা ফলের অবস্থার পরিবর্তন, বর্ধন সম্পন্ন হওয়া নয়। যদি ক্রেতা ফল [বর্ধন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে] শর্তহীনভাবে ক্রয় করে এবং [ক্রয়ের পর] গাছে রেখে দেয়, আর ফল পাকার সময় পর্যন্ত গাছ ভাড়া নেয় তাহলে তার জন্য বর্ধিতাংশটুকু হালাল হবে। কারণ প্রচলন ও প্রয়োজন না থাকার দরুন ভাড়া গ্রহণ চুক্তি বাতিল হবে, কিন্তু বিক্রেতার অনুমতি বিবেচ্য থাকবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি ফসল ক্রয় করে আর ফসল পাকার সময় পর্যন্ত জমি ভাড়া নেয় এবং [সে মতে] ফসল [জমিতে] রেখে দেয় তাহলে তার জন্য বর্ধিতাংশটুকু হালাল হবে না। কেননা, [ফসল পাকার সময়কাল] অজ্ঞাত থাকার কারণে ভাড়ার চুক্তি ফাসিদ। সুতরাং তাতে অবৈধতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ الخ : ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি, আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ফল যদি শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) কেউ ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে গাছে রেখে দেয় তাহলে বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলে যে অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটবে তা তার জন্য হালাল হবে। আর যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া রাখে তাহলে ফলের যে অংশটুকু বর্ধিত হয়েছে তা সদকা করে দিবে। অর্থাৎ ক্রয়কালে ফলের দাম কত ছিল আর এখন বেড়ে কত হয়েছে তা হিসাব করে যে পরিমাণ অর্থ বের হয় তা সদকা করে দিবে। –[আইনী, খ. ৭, পৃ. ৮৩]

কারণ তা অন্যের মালিকানাধীন জমি ও গাছ থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে অর্জিত হয়েছে। আর অন্যের মালিকানাধীন বস্তু থেকে অনুমতি ছাড়া উপকার গ্রহণ করা নিষেধ। তাই অতিরিক্ত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَى عِظَمُهَا الخ : যদি ফলের বর্ধন পূর্ণ ও পুষ্ট হওয়ার পর কেউ শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) ফল ক্রয় করে এবং বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া গাছে রেখে দেয় তাহলে তাকে কিছুই সদকা করতে হবে না। কারণ, এ সুরতে বিক্রেতার গাছ ও জমি থেকে রস ও শক্তি আহরণ করে ফলে কোনো অংশের প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। বরং ফলের অবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। আগে কাঁচা ছিল, এখন সূর্যের আলো তাকে পাকিয়েছে, চাঁদের আলো তাতে রং ধরিয়েছে, আর নক্ষত্রমণ্ডলী তাতে স্বাদ এনেছে।– [আইনী, প্রাগুক্ত] অতএব অন্যের মালিকানাধীন বস্তু থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়নি। তাই তাকে কিছু সদকা করতে হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيْلِ وَقَدِ الخ : ফলের বর্ধন পূর্ণ হয়নি, আরো পুরু ও পুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ফল যদি শর্তহীনভাবে (مُطْلَقًا) কেউ ক্রয় করে গাছে রেখে দেয় এবং পাকার সময় পর্যন্ত গাছ ভাড়া নেয় তাহলে বর্ধিত অংশটুকু তার জন্য হালাল হবে। কারণ সমাজে গাছ ইজারা নেওয়ার প্রচলন নেই এবং এর প্রয়োজনও নেই। ইজারার মাধ্যমে ফল গাছে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন তখন অনুভূত হতো যদি ফল গাছে রাখার অন্য কোনো উপায় না থাকত। কিন্তু ক্রেতার জন্য ফল গাছে রাখার অন্য উপায় আছে। ক্রেতা ফলগুলো গাছসহ কিনে নিতে পারে। মোটকথা, প্রয়োজন ও প্রচলন না থাকায় ইজারা চুক্তি শুদ্ধ নয়। অতএব, ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে গেল কিন্তু বিক্রেতার অনুমতি বিবেচ্য থেকে গেল। বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে গাছে রেখে দেওয়া হলে ক্রেতার জন্য বর্ধিত অংশটুকু যেরূপ হালাল হয়, তেমনি এ সুরতেও বিক্রেতার পক্ষ থেকে অনুমতি থাকার কারণে বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিক্রেতার অনুমতি তো ইজারার প্রেক্ষিতে ছিল। যখন ইজারা বাতিল হয়ে গেল তখন অনুমতি অবশিষ্ট থাকে কিভাবে? যুক্তি বলে, অনুমতিও অবশিষ্ট থাকবে না। আর অনুমতি ছাড়া ফল গাছে রেখে দিলে বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য যেরূপ হালাল হয় না তেমনি আলোচ্য মাসআলায় বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে না।

এর উত্তর হলো, এখানে দু'টি বিষয়; বাতিল ও ফাসিদ। বাতিল হলো (مَا لَا يَصِحُّ أَصْلًا وَلَا وَصْفًا وَلَا شَرْعًا) যা মৌলিক, আনুসঙ্গিক ও শরয়ী কোনো বিচারেই শুদ্ধ নয়। বরং তা অস্তিত্বহীন (مَعْدُوْم) একটি ব্যাপার। গাছ ইজারা নেওয়ার সুরতে ইজারা বাতিল হওয়ার অর্থ হলো, যেন ইজারার প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয়নি। বরং বিক্রেতার অনুমতিটা এখানে মুখ্যভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং অনুমতি যখন পাওয়া গেল তখন বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে।–[বিনায়া : খ. ৭, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ الخ : কেউ যদি ফসল ক্রয় করে ফসল জমিতে রেখে দেয় এবং ফসল পাকার সময় পর্যন্ত বিক্রেতা থেকে জমি ইজারা নেয় তাহলে তার জন্য ফসলের বর্ধিত অংশটুকু হালাল হবে না। কারণ ফসল পাকতে কতদিন লাগবে তা অজানা থাকার দরুন ইজারার মেয়াদ অজ্ঞাত। আর মেয়াদ অজ্ঞাত হলে ইজারা ফাসিদ হয়। ফাসিদ হলো (مَا يَصِحُّ أَصْلًا لَا وَصْفًا) যা মৌলিক বিচারে শুদ্ধ, কিন্তু আনুসঙ্গিক বিচারে শুদ্ধ নয়। তা অস্তিত্বশীল (مَوْجُوْد) ব্যাপার। জমি ইজারা নেওয়ার সুরতে ইজারা ফাসিদ হওয়ার অর্থ হলো, ইজারার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি অশুদ্ধ হয়েছে। তাই তা বাস্তবায়িত হবে না। যেহেতু জমিতে ফসল রাখার অনুমতি ইজারার প্রেক্ষিতে ছিল, তা যখন বাস্তবায়িত হবে না তখন অনুমতিও কার্যকর হবে না। আর অনুমতি কার্যকর না হওয়ার কারণে বর্ধিত অংশের মাঝে অবৈধতা সৃষ্টি হবে। তাই বর্ধিত অংশটুকু ক্রেতার জন্য হালাল হবে না।

وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ، وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِلْاِخْتِلَاطِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِهِ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَكَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ، وَالْمَخْلَصُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأُصُولَ لِيَحْصُلَ الزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِ.

অনুবাদ : কেউ যদি শর্তহীনভাবে ফল ক্রয় করে, কিন্তু দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে আরো কিছু নতুন ফল ধরে সে ক্ষেত্রে [বিক্রীত ফল ও নতুন ফলের মাঝে] পার্থক্য করা অসম্ভব বিধায় বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দখল বুঝে নেওয়ার পর নতুন আরো কিছু ফল ধরে তাহলে [বিক্রয় ফাসিদ হবে না, কিন্তু বিক্রীত ফল ও নতুন ফলের] সংমিশ্রণের কারণে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে সমগ্র ফলে অংশীদার হবে। আর বর্ধিত ফলের পরিমাণের ব্যাপারে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। কারণ ফল তার দখলে আছে। বেগুন ও খরবুযাতেও একই হুকুম। [বিক্রয় ফাসিদ হওয়া থেকে] বাঁচার উপায় হলো গাছ কিনে নেওয়া। যাতে ক্রেতার মালিকানাতে বর্ধন অর্জিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি গাছে বিদ্যমান ফলসমূহ, গাছে রেখে দিবে বা তৎক্ষণাৎ পেড়ে নিবে এ ধরনের কোনো শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে ক্রয় করল। ক্রয়ের পর বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হলো, কিন্তু সে এখনও ক্রয়কৃত ফল দখল বুঝে নেয়নি। ইতোমধ্যে গাছে আরো কিছু নতুন ফল ধরেছে এবং তা বেড়ে উঠেছে। এখন কোন ফলগুলো বিক্রিত আর কোন ফলগুলো নতুন তা কোনোক্রমে পার্থক্য করা যাচ্ছে না। তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ পার্থক্য করা অসম্ভব হওয়ার কারণে বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ফলগুলো বুঝিয়ে দিতে পারছে না। আর যে সুরতে বিক্রীত পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া যায় না সেই সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হয়। তাই এ সুরতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে।

ক্রেতা বিক্রীত ফলে দখল বুঝে নিয়েছে, কিন্তু এখনও ফল পেড়ে নেয়নি। ইতোমধ্যে গাছে আরো কিছু নতুন ফল ধরেছে এবং বেড়ে উঠেছে। এখন কোন ফলগুলো ক্রেতার, আর কোন ফলগুলো নতুন তা পার্থক্য করা যাচ্ছে না। এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কারণ বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রয়পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ায় বিক্রয় চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তবে যেহেতু ক্রেতার মালিকানাধীন বিক্রীত ফলগুলো এবং বিক্রেতার মালিকানাধীন নতুন ফলগুলো এমনভাবে মিশে আছে যে, সেগুলোর মাঝে পার্থক্য করা যাচ্ছে না তাই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে গাছের সমগ্র ফলে অংশীদার হবে। তবে ফলগুলো ক্রেতার দখলে থাকার কারণে কি পরিমাণ ফল নতুন ধরেছে এ বিষয়ে ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে। কারণ নিয়ম হচ্ছে, দখলকৃত জিনিসের ব্যাপারে দখলকারীর কথা ধর্তব্য হয়। অতএব এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার কথা ধর্তব্য হবে।

বেগুন, খরবুয়া ও অন্যান্য ফলেও একই হুকুম। অর্থাৎ, কেউ যদি গাছে বিদ্যমান বেগুন/খরযুযাহ বা অন্য কোনো ফল ক্রয় করে এবং দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে গাছে নতুন আরো কিছু বেগুন/খরবুযা ধরে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দখল বুঝে নেওয়ার পর নতুন বেগুন/খরবুযা ধরে তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা গাছের সমগ্র ফলে অংশীদার হবে।

قَوْلُهُ وَالْمَخْلَصُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأُصُولَ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন,দখল বুঝে নেওয়ার পূর্বে গাছে নতুন ফল ধরার সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়া থেকে বাঁচার উপায় হলো, কিছু টাকা বাড়িয়ে ফলের গাছও কিনে নেওয়া। ফল গাছে নতুন যত ফল ধরবে তা ক্রেতার মালিকানায় ধরবে। ক্রেতাই সেগুলোর মালিক হবে। এতে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। আর ফল পেড়ে নেওয়ার পর ক্রেতা পূর্ব মূল্যে বিক্রেতার কাছে গাছটি বিক্রি করে দিবে। তবে এটা তখনি সম্ভব, যখন ক্রেতা পূর্ব মূল্যে বিক্রেতার কাছে গাছ বিক্রি করবে বলে বিক্রেতা নিশ্চিত থাকবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً ، خِلَافًا لِمَالِكٍ (رحـ) ، لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَثْنٰى نَخْلًا مُعَيَّنًا لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ قَالَ : (رض) قَالُوا : هٰذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيْ ، أَمَّا عَلٰى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِيْ أَنْ يَجُوْزَ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ مَا يَجُوْزُ إِيْرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِإِنْفِرَادِهِ يَجُوْزُ إِسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْعَقْدِ ، وَبَيْعُ قَفِيْزٍ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ ، فَكَذَا إِسْتِثْنَاءُهُ ، بِخِلَافِ إِسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ وَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَكَذَا إِسْتِثْنَاؤُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "নির্দিষ্ট কয়েক রিতল বাদ দিয়ে [গাছের] ফল বিক্রি করা জায়েজ নেই।" তবে ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। [জায়েজ না হওয়ার] কারণ, বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ফলের পরিমাণ অজ্ঞাত। তবে নির্দিষ্ট গাছ বাদ দিয়ে ফল বিক্রি করলে তার ব্যাপার ভিন্ন। কারণ, [সে ক্ষেত্রে] অবশিষ্ট ফলগুলোর পরিমাণ প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা জ্ঞাত। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ফিকহবিদগণ বলেছেন, এটা [ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে] হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনা। ইমাম তহাবী (র.)-এর অভিমতও এটি। পক্ষান্তরে জাহেরী বর্ণনা অনুসারে এটা জায়েজ হওয়া উচিত। কেননা, কায়দা হলো, যার উপর স্বতন্ত্রভাবে চুক্তি করা জায়েজ তাকে চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও জায়েজ। খাদ্যশস্যের স্তূপ থেকে এক কফিয বিক্রয় জায়েজ, তা থেকে এক কফিযকে বাদ দেওয়াও জায়েজ। পশুর গর্ভ ভ্রূণ ও অঙ্গ বিশেষকে [বিক্রয় চুক্তি থেকে] বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা আলাদা বিক্রি করা যেমন জায়েজ নেই, তেমনি [বিক্রয় থেকে] তা বাদ দেওয়াও জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল বাদ দিয়ে গাছের অবশিষ্ট ফল বিক্রি করে, যেমন কেউ বলল, এই গাছে যতগুলো আম আছে তা থেকে দশ কেজি বা একশ'টি আম বাদে অবশিষ্ট আমগুলো আমি একশ' টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ হবে না। দলিল হলো, মোট পরিমাণ থেকে দশ কেজি বাদ দিলে গাছে কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তা অজ্ঞাত (مَجْهُوْل)। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় বিধায় তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক। তাছাড়া এও তো হতে পারে যে, ফল পাড়ার পর ফলের সর্বসাকুল্য পরিমাণই দাঁড়াবে দশ কেজি। তখন মূল্যের বিপরীতে পণ্য অবিদ্যমান (مَعْدُوْم) হবে। আর বিক্রয়পণ্য অবিদ্যমান হলে বিক্রয় জায়েজ হয় না।

তবে কেউ যদি বাগানের নির্দিষ্ট গাছকে বাদ রেখে অবশিষ্ট গাছের ফলসমূহ বিক্রি করে তাহলে তা বৈধ হবে। কারণ, অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা কত এবং তাতে কি পরিমাণ ফল আছে তা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা জানা যাচ্ছে। তাই এ সুরতে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত নয়।

ইমাম মালিক (র.) প্রথমোক্ত মাসাআলায় ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে বাগানের নির্দিষ্ট গাছকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট গাছের ফল বিক্রয় যেরূপ বৈধ, তেমনি গাছের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ ফল বিক্রয়ও বৈধ।

-[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯]

قَوْلُهُ قَالَ : قَالُوْا : هٰذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, "নির্দিষ্ট কয়েক রিতিল বাদ দিয়ে [গাছের] ফল বিক্রি করা জায়েজ নেই" ইমাম কুদূরীর এ উক্তি মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনা। ইমাম তহাবী (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) ও এ মতামত পোষণ করেন।

তবে জাহেরী রিওয়ায়াত অনুসারে এ সুরতে বিক্রয় বৈধ হওয়া উচিত। কারণ, জাহেরী রিওয়ায়াতে এই মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে জিনিসকে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ তাকে বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও জায়েজ। উদাহরণত শস্যস্তূপ থেকে এক কফিয শস্য স্বতন্ত্রভাবে যেরূপ বিক্রি করা জায়েজ তেমনি শস্যস্তূপ থেকে এক কফিযকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শস্য বিক্রি করাও জায়েজ। পশুর ভ্রূণ গর্ভ ও অঙ্গবিশেষ (اَلْحَمْلُ وَالْاَطْرَافُ) যেরূপ আলাদাভাবে বিক্রি করা জায়েজ নেই, তেমনি তাকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পশু বিক্রয়ও জায়েয নেই। পশুর গর্ভ ভ্রূণ বাদ দেওয়ার সুরত হলো, কেউ বলল, আমি এ গরুটি তার গর্ভস্থিত বাছুর ছাড়া পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। অঙ্গ বিশেষ বাদ দেওয়ার সুরত হলো, কেউ বলল, আমি একটি রান বাদে এই পুরা গরুটি তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম।

গাছের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফল যেরূপ স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা জায়েজ, উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে তেমনি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ফল বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

তবে নির্দিষ্ট কয়েক কেজি বাদ দিলে অবশিষ্ট ফলের পরিমাণ সম্পর্কে যে অজ্ঞতা (جَهَالَة) থাকে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, অবশিষ্ট ফলের ওজন অজানা থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের হিসেবে পরিমাণ অজানা থাকে না। তাছাড়া এ সুরতে ফলের বিক্রয় হচ্ছে অনুমান হিসেবে, ওজন হিসেবে নয়। আর অনুমান হিসাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের ওজন জানা থাকা জরুরি নয়। বরং ইশারা এবং প্রত্যক্ষ দর্শনই বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আর বাদ দেওয়ার পরিমাণটি যদি ফলের সর্বসাকুল্য পরিমাণ হয়, তবে এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, সে ক্ষেত্রে اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ তথা পণ্যের পুরোটাকেই বাদ দেওয়া হলো। আর কায়দা আছে, যদি اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ হয় তাহলে اِسْتِثْنَاء তথা বাদ দেওয়ার উক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যখন বাদ দেওয়ার উক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে তখন বিক্রয় গাছের সমগ্র ফলে হবে। আর বাদ দেওয়া ছাড়া গাছের সমগ্র ফল বিক্রি করা জায়েজ আছে। তাই এ সুরতেও বিক্রয় জায়েজ হবে।

-[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০]

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا، وَالْبَاقِلّٰى فِي قِشْرِهِ، وَكَذَا الْأَرُزُّ وَالسِّمْسِمُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلّٰى الْأَخْضَرِ، وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْفُسْتُقُ فِي قِشْرِهِ الْأَوَّلِ عِنْدَهُ، وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنْبُلَةِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذٰلِكَ كُلُّهُ، لَهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ، فَأَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاغَةِ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُزْهِيَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَّعِيرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَالًا مُتَقَوَّمًا، بِخِلَافِ تُرَابِ الصَّاغَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ لِاحْتِمَالِ الرِّبٰوا، حَتّٰى لَوْ بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ جَازَ وَفِي مَسْئَلَتِنَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الرِّبٰوا لِأَنَّهُ، لَا يُدْرٰى قَدْرُ مَا فِي السَّنَابِلِ .

অনুবাদ : শীষে থাকা গম এবং খোসায় আবৃত সবজি বিক্রি করা জায়েজ আছে। চাউল ও তিলের হুকুমও এরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সবুজ খোসা বিশিষ্ট সবজি বিক্রি করা জায়েজ নেই। উপরের খোসা আবৃত অবস্থায় আখরোট, বাদাম ও পেস্তা বিক্রয়ের হুকুমও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট এরূপ। শীষে থাকা গম বিক্রয় সম্পর্কে তার দু'টি অভিমত রয়েছে। আমাদের মতে এর সবই জায়েজ। তাঁর দলিল হলো, চুক্তিকৃত পণ্য এমন জিনিস দ্বারা আবৃত যাতে ক্রেতার কোনো উপকার নেই। সুতরাং তা স্বর্ণকারের ছাই সদৃশ হলো যখন তা সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। আমাদের দলিল হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রং ধরার আগে গাছে থাকা খেজুর বিক্রি করতে এবং শুভ্রতা আসার ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুক্ত হওয়ার আগে শীষে থাকা গম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া গম একটি উপকার লাভযোগ্য শস্য। সুতরাং যবের মতো তা শীষে থাকা অবস্থায় বিক্রি জায়েজ হবে। উভয়ের যোগসূত্র হলো, উভয়টি মূল্যসম্পন্ন মাল। স্বর্ণকারের ছাই তা থেকে ভিন্ন। কারণ সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করা সুদের সম্ভাবনার কারণে জায়েজ নেই। অবশ্য যদি তাকে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে জায়েজ আছে। আর আমাদের এ মাসআলায়ও যদি শীষসহ গমকে সমজাতীয় শস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে সুদের সম্ভাবনার কারণে তা জায়েজ নেই। কেননা শীষের মাঝে কি পরিমাণ গম আছে তা জানা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْحِنْطَةُ : গম سُنْبُلٌ : শীষ, যাতে শস্যদানা জন্ম নেয় بَاقِلّٰى : সব্জি قِشْرٌ : খোসা جَوْزٌ : আখরোট لَوْزٌ : বাদাম فُسْتُقٌ : পেস্তা বাদাম أَرُزٌّ : চাউল سِمْسِمٌ : তিল।

শীষসহ গম এবং খোসাসহ সবজি বিক্রি করা জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বলেন, সবুজ খোসা বিশিষ্ট সবজি বিক্রি করা জায়েজ নেই। এমনিভাবে উপরের শক্ত খোসাসহ আখরোট, বাদাম ও পেস্তা বিক্রি করা তাঁর মতে জায়েজ নেই। আর শীষসহ গম বিক্রয় সম্পর্কে তাঁর দু'টি অভিমত আছে। আগের অভিমত হলো জায়েজ আছে। আর পরের অভিমত হলো জায়েজ নেই। তাঁর দলিল হলো কিয়াস। তিনি বলেন, চুক্তিপণ্য (مَعْقُوْد عَلَيْه) অর্থাৎ, গম, সব্জি এবং আখরোট, বাদাম ও পেস্তার শাষ খোসা দ্বারা আবৃত্ত, আর খোসায় ক্রেতার কোনো উপকার নেই। খোসার ভিতরে বিক্রয় পণ্য আছে কিনা বা কতটুকু আছে তা অজ্ঞাত। সুতরাং এটা স্বর্ণকারের ছাইকে সমজাতীয় ছাইয়ের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো। স্বর্ণকারের ছাইয়ের মাঝে স্বর্ণ বা রূপার কণা থাকে। কিন্তু তা লুকায়িত থাকে। আর এমন জিনিসে লুকায়িত থাকে যাতে ক্রেতার কোনো উপকার নেই অর্থাৎ ছাই। স্বর্ণকণা মিশ্রিত এ ছাইকে স্বর্ণের বিনিময়ে কিংবা রূপার কণা মিশ্রিত ছাইকে রূপার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েজ নেই। কারণ ছাইয়ের আড়ালে স্বর্ণ বা রূপার কণা আছে কিনা তা অজ্ঞাত। এমনিভাবে শীষসহ গম বিক্রি করার সুরতেও শীষের মাঝে গম আছে কি নেই তা অজ্ঞাত থাকে এবং গম এমন জিনিস দ্বারা আবৃত, যাতে ক্রেতার কোনো উপকার নেই। অতএব শীষসহ গমের বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে।

আমাদের দলিল : হাদীস–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُزْهِىَ وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ –

রাসূলুল্লাহ ﷺ [ফলে] রং না ধরা পর্যন্ত গাছে থাকা খেজুর বিক্রি করতে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিরাপদ ও সাদা না হওয়া পর্যন্ত শীষসহ গম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত আইম্মায়ে সিত্তার সকলে তাদের কিতাবে সংকলন করেছেন। [বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৬৭] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শীষসহ গম বিক্রি করা জায়েজ আছে। তবে বিক্রয়টা অবশ্যই প্রাকৃতিক বিপদ থেকে নিরাপদ ও পাঁকার পর হতে হবে। যখন শীষসহ গম বিক্রি করার বৈধতা প্রমাণিত হলো তখন খোসাসহ অন্যান্য ফল ও শস্য বিক্রি করাও জায়েজ হবে।

আকলী দলিল : শীষে থাকা গম উপকার লাভযোগ্য শস্য। তাই তা যবের মতো। শীষে থাকা যবের সাথে শীষে থাকা গমের সাদৃশ্যের যোগসূত্র হলো উভয়টা মূল্যসম্পন্ন (مَال مُتَقَوَّم) ও উপকার লাভযোগ্য মাল। অতএব শীষসহ যব বিক্রি করা জায়েজ হলে শীষসহ গম বিক্রি করাও জায়েজ হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর পক্ষ থেকে খোসা ও শীষে উপকার নেই বলে যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ এ খোসা ও শীষের মধ্যেই গম ইত্যাদি জমা করে আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে নিরাপদ রাখেন। আর এটা নিঃসন্দেহে একটি উপকার। সুতরাং শীষসহ গম বিক্রি করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ تُرَابِ الصَّاغَةِ الخ : স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইকে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী নাজায়েজের কারণ হলো স্বর্ণকণাগুলো উপকার লাভযোগ্য নয় এমন জিনিস তথা ছাইয়ের মাঝে লুকায়িত থাকা। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং ছাইয়ের মাঝে কি পরিমাণ স্বর্ণকণা আছে তা জানা না থাকায় সুদের সম্ভাবনার কারণে সমজাতীয় স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইয়ের বিনিময়ে তার বিক্রয় জায়েজ নেই। তাই সুদের সম্ভাবনা যেখানে নেই অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে উদাহরণত স্বর্ণকণা মিশ্রিত ছাইকে রূপার কণা মিশ্রিত ছাইয়ের বিনিময়ে বিক্রি করা হলে তা জায়েজ। যদি চুক্তিকৃত পণ্য (مَعْقُوْد عَلَيْه) লুকায়িত থাকা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হতো তাহলে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ও না জায়েজ হতো। কিন্তু তা হচ্ছে না।

অতএব প্রমাণিত হলো যে, চুক্তিকৃত পণ্য লুকায়িত থাকা বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ নয়। এ বিষয়টিই যদি আলোচ্য মাসআলায় পাওয়া যায় অর্থাৎ শীষে থাকা গমকে সমজাতীয় গমের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় তাহলে তাও সুদের সম্ভাবনার

কারণে না জায়েজ হবে। কারণ, শীষের মাঝে কি পরিমাণ গম আছে তা জানা নেই। সে ক্ষেত্রে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হলে কমবেশি হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী ফিকহবিদদের কেউ কেউ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি পেশ করেন–

১. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। শীষের মাঝে আদৌ গম আছে কিনা, থাকলে কি পরিমাণ আছে তা অজ্ঞাত থাকায় এ ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই তা না জায়েজ হবে।

২. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يُفْرَكَ . (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ)

অর্থাৎ, নবী করীম ﷺ শীষ থেকে না ছাড়ানো পর্যন্ত শস্যদানা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। অতএব শীষে থাকা অবস্থায় গম বিক্রি করা জায়েজ নেই।

হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম প্রথম হাদীসের উত্তরে বলেন, উক্ত হাদীসটি মূলত উড়ন্ত পাখি বিক্রি করা, শিকার করার পূর্বে নদী বা ডোবার মাছ বিক্রি করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, বিক্রীতপণ্য নির্ধারিত এবং অর্পণযোগ্য না হলে তা ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু শীষে থাকা গম অর্পণযোগ্য এবং ইশারার মাধ্যমে নির্ধারিত। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইশারাকৃত বস্তুর পরিমাণ জানা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি নয়। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১]

দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য হলো, حَتّٰى يُفْرَكَ শব্দে হাদীসটি গরীব (غَرِيْب)। হযরত হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) ব্যতীত অন্য কোনো রাবীর রিওয়ায়াতে এ শব্দ নেই। এটাকে সঠিক মেনে নিলেও এর ব্যাখ্যা হলো, حَتّٰى يَصِيْرَ بِحَالٍ يَتَأَتّٰى فِيْهِ الْفَرْكُ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ শীষ থেকে ছাড়ানোর উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শস্যদানা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

মাসআলা : সুপারি, নারিকেল, বেল, আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি খোসা জাতীয় ফল খোসায় আবৃত্ত থাকা অবস্থায় বিক্রি করা জায়েজ। এরূপভাবে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাতকৃত টিনজাত খাবার, বিভিন্ন দ্রব্যের প্যাকেট, বোতলে ভরা পানীয়, ঔষধ ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েজ।

وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِى الْبَيْعِ مَفَاتِيْحُ أَغْلَاقِهَا ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيْهِ الْأَغْلَاقُ ، لِأَنَّهُ مُرَكَّبَةٌ فِيْهَا لِلْبَقَاءِ ، وَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ فِىْ بَيْعِ الْغَلَقِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ ، إِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِدُوْنِهِ -

অনুবাদ : কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে তাহলে তার তালার চাবিগুলো বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, তালা বাড়ির সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সংযুক্ত বিধায় তালা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তালার বিক্রয় চুক্তিতে উল্লেখ ছাড়াই চাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, চাবি তালার অংশ বিশেষ। কেননা, চাবি ছাড়া তালা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَغْلَاقٌ শব্দটি বহুবচন। অর্থ তালা। একবচন غَلَقٌ। মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করেছে। বাড়ির দরজার সাথে ফিটিং করা তালা আছে। তাহলে বিক্রয় চুক্তিতে তালা ও তার চাবি অন্তর্ভুক্ত হবে। তালা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ, তালা বাড়ির দরজার সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য সংযুক্ত। আর যা কোনো জিনিসের সাথে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য যুক্ত হয় তা ঐ জিনিসের অনুবর্তী হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই তালা বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর চাবি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ, চাবি ছাড়া তালা কোনো কাজে আসে না। চাবি তালারই একটি অংশের মতো। তাই শুধু তালা বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেমন চাবির উল্লেখ ছাড়াই চাবি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি এ সুরতেও তালার অংশ হিসেবে চাবি বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলা হলো দরজার কাঠ/ পাল্লার সাথে ফিটিং করা তালার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে তালা দরজার কাঠ/ পাল্লার সাথে ফিটিং করা নয় তা এবং তার চাবি বাড়ি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। -[বিনায়া, খ. ৭, পৃ. ৬৯]

قَالَ : وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا الْكَيْلُ فَلَابُدَّ مِنْهُ لِلتَّسْلِيْمِ ، وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَمَعْنٰى هٰذَا إِذَا بِيْعَ مُكَايَلَةً، وَكَذَا أُجْرَةُ الْوَزَّانِ وَالذَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ ، وَأَمَّا النَّقْدُ فَالْمَذْكُوْرُ رِوَايَةُ إِبْنِ رُسْتُمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) ، لِأَنَّ النَّقْدَ يَكُوْنُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ يَكُوْنُ بَعْدَ الْوَزْنِ ، وَالْبَائِعُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيُمَيِّزَ مَا تَعَلَّقَ بِهٖ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِهٖ ، أَوْ لِيَعْرِفَ الْمَعِيْبَ لِيَرُدَّهُ ، وَفِيْ رِوَايَةِ إِبْنِ سِمَاعَةَ عَنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِيْ ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلٰى تَسْلِيْمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدَّرِ ، وَالْجَوْدَةُ تُعْرَفُ بِالنَّقْدِ كَمَا يُعْرَفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ قَالَ : وَأُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِيْ ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلٰى تَسْلِيْمِ الثَّمَنِ ، وَبِالْوَزْنِ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيْمُ .

অনুবাদ : পাত্র দ্বারা পণ্য পরিমাপকারী ও মূল্য মুদ্রা পরখকারীর মজুরি বিক্রেতার দায়িত্বে। পরিমাপকারীর বিষয়টি এ জন্য যে, [ক্রেতার কাছে] সোপর্দ করার জন্য পরিমাপ করা জরুরি। আর সোপর্দ করার দায়িত্ব বিক্রেতার। এর অর্থ হলো, বিক্রীত দ্রব্য যদি পাত্রের পরিমাপে বিক্রি করা হয়। পণ্য দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকারী, গজে পরিমাপকারী এবং গণনাকারীর মজুরিরও তদ্রূপ হুকুম। মূল্য মুদ্রা পরখকারীর মজুরি বিষয়ে উপরোক্ত বক্তব্যটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনে রুস্তমের বর্ণনা। কারণ, পরখ করার বিষয়টি হয় অর্পণের পর। তুমি কি দেখ না যে, ওজন করার পর মুদ্রা পরখ করা হয়। আর বিক্রেতাই এর প্রতি মুখাপেক্ষী, যাতে সে যে মুদ্রার সাথে তার হক জড়িত তাকে অন্য মুদ্রা থেকে পৃথক করতে পারে কিংবা ত্রুটিযুক্ত মুদ্রাগুলোকে ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করতে পারে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে ইবনে সিমাআর বর্ণনা অনুসারে [মুদ্রা পরখকারীর মজুরি] ক্রেতার জিম্মায়। কারণ, ক্রেতা নির্ধারিত উৎকৃষ্ট মুদ্রাগুলো অর্পণ করার মুখাপেক্ষী। আর উৎকৃষ্টতা বুঝা যায় পরখ করার দ্বারা যেমন পরিমাণ জানা যায় দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার দ্বারা। অতএব মুদ্রা পরখ করার মজুরি ক্রেতার জিম্মায় হবে। ইমাম (র.) কুদূরী বলেন, মূল্যমুদ্রা ওজনকারীর মজুরি ক্রেতার জিম্মায়। কারণ, আমরা বলেছি যে, ক্রেতাই মূল্য মুদ্রা অর্পণ করার মুখাপেক্ষী। আর অর্পণ হয় ওজনের মাধ্যমে। [সুতরাং ওজনের মজুরি তার উপর বর্তাবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, পণ্য বিক্রয়ে বিভিন্ন পরিমাপ আছে– ১. (كَيْل) পাত্রের পরিমাপ। ২. (وَزْن) দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ। ৩. (ذِرَاعٌ) গজের পরিমাপ। ৪. (عَدَدٌ) গণনার পরিমাপ।

সুরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে মেপে দেওয়ার খরচ বিক্রেতার জিম্মায়। কায়ল পরিমাপে বিক্রি করলে কয়ালের মজুরি বিক্রেতা বহন করবে। তদ্রূপ দাঁড়িপাল্লায় মেপে বিক্রি করলে দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকারীর

মজুরি, এমনিভাবে গজে মাপে বিক্রি করলে গজে পরিমাপকারীর মজুরি এবং গণনা করে বিক্রি করলে গণনাকারীর মজুরি বিক্রেতা বহন করবে। দলিল হলো, ক্রেতার নিকট বিক্রীত পণ্য সোপর্দ করতে গেলে তার পরিমাপ করা জরুরি। আর বিক্রীত পণ্য সোপর্দ করা বিক্রেতার উপর আবশ্যক। তাই তার ব্যয়ভারও তার উপর আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا النَّقْدُ فَالْمَذْكُورُ رِوَايَةُ ابْنِ رُسْتُمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الخ : نَقْد মানে পরখ করা। পূর্ব যুগে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। এ সব মুদ্রার মাঝে ভাল (اَلْجَيِّدُ), খারাপ (اَلرَّدِيُّ), মধ্যম (اَلْأَوْسَطُ) বিভিন্ন রকমের ছিল। মূল্য মুদ্রার পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত ওজন করে মুদ্রা অর্পণ (تَسْلِيْم) করা হতো। এ সব মুদ্রা বিক্রেতার কাছে আসলে তার প্রকার পরখ করে নিতে হতো। অনেক ক্ষেত্রে পরখ করার জন্য আলাদা লোক রাখা হতো। বর্তমান যুগে কাগজি নোটের পরিমাণ বেশি হলেও তা যাচাই করার জন্য আলাদা লোকের প্রয়োজন হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এ মুদ্রা পরখকারীর মজুরি কার জিম্মায়? ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে রুস্তম (র.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য মুদ্রা (ثَمَنْ) পরখকারীর মজুরি বিক্রেতার জিম্মায়। আর ইবনে সিমাআ (র.)-এর বর্ননা অনুযায়ী ক্রেতার জিম্মায়।

ইবনে রুস্তম (র.)-এর বর্ণনার যৌক্তিকতা হলো, মূল্য মুদ্রা (ثَمَنْ) ক্রেতার পক্ষ থেকে ওজন করে বিক্রেতার কাছে অর্পণের (تَسْلِيْم) পর তা পরখ করা হয়। আর তা হয় বিক্রেতার প্রয়োজনেই। কারণ, তার প্রাপ্য মুদ্রার চেয়ে বেশি এসে গেলে তার প্রাপ্যকে আলাদা করা এবং অতিরিক্ত মুদ্রাগুলো ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া তার কর্তব্য। তাছাড়া তার প্রাপ্য উৎকৃষ্ট (اَلْجَيِّدُ) মুদ্রার স্থলে নিম্নমানের (اَلرَّدِيُّ) মুদ্রা এসে গেলে তা ফেরত দেওয়ার জন্য চিহ্নিত করা কিংবা প্রাপ্য মুদ্রার চেয়ে কম হলে ক্রেতার কাছে অবশিষ্টগুলো দাবি করার জন্য মুদ্রাগুলো পরখ করা তার প্রয়োজন। অতএব এর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে।

ইবনে সামাআ (র.)-এর বর্ণনার যৌক্তিকতা হলো, ক্রেতা-বিক্রেতার চুক্তিতে নির্ধারিত উৎকৃষ্ট মুদ্রা বিক্রেতাকে অর্পণ করতে ক্রেতা মুখাপেক্ষী। আর উৎকৃষ্টতা বুঝা যায় পরখ করার দ্বারা। সুতরাং পরখ করার ব্যয়ভার তার উপরই বর্তাবে। যেমন ওজন করার ব্যয়ভার তার উপর বর্তায়। ওজন দ্বারা মুদ্রার পরিমাণ জানা যায়। আর পরখ দ্বারা মুদ্রার প্রকার জানা যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা ক্রেতা বিক্রেতাকে অর্পণ করতে বাধ্য বিধায় ওজনের মজুরি যেরূপ ক্রেতার জিম্মায়, তেমনি উৎকৃষ্ট মুদ্রা অর্পণ করতে বাধ্য বিধায় পরখের মজুরিও ক্রেতার জিম্মায় হবে।

পূর্বযুগে মূল্য মুদ্রার পরিমাণ বেশি হলে সাধারণত মেপে তা পরিশোধ করা হতো। যেহেতু বিক্রেতাকে মুদ্রা পরিশোধ করতে ক্রেতা মুখাপেক্ষী, আর নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা পরিশোধ হলো কিনা তা জানা যায় ওজন দ্বারা তাই ওজনের মজুরি ক্রেতার উপর বর্তাবে। এরূপভাবে মূল্য মুদ্রা না হয়ে যদি দ্রব্য হয়, আর তা মেপে পরিশোধ করার প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রেও পরিমাপকারীর মজুরি ক্রেতার উপর বর্তাবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي إِدْفَعِ الثَّمَنَ أَوَّلًا ، لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ ، فَيُقَدَّمُ دَفْعُ الثَّمَنِ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ ، لِمَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ ، قَالَ : وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قِيلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا ، لِإِسْتِوَائِهِمَا فِي التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, "কেউ যদি মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে, তুমি প্রথমে মূল্যমুদ্রা অর্পণ কর।" কেননা, [বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হতেই] বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার হক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তাই সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে [মুদ্রা] হস্তগত করার মাধ্যমে বিক্রেতার হক নির্দিষ্ট করার জন্য প্রথমে মূল্যমুদ্রা অর্পণ করা হবে। কারণ, মুদ্রা [হস্তগত করা ছাড়া] নির্দিষ্ট করা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর কেউ যদি দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি করে কিংবা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করে তাহলে উভয়কে বলা হবে, তোমরা দু'জন এক সাথে [বিক্রিত মুদ্রা ও মূল্য] অর্পণ কর। কারণ, নির্দিষ্ট হওয়া/না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি সমান। সুতরাং দু'টোর কোনো একটিকে আগে অর্পণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো اَلسِّلْعَةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ وَالثَّمَنُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ অর্থাৎ ইশারায় বা মৌখিক উল্লেখের দ্বারা কিংবা মেপে আলাদা করার মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী নির্দিষ্ট করা হলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলে হাতে না আসা পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট হয় না। যেমন কেউ গমের স্তূপ দেখিয়ে বলল, আমি এ স্তূপ থেকে এক মণ গম দু'শ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। বিক্রেতা সম্মত হলো। বিক্রেতা ঐ স্তূপ থেকে এক মণ গম মেপে ক্রেতার জন্য আলাদা করল। এতে ঐ গমে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ যদি হাতের একশ' টাকার নোট দেখিয়ে বিক্রেতাকে বলে, আমি এই একশ' টাকার বিনিময়ে তোমার থেকে এক মণ আলু ক্রয় করলাম, আর বিক্রেতা তাতে সম্মত হয় তাহলে ঐ একশ' টাকাতে বিক্রেতার মালিকানা স্বীকৃত বা নিশ্চিত হয়নি এবং ক্রেতার উপর বিনিময়মূল্য হিসেবে একশ' টাকার ঐ নোটটি বিক্রেতাকে দেওয়া আবশ্যক নয়। একশ' টাকা দেওয়া আবশ্যক, তবে তা ক্ষুদ্র বিভিন্ন নোটের সমন্বয়ে হলেও চলবে।

উপরোক্ত ইবারতের মাসআলা হলো, মুদ্রার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা হলে, যেমন এক ব্যক্তি পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে এক মণ চাউল বিক্রি করল, তাহলে বিক্রীত পণ্য ও বিনিময় মুদ্রার কোনটা প্রথমে অর্পণ (تَسْلِيْم) করা হবে? ইমাম কুদূরীর ভাষ্য মতে প্রথমে বিনিময় মুদ্রা অর্পণ করতে হবে। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে এ বিষয়ে তর্ক বাঁধে তাহলে ফয়সালা যাবে বিক্রেতার পক্ষে, আর ক্রেতাকে বলা হবে, তুমি প্রথমে বিনিময় মুদ্রা অর্পণ কর।

দলিল হলো, যেহেতু দ্রব্যসামগ্রী নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তাই বিক্রেতা যখন বিক্রীত দ্রব্য মেপে আলাদা করেছে কিংবা ইশারায় দেখিয়েছে তখন বিক্রীত দ্রব্যে ক্রেতার হক নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বিক্রেতার হক তখনও স্বীকৃত বা নির্দিষ্ট হয়নি। বিক্রেতার হক নির্দিষ্ট করার জন্য বিনিময় মুদ্রা তার হস্তগত হওয়া জরুরি। তাই সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রেতা প্রথমে বিনিময় মুদ্রা অর্পণ করবে।

ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত এটি। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বিক্রেতাকে প্রথমে বিক্রীত পণ্য অর্পণে বাধ্য করা হবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও অভিমত।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ الخ : বিক্রীত পণ্য ও বিক্রয়মূল্য (مَبِيْع وَثَمَن) উভয়টিই যদি দ্রব্য হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে অর্পণের আগেই ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের হক নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর উভয়টি যদি মুদ্রা হয় তাহলে অর্পণের আগে কারো হক নির্দিষ্ট হয় না। হক নির্দিষ্ট হওয়া/না হওয়ার হিসেবে যখন উভয়ে সমান তখন কোনো একজনকে আগে অর্পণে বাধ্য করা যাবে না। বরং সমতা রক্ষা করার জন্য উভয়কে বলা হবে, তোমরা বিক্রীত পণ্য ও বিক্রয় মূল্য এক সাথে অর্পণ কর।

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

পরিচ্ছেদ : শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার

خِيَارٌ অর্থ এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। شَرْطٌ অর্থ শর্ত, দফা। خِيَارٌ শব্দটি شَرْط -এর দিকে ইযাফত (إِضَافَة) হয়েছে। মূলত: এ ইযাফত إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى سَبَبِهِ। خِيَارُ شَرْطٍ অর্থ হচ্ছে خِيَارٌ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার।

মানুষের প্রয়োজনে মানুষ লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় ক্রয়-বিক্রয়ে মানুষ প্রতারিত হয়, ধোঁকা খায়. চিন্তার অবকাশ না থাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্তে ভুল হয়, ফলে তাকে অনুতপ্ত ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হয়, অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের এ সব সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে শরিয়ত খেয়ারে শর্তের বিধান দিয়েছে। মানুষের সমস্যা লাঘবই এ বিধান দানের উদ্দেশ্য। ক্রয়-বিক্রয়ে এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়কালে ইজাব বা কবুলের মাঝে বলে নিবে, "আমি তিনদিনের খেয়ারে শর্তে এ দ্রব্যটি ক্রয় বা বিক্রয় করলাম।" এভাবে বলে নিলে সে তিনদিন পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাবে। এ তিনদিনে সে ধীরস্থিরভাবে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, কৃত বিক্রয় চুক্তি স্থির রাখবে, না তা ভেঙ্গে দিবে। যদি কৃত চুক্তি স্থির রাখার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এ সিদ্ধান্তের কথা অপরপক্ষকে তিনদিনের ভিতরে জানানো জরুরি নয়। তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। কিন্তু ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিন দিনের ভিতরে অপর পক্ষকে তা জানাতে হবে এবং আনুসঙ্গিক হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ সে যদি বিক্রেতা হয়ে থাকে আর বিক্রয় দ্রব্য বাবদ ক্রেতা থেকে বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা ফেরত দিবে। আর যদি ক্রেতা হয়ে থাকে তাহলে বিক্রেতাকে বিক্রয় মূল্য দিয়ে থাকলে তা তুলে নিবে এবং বিক্রয় পণ্য হস্তগত করে থাকলে তা ফেরত দিবে।

ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার সাত প্রকার। যথা–

১. خِيَارُ الشَّرْطِ শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার।

২. خِيَارُ الرُّؤْيَةِ দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ার।

৩. خِيَارُ الْعَيْبِ দোষের কারণে প্রাপ্ত ইখতিয়ার।

৪. خِيَارُ التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার।

৫. خِيَار نَقْد নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করার ইখতিয়ার।

৬. خِيَار قَبُوْل গ্রহণ করার ইখতিয়ার।

৭. خِيَارُ الْمَجْلِسِ দরাদরির মজলিস চলাকালীন ইখতিয়ার। আল্লামা আইনী (র.) প্রথমোক্ত চার প্রকারের উল্লেখ করেছেন।
–[বিনায়া, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪]

হানাফীদের কাছে খেয়ারে মজলিস স্বীকৃত নয়, তবে খেয়ারে নকদ স্বীকৃত। আইম্মায়ে ছালাছার মাযহাবে খেয়ারে মজলিস স্বীকৃত, কিন্তু খেয়ারে নকদ স্বীকৃত নয়।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ে পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধকতা (اَلْمَوَانِعُ) আছে। যথা–

১. مَانِعٌ يَمْنَعُ اِنْعِقَادُ الْعِلَّةِ যে প্রতিবন্ধকতা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে বাধা দেয়। যেমন বিক্রয় পণ্য স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করা। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য বিক্রীত বস্তু পণ্য হওয়া জরুরি। আর স্বাধীন মানুষ পণ্য নয়। তাই এ ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিই শুদ্ধ বা সম্পন্ন হয় না।

২. مَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْعِلَّةِ যে প্রতিবন্ধকতা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়াকে বাধা দেয় না, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়াকে বাধা দেয়। যেমন, অন্যের মাল অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা। এ ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু মালিকের অনুমতির উপর তার পরিপূর্ণতা স্থগিত থাকে।

৩. مَانِعٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْحُكْمِ بَعْدَ اِنْعِقَادِ الْعِلَّةِ প্রতিবন্ধকতা বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রাথমিক হুকুম সাব্যস্ত হতে বাধা দেয়। যেমন খেয়ারে শর্ত। খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোনো জিনিস বিক্রি করলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়, কিন্তু বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম ধাপ হলো বিক্রীত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর খেয়ারে শর্ত তা নিষেধ করে।

৪. مَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوْتِهِ যে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয় চুক্তির হুকুম সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তার পূর্ণতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন খেয়ারে রুয়ত (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ)। ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত থাকলে বিক্রীত পণ্যে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ হয় না।

৫. مَانِعٌ يَمْنَعُ لُزُوْمَ الْحُكْمِ যে প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও বিক্রয় চুক্তির হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক হয় না। যেমন খেয়ারে আইব (خِيَارِ عَيْبٍ)। ক্রেতার খেয়ারে আইব থাকলে বিক্রীত পণ্যে তার মালিকানা বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় না। সে ইচ্ছা করলে তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

–[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬]

খেয়ারে শর্ত যেহেতু প্রাথমিক হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকেই বাধা দেয় তাই গ্রন্থকার (র.) প্রথমে এর আলোচনা করেছেন। কারণ, যা প্রাথমিক হুকুমের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট তার ধারাবাহিকতা প্রথমে। আর খেয়ারে শর্তকে ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এনেছেন। কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হুকুমের হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় প্রথমত দুপ্রকার। এক. লাযেম (لَازِمٌ) দুই. গায়রে লাযেম (غَيْرُ لَازِمٍ)। যে ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার নেই তা লাযেম। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার আছে তা গায়রে লাযেম। লাযেম যেহেতু গায়রে লাযেম অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই প্রথমে লাযেমের আলোচনা করেছেন। এরপর আলোচ্য পরিচ্ছেদ থেকে গায়রে লাযেমের আলোচনা শুরু করেছেন।

خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى ، وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِىَ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِىَّ (رض) كَانَ يُغْبَنُ فِى الْبِيَاعَاتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِىَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِىْ رحـ ، وَقَالَا : يَجُوْزُ إِذَا سُمِّىَ مُدَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّرَوِّىْ لِيَنْدَفِعَ الْغَبْنُ ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى الْأَكْثَرِ ، فَصَارَ كَالتَّأْجِيلِ فِى الثَّمَنِ .

অনুবাদ : ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খেয়ারে শর্ত [শর্তারোপ করে ইচ্ছাধিকার রাখা] ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ। তাদের খেয়ার [এর মেয়াদ] থাকবে তিন দিন বা তার চেয়ে কম। এ বিষয়ের দলিল হলো এই মর্মে বর্ণিত হাদীস যে, হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আল আনসারী (রা.) বেচাকেনায় ঠকে যেতেন। তাই নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, 'যখন তুমি বেচাকেনা কর তখন তুমি বলে নিও যে, কোনো ঠকবাজি নয়; আমার তিনদিনের খেয়ার [ইচ্ছাধিকার] থাকবে।' ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে তিনদিনের অধিক [মেয়াদে] খেয়ারে শর্ত [ইচ্ছাধিকারের শর্তারোপ করা] জায়েজ নেই। এটাই ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, [তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য] খেয়ারে শর্ত জায়েজ; যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য করে। দলিল হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস। তিনি দু'মাসের মেয়াদে খেয়ারে শর্তের অনুমতি দিয়েছেন। তাছাড়া খেয়ারে শর্ত শরিয়ত বৈধ করেছে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে, যাতে প্রতারণা রোধ হয়। আর [এর জন্য] কখনও কখনও [তিন দিনের] অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এটা বিক্রয় মূল্য পরিশোধের মেয়াদ ধার্যের মতো হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِىْ : ফুকাহায়ে কেরাম ও উলামায়ে ইসলামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ক্রমে খিয়ারে শর্ত জায়েজ। [বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪] তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েয কিনা এ ব্যাপারে তাবেয়ীদের কারো কারো ভিন্নমত পাওয়া যায়। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরুমা (র.) বলেন, খেয়ারে শর্ত শুধু ক্রেতার জন্য জায়েয। বিক্রেতার জন্য জায়েজ নেই। [প্রাগুক্ত] জমহুরের মতে খিয়ারে শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ। দু'জনের একসাথেও জায়েজ, পৃথকভাবেও জায়েজ। ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের ভিন্ন অন্য কারো জন্য খিয়ারের শর্তারোপ করতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অবশ্য জমহুরের মাঝে মতবিরোধ আছে। এ সম্পর্কিত আলোচনা পরে আসছে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী ও ইবনে শুবরুমা (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারের শর্তারোপ করা কিয়াস বিরোধী। হাদীসের কারণে তা জায়েজ রাখা হয়েছে। তাই তা হাদীসে উল্লিখিত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর হাদীসে শুধু ক্রেতার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দলিল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন–

إِنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبِيَاعَاتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ -

হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আল আনসারী (রা.) বেচাকেনায় ঠকে যেতেন। তাই নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, যখন তুমি কেনাবেচা কর তখন বলে নিও যে, কোনো প্রতারণা নেই, আমার তিন দিনের খেয়ার থাকবে।

এ হাদীসটিই খেয়ারে শর্ত জায়েজ হওয়ার মূল দলিল। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হাদীসের শব্দ থেকেই বুঝা যায় খেয়ারে শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ। হাদীসের শব্দ হলো إِذَا بَايَعْتَ الخ

উল্লেখ্য যে, بَايَعْتَ বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর ক্রিয়ারূপ। বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো مُشَارَكَةٌ। সেই হিসেবে শব্দটি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ঠকে যাওয়া থেকে বাঁচার উপায় বের করার সুবিধার্থে খেয়ারে শর্ত বৈধ করা হয়। আর এ বিষয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সমান। তাই উভয়ের জন্য খেয়ারে শর্ত জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাটি সাহাবী হাব্বানের, না তাঁর পিতা হযরত মুনকিয এ সম্পর্কে রিওয়ায়াত দু'ধরনের হলেও দীর্ঘ আলোচনার পর হাফেজ আইনী প্রমাণ করেছেন যে, ঘটনাটি হযরত হাব্বানের। -[প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.) লিখেছেন, শব্দের কিছুটা পরিবর্তনসহ বর্ণিত হাদীসটি আইম্মায়ে আরবা'আ তাদের সুনানে সংকলন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) তাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। মুসতাদরাকে হাকিমে এ হাদীসটিই আরেকটু বিস্তারিত আছে,

كَانَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا وَكَانَ قَدْ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَكَانَ قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْ وَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ يَشْتَرِي وَيَجِيءُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ إِنَّ هٰذَا غَالٍ، فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي -

এ রিওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত হাব্বান (রা.)-কে ক্রয়কালেও খেয়ারের শর্তারোপ করার কথা বলেছেন এবং বিক্রয়কালেও। সুতরাং খেয়ারে শর্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য জায়েজ।

-[আদ-দিরায়া ফী তাখরীজিল হিদায়া]

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الخ : হযরত ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতানুসারে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিনদিন। তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্ত করা জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খেয়ারের শর্তারোপকারী যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে তবে তা যত দিনই হোক না কেন জায়েজ আছে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এরও মতামত। তবে কেউ যদি সর্বদার জন্য খেয়ারের শর্ত করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে তা জায়েজ নেই।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, খেয়ারে শর্তের সময়সীমা প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। আর দ্রব্যের বিভিন্নতার কারণে প্রয়োজনও বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যদি কাঁচা দ্রব্য যা সাধারণতঃ এক দিনের বেশি ভাল থাকে না, যেমন ফলমূল, সে ক্ষেত্রে এক দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ হবে না। আর যদি দ্রব্য এরূপ হয় যে, তিন দিনের ভিতর তার সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ হবে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল :

নকলী দালিল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে- أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ

অর্থাৎ তিনি দু'মাস পর্যন্ত খেয়ারে শর্তকে জায়েজ রেখেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খেয়ারের শর্তারোপ করা জায়েজ আছে।

আকলী দলিল : শরিয়ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে খেয়ারে শর্ত বৈধ করেছে, যাতে মানুষ ঠকা থেকে বাঁচতে পারে। আর এর জন্য কখনও কখনও তিন দিনের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই তিন দিনের অধিক সময়ের সুযোগ থাকবে। এটা বাকি মূল্য পরিশোধের মেয়াদ ধার্যের মতো। বাকি মূল্য পরিশোধের জন্য তিন দিন বা তার অধিক যতদিন প্রয়োজন হয়, ততদিন সময় ধার্য করা জায়েজ। তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা-বিক্রেতার চিন্তা-ভাবনার জন্য যতদিন প্রয়োজন হয় পারস্পরিক সম্মতিতে ততদিন সময়সীমা ধার্য করা জায়েজ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল [নকলী দলিল] :

১. পূর্বোক্ত হাদীসে হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয (রা.)-কে হুজুর ﷺ তিন দিনের খেয়ারে শর্তের কথা বলেছেন। খেয়ারের শর্তারোপ করা বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক দাবির পরিপন্থি। বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক দাবি হলো, বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বিক্রীত দ্রব্যের, আর বিক্রেতা বিনিময় মূল্যের মালিক বনে যাবে। বিক্রেতাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রীত পণ্যের দখল ছেড়ে দিতে, আর ক্রেতাকে অবশ্যই বিক্রীত দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে এবং বিক্রেতাকে বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে হবে। বিক্রয় চুক্তিতে খিয়ারের শর্ত করা হলে ক্রেতা যেহেতু বিক্রীত পণ্যের মালিক হয় না এবং তার উপর বিক্রয় মূল্য প্রদানও আবশ্যক হয় না তাই তা বিক্রয় চুক্তির পরিপন্থি। এতদসত্ত্বেও কিয়াস বহির্ভূতভাবে আমরা উক্ত হাদীসের কারণে খেয়ারে শর্ত জায়েজ রেখেছি। আর কায়দা আছে, কোনো নস [কুরআনের আয়াত, হাদীস] কিয়াস বহির্ভূত হলে তার হুকুম নসের প্রসঙ্গ ও ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। আলোচ্য হাদীসে তিন দিনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিতে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিন হবে। এর বেশি জায়েজ হবে না।

২. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত,

إِنَّ رَجُلًا اِشْتَرٰى مِنْ رَجُلٍ بَعِيْرًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْخِيَارَ اَرْبَعَةً فَاَبْطَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَلْخِيَارُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ -

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি থেকে একটি উট ক্রয় করে এবং চার দিনের খেয়ারের শর্তারোপ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বাতিল করে দেন এবং বলেন, খেয়ারের সময়সীমা তিন দিন।-[দিরায়া : ইবনে হাজর আসকলানী]

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিন।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হিসেবে পেশকৃত হাদীসটিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে হাদীসটির সম্বন্ধ সঠিক নয়। সাহেবে হিদায়ার মতেও হাদীসটি মারফূ' (مَرْفُوْعٌ) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম বা বাণী নয়। বরং হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর নিজস্ব আমল। ইমাম আতাবী (র.) বলেন, সঠিক উত্তর হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) একবার এক মাসের খেয়ারে শর্তে একটি বাঁদী বিক্রি করেন। আর যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান সে বিষয়ে সাহাবীর কর্ম অগ্রগণ্য হতে পারে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে হাদীসটির সম্বন্ধ সঠিক মেনে নেওয়া হলেও হযরত হাব্বানের হাদীসটি মাশহুর। আর আলোচ্য হাদীসটি গরীব। গরীব হাদীসের তুলনায় মাশহুর হাদীস অগ্রগণ্য। এছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে খেয়ারে শর্তের কথা উল্লেখ নেই। খেয়ারে রুয়তও (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) হতে পারে। বরং তা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, অন্যত্র খেয়ারে রুয়তের সময়সীমা দু'মাস পর্যন্ত থাকার কথা উল্লিখিত হয়েছে। -[কেফায়া, হেদায়ার টীকা]

আল্লামা কাকী (র.) বলেন, সাহেবাইনের মতের পক্ষে মূল দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ "মুসলমানগণ তাদের পারস্পরিক শর্ত রক্ষা করবে।"- [তিরমিযী] আর খেয়ারে শর্তও একটি শর্ত। অতএব পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যতদিন ইচ্ছা খেয়ারে শর্তের সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

وَلِأَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَهُوَ اللُّزُوْمُ وَإِنَّمَا جَوَّزْنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ بِمَا رَوَيْنَا مِنَ النَّصِّ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْهِ وَانْتَفَتِ الزِّيَادَةُ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ فِي الثَّلْثِ جَازَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لِزُفَرَ. وَهُوَ يَقُوْلُ : إِنَّهُ انْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَعُوْدُ جَائِزًا، كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّقْمِ وَأَعْلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَتَّصِلِ الْمُفْسِدُ بِالْعَقْدِ وَلِهٰذَا قِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِمَضْيِ جُزْءٍ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثُمَّ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ بِحَذْفِ الشَّرْطِ، وَهٰذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, খেয়ারে শর্ত [শর্তারোপ করে ইচ্ছাধিকার রাখা] বিক্রয় চুক্তির চাহিদা বিরোধী। বিক্রয় চুক্তির চাহিদা হলো, [বিক্রীত দ্রব্যে ক্রেতার আর বিনিময় মূল্যে বিক্রেতার মালিকানা] আবশ্যক হওয়া। আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীসের কারণে আমরা কিয়াসের বিপরীত তা জায়েজ রেখেছি। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত সময়সীমাতে তা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং [তাতে] বর্ধিতকরণ নিষিদ্ধ হবে। তবে অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপকারী যদি তৃতীয় দিনের ভিতরেই অনুমোদন দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ রূপে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং তা জায়েজরূপে প্রত্যাবর্তিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপকারী ফাসিদকারী বিষয়টিকে স্থির হওয়ার পূর্বেই রহিত করে দিয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হয়ে যাবে। যেমন কেউ মূল্যের সংকেত দেখিয়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করল, এরপর মজলিসে থাকা অবস্থাতেই সংকেতের পরিমাণ তাকে জানিয়ে দিল। তাছাড়া ফাসাদ সাব্যস্ত হয় চতুর্থ দিনের হিসাবে। যখন এর আগেই খেয়ারের শর্তারোপকারী অনুমোদন দিয়ে দিল তখন ফাসিদকারী বিষয়টি বিক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত হলো না। এ কারণেই বলা হয় যে, [অধিক মেয়াদে খেয়ারের শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে] বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে। কারো মতে চুক্তিটি ফাসিদরূপেই সংঘটিত হয়, এরপর [অধিক মেয়াদের] শর্ত রহিত করার দ্বারা ফাসাদ দূর হয়ে যায়। এই শেষোক্ত মতটি প্রথমোক্ত দলিলের উপর নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الخ : যদি কেউ বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করে, কিন্তু পরে তিন দিনের ভিতরেই অনুমোদন দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে সেই বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, তিন দিনের অধিক

সময়সীমা নির্ধারণ করার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছে। আর যে চুক্তি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয় তা পুনরায় জায়েজ হবে না। শরিয়তে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন,

১. এক ব্যক্তি দু'দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করল। সুদ হওয়ায় এ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। এরপর অতিরিক্ত দিরহামটি রহিত করে দিলেও এ বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হয় না।
২. এক ব্যক্তির চারজন স্ত্রী আছে। এমতাবস্থায় সে আরেকজন মহিলাকে বিবাহ করল। এক সাথে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা যায় না, বিধায় এ বিবাহচুক্তি ফাসিদ। এখন চতুর্থ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেও তার উক্ত বিবাহ জায়েজ হবে না।
৩. এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম ও এক সের মদের বিনিময়ে একটি গাড়ি ক্রয় করল। মুসলমানের জন্য মদের লেনদেন হারাম বিধায় এ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। এখন যদি বিক্রয়মূল্য থেকে মদকে বাদ দিয়ে দেয় তাহলেও উক্ত বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে না। অতএব তিনদিনের অধিক সময়সীমা ধার্য করার কারণে যে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়েছে, অতিরিক্ত সময় বাদ দিয়ে দিলেও তা পুনরায় জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর দলিল :

আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, কেউ যদি খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করে তাহলে এ বিক্রয়চুক্তির হুকুম সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে উক্তি করেছেন তার ব্যাখ্যা নিয়ে মাশায়েখে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। ইরাকের হানাফী মাশায়েখের মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ রূপে সংঘটিত হবে। কিন্তু তিন দিনের ভিতরে অনুমোদন দিয়ে দিলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর খোরসানের হানাফী মাশায়েখের মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয় চুক্তিটি মওকুফ থাকবে। যখন চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হবে তখন তা ফাসিদ হবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)-এর সমর্থন এদিকে।

প্রথমোক্ত বক্তব্য হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যে বিষয়টি আলোচ্য বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করেছে তা হলো চতুর্থ দিনের শর্তারোপ করা। খেয়ারের শর্তারোপকারী যখন তা সুদৃঢ় হওয়ার আগেই অর্থাৎ চতুর্থ দিন আসার আগেই তা রহিত করে দিল তখন ফাসাদ উঠে গেল। তাই বিক্রয় চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। এর উপমা হলো : এক ব্যক্তি দ্রব্যের গায়ে লেখা দামের বিনিময়ে একটি দ্রব্য বিক্রি করল। গায়ের লেখাটি একটি বিশেষ সংকেত। এ সংকেত দেখে বিক্রেতা দামের অংক বুঝতে পারে। কিন্তু এ সংকেতের অর্থ ক্রেতা বুঝে না। ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সংকেত দেওয়ার প্রচলন আছে। যেহেতু ক্রেতা এ সংকেতের অর্থ জানে না তাই বিক্রয় মূল্য তার কাছে অজ্ঞাত। আর বিক্রয় মূল্য অজ্ঞাত থাকলে ঐ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। কিন্তু মজলিসে থাকা অবস্থাতেই যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে সংকেতের অর্থ জানিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হয়ে যায়।

আর শেষোক্ত বক্তব্য হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, খেয়ারের শর্তারোপ করা বিক্রয় চুক্তিকে ফাসেদ করে না। ফাসিদকারী হলো তিন দিনের সাথে চতুর্থ দিনকে যুক্ত করা। যখন চতুর্থ দিন আসার আগেই অনুমোদন দিয়ে দিল তখন ফ্যাসাদকারী বিষয়টি বিক্রয় চুক্তির সাথে যুক্ত হলো না। অতএব বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হলো না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِمَضِيْ جُزْءٍ مِنَ الْيَوْمِ الخ : এ বাক্যে সাহেবে হিদায়া খোরাসানের মাশায়েখের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করলে বিক্রয় চুক্তি মওকুফ থাকবে। চতুর্থ দিনের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে বিক্রয় চুক্তিটি ফাসিদ হবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثُمَّ الخ : এ বাক্যে সাহেবে হিদায়া ইরাকের মাশায়েখের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট খেয়ারে শর্তের সময়সীমা তিন দিনের অধিক নির্ধারণ করলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। তবে চতুর্থ দিনের আগে অনুমোদন দিয়ে দিলে তা জায়েজ হয়ে যাবে। এ বক্তব্যটি প্রথমোক্ত দলিলের উপর নির্ভরশীল। وَهٰذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ -এর এটাই অর্থ।

وَلَوِ اشْتَرٰى عَلٰى أَنَّهٗ إِنْ لَمْ يَنْقُدِ الثَّمَنَ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ، وَإِلٰى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يَجُوْزُ إِلٰى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ نَقَدَ فِى الثَّلَاثِ جَازَ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، وَالْأَصْلُ فِيْهِ أَنَّ هٰذَا فِىْ مَعْنٰى إِشْتِرَاطِ الْخِيَارِ، إِذِ الْحَاجَةُ مَسَّتْ إِلَى الْإِنْفِسَاخِ عِنْدَ عَدَمِ النَّقْدِ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُمَاطَلَةِ فِى الْفَسْخِ فَيَكُوْنُ مُلْحَقًا بِهٖ وَقَدْ مَرَّ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) عَلٰى أَصْلِهٖ فِى الْمُلْحَقِ بِهٖ وَنَفَى الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَكَذَا مُحَمَّدٌ (رحـ) فِىْ تَجْوِيْزِ الزِّيَادَةِ وَأَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) أَخَذَ فِى الْأَصْلِ بِالْأَثَرِ، وَفِىْ هٰذَا بِالْقِيَاسِ، وَفِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ قِيَاسٌ اٰخَرُ، وَإِلَيْهِ مَالَ زُفَرُ، وَهُوَ أَنَّهٗ بَيْعٌ شُرِطَ فِيْهِ إِقَالَةٌ فَاسِدَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِالشَّرْطِ، وَإِشْتِرَاطُ الصَّحِيْحِ مِنْهَا فِيْهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فَإِشْتِرَاطُ الْفَاسِدِ أَوْلٰى، وَ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ مَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : কেউ যদি [কোনো দ্রব্য] এই শর্তে ক্রয় করে যে, যদি তিন দিনের ভিতরে সে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে উভয়ের মাঝে কোনো বেচাকেনা নেই তাহলে তা জায়েজ হবে। আর যদি চার দিন বা তদুর্ধ্ব দিন পর্যন্ত বলে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চার দিন বা তদুর্ধ্ব দিন পর্যন্ত জায়েজ হবে। অতঃপর যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে সকলের ঐকমত্যে জায়েজ হবে। এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, এটা খেয়ারে শর্তের সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ, ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রয়চুক্তি [নিজ থেকে] রহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে চুক্তি রহিত করার ব্যাপারে অপর পক্ষের গড়িমসি থেকে বাঁচা যায়। সুতরাং এটা [অর্থাৎ, মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত ইচ্ছাধিকার] খেয়ারে শর্তের সাথে যুক্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) খেয়ারে শর্তের ব্যাপারে [গৃহীত] স্বীয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন এবং [আলোচ্য মাসআলায় খেয়ারের সময়সীমা] তিন দিনের অধিক [ধার্য করার বিষয়টি] বাতিল করেছেন। এরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তিন দিনের অধিক সময়ের খেয়ারকে জায়েজ রাখার ক্ষেত্রে [স্বীয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন।] পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) মূল মাসআলায় [অর্থাৎ খেয়ারে শর্তে] সাহাবীর কর্মকে গ্রহণ করেছেন, আর আলোচ্য মাসআলায় কিয়াসকে গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য মাসআলায় অপর আরেকটি কিয়াস রয়েছে, ইমাম যুফার (র.) সেদিকেই সমর্থন দিয়েছেন। তা হলো, এটা এমন একটি বিক্রয়চুক্তি, যাতে ফাসিদ ইকালার শর্তারোপ করা হয়েছে। [ইকালা ফাসিদ] এ জন্য যে, ইকালাকে শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ বিক্রয়চুক্তিতে শুদ্ধ ইকালার শর্তারোপ করাও বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং ফাসিদ ইকালার শর্তারোপ তো স্বাভাবিকভাবেই [বিক্রয় চুক্তিকে ফাসিদ করবে।] আর ইসতিহসানের সুরত আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারে নকদ : মানুষের প্রয়োজনে মানুষ লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষের একটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় কিন্তু কেনার মতো টাকা থাকে না। কখনো কখনো প্রয়োজন এত বেশি থাকে যে, টাকা না থাকলেও কিনতে হয়। কিন্তু কেনার পর মূল্য পরিশোধ করতে পারে না কিংবা সামর্থ্য আছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত পরিশোধ করে না। এদিকে মূল্য না পাওয়াতে বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়। কিন্তু ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া বিক্রয় চুক্তি ভাঙতেও পারছে না। এ ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় হিসাবে শরিয়ত "খেয়ারে নকদ" (خِيَارُ نَقْدٍ) -এর বিধান দিয়েছে। খেয়ারে নকদ -এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা ক্রয়কালে বিক্রেতাকে বলবে, "আমি এ দ্রব্যটি একশ' টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। যদি আমি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বেচাকেনার চুক্তি বহাল থাকবে না।" এরপর ক্রেতা তিন দিন সময় পাবে। এ তিন দিনের ভিতরে ক্রেতা টাকা পরিশোধ না করলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে খেয়ারে নকদ স্বীকৃত। কিন্তু ইমাম যুফার, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) এটাকে জায়েজ বলেন না। তাদের দলিল হলো কিয়াস। আর ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো ইসতিহসান।

ইমাম যুফার ও আইম্মায়ে ছালাছার দলিল :

ইমাম যুফার ও আইম্মায়ে ছালাছার দলিল উপস্থাপন করার আগে ইকালা ও তার প্রকার সম্পর্কে জানতে হবে। ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে বিক্রয়মূল্যে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করাকে ইকালা (اَلْإِقَالَةُ) বলা হয়। যেমন, এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে একটি পেন্সিল ক্রয় করল। কিন্তু কোনো কারণে তার এখন পেন্সিলের প্রয়োজন নেই। সে পেন্সিল দোকানে ফেরত দিয়ে দশ টাকা ফিরে পেতে চায়। তাই সে দোকানে গিয়ে বিক্রেতাকে বলল, ভাই ! আমার পেন্সিলের প্রয়োজন নেই। আপনি পেন্সিলটি রেখে আমাকে দশ টাকা ফেরত দিন। বিক্রেতা পেন্সিল রেখে দশ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু সে সম্মত হয়ে ফেরত দিল। এটাকেই শরিয়তের পরিভাষায় ইকালা বলে।

ইকালা দু'প্রকার– ১. সহীহ ইকালা (اَلْإِقَالَةُ الصَّحِيْحَةُ) ২. ফাসিদ ইকালা (اَلْإِقَالَةُ الْفَاسِدَةُ)। সহীহ ইকালা হলো, যে ইকালাকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয় না। যেমন কেউ বলল, "আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, তুমি ইকালা করবে।" এ উক্তিতে ইকালাকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়নি, তাই এটা সহীহ। অবশ্য বিক্রয়চুক্তিতে ইকালার শর্ত করা হয়েছে। ফাসিদ ইকালা হলো, যে ইকালাকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন কেউ বলল, "আমি তোমার কাছে এ দ্রব্যটি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে, যদি তুমি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না কর তাহলে তোমার আমার মাঝে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না।" এ উক্তিতে "বিক্রয় হবে না" বলে ইকালার শর্ত করা হয়েছে। আর ইকালাকে মূল্য পরিশোধ না করার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। তাই এটা ফাসিদ ইকালা।

ইমাম যুফার ও আইম্মায়ে ছালাছা (র.) বলেন, যে বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে নকদ রাখা হয় তা মূলত এমন একটি বিক্রয়চুক্তি যাতে ফাসিদ ইকালার শর্ত করা হয়। আর বিক্রয়চুক্তিতে সহীহ ইকালার শর্ত করাটাই বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সেখানে ফাসিদ ইকালা তো স্বাভাবিকভাবেই বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দিবে। তাই খেয়ারে নকদের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। অতএব খিয়ারে নকদ জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর দলিল :

ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) খেয়ারে নকদকে খেয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করেন। এ কিয়াসকেই সাহেবে হিদায়া ইসতিহসান বলেছেন। مَقِيْسٌ عَلَيْهِ হলো খেয়ারে শর্ত। আর مَقِيْسٌ হলো খেয়ারে নকদ। উভয়ের মাঝে যোগসূত্র (اَلْجَامِعُ) হলো প্রয়োজন ও জরুরত (اَلْحَاجَةُ)। ক্রয়-বিক্রয়ে ঠকে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজনে যেরূপ খেয়ারে শর্তকে শরিয়ত জায়েজ করেছে তেমনি খেয়ারে নকদেরও প্রয়োজন হয়। কারণ, অনেক সময় ক্রেতা দ্রব্য কিনে নিয়ে যায়, কিন্তু মূল্য পরিশোধ করে না বা করতে পারে না। এদিকে বিক্রেতা মূল্য না পাওয়াতে বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করতে চায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের জন্য ক্রেতার উপস্থিতি জরুরি, অথচ ক্রেতাকেও সে পাচ্ছে না। মূল্যও পাচ্ছে না, দ্রব্যও ফিরে পাচ্ছে না- এ উভয় সংকট থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে খেয়ারে নকদের প্রয়োজন। তাই তা খেয়ারে শর্তের মতো জায়েজ হবে।

إِلٰى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ...... جَازَ وَإِلٰى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ الخ : ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে নকদের শর্তারোপ করার কয়েকটি সুরত হতে পারে :

১. কেউ খেয়ারে নকদের শর্তারোপ করেছে, কিন্তু সময়সীমা উল্লেখ করেনি। যেমন বলল, আমি এ দ্রব্যটি এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, যদি আমি এর মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। এ সুরতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ।

২. সময়সীমা উল্লেখ করেছে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করেনি। যেমন বলল, তুফান আসার আগে যদি আমি মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। এ বিক্রয় চুক্তিও ফাসিদ। কারণ, সময়সীমা অজ্ঞাত। আর এ ধরনের অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয়।

৩. তিন দিন বা তার কম সময় উল্লেখ করেছে। যেমন বলল, আমি যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয় বহাল থাকবে না। এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাঈন (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ। ইমাম যুফার ও আইম্মায়ে ছালাছার মতে জায়েজ নেই। উভয়পক্ষের দলিল পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৪. খেয়ারে নকদের সময়সীমা চারদিন বা তদূর্ধ্ব দিন নির্ধারণ করা। যেমন, যদি চার দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ না করি তাহলে আমাদের মাঝে বিক্রয় চুক্তিসম্পন্ন হবে না। এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় চুক্তি জায়েজ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) مَقِيسٌ عَلَيْهِ ও مُلْحَقٌ بِهٖ তথা খেয়ারে শর্তে যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ খেয়ারের তিন দিনের অধিক সময়সীমাকে জায়েজ বলেননি, مَقِيسٌ ও مُلْحَقٌ তথা খেয়ারে নকদে তারই অনুসরণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদও খেয়ারে শর্তে যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ তিন দিনের অধিক সময়সীমাকে জায়েজ বলেছেন, খেয়ারে নকদেও তার অনুসরণ করেছেন।

সাহেবে হিদায়া বলেন, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) أَصْلٌ অর্থাৎ খেয়ারে শর্তের বেলায় হাদীসের উপর আমল করেছেন, আর আলোচ্য মাসআলা অর্থাৎ খেয়ারে নকদের বেলায় কিয়াসের উপর আমল করেছেন।

সাহেবে হিদায়ার এ কথার দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী أَصْلٌ মানে খেয়ারে শর্ত, وَفِىْ هٰذَا মানে খেয়ারে নকদ, أَثَرٌ মানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস إِنَّهٗ أَجَازَ الْخِيَارَ إِلٰى شَهْرَيْنِ অর্থাৎ এ হাদীসের কারণে খেয়ারে শর্তকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়। আর قِيَاسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, খেয়ার বিক্রয়চুক্তির চাহিদা পরিপন্থি। তাই তা নাজায়েজ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হাব্বান ইবনে মুনকিয (র.)-এর ঘটনার কারণে খেলাফে কিয়াস তিন দিনের জন্য জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন দিনের অধিক সময়ের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল করে খেয়ারে নকদকে নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী أَصْلٌ মানে তিন দিন। অর্থাৎ খেয়ারে নকদ তিন দিনের জন্য জায়েজ। এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হলো, ইবনুল বারস্যার আজাদকৃত দাস হযরত সুলায়মান তাঁর কাছে এই শর্তে একটি বাদী বিক্রি করেছিল যে, যদি তিন দিনের ভিতরে মূল্য পরিশোধ করা না হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকবে না। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ বিক্রয়চুক্তিকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। আর وَفِىْ هٰذَا মানে তিন দিনের অধিক সময়। অর্থাৎ সাধারণভাবে কিয়াস বিক্রয় চুক্তিতে খেয়ারে নকদ নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে। হাদীসের কারণে তিন দিনকে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন দিনের অধিক সময়ের ক্ষেত্রে হাদীস না থাকায় কিয়াসের উপর আমল করে নাজায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত পৃ. ৮১; ফাতহুল কাদীর প্রাগুক্ত পৃ. ২৮২]

ফায়দা : হযরত হাসান ইবনে মালিকের বর্ণনা মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উপরোক্ত মত প্রত্যাহার করে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন। তবে শরহুল জামেউস সাগীরে আছে– اَلْأَصَحُّ أَنَّهٗ مَعَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ অর্থাৎ, বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত।

–[ফাতহুল কাদীর : প্রাগুক্ত]

পাঁচ. খেয়ারে নকদের সময়সীমা চারদিন বা তদূর্ধ্ব দিন নির্ধারণ করেছে, কিন্তু তিন দিনের ভিতরেই মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাঈন (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে।

قَالَ : وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيْعِ عَنْ مِلْكِهِ، لِأَنَّ تَمَامَ هٰذَا السَّبَبِ بِالْمُرَاضَاةِ، وَلَا تَتِمُّ مَعَ الْخِيَارِ، وَلِهٰذَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِى التَّصَرُّفَ فِيْهِ، وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِى وَهَلَكَ فِى يَدِهٖ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيْمَةِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالْهَلَاكِ، لِأَنَّهُ كَانَ مَوْقُوْفًا، وَلَا نِفَاذَ بِدُوْنِ الْمَحَلِّ، فَبَقِىَ مَقْبُوْضًا فِى يَدِهٖ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَفِيْهِ الْقِيْمَةُ، وَلَوْ هَلَكَ فِى يَدِ الْبَائِعِ اِنْفَسَخَ الْبَيْعُ، وَلَا شَىْءَ عَلَى الْمُشْتَرِى إِعْتِبَارًا بِالصَّحِيْحِ الْمُطْلَقِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিক্রেতার খেয়ার বিক্রীত-পণ্যকে তার মালিকানা থেকে বের হতে বাধা দেয়। কেননা, এই কার্যকারণের [অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তির] পূর্ণাঙ্গতা উভয়ের সম্মতির উপর নির্ভরশীল। আর খেয়ারের বর্তমানে সম্মতি পূর্ণাঙ্গ হয় না। এ কারণেই [বিক্রেতার খেয়ারে শর্তে বিক্রীত ক্রীতদাসের বেলায়] বিক্রেতার মুক্তিদান কার্যকর হয়। আর ক্রেতা [বিক্রেতার খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] বিক্রীত-পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার পায় না; যদিও সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে তা হস্তগত করে। যদি ক্রেতা তা হস্তগত করে এবং তার অধিকারে থাকা অবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা বাজার-মূল্য দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করবে। কেননা, [পণ্য] বিনষ্ট হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কারণ, তা [বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত] মওকুফ ছিল, [কার্যকর হয়নি]। আর [বিনষ্ট হওয়ার পর কার্যকর হওয়ার প্রশ্ন আসে না।] কারণ, পাত্র [অর্থাৎ বিক্রেয়-পণ্য] ছাড়া বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয় না। [যেহেতু বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়নি] তাই ক্রেতার দখলে বিক্রয়পণ্যটি ছিল দরাদরির পর্যায়ে। আর দরাদরি করা অবস্থায় ক্রেতার কব্জায় বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে ঐ পণ্যের বাজারমূল্য আবশ্যক হয়। আর যদি বিক্রেতার কব্জায় বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং নিঃশর্ত ও বিশুদ্ধ বিক্রয়চুক্তির উপর কিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে খেয়ারে শর্তের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। খেয়ারে শর্ত ক্রেতার জন্যও হয়, বিক্রেতার জন্যও হয়। যদি খেয়ারে শর্ত বিক্রেতার হয়, যেমন– বিক্রেতা বলল, আমি এই গাড়ীটি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে তিন দিনের খেয়ারে শর্তে বিক্রি করলাম, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের মালিক সেই থাকবে। তিন দিনের ভিতরে বিক্রির অনুমোদন দিলে কিংবা হ্যাঁ/ না বলা ছাড়াই তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তখন বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে এবং পণ্য তার মালিকানা থেকে বের হবে আর সে কারণেই কেউ যদি খেয়ারে শর্তে বিক্রি করা তার দাসকে তিন দিনের ভিতর মুক্ত করে দেয়, তাহলে মুক্তকরণ কার্যকর হয়। কারণ, মুক্তকরণ কার্যকর হওয়ার জন্য দাসের মালিকানা থাকা শর্ত। আর বিক্রেতার তা আছে। একই কারণে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীত-পণ্য হস্তগত করা সত্ত্বেও ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পায় না। কারণ, হস্তক্ষেপ করার জন্য বিক্রীত-পণ্যে মালিকানা শর্ত; আর ক্রেতার তা নেই। খেয়ারে শর্ত বিক্রেতার বিধায় পণ্যের মালিকানা এখনও তার।

খেয়ারে শর্তে বিক্রি করা পণ্য থেকে বিক্রেতার মালিকানা কেন উঠে যায় না? বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে পণ্যের উপর থেকে বিক্রেতার মালিকানা উঠে যায় এবং ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকলে; পণ্যের উপর থেকে বিক্রেতার মালিকানা ছাড়ার সম্মতি এবং বিনিময়মূল্যের উপর থেকে ক্রেতার মালিকানা ছাড়ার সম্মতি। কিন্তু খেয়ারে শর্ত থাকা অবস্থায় এ সম্মতি পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। কারণ, পণ্যের উপর থেকে মালিকানা ছাড়তে সে সম্মত কিনা এ চিন্তাভাবনার জন্যই তো তার খেয়ারে শর্ত নেওয়া। তাই খেয়ারে শর্ত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার কারণেই বিক্রয়পণ্য (مَبِيْع) থেকে বিক্রেতার মালিকানা যায় না।

قَوْلُهُ فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِىْ وَهَلَكَ فِىْ يَدِهٖ فِىْ مُدَّةِ الْخِيَارِ الخ : ক্রেতা যদি বিক্রয়পণ্য হস্তগত করে এবং তার দখলে থাকা অবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে জরিমানা হিসেবে তাকে ঐ পণ্যের বাজারমূল্য(قِيْمَة) দিতে হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এটাই অভিমত। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জরিমানা হিসেবে ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَن) দেবে। ইমাম ইবনে আবী লায়লা (র.) বলেন, ক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে না। কারণ, সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হস্তগত করেছে। সুতরাং তা তার হাতে আমানত। আর আমানতের মাল ধ্বংস হলে জরিমানা আবশ্যক হয় না।

আমাদের দলিল হলো, বিক্রেতার খেয়ারে শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি মওকুফ তথা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। পণ্য ধ্বংস হওয়ার কারণে এ বিক্রয়চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করার কোনো উপায় থাকল না। কারণ, পণ্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে গেছে। আর নিয়ম আছে– مَقْبُوْضٌ بِجِهَةِ الْعَقْدِ مَضْمُوْنٌ بِالْقِيْمَةِ অর্থাৎ 'ক্রয় করার ইচ্ছায় কোনো জিনিস হস্তগত করার পর তা ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে বাজার মূল্য প্রদান আবশ্যক হয়।' যেমন– এক ব্যক্তি ক্রয়ের ইচ্ছায় একটি কাঁচের পাত্র হাতে নিয়ে দরদাম করছে, হঠাৎ তার হাত থেকে তা পড়ে ভেঙ্গে গেল। তাহলে তাকে জরিমানা হিসেবে ঐ পাত্রের বাজারমূল্য দিতে হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার উপর পণ্যের জরিমানা হিসেবে বাজারমূল্য (قِيْمَة) প্রদান আবশ্যক হবে।

কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার পরে যদি ধ্বংস হয়, তাহলে ধার্যকৃত (ثَمَن) প্রদান আবশ্যক হবে। কারণ, খেয়ারের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর বিক্রীত-পণ্য ধ্বংস হলে ক্রেতার মালিকানাধীন অবস্থায় তা ধ্বংস হয়েছে। তাই তার উপর কোনো জরিমানা আসবে না। তবে বিক্রেতাকে পণ্যের ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَن) দিয়ে দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ اِنْفَسَخَ الْبَيْعُ الخ : যদি বিক্রেতার খেয়ারে শর্ত এবং তার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রয়পণ্য ধ্বংস হয়, তাহলে বিক্রেতার মাল ধ্বংস হলো। এর জন্য ক্রেতার উপর কোনো জরিমানা আবশ্যক হবে না; যেমনিভাবে কোনো শর্তহীন বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রীত-পণ্য ধ্বংস হলে ক্রেতার উপর কিছু আবশ্যক হয় না।

قَالَ : وَخِيَارُ الْمُشْتَرِى لَا يَمْنَعُ خُرُوْجَ الْمَبِيْعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ فِىْ جَانِبِ الْاٰخَرِ لَازِمٌ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوْجَ الْبَدْلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظْرًا لَهُ دُوْنَ الْاٰخَرِ. قَالَ : إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِىَ لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا : يَمْلِكُهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِىْ مِلْكِ الْمُشْتَرِىْ يَكُوْنُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ، وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِى الشَّرْعِ، وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيْعُ فِىْ مِلْكِهِ لَاجْتَمَعَ الْبَدْلَانِ فِىْ مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِى الشَّرْعِ، لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ يَقْتَضِى الْمُسَاوَاةَ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ نَظْرًا لِلْمُشْتَرِىْ لِيَتَرَوَّى، فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ رُبَّمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِخْتِيَارِهِ، بِأَنْ كَانَ قَرِيْبَهُ فَيَفُوْتُ النَّظْرُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রেতার খেয়ার বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রীত-পণ্যকে বের হতে বাধা দেয় না। কারণ, বিক্রয় তো অন্য পক্ষে সাব্যস্ত হয়ে আছে। বাধা না দেওয়াটা এজন্য যে, খেয়ারে শর্ত ঐ ব্যক্তির মালিকানা থেকে বিনিময়বস্তু বের হতে বাধা দেয়, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয়। কারণ, অপরজনের নয়, বরং তার সুবিধার্থেই খেয়ারে শর্ত বৈধ হয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে। কারণ, যখন পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, তখন তা যদি ক্রেতার মালিকানায় প্রবেশ না করে, তাহলে পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হলো কোনো মালিকের মালিকানায় আসা ছাড়াই। আর শরিয়তে এ ধরনের কোনো নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যখন ক্রেতার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য বের হচ্ছে না, তখন আমরা যদি বলি যে, বিক্রীত-পণ্য তার মালিকানায় প্রবেশ করবে, তাহলে বিনিময়চুক্তির হুকুম হিসেবে এক ব্যক্তির মালিকানায় উভয় বিনিময়বস্তু [পণ্য ও বিনিময়মূল্য] একত্র হয়ে যাবে। আর শরিয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, বিনিময়চুক্তি সমতাকে দাবি করে। তাছাড়া ক্রেতার সুবিধার্থে খেয়ারকে বৈধ করা হয়েছে, যাতে সে চিন্তাভাবনা করে নিজের মঙ্গল [কিসে তা] বুঝতে পারে। যদি [বিক্রীত-পণ্যে তার] মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে হতে পারে তার ইচ্ছা ছাড়াই ক্রয়কৃত দাস আজাদ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার নিকটাত্মীয়। এতে তার সুবিধার দিক রক্ষা হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয়, তাকে مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বলা হয়। উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা হলো, যদি مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ক্রেতা হয় অর্থাৎ খেয়ার ক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। এ বিষয়ে আইম্মায়ে আরবা'আ ও সাহেবাইন (র.) একমত। তবে তা ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয় কিনা এ বিষয়ে

মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয় না। সাহেবাইন, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতানুসারে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয়।

বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হয়ে যায় এ বিষয়ের দলিল হলো, খেয়ারে শর্ত যেহেতু শরিয়ত বৈধ করেছে যার খেয়ার তার সুবিধার্থে, তাই খেয়ার তার মালিকানা থেকে বিনিময় বস্তু বের হওয়াকে বাধা দেয়। বিক্রেতার খেয়ার হলে তার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্যকে(مَبِيْعٌ)বের হতে বাধা দেবে, আর ক্রেতার খেয়ার হলে ক্রেতার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) বের হতে বাধা দেবে। যেহেতু আলোচ্য মাসআলায় খেয়ার ক্রেতার, তাই বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হতে কোনো বাধা নেই। বিক্রেতার দিক থেকে বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। বিক্রয়চুক্তি থেকে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই। তাই তার মালিকানা থেকে বিক্রয়পণ্য বের হয়ে যাবে।

বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়ার দলিল : সাহেবাইন (র.) বলেন, যখন এটা সাব্যস্ত হলো যে, বিক্রয়পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে তখন তা যদি ক্রেতার মালিকানাভুক্ত না হয়, তাহলে তা মালিকানাবিহীন হবে। অথচ শরিয়তে এ ধরনের কোনো নজির নেই যে, কারো মালিকানাধীন পণ্য তার মালিকানা থেকে বের হয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় থাকে। তাই এ পণ্যের ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হওয়া জরুরি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : যেহেতু খেয়ার ক্রেতার তাই তার মালিকানা থেকে বিনিময়মূল্য (ثَمَنٌ) বের হবে না। এখন যদি বিক্রয়পণ্য তার মালিকানাভুক্ত হয়, তাহলে বিনিময়চুক্তিতে একই ব্যক্তির মালিকানায় বিক্রয়পণ্য ও বিনিময়মূল্য একত্র হয়ে যায়। অথচ শরিয়তে এর কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, বিনিময়চুক্তির দাবি হলো সমতা। একজনের মালিকানায় বিক্রয়পণ্য আসলে তার বিনিময়টা যাবে অপরজনের মালিকানায়। অথচ এখানে উভয়টা ক্রেতার মালিকানায় এসে যায়। সেক্ষেত্রে এটা বিনিময়চুক্তি হয় কি করে?

এ দলিলের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এক ডাকাত ডাকাতি করে এক ব্যক্তির একটি মুদাব্বার দাসকে [যে দাসের মুক্তি মনিবের মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত] নিয়ে গেল। কিন্তু দাসটি তার হাত থেকে পলায়ন করল। এ সুরতে ডাকাতের উপর জরিমানা আদায় করা আবশ্যক হয়। কিন্তু তখনও মুদাব্বার মনিবের মালিকানা থেকে বের হয় না। কারণ, মুদাব্বার যেহেতু এক রকম স্বাধীন, তাই তা নতুন করে কারো মালিকানাভুক্ত হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে মনিবের মালিকানায় জরিমানার অর্থ ও দাস উভয়টি একত্র হচ্ছে। অতএব, এক ব্যক্তির মালিকানায় উভয় বিনিময়বস্তু (مَبِيْعٌ وَثَمَنٌ) একত্র হওয়ার প্রমাণ শরিয়তে নেই একথা শুদ্ধ নয়।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, উপরিউক্ত উদাহরণ ضَمَانُ جِنَايَةٍ -এর, আর আমাদের আলোচনা ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ -এর। সুতরাং প্রশ্নটি সঠিক নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতার জন্য শরিয়ত খেয়ারে শর্ত বৈধ করেছে তার সুবিধার্থে। সে চিন্তাভাবনা করে ধীরে-সুস্থে সিদ্ধান্ত নেবে, তার জন্য কোনটা মঙ্গলজনক হবে। ক্রয় করা মঙ্গলজনক হবে, না বিপরীতটা মঙ্গলজনক হবে? যদি খেয়ার সত্ত্বেও বিক্রয়পণ্য তার মালিকানাভুক্ত হয়ে যায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে খেয়ারের কোনো অর্থ থাকে না। কারণ, তখন তার চিন্তাভাবনার সুযোগ থাকে না। যেমন– ক্রেতা তার নিকটাত্মীয়কে খেয়ারে শর্তে ক্রয় করল। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'কেউ যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়র মালিক হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যাবে।' তাই কেনার সঙ্গে সঙ্গে সে আজাদ হয়ে গেছে। এ সুরতে ক্রেতা চিন্তাভাবনার কোনো সুযোগ পেল না। খেয়ার যে উদ্দেশ্যে বৈধ করা হয়েছে তা এখানে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা বলি, খেয়ার ক্রেতার হলে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হবে না। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫]

قَالَ : فَإِنْ هَلَكَ فِيْ يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلَاكُ لَا يَعْرِىْ عَنْ مُقَدِّمَةِ عَيْبٍ فَيَهْلِكُ، وَالْعَقْدُ قَدْ إِنْبَرَمَ، فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ بِدُخُوْلِ الْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ حُكْمًا لِخِيَارِ الْبَائِعِ فَيَهْلِكُ، وَالْعَقْدُ مَوْقُوْفٌ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি ক্রেতার কব্জায় বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়মূল্যের বিপরীতে বিনষ্ট হলো। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি [ক্রেতার কব্জায়] বিক্রয়পণ্য দোষগ্রস্ত হয়। কিন্তু খেয়ার যখন বিক্রেতার হয়, তখন ব্যাপার ভিন্ন। পার্থক্যের কারণ এই যে, যখন বিক্রয়পণ্য [ক্রেতার কব্জায়] দোষগ্রস্ত হয় [এবং খেয়ার তার হয়] তখন তা [বিক্রেতাকে] ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। আর বিনষ্ট হওয়াটাও কোনো পূর্বদোষ থেকে মুক্ত হয় না [অর্থাৎ দোষে দুষ্ট হয়েই বিনষ্ট হয়।] সুতরাং পণ্য বিনষ্ট হলো এমতাবস্থায় যে, বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। তাই ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি ভিন্ন। কারণ, বিক্রেতার খেয়ারের কারণে [পণ্য] দোষগ্রস্ত হওয়াতে ফেরত দেওয়াটা নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং পণ্য বিনষ্ট হলো এমতাবস্থায় যে, বিক্রয়চুক্তি মওকুফ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, খেয়ার যদি ক্রেতার হয় এবং তার কব্জায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রয়পণ্য বিনষ্ট হয় কিংবা এমন কোনো দোষে দুষ্ট হয়, যা কখনো দূর হওয়ার নয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে খেয়ার যদি বিক্রেতার হয় এবং ক্রেতার কব্জায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে পণ্য বিনষ্ট হয়, তাহলে ক্রেতার উপর পণ্যের বাজারমূল্য (قِيْمَةٌ) ওয়াজিব হবে। এ দু-মাসআলায় পার্থক্যের কারণ এই যে, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রয়পণ্য যখন তার কব্জায় দোষগ্রস্ত হলো, তখন খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দিয়ে বিক্রেতার কাছে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার যে সুযোগ ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। কারণ, বিক্রেতার মালিকানা থেকে পণ্যটি দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে। এখন ফেরত গেলে দোষগ্রস্ত অবস্থায় বিক্রেতার মালিকানায় দাখিল হবে। যখন ফেরত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে গেল এবং বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হয়। তাই এ সুরতে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হবে।

ক্রেতার খেয়ারের সুরতে তার কব্জায় থাকা অবস্থায় পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও একই হুকুম। কারণ, যে কোনো জিনিস ধ্বংস বা বিনষ্ট হওয়ার আগে দোষযুক্ত হয়। মানুষও মৃতুবরণ করার আগে অসুস্থ হয়; যদিও অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতা অনুভব হয় না। যখন পণ্য দোষযুক্ত হলো তখন তা বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে গেল এবং বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। আর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হলে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য (ثَمَنٌ) ওয়াজিব হয়, তাই এ সুরতেও ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে বিক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতার কব্জায় যখন পণ্য দোষগ্রস্ত হলো, তখন তা ফেরত দেওয়াটা অসম্ভব নয়। কারণ, বিক্রেতার মালিকানা থেকে পণ্য বের হয়নি, তাই তা তার মালিকানাতেই দোষযুক্ত হয়েছে। এরপর যখন পণ্য ধ্বংস হলো, আর তা ধ্বংস হলো এমন এক অবস্থায় যখন বিক্রয়চুক্তি মওকুফ। পণ্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে গেল। আর কায়দা আছে, مَقْبُوْضٌ بِجِهَةِ الْعَقْدِ مَضْمُوْنٌ بِالْقِيْمَةِ অর্থাৎ 'ক্রয় করার ইচ্ছায় কোনো জিনিস হস্তগত করার পর তা ধ্বংস হয়ে গেলে জরিমানা হিসেবে বাজার মূল্য (قِيْمَةٌ) প্রদান করা আবশ্যক হয়।' যেমন– এক ব্যক্তি ক্রয়ের ইচ্ছায় একটি কাচের পাত্র হাতে নিয়ে দরদাম করছে, হঠাৎ তার হাত থেকে তা পড়ে গেল, তাহলে তাকে জরিমানা হিসাবে ঐ পাত্রের বাজারমূল্য দিতে হবে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় জরিমানা হিসাবে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য (قِيْمَةٌ) প্রদান করা আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى إِمْرَأَتَهُ عَلٰى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا لِمَالَهُ مِنَ الْخِيَارِ، وَإِنْ وَطِيَهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، لِأَنَّ الْوَطْيَ بِحُكْمِ النِّكَاحِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا، لِأَنَّ الْوَطْيَ يُنْقِصُهَا، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَقَالَا : يَفْسُدُ النِّكَاحُ، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا، وَإِنْ وَطِيَهَا لَمْ يَرُدَّهَا، لِأَنَّ وَطْيَهَا بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ، فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি তার স্ত্রীকে এই শর্তে ক্রয় করে যে, তার তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে [তাদের] বিবাহ ফাসিদ হবে না। কেননা, তার খেয়ার থাকার কারণে এখনও সে স্ত্রীর মালিক হয়নি। [মালিক হলে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যায়।] এ অবস্থায় যদি সে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে এরপরেও সে তাকে [বিক্রেতার কাছে] ফেরত দিতে পারবে। কারণ, এ সহবাস বিবাহ সূত্রে হয়েছে। হ্যাঁ, স্ত্রী যদি কুমারী হয় [তাহলে ফেরত দিতে পারবে না।] কেননা, সহবাস [কুমারিত্ব নষ্ট করার মাধ্যমে] তাকে দোষযুক্ত করে দেয়। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, সে স্ত্রীর মালিক হয়েছে। এরপর যদি সে তার সাথে সহবাস করে, তাহলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, তার সাথে সহবাস করেছে দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতে। সুতরাং [তাকে] ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে; যদিও সে অকুমারী হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে যে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাটি উল্লিখিত হয়েছে তা মূলত পূর্বোক্ত একটি উসূলগত মতপার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল। উসূলটি হলো, খেয়ারে শর্ত ক্রেতার হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা মালিক হয়। এ মূলনীতিগত মতপার্থক্যের কারণে বহু মাসআলায় মতপার্থক্য হয়েছে। সাহেবে হিদায়া এ স্থলে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের বেশ কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন।

এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার দাসী স্ত্রীকে ক্রয় করল। মূলনীতি হলো, কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীর মালিক হয়, তাহলে বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এ সুরতে বিবাহ ভাঙবে কিনা ? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু খেয়ার ক্রেতার হলে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না, তাই এ সুরতে স্বামী এখনও স্ত্রীর মালিক হয়নি। সুতরাং তাদের বিবাহ ভাঙ্গেনি। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর মতে যেহেতু ক্রেতা মালিক হয়, তাই এ সুরতে স্বামী তার স্ত্রীর মালিক হয়ে গেছে। ফলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে গেছে।

এরপর ক্রেতা তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করল। পিছনে মূলনীতি গেছে যে, যদি খেয়ার ক্রেতার হয়, আর তার কজায় থাকাকালে বিক্রয়পণ্য দোষযুক্ত হয়, তাহলে ক্রেতা তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, এ সুরতে চিন্তাভাবনার পর ক্রেতা যদি স্ত্রীকে ক্রয় করার ইচ্ছে না করে, তাহলে বিক্রেতার কাছে তাকে ফেরত দিতে পারবে কিনা এবং সহবাস করা সত্ত্বেও তার খেয়ার বাকি থাকবে কিনা ?

স্ত্রীর দু অবস্থা হতে পারে। কুমারী কিংবা অকুমারী (ثَيِّبَةٌ)। স্ত্রী যদি অকুমারী হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ফেরত দিতে পারবে এবং তার খেয়ার বাতিল হবে না। তিনি বলেন, স্বামী বিবাহের সূত্রে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে; ক্রেতা হিসেবে বিক্রয়পণ্যে হস্তক্ষেপ করেনি এবং তার সহবাসের কারণে বিক্রয়পণ্যে নতুন কোনো দোষও যুক্ত হয়নি। তাই তার খেয়ার বাতিল হবে না।

আর যদি স্ত্রী কুমারী হয়, তাহলে স্বামী বিবাহের সূত্রে সহবাস করেছে– এ কথা যদিও বলা যায়, কিন্তু তার সহবাসের কারণে যেহেতু বিক্রয়পণ্যে নতুন দোষ যুক্ত হয়েছে তাই তা ফেরত দেওয়া যাবে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, স্ত্রী কুমারী হোক বা অকুমারী হোক সহবাস করার কারণে তা দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে, তাই তা ফেরত দেওয়া যাবে না এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, স্বামী যেহেতু তার মালিক হয়ে গেছে এবং তাদের বিবাহ ভেঙ্গে গেছে, তাই দাসত্বের মালিকানার ভিত্তিতেই স্বামী তার সাথে সহবাস করেছে। আর এ সহবাস তাকে দোষযুক্ত করেছে। কারণ, একজনের ব্যবহৃত দাসী অন্যজন ব্যবহার করতে আগ্রহী হয় না। সুতরাং এ কারণে তাকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া যাবে না। ফলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

وَلِهٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ أَخَوَاتٌ، كُلُّهَا تَبْتَنِيْ عَلٰى وُقُوْعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِيْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ، مِنْهَا : عِتْقُ الْمُشْتَرِيْ عَلَى الْمُشْتَرِيْ إِذَا كَانَ قَرِيْبًا لَهٗ فِيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَمِنْهَا عِتْقُهٗ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِيْ حَلَفَ : إِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : إِنِ اشْتَرَيْتُ ، لِأَنَّهٗ يَصِيْرُ كَالْمُنْشِئِ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَسْقُطُ الْخِيَارُ.

অনুবাদ : উল্লিখিত মাসআলাটির সমশ্রেণীর আরো কিছু মাসায়েল আছে। সবগুলোই খেয়ারে শর্ত দিয়ে [ক্রয়কৃত জিনিসের উপর] ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, না হওয়ার উপর ভিত্তিশীল। তন্মধ্যে একটি হলো, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে ক্রয়কৃত দাসের ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হওয়া, যখন ক্রয়কৃত দাস তার নিকটাত্মীয় হয়। তন্মধ্যে আরেকটি হলো, খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত দাসের আজাদ হওয়া, যখন ক্রেতা শর্তবাচক বাক্য বলে যে, যদি আমি কোনো ক্রীতদাসের মালিক হই তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ সুরতে বিধান ভিন্ন হবে, যখন ক্রেতা বলে যে, যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি [তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে]। কারণ, এ উক্তিটি ক্রয়ের পর আজাদ হওয়ার কারণ হবে। সুতরাং তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাহেবে হিদায়া (র.) উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বোক্ত মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন। মূলনীতিটি হলো, খেয়ারে শর্ত ক্রেতার হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতা বিক্রয়পণ্যের মালিক হয় না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে ক্রেতা মালিক হয়। এ মূলনীতিগত মতপার্থক্যের কারণে যে সব মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে সেগুলোর একটি পূর্বোক্ত ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ইবারতে সাহেবে হিদায়া (র.) আরেকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন।

এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার এক নিকটাত্মীয় দাসকে ক্রয় করল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'কেউ যদি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা ক্রেতার পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যায়।'-[মিশকাত শরীফ]

সাহেবাইন (র.) বলেন, এ হাদীস অনুসারে ক্রেতা তিন দিনের খেয়ারে শর্তে তার নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সে আজাদ হয়ে যাবে। কারণ, ক্রেতা তার মালিক হয়ে যায়, আর মালিক হওয়াতে নিকটাত্মীয় আজাদ হয়ে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আজাদ হবে না। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতা মালিক হয়নি। আর হাদীসে মালিক হলে তবেই আজাদ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا عِتْقُهٗ الخ : আরেকটি মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি দাস ক্রয় করল। ক্রয়ের আগে সে এভাবে শর্তবাচক বাক্য বলে ব্যক্ত করেছিল যে, যদি আমি কোনো ক্রীতদাসের মালিক হই, তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ সুরতে ক্রীতদাসটি আজাদ হবে কিনা? সাহেবাইন (র.) বলেন, যেহেতু ক্রেতা খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জিনিসের মালিক হয়, তাই কেনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসটি মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর তার উপর ক্রীতদাসের মূল্য (ثَمَنْ) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যেহেতু ক্রেতা খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জিনিসের মালিক হয় না, তাই ক্রীতদাসটি মুক্ত হবে না। তার খেয়ার বাকি থাকবে।

পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এভাবে শর্তযুক্ত বাক্য ব্যক্ত করে যে, যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি, তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর সে তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি গোলাম ক্রয় করল। এ সুরতে সর্বসম্মতভাবে গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে আর তার উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কারণ, ক্রেতা মুক্ত হওয়াকে ক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল। আর ক্রয় পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং ক্রীত গোলামটি মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, নিয়ম আছে- اَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَالْمُرْسَلِ অর্থাৎ 'কেউ যদি কোনো জিনিসকে কোনো শর্তের সাথে যুক্ত করে এবং পরে সেই শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে যেন সে শর্ত ছাড়াই ঐ জিনিসটি সংঘটিত করল।' তাই শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে কোনো গোলামকে মুক্ত করলে সে যেমন মুক্ত হয়ে যায় তেমনি এ সুরতেও মুক্ত হয়ে যাবে।

وَمِنْهَا : إِنَّ حَيْضَ الْمُشْتَرَاةِ فِي الْمُدَّةِ لَا يُجْتَزَئُ بِهِ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يُجْتَزَئُ، وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ -

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] ক্রয়কৃত বাঁদির খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে ঋতুস্রাব হলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে যথেষ্ট হবে। আর যদি খেয়ারের বিধানুসারে বাঁদিটি বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতানুসারে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব নয়। সাহেবাইন (র.)-এর মতে [ক্রেতার] কব্জা করার পর যদি ফিরে আসে, তাহলে গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি বাঁদি ক্রয় করল এবং তাকে কব্জা করল। তার কব্জায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে দাসীটির ঋতুস্রাব হলো। এরপর সে দাসীটির ব্যাপারে খেয়ারে শর্ত পরিত্যাগ করে তাকে রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। নিয়ম হলো, কোনো দাসী যদি একজনের মালিকানা থেকে আরেকজনের মালিকানায় আসে, তাহলে নতুন মালিকের উপর ঐ দাসীর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় করা (إِسْتِبْرَاءُ) ওয়াজিব। গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য কমপক্ষে একটি মাসিক রজঃস্রাব অতিবাহিত হওয়া জরুরি। একটি মাসিক রজঃস্রাব অতিবাহিত হলে এটা নির্ণীত হবে যে, এ দাসীর গর্ভে আগের মালিকের পক্ষ থেকে কোনো সন্তান নেই। এটা প্রমাণ হওয়ার পর নতুন মালিকের জন্য তার সঙ্গে সহবাস বৈধ হবে। এখন প্রশ্ন হলো, খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে দাসীর যে ঋতুস্রাব হয়েছে তা গর্ভমুক্ততা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা?

সাহেবাইন (র.) বলেন, যথেষ্ট হবে। কারণ, ক্রেতা খেয়ারে শর্তে পণ্য ক্রয়ের পর পণ্যের মালিক হয়ে যায়, তাই দাসীর ঋতুস্রাব তার মালিকানায় হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যথেষ্ট হবে না। কারণ, খেয়ারে শর্তে পণ্য ক্রয়ের পর কব্জা করলেও অনুমোদন দেওয়ার আগে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না, তাই ঋতুস্রাব ক্রেতার মালিকানায় হয়নি। নিয়ম হলো, মালিকানায় আসার পর ঋতুস্রাব হলে তা দ্বারা গর্ভমুক্ততা নির্ণয় (إِسْتِبْرَاءُ رِحْمٍ) হবে।

আর যদি ক্রেতা তার খেয়ার বলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেয় এবং দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে ক্রেতা দাসী কব্জা করে থাকুক বা না থাকুক ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় (إِسْتِبْرَاءُ) ওয়াজিব নয়। কারণ, বিক্রেতার পর এ দাসীর অন্য কেউ মালিক হয়নি। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার কব্জা করার পর যদি দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত আসে, তাহলে বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব। কেননা, ক্রেতা খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে ক্রয় করার কারণে তার মালিক হয়েছিল। এখন নতুন করে বিক্রেতার মালিকানায় আসছে। অতএব বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব।

কব্জা করার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার সুরতেও সাহেবাইন (র.)-এর উসূল মোতাবেক বিক্রেতার উপর গর্ভমুক্ততা নির্ণয় ওয়াজিব হওয়া উচিত। কারণ, খেয়ারে শর্তে ক্রয় করার কারণে ক্রেতা তার মালিক হয়েছিল। এখন নতুন করে বিক্রেতার মালিকানায় আসছে। কিন্তু ইসতিহসান হিসেবে ওয়াজিব নয়। কারণ, মালিকানা সাব্যস্ত হলেও কব্জা না করায় তা স্থির হয়নি। তাই বিক্রেতার পর যেন কেউ মালিক হয়নি।

وَمِنْهَا : إِذَا وَلَدَتِ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا .

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে ক্রয়কৃত] দাসী যদি বিবাহ সূত্রে [ক্রেতার ঔরসে] খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে সন্তান প্রসব করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সে উম্মে ওয়ালাদ হবে না; কিন্তু সাহেবাইন (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, মালিকের ঔরসে যে দাসী সন্তান প্রসব করে তাকে ফিক্‌হশাস্ত্রের পরিভাষায় উম্মে ওয়ালাদ বলে। উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জায়েজ নয়। মনিবের মৃত্যুর পর সে দাসত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত ইবারতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তে নিজ দাসী স্ত্রীকে তার মনিবের কাছ থেকে ক্রয় করল, কিন্তু সে এখনও দাসীটি কব্জা করেনি। [৩৬. বেনায়া : প্রাগুক্ত পৃ. ৯১] বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে স্ত্রী সন্তান প্রসব করল। এখন এ দাসীটি ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হবে না। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতা দাসীর সন্তান প্রসবকালে তার মালিক হয়নি। মালিকের ঔরসে দাসী সন্তান প্রসব করলে তবেই সে উম্মে ওয়ালাদ হয়। কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদ হবে। কারণ, তাঁদের মতে খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। তাই দাসীটি ক্রেতার মালিকানায় সন্তান প্রসব করেছে।

ফায়দা : ক্রেতার কব্জায় আসার পর দাসী সন্তান প্রসব করল, না কব্জায় আসার আগে প্রসব করল তা সাহেবে হিদায়ার উপরিউক্ত ইবারতে স্পষ্ট নয়। আল্লামা আইনী (র.) দীর্ঘ আলোচনার পর মন্তব্য করেছেন যে, যদি সাহেবে হিদায়ার ইবারতে وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ শব্দাবলি থাকত, তাহলে এত আলোচনার প্রয়োজন পড়ত না। কারণ, بَعْدَ الْقَبْضِ অর্থাৎ কব্জা করার পর যদি দাসী সন্তান প্রসব করে, তাহলে সকলের মতেই দাসী ক্রেতার উম্মে ওয়ালাদ হবে। কারণ, সন্তান প্রসব করা দাসীর জন্য মানক্ষুণ্নকারক, আর ক্রেতার কব্জায় সন্তান প্রসব হলে দাসী বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া যায় না। ফলে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যায় এবং ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়।

وَمِنْهَا : إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ، ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِى يَدِهِ فِى الْمُدَّةِ، هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، لِإِرْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ، لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، لِصِحَّةِ الْإِيْدَاعِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ الْمِلْكِ.

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, ক্রেতা যদি [খেয়ারে শর্তের মাধ্যমে] ক্রয় করা পণ্য বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কব্জা করে, তারপর তা বিক্রেতার কাছে গচ্ছিত রাখে, এরপর বিক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট বিক্রেতার সম্পদ বিনষ্ট হলো। কারণ, ক্রেতার মালিকানা না থাকায় বিক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে [ক্রেতার] কব্জা রহিত হয়ে গেছে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে, ক্রেতার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। কারণ, [পণ্যে ক্রেতার] মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় [বিক্রেতার কাছে] গচ্ছিত রাখা শুদ্ধ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করল এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্যটি কব্জা করল। এরপর সে পণ্যটি বিক্রেতার কাছে আমানত রাখল। কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার মাঝেই পণ্য বিক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হলো, পণ্যটি কার সম্পদ থেকে গেল ? ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে বিক্রেতার সম্পদ থেকে গেল। কারণ, ক্রেতা পণ্যটির মালিক হয়নি। তাই যখন সে আমানত রাখার কথা বলে বিক্রেতার হাতে পণ্যটি তুলে দিল– এতে বিক্রেতার পণ্য বিক্রেতার হাতে চলে আসল, আর ক্রেতার কব্জা রহিত হয়ে গেল। কারণ, মালিকানা না থাকায় আমানত রাখা শুদ্ধ হয়নি। যখন ক্রেতার কব্জা রহিত হয়ে গেল, তখন তা বিক্রেতার কব্জা থেকে বিনষ্ট হলো। আর বিক্রেতার কব্জা থেকে এবং বিক্রেতার মালিকানা থেকে কোনো পণ্য বিনষ্ট হলে বিক্রেতার সম্পদ থেকে যায়, ক্রেতার উপর কোনো জরিমানা আসে না।

সাহেবাইন (র.) বলেন, এটা ক্রেতার সম্পদ থেকে গেল। তাই বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য (ثَمَنْ) প্রদান করা তার উপর আবশ্যক হবে। কারণ, তাঁদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়। তাই বিক্রেতার কাছে আমানত রাখা শুদ্ধ হয়েছে। আর আমানতের মাল আমানতদারের কাছ থেকে ধ্বংস হওয়া আর মালিকের কাছ থেকে ধ্বংস হওয়া একই কথা। উভয় অবস্থায় মালিকের সম্পদ থেকে যায়। তাই ক্রেতার সম্পদ থেকে যাবে এবং তার উপর বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে।

وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِيْ عَبْدًا مَأْذُوْنًا لَهُ فَأَبْرَأَهُ الْبَائِعُ عَنِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ بَقِيَ خِيَارُهُ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الرَّدَّ اِمْتِنَاعٌ عَنِ التَّمَلُّكِ ، وَالْمَأْذُوْنُ لَهُ يَلِيْهِ، وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيْكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত দাস হয়, আর বিক্রেতা তাকে খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে মূল্য থেকে অব্যাহতি দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তার খেয়ার অবশিষ্ট থাকবে। কারণ, [খেয়ারের ভিত্তিতে] পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আর অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের এর অধিকার রয়েছে। সাহেবাইন (র.) -এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, যখন সে পণ্যের মালিক হয়ে গেছে তখন পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো কাউকে বিনিময় ছাড়া মালিক বানানো। আর এর অধিকার তার নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে দাস মালিকের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, তাকে عَبْدٌ مَأْذُوْنٌ لَهُ বলে। মানুষের সাথে তার সকল লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় মালিকের পক্ষ থেকে গণ্য হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যেসব অর্থ বা সম্পদ তার হাতে আসে সেগুলোর মালিকানাও মালিকের। মালিকের অনুমতি ছাড়া কাউকে কোনো হাদিয়া দেওয়া বা দান করার এখতিয়ার তার নেই। সুরতে মাসআলা এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত একটি দাস দশ দিরহামের বিনিময়ে তিন দিনের খেয়ারে একজন স্বাধীন ব্যক্তি থেকে একটি দ্রব্য ক্রয় করল। এরপর খেয়ারের সময়সীমার ভিতরেই বিক্রেতা তাকে পণ্যের মূল্য থেকে অব্যাহতি দিল। কিয়াস তথা যুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতার এ অব্যাহতি দান শুদ্ধ নয়। কারণ, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রেতা এখনো বিক্রয়মূল্যের মালিক হয়নি। আর বিক্রয়মূল্যের মালিক না হয়ে বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দেয় কিভাবে? কিন্তু ইসতিহসান তথা উত্তম বিচেনা হিসেবে অব্যাহতি দান শুদ্ধ। কারণ, মালিকানার সূত্র অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তি সংগঠিত হওয়ার কারণে বিক্রয়মূল্যে তার এক জাতীয় মালিকানা অর্জিত হয়েছে। তাই বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দান শুদ্ধ হবে। যখন বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দান শুদ্ধ হয় তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার খেয়ার স্বস্থানে ঠিক থাকবে; ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করবে, তখন পণ্য বিনামূল্যে তার হবে। আর ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল হলো, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। তাই খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো, সে পণ্যের মালিক হতে চায় না। আর গোলামের মালিকের পক্ষ থেকে তাকে এতটুকু ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, সে ইচ্ছা করলে কোনো জিনিস ক্রয় করতে পারে, আবার ফেরতও দিতে পারে।

সাহেবাইন (র.) বলেন, বিক্রয়মূল্য থেকে অব্যাহতি দানের কারণে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, তাঁদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে গেছে। এখন খেয়ারের ভিত্তিতে পণ্য ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো, তার পক্ষ থেকে সে একজনকে বিনামূল্যে পণ্যের মালিক বানাচ্ছে। আর পণ্যের মালিকানা যেহেতু তার মনিবের, তাই এর অধিকার তার নেই। কারণ, পণ্য বিনামূল্যে দেওয়া মানে হাদিয়া দেওয়া। আর কাউকে পণ্য হাদিয়া দেওয়ার অধিকার মনিব তাকে দেয়নি।

وَمِنْهَا : إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا ، لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَعِنْدَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا ، فَلَا يَتَمَلَّكُهَا بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَهُوَ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ : আরেকটি মাসআলা হলো, জিম্মি যদি অপর কোনো জিম্মি থেকে খেয়ারের শর্তের মাধ্যমে মদ ক্রয় করে, এরপর সে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, সে মদের মালিক হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মুসলমান অবস্থায় সে তা ফেরত দেওয়ার অধিকারী হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, জিম্মি মদের মালিক হয়নি। তাই এখন মুসলমান অবস্থায় খেয়ার রহিতকরণের মাধ্যমে সে মদে মালিকানা গ্রহণ করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذِمِّيٌّ [জিম্মি] হলো ইসলামি রাষ্ট্রের ঐ সকল অমুসলিম বাসিন্দা, যারা নিরাপত্তা-কর দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাস করে। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– هُمْ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ وَ ذِمَّةِ رَسُوْلِهِ অর্থাৎ 'তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জিম্মায়।' এ থেকেই ইসলামের পরিভাষায় তাদেরকে জিম্মি বলা হয়।

–[মুফতী সায়ীদ আহমদ পালনপুরী : তাকরীরে তিরমিযী]

মুসলমানদের জন্য মদ ও শূকরের লেনদেন করা হারাম। মালিক হওয়া ও মালিক বানানো উভয়টা নিষিদ্ধ। কিন্তু জিম্মিদের পরস্পরে এ দুটোর লেনদেন করা বৈধ।

সূরতে মাসআলা হলো, এক জিম্মি অপর জিম্মি থেকে তিন দিনের খেয়ারের শর্তের মাধ্যমে মদ ক্রয় করল। এরপর জিম্মি ক্রেতা মুসলমান হয়ে গেল। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, তাঁদের মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। তাই ক্রেতা জিম্মি থাকাবস্থায় মদের মালিক হয়ে গেছে। এখন যেহেতু মুসলমান হয়ে গেছে– আর মুসলমান কাউকে মদের মালিক বানাতে পারে না, তাই খেয়ারের ভিত্তিতে এখন বিক্রেতাকে মদ ফেরত দিতে পারবে না। অতএব তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে এ সূরতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল। কারণ, তাঁর মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। তাই ক্রেতা জিম্মি থাকাবস্থায় মদের মালিক হয়নি। এখন যদি খেয়ার রহিতকরণের মাধ্যমে মদের মালিকানা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা পারবে না। কারণ, মুসলমান মদের মালিক হতে পারে না। তাই বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِيْ مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَلَهُ أَنْ يُجِيْزَ، فَإِنْ أَجَازَ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ، وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْأُخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمُحَمَّدٍ (رحـ)، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) : يَجُوْزُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ) : وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا كَنّٰى بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ، لَهُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى عِلْمِهِ كَالْإِجَازَةِ، وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ، وَصَارَ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيْ حَقِّ الْغَيْرِ - وَهُوَ الْعَقْدُ - بِالرَّفْعِ، وَلَا يَعْرِيْ عَنِ الْمَضَرَّةِ، لِأَنَّهُ عَسَاهُ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির জন্য খেয়ারে শর্ত আরোপ করা হয়, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে তার বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং বহাল রাখারও অধিকার রয়েছে। যদি সে অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বহাল রাখে, তাহলে তা জায়েজ হবে। কিন্তু যদি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে অপর পক্ষের উপস্থিতি ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, জায়েজ হবে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। মূলত শর্ত হলো অবগতি। ইমাম কুদূরী উপস্থিতির কথা বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, যার জন্য খেয়ারে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে তো অপর পক্ষের কাছ থেকে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাই বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়াটা অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ হবে না। যেমন– অনুমোদন বিষয়টি। আর সে কারণেই [ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য] তার সন্তুষ্টি শর্ত নয়। আর [যার খেয়ারে শর্তের অধিকার রয়েছে] সে হলো বিক্রয়ের উকিলের মতো। তরফাইন (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়াটা অর্থাৎ চুক্তি রহিতকরণ মূলত অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ। আর তা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা, হতে পারে যে, বিক্রেতার খেয়ারের সুরতে অপর পক্ষ বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হওয়ার আশায় বিক্রয়পণ্যে হস্তক্ষেপ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লেখ্য যে, যার অনুকূলে খেয়ারের শর্ত আরোপ করা হয় তাকে مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বলা হয়। مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ক্রেতাও হতে পারে, বিক্রেতাও হতে পারে বা অন্য কেউও হতে পারে। যার অনুকূলে খেয়ার থাকে না তাকে مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ বলে।

مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা হোক, সে খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে চিন্তাভাবনার পর বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখতে পারে, বিক্রয়চুক্তিকে বাতিলও করতে পারে। যদি বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখে, তাহলে এ অনুমোদনের কথা অপর পক্ষকে জানানো জরুরি নয়। জানানো ছাড়াই তার অনুমোদন কার্যকর হবে। কিন্তু ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে ইমাম আবূ

হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে তিন দিনের ভিতরে অপর পক্ষকে তা জানাতে হবে। জানানো ছাড়া তার ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে না; বরং অপর পক্ষের অবগতি ছাড়া যদি খেয়ারের সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে। এটা ইমাম মালিক (র.) -এরও অভিমত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তির অনুমোদনের তথা বহাল রাখার কথা অপর পক্ষকে যেরূপ জানানো জরুরি নয়, তেমনি ভেঙ্গে দেওয়ার কথাও জানানো জরুরি নয়। অপর পক্ষের অবগতি ছাড়াই ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম যুফার (র.) এবং এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও এটাই।

قَوْلُهُ لَهُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ الخ :

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : অপর পক্ষ (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) যখন খেয়ারের শর্ত মেনে নিয়েছে, এর মাধ্যমে সে مَنْ لَهُ الْخِيَارُ-কে এই অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করেছে যে, সে ইচ্ছা করলে বিক্রয়চুক্তিকে বহাল রাখবে, ইচ্ছা করলে বাতিল করবে। অপর পক্ষের ঐ ক্ষমতা বলে সে যখন বিক্রয়চুক্তিকে অনুমোদন দেয়, তখন সর্বসম্মতভাবে তা কার্যকর হওয়া অপর পক্ষের (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) অবগতির উপর নির্ভর করে না। তাছাড়া অপর পক্ষের ক্ষমতা বলেই যেহেতু مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে, তাই বিক্রয়চুক্তি বাতিলেও তার সম্মতি শর্ত নয়। অতএব একই ক্ষমতা বলে তার বাতিলকৃত চুক্তিটির কার্যকর হওয়াটাও অপরপক্ষের অবগতির উপর নির্ভর করবে না।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তার পক্ষে একটি নজিরও পেশ করেন। তিনি বলেন, مَنْ لَهُ الْخِيَارُ বিক্রয়ের উকিলের মতো। বিক্রয়ের উকিল-মুআক্কিল তথা মালিকের পক্ষ থেকে অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার অনবগতিতেও বিক্রয়পণ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। অতএব যার খেয়ারের অধিকার রয়েছে, সেও অপর পক্ষের অনবগতিতে তারই প্রদত্ত অধিকার বলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيْ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ بِالرَّفْعِ الخ :

তরফাইন (র.)-এর দলিল : তরফাইন (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা মূলত অপরজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। কারণ, যার খেয়ার নেই (مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ) তার পক্ষ থেকে বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়ে গেছে। এখন বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা মানে তার এ অধিকারকে বাতিল করা। আর এটা ক্ষতি থেকে খালি নয়। কারণ, বিক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হবে এ আশায় বিক্রয়পণ্য কব্জা করে তাতে হস্তক্ষেপ করে। ফলে তা বিনষ্ট/ ধ্বংস/ শেষ হয়ে যায়। এরপর যদি বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়, তখন দণ্ড হিসেবে তার উপর ঐ পণ্যের বাজারমূল্য (قِيْمَةٌ) আরোপিত হয়। আর বাজারমূল্য অনেক সময় ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর ক্রেতার উপর ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি আরোপ করা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।

আর ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রেতা মনে করে যে, পণ্য তো বিক্রি হচ্ছেই, তাই পণ্যের জন্য অন্য কোনো ক্রেতা তালাশ করে না। অথচ ততদিনে সে সহজেই তা অন্যত্র বিক্রি করে ফেলত। তাছাড়া বিক্রয়মূল্য কব্জা করে থাকলে বিক্রয়মূল্য কাজে লাগিয়ে ফেলে। বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে তাকে বিক্রয়মূল্য যোগাড় করতে হবে, পণ্যের জন্য আবার ক্রেতা তালাশ করতে হবে– এগুলো নিঃসন্দেহে ক্ষতি। যেহেতু বিক্রয়চুক্তি বাতিল-করাটা অপরজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও তার ক্ষতির কারণ, আর যে কাজে অন্য কারো ক্ষতি ও লোকসান হয় তা তার অবগতি ছাড়া করা জায়েজ নেই। তাই বিক্রয়চুক্তির রহিতকরণ কার্যকর হওয়া অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে অর্থাৎ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ যদি খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে চায়, তাহলে অপর পক্ষকে জানিয়ে বাতিল করবে, যাতে সে ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

فَيَلْزَمُهُ غَرَامَةُ الْقِيْمَةِ بِالْهَلَاكِ فِيْمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَا يَطْلُبُ لِسِلْعَتِهِ مُشْتَرِيًا فِيْمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِيْ، وَهٰذَا نَوْعُ ضَرَرٍ، فَيَتَوَقَّفُ عَلٰى عِلْمِهِ، وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيْلِ ، بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّهُ لَا إِلْزَامَ فِيْهِ، وَلَا نَقُوْلُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ، وَكَيْفَ يُقَالُ ذٰلِكَ؟ وَصَاحِبُهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ، وَلَا تَسْلِيْطَ فِيْ غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُسَلِّطُ، وَلَوْ كَانَ فَسَخَ فِيْ حَالِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ، وَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحُصُوْلِ الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ بَلَغَهُ بَعْدَ مَضِيِ الْمُدَّةِ تَمَّ الْعَقْدُ بِمَضِيِ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ ـ

অনুবাদ : ফলে তা বিনষ্ট হওয়ার কারণে তার উপর ঐ পণ্যের বাজারমূল্যের দণ্ড আরোপিত হবে। আর ক্রেতার খেয়ারের সুরতে অপর পক্ষ পণ্যের অন্য কোনো ক্রেতা তালাশ করবে না। আর এটাও এক ধরনের ক্ষতি। তাই বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ করাটা অপর পক্ষের অবগতির উপর মওকুফ থাকবে। আর তাই এটা [ক্রয়-বিক্রয়ের] উকিলকে বরখাস্ত করার মতো হলো। কিন্তু অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তাতে অপর পক্ষের প্রতি কোনো দায় আরোপিত হয় না। আর আমরা এ কথা বলি না যে, যার খেয়ারের শর্তের অধিকার রয়েছে, সে [অপর পক্ষের নিকট থেকে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে] ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিভাবেই বা এটা বলা যায়, অথচ অপর পক্ষ নিজেই চুক্তি ভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখে না। আর ক্ষমতা দানকারী যে বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না সে বিষয়ে ক্ষমতা দান গ্রহণযোগ্য নয়। যদি অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে চুক্তি বাতিল করে, কিন্তু খেয়ারের সময়সীমার মাঝে তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়, তাহলে তার অবগতি অর্জিত হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিলকরণ কার্যকর হবে। আর যদি সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পৌঁছে, তাহলে চুক্তি বাতিল হওয়ার পূর্বে সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার কারণে চুক্তি সম্পন্ন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيْلِ : তরফাইন (র.)-এর পক্ষে সাহেবে হিদায়া একটি নজির পেশ করেছেন। তিনি বলেন, খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিলকরণের উপমা হলো উকিল বরখাস্তকরণ। কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল বানায় এবং পরে কোনো কারণে তাকে বরখাস্ত করতে চায়, তাহলে উকিলকে জানিয়ে বরখাস্ত করা আবশ্যক। কারণ, উকিলকে না জানিয়ে বরখাস্ত করা হলে অনেক সময় উকিলের ক্ষতি হতে পারে। না জানার কারণে সে হয়তো বিক্রেতার জন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করবে, আর এর পয়সা তাকে দিতে হবে। অতএব উকিলকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে যেরূপ তাকে জানিয়ে বরখাস্ত করতে হয় তেমনি খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে চাইলে তা অপর পক্ষকে জানিয়ে করতে হবে। তা না হলে বাতিলকরণ কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ لَا إِلْزَامَ فِيْهِ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) খেয়ারের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করাকে বহাল রাখার উপর কিয়াস করেছেন অর্থাৎ বহাল রাখার জন্য যেরূপ অপর পক্ষের অবগতি লাগে না, তেমনি বাতিলকরণ কার্যকর হওয়ার জন্যও অপর পক্ষের অবগতি লাগবে না। এর জবাবে তরফাইন (র.)-এর পক্ষে সাহেবে হিদায়া বলেন, বিক্রয়চুক্তি বহাল রাখার উপর বিক্রয়চুক্তি বাতিল করাকে কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, বহাল রাখার মধ্যে অপর পক্ষের কোনো ক্ষতি নেই।

কারণ, তার দিক থেকে তো বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়েছিল। مَنْ لَهُ الْخِيَارُ-এর বহাল রাখার মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। যেহেতু বহাল রাখার ক্ষেত্রে অপর পক্ষের কোনো ক্ষতি নেই, তাই এটা তার অবগতির উপর মওকুফ নয়।

قَوْلُهُ وَلَا نَقُوْلُ إِنَّهُ مُسَلَّطٌ وَكَيْفَ يُقَالُ الخ : সাহেবে হিদায়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, مَنْ لَهُ الْخِيَارُ অপর পক্ষ থেকে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় একথা আমরা মানি না। কারণ, অপর পক্ষের নিজেরই তো বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা নেই। আর যার যে বিষয়ের ক্ষমতা নেই সে বিষয়ে তার ক্ষমতা দান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই مَنْ لَهُ الْخِيَارُ অপর পক্ষের নিকট থেকে বিক্রয়চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা পেয়েছে এ কথা শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسَخَ فِيْ حَالِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ الخ : সাহেবে হিদায়া বলেন, যদি খেয়ারের ভিত্তিতে مَنْ لَهُ الْخِيَارُ অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে, আর খেয়ারের সময়সীমার মাঝে এ সংবাদ অপর পক্ষের কাছে পৌছে, তাহলে যথেষ্ট হবে; বিক্রয়চুক্তি বাতিলকরণ সম্পন্ন হবে। কারণ, খেয়ারের সময়সীমার মাঝে অপর পক্ষের জানা জরুরি। চুক্তি বাতিলের স্থানে উপস্থিত থাকা জরুরি নয়। কুদূরীর ইবারতে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও (إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْآخَرُ حَاضِرًا) তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অবগতি। সাহেবে হিদায়া وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا كَنَى بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ বলে এ কথাই বুঝিয়েছেন।

কিন্তু অপর পক্ষের কাছে যদি এ সংবাদ খেয়ারের সময়সীমার পরে পৌঁছে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে– বাতিলকরণ কার্যকর হবে না। কারণ, বাতিলকরণ কার্যকর হওয়ার জন্য অপর পক্ষের জানা জরুরি। জানার আগেই সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। আর খেয়ারের ভিত্তিতে হ্যাঁ/না কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যদি সময়সীমা শেষ হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়।

ফায়দা : খেয়ারে শর্ত যদি বিক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন ও কার্যকর হওয়ার তিনটি সুরত।

১. খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রেতা বলল– أَجَزْتُ الْبَيْعَ [আমি বিক্রয়চুক্তি বহাল রাখলাম]। এ সুরতে অপর পক্ষের উপস্থিতি বা অবগতি শর্ত নয়।

২. খেয়ারের সময়সীমার মাঝে বিক্রেতার মৃত্যুবরণ করা। এ সুরতে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হবে। কারণ, আমাদের মতে খেয়ারে উত্তরাধিকার নেই।

৩. বিক্রয়চুক্তি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাতিল করা ছাড়া সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যাওয়া।

আর বিক্রয়চুক্তি বাতিলের দু সুরত। যথা–

১. স্পষ্ট উক্তির মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা। যেমন, বিক্রেতা বলল– فَسَخْتُ الْبَيْعَ [আমি বিক্রয়চুক্তি বাতিল করলাম]। এ উক্তির মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায়। ক্রেতার সম্মতি ও বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয় না। তবে তরফাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার অবগতি শর্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অবগতি শর্ত নয়।

২. কার্যকলাপের ম্যধ্যমে বিক্রয়চুক্তি বাতিল করা। যেমন– খেয়ারের সময়সীমার ভিতরে বিক্রেতার বিক্রয়পণ্যে এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা, যা অন্যকে বিক্রয়পণ্যের মালিক বানিয়ে দেয়। উদাহরণত– বিক্রি করে দেওয়া, বিক্রয়পণ্য দাস হলে মুক্ত করে দেওয়া, খাদ্যদ্রব্য হলে খেয়ে ফেলা ইত্যাদি। এ সুরতে বিক্রয়চুক্তি বাতিলের জন্য ক্রেতার অবগতি জরুরি নয়।

আর যদি খেয়ার ক্রেতার হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন ও কার্যকর হওয়ার উপরিউক্ত তিনটি সুরত ছাড়া আরো একটি সুরত আছে। তা হলো, ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় বিক্রয়পণ্য এমন কোনো দোষে দুষ্ট হওয়া, যার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না। ক্রেতার কার্যকলাপে দোষযুক্ত হোক বা অন্য কারো কার্যকলাপে হোক কিংবা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ের কারণে হোক কিংবা স্বয়ং বিক্রয়পণ্যের কার্যকলাপে হোক– সমান কথা। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭–৯৮]

মাসআলা : কেউ যদি মদ খেয়ে মাতাল হয়, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয় না। অনুরূপভাবে কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলেও তার খেয়ার বাতিল হয় না। –[প্রাগুক্ত]

قَالَ : وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ)، يُوْرَثُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ، فَيَجْرِيْ فِيْهِ الْإِرْثُ، كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِيْنِ، وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيَّةً وَإِرَادَةً، وَلَا يَتَصَوَّرُ اِنْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيْمَا يَقْبَلُ الْإِنْتِقَالَ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّ الْمُوْرِثَ اِسْتَحَقَّ الْمَبِيْعَ سَلِيْمًا، فَكَذَا الْوَارِثُ، فَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ لَا يُوْرَثُ، وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ اِبْتِدَاءً لِإِخْتِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ، لَا أَنْ يُوْرَثَ الْخِيَارُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির খেয়ার রয়েছে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং তার উত্তরাধিককারীদের প্রতি তা প্রত্যাবর্তিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, খেয়ার তার পক্ষ থেকে ওয়ারিসদের প্রতি উত্তরাধিকার সূত্রে আবর্তিত হবে। কারণ, খেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ে অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত একটি অধিকার। সুতরাং তাতে উত্তরাধিকার জারি হবে, যেমন [জারি হয়] দোষজনিত খেয়ার ও নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের ক্ষেত্রে। আমাদের [অর্থাৎ হানাফী ফিক্‌হবিদদের] দলিল হলো, খেয়ার একটি ইচ্ছা ও ইরাদা মাত্র। এর স্থানান্তরিত হওয়ার ধারণা করা যায় না। আর উত্তরাধিকার হয় ঐ সকল জিনিসে, যেগুলো স্থানান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু দোষজনিত খেয়ারটি ভিন্ন। কারণ, মৃতব্যক্তি দোষমুক্ত পণ্যের অধিকারী হয়েছিল। অতএব উত্তরাধিকারীরাও এরূপ হবে। শুধু খেয়ারের [এক্ষেত্রেও] উত্তরাধিকার হয় না। আর নির্দিষ্টকরণের খেয়ার [উত্তরাধিকারীদের] সাব্যস্ত হয় নতুনভাবে ও পৃথকভাবে, তাদের মালিকানা অন্যের মালিকানার সাথে মিশে যাওয়ার কারণে; খেয়ারের উত্তরাধিকার হিসেবে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, সে ক্রেতা হোক বা বিক্রেতা অথবা অন্য কেউ হোক, তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তার উত্তরাধিকারীগণ তার খেয়ারের উত্তরাধিকার লাভ করবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, উত্তরাধিকারীগণ তার খেয়ারের উত্তরাধিকার লাভ করবে। এটা ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ فَيَجْرِيْ الخ :

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ার শরিয়তের পক্ষ থেকে অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত একটি অধিকার। অপর পক্ষ অর্থাৎ যার খেয়ার নেই সে চাইলেও এ অধিকার বাতিল করতে পারে না। মানুষ যদি বলে, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে শর্ত চলবে না তাহলেও খেয়ারপ্রাপ্ত ব্যক্তির এ অধিকার বহাল থাকবে। আর যে অধিকার অনিবার্যরূপে সাব্যস্ত হয় তাতে উত্তরাধিকার জারি হয়। অতএব খেয়ারে শর্তের মাঝেও উত্তরাধিকার জারি হবে। যেমন– দোষজনিত খেয়ারে (خِيَارُ الْعَيْبِ) ও নির্দিষ্টকরণের খেয়ারে (خِيَارُ التَّعْيِيْنِ) উত্তরাধিকার জারি হয়। খেয়ারে আইব অর্থাৎ

দোষজনিত খেয়ারের স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি দোকান থেকে একটি পণ্য ক্রয় করে বাড়ি আনার পর সে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিগণ দেখল পণ্যটি দোষযুক্ত। বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই পণ্যে এ দোষ ছিল। তাহলে তারা খেয়ার পায়, ইচ্ছা করলে পণ্যটি রেখেও দিতে পারে, ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

আর খেয়ারে তা'য়ীন অর্থাৎ নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি দুটি গরুর একটি ক্রয় করল। ক্রেতা তাকে যে কোনো একটি পছন্দ করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট করার আগেই সে মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকারীগণ যে কোনো একটি গরু নির্দিষ্ট করতে পারে। মোটকথা, مَنْ لَهُ الْخِيَارُ -এর মৃত্যুবরণের পর খেয়ারে আইব ও খেয়ারে তা'য়ীনে উত্তরাধিকারীগণ যেরূপ খেয়ার পায় তেমনি খেয়ারে শর্তের বেলায়ও উত্তরাধিকারীগণ খেয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيْئَةً وَإِرَادَةً الخ :

হানাফীদের দলিল : তাঁরা বলেন, খেয়ার একটি ইচ্ছা মাত্র। ইচ্ছা অবস্তুগত জিনিস। অবস্তুগত জিনিস স্থানান্তর হয় না। আর উত্তরাধিকার জারি হয় ঐ সকল জিনিসে, যেগুলো স্থানান্তরযোগ্য। যেমন− দ্রব্যসামগ্রী ও মালামাল। অতএব দ্রব্যসামগ্রী ও মালামালের মতো মৃতব্যক্তির ইচ্ছায় উত্তরাধিকার জারি হবে না।

আর খেয়ারে আইব ও খেয়ারে তা'য়ীনে উত্তরাধিকার জারি হয় বলে যে কথা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, মূলত সেক্ষেত্রে খেয়ার বা ইচ্ছায় উত্তরাধিকার জারি হয় না; বরং সেখানে বিষয়টি ভিন্ন। খেয়ারে আইবের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রয়চুক্তির কারণে দোষমুক্ত পণ্যের মালিক হয়। সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারীরাও দোষমুক্ত পণ্যের মালিক হবে। তাই পণ্য দোষযুক্ত হলে তারা তা ফেরত দেওয়ার অধিকার পায়। আর খেয়ারে তা'য়ীনের ক্ষেত্রে ক্রেতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা পণ্যের মালিক হয়। ক্রেতা যেরূপ দুটি গরুর একটির মালিক হয়, তেমনি উত্তরাধিকারীরাও একটি গরুর মালিক হয়। কিন্তু তাদের মালিকানা বিক্রেতার মালিকানার সাথে মিশে আছে। তাই তারা চিহ্নিত করার এখতিয়ার নতুনভাবে লাভ করে। মৃত্যুবরণকারী ক্রেতার পরিত্যক্ত দ্রব্য ও সম্পদের মতো ইচ্ছা ও এখতিয়ার মিরাস হিসেবে তাদের কাছে পৌঁছে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهٖ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ، وَاَصْلُ هٰذَا أَنَّ اِشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهٖ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا ، وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُوْزُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رح) ، لِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقْدِ وَأَحْكَامِهٖ، فَلَا يَجُوْزُ اِشْتِرَاطُهٗ لِغَيْرِهٖ، كَاشْتِرَاطِ الثَّمَنِ عَلٰى غَيْرِ الْمُشْتَرِىْ، وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِطَرِيْقِ النِّيَابَةِ عَنِ الْعَاقِدِ، فَيُقَدَّرُ الْخِيَارُ لَهٗ اِقْتِضَاءً، ثُمَّ يُجْعَلُ هُوَ نَائِبًا عَنْهُ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهٖ، وَعِنْدَ ذٰلِكَ يَكُوْنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ، فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ اِنْتَقَضَ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো জিনিস ক্রয় করে এবং অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করে, তাহলে তাদের দুজনের যে কেউ অনুমোদন দিলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে এবং যে কেউ রহিত করলে রহিত হয়ে যাবে। এর মূলনীতি হলো, অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করা ইসতিহসান তথা উত্তম বিবেচনা হিসেবে বৈধ। কিন্তু কিয়াস [যুক্তি] হিসেবে বৈধ নয়। এটাই ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত। কারণ, খেয়ার বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি ও তার বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চুক্তিকারী ছাড়া অন্যের জন্য তার শর্ত করা বৈধ হবে না। যেমন বৈধ নয় ক্রেতা ভিন্ন অন্য কারো উপর বিক্রয়মূল্য শর্ত করা। আমাদের দলিল হলো, চুক্তিকারীর স্থলাভিষিক্ততার ভিত্তিতেই শুধু অন্যের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত হচ্ছে। তাই চুক্তিকারীর জন্যও অনিবার্যভাবে খেয়ার সাব্যস্ত হবে। [সুতরাং যেন সে নিজের জন্য শর্ত করেছে], এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে স্থলাভিষিক্ত বানাচ্ছে, তার পদক্ষেপকে শুদ্ধরূপ দেওয়ার জন্য। আর তখন উভয়ের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার হবে। তাই তাদের যে কেউ অনুমোদন করলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে। আর যে কেউ রহিত করলে রহিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ জিনিস সম্পর্কে কিংবা ঐ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ ও ক্রয়-বিক্রয়ে পারদর্শী কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। এসব প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয়ে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ করা হয়েছে। এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা কোনো জিনিস ক্রয় করল এবং অন্যের জন্য তিন দিনের খেয়ারের শর্ত করল। এ সুরতে তাদের দুজনই খেয়ার-প্রাপ্ত হবে। দুজনের যে কেউ অনুমোদন দিলে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হবে এবং যে কেউ বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, অন্যের জন্য খেয়ারের শর্ত করা ইসতিহসান [উত্তম বিবেচনার] হিসেবে বৈধ। কিয়াস [যুক্তি] হিসেবে বৈধ হয় না। ইমাম যুফার (র.) -এর মতেও তৃতীয় কারো জন্য খেয়ারের শর্ত করা বৈধ নয়। কিয়াস হলো, খেয়ারে শর্ত বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হুকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য পরিশোধ করা, পণ্য অর্পণ করা ইত্যাদি যেমন অবশ্য পালনীয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো এক পক্ষের জন্য খেয়ারের শর্ত করা হলে তাও অবশ্যপালনীয়। যেহেতু খেয়ার বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হুকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়, তাই তা শুধু দুই চুক্তিকারী অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য বৈধ হবে। তৃতীয় কারো জন্য বৈধ হবে না। যেমন বৈধ হয় না মূল্য পরিশোধের শর্ত ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। অথচ মূল্য পরিশোধ করাও খেয়ারের মতোই বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য বিষয়াবলি এবং হুকুমসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই খেয়ারের শর্তও তৃতীয় কারো জন্য করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثْبُتُ الخ :

আমাদের দলিল : প্রয়োজনের কারণে শরিয়ত খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ করেছে; কিয়াস হিসেবে খেয়ারের শর্ত আরোপ বৈধ হয় না। এরূপ প্রয়োজন চুক্তিকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য খেয়ারের শর্ত করার বেলায়ও বিদ্যমান। তাই ইসতিহসান [উত্তম বিবেচনায়] হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করাও বৈধ হবে। তবে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করার দু-সুরত হতে পারে–

১. মূলগতভাবে (أَصَالَةً);

২. স্থলাভিষিক্ত রূপে (نِيَابَةً)।

যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি চুক্তিকারী নয়, তাই তার জন্য মূলগতভাবে খেয়ারের শর্ত করা যায় না। তবে চুক্তিকারীর স্থলাভিষিক্ত রূপে তার জন্য খেয়ারের শর্ত করা যায়। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য খেয়ারের শর্ত করার অর্থ হবে– চুক্তিকারী প্রথমে নিজের জন্য খেয়ারের শর্ত করেছে, এরপর তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপে তার স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, এরূপ সুরত করে তৃতীয় ব্যক্তির খেয়ারের শর্তকে বৈধ করা এজন্য যে, যাতে একজন বালেগ মুসলমান ব্যক্তির চুক্তি দুরস্ত হয়ে যায়।

এ প্রক্রিয়ায় যখন দুজনের জন্যই খেয়ার সাব্যস্ত হবে, তখন দুজনের যে কেউ বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করলে তা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে যে কেউ বাতিল করলে বাতিল হবে। কিন্তু যদি দুজনের কথায় পার্থক্য হয় অর্থাৎ একজন বিক্রয়চুক্তিকে অনুমোদন করে আর অপরজন বাতিল করে, তাহলে প্রথমে যে সিদ্ধান্ত দেবে তার হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, প্রথমজন যখন অনুমোদন বা বাতিল করে তখন তার বিপরীতে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। ফলে তার কথাই কার্যকর হয়ে যায়।

وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْأُخَرُ يُعْتَبَرُ السَّابِقُ لِوُجُوْدِهٖ فِىْ زَمَانٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيْهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الْعَاقِدِ فِىْ رِوَايَةٍ، وَتَصَرُّفُ الْفَاسِخِ فِىْ أُخْرٰى، وَجْهُ الْاَوَّلِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِدِ أَقْوٰى، لِأَنَّ النَّائِبَ يَسْتَفِيْدُ الْوَلَايَةَ مِنْهُ، وَجْهُ الثَّانِىْ أَنَّ الْفَسْخَ أَقْوٰى لِأَنَّ الْمُجَازَ يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ ، وَالْمَفْسُوْخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَلَمَّا مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ رَجَّحْنَا بِحَالِ التَّصَرُّفِ، وَقِيْلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ)، وَالثَّانِىْ قَوْلُ أَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ)، وَاسْتُخْرِجَ ذٰلِكَ مِمَّا إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ مِنْ رَجُلٍ وَالْمُوَكِّلُ مِنْ غَيْرِهٖ مَعًا فَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَعْتَبِرُ فِيْهِ تَصَرُّفَ الْمُوَكِّلِ، وَأَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَعْتَبِرُهُمَا .

অনুবাদ : যদি দুজনের একজন অনুমোদন দেয় আর অপরজন বাতিল করে, তাহলে অগ্রবর্তীজনের পদক্ষেপ বিবেচিত হবে। কারণ, তার হস্তক্ষেপ এমন সময়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে যখন অন্য কিছু তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। যদি দুজনের কথা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহলে এক বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীর হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। অপর বর্ণনা অনুসারে রহিতকারীর হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفْ) গ্রহণযোগ্য হবে। প্রথম বর্ণনার দলিল হলো, চুক্তিকারীর হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তো তারই নিকট থেকে ক্ষমতা পেয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনার দলিল হলো, চুক্তি বাতিল করার হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, অনুমোদনকৃত বিষয়ের সঙ্গে রহিতকরণ যুক্ত হয়, কিন্তু বাতিলকৃত বিষয়ের সঙ্গে অনুমোদন যুক্ত হয় না। যখন উভয়ের প্রত্যেকেই হস্তক্ষেপের অধিকারী, তখন হস্তক্ষেপের গুণগত মানের বিচারে আমরা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করব। কারো কারো মতে প্রথম বর্ণনাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত, আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। এটা বের করা হয়েছে ঐ মাসআলা থেকে যে, যখন একসঙ্গে [একই পণ্যকে] উকিল বিক্রি করে এক ব্যক্তির কাছে আর মুআক্কিল বিক্রি করে আরেক ব্যক্তির কাছে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআক্কিলের কর্মকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেন, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উভয়ের কর্মকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا الخ : আর যদি দুজনের কথা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়, তাহলে এক বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যে বর্ণনা অনুযায়ী চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার দলিল হলো, খেয়ারের বেলায় চুক্তিকারী যেহেতু মূল ব্যক্তি তাই তার কথা বেশি শক্তিশালী। কারণ, অপরজন তো তার কাছ থেকেই খেয়ারের ক্ষমতা পেয়েছে। সুতরাং বেশি শক্তিশালীটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যে বর্ণনা অনুযায়ী বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার দলিল হলো, দুজনের প্রত্যেকেই বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে। তাই দেখা উচিত কার হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। আমরা দেখি বাতিলকারীর হস্তক্ষেপ বেশি শক্তিশালী। কারণ, বাতিলকরণ অনুমোদন দানের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। কোনো জিনিস অনুমোদন করার পর তা বাতিল করা যায়, কিন্তু বাতিল করার পর অনুমোদন করা যায় না। তাই বাতিলকরণ গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ) وَالثَّانِي الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ফিক্‌হবিদদের কারো কারো মতে প্রথমোক্ত বর্ণনা অর্থাৎ চুক্তিকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে– এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ বাতিলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে– এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। সরাসরি ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় না। নিম্নোক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে যে মতপার্থক্য হয়েছে সম্ভবত ফিক্‌হবিদগণ তা থেকেই এ মত গ্রহণ করেছেন। মাসআলা হলো, যখন একসঙ্গে একই পণ্যকে উকিল বিক্রি করে এক ব্যক্তির কাছে, আর মুআক্কিল বিক্রি করে আরেক ব্যক্তির কাছে, তখন ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআক্কিলের কর্মকে (تَصَرُّفٌ) গ্রহণ বলে বিবেচনা করেন।

এ মাসআলায় মুআক্কিল মূল ব্যক্তি, আর উকিল তার স্থলাভিষিক্ত। উকিল মাআক্কিল থেকেই বিক্রয়ের ক্ষমতা পেয়েছে। পূর্বোক্ত মাসআলায় চুক্তিকারী মূল। চুক্তিকারীর পক্ষ থেকেই তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রয়চুক্তিতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা পেয়েছে। এ মাসআলায় যেহেতু ইমাম মুহাম্মদ (র.) মুআক্কিলের কর্মকে গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন তাই পূর্বোক্ত মাসআলায় চুক্তিকারীর পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হবে– এ অভিমত তাঁরই হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উভয়ের কর্মকে (تَصَرُّفٌ) গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন এবং তিনি বলেন, উভয় ক্রেতা অর্ধেক করে পণ্যটির মালিক হবে এবং উভয়ের উপর অর্ধেক মূল্য আবশ্যক হবে। তবে সম্মতি অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি না হওয়াতে উভয়ে তা গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পাবে। এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) উকিল ও মুআক্কিলের বিবেচনা করেননি; তাদের পদক্ষেপের বিবেচনা করেছেন এবং উভয়ের পদক্ষেপকে ঠিক রেখেছেন। এ থেকে বুঝা যায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হস্তক্ষেপকারীর বিবেচনা করেন না, হস্তক্ষেপের বিবেচনা করেন। অতএব পূর্বোক্ত মাসআলায় হস্তক্ষেপের বিবেচনা করার অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর।

মোটকথা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে আসল মতবিরোধ হলো ওকালতের মাসআলায়। আলোচ্য মাসআলার দুই বর্ণনাকে ফিক্‌হবিদগণ কিয়াস করে দুই বর্ণনা দুজনের বলে সাব্যস্ত করেছেন।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلٰى أَنَّهٗ بِالْخِيَارِ فِىْ أَحَدِهِمَا ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ بَاعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِ مِائَةٍ عَلٰى أَنَّهٗ بِالْخِيَارِ فِىْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهٖ جَازَ الْبَيْعُ، وَالْمَسْأَلَةُ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا أَنْ لَا يُفَصِّلَ الثَّمَنَ، وَلَا يُعَيِّنَ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِى الْكِتَابِ، وَفَسَادُهٗ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ وَالْمَبِيْعِ، لِأَنَّ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنِ الْعَقْدِ إِذِ الْعَقْدُ مَعَ الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُ فِىْ حَقِّ الْحُكْمِ، فَبَقِىَ الدَّاخِلُ فِيْهِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِىْ أَنْ يُفَصِّلَ الثَّمَنَ وَيُعَيِّنَ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ، وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ ثَانِيًا فِى الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا جَازَ، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ مَعْلُوْمٌ، وَالثَّمَنَ مَعْلُوْمٌ، وَقَبُوْلُ الْعَقْدِ فِى الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِانْعِقَادِهٖ فِى الْآخَرِ وَلٰكِنْ هٰذَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ، لِكَوْنِهٖ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ، كَمَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُفَصِّلَ، وَلَا يُعَيِّنَ وَالرَّابِعُ أَنْ يُعَيِّنَ، وَلَا يُفَصِّلَ، وَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِى الْوَجْهَيْنِ إِمَّا لِجَهَالَةِ الْمَبِيْعِ، أَوْ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে দুটি দাস এই শর্তে বিক্রি করে যে, দুটোর একটিতে ক্রেতার তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি দুটোর প্রতিটিকে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রয় করে যে, নির্দিষ্ট একটিতে তিন দিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ মাসআলার সুরত চারটি। **প্রথম সুরত:** বিক্রেতা [প্রতিটি দাসের বিপরীতে পৃথকভাবে] মূল্য ধার্য করেনি এবং কোনটিতে খেয়ার হবে তা নির্দিষ্ট করেনি। কিতাবে [জামে সগীরে] উল্লিখিত দু-সুরতের এটি প্রথমটি। এর ফাসিদ হওয়াটা বিক্রয়মূল্য ও বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত থাকার কারণে। কারণ, যে গোলামে খেয়ার তা চুক্তি বহির্ভূত ক্রীতদাসের মতো। কারণ, খেয়ারের বর্তমানে হুকুম [অর্থাৎ মালিকানা] সাব্যস্ত হওয়ার হিসেবে চুক্তি সংগঠিত হয় না। অতএব চুক্তিভুক্ত রইল দুটোর একটি। আর তা অনির্দিষ্ট। **দ্বিতীয় সুরত :** [প্রতিটির বিপরীতে পৃথকভাবে] মূল্য ধার্য করা এবং কোনটিতে খেয়ার তা নির্দিষ্ট করা। কিতাবে উল্লিখিত দ্বিতীয় সুরত হলো এটি। [এ সুরতে] বিক্রয় জায়েজ। কারণ, বিক্রয়পণ্যও নির্দিষ্ট এবং বিক্রয়মূল্যও নির্দিষ্ট। অবশ্য যেটায় খেয়ার রয়েছে, তাতে চুক্তি কবুল করাটা যদিও অপরটিতে বিক্রয় সংগঠিত হওয়ার জন্য শর্ত, কিন্তু এটি চুক্তিকে ফাসিদকারী নয়। কারণ, তা বিক্রয়ের ক্ষেত্র। যেমন কেউ দাস ও মুদাব্বারকে [একই বিক্রয়চুক্তিতে] একত্র করলে [তা ফাসিদ নয়]। **তৃতীয় সুরত :** [প্রতিটি দাসের বিপরীতে] মূল্য ধার্য করা, তবে [খেয়ার কোনটিতে তা] নির্দিষ্ট না করা। **চতুর্থ সুরত :** [কোনটিতে খেয়ার তা] নির্দিষ্ট করা, কিন্তু [প্রতিটির বিপরীতে] মূল্য ধার্য না করা। বিক্রয়পণ্য বা মূল্য অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এ দু-সুরতে চুক্তি ফাসিদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারত ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীরের। আলোচিত মাসআলার সুরত চারটি। ইবারতে দু-সুরত উল্লিখিত হয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বিশ্লেষণসহ উক্ত চার সুরতই উল্লেখ করেছেন।

প্রথম সুরত : قَوْلُهُ أَحَدُهَا أَنْ لَا يُفَصِّلَ الثَّمَنَ وَلَا يُعَيِّنَ الخ : এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলাম বিক্রি করল, এই শর্তে যে, একটি গোলামে ক্রেতার তিন দিনের খেয়ার থাকবে। কিন্তু দুটির কোনটির মূল্য কত তা ধার্য করেনি এবং দুটির কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার থাকবে তাও নির্দিষ্ট করেনি। ইবারতে উল্লিখিত দু-সুরতের এটি প্রথমটি। এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ, এ সুরতে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত এবং মূল্যও অজ্ঞাত। তা এভাবে যে, যে গোলামে ক্রেতার খেয়ার রয়েছে তাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি, তাই তা যেন চুক্তি-বহির্ভূত। সুতরাং চুক্তিভুক্ত রইল একটি। একটিতে বিক্রয় সংগঠিত হয়েছে এবং তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সেটা কোনটি এবং তার মূল্য কত তা নির্দিষ্ট না হওয়ায় বিক্রয়পণ্যও অজ্ঞাত এবং মূল্যও অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য ও মূল্যের উভয়টি কিংবা কোনো একটি অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। অতএব এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

দ্বিতীয় সুরত : قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ الثَّانِيْ اَنْ يُفَصِّلَ الثَّمَنَ وَيُعَيِّنَ الخ : বিক্রেতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেছে এবং কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তাও নির্দিষ্ট করেছে। এটা ইবারতে উল্লিখিত দ্বিতীয় সুরত। এ সুরতে বিক্রয় জায়েজ। কারণ, যে গোলামে খেয়ার নেই তাতে বিক্রয়চুক্তি সংগঠিত হয়েছে এবং তার মূল্যও ধার্য করা আছে। তাই বিক্রয়পণ্যও জানা এবং মূল্যও জানা। অতএব বিক্রয় জায়েজ হওয়াতে কোনো বাধা নেই।

তবে এ সুরতে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যেন বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তিতে এ ধরনের একটি শর্ত করল যে, যদি খেয়ারবিহীন গোলামটি ক্রয় করতে হয়, তাহলে খেয়ারাধীন গোলামে বিক্রয়চুক্তি কবুল করতে হবে। যে গোলামে খেয়ার আছে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি বিধায় তা যেন বিক্রয়চুক্তি বহির্ভূত। আর বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তি-বহির্ভূত কোনো বিষয়ের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি নিজের মালিকানাধীন গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে বিক্রি করে, তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। গোলামেও বিক্রয় দুরস্ত হয় না। কারণ, এ সুরতে বিক্রেতা যেন এই শর্ত করছে যে, যদি গোলাম ক্রয় করতে হয় তাহলে স্বাধীন ব্যক্তির বেলায় বিক্রয়চুক্তি কবুল করতে হবে। আর স্বাধীন ব্যক্তি বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য নয়। তাই তা বিক্রয়পণ্য নয়। অতএব, বিক্রয় চুক্তিতে চুক্তি বহির্ভূত বিষয়ের শর্ত করা হলো। আর বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তি বহির্ভূত কোনো বিষয়ের শর্ত করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। তাই তা ফাসিদ হবে। আলোচ্য মাসআলায় যেন ঠিক একই শর্ত করা হয়েছে। অতএব এ চুক্তিও ফাসিদ হওয়া উচিত।

হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর জবাবে বলেন, যে গোলামে ক্রেতার খেয়ার রয়েছে তা বিক্রয়যোগ্য পণ্য। আর তাই তা বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে; যদিও মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে অন্তর্ভুক্ত নয়। যখন খেয়ারাধীন গোলাম বিক্রয়যোগ্য পণ্য হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত, তখন বিক্রয়চুক্তিতে চুক্তিবহির্ভূত কোনো বিষয় কবুল করার শর্ত করা হয়নি। অতএব বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। এর উদাহরণ হলো, কেউ যদি গোলাম ও মুদাব্বারকে একই বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ নয়; গোলামে বিক্রয় কার্যকর হয়। কারণ, মালিকানাধীন হেতু মুদাব্বার বিক্রয়ের স্থল। তাই তা বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে বিক্রয়চুক্তিতে বহির্ভূত কোনো জিনিসের শর্ত করা হয় না।

তৃতীয় সুরত : وَالثَّالِثُ اَنْ يُفَصِّلَ وَلَا يُعَيِّنَ : বিক্রেতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেছে, কিন্তু কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তা নির্দিষ্ট করেনি। এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ সুরতে কোন গোলামটিতে এখনি বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়েছে তা নির্দিষ্ট নয় বিধায় বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। সুতরাং এ সুরতে বিক্রয় ফাসিদ হবে।

চতুর্থ সুরত : وَالرَّابِعُ اَنْ يُعَيِّنَ وَلَا يُفَصِّلَ : বিক্রেতা প্রতিটি গোলামের বিপরীতে মূল্য ধার্য করেনি, কিন্তু কোনটিতে ক্রেতার খেয়ার তা নির্দিষ্ট করেছে। এ সুরতেও বিক্রয় ফাসিদ। কারণ, এ সুরতে যে গোলামটিতে এখনি বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়েছে তা নির্দিষ্ট, কিন্তু তার মূল্য ধার্য নয় বিধায় বিক্রয়মূল্য অজ্ঞাত। আর বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হলে যেরূপ বিক্রয় ফাসিদ হয় তেমনি বিক্রয়মূল্য অজ্ঞাত হলেও বিক্রয় ফাসিদ হয়। সুতরাং এ সুরতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ عَلٰى أَنْ يَّأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِعَشَرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذٰلِكَ الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيْعِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (رح)، وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ شَرْعَ الْخِيَارِ لِلْحَاجَةِ إِلٰى دَفْعِ الْغَبْنِ لِيَخْتَارَ مَاهُوَ الْأَرْفَقُ وَالْأَوْفَقُ، وَالْحَاجَةُ إِلٰى هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيْعِ مُتَحَقِّقَةٌ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلٰى اخْتِيَارِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ اخْتِيَارِ مَنْ يَشْتَرِيْهِ لِأَجْلِهِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْبَيْعِ، فَكَانَ فِى مَعْنٰى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি দু'টি কাপড় [এর একটি] এই শর্তে ক্রয় করে যে, দু'টির যেটা ইচ্ছা সে দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে এবং তার তিন দিনের খেয়ার থাকবে তাহলে তা জায়েজ আছে। এরূপভাবে তিনটি কাপড় [এর একটি হলেও জায়েজ]। কিন্তু কাপড় যদি চারটি হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ। আর কিয়াসের দাবি হলো বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত হওয়ায় সকল সূরতে বিক্রয় ফাসিদ হওয়া। এটাই ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইসতিহসানের দলিল হলো, শরিয়ত কর্তৃক খেয়ারকে বৈধ করা হয়েছে ঠকা রোধ করার প্রয়োজনে; যাতে খেয়ারের শর্তারোপকারী অধিকতর লাভজনক ও সুবিধাজনক বস্তুটি নির্বাচন করতে পারে। আর এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজনও সুসাব্যস্ত। কারণ, খেয়ারের শর্তারোপকারী [অনেক সময়] নির্ভরযোগ্য কারো পছন্দের প্রতি কিংবা যার জন্য সে ক্রয় করছে তার পছন্দের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর বিক্রেতা তাকে বিক্রয় চুক্তি ছাড়া তার কাছ থেকে তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিবে না। সুতরাং শরিয়ত তিনদিন মেয়াদী যে শর্তভিত্তিক ইচ্ছাধিকার বৈধ করেছে এটা তারই সমপর্যায়ের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারে তা'ঈন : মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা করে। কিন্তু ঐ জিনিসের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ এবং ঐ জিনিসের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় একই জিনিস বিভিন্ন মানের হয়, আবার একই মানের জিনিস বিভিন্ন ডিজাইনের ও বিভিন্ন কালারের হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ে শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত শর্তভিত্তিক খেয়ারের উপর কিয়াস করে এসব প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম খেয়ারে তা'ঈন বা নির্দিষ্টকরণের খেয়ারকে বৈধ করেছেন।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা একটি কাপড় কেনার জন্য দোকানে গেল। বিক্রেতা একই মানের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন ও ভিন্ন ভিন্ন কালারের দু'টি/ তিনটি কাপড় দেখিয়ে ক্রেতাকে বলল, তিনটি কাপড়ের যেটা ইচ্ছা আপনি নিতে পারেন, সবগুলোর দাম সমান, যেটা নেন একশ টাকা। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মানের দু'টি/ তিনটি কাপড় দেখিয়ে বলল, এর দাম একশ' টাকা, এর দাম

দেড়শ' টাকা, আর এর দাম দু'শ টাকা, আপনার ইচ্ছা যেটা নেন। এ সব সূরতে ক্রেতাকে তার উদ্দিষ্ট একটি পণ্য নির্দিষ্ট করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। এটাকেই খেয়ারে তা'ঈন বলে।

তবে নির্দিষ্ট করার জন্য ক্রেতা কতটুকু সময় পাবে কিংবা বলা যায়, খেয়ারে তা'ঈনের সময়সীমা কতটুকু হবে- এ নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। শর্তভিত্তিক খেয়ারের সময়সীমার ব্যাপারে যে মতপার্থক্য, ঠিক একই মতপার্থক্য খেয়ারে তা'ঈনের বেলায়ও। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সর্বোচ্চ সময়সীমা তিন দিন, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিতে যতদিন ধার্য হয়। এর কারণ হলো, খেয়ারে তা'ঈনকে তো খেয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করেই বৈধ করা হয়েছে। অতএব, শর্তভিত্তিক খেয়ারের সময়সীমা যা হবে, খেয়ারে তা'ঈনেও তাই হবে।

খেয়ারে তা'ঈনের ভিত্তিতে নেওয়া দু'টি/ তিনটি কাপড়ের যে কোনো একটি বিক্রয় পণ্য হবে। অবশিষ্ট একটি বা দু'টি ক্রেতার হাতে আমানত থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا الخ : উপরোক্ত মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত জামে সগীরের। সাহিবে হিদায়া তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সূরতে মাসআলা এই যে, এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দোকানে গেল। বিক্রেতা তাকে দু'টি কাপড় দেখাল। ক্রেতা বলল, আমি দশ টাকার বিনিময়ে দু'টির একটি এ শর্তে ক্রয় করলাম যে, যেটা পছন্দ হয় সেটা নিব এবং আমার তিনদিনের খেয়ার থাকবে। বিক্রেতা সম্মত হলো। এ সূরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

এরূপ চুক্তি যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে হয় অর্থাৎ বিক্রেতা তিনটি কাপড় দেখাল আর ক্রেতা বলল, আমি এ তিনটি কাপড়ের একটি একশ টাকার বিনিময়ে এই শর্তে ক্রয় করলাম যে, যেটা পছন্দ হয় সেটা নিব এবং আমার তিনদিনের খেয়ার থাকবে, তাহলে তাও জায়েজ হবে। কিন্তু চার কাপড়ের মাঝে এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ الخ : সাহিবে হিদায়া বলেন, কিয়াস অনুযায়ী তিনো সুরতেই বিক্রয় ফাসিদ হয় এবং ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও তাই। কারণ, দুই/ তিন/ চার কাপড়ের মধ্যে কোনটি বিক্রয়পণ্য (مَبِيع) তা বিক্রয়চুক্তির সময় অজ্ঞাত থাকে। আর ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য ও বিক্রয় মূল্যের কোন একটি অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। তাই এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَوْلُهُ وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ شَرْعَ الْخِيَارِ لِلْحَاجَةِ الخ : সাহিবে হিদায়া বলেন, কিন্তু ইসতিহসান হিসেবে এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি বৈধ। ইসতিহসানের দলিল হলো, শরিয়ত শর্তভিত্তিক খেয়ারকে বৈধ করেছে ঠক রোধ করার প্রয়োজনে; যাতে খেয়ারের শর্তারোপকারী চিন্তাভাবনা করে তার জন্য যেটাকে অধিকতর লাভজনক ও সুবিধাজনক মনে করে তা নির্বাচন করতে পারে। আর এ ধরনের প্রয়োজন খেয়ারে তা'ঈনেও পাওয়া যায়। কারণ, অনেক সময় মানুষ একটি জিনিস ক্রয় করার ইচ্ছা করে। কিন্তু ঐ জিনিসের ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তখন তাকে অভিজ্ঞ এবং ঐ জিনিসের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তির পরামর্শ ও পছন্দ অনুসারে ক্রয় করতে হয়। অনেক সময় একই জিনিস বিভিন্ন মানের হয়, আবার একই মানের জিনিস বিভিন্ন ডিজাইনের ও বিভিন্ন কালারের হয়। অনেক সময় ক্রেতা নিজের জন্য ক্রয় করে না, অন্যের জন্য ক্রয় করে। যার জন্য ক্রয় করে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকে। তার পছন্দের জন্য বেছে বেছে কয়েকটি কাপড় তার কাছে নিয়ে আসতে হয়। আর বিক্রেতা তাকে বিক্রয়চুক্তি ছাড়া তার কাছ থেকে তা নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয় না। এসব কারণে অর্থাৎ প্রয়োজনের বিবেচনায় খেয়ারে তা'ঈন তিনদিন মেয়াদি শর্তভিত্তিক খেয়ারের সমপর্যায়ভুক্ত। অতএব প্রয়োজনের কারণে যেমন শরিয়ত শর্তভিত্তিক খেয়ার বৈধ করেছে তেমনি খেয়ারে তা'ঈনও বৈধ হবে।

আর খেয়ারে তা'ঈনের বেলায় বিক্রয়কালে বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত থাকলেও তা বিক্রয়চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য বাধা নয়। কেননা, এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ (مُفْضِيٌّ إِلَى الْمُنَازَعَةِ) হয় না। তা এ জন্য যে, বিক্রেতার পক্ষ থেকে তো ক্রেতাকে পণ্য নির্দিষ্ট করার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। তাই ক্রেতার পছন্দের উপর বিক্রেতার কিছু বলার অবকাশ থাকে না। আর যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা বিক্রয়চুক্তি বৈধ হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

غَيْرَ أَنَّ هٰذِهِ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالثَّلَاثِ لِوُجُوْدِ الْجَيِّدِ وَالْوَسْطِ وَالرَّدِيِّ فِيْهَا ، وَالْجَهَالَةُ لَا تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الثَّلَاثِ لِتَعْيِيْنِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، وَكَذَا فِي الْاَرْبَعِ ، اِلَّا أَنَّ الْحَاجَةَ اِلَيْهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ ، وَالرُّخْصَةُ ثُبُوْتُهَا بِالْحَاجَةِ وَكَوْنِ الْجَهَالَةِ غَيْرَ مُفْضِيَّةٍ إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، فَلَا تَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ قِيْلَ يُشْتَرَطُ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْ هٰذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ التَّعْيِيْنِ ، وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ، وَقِيْلَ : لَا يُشْتَرَطُ ، وَهُوَ الْمَذْكُوْرُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ ، فَيَكُوْنُ ذِكْرُهُ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِبَارِ وِفَاقًا لَا شَرْطًا ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَابُدَّ مِنْ تَوْقِيْتِ خِيَارِ التَّعْيِيْنِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ ، وَبِمُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ أَيَّتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا ، ثُمَّ ذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ اِشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ ، وَفِيْ بَعْضِهَا اِشْتَرٰى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ ، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ فِي الْحَقِيْقَةِ أَحَدُهُمَا ، وَالْأُخَرُ اَمَانَةٌ ، وَالْأَوَّلُ تَجَوُّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ ـ

অনুবাদ : তবে তাতে উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন তিন মানের কাপড় থাকাতে প্রয়োজন তিনটি কাপড়ের দ্বারাই মিটে যায়। আর খেয়ারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্দিষ্টকরণের কারণে তিনটি কাপড়ে [-র মাঝে বিক্রয় পণ্য কোনটি এ] অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত করে না। এরূপভাবে চার কাপড়েও [ঝগড়ার দিকে ধাবিত করে না।] তবে চার কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান নেই। অথচ প্রয়োজনের কারণে এবং অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত না করার কারণেই [এ ধরনের বিক্রয়ের] অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং দু'টির একটি দ্বারা অনুমতি সাব্যস্ত হবে না। [দু'টোই বিদ্যমান থাকতে হবে।] কারো কারো মতে এ চুক্তিতে নির্দিষ্টকরণের খেয়ারের সাথে সাথে শর্তভিত্তিক খেয়ারের [-এর উল্লেখ] থাকাও শর্ত। জামে সগীরে এটাই উল্লিখিত হয়েছে। আর কারো কারো মতে শর্ত নয়। এটা জামে কাবীরে উল্লিখিত হয়েছে। এ হিসেবে [অর্থাৎ জামে কাবীরের উল্লেখ অনুযায়ী] শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ শর্তরূপে নয়, বরং ঘটনাক্রমে। যখন শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ থাকবে না তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে নির্দিষ্টকরণের খেয়ার তিনদিন ধার্য করা জরুরি। সাহেবাইন (র.)-এর মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ধার্য করা জরুরি; তা যাই হোক না কেন। [জামে সগীরের] কোনো কোনো নুসখায় "দু'টি কাপড় ক্রয় করল" এর উল্লেখ আছে। আর কোনো কোনো নুসখায় "দুটির একটি ক্রয় করল" এর উল্লেখ আছে। আর এটাই বিশুদ্ধ। কারণ, বিক্রয়পণ্য মূলত দু'টির একটি, অপরটি [ক্রেতার হাতে] আমানত। প্রথমোক্ত নুসখার ইবারত রূপক ও ইঙ্গিতার্থক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّ هٰذِهِ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالثَّلَاثِ الخ : খেয়ারে তা'ঈন তিন কাপড়ে বৈধ। কিন্তু চার কাপড়ে বৈধ নয়। বরং সে ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসিদ। তিন কাপড়ে বৈধ হওয়ার কারণ দু'টি। এক. প্রয়োজন। দুই. বিক্রয়পণ্য অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়ার কারণ না হওয়া। কিন্তু চার কাপড়ে এ উভয় কারণ পাওয়া যায় না। শুধু দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়। প্রথমটি পাওয়া যায় না। কারণ, বিক্রয়পণ্য সাধারণত তিন ধরনের হয়। উন্নত মানের, মধ্যম মানের ও নিম্ন মানের। তিন মানের তিনটি কাপড় হলেই ক্রেতা কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি পছন্দ করতে পারেন। কাপড় চারটি হলে একই মানের দু'টো হয়ে যাবে। তাই তিনটি কাপড়ে যে প্রয়োজন আছে তা চারটিতে নেই। মোটকথা, বৈধতার জন্য যে দু'টি কারণ থাকা দরকার তার একটি না থাকায় চার কাপড়ের মাঝে খেয়ারে তা'ঈনের ভিত্তিতে বিক্রয় ফাসিদ।

قَوْلُهُ ثُمَّ قِيْلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ هٰذَا الْعَقْدِ الخ : বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ করা শর্ত কিনা ? জামে সগীরের যে ইবারত সাহিবে হিদায়া উদ্ধৃত করেছেন তাতে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ আছে। কিন্তু জামে কাবীরের ইবারতে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দু' কিতাবে দু'ধরনের বর্ণনা থাকায় মাশায়েখের মাঝে এ বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এক জামাতের মতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে শর্তভিত্তিক খেয়ারের উল্লেখ শর্ত। ইমাম কারখী (র.)-এর সমর্থন এদিকে। ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) এ মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আরেক জামাতের মতে শর্ত নয়। ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদূবী ও মুহাম্মদ ইবনে শুজা বলখী (র.)-এর মতে এ মত বিশুদ্ধ। যারা বলেন, শর্ত নয় তাদের মতে জামে সগীরের ইবারতে ঘটনাক্রমে শর্তভিত্তিক খেয়ারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চুক্তিতে উল্লেখ করা শর্ত এ হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯]

قَوْلُهُ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَابُدَّ الخ : সাহিবে হিদায়া বলেন, যদি বিক্রয় চুক্তিতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্তের উল্লেখ করা না হয় তাহলে খেয়ারে তা'ঈনের মেয়াদ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে খেয়ারে শর্তের মতো সর্বোচ্চ তিনদিন, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তিকারী দু'জনের সম্মতিতে যতদিন ধার্য হয় ততদিন।

قَوْلُهُ ثُمَّ ذُكِرَ فِيْ بَعْضِ النُّسَخِ إِشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ الخ : সাহিবে হিদায়া বলেন, জামে সগীরের কোনো কোনো নুসখায় إِشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ উল্লিখিত হয়েছে, যেমন আছে উপরোক্ত ইবারতে। আর কোনো কোনো নুসখায় আছে إِشْتَرٰى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ এবং এটিই বিশুদ্ধ। কারণ إِشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ -এর অর্থ হলো, ক্রেতা দু'টি কাপড় ক্রয় করেছে। আর إِشْتَرٰى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ -এর অর্থ হলো, ক্রেতা দু'টি কাপড়ের একটি ক্রয় করেছে। আর উপরোক্ত মাসআলা এটিই যে, ক্রেতা যদি দুই কাপড়ের একটি ক্রয় করে... । একটি কাপড় বিক্রয়পণ্য, অন্যটি তার হাতে আমনত। অতএব বলা যায় إِشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ রূপক (مَجَازٌ) অর্থে এবং ইস্তিআরা (إِسْتِعَارَةٌ) হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ 'সম্পূর্ণটা' বলে "অংশ বিশেষ" বুঝানো হয়েছে।

وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ، وَتَعَيَّنَ الْأُخَرُ لِلْأَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالتَّعْيِيبِ، وَلَوْ هَلَكَا جَمِيعًا مَعًا يَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشُيُوعِ الْبَيْعِ وَالْأَمَانَةِ فِيهِمَا، وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا، لِأَنَّ الْبَاقِيَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْاخْتِلَاطِ، وَلِهٰذَا لَا يَتَوَقَّتُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ، فَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُوْرَثُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : যদি দুই কাপড়ের একটি বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা দোষযুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাতে তার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ, দোষযুক্ত হওয়াতে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। আর অপরটি আমানত হিসাবে নির্ধারিত হবে। আর যদি দু'টোই এক সাথে বিনষ্ট হয় তাহলে প্রতিটির অর্ধেক মূল্য তার উপর আবশ্যক হবে। কেননা, বিক্রয়চুক্তি ও আমানত দু'টোতেই ব্যাপ্ত রয়েছে। যদি বিক্রয়চুক্তিতে খেয়ারে শর্তও থাকে তাহলে তার জন্য উভয়টি ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। যদি খেয়ারের শর্তারোপকারী মৃত্যুবরণ করে তাহলে উত্তরাধিকারীদের একটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, মালিকানা সংমিশ্রণের কারণে শুধু খেয়ারে তা'ঈন অবশিষ্ট আছে। এ কারণেই উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে কোনো সময় নির্ধারণ নেই। আর খেয়ারে শর্তের ব্যাপার হলো, তাতে মিরাস জারি হয় না; আমরা পূর্বে তা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খেয়ারে তা'ঈনের ভিত্তিতে নেওয়া দু'টি/ তিনটি কাপড়েরর যে কোনো একটি বিক্রয় পণ্য হয়। অবশিষ্ট একটি বা দু'টি ক্রেতার হাতে আমানত থাকে। কেউ যদি দু'টি কাপড় নেয় এবং ক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় একটি বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা এমন দোষগ্রস্ত হয় যে, তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না তাহলে বিনষ্ট বা দোষগ্রস্ত কাপড়টিতে তার মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে যাবে এবং অপরটি আমানতের বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, দোষগ্রস্থ হওয়ার কারণে যখন ফেরত দেওয়া যায় না তখন খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আর যদি উভয়টি একসাথে বিনষ্ট বা দোষগ্রস্ত হয় তাহলে ক্রেতার উপর উভয়টির অর্ধেক মূল্য আবশ্যক হবে। কারণ, কোনটা আমানতের আর কোনটা বিক্রয়পণ্য তা নির্ধারিত না থাকায় প্রতিটির অর্ধেককে বিক্রয়পণ্য এবং অবশিষ্ট অর্ধেককে আমানতের পণ্য ধরা হবে। যেহেতু অর্ধেক বিক্রয়পণ্য তাই অর্ধেক মূল্য আবশ্যক হবে। আর অর্ধেক আমানতের পণ্য বিধায় তার জন্য জরিমানা আসবে না। কারণ, আমানতের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো اَلْأَمَانَاتُ لَا تُضْمَنُ আমানতের মাল বিনষ্ট হলে জরিমানা আরোপিত হয় না।

যদি দু'টি কাপড় একসাথে বিনষ্ট না হয়ে আগে পরে হয়, তাহলে যেটা প্রথমে বিনষ্ট হবে তা বিক্রয় পণ্য সাব্যস্ত হবে এবং তার মূল্য ক্রেতার উপর আবশ্যক হবে আর যেটা পরে বিনষ্ট হবে তা আমানতের বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার জন্য ক্রেতাকে কিছু দিতে হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَنْ الخ : যদি চুক্তিতে খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্ত থাকে তাহলে ক্রেতার জন্য উভয় কাপড়টি ফেরত দেওয়া বৈধ হবে। কারণ, একটি কাপড় তার কাছে আমানত। তা বিক্রেতাকে আমানতের মাল হিসেবে ফেরত দিবে। আর অপরটি খেয়ারের শর্তারোপকৃত পণ্য। খেয়ারের ভিত্তিতে তা ফেরত দিবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ الخ : যদি খেয়ারে তা'ঈনের সঙ্গে খেয়ারে শর্তের উল্লেখ করা হয় আর ক্রেতা তিন দিনের ভিতরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে খেয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং একটিতে বিক্রয় অনিবার্য হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির খেয়ারের ভিত্তিতে ঐ বিক্রয়চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। কারণ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, খেয়ারে শর্তের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয় না। এরূপভাবে মৃত ব্যক্তির খেয়ার তা'ঈন বা নির্দিষ্টকরণের ইচ্ছায়ও উত্তরাধিকার জারি হয় না। আর এ জন্যই উত্তরাধিকারীদের জন্য খেয়ারে তা'ঈনের কোনো সময়সীমা নেই। অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য খেয়ারে তা'ঈনের সময়সীমা আছে। তবে উত্তরাধিকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে খেয়ারে তা'ঈন পাবে। কারণ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে তারা একটি পণ্যের মালিক হয়েছে। কিন্তু তাদের মালিকানাধীন পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানাধীন পণ্যের সাথে মিশে আছে। তাই তারা দু'টি/ তিনটির একটিকে নির্দিষ্ট করবে। আর অপরটি আমানতের মাল হিসেবে বিক্রেতাকে ফেরত দিবে।

وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا عَلٰى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ، فَبِيْعَتْ دَارٌ أُخْرٰى إِلٰى جَنْبِهَا، فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ رِضًا، لِأَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَدُلُّ عَلٰى إِخْتِيَارِهِ الْمِلْكَ فِيْهَا، لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ وَذٰلِكَ بِالْاِسْتِدَامَةِ فَيَتَضَمَّنُ ذٰلِكَ سُقُوْطَ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ، فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجِوَارَ كَانَ ثَابِتًا، وَهٰذَا التَّقْرِيْرُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) خَاصَّةً.

অনুবাদ : কেউ যদি তার খেয়ারের শর্তে কোনো বাড়ি ক্রয় করে, এরপর তার পার্শ্ববর্তী আরেকটি বাড়ি বিক্রি হয় আর সে শোফা-এর অধিকার বলে তা গ্রহণ করে তাহলে এটা [বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে তার] সম্মতি [বলে গণ্য হবে]। কারণ, শুফ'আ দাবি করাটা প্রমাণ করে যে, খেয়ারের শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িতে সে মালিকানা অনুমোদন করেছে। কেননা, প্রতিবেশীর ক্ষতি রোধ করার জন্যই শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হয়। আর ক্ষতি রোধ হয় স্থায়ীভাবে মালিকানা গ্রহণ করার দ্বারা। সুতরাং শুফ'আ দাবি করা দাবির পূর্বেই খেয়ার রহিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাই ক্রয়ের সময় থেকে [খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িতে] মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর এতেই প্রমাণিত হবে যে, প্রতিবেশী পূর্ব থেকে ছিল। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবানুসারে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি বাড়ি ক্রয় করার পর দেখল, পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রি হয়েছে। সে তাতে শোফা দাবি করল এবং সে অনুযায়ী ঐ বাড়িটি কিনে নিল। শুফ'আর ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী বাড়ি ক্রয় করায় খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত বাড়িটির বিক্রয়চুক্তিতে সে সম্মত আছে বলে গণ্য হবে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়বে।

উল্লেখ্য যে, শুফ'আ প্রতিবেশীর জমিতে প্রতিবেশীর একটি স্বীকৃত অধিকার। এর স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তির এক খণ্ড জমি/ একটি বাড়ি আছে। তার জমি/ বাড়ির চারপাশে যে সকল জমি/ বাড়ি আছে, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তার কোনোটি দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী জমি/ বাড়িটি একই মূল্যে সে ক্রয় করতে পারে এবং এ বিষয়ে বিক্রিত জমি/বাড়ির মালিকের বা তৃতীয় ব্যক্তির কিছু বলার থাকবে না। শরিয়ত কর্তৃক প্রদত্ত এ অধিকারকে শুফ'আ বলে। এ অধিকার লাভের জন্য বিক্রীত জমি/ বাড়ির পার্শ্ববর্তী জমি/ বাড়ির মালিক হওয়া শর্ত। পার্শ্ববর্তী জমির মালিক অন্য কেউ হলে তার পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষতি রোধ করার জন্যই শরিয়ত শুফ'আর বিধান দিয়েছে।

যেহেতু শুফ'আ দাবির জন্য বাড়ি/ জমির মালিক হওয়া শর্ত আর খেয়ারে শর্তের বর্তমানে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না, তাই আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা পার্শ্ববর্তী বাড়িটি বিক্রি হয়েছে দেখে যখন তাতে শুফ'আ দাবি করল, তখন তার এ দাবি এটা প্রমাণ করে, প্রথমে খেয়ারে শর্তে ক্রয়কৃত জমিটিতে সে তার খেয়ার বাতিল করেছে, এরপর শোফা দাবি করেছে। যেন খেয়ার ছাড়াই সে বাড়িটি কিনেছিল এবং সেই সূত্রে শুফ'আ দাবি করার আগে থেকেই সে ক্রয়সূত্রে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর গৃহীত মূলনীতির কারণে উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কারণ, তার মতে ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করার আগে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় না। আর শুফ'আ দাবির জন্য পার্শ্ববর্তী জমি/বাড়ির মালিক হওয়া শর্ত। তাই খেয়ার বাকি থাকা অবস্থায় শুফ'আ দাবি করা যায় না। কিন্তু সাহেবাঈন (র.)-এর মতে যেহেতু ক্রেতার খেয়ারের সুরতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয় তাই তাদের মতে খেয়ার বাকি থাকা সত্ত্বেও শুফ'আ দাবি করা এবং সেই দাবির প্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী জমির মালিক হওয়া যায়।

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَقَالَا : أَنْ يَرُدَّهُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ، لَهُمَا أَنَّ إِثْبَاتَ الْخِيَارِ لَهُمَا إِثْبَاتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ، وَلَهُ أَنَّ الْمَبِيْعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيْبٍ بِعَيْبِ الشَّرْكَةِ، فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيْبًا بِهِ وَفِيْهِ إِلْزَامُ ضَرَرٍ زَائِدٍ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدِّ أَحَدِهِمَا، لِتَصَوُّرِ إِجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দুই ব্যক্তি এ শর্তে একটি গোলাম ক্রয় করে যে, তাদের উভয়ের খেয়ার থাকবে, অতঃপর একজন [বিক্রয় চুক্তিতে] সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অপরজনের তা ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই। সাহেবাইন (র.) বলেন, অপরজনের তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। একই ধরনের মতপার্থক্য দোষজনিত খেয়ার ও দর্শন ভিত্তিক খেয়ারের ক্ষেত্রেও। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করার অর্থ দু'জনের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করা। সুতরাং তার সঙ্গীর খেয়ার রহিত করার কারণে তার খেয়ার রহিত হবে না। কারণ, তাতে অন্যের অধিকার বাতিল করা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয় পণ্য অংশীদারিত্বের দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে। যদি দু'জনের একজন [খেয়ারের অধিকার বলে] বিক্রয় পণ্য ফেরত দেয় তাহলে তা অংশীদারিত্বের দোষে দোষগ্রস্ত করে ফেরত দিবে। আর এতে "অতিরিক্ত ক্ষতি" আরোপ করা হয়। দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্তকরণ এটা আবশ্যক করে না যে, [বিক্রেতা] তাদের একজনের ফেরত দানে সম্মত। কারণ, ফেরত দানে দু'জনের একমত হওয়া সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রণীত জামে সগীরে আছে, যদি দুই ব্যক্তি মিলে একটি গোলাম এ শর্তে ক্রয় করে যে, উভয়ের খেয়ার থাকবে, এরপর দু'জনের একজন গোলামটি ক্রয়ে সম্মত হয় এবং খেয়ার রহিত করে উদাহরণত সে বলল, আমি খেয়ার ছাড়াই ক্রয় করলাম, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অপরজন খেয়ার বলে গোলামটিকে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, অপরজন ফেরত দিতে পারবে।

সাহিবে হিদায়া বলেন, এ ধরনের মতপার্থক্য খেয়ারে আইব (خِيَارُ الْعَيْبِ) ও খেয়ারে রুয়তের (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ দু'ব্যক্তি মিলে যদি একটি দ্রব্য ক্রয় করে এবং দ্রব্যটি কব্জা করার পর তাতে দোষ পায় তাহলে পণ্যটি রাখা/না রাখার ব্যাপারে তারা দু'জন খেয়ার পায়। দু'জনের একজন যদি দোষসহ পণ্যটি রাখতে সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা

(র.)-এর মতে অপরজন খেয়ারের বলে পণ্যটি দিতে পারবে না। সাহেবাইন (র.)-এর মতে অপরজন ফেরত দিতে পারবে। এরূপভাবে দু'জন মিলে একটি পণ্য ক্রয় করল। কিন্তু কেনার সময় বা কব্জা করার সময় তারা পণ্যটি দেখল না। তাহলে দেখার পর দু'জন পণ্যটি রাখা/না রাখার খেয়ার পায়। এরপর যদি একজন পণ্যটি রাখতে সম্মত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অপরজন তা ফেরত দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ لَهُمَا إِثْبَاتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الخ :

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয় চুক্তিতে দু'জনের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করার অর্থ হলো দু'জনের প্রত্যেকের জন্য খেয়ার সাব্যস্ত করা। আর যে খেয়ার দু'জনের প্রত্যেকের জন্য সাব্যস্ত হয় তাকে যদি একজন রহিত করে দেয় তাহলে অপরজনের খেয়ার রহিত হয় না। কারণ, এতে অপরজনের অধিকার বাতিল করা আবশ্যক হয়। আর অপরের অধিকার বাতিল করা জায়েজ নেই। তাই একজনের খেয়ার রহিত করার দ্বারা অপরজনের খেয়ার রহিত হবে না। সে খেয়ার বলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : সাহিবে হিদায়া বলেন, ক্রেতার খেয়ারের সুরতে বিক্রেতার মালিকানা থেকে বিক্রয় পণ্য অংশীদারিত্বের দোষমুক্ত অবস্থায় বের হয়। খেয়ার রহিত করে একজন বিক্রয়ে সম্মত হওয়ার পর যদি খেয়ার বলে অপরজন বিক্রয় পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দেয় তাহলে পণ্যটিতে বিক্রেতা ও খেয়ার রহিতকারী ক্রেতা সমানভাবে অংশীদার হবে। আর দ্রব্যে অংশীদারিত্ব একটি দোষ। তাই বিক্রেতার এতে অতিরিক্ত ক্ষতি হবে। আর কারো ক্ষতি করা জায়েজ নেই। তাই দু'জনের একজন বিক্রয়ে সম্মত হলে অপরজন খেয়ার বলে তা ফেরত দিতে পারবে না।

সাহিবে হিদায়া বিক্রেতার বেশি ক্ষতি হবে বলেছেন। কারণ যে বিক্রয়ে সম্মত নয় তার যদি বিক্রয় পণ্য ফেরত দেওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে তারও ক্ষতি হবে। বাধ্য হয়ে তাকে নিতে হচ্ছে। এর জন্য তাকে কতগুলো পয়সা গুণতে হবে। কিন্তু তার ক্ষতিটা বিক্রেতার ক্ষতির তুলনায় কম। কারণ, বিক্রেতার ক্ষতি তার কারণে। আর তার ক্ষতি হচ্ছে নিজের কারণে। অন্যের কারণে ক্ষতি হলে মানুষের দুঃখ বেশি হয়। পক্ষান্তরে নিজের কারণে ক্ষতি হলে দুঃখ তুলনামূলক কম হয়।

–[বেনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ الخ : সাহিবে হিদায়া সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাবে বলেন, দু'জনকে খেয়ার দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, একজন ক্রয়ে সম্মত হলে এবং অপরজন ফেরত দিলে বিক্রেতা তাতে সন্তুষ্ট হবে। বরং ক্রেতা এই ভেবে দু'জনকে খেয়ার দিয়েছে যে, নিলে দু'জন একমত হয়ে নিবে, না নিলে দু'জন একমত হয়ে নিবে না। কারণ, নেওয়া/না নেওয়ায় দু'জনের একমত হওয়া সম্ভব। অতএব, একজন ক্রয়ে সম্মত হবে আর অপরজন ফেরত দিবে, এতে বিক্রেতা সন্তুষ্ট নয়। তাই একজন ক্রয়ে সম্মত হলে অপরজন ফেরত দিতে পারবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى أَنَّهُ خَبَّازٌ أَوْ كَاتِبٌ، وَكَانَ بِخِلَافِهِ، فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، لِأَنَّ هٰذَا وَصْفٌ مَرْغُوْبٌ فِيْهِ فَيَسْتَحِقُّ فِى الْعَقْدِ بِالشَّرْطِ، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوْجِبُ التَّخْيِيْرَ، لِأَنَّهُ مَا رَضِىَ بِهِ دُوْنَهُ وَهٰذَا يَرْجِعُ إِلٰى اخْتِلَافِ النَّوْعِ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِى الْأَغْرَاضِ، فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِعَدَمِهِ بِمَنْزِلَةِ وَصْفِ الذُّكُوْرَةِ وَالْأُنُوْثَةِ فِى الْحَيَوَانَاتِ، وَصَارَ كَفَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ، وَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً فِى الْعَقْدِ عَلٰى مَا عُرِفَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো দাস বিক্রি করে এ শর্তে যে, সে রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা সে লিখতে জানে, অথচ দেখা গেল তার ব্যতিক্রম তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে সে দাসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে। কারণ, এটি একটি আগ্রহজনক গুণ, তাই চুক্তিতে শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা [তার] অধিকারী হবে। এরপর তার অবিদ্যমানতা এখতিয়ার প্রদানকে আবশ্যক করবে। কারণ, ক্রেতা এটা ছাড়া ক্রয়ে সম্মত হয়নি। আর এ ভিন্নতা [গুণ ভিন্নতা] উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য স্বল্পতার কারণে শ্রেণীগত ভিন্নতার সমপর্যায়ভুক্ত, যেমন প্রাণীর ক্ষেত্রে নর ও মাদী হওয়ার গুণ। তাই তার অনুপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। আর এটা দোষমুক্ততা গুণের অনুপস্থিতির মতো হলো। তাই যখন ক্রেতা তা গ্রহণ করবে, পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। কারণ, পূর্ব বর্ণিত নীতি অনুযায়ী যেহেতু গুণ চুক্তিতে অনুবর্তী বিষয় তাই গুণের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ আসে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কেউ যদি কোনো গোলাম এই শর্তে ক্রয় করে যে, গোলামটি রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা লেখতে জানে কিন্তু ক্রয়ের পর দেখা গেল সে রুটিও তৈরি করতে জানে না, লিখতেও জানে না তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না, তবে ক্রেতা গোলামটি গ্রহণ করা/না করার ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। যদি গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে হবে।

বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ না হওয়ার কারণ এই যে, যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না এবং যে গোলাম লিখতে জানে, আর যে লিখতে জানে না- এ দু'জনের মাঝের ভিন্নতা হলো শ্রেণীগত ভিন্নতা (إِخْتِلَافُ النَّوْعِ)। আর পণ্যের শ্রেণীগত ভিন্নতার কারণে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় না। উদাহরণত এক ব্যক্তি কুরবানি করার উদ্দেশ্যে বাজার থেকে গাভী ক্রয় করল। কিন্তু বাড়িতে আনার পর দেখল তা ষাড়। এতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয় না। যদি জাতিগত ভিন্নতা (إِخْتِلَافُ الْجِنْسِ) হয় তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়। যেমন এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল কিন্তু পরে দেখল তা দাস। এতে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়।

ফিকহের পরিভাষায় জাতিগত ও শ্রেণীগত ভিন্নতা নির্ণিত হয় উদ্দেশ্য (أَغْرَاض)-এর বিচারে। দু'টি জিনিসের উদ্দেশ্যের মাঝে ভিন্নতা কম হলে ঐ দু'টি জিনিসকে একই শ্রেণীভুক্ত গণ্য করা হয়। আর উদ্দেশ্যের ভিন্নতা বেশি হলে দুই জিনিসকে দুই জাতি গণ্য করা হয়। যেমন, মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারী দু'টি ভিন্ন জাতি। কারণ দু'টির উদ্দেশ্যের মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন আয়-উপার্জন, নেতৃত্ব দান ও বাড়ির বাইরের কাজ সমাধা করার উদ্দেশ্যে, আর নারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন সন্তান প্রজনন ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু পশুর মধ্যে নর ও মাদী একজাতি, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণী। কারণ গরু আর গাভীর উদ্দেশ্যের মাঝে ভিন্নতা সামান্যই। এগুলো সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের গোশতের চাহিদা পূরণ করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যও থাকে। অন্যান্য উদ্দেশ্যের বিচারে এগুলোকে দুই শ্রেণী গণ্য করা হয়।

আলোচ্য মাসআলায় যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না উভয়ের মাঝে ভিন্নতা হলো শ্রেণীগত ভিন্নতা। কারণ, গোলামের মাঝে সাধারণভাবে উদ্দেশ্য একটিই। তা হলো, খেদমত নেওয়া। আর এ উদ্দেশ্য সব গোলামেই সমান। তবে কাজের যোগ্যতার ভিন্নতার কারণে দুই যোগ্যতার অধিকারীকে দুই শ্রেণী গণ্য করা হয়। আর শ্রেণীগত ভিন্নতার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয় না। তাই আলোচ্য বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না।

তবে ক্রেতা বিদ্যমান গোলামটি গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পাবে। কারণ, রুটি তৈরি করতে জানা এবং লিখতে পারা একটি আকর্ষণীয় গুণ (اَلْوَصْفُ الْمَرْغُوْبُ فِيْهِ)। ক্রেতা এ গুণের কারণেই গোলামটি ক্রয় করেছে এবং বিক্রয়চুক্তিতে এর শর্ত করেছে। আর বিক্রয় চুক্তিতে বস্তুর কোনো গুণের উল্লেখ শর্ত আকারে হলে ক্রেতা ঐ গুণসম্পন্ন বস্তুর অধিকারী হয়। ঐ গুণের অবিদ্যমানতায় ক্রেতা বিদ্যমান বস্তুটি গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পায়। কারণ, ঐ গুণ ছাড়া বস্তু ক্রয়ে ক্রেতা সম্মত নয়।

রুটি তৈরি করতে জানা এবং লিখতে পারাটা বস্তুর দোষমুক্ত হওয়ার গুণের মতো। অর্থাৎ কেউ যদি দোষমুক্ত হওয়ার শর্তে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, আর পরে দোষগ্রস্ত পায় তাহলে সে তা গ্রহণ করা/না করার এখতিয়ার পায়। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও রুটি তৈরি করতে না জানায় কিংবা লিখতে না পারায় ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে সে গোলামটি গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে বাদ দিবে। তবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্যে দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, গুণ (وَصْف)-এর বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। কারণ, গুণ পণ্যের অনুবর্তী (تَابِعْ) হওয়ায় উল্লেখ ছাড়াই তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যা উল্লেখ ছাড়াই পণ্যের অনুবর্তী হয়ে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় তার বিপরীতে পৃথকভাবে মূল্য আসে না।

ফায়দা : যখীরা গ্রন্থে আছে, যদি ক্রেতা তার এখতিয়ারের ভিত্তিতে গোলামটি ফেরত দিতে চায় কিন্তু কোনো কারণে ফেরত দিতে পারছে না তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। অর্থাৎ যে গোলাম রুটি তৈরি করতে জানে আর যে জানে না-এ দুয়ের মাঝে দামের যে ব্যবধান হয় ঐ পরিমাণ অর্থ ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ফেরত নিবে।

-[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪]

ফায়দা : ক্রেতা রুটি তৈরি করতে জানে কিংবা লিখতে জানে-এ শর্তে গোলাম ক্রয় করার পর কব্জা করল। বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি তো গোলামটিকে রুটি বানাতে জানে কিংবা লিখতে পারে এরূপ পাইনি। বিক্রেতা বলল, আমি ঠিক মতোই তোমার কাছে অর্পণ করেছি; তোমার কাছে যেয়ে ভুলে গেছে। ক্রেতা-বিক্রেতার কথায় যদি এ ধরনের এখতেলাফ হয় তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মানুষের আসল হলো লেখতে না পারা এবং রুটি তৈরি করতে না জানা। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন, وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে বের করেছেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না।'

-[সূরা নাহল : ৭৮]

بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَصْلًا، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ مَجْهُوْلٌ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَا تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ يَرُدُّهُ، فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايَنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيْتُ ثُمَّ رَآهُ، لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّ الْخِيَارَ مُعَلَّقٌ بِالرُّؤْيَةِ لِمَا رَوَيْنَا، فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهَا، وَحَقُّ الْفَسْخِ بِحُكْمِ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ، لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيْثِ، وَلِأَنَّ الرِّضَاءَ بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَوْصَافِهِ لَا يَتَحَقَّقُ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ رَضِيْتُ، قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ : رَدَدْتُ ـ

পরিচ্ছেদ : দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার

অনুবাদ : কেউ যদি না দেখে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে, আর যখন সে ঐ জিনিস দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। যদি চায়, জিনিসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, যদি চায় জিনিসটিকে ফেরত দিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোভাবেই বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধ হবে না। কারণ, বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত। আমাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী "কেউ যদি না দেখে কোনো জিনিস ক্রয় করে তাহলে যখন তা দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে।" তাছাড়া না দেখার কারণে [সৃষ্ট] অজ্ঞতা ঝগড়ার দিকে ধাবিত করে না। কারণ, তার মনঃপূত না হলে ফেরত দিয়ে দিবে। সুতরাং এটা চোখে দেখা ও ইশারাকৃত পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকার মতো হলো। এরূপভাবে ক্রেতা যদি বলে, আমি সম্মত আছি, এরপর সে পণ্যটি দেখল, তাহলেও তার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, আমাদের বর্ণিত হাদীস অনুসারে এখতিয়ার দেখার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তা দেখার পূর্বে সাব্যস্ত হবে না। আর [দেখার পূর্বে] বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার এই হাদীসের প্রেক্ষিত হিসেবে নয়, বরং এই হিসেবে যে, তা অবশ্য সাব্যস্ত চুক্তি নয়। তাছাড়া কোনো জিনিসের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে ঐ জিনিসের প্রতি সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং দেখার পূর্বে 'আমি সম্মত আছি' ক্রেতার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু 'আমি [বিক্রয়চুক্তি] প্রত্যাখ্যান করলাম' ক্রেতার এ উক্তি [এর ব্যাপার] ভিন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارٌ অর্থ- এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। اَلرُّؤْيَةُ অর্থ- দেখা, দর্শন। خِيَارٌ শব্দটি اَلرُّؤْيَةُ-এর দিকে ইযাফত (اِضَافَة) হয়েছে। এরূপ ইযাফত اِضَافَةُ الْحُكْمِ اِلٰى سَبَبِهٖ বলা হয়। خِيَارُ الرُّؤْيَةِ অর্থ হচ্ছে- خِيَارٌ يَثْبُتُ بِالرُّؤْيَةِ দর্শনভিত্তিক ইচ্ছাধিকার।

মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয় করে। সাধারণভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের এটাই নিয়ম যে, মানুষ প্রথমে পণ্য দেখে, দরদাম করে, এরপর ক্রয় করে। কিন্তু অনেক সময় এর উল্টাও হয়। পরিস্থিতির কারণে এবং সময়ের অভাবে না দেখেই মানুষকে ক্রয় করতে হয়। আর আজকাল টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সব ক্রয়-বিক্রয় হয় তা প্রায় সবই এ ধরনের। পণ্য

এক স্থানে, বিক্রেতা আরেক স্থানে, আর ক্রেতা আরেক দেশে-প্রয়োজনের কারণেই মানুষকে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়। মানুষের এ সব প্রয়োজনের কারণেই শরিয়ত দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ারের বিধান দিয়েছেন। এর স্বরূপ হলো, এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু পণ্যটি সে দেখেনি। পণ্যটি দূরে কোথাও আছে কিংবা নিকটেই আছে, কিন্তু দেখার মতো সময়-সুযোগ নেই। এ সুরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে ক্রেতা যখন পণ্যটি দেখবে তখন সে এখতিয়ার লাভ করবে; পছন্দ হলে পণ্যটি রাখবে, পছন্দ না হলে ফেরত দিবে। যদি রাখতে চায় তাহলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে রাখবে।

খেয়ারে রুয়তের হুকুম হলো, خِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত থাকলে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু পণ্য দেখার আগে তার পূর্ণ সম্মতি পাওয়া যায় না বিধায় তা পূর্ণাঙ্গ হয় না।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) খেয়ারে রুয়ত-এর আলোচনাকে খেয়ারে আইবের পূর্বে এনেছেন; কারণ, খেয়ারে রুয়ত খেয়ারে আইবের তুলনায় বেশি শক্তিশালী (أَقْوٰى)। খেয়ারে রুয়তের সুরতে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয় না; কিন্তু খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়; অবশ্য বিক্রয় চুক্তির হুকুম তথা বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার মালিকানা অনিবার্য হয় না। আর যা বিক্রয় চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ হতে দেয় না, তা নিশ্চয়ই যা পূর্ণাঙ্গ হতে দেয় তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। বেশি শক্তিশালী বিধায় খেয়ারে আইবের আগে রুয়ত-এর আলোচনা করেছেন। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, প. ৩০৯]

কেউ যদি না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে আমাদের মাযহাবানুসারে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে, আর যখন সে ঐ জিনিস দেখবে তখন সে রাখা বা না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। যদি চায়, জিনিসটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, অথবা জিনিসটিকে ফেরত দিবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) থেকেও এরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী বহু ফুকাহায়ে কেরামও এ মত গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত] এটাই হযরত উসমান ও তালহা (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোভাবেই বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল :

নকলী দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতামতের পক্ষে দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত দু'টি হাদীস পেশ করা হয়।

১. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। না দেখে পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন, তাই এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে তা নিষিদ্ধ হবে।-[মুসলিম শরীফ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়]

২. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- যে দ্রব্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রি কর না। এ হাদীসে স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। না দেখে পণ্য ক্রয় করার সুরতে পণ্য অনুপস্থিত থাকে; তাই তার বিক্রয় নাজায়েজ হবে।-[সুনানে আরবা'আ, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়]

আকলী দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, না দেখে ক্রয়ের সুরতে পণ্য ক্রেতার কাছে অজ্ঞাত থাকে। আর ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্য ও বিক্রয় মূল্যের কোনো একটি অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। অতএব না দেখে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَاٰهُ "কেউ যদি না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তা দেখার পর সে রাখা বা না রাখার এখতিয়ার পাবে।" এ হাদীসটি দারাকুতনীতে মুত্তাসিল সনদে এবং বায়হাকী ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে মুরসাল সনদে একাধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, না দেখে পণ্য ক্রয় করা হলে তা জায়েজ হবে এবং ক্রেতা দেখার পর পণ্যটি রাখা/না রাখার ব্যাপারে এখতিয়ার লাভ করবে।

নাওয়াদিরুল ফুকাহা গ্রন্থে আছে, যে অনুপস্থিত দ্রব্য অর্পণযোগ্য, তা না দেখে বিক্রি করা জায়েজ এবং দেখার পর ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে-এ বিষয়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমত। একবার হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বসরার একটি জমি মদীনায় বসে ক্রয় করেন। হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে হযরত তালহার পক্ষে খেয়ারে রুয়তের সিদ্ধান্ত দেন। -[তহাবী ও বায়হাকী শরীফ]

হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিলের জবাবে বলেন, প্রথম হাদীসটি মূলত যে সব পণ্যদ্রব্য অর্পণযোগ্য নয়, যেমন উড়ন্তপাখি, নদী বা ডোবার যে মাছ শিকার করা হয়নি ইত্যাদি বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। কারণ, বিক্রীতপণ্য নির্ধারিত এবং অর্পণযোগ্য না হলে তবেই তা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু আমরা যে পণ্য না দেখে ক্রয় করা জায়েজ বলছি তা অবশ্যই নির্ধারিত ও অর্পণযোগ্য। কারণ, নির্ধারিত বা অর্পণযোগ্য না হলে আমরাও এরূপ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ বলি না।

আর দ্বিতীয় হাদীস সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসে অনুপস্থিত দ্রব্য বলে মূলত মালিকানাভুক্ত নয় এমন পণ্যের কথা বলা হয়েছে। মূল হাদীসটি অনেক দীর্ঘ। নাসায়ী শরীফে হাদীসটি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِىْ مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ أَبِيْعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ـ

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যে পণ্য আমার কাছে নেই তা বিক্রি করার আবেদন জানায়। আমি কি তার কাছে সেই পণ্য বিক্রি করব এবং এরপর বাজার থেকে সেই পণ্য ক্রয় [করে তার কাছে অর্পণ] করব? তিনি বললেন, যে পণ্য তোমার কাছে নেই তা বিক্রি কর না। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুজুর ﷺ মালিকানাভুক্ত নয় এমন দ্রব্যকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর মালিকানাভুক্ত নয় এমন পণ্য বিক্রি করা নাজায়েজ এ ব্যাপারে আমরাও একমত।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ لَا تُفْضِىْ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর আকলী দলিলের জবাবে সাহিবে হিদায়া বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় দুরস্ত নয় - এটা ঐ অজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যা ঝগড়ার কারণ হয়। কিন্তু যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার পথে বাধা নয়। না দেখে ক্রয়ের সুরতে বিক্রয়পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সৃষ্ট অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কারণ, ক্রেতার মনঃপূত না হলে পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার তো সে পাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিক্রেতার উচ্চবাচ্য করার অবকাশ নেই। সুতরাং ঝগড়ারও কিছু নেই।

قَوْلُهُ كَجَهَالَةِ الْوَصْفِ فِى الْمُعَايَنِ الخ : সাহিবে হিদায়া বলেন, না দেখে কেনার সুরতে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সৃষ্ট অজ্ঞতা চোখে দেখা ও ইশারাকৃত পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত থাকার মতো। বিক্রেতা ক্রেতাকে হাত ইশারায় একটি খাদ্যশস্যের স্তূপ দেখিয়ে বলল, আমি এ স্তূপটি তোমার কাছে একশ' টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এ সুরতে স্তূপে কি পরিমাণ শস্য আছে এবং সেগুলো কোন মানের তা জানা না থাকলেও বিক্রয় জায়েজ হয়। কারণ পরিমাণ ও গুণাগুণের এ অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। না দেখে ক্রয় করার সুরতে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অজ্ঞতাও যেহেতু ঝগড়ার কারণ নয় তাই তাও জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيْتُ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, কেউ যদি না দেখে পণ্য ক্রয় করার পর বলে, পণ্য যেরূপ হোক আমি সম্মত আছি, এতে তার খেয়ার রুয়ত বাতিল হবে না। এরপর যখন সে পণ্য দেখবে তখন সে এখতিয়ার পাবে। কারণ, উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী খেয়ার দেখার সাথে সম্পৃক্ত। যখন দেখবে তখন খেয়ার সাব্যস্ত হবে। দেখার পূর্বে যেহেতু খেয়ার সাব্যস্ত হয় না তাই যা সাব্যস্ত হয়নি তা বাতিল হবে কিরূপে? তাই দেখার আগে খেয়ার বাতিল করলেও বাতিল হবে না।

তাছাড়া কোনো জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আগে ঐ জিনিসের প্রতি সে পুরোপুরি সম্মত আছে এটা বুঝা যায় না। সুতরাং দেখার মাধ্যমে পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার আগে আমি সম্মত আছি - এ কথা বলা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ رَدَدْتُ الخ : কিন্তু দেখার আগে যদি ক্রেতা বলে যে, আমি বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করলাম, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, না দেখে পণ্য ক্রয় করার সুরতে দেখার আগে যদি ক্রেতার এখতিয়ার সাব্যস্ত না হয় তাহলে দেখার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার পাচ্ছে কোত্থেকে? সাহিবে হিদায়া এর জবাবে বলেন, দেখার আগে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার আর দেখার পর বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেয়ার এখতিয়ার দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপার। দেখার পর ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি স্থির রাখার কিংবা বাতিল করার যে খেয়ার পায়, তা পায় مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ এ হাদীসের প্রেক্ষিতে। আর দেখার আগে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার এখতিয়ার পায় বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য না হওয়ার কারণে। কারণ, খেয়ারে রুয়তের সুরতে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয় না। আর যে চুক্তি অনিবার্য হয় না তা যখন তখন ভাঙ্গা যায়।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَقُوْلُ أَوَّلًا : لَهُ الْخِيَارُ اِعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَهٰذَا لِأَنَّ لُزُوْمَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَاءِ زَوَالًا وَثُبُوْتًا، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيْعِ، وَذٰلِكَ بِالرُّؤْيَةِ، فَلَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوْعِ إِلَيْهِ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشِّرَاءِ لِمَا رَوَيْنَا، فَلَا يَثْبُتُ دُوْنَهُ، وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَاعَ أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقِيْلَ لِطَلْحَةَ : إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ، فَقَالَ : لِيَ الْخِيَارُ، لِأَنِّيْ اِشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ، وَقِيْلَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّكَ قَدْغُبِنْتَ، فَقَالَ : لِيَ الْخِيَارُ، لِأَنِّيْ بِعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ، فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَقَضٰى بِالْخِيَارِ لِطَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো দ্রব্য বিক্রি করে যা সে দেখেনি তাহলে [দেখার পর] তার কোনো খেয়ার নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) দোষজনিত খেয়ার ও শর্তভিত্তিক খেয়ারের সাথে তুলনা করে প্রথম দিকে বলতেন যে, তার [বিক্রেতার] খেয়ার রয়েছে। আর এটা এ জন্য যে, চুক্তির অনিবার্যতা [বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত-পণ্যের] স্বত্ব ত্যাগ ও [ক্রেতার] স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কিত পূর্ণ সম্মতির উপর নির্ভরশীল। আর পূর্ণ সম্মতি পণ্যের সম্পর্কে অবগতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর অবগতি হয় দেখার দ্বারা। সুতরাং [না দেখে বিক্রি করার সুরতে] বিক্রেতা পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে পূর্ণ সম্মত নয়। [তাই দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।] আর প্রত্যাবর্তিত মতের দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত রিওয়ায়াত অনুসারে দর্শনভিত্তিক খেয়ার ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ক্রয় ছাড়া অন্য সুরতে তা সাব্যস্ত হবে না। তা ছাড়া বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (র.) বসরার একটি জমি [মদীনায় থেকে] হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (র.)-এর কাছে বিক্রি করেছিলেন। পরে হযরত তালহাকে বলা হলো, আপনি ঠকে গেছেন। তিনি বললেন, আমার [জমিটি রাখা/ না রাখার] এখতিয়ার আছে। কারণ, আমি না দেখা জিনিস ক্রয় করেছি। হযরত উসমান (রা.)-কেও বলা হলো যে, আপনি ঠকে গেছেন। তিনি বললেন, আমার [জমিটি ফেরত নেওয়ার] এখতিয়ার আছে। কারণ, আমি না দেখা জিনিস বিক্রি করেছি। অতঃপর দু'জন তাদের মাঝে [ফয়সালার জন্য] হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-কে বিচারক বানালেন। তখন তিনি হযরত তালহা (রা.)-এর এখতিয়ারের রায় দিলেন। আর এটা ছিল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপস্থিতিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত [দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার] রয়েছে অর্থাৎ কেউ যদি না দেখা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে দেখার পর সে ঐ দ্রব্য রাখা/ না রাখার এখতিয়ার পাবে। আলোচ্য ইবারতের মাসআলা হলো, বিক্রেতার খেয়ারে রুয়ত (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) আছে কিনা? অর্থাৎ কেউ যদি না দেখা কোনো দ্রব্য বিক্রি করে, যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক হলো এবং তা না দেখেই কারো কাছে বিক্রি করে দিল, তাহলে দেখার পর বিক্রয় চুক্তিকে বহাল রাখা কিংবা ঐ জমিটি ফেরত নিয়ে চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার তার এখতিয়ার রয়েছে কিনা? ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিক্রেতার খেয়ারে রুয়ত নেই। না দেখা দ্রব্যটিতে বিক্রেতার দিক থেকে বিক্রয় অনিবার্য হয়ে যায়। ইমাম চতুষ্টয়ের এটাই অভিমত। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথম দিকে বলতেন যে, বিক্রেতার খেয়ারে রুয়ত আছে। তবে পরবর্তীতে তিনি তার এ মত পরিবর্তন করেন।

قَوْلُهُ لَهُ الْخِيَارُ اِعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম মতের দলিল : হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথম দিকে খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে শর্ত [শর্তভিত্তিক এখতিয়ার] ও খেয়ারে আইব [দোষজনিত এখতিয়ার]-এর উপর কিয়াস করেছিলেন। বিক্রয়চুক্তিতে তিন দিনের খেয়ারের শর্ত ক্রেতাও করতে পারেন, বিক্রেতাও করতে পারেন। এরূপভাবে পণ্যে দোষ পাওয়া গেলে তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার যেরূপ ক্রেতার আছে তেমনি মূল্যমুদ্রায় বা মূল্যদ্রব্যে দোষ পাওয়া গেলে বিক্রেতারও তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার আছে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, ক্রেতা দোষের কারণে পণ্য (مَبِيْع) ফেরত দিলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায়। কিন্তু বিক্রেতা মূল্যমুদ্রা বা মূল্যদ্রব্য (ثَمَنٌ) ফেরত দিলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায় না। কারণ, চুক্তিতে পণ্য হলো মূল; মূল্য মূল জিনিস নয়। তাই দোষের ভিত্তিতে মূল্য ফেরত দেওয়া হলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যায় না; বরং দোষমুক্ত মূল্য প্রদান আবশ্যক হয়। মোটকথা, খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে আইবের সুরতে যেমন ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য খেয়ার রয়েছে, তেমনি খেয়ারে রুয়তের সুরতেও ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জন্য খেয়ার থাকবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّ لُزُوْمَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَاءِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে আইবের উপর কোনো যোগসূত্রের (اَلْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ) ভিত্তিতে কিয়াস করেছিলেন, হিদায়া গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণ সম্মতি পাওয়া গেলে বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়; বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্যের স্বত্ব ত্যাগের উপর পূর্ণ সম্মতি, আর ক্রেতার ঐ পণ্যে তার স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি। আর পূর্ণ সম্মতি পণ্যের গুণাগুণ (وَصْف) সম্পর্কে অবগতি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর অবগতি হয় দেখার দ্বারা। কারণ, দেখার দ্বারা পণ্যের ভাল খারাপ দিক সম্পর্কে যেরূপ স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তা শোনার দ্বারা পাওয়া যায় না। সুতরাং না দেখে বিক্রি করার সুরতে বিক্রেতা পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে পূর্ণ সম্মত নয়। অতএব দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে। যেমন খেয়ারে শর্তের সুরতে বিক্রেতা পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে সম্মত নয় বিধায় সে এখতিয়ার পায়। এরূপভাবে খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রেতা দোষযুক্ত মূল্য গ্রহণে সম্মত নয় বিধায় সে তা রাখা/ না রাখার এখতিয়ার পায়। অতএব খেয়ারে রুয়তের সুরতেও বিক্রেতা এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ اَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشِّرَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَثْبُتُ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রত্যাবর্তিত মতের দলিল : গ্রন্থকার (র.) দু'টি দলিল উল্লেখ করেছেন।

১. পূর্বোল্লিখিত যে হাদীস দ্বারা আমরা খেয়ারে রুয়তকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি তাতে খেয়ারে রুয়তকে ক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে আছে, مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ الخ "না দেখা কোনো দ্রব্য কেউ ক্রয় করলে দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।" অতএব ক্রয় ছাড়া অন্য সুরতে খেয়ারে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না।

২. হযরত উসমান ও হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর ঘটনা। একবার হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.)-এর কাছে তার বসরার একটি জমি বিক্রি করেন।

তারা দু'জনের কেউ জমিটি দেখেননি। উভয়ে মদীনায় থেকেই এ ক্রয়-বিক্রয় করেন। কিছুদিন পর হযরত তালহা (রা.) -কে কেউ বললেন, আপনি ঠকে গেছেন, জমিটির দাম আরো কম ছিল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি না দেখা জিনিস ক্রয় করেছি। সুতরাং দেখার পর পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাব। অপরদিকে হযরত উসমান (রা.) -কে কেউ বলল, আপনি ঠকে গেছেন, জমিটির দাম আরো বেশি ছিল। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি না দেখা জিনিস বিক্রি করেছি। তাই আমি জমিটি দেখার পর ফেরত নেওয়ার এখতিয়ার পাব।

দু'জনের একই উক্তিতে বিষয়টি একটু ঘোলাটে হয়ে যায়। কারণ, দু'জনই যদি এখতিয়ার পায় আর এখতিয়ার বলে একজন জমিটি রাখতে চায় আরেকজন ফেরত নিতে চায় তাহলে দু'জনের এখতিয়ার রক্ষা হয় না। তাই মূলত কে এখতিয়ার পাবেন তা নির্ধারণের জন্য তারা বিখ্যাত সাহাবী হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর কাছে বিষয়টি পেশ করেন এবং তার উপর বিষয়টি মীমাংসা করার ভার দেন। হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শুধু হযরত তালহা (রা.) এখতিয়ার পাবেন বলে রায় প্রদান করেন। উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এ রায়ের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং এটা সাহাবায়ে কেরামের ইজমা যে, না দেখা কোনো দ্রব্য বিক্রি করলে বিক্রেতা দেখার পর এখতিয়ার পাবেন না। এ ইজমার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার প্রথম মত থেকে ফিরে আসেন এবং এই মত গ্রহণ করেন যে, বিক্রেতা খেয়ারে রুয়ত তথা দেখার এখতিয়ার লাভ করবে না। -[তাহাবী ও বায়হাকী]

ثُمَّ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، بَلْ يَبْقَى إِلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ، وَمَا يُبْطِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ مِنْ تَعَيُّبٍ أَوْ تَصَرُّفٍ يُبْطِلُ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ، كَالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ، أَوْ تَصَرُّفًا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَ بَعْدَهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ تَعَذُّرُ الْفَسْخِ فَبَطَلَ الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَالْمُسَاوَمَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ، لِأَنَّهُ لَا يَرْبُوْ عَلَى صَرِيحِ الرِّضَاءِ وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ، لِوُجُوْدِ دَلَالَةِ الرِّضَاءِ.

অনুবাদ : দেখার ইচ্ছাধিকার সময়ের সাথে নির্ধারিত নয়। বরং বাতিলকারী কোনো জিনিসের উপস্থিতি পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকবে। আর [পণ্য] দোষগ্রস্ত হওয়া কিংবা [পণ্যে] কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি যে সব বিষয় খেয়ারে শর্তকে বাতিল করে তা দেখার ইচ্ছাধিকারকেও বাতিল করে। তবে কথা হলো, হস্তক্ষেপ যদি এরূপ হয় যা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, যেমন [ক্রয়কৃত দাসকে] মুক্ত করে দেওয়া বা মুদাব্বার বানানো কিংবা এমন হস্তক্ষেপ, যা [পণ্যের মাঝে] অপরের অধিকারকে অবশ্য সাব্যস্ত করে, যেমন [ক্রয়কৃত পণ্যকে] নিঃশর্ত বিক্রি করা, বন্ধক রাখা বা ইজারা দেওয়া, তাহলে তা দেখার আগে হোক বা পরে হোক তা দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে দেয়। কারণ, হস্তক্ষেপটি প্রত্যাহার করা সম্ভব না হওয়াতে কিংবা পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত হওয়াতে বিক্রয়চুক্তি রহিত করা অসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি হস্তক্ষেপ এরূপ হয় যা [পণ্যের মাঝে] অপরের অধিকারকে অবশ্য সাব্যস্ত করে না, যেমন খেয়ারের শর্তে বিক্রয় করা বা দরদাম করা কিংবা অর্পণ না করে কাউকে পণ্য উপহার দেওয়া, তাহলে তা দেখার পূর্বে দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে না। কারণ, এ হস্তক্ষেপ স্পষ্ট সম্মতির চেয়ে বেশি [শক্তিশালী] নয়। আর দেখার পরে হলে দেখার ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে দিবে। কারণ, সম্মতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরোক্ত ইবারতে দু'টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এক. খেয়ারে রুয়তের কোনো সময়সীমা আছে কি না? দুই. খেয়ারে রুয়ত বাতিলকারী জিনিস কি কি?

হানাফী ফিকহবিদগণের মধ্যে কারো কারো মতে খেয়ারে রুয়তের নির্ধারিত সময়সীমা আছে। তারা বলেন, দেখার পর ক্রেতার পছন্দ না হলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দিতে যেটুকু সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়ার থাকবে। এটুকু সময়ে যদি সে বিক্রয়চুক্তি বাতিল না করে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, চুক্তিতে সে সম্মত আছে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।
-[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২]

কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, খেয়ারে শর্তের যেরূপ নির্ধারিত সময়সীমা আছে এবং হ্যাঁ/না কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত প্রদান ছাড়া ঐ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যেরূপ খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে, খেয়ারে রুয়তের এ

ধরনের কোনো সময়সীমা নেই। দেখার আগে বা পরে খেয়ার বাতিলকারী কোনো কারণ না পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত খেয়ার থাকবে। খেয়ার বাতিলকারী কোনো কারণ পাওয়া গেলে তবেই খেয়ার বাতিল হবে।

খেয়ার বাতিলকারী কারণসমূহ কি কি? ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, খেয়ারে শর্ত যে সব কারণে বাতিল হয়,সে সব কারণে খেয়ারে রুয়তও বাতিল হবে। যেমন– ক্রেতার খেয়ারে শর্তের সুরতে বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রয়চুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরূপভাবে ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রীত-পণ্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হলে ধরে নেওয়া হয় ক্রেতা চুক্তিতে সম্মত আছে। তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যায়। তদ্রূপ খেয়ারে রুয়তের সুরতেও যদি ক্রেতার কব্জায় থাকাকালে বিক্রীত-পণ্য দোষগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা ক্রেতা পণ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ كَالْإِعْتَاقِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার আল্লামা ফারগানী (র.) বলেন, হস্তক্ষেপের বিভিন্ন সুরত আছে। সব ধরনের হস্তক্ষেপে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না। দুই ধরনের হস্তক্ষেপের কারণে খেয়ার বাতিল হবে।

১. যে হস্তক্ষেপ (تَصَرُّف) প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখার আগে হোক বা পরে হোক, এর কারণে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, ক্রেতা গোলাম ক্রয়ের পর না দেখেই আজাদ করে দিল। এ সুরতে এখতিয়ার বাতিল হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু গোলামটি আজাদ হয়ে গেছে তাই তা এখন তার মালিকানাভুক্ত নয়। অতএব এখতিয়ার বলে গোলামটি সে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে চাইলে তা সম্ভব নয়। তাই তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

   এরূপভাবে গোলাম ক্রয়ের পর না দেখে তাকে মুদাব্বার (مُدَبَّر) বানালে সে ক্ষেত্রেও ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, দেখার পর এখতিয়ার বলে ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো ক্রেতা বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে যে গোলামের মালিক হয়েছিল এখন বিক্রেতাকে সে তার মালিক বানাচ্ছে। আর মুদাব্বার গোলামে মালিকানা পরিবর্তন বৈধ নয়। অতএব এখতিয়ার বলে বিক্রেতাকে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

২. যে হস্তক্ষেপ বিক্রীত-পণ্যে অন্যের মালিকানা আবশ্যকরূপে সাব্যস্ত করে, এ ধরনের হস্তক্ষেপ দেখার আগে হোক বা পরে হোক, এর কারণে ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্যটি নিঃশর্তভাবে কারো কাছে বিক্রি করে ফেলল কিংবা কারো কাছে বন্ধক রাখল কিংবা কাউকে ইজারা দিল। এ সব সুরতে পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ায় ক্রেতা এখতিয়ার বলে পণ্যটি যেহেতু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারছে না তাই তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا الخ : আর যে হস্তক্ষেপ বিক্রীত-পণ্যে অপরের অধিকার অবশ্য সাব্যস্ত করে না, তা দেখার পূর্বে হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্যটি খেয়ারের শর্তে কারো কাছে বিক্রি করল অথবা এখনও বিক্রি করেনি, কেবল দরদাম হচ্ছে কিংবা পণ্যটি কাউকে উপহার দিল, কিন্তু এখনও তা তাকে অর্পণ করেনি। এ সকল সুরতে পণ্যে অপরের অধিকার আবশ্যকরূপে সাব্যস্ত না হওয়ায় এখতিয়ার বলে বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরত দেওয়া সম্ভব। তাই ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হবে না। অবশ্য এ সব হস্তক্ষেপ এদিকে ইঙ্গিত করে যে, না দেখা পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতার সম্মতি আছে। কিন্তু তা খেয়ার বাতিলের কারণ হতে পারে না। কারণ, দেখার আগে কেউ যদি স্পষ্টভাবে তার সম্মতি প্রকাশ করে তাহলেও তার খেয়ার বাতিল হয় না। স্পষ্ট সম্মতির তুলনায় সম্মতির ইঙ্গিত অনেক দুর্বল ব্যাপার। তাই যৌক্তিকভাবেই তার কারণে ক্রেতার দেখার এখতিয়ার বাতিল হবে না।

তবে এ সব হস্তক্ষেপ দেখার পর হলে ক্রেতার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, দেখার পর পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতা সম্মত রয়েছে, এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেই এখতিয়ার বাতিল হয়ে যায়। তাই দেখার পর এ ধরনের হস্তক্ষেপ খেয়ার বাতিলের কারণ হবে।

قَالَ : وَمَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَالْأَصْلُ فِي هٰذَا أَنَّ رُؤْيَةَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشْرُوْطٍ لِتَعَذُّرِهِ، فَيَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُوْدِ، وَلَوْ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ أَشْيَاءُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ اٰحَادُهَا كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يُعْرَضَ بِالنَّمُوْذَجِ يَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَرْدَأَ مِمَّا رَأَى، فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ لَهُ الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ اٰحَادُهَا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ لَابُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْجَوْزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ فِيْمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ (رحـ)، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِكَوْنِهَا مُتَقَارِبَةً، إِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ : اَلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ كَافٍ، لِأَنَّهُ يُعَرِّفُ وَصْفَ الْبَقِيَّةِ، لِأَنَّهُ مَكِيْلٌ يُعْرَضُ بِالنَّمُوْذَجِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি শস্যস্তুপের বাইরের দিক অথবা ভাঁজ করা কাপড়ের বাইরের দিক কিংবা দাসীর মুখমণ্ডল কিংবা পশুর মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখে তাহলে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, বিক্রীত-পণ্যের সর্বাংশ দেখা শর্ত নয়। কারণ, তা অসাধ্য। সুতরাং ঐটুকু দেখাই যথেষ্ট হবে, যা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে। যদি বিক্রয়চুক্তিতে [এক জাতীয়] অনেকগুলো জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়, আর তার এককগুলোর মাঝে তারতম্য না হয়; যেমন, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা বস্তু, যার আলামত হলো, [সবগুলোর স্বরূপ বুঝতে অল্প কিছুকে] নমুনা হিসেবে পেশ করা, এ ধরনের বস্তুর একটি দেখাই [সবগুলো দেখার পক্ষে] যথেষ্ট হবে। অবশ্য অবশিষ্টগুলো যদি দেখা জিনিসের চেয়ে নিম্নমানের হয় তখন ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। আর যদি তার এককগুলোর মাঝে তারতম্য হয়; যেমন, কাপড় বা পশু, তাহলে তার প্রতিটিকে দেখা অপরিহার্য। আখরোট ও ডিম ইমাম কারখী (র.)-এর মতানুযায়ী এ পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এগুলো গম ও যবের পর্যায়ভুক্ত হওয়া সমুচিত ছিল। কারণ, এগুলো [-র প্রতিটি] পরস্পর কাছাকাছি। যখন এ মূলনীতি সাব্যস্ত হলো, তখন আমরা বলব, শস্যস্তুপের বাইরের দিক দেখাই যথেষ্ট। কারণ, তা অবশিষ্টগুলোর গুণাগুণ জানিয়ে দেয়। কেননা, স্তুপিকৃত শস্য পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু, [সবগুলোর মান বুঝতে অল্প কিছুকে] নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলাটির বিবরণ হলো–

১. ক্রেতা একটি শস্যস্তূপ ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে শস্যস্তূপের বাইরের অংশ দেখেছে, ভিতরের শস্য বের করে দেখেনি।

২. ক্রেতা একটি ভাঁজ করা থান কাপড় ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে বাইরের দিক দেখেছে, ভিতরে খুলে দেখেনি।

৩. ক্রেতা দাস/ দাসী ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে দাস/দাসীর চেহারা দেখেছে, অন্যান্য অঙ্গ দেখেনি।

৪. ক্রেতা পশু ক্রয় করেছে, ক্রয়কালে মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখেছে, দেহের অন্যান্য অংশ দেখেনি- এ সব সুরতে ক্রেতার উক্ত অংশ বিশেষ দেখাই সমগ্র পণ্য দেখেছে বলে গণ্য হবে। তাই তার জন্য খেয়ারে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيْ هٰذَا أَنَّ رُؤْيَةَ جَمِيْعِ الْمَبِيْعِ الخ : গ্রন্থকার আল্লামা বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) ক্রয়কালে পণ্যের কতটুকু অংশ দেখে থাকলে ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত [দেখার এখতিয়ার] বাকি থাকবে না এ বিষয়ে একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ক্রয়কালে বিক্রয় পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত নয়; বরং যেটুকু দেখলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, তা দেখলেই যথেষ্ট হবে এবং উক্ত পরিমাণ দেখার পর তার দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার বাকি থাকবে না।

পণ্যের সংখ্যা ও ধরন তিন রকম হতে পারে–

১. পণ্যের সংখ্যা একটি।

২. اَلْأَشْيَاءُ غَيْرُ مُتَفَاوِتِ الْأَحَادِ পণ্যের সংখ্যা একাধিক, সবই এক জাতীয় এবং একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় না। এর আলামত হলো, ব্যাগে বা পাত্রে রাখা সমগ্র পণ্যের মান ও স্বরূপ বোঝার জন্য অল্প কিছুকে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়। যেমন কায়ল বা ওজন পরিমাপে বিক্রি করা পণ্য; ধান, চাউল, গম, যব। এরূপভাবে গণনা করে বিক্রি করা পণ্য; যেমন, ডিম, লেবু, পেয়ারা।

৩. اَلْأَشْيَاءُ مُتَفَاوِتُ الْأَحَادِ পণ্যের সংখ্যা একাধিক; সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয়। যেমন, গরু, ছাগল, কাপড় ইত্যাদি।

যদি পণ্যের সংখ্যা একটি হয় তাহলে তার সব অংশ দেখা শর্ত নয়। কেননা, তা বাস্তবিক পক্ষেও এবং শরিয়তের বিধানগত কারণেও অনেক ক্ষেত্রে অসাধ্য হয়। যদি খেয়ার রহিত হওয়ার জন্য পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত হয় তাহলে দাস/ দাসীর গুপ্তস্থান ও সতর খুলে দেখতে হবে। অথচ তা জায়েজ নেই। তাই মুখ্য ও প্রধান অংশটুকু দেখাই যথেষ্ট হবে। যখন মুখ্য ও প্রধান অংশটি দেখবে তখন না দেখা অপ্রধান অংশগুলো তার অনুবর্তী (تَابِعْ) হয়ে যাবে। প্রধান অংশটুকু দেখার কারণে যখন তাতে খেয়ার রহিত হয়ে যাবে তখন অনুবর্তী অংশগুলোতেও খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

অতএব কেউ যদি দাস/ দাসী ক্রয় করে আর ক্রয়কালে দাস/দাসীর মুখমণ্ডল দেখে থাকে তাহলে অবশিষ্ট অংশগুলো দেখার পর তার খেয়ারে রুয়ত বাকি থাকবে না। কারণ মুখমণ্ডলই মানুষের প্রধান ও মুখ্য অঙ্গ। অন্যান্য অঙ্গগুলো মুখমণ্ডলের অনুবর্তী। এ কারণেই অন্যান্য অঙ্গসমূহ এক রকম হওয়া সত্ত্বেও মুখমণ্ডলের তারতম্যের কারণে দাস/দাসীর দামেও তারতম্য ঘটে। হ্যাঁ, যদি ক্রয়কালে ক্রেতা দাস/দাসীর পেট, পিঠ ও অন্য সব অঙ্গ দেখে, কিন্তু মুখমণ্ডল দেখেনি তাহলে মুখমণ্ডল দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে এবং এখতিয়ার বলে উক্ত দাস/দাসী বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ أَحَادُهَا كَالْمَكِيْلِ الخ : যদি পণ্য একাধিক হয়, সবগুলো এক জাতীয় এবং একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় না তাহলে ক্রয়কালে কোনো একটি দেখাই ক্রেতার দেখার এখতিয়ার রহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অতএব কেউ যদি স্তূপকৃত শস্য ক্রয় করে আর ক্রয়কালে স্তূপের বাইরের অংশ দেখে তাহলে স্তূপের অবশিষ্ট শস্য দেখার পর তার খেয়ারে রুয়ত বাকি থাকবে না। কারণ স্তূপের সব শস্য এক জাতীয়, পরস্পর কোনো তারতম্য নেই,

সবগুলোর মান বোঝার জন্য কিছুকে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়। অল্প কিছু দেখলেই অবশিষ্টগুলোর মান কেমন তা বোঝা যায়। অতএব ক্রয়কালে কিছু দেখার অর্থ হলো ক্রেতা সব পণ্যের মান ও অবস্থা জেনে শুনেই ক্রয় করেছে। তাই দেখার পর তার এখতিয়ার বাকি থাকবে না।

এরূপভাবে একই সুতা, একই কালার, একই ডিজাইন এবং একই বুননের কয়েকটি থান কাপড় যদি ক্রেতা একই বিক্রয়চুক্তিতে ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে কেবল একটি থান দেখে তাহলে অবশিষ্ট থানগুলো দেখার পর ক্রেতা দেখার এখতিয়ার পাবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِيْ أَرْدَأَ مِمَّا الخ : তবে ক্রয়ের পর ক্রেতা যদি দেখে যে, সে যা দেখেছিল অবশিষ্টগুলো তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের, তাহলে তখন সে এখতিয়ার পাবে। তবে কোন এখতিয়ার পাবে গ্রন্থকার (র.) তা স্পষ্ট উল্লেখ করেননি। য়ানাবী' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খেয়ারে আইব পাবে। –[প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫]

কাফী গ্রন্থে আছে, যদি অবশিষ্টগুলো দেখা জিনিসের চেয়ে নিম্নমানের হয় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কারণ, ক্রেতা যে মানের পণ্য দেখেছে তা ক্রয়েই সে সম্মত হয়েছে, তারচেয়ে নিম্নমানের পণ্য ক্রয়ে সে সম্মত হয়নি। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, কাফী গ্রন্থের এ দলিল বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, খেয়ারে রুয়ত পাবে। গ্রন্থকার (র.)-এর পূর্বাপর বক্তব্যের দাবিও এটাই। তবে সঠিক কথা হলো, কিছু সুরতে খেয়ারে আইব পাবে, আর কিছু সুরতে খেয়ারে রুয়ত পাবে। যদি পণ্য দেখা জিনিসের চেয়ে এতটা নিম্নমানের হয় যে, তা দোষের সংজ্ঞায় পড়ে তাহলে খেয়ারে আইব, আর যদি দোষের সংজ্ঞায় না পড়ে তাহলে খেয়ারে রুয়ত পাবে। কখনো উভয়টা এক সাথেও হতে পারে। যেমন, ক্রেতা না দেখা পণ্য ক্রয় করার পর এখনও তা কব্জা করেনি। ইতোমধ্যে বিক্রেতা তাকে পণ্যে দোষ আছে বলে জানাল এবং তৎক্ষণাৎ তাকে পণ্য দেখাল। এ সুরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব ও খেয়ারে রুয়ত উভয়টা পাবে। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫]

যখীরা গ্রন্থে আছে, কায়ল পরিমাপে বিক্রি করা পণ্য বা ওজন করে বিক্রি করা পণ্য যদি এক পাত্রে থাকে তাহলে তার কিছু দেখাই যথেষ্ট হবে। যদি পণ্য দুই পাত্রে থাকে আর ক্রেতা একটি পাত্রের পণ্য দেখে তাহলে এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইরাকের মাশায়েখ বলেন, যদি অপর পাত্রের পণ্যের মান ক্রেতার দেখা পাত্রের পণ্যের মতো বা তারচেয়ে ভাল হয় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার বাতিল হবে। আর যদি নিম্নমানের হয় তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। তবে ফেরত দিতে চাইলে সবটাই ফেরত দিতে হবে। ফাতাওয়া কাজীখান গ্রন্থে আছে, বলখের মাশায়েখ বলেন, দুই পাত্রের একটি দেখার দ্বারা ক্রেতার খেয়ার বাতিল হবে না। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ اٰحَادُهَا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ الخ : যদি পণ্যের সংখ্যা একাধিক হয়; সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয় যেমন, একই বিক্রয়চুক্তিতে ক্রেতা কয়েকটি গরু কিংবা কয়েক প্রকারের থান কাপড় ক্রয় করে, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের প্রতিটিকে দেখা আবশ্যক। যদি কোনো একটি না দেখে তাহলে তা দেখার পর ক্রেতা দেখার এখতিয়ার লাভ করবে। কেননা, একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্যের কারণে একটি দেখার দ্বারা অবশিষ্টগুলোর মান ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। তাই প্রতিটিকে দেখা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَالْجَوْزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ فِيْمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ الخ : ইমাম কারখী (র.)-এর উল্লেখ অনুসারে ডিম ও আখরোট এক জাতীয় যে সব দ্রব্যের এককের মাঝে দামে তারতম্য হয় সেই পর্যায়ভুক্ত। কারণ, এগুলো ছোট বড় হয়। কাজী খান (র.)-এর মতও এটি। অতএব ক্রয়কালে ডিম ও আখরোটের প্রতিটিকে দেখা শর্ত। কিন্তু গ্রন্থকার (র.)-এর মতে, এগুলোর যে কোনো একটি দেখাই যথেষ্ট। তাই তিনি বলেন, ডিম ও আখরোট, গম ও যবের পর্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ, এগুলোর একটি অপরটির কাছাকাছি। তাই কিছু দেখাই সবগুলো দেখার পক্ষে যথেষ্ট হবে। মুজাররদ গ্রন্থে আছে, এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী কতিপয় ফিকহবিদের অভিমতও এরূপ। –[প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬]

وَكَذَا النَّظَرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مِمَّا يُعْلِمُ الْبَقِيَّةَ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي طَيِّهِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كَمَوْضَعِ الْعَلَمِ، وَالْوَجْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْآدمِيِّ، وَهُوَ وَالْكَفَلُ فِي الدَّوابِّ، فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ الْمَقْصُودِ، وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ، وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَفِي شَاةِ اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنَ الْجَسِّ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اللَّحْمُ يُعْرَفُ بِهِ، وَفِي شَاةِ الْقُنْيَةِ لَابُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ الضَّرعِ، وَفِيمَا يُطْعَمُ لَابُدَّ مِنَ الذَّوْقِ ، لِأَنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْمُعَرِّفُ لِلْمَقْصُودِ .

অনুবাদ : তদ্রূপ কাপড়ের উপরিভাগ দেখা অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে অবগতি দান করে। অবশ্য ভাঁজের ভিতরে যদি ঐ অংশ থাকে যা সাধারণত মুখ্য হয়, যেমন কারুকাজের স্থান [তাহলে বাইরের দিক দেখা যথেষ্ট হবে না।] মানুষের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল মুখ্য। আর পশুর ক্ষেত্রে মুখ্য হলো মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ। সুতরাং উদ্দেশ্য অংশটি দেখাই বিবেচ্য হবে। অন্যান্য অংশ দেখা বিবেচ্য হবে না। ফিকহবিদগণের কেউ কেউ পশুর পা দেখারও শর্ত করেছেন। প্রথমোক্ত অভিমত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। গোশতের বকরির ক্ষেত্রে ধরে অনুমান করা জরুরি। কারণ, উদ্দেশ্য হলো গোশত, আর তা এভাবে বুঝা যায়। পালার বকরির ক্ষেত্রে ওলান দেখা এবং স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে চেখে নেওয়া আবশ্যক। কারণ, এটাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগতি দান করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا النَّظَرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ الخ : এরূপভাবে কেউ যদি থান কাপড় ক্রয় করে আর ক্রয়কালে কাপড়ের বাইরের দিক দেখে, ভিতরে খুলে দেখেনি, তাহলে অবশিষ্ট কাপড় দেখার পর তার খেয়ারে রুয়ত বাকি থাকবে না। কারণ উপরের দিক দেখেই অবশিষ্ট কাপড়ের মান ও স্বরূপ ক্রেতা বুঝতে পেরেছে এবং তাতে সম্মত হয়েই সে কাপড় ক্রয় করেছে। হ্যাঁ, নকশা ও কারুকাজের স্থান, যা সাধারণত কাপড়ের প্রধান ও মুখ্য অংশ হয়, তা যদি ভাঁজের ভিতরে থাকে এবং ক্রয়কালে ক্রেতা না দেখে তাহলে দেখার পর সে এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَالْكَفَلُ فِي الدَّوَابِّ فَيُعْتَبَرُ الخ : পশুর ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল ও পশ্চাদভাগ দেখা বিবেচ্য হবে। কারণ, পশুতে এ দু'টোই প্রধান ও মুখ্য। অতএব, ক্রয়কালে এ দু'অংশ দেখে থাকলে তার দেখার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু এ দু'অংশ দেখেনি, অবশিষ্ট সব অংশ দেখেছে, তাহলে এ দু'অংশ দেখার পর সে দেখার এখতিয়ার পাবে। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত।

ফিকহবিদগণের কারো কারো মতে ক্রয়কালে পশুর পা দেখাও শর্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, দাস/ দাসীর মতো পশুর মুখমণ্ডল দেখাই যথেষ্ট হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আল মুহাল্লার বর্ণনা অনুসারে পশুর ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের রীতি বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পশুর মুখমণ্ডল, পশ্চাদভাগ ও পা দেখা জরুরি এবং বসার গদি, পাদানি এবং গলার রশি খুলে নেওয়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَفِيْ شَاةِ اللَّحْمِ لَابُدَّ مِنَ الْجَسِّ الخ : যদি গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বকরি ক্রয় করা হয় তবে সেক্ষেত্রে ধরে দেখা বিবেচ্য হবে। কারণ বকরিতে কি পরিমাণ গোশত আছে, বকরি মোটা-তাজা, না কৃশকায় তা ধরে দেখার দ্বারা বুঝা যায়। যদি পালা ও প্রজনন উদ্দেশ্য হয় তাহলে বকরির ওলান দেখা শর্ত। যখীরা গ্রন্থে আছে, ওলান এবং পুরা শরীর দেখা জরুরি। আর যদি স্বাদবিশিষ্ট জিনিস হয় তাহলে চেখে দেখা জরুরি। কারণ, স্বাদটাই এ ক্ষেত্রে মুখ্য। আর তার স্বরূপ চেখে দেখার দ্বারা বুঝা যায়। অতএব ক্রয়কালে চেখে না দেখলে ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত থাকবে।

قَالَ : وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوْتَهَا، وَكَذٰلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ اَوْ رَأَى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، وَعِنْدَ زُفَرَ (رحـ) لَابُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوْتِ، وَالْأَصَحُّ اَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلٰى وِفَاقِ عَادَتِهِمْ فِى الْأَبْنِيَةِ، فَاِنَّ دُوْرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَئِذٍ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَابُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِيْ دَاخِلِ الدَّارِ لِلتَّفَاوُتِ، وَالنَّظَرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوْقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [বাড়ি ক্রয়কালে] যদি ক্রেতা বাড়ির প্রাঙ্গণ দেখে থাকে, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে না; যদিও সে বাড়ির ঘরগুলো [এবং কক্ষগুলো] না দেখে। তদ্রূপই বিধান; যদি বাড়ির বহিরাঙ্গণ দেখে থাকে কিংবা বাইরের দিক থেকে বাগানের গাছগুলো দেখে থাকে। ইমাম যুফার (র.)-এর মতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা জরুরি। বিশুদ্ধতম মত হলো, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যটি ঘর-বাড়ি [নির্মাণের] ক্ষেত্রে তাঁদের [তৎকালীন] প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। কারণ, তৎকালে তাদের ঘর-বাড়িগুলো সাধারণত [ভিতর ও বাইরের দিক থেকে] পার্থক্যপূর্ণ হতো না। কিন্তু বর্তমানে পার্থক্যের কারণে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। বাইরের দিক দেখা ভিতর সম্পর্কে অবগতি দান করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এক ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করেছে। ক্রয়কালে শুধু বাড়ির প্রাঙ্গণ দেখেছে, ঘর ও কক্ষগুলোতে ঢুকে দেখেনি, কিংবা বাড়ির বাইরের অংশ দেখেছে, বাড়ির ভিতরে ঢুকেনি, তাহলে ঘর ও কক্ষগুলো দেখার পর তার দেখার এখতিয়ার অর্জিত হবে না। তদ্রূপ এক ব্যক্তি একটি বাগান ক্রয় করেছে। ক্রয়কালে বাগানের বাইরে থেকে দেখেছে, বাগানের ভিতরে প্রবেশ করেনি, তাহলে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করার পর এবং গাছগুলো দেখার পর তার এখতিয়ার অর্জিত হবে না।

এর দলিল হলো, পূর্বে গেছে যে, বিক্রীত-পণ্যের সব অংশ দেখা শর্ত নয়। কারণ, সব অংশ দেখা অসাধ্য। বাড়ির প্রতি ইঞ্চি ভূমি দেখা এবং বাগানের প্রতিটি গাছ, গাছের শাখা ও কাণ্ড দেখা সহজসাধ্য নয়। তাই মুখ্য ও প্রধান অংশ দেখাই যথেষ্ট হবে। না দেখা অংশগুলো দেখা অংশের অনুবর্তী (تَابِعٌ) হবে। দেখা অংশে খেয়ার রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে অনুবর্তী অংশগুলোতেও খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) -এর মতে ঘর ও কক্ষগুলোর ভিতরে ঢুকে দেখা শর্ত। ইমাম ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মত এটাই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে ঘরের ছাদ, রান্নাঘর, টয়লেট, গোসলখানা, গোয়ালঘর এবং ভিতর ও বাইরের দেয়াল দেখাও শর্ত। এটা ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এরও অভিমত। –[বিনায়া, পৃ. ১২৮]

قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلٰى وِفَاقِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যটি মূলত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগে বাগদাদ ও কূফাবাসীদের ঘর-বাড়ি নির্মাণের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। তৎকালে তাদের নির্মিত বাড়ির বহিরভাগ ও অভ্যন্তরভাগ সাধারণত এক ও অভিন্ন হতো। তাই বাইরের অংশ দেখেই ভিতরের অংশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া

যেত। কিন্তু বর্তমানে নির্মিত বাড়ি ও ঘরগুলোর ভিতরভাগে ও অভ্যন্তরভাগে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। তাই এখন খেয়ার বিলুপ্ত হওয়ার জন্য ইমাম যুফার (র.)-এর মতানুযায়ী ঘর ও কক্ষগুলোতে ঢুকে দেখা, রান্নাঘর, টয়লেট, গোসলখানা, গোয়ালঘর ইত্যাদি দেখা শর্ত। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ইমাম যুফার (র.)-এর মতের উপর ফাতওয়া। -[প্রাগুক্ত]

জাহেরী রেওয়ায়েত অনুযায়ী বাগান ক্রয়কালে বাইরের দিক থেকে দেখে থাকলে কিংবা গাছের মাথাগুলো দেখে থাকলে খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো কোনো ফিক্হবিদ এ রেওয়ায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, বাগানের ভিতরের অংশই মুখ্য ও প্রধান। সুতরাং বাইরের দিক দেখায় খেয়ার রহিত হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বাগান ক্রয়কালে প্রতিটি গাছ, বাগানের দেয়াল এবং পানির সুবিধাদি দেখা শর্ত। -[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯]

ফায়দা : কেউ যদি কাচের পাত্রে রাখা তৈল ক্রয় করে আর পাত্রের বাইরের দিক থেকে দেখে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে হাতে ঢেলে দেখে না নিলে তার খেয়ার রহিত হবে না। কারণ, আড়াল থাকায় সে তেলকে ভালোভাবে দেখেনি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যথেষ্ট হবে। কারণ, কাচ তেলের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করেনি।

তুহফা গ্রন্থে আছে, কেউ যদি আয়নার দিকে তাকায় এবং পণ্যকে দেখে, মাশায়েখ বলেন, এতে তার খেয়ার রহিত হবে না। কারণ, ক্রেতা মূল পণ্যকে দেখেনি, পণ্যের ছবি দেখেছে।

যদি কেউ পানিতে থাকা মাছ ক্রয় করে, যা শিকার ছাড়াই ধরা সম্ভব এবং পানিতে দেখে থাকে, তাহলে কারো কারো মতে ক্রেতার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, সে পণ্যটি হুবহু দেখেছে। আর কারো কারো মতে খেয়ার রহিত হবে না। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কারণ, পানিতে থাকা অবস্থায় মাছের প্রকৃত আকার বুঝা যায় না; বরং কিছুটা বড় দেখা যায়। তাই এ দেখা পণ্য সম্পর্কে অবগতি দান করে না। -[ফাতহুল কাদীর, পৃ. ৩১৮]

قَالَ : وَنَظَرُ الْوَكِيْلِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِيْ حَتّٰى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَلَا يَكُوْنُ نَظَرُ الرَّسُوْلِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِيْ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا : هُمَا سَوَاءٌ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ (رضـ) : مَعْنَاهُ الْوَكِيْلُ بِالْقَبْضِ ، فَأَمَّا الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ فَرُؤْيَتُهُ تُسْقِطُ الْخِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا أَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُوْنَ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلْ بِهٖ، وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْإِسْقَاطِ قَصْدًا : وَلَهُ أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ، تَامٌّ وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَهُوَ يَرَاهُ، وَنَاقِصٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَسْتُوْرًا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উকিলের দেখা ক্রেতার দেখার মতো; তাই [উকিল দেখে থাকলে] ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। তবে দোষগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। বার্তাবাহকের দেখা ক্রেতার দেখার মতো নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। সাহেবাইন (র.) বলেন, উভয়ে সমান। [তাই উকিল বা বার্তাবাহকের দেখার পরও] ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, উকিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কব্জা করার উকিল। যদি ক্রয়ের উকিল হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার দেখা খেয়ারকে রহিত করে দেবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতা [উকিলকে] কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করেছে, খেয়ার রহিত করার উকিল নিযুক্ত করেনি। আর যে বিষয়ে সে উকিল নিযুক্ত হয়নি সে বিষয় সে ক্ষমতা রাখে না এবং এটা দোষজনিত খেয়ার, শর্তভিত্তিক খেয়ার এবং ইচ্ছাকৃত খেয়ার রহিত করার মতো হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– কব্জা দু প্রকার–১. পূর্ণ কব্জা। আর তা হলো, পণ্য দেখে কব্জা করা। ২. অপূর্ণ কব্জা। আর তা হলো, পণ্য গুপ্ত অবস্থায় কব্জা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীর থেকে গৃহীত হয়েছে। মাসআলাটির তিনটি অংশ। দুটি অংশে ইমাম চতুষ্টয় একমত, একটি অংশ নিয়ে তাঁদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।

মাসআলাটির বিবরণ হলো, এক ব্যক্তি না দেখে একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে পণ্যটি তার পক্ষে কব্জা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল; যেমন বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে পণ্যটি কব্জা করার উকিল হও, কিংবা বলল, আমি তোমাকে পণ্যটি কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করলাম। এখন এ উকিল যদি পণ্যটি দেখে, তাহলে তা মুআক্কিল তথা ক্রেতার দেখার মতো হবে। অর্থাৎ ক্রেতার দেখার কারণে যেরূপ খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যায়, তেমনি উকিলের দেখার কারণেও ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত রহিত (سَاقِطٌ) হয়ে যাবে। যখন খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে, তখন ক্রেতা পণ্যটি খেয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। অবশ্য পণ্যে যদি কোনো দোষ প্রকাশ পায়, তাহলে দোষজনিত খেয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে।

কিন্তু ক্রেতা যদি কাউকে পণ্য কব্জার দূত (رَسُوْلٌ) নিযুক্ত করে; যেমন বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে পণ্যটি কব্জার দূত হও; কিংবা বলল, আমি তোমাকে পণ্যটি কব্জার দূত নিযুক্ত করলাম; কিংবা বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যেয়ে বল যে, সে যেন

তোমার কাছে পণ্যটি অর্পণ করে, তাহলে দূতের দেখাটা ক্রেতার দেখার মতো হবে না। অর্থাৎ ক্রেতার দেখার দ্বারা যেরূপ তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যায়, দূতের দেখার দ্বারা তার খেয়ার রহিত হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। তিনি উকিল ও দূতের দেখার মাঝে পার্থক্য করেন। সাহেবাইন [ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)] বলেন, উকিল ও দূত একই রকম। তাঁরা উকিল ও দূতের দেখায় পার্থক্য করেন না। তাঁদের মতে দূতের দেখায় যেরূপ ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না, তেমনি উকিলের দেখায়ও ক্রেতার খেয়ার বিলুপ্ত হবে না। দূতের দেখায় ক্রেতার খেয়ার বিলুপ্ত হবে না– এ বিষয়ে সকলে একমত। মতপার্থক্য হলো উকিলের দেখায় ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত রহিত হবে কিনা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হবে। সাহেবাইন (র.) বলেন, হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ (رض) مَعْنَاهُ الْوَكِيْلُ بِالْقَبْضِ فَاَمَّا الْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, উকিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কব্জার জন্য নিযুক্ত উকিল। কারণ, পণ্য ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের দেখায় ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত রহিত হবে– এ বিষয়ে সকলেই একমত।

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُوْنَ إِسْقَاطِ الخ :

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা উকিলকে কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করেছে., তার খেয়ার বিলোপ করার উকিল নিযুক্ত করেনি। আর যে বিষয়ে সে উকিল নিযুক্ত হয়নি সে বিষয়ে সে ক্ষমতা রাখে না। অতএব কব্জার উকিল ক্রেতার খেয়ার বিলোপ করতে পারবে না। তাই তার দেখায় ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْإِسْقَاطِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে গ্রন্থকার (র.) তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যথা–

১. এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করল। উকিল দেখেশুনেই দোষগ্রস্ত অবস্থায় পণ্যটি কব্জা করল। এতে ক্রেতার খেয়ারে আইব [দোষজনিত এখতিয়ার] বিলুপ্ত হয় না।

২. এক ব্যক্তি খেয়ারের শর্তে একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করল। এ সুরতেও উকিলের পণ্যটি কব্জা করায় ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।

৩. এক ব্যক্তি একটি পণ্য ক্রয় করল। এরপর অপর এক ব্যক্তিকে তা কব্জা করার উকিল নিযুক্ত করল। কব্জার উকিল পণ্যটি গুপ্ত অবস্থায় কব্জা করল। এরপর পণ্যটি দেখল এবং ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ারকে রহিত করে দিল। এতেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না।

এ তিন সুরতে কব্জার উকিলের কারণে ক্রেতার খেয়ার রহিত হয় না। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও কব্জার উকিল দেখে কব্জা করলেও ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ، تَامٌّ وَهُوَ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : গ্রন্থকার (র.) বলেন, কব্জা দু প্রকার : পূর্ণ কব্জা ও অপূর্ণ কব্জা। পণ্য দেখে কব্জা করা হলে তাকে পূর্ণ কব্জা, আর না দেখে কব্জা করা হলে তাকে অপূর্ণ কব্জা বলে। মুআক্কিল অর্থাৎ ক্রেতা এ উভয় প্রকার কব্জার অধিকারী। উকিল নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনোরূপ শর্ত আরোপ করা হয়নি, তাই কব্জার উকিলও উভয় প্রকার কব্জার অধিকারী হবে। মুআক্কিল যদি দেখে কব্জা করে, তাহলে যেরূপ তার খেয়ার রহিত হয়ে যায় তেমনি উকিল দেখে কব্জা করলেও তার খেয়ার রহিত হবে। মুআক্কিল না দেখে কব্জা করলে যেরূপ তার খেয়ার রহিত হয় না, তেমনি উকিল না দেখে কব্জা করলেও তার খেয়ার রহিত হবে না।

وَهٰذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفْقَةِ، وَلَا تَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، وَالْمُوَكِّلُ مَلَكَهُ بِنَوْعَيْهِ، فَكَذَا الْوَكِيْلُ، وَمَتٰى قَبَضَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ الْخِيَارُ، فَكَذَا الْوَكِيْلُ لِإِطْلَاقِ التَّوْكِيْلِ، وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُوْرًا اِنْتَهَى التَّوْكِيْلُ بِالنَّاقِصِ مِنْهُ، فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ قَصْدًا بَعْدَ ذٰلِكَ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، فَيَتِمُّ الْقَبْضُ مَعَ بَقَائِهِ، وَخِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى الْخِلَافِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمُوَكِّلُ لَا يَمْلِكُ التَّامَّ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِقَبْضِهِ، لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِالْخِيَارِ يَكُوْنُ بَعْدَهُ، فَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ وَكِيْلُهُ، وَبِخِلَافِ الرَّسُوْلِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِيْغُ الرِّسَالَةِ، وَلِهٰذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالتَّسْلِيْمَ، إِذَا كَانَ رَسُوْلًا فِي الْبَيْعِ ـ

অনুবাদ : দু প্রকার এজন্য যে, কজা পূর্ণ হয় বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা দ্বারা। আর দেখার এখতিয়ার থাকা অবস্থায় চুক্তি পূর্ণ হয় না। মুআক্কিল উভয় প্রকার কজার অধিকারী, তদ্রূপ উকিলও [উভয় কজার অধিকারী হবে]। মুআক্কিল যখন দেখে কজা করে, তখন তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যায়। সুতরাং উকিল নিয়োগ দান শর্তহীন হওয়ার কারণে উকিলের ক্ষেত্রেও তাই হবে। যখন উকিল পণ্যকে গুপ্ত অবস্থায় কজা করে, তখন ওকালতি অপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। তাই এরপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ার রহিত করার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু দোষজনিত খেয়ারের ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ, দোষজনিত খেয়ার বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হতে বাধা দেয় না। তাই খেয়ার থাকা সত্ত্বেও কজা পূর্ণ হয়ে যায়। আর শর্তভিত্তিক খেয়ারের বিষয়টিতে মতবিরোধ রয়েছে। যদি [ক্রেতার শর্তভিত্তিক খেয়ারের সুরতে উকিল কজা করার পর ক্রেতার খেয়ার অবশিষ্ট থাকে, প্রতিপক্ষের এ কথা] মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে বক্তব্য হলো, সে ক্ষেত্রে মুআক্কিল নিজেই তো পূর্ণ কজার অধিকার রাখে না। কারণ, পণ্য কজা করার দ্বারা তার খেয়ার রহিত হয় না। কারণ, খেয়ারের উদ্দেশ্যেই হলো [পণ্যকে] যাচাই করা, আর তা কজার পরেই হয়। অতএব তার উকিলও পূর্ণ কজার ক্ষমতা রাখে না। বার্তাবাহকের বিষয়টিও ভিন্ন। কারণ, সে কোনো কজারই অধিকার রাখে না। তার কাজ হলো শুধু সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। এ কারণেই সে যখন বিক্রয়চুক্তিতে বার্তাবাহক হয়, তখন সে কজা ও অর্পণ কোনোটারই অধিকার রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ تَمَامَهُ بِتَمَامِ الصَّفْقَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) কজা দু প্রকার কেন তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, কজা পূর্ণ হওয়া বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যদি বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয়, তাহলে কজাও পূর্ণ হবে। যদি চুক্তি অপূর্ণ হয়, তাহলে কজাও অপূর্ণ হবে। কারণ, এটা স্বীকৃত যে, ক্রয়-বিক্রয়ে খেয়ারে রুয়ত থাকলে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয় না। অতএব, ক্রেতা যখন পণ্য দেখে কজা করল তখন পণ্য দেখার কারণে তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে গেল। যখন খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে গেল, তখন চুক্তিও পূর্ণ হয়ে গেল। আর যখন চুক্তি পূর্ণ হলো, তখন ক্রেতার কজাও পূর্ণ হলো।

আর যখন ক্রেতা না দেখে পণ্য কব্জা করল, তখন যেহেতু খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়নি তাই চুক্তিও পূর্ণ হয়নি। আর চুক্তি পূর্ণ না হলে ক্রেতার কব্জাও পূর্ণ হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا إِنْتَهَى التَّوْكِيلُ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে যে তিনটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, গ্রন্থকার (র.) ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে তার উত্তর দিয়েছেন। তৃতীয় উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কব্জার উকিল যেহেতু উভয় প্রকার কব্জার মালিক, তাই যখন সে গুপ্ত অবস্থায় (مَسْتُورًا) পণ্যটি কব্জা করল তখন অপূর্ণ কব্জার মাধ্যমে তার ওকালতি শেষ হয়ে গেল। যখন ওকালতি শেষ হয়ে গেল, তখন ক্রেতার বিষয়াদিতে সে অপরিচিত ব্যক্তির মতো। আর অপরিচিত কোনো ব্যক্তি ক্রেতার খেয়ারে রুয়ত রহিত করার অধিকার রাখে না। তাই পণ্য না দেখে কব্জা করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে উকিল খেয়ার রহিত করলেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الخ : গ্রন্থকার (র.) প্রথম উদাহরণ সম্পর্কে বলেন, খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কারণ, খেয়ারে আইব বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হওয়াতে বাধা দেয় না। অর্থাৎ খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায়। আর চুক্তি যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও কব্জা পূর্ণ হয়ে যাবে। অথচ খেয়ারে রুয়ত থাকা অবস্থায় কব্জা পূর্ণ হয় না। সুতরাং এ পার্থক্যের কারণে খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَخِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى الْخِلَافِ الخ : গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয় উদাহরণ সম্পর্কে বলেন, খেয়ারে শর্তের উপর খেয়ারে রুয়তকে কিয়াস করাও শুদ্ধ নয়। কারণ, যার উপর কিয়াস করা হবে (مَقِيس عَلَيْه) তা সর্বসম্মত বিষয় হতে হবে। কিন্তু ক্রেতার খেয়ারে শর্তের সুরতে কব্জার উকিল যদি পণ্য দেখে কব্জা করে, তাহলে ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে কিনা তাই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে রহিত হবে না। যখন খেয়ারে শর্তের বিষয়টিই মতবিরোধপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হলো, তখন এর দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর মতের পক্ষে সমর্থন কিভাবে হয়?

আর যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় যে, কব্জার উকিলের দেখে কব্জা করার দ্বারা সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না, তাহলে আমাদের বক্তব্য হলো, উকিল সর্বদা মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হয়। আর খেয়ারে শর্তের সুরতে স্বয়ং ক্রেতা তথা মুআক্কিল পূর্ণ কব্জার অধিকারী নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত অর্থাৎ উকিল– সেও পূর্ণ কব্জার মালিক হবে না। অতএব মুআক্কিল (مُوَكِّل) পণ্য দেখে কব্জা করলে যেরূপ খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না, তেমনি উকিল পণ্য দেখে কব্জা করলেও ক্রেতার খেয়ার রহিত হবে না। পক্ষান্তরে খেয়ারে রুয়তের সুরতে মুআক্কিল উভয় কব্জার অধিকারী হয়। আর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উকিলও উভয় কব্জার অধিকারী হয়। তাই খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে শর্তের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ক্রেতার পণ্য কব্জা করার দ্বারা তার খেয়ারে শর্ত কেন রহিত হবে না? এর উত্তর হলো, খেয়ারে শর্তের বৈধতার উদ্দেশ্যই হলো ক্রেতাকে পণ্যের ভালোমন্দ যাচাই করার সুযোগ দেওয়া। আর ভালমন্দ যাচাই হয় কব্জা করার পরেই। সুতরাং কব্জা করার দ্বারা যদি খেয়ার রহিত হয়ে যায়, তাহলে পণ্যের ভালোমন্দ তো যাচাই হলো না, বরং পণ্য ভালো হোক বা মন্দ হোক ক্রেতা নিতে বাধ্য থাকবে। আর এতে খেয়ারে শর্তের বৈধতার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাই কব্জা করার দ্বারা ক্রেতার খেয়ারে শর্ত রহিত হয় না।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الرَّسُولِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا الخ : সাহেবাইন (র.) উকিলকে দূতের উপর কিয়াস করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) উকিল ও দূতের মাঝে পার্থক্য করেছেন। এ পার্থক্যের কারণ হলো, উকিল মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উভয় প্রকার কব্জার অধিকারী, কিন্তু দূত (رَسُوْل) কোনো প্রকার কব্জার অধিকারী নয়। তার কাজ হলো শুধু সংবাদ পৌঁছানো। এ কারণেই কোনো ব্যক্তি যদি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে দূত হয়, তাহলে সে পণ্য কব্জারও অধিকার রাখে না এবং মূল্য অর্পণেরও অধিকার রাখে না। উকিল ও দূত তথা রাসূলের এ পার্থক্যের কারণেই কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থানকে এভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ "বলুন ! আমি তোমাদের উপর উকিল নই।" অথচ তিনি রাসূল ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হলো, উকিল ও রাসূলের অর্থ এক নয়। তাই উকিলকে রাসূলের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ হবে না।

قَالَ : وَبَيْعُ الْأَعْمٰى وَشِرَاءُهُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرٰى، لِأَنَّهُ اشْتَرٰى مَا لَمْ يَرَهُ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيْعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ، وَبِشَمِّهِ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ، وَبِذَوْقِهِ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ، كَمَا فِي الْبَصِيْرِ، وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتّٰى يُوْصَفَ لَهُ، لِأَنَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي السَّلَمِ، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِيْ مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيْرًا لَرَاٰهُ، وَقَالَ : قَدْ رَضِيْتُ ، سَقَطَ خِيَارُهُ، لِأَنَّ التَّشْبِيْهَ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيْقَةِ فِيْ مَوْضَعِ الْعَجْزِ، كَتَحْرِيْكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ فِيْ حَقِّ الْأَخْرَسِ فِي الصَّلٰوةِ، وَإِجْرَاءِ الْمُوْسٰى مَقَامَ الْحَلْقِ فِيْ حَقِّ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَجِّ، وَقَالَ الْحَسَنُ (رحـ) : يُوَكِّلُ وَكِيْلًا يَقْبِضُهُ، وَهُوَ يَرَاهُ، وَهٰذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْوَكِيْلِ رُؤْيَةُ الْمُوَكِّلِ عَلٰى مَا مَرَّ أٰنِفًا ـ

অনুবাদ : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ। যখন সে ক্রয় করবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, সে না-দেখা জিনিস ক্রয় করেছে। আর এ বিষয়টি আমরা পূর্বে স্থির করেছি। অতঃপর তার এখতিয়ার রহিত হবে স্পর্শ করার দ্বারা, যদি স্পর্শ করার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা, যদি ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়, আর চোখে দেখার দ্বারা; যদি চোখে দেখার দ্বারা পণ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন– চক্ষুষ্মানের ক্ষেত্রে। আর ভূমির ক্ষেত্রে ভূমির গুণাগুণ ও [পূর্ণ] বিবরণ তার সম্মুখে তুলে না ধরা পর্যন্ত তার এখতিয়ার রহিত হবে না। কারণ, গুণ বর্ণনা দেখার স্থলবর্তী হয়; যেমন– 'বাইয়ে সালামের' ক্ষেত্রে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন স্থানে দাঁড়ায়– চক্ষুষ্মান হলে সে যেখানে থেকে দেখতে পেত এবং বলে যে, 'আমি সম্মত হলাম,' তাহলে তার এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, অপারগতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যটাই মূলের স্থলবর্তী। যেমন– বোবা ব্যক্তির ব্যাপারে নামাজের ক্ষেত্রে ঠোঁট নাড়ানো কেরাতের স্থলবর্তী ধরা হয় এবং চুলবিহীন ব্যক্তির ব্যাপারে হজের ক্ষেত্রে মাথায় ক্ষুর টেনে নেওয়াকে মাথা মুণ্ডানোর স্থলবর্তী ধরা হয়। ইমাম হাসান (র.) বলেন, অন্ধ ব্যক্তি এমন একজন উকিল নিযুক্ত করবে যে দেখে তা কব্জা করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, একটু আগেই বর্ণিত হয়েছে যে, [তাঁর মতে] উকিলের দেখাই মুআক্কিলের দেখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَبَيْعُ الْأَعْمٰى وَشِرَاءُهُ جَائِزٌ : অন্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ। এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ মত পোষণ করেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হলো, জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ নেই। যদি বিক্রয়চুক্তির সময় অন্ধ হয়, কিন্তু পূর্বে চক্ষুষ্মান ছিল তাহলে তাঁর মতে এরূপ অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২]

জন্মান্ধ ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় জায়েজ নেই– এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, জন্মান্ধ ব্যক্তির রং ও গুণাগুণ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাই তার সামনে পণ্যের গুণ বর্ণনা করা অর্থহীন। অতএব পণ্য তার কাছে অজ্ঞাত (مجهول). আর অজ্ঞাত পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয় যেহেতু নাজায়েজ তাই অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হলো–

১. জন্মান্ধ ও জন্ম পরবর্তী সময়ের অন্ধ উভয় প্রকার অন্ধের সাথেই লোকদের ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রচলন আছে এবং এ বিষয়ে কেউ কোনো আপত্তি উত্থাপন করে না। আর কোনো বিষয়ে মুসলমানদের সর্বসম্মত রায় [ইজমা] যেমন শরিয়তের দলিল, তেমনি আপত্তিহীন লোক-প্রচলনও শরিয়তের দলিল। অতএব জন্মান্ধ ও জন্ম পরবর্তী সময়ের অন্ধ উভয়ের ক্রয় ও বিক্রয় বৈধ হবে।

২. তাছাড়া জন্মান্ধ ব্যক্তি যদি নিজে ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার না রাখে, তাহলে সে অন্য কাউকে তার পক্ষে ক্রয় ও বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করারও অধিকার রাখবে না। কারণ, এটা স্বীকৃত নিয়ম যে, কেউ যদি নিজে কোনো বিষয়ের অধিকার ও ক্ষমতা না রাখে, তাহলে সে ঐ বিষয়ে অপর কাউকে অধিকার ও ক্ষমতা দান করতে পারে না। এ অবস্থায় জন্মান্ধ ব্যক্তির যদি খাবারের প্রয়োজন হয় এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতানুসারে তার নিজেরও কোনো জিনিস ক্রয় করার অনুমতি নেই এবং সে কাউকে উকিলও নিযুক্ত করতে না পারে, তাহলে সে তো না খেয়েই মারা যাবে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই জন্মান্ধ ব্যক্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى، لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ الخ : অন্ধ ব্যক্তি কোনো জিনিস ক্রয় করলে সে খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে। কারণ, পূর্বোক্ত হাদীসে আছে, কেউ যদি না দেখা পণ্য ক্রয় করে, তাহলে সে দেখার পর এখতিয়ার পাবে। অন্ধ ঐ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মতো যে না দেখা পণ্য ক্রয় করে। সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি না দেখে পণ্য ক্রয় করলে যেরূপ খেয়ারে রুয়ত পায় তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও খেয়ারে রুয়ত পাবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيْعَ إِذَا كَانَ الخ

অন্ধ ব্যক্তির খেয়ারে রুয়ত কখন রহিত হবে? এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ্য যে, চোখের দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও বহু পণ্যের ভালোমন্দ ও গুণাগুণ নির্ণয় করা যায়। এটা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেরূপ নির্ণয় করতে পারে তদ্রূপ অন্ধ ব্যক্তিও নির্ণয় করতে পারে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ক্রয়কালে চোখে দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পণ্যের ভালোমন্দ ও গুণাগুণ যাচাই করে থাকলে যেরূপ তার খেয়ারে রুয়ত রহিত হয়ে যায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তিও ক্রয়কালে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ ধরনের পণ্যের ভালোমন্দ যাচাই করে থাকলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। অতএব যদি পণ্য এমন হয় যে, স্পর্শ করা দ্বারা তার মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন– মুরগি, ছাগল ইত্যাদি, তাহলে ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তি তা স্পর্শ করে থাকলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। যদি ঘ্রাণ নেওয়ার দ্বারা পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন– সুগন্ধি ও আতর, তাহলে ঘ্রাণ নিয়ে থাকলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। যদি চোখে দেখার দ্বারা পণ্যের মান ও স্বরূপ বুঝা যায়, যেমন– মধু, দুধ, ঘি ইত্যাদি, তাহলে ক্রয়কালে তা চেখে দেখে থাকলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। যদি দেখা ছাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পণ্যের ভালোমন্দ ও স্বরূপ বুঝা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে পণ্যের গুণ (وَصْف) বর্ণনাকে দেখার স্থলবর্তী ধরা হবে এবং ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তির কাছে পণ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে থাকলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

আবুল লাইস (র.) রচিত শরহে জামেউস সগীর গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পণ্যের ভালোমন্দ ও স্বরূপ স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া কিংবা চেখে দেখার দ্বারা বুঝা সম্ভব হলেও অন্ধ ব্যক্তির খেয়ার রহিত হওয়ার জন্য গুণ বর্ণনা বিবেচ্য হবে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করা বা ঘ্রাণ নেওয়া কিংবা চেখে দেখার দ্বারা পণ্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন– গাছের ফল। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-৩২২]

قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعِقَارِ حَتّٰى يُوْصَفَ لَهُ الخ : যদি অন্ধ ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, যেমন– ভূমি, গাছ, বাড়ি, তাহলে তার পূর্ণ বিবরণ তার সম্মুখে তুলে না ধরা পর্যন্ত তার এখতিয়ার রহিত হবে না। যদি ক্রয়কালে পূর্ণ বিবরণ তার সম্মুখে তুলে ধরা হয় এবং তাতে সম্মত হয়ে সে তা ক্রয় করে, তাহলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, শরিয়তে গুণ বর্ণনাকে দেখার স্থলবর্তী ধরা হয়। যেমন– بَيْعِ سَلَمْ -এর ক্ষেত্রে চুক্তিকালে দাদন-দ্রব্যের স্থলে অপারগতা হেতু তার গুণ বর্ণনা করা হয়। কারণ, দাদন-দ্রব্য চুক্তিকালে অস্তিত্বহীন হয়। আর এ অপারগতা অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরো বেশি। কারণ, দাদন-দ্রব্যকে দেখা সম্ভব, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে আরো বেশি যৌক্তিকভাবেই গুণ বর্ণনা দেখার স্থলবর্তী হবে।

وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِيْ مَكَانٍ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যদি অন্ধ ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, যেমন– জমি, বাড়ি এবং ক্রয়কালে এমন স্থানে দাঁড়ায় যেখান থেকে সে চক্ষুষ্মান হলে ঐ জমি ও বাড়ি দেখতে পেত এবং বলে যে, আমি ক্রয়ে সম্মত হলাম, তাহলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে। কারণ, অপারগতার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে মূলের স্থলবর্তী ধরা হয়। অন্ধ ব্যক্তি দেখতে অপারগ, তাই দেখার সাদৃশ্যকে দেখার স্থলবর্তী ধরা হবে। যেমন– বোবা ব্যক্তি নামাজে কেরাত পড়তে অপারগ, তাই কেরাত পড়ার সাদৃশ্য তথা মুখ নাড়ানোকে কেরাতের স্থলবর্তী ধরা হয়েছে। চুলবিহীন ব্যক্তি চুল মুণ্ডাতে অপারগ, তাই চুল মুণ্ডানোর সাদৃশ্য তথা মাথায় ক্ষুর টেনে নেওয়াকে হজ্জের ক্ষেত্রে মুণ্ডানোর স্থলবর্তী ধরা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, এ বর্ণনাটি যে দুর্বল তা সুস্পষ্ট। কারণ, অপারগতা তখনি সাব্যস্ত হয়, যখন মূলের বিকল্প কিছু থাকে না। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখার বিকল্প আছে। তা হলো, পণ্যের গুণ বর্ণনা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া ও চেখে দেখার পরিবর্তে গুণ বর্ণনাকে দেখার স্থলবর্তী বিবেচনা করার বর্ণনাও আছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ (رحـ) يُوَكِّلُ وَكِيْلًا يَقْبِضُهُ وَهُوَ يَرَاهُ الخ : ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি তার পক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করবে। এ উকিল দেখে কব্জা করলে তার খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতের সঙ্গে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ, পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে যে, তিনি মুআক্কিলের দেখা ও উকিলের দেখাকে এক মনে করেন। মুআক্কিল দেখে কব্জা করলে যেরূপ তার খেয়ার রহিত হয়ে যায় তেমনি উকিল দেখে কব্জা করলেও তার খেয়ার রহিত হয়ে যায়। তাই চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মতো অন্ধ ব্যক্তির উকিল দেখে কব্জা করলে অন্ধ ব্যক্তির খেয়ার রহিত হয়ে যাবে।

ফায়দা : অন্ধ ব্যক্তির সম্মুখে বিক্রয়কালে পণ্যের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তাতে সম্মত হয়ে সে পণ্য ক্রয় করেছে, এরপর যদি সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, তাহলে তার খেয়ার অর্জিত হবে না। কারণ, তার খেয়ার রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা প্রত্যাবর্তিত হবে না।

যদি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি না দেখা পণ্য ক্রয় করে, এরপর অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার এখতিয়ার গুণ বর্ণনায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا، لِأَنَّ رُؤْيَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَكُوْنُ رُؤْيَةَ الْآخَرِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الثِّيَابِ، فَبَقِيَ الْخِيَارُ فِيْمَا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ لَا يَرُدُّهُ وَحْدَهُ بَلْ يَرُدُّهُمَا كَيْلَا يَكُوْنَ تَفْرِيْقًا لِلصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ দুটি কাপড়ের একটি দেখে অতঃপর দুটিই ক্রয় করে, এরপর অপরটি দেখে, তাহলে তার জন্য উভয়টি ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। কেননা, কাপড়ের তারতম্যের কারণে দুটির একটি দেখায় অপরটির দেখা হয় না। সুতরাং যেটা দেখেনি তাতে এখতিয়ার থাকবে। অতঃপর তা এককভাবে ফেরত দিতে পারবে না; বরং উভয়টাকে ফেরত দেবে, যাতে ফেরত দেওয়াটা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তির জন্য বিভক্তকারী না হয়। আর তা এজন্য যে, কব্জা করা হোক বা না হোক দেখার এখতিয়ার থাকা অবস্থায় চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না। এ কারণেই বিচারকের রায় ও বিক্রেতার সম্মতি ছাড়াই [না দেখা পণ্য দেখার পর] ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তিটি মূল হতে রহিত বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাসআলাটির বিবরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ভিন্ন মানের দুটি থান কাপড়ের একটি দেখে কিংবা দুটি রেডিমেট জামার একটি দেখে অতঃপর দুটিই ক্রয় করে, এরপর অপরটি দেখে, তাহলে যে থানটি/ জামাটি ক্রয়কালে দেখেনি তাতে সে খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে। তবে খেয়ারের ভিত্তিতে যদি ক্রয়কালে কেবল না দেখা কাপড়টি ফেরত দিতে চায়, তাহলে তা তার জন্য জায়েজ হবে না; বরং ফেরত দিতে চাইলে উভয়টি ফেরত দিতে হবে।

ক্রয়কালে না দেখা কাপড়টি দেখার পর ক্রেতা যে এখতিয়ার লাভ করবে তার দলিল হলো, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যদি পণ্যের সংখ্যা একাধিক হয় এবং সবগুলো এক জাতীয়, তবে একটির সাথে অপরটির মূল্যের তারতম্য হয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্যের একটিকে দেখা অবশিষ্টগুলোর জন্য দেখা হবে না; বরং প্রতিটিকে দেখা আবশ্যক। যদি কোনো একটি না দেখে, তাহলে তা দেখার পর ক্রেতা খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলায় কাপড়ের একটি থান বা একটি জামা দেখায় অপর থান/ জামাটি দেখেছে বলে গণ্য হবে না। কেননা, মূল্যের দিক থেকে একটি থান/জামার সাথে অপরটির অনেক তারতম্য হয়। তাই ক্রেতা যে থান/জামাটি ক্রয়কালে দেখেনি তা দেখার পর খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে।

খেয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে চাইলে উভয়টি ফেরত দিতে হবে– এর দলিল হলো, আমরা পূর্বে জেনেছি যে, পণ্য কব্জা করা হোক বা না হোক খেয়ারে রুয়ত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি (صَفْقَة) পূর্ণ হয় না। যদি খেয়ারের ভিত্তিতে একটি থান/জামা ফেরত দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা লাভের আগেই চুক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। আর পূর্ণতা লাভের আগে বিক্রয়চুক্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করা (تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ) জায়েজ নেই। অতএব দুটি থান/জামার একটিকে ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

وَلِهٰذَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرَّدِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ، وَلَا رِضَاءٍ، وَيَكُوْنُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ وَمَنْ مَاتَ، وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ، لِأَنَّهُ لَا يَجْرِيْ فِيْهِ الْإِرْثُ عِنْدَنَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ خِيَارِ الشَّرْطِ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِيْ رَآهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِأَوْصَافِهِ حَاصِلٌ لَهُ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ، وَبِفَوَاتِهِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ، إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ مَرْئِيَّةً لِعَدَمِ الرِّضَاءِ بِهِ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ، لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِأَنَّ التَّغَيُّرَ حَادِثٌ، وَسَبَبُ اللُّزُوْمِ ظَاهِرٌ، إِلَّا إِذَا بَعُدَتِ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالُوْا، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمُشْتَرِيْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ، لِأَنَّهَا أَمْرٌ حَادِثٌ، وَالْمُشْتَرِيْ يُنْكِرُهُ، فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ .

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে অথচ তার দেখার এখতিয়ার ছিল, তাহলে তার এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের মতে দেখার এখতিয়ারে উত্তরাধিকার জারি হয় না। এ বিষয়টি আমরা খেয়ারে শর্তের আলোচনায় উল্লেখ করেছি। যদি কেউ কোনো জিনিস দেখে অতঃপর কিছুকাল পরে তা ক্রয় করে– যদি জিনিসটি যে রকম দেখেছিল সে রকমই থাকে, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, পূর্বের দেখার দ্বারা পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে তার অবগতি অর্জিত হয়েছে। অবগতি না থাকার ক্ষেত্রেই এখতিয়ার সাব্যস্ত হয়। তবে পণ্যটিকে পূর্বের দেখা জিনিস বলে যদি চিনতে না পারে, [তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে]। কারণ, এর প্রতি সম্মতি নেই। যদি সে পণ্যটিকে পরিবর্তিত পায়, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, পূর্বের দেখাটা পণ্যের বর্তমান গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি দান করেনি। সুতরাং সে যেন তা [পূর্বে] দেখেনি। যদি পরিবর্তন সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়, তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, পরিবর্তন হলো নতুন বিষয়। আর বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ স্পষ্ট। [আর যে স্পষ্ট বিষয়কে ব্যক্ত করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] তবে ফিক্‌হবিদগণের বক্তব্য অনুযায়ী সময়ের ব্যবধান বেশি হলে [ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।] কারণ, বাহ্যিক অবস্থা ক্রেতার পক্ষে সাক্ষী। [আর বাহ্যিক অবস্থা যার পক্ষে সাক্ষী হয় তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] অবশ্য দেখার বিষয়ে মতবিরোধ হলে ভিন্ন কথা। কারণ, দেখা একটি নতুন বিষয়। ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। [আর যে অস্বীকার করে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।] সুতরাং ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرَّدِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ الخ : যেহেতু খেয়ারে রুয়ত থাকা অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি পূর্ণ হয় না, তাই খেয়ারের ভিত্তিতে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে চাইলে বিচারকের রায় কিংবা বিক্রেতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়াটা মূল থেকে ফসখ হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ যেন বিক্রয়চুক্তিই হয়নি। কারণ, পণ্যের গুণাগুণ অজ্ঞাত

হওয়ার কারণে ক্রেতার সম্মতি পাওয়া যায়নি। আর ক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় সংগঠিত হয় না। তাই এ সুরতে যেন বিক্রয়চুক্তিই হয়নি।

আহনাফের মতে খেয়ারে রুয়তের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয় না। কারণ, তা একটি ইচ্ছা মাত্র। আর এক ব্যক্তির ইচ্ছা অপর ব্যক্তির মাঝে স্থানান্তরিত হয় না। তাই যার খেয়ারে রুয়ত ছিল এমন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে খেয়ারে রুয়তের মাঝে উত্তরাধিকার জারি হয়। এ বিষয়টি খেয়ারে শর্ত পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنْ كَانَ الخ : যদি কেউ কোনো দ্রব্য দেখে এবং বেশ কিছুদিন পর তা ক্রয় করে– ক্রয়ের পর দ্রব্যটিকে পূর্বে যেমন দেখেছিল তেমনই পায়, তাহলে তার খেয়ারে রুয়ত থাকবে না। কারণ, ক্রয়কালে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগতি না থাকলে খেয়ারে রুয়ত সাব্যস্ত হয়। আর আলোচ্য মাসআলায় পূর্বের দেখা দ্বারাই পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগতি অর্জিত হয়েছে, তাই সে এখতিয়ার পাবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ مَرْئِيَّهُ لِعَدَمِ الرِّضَاءِ بِهِ : তবে ক্রয়কালে পণ্যটিকে পূর্বের দেখা জিনিস বলে যদি ক্রেতা চিনতে না পারে, উদাহরণত ক্রেতা অনেক দিন আগে একটি কাপড় দেখেছে, কিন্তু তখন কাপড়টি সে ক্রয় করেনি। এখন যখন ক্রয় করেছে তখন কাপড়টি ভাঁজ করা ছিল, তাই সে তা দেখতে পায়নি, এ সুরতে ক্রেতা কাপড়টি দেখার পর খেয়ারে রুয়ত লাভ করবে। কারণ, পূর্বের দেখা বলে চেনার পর যদি ক্রেতা পণ্যটি ক্রয় করত, তাহলে সে সম্মত হয়ে ক্রয় করছে বলে প্রমাণিত হতো। কিন্তু সে যেহেতু চিনেনি তাই পণ্যটির প্রতি তার সম্মতি পাওয়া যায়নি। অতএব তার খেয়ারে রুয়ত থাকবে। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫]

قَوْلُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ الخ : যদি পূর্বের দেখা পণ্যটিকে ক্রয়ের পর ক্রেতা পরিবর্তিত পায়, তাহলে তার খেয়ার থাকবে। কারণ, পূর্বের দেখাটা পণ্যের বর্তমান গুণাগুণ সম্পর্কে তাকে অবগতি দান করেনি। সুতরাং সে যেন দেখেনি। আর না-দেখা পণ্য ক্রয় করলে ক্রেতা দেখার পর খেয়ারে রুয়ত লাভ করে। তাই এ সুরতে ক্রেতা খেয়ার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى التَّغَيُّرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ الخ : পণ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়, যেমন– ক্রেতা বলল, আমি পণ্যটি পূর্বে যে রকম দেখেছি এখন সে রকম নেই; পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর বিক্রেতা বলল, পরিবর্তিত হয়নি; পূর্বে যে রকম ছিল এখনও সে রকমই আছে, তাহলে বিক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, পণ্যের আসল হলো পরিবর্তিত না হওয়া। পরিবর্তন হওয়াটা নতুন সৃষ্ট বিষয়। আর ক্রেতা এর দাবি করছে। তাছাড়া বাস্তবতা (ظَاهِرٌ) হলো, পূর্ববর্তী দেখার কারণে বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরপর ক্রেতা পণ্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে প্রকারান্তরে বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত হয়নি বলে বাস্তবতার বিপরীত দাবি করছে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা বাদী (مُدَّعِىْ) আর বিক্রেতা বিবাদী (مُدَّعٰى عَلَيْهِ) ও ক্রেতার দাবি অস্বীকারকারী (مُنْكِرٌ) শরিয়তের স্বীকৃত নিয়ম হলো, যদি বাদী তার দাবির পক্ষে দলিল পেশ করতে না পারে, তাহলে বিবাদীর কথা কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হয় (اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ أَنْكَرَ) তাই আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا بَعُدَتِ الْمُدَّةُ عَلٰى مَا قَالُوْا الخ : তবে দেখার সময়ের ব্যবধান যদি বেশি হয়; উদাহরণত ক্রেতা বিশ বছর আগে একটি বাঁদিকে দেখেছিল, এখন বিশ বছর পর এসে তাকে ক্রয় করল। বিক্রেতা ধারণা করল যে, এ বিশ বছরে রূপ-লাবণ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি, কিন্তু ক্রেতার ধারণায় পরিবর্তন এসেছে, তাহলে মুতাআখ্খিরীন ফিক্হবিদগণের মতে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পণ্য পরিবর্তন হতে পারে। তাই বাস্তবতা (ظَاهِرٌ) ক্রেতার কথার পক্ষে সাক্ষী। আর বাস্তবতা যার পক্ষে সাক্ষী হয় তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়। তাই ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র.)-এর সমর্থন এ অভিমতের দিকেই। সদরুশ শহীদ এবং জহীরুদ্দীন মারগীনানী (র.) এ অভিমতের উপর ফাতওয়া দান করেছেন। –[প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَا فِى الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهَا الخ : যদি ক্রেতা পূর্বে দেখেছে কিনা এ বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতবিরোধ হয়; ক্রেতা বলল, আমি পণ্যটি দেখিনি, বিক্রেতা বলল, তুমি দেখেছ, তাহলে ক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে। কারণ, পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবগতি না থাকাটা আসল ও বাস্তব (ظَاهِرٌ)। বিক্রেতা দেখার মাধ্যমে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার অবগত হওয়ার দাবি করছে। আর এটা নতুন ও বাস্তবতার বিপরীত বিষয়। ক্রেতা এ দাবিকে অস্বীকার করছে। আর যে অস্বীকার করে তার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হয়। তাই ক্রেতার কথা কসমের সঙ্গে গৃহীত হবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عِدْلَ زُطِّيٍّ وَلَمْ يَرَهُ، فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَكَذٰلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيْمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِيْ رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ، لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ، وَفِيْهِ وُضِعَ الْمَسْئَلَةُ ، فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ ، فَهُوَ عَلٰى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ (رح)، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَعُوْدُ بَعْدَ سُقُوْطِهِ كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ اِعْتَمَدَ الْقُدُوْرِيُّ .

অনুবাদ : কেউ যদি না দেখে 'যুত্বী' কাপড়ের একটি গাঁইট ক্রয় করে, তারপর তা থেকে একটি কাপড় বিক্রি করে অথবা তা [কাউকে] হেবা করে এবং অর্পণ করে, তাহলে দোষের কারণ ছাড়া কোনো কাপড় ফেরত দিতে পারবে না। তদ্রূপ খেয়ারে শর্তের বেলায়ও। কারণ, যে কাপড়টি ক্রেতার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেছে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। আর অবশিষ্টগুলো ফেরত দেওয়ায় পূর্ণতা লাভের আগেই বিক্রয়চুক্তি বিভক্ত হয়ে যায়। কারণ, খেয়ারে রুয়ত [দর্শনভিত্তিক এখতিয়ার] ও খেয়ারে শর্ত [শর্তভিত্তিক এখতিয়ার] বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা লাভে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু খেয়ারে আইব [দোষজনিত খেয়ার]-এর বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, খেয়ারে আইব থাকা সত্ত্বেও কব্জার পরে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে; যদিও কব্জার আগে পূর্ণতা লাভ করে না। আর কব্জাকৃত পণ্যের ব্যাপারেই উপরিউক্ত **মাসআলা**। তারপর ক্রেতার কাছে যদি ঐ কাপড়টি ফিরে আসে এমন কোনো কারণে যা চুক্তি বিলোপ বলে মনে হয়, তাহলে তার খেয়ারে রুয়ত বহাল থাকবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, খেয়ারে শর্তের মতো খেয়ারে রুয়ত একবার রহিত হওয়ার পর প্রত্যাবর্তিত হয় না। ইমাম কুদূরী (র.) এর উপরই নির্ভর করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'যুত্ব' (زُطٌ) ইরাকের বা মতান্তরে হিন্দুস্তানের একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের প্রস্তুতকৃত কাপড়কে 'যুত্বী' বলা হতো। মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি 'যুত্বী' কাপড়ের একটি গাঁইট ক্রয় করল, ক্রয়কালে বা ক্রয়ের আগে কাপড়গুলো সে দেখেনি, কাপড়গুলো কব্জা করার পর একটি কাপড় কারো কাছে বিক্রি করল বা কাউকে হাদিয়া দিল এবং তা তাকে অর্পণও করল, এরপর সে কাপড়গুলো দেখল, তাহলে খেয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে সে অবশিষ্ট কাপড়গুলো ফেরত দিতে পারবে না। তবে অবশিষ্ট কাপড়গুলো দোষগ্রস্ত হলে 'খেয়ারে আইব' [দোষজনিত এখতিয়ার]-এর ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে।

তদ্রূপ কেউ যদি তিন দিনের খেয়ারে শর্তে একটি কাপড়ের গাঁইট ক্রয় করে এবং কব্জা করার পর তা থেকে একটি কাপড় কারো কাছে বিক্রি করে কিংবা কাউকে হাদিয়া দেয় এবং তা তাকে অর্পণও করে, তাহলে খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে অবশিষ্ট কাপড়গুলো সে ফেরত দিতে পারবে না।

এর দলিল হলো, যে কাপড়টি ক্রেতা বিক্রি করেছে বা কাউকে হাদিয়া দিয়েছে তা তার মালিকানা থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই খেয়ারে রুয়ত বা শর্তভিত্তিক এখতিয়ারে এ কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, অবশিষ্টগুলো ফেরত দিতে পারে, কিন্তু খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুয়ত থাকা অবস্থায় পণ্য কব্জা করলেও যেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না, তাই অবশিষ্টগুলো– উদাহরণত দশটি কাপড়ের নয়টি ফেরত দিতে গেলে পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়। আর মূলনীতি হলো, পূর্ণতা লাভের পূর্বে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা (تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ) জায়েজ নেই। তাই অবশিষ্ট কাপড়গুলোও ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই।

তবে খেয়ারে আইবের সুরতে খেয়ারে আইব থাকা অবস্থায় যদিও কব্জা করার আগে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না কিন্তু কব্জা করার পর যেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে, আর পূর্ণতা লাভের পর চুক্তিতে বিভক্তি সৃষ্টি করা জায়েজ আছে, তাই খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে অবশিষ্ট কাপড়গুলো ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ فَهُوَ عَلَى الخ : যদি বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়া কাপড়টি ক্রেতার কাছে চুক্তি বিলোপ (فَسْخ) বলে সাব্যস্ত এমন কোনো কারণে ফেরত আসে; উদাহরণত দোষের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথম ক্রেতার কাছে ফেরত দেয় কিংবা ক্রেতা হাদিয়া ফেরত নিয়ে নেয়, তাহলে সে খেয়ারে রুয়ত ফিরে পাবে। কারণ, বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়া কাপড়টিতে এখন তার মালিকানা ফিরে এসেছে। তাই খেয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে সবগুলো কাপড় ফেরত দেওয়া সম্ভব। ফলে পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তিতে বিভক্তি হচ্ছে না। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَعُوْدُ بَعْدَ سُقُوْطِهِ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে আলী ইবনুল জা'দ বর্ণনা করেন যে, খেয়ারে শর্তের সুরতে পণ্য বিক্রি করা বা হাদিয়া দেওয়ার পর তিন দিনের ভিতরে চুক্তি বিলোপ (فَسْخ) বলে সাব্যস্ত এমন কোনো কারণে ক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত আসলে যেরূপ ক্রেতা খেয়ারে শর্ত ফিরে পায় না, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা খেয়ারে রুয়ত ফিরে পাবে না। কারণ, যা একবার রহিত হয়ে যায় তা ফিরে আসে না। কাযীখান এ মতকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) এ মতের উপরই নির্ভর করেছেন।

بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِيْ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِيْ وَصْفَ السَّلَامَةِ، فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَتَخَيَّرُ، كَيْلَا يَتَضَرَّرَ بِلُزُوْمِ مَا لَا يَرْضَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فِيْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى، فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِيْ مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُوْنِ تَضَرُّرِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِيْ عِنْدَ الْبَيْعِ، وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ ذٰلِكَ رِضًا بِهِ.

পরিচ্ছেদ : দোষজনিত এখতিয়ার

অনুবাদ : [ইমাম কুদূরী (র.) বলেন] যদি ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে তার এখতিয়ার থাকবে– চাইলে সে তা পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে, চাইলে তা ফেরত দেবে। কারণ, শর্তহীন চুক্তি [পণ্য] দোষমুক্ত হওয়ার দাবি করে। সুতরাং তার অবিদ্যমানতায় ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে। যাতে যে বিষয়ে ক্রেতা সম্মত নয় তা গ্রহণে বাধ্য হওয়ার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর ক্রেতার এ অধিকার নেই যে, সে দোষগ্রস্ত পণ্যটি [তার কাছে] রেখে দেবে এবং [বিক্রেতার কাছ থেকে] ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। কারণ, সাধারণ চুক্তিতে গুণাবলির বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্যকে নির্ধারিত মূল্যের কমে তার মালিকানা থেকে ত্যাগ করতে সম্মত হয়নি। সুতরাং এর দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর বিক্রেতার ক্ষতি করা ছাড়াই বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিয়ে ক্রেতার ক্ষতি দূর করা সম্ভব। ইমাম কুদূরী (র.)-এর উল্লেখকৃত 'দোষ' দ্বারা ঐ দোষ উদ্দেশ্য যা [পণ্যটি] বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল, কিন্তু ক্রেতা ক্রয়কালেও তা দেখেনি এবং কব্জা করার সময়ও দেখেনি। কারণ, ক্রয়কালে বা কব্জার সময় দেখাটা তার প্রতি সম্মতির প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارٌ অর্থ– এখতিয়ার, ইচ্ছাধিকার, স্বাধীনতা। اَلْعَيْبُ অর্থ– দোষ, ত্রুটি। اَلْعَيْبُ শব্দের দিকে خِيَارٌ শব্দটির ইযাফত (إِضَافَة) হয়েছে। এরূপ ইযাফতকে إِضَافَةُ الْحُكْمِ إِلَى سَبَبِهِ বলা হয়। خِيَارُ الْعَيْبِ অর্থ হচ্ছে– خِيَارٌ يَثْبُتُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ 'দোষের কারণে সাব্যস্ত ইচ্ছাধিকার।' শরিয়তের পরিভাষায় পণ্যের দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রেতার ঐ পণ্যটি রাখা/ না রাখার শরিয়ত প্রদত্ত এখতিয়ারকে 'খেয়ারে আইব' বলে।

মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে লেনদেন করে, ক্রয়-বিক্রয় করে। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণত সকল ক্রেতার প্রত্যাশা থাকে তার ক্রয়কৃত পণ্যটি নির্দোষ হবে, নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত হবে। তাছাড়া নির্দোষ পণ্য বলেই ক্রেতা ক্রয়ে সম্মত হয়। কিন্তু অনেক সময় বিক্রেতার প্রতারণার শিকার হয়ে কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অজান্তে দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রেতার কাছে এসে পড়ে। অথচ দোষগ্রস্ত পণ্যে ক্রেতার সম্মতি নেই। আর ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের সম্মতি আবশ্যক। তাছাড়া দোষগ্রস্ত পণ্যটি ফেরত দিয়ে দোষমুক্ত পণ্য পাওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকারকে যদি নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রেতার দোষমুক্ত পণ্য পাওয়ার অধিকার রক্ষা ও তাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে শরিয়ত খেয়ারে আইবের বিধান দিয়েছে। এর স্বরূপ হলো, ক্রেতা একটি পণ্য ক্রয় করেছে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতা সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দেয়নি। পণ্যটি কব্জা করার পর ক্রেতা তাতে দোষ পেল, এ দোষটি কব্জার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি, তাহলে ক্রেতা এ পণ্যটি রাখা/ না রাখার এখতিয়ার লাভ করবে। যদি রাখে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে রাখবে, আর যদি ফেরত দেয়, তাও তার জন্য জায়েজ হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন ফারগানী (র.) খেয়ারে আইবের আলোচনাকে খেয়ারসমূহের আলোচনার সবশেষে কেন এনেছেন তা খেয়ারে রুয়তের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

খেয়ারে আইবের বিধান হলো, خِيَارُ الْعَيْبِ مَانِعٌ يَمْنَعُ لُزُوْمَ الْحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوْتِهٖ বিক্রয়চুক্তির হুকুম পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত হয়, কিন্তু তা অনিবার্য হয় না। অর্থাৎ খেয়ারে আইব থাকা অবস্থায় ক্রেতা পণ্য কব্জা করলে বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু বিক্রীত-পণ্যে তার মালিকানা বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হয় না। সে ইচ্ছা করলে তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

قَوْلُهٗ وَاِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِيْ عَلٰى عَيْبٍ الخ : ক্রেতা একটি পণ্য ক্রয় করল। পণ্যটি কব্জা করার পর ক্রেতা তাতে কোনো দোষ দেখতে পেল; এ দোষটি পণ্য কব্জা করার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি এবং কব্জা করার সময় ক্রেতা এ দোষ সম্পর্কে অবগতও ছিল না, আর ক্রয়কালে বিক্রেতা সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির ঘোষণাও দেয়নি, তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করবে, সে পণ্যটি রাখতেও পারে, ফেরতও দিতে পারে। যদি রাখে তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে রাখবে, আর যদি ফেরত দেয়– তাও তার জন্য জায়েজ হবে। অবশ্য এ এখতিয়ার তখন লাভ করবে যদি দোষটি এমন হয় যে, তা কষ্ট ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয়, তাহলে এখতিয়ার পাবে না। যেমন– এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করল কিন্তু কব্জা করার পর দেখল কাপড়টি নাপাক; ব্যবহারের আগে ধুয়ে নিতে হবে। ধৌত করার দ্বারা যদি কাপড়টি নষ্ট না হয় কিংবা তার কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে এ দোষের কারণে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে না। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭]

قَوْلُهٗ لِاَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِيْ وَصْفَ السَّلَامَةِ الخ : পণ্যে দোষ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করার দলিল হলো, পণ্যে দোষ আছে মর্মে কোনো শর্ত করা হয়নি, এমন যে কোনো চুক্তির স্বাভাবিক দাবি হলো, পণ্য দোষমুক্ত ও নিখুঁত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদীস থেকেই এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মু'জামে ইবনে শাহীন গ্রন্থে সাহাবী হযরত আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ (রা.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ وَهْبٍ اَبُوْ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ : اَلَا اُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهٗ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : قُلْتُ بَلٰى، فَاَخْرَجَ لِيْ كِتَابًا هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا اَوْ اَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ .

হাদীসে উল্লিখিত دَاءٌ ، غَائِلَةٌ ، خِبْثَةٌ এ শব্দ তিনটির ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, اَلدَّاءُ হলো অভ্যন্তরীণ রোগ, যেমন– পাকস্থলী, হার্ট ও কিডনির রোগ। غَائِلَةٌ হলো স্বভাবগত দোষ, যেমন– চুরি করা, পলায়ন করা ইত্যাদি। আর خِبْثَةٌ হলো, অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০]

সুতরাং হাদীসটির অর্থ এই যে, হযরত আব্দুল হামীদ ইবনে ওয়াহাব (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ (রা.) আমাকে বললেন, আমার জন্য লেখা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি চুক্তিপত্র কি তোমাকে পড়ে শুনাব? আমি বললাম, অবশ্যই। এরপর তিনি একটি চুক্তিপত্র বের করলেন। তাতে লেখা ছিল– 'এটি একটি বিক্রয়চুক্তিপত্র; আদ্দা ইবনে খালিদ ইবনে হাওযাহ মুহাম্মদ ﷺ থেকে একটি দাস/ দাসী ক্রয় করেছে, যাতে দৈহিক রোগও নেই, স্বভাবগত দোষও নেই, আর অন্য কেউ এর মালিকও নয়। এটা মুসলমানের কাছে মুসলমানের বিক্রয়।'

এ বর্ণনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিক্রেতা, আর হযরত আদ্দা ইবনে খালিদ (রা.) ছিলেন ক্রেতা। এ হাদীসটি বুখারী শরীফে তা'লীক হিসেবে (تَعْلِيْقًا) বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ক্রেতা। আল্লামা ইবনে হুমাম ও আল্লামা আইনী (র.) দীর্ঘ আলোচনার পর মু'জামে ইবনে শাহীনের বর্ণনাকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, বুখারীর বর্ণনাটি যেহেতু তা'লীক তাই তার বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয়। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো, বিক্রয়পণ্য নিখুঁত ও দোষমুক্ত হওয়া। এ বিষয়টি আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি রায় থেকে আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন–

أَنَّ رَجُلًا اِبْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يُقِيْمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ .

অর্থাৎ এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল। কিছু দিন যাওয়ার পর লোকটি গোলামে দোষ পেল। বিষয়টি সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পেশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিখুঁত ও দোষমুক্ত পণ্যই সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের দাবি। তাছাড়া যুক্তিও এটাই বলে। কারণ, সকল প্রকার সৃষ্টিজীবের মৌল প্রকৃতি হলো নিখুঁত ও দোষমুক্ত হওয়া। সুতরাং সাধারণ চুক্তিতে নিখুঁত পণ্যই উদ্দেশ্য হবে।

অতএব ক্রেতা যখন পণ্যকে নিখুঁত ও দোষমুক্ত পাবে না তখন সে এখতিয়ার লাভ করবে। কারণ, যদি এখতিয়ার না পায়; বরং দোষগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পণ্যটি গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ ক্ষতি বহনে সে সম্মত নয়। তাই সে এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ : তবে ক্রেতার জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দোষগ্রস্ত পণ্যটি নিজের কাছে রেখে দেবে, আর বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)ও এ কথা বলেন। তবে ইমাম আহমদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ক্রেতার জন্য পণ্য ফেরত দেওয়া কিংবা পণ্য রেখে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা উভয়টাই বৈধ।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْئٌ الخ : আমাদের প্রথম দলিল হলো, দোষ পণ্যের একটি গুণ (وَصْف)। আর যে বিক্রয়চুক্তিতে গুণটি মুখ্য হয় না এবং গুণের বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না তাতে গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ ধার্য হয় না; বরং গুণটি দ্রব্যের অনুবর্তী হয়। পিছনে এর উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে। অতএব দোষের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হবে না। তাই ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ الخ : দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে সম্মত নয়। কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিতে হলে নির্ধারিত মূল্যের কমে তাকে স্বত্ব ত্যাগ করতে হয়। এতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। আর ক্ষতির হাত থেকে দুই কারবারির একজনকে বাঁচানোর জন্য শরিয়ত খেয়ারে আইবকে বৈধ করেছে। সুতরাং এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন বৈধ হবে না যাতে অপর কারবারির ক্ষতি হয়। তবে পণ্য দোষগ্রস্ত হওয়ায় ক্রেতার যে ক্ষতি হচ্ছে, পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে তার ক্ষতি করা ছাড়াই তা দূর করা সম্ভব। সুতরাং পণ্য দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে, কিন্তু তা রেখে দিয়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না।

গ্রন্থকার (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। তা হলো, বিক্রেতা তার পণ্যকে দোষমুক্ত মনে করে নির্ধারিত মূল্যে পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে সম্মত হয়েছে। যখন দোষ প্রমাণিত হবে তখন সে মূল্যসংকোচন করতে সম্মত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। অতএব এ কথা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্ব ত্যাগে সম্মত নয়।

আল্লামা আইনী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বিক্রীত-পণ্য দীর্ঘ সময় ধরে বিক্রেতার দখলে ছিল, সে তা নাড়াচড়া করেছে, তাতে হস্তক্ষেপ করেছে। সুতরাং সে পণ্যের দোষ-গুণ সম্পর্কে অবগত ছিল বলে গণ্য হবে। যেন সে জেনেশুনেই মূল্য নির্ধারণ করেছে; এর চেয়ে কমে সে সম্মত নয়। অতএব বিক্রেতা যে মূল্যে পণ্য বিক্রি করেছে সে তার চেয়ে কমে পণ্যের স্বত্বত্যাগে সম্মত নয়– এ কথা যৌক্তিক। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮]

এখানে আরকটি প্রশ্ন হয় যে, ক্রেতা কব্জা করার পর পণ্যে দোষ পেলে যেরূপ এখতিয়ার পায় তেমনি বিক্রেতা তার পণ্যকে দোষগ্রস্ত মনে করে হ্রাসকৃত মূল্যের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য বিক্রি করার পর দ্রব্যটি দোষমুক্ত প্রমাণিত হলে তারও এখতিয়ার পাওয়া উচিত। কারণ, দোষগ্রস্ত মনে করে সে মূল্য কম নির্ধারণ করেছে। অথচ পণ্যটি দোষমুক্ত। যদি পণ্যটি ফেরত নেওয়ার কিংবা মূল্য বৃদ্ধির এখতিয়ার বিক্রেতাকে দেওয়া না হয়, তাহলে তার ক্ষতি হবে; ন্যায্য মূল্যের কমে পণ্যটি তার হাতছাড়া হবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এর উত্তরে বলেন, বিক্রেতার কাছে পণ্যটি দীর্ঘ সময় থাকায় সে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত বলে গণ্য হবে। সুতরাং যেন সে দোষমুক্ত মনে করেই পণ্যটি কম মূল্যে বিক্রি করেছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা পূর্বে বিক্রীত-পণ্য দেখেনি। সে পণ্যের দোষগুণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। এমতাবস্থায় যদি দোষগ্রস্ত পণ্যটি গ্রহণে সে বাধ্য হয়, তাহলে তার পূর্ব অবগতি ছাড়াই তার উপর একটি ক্ষতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর কারো পূর্ব অবগতি ছাড়া তার উপর ক্ষতি আরোপ করা বৈধ নয়। তাই পণ্য দোষগ্রস্ত হলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। কিন্তু দোষগ্রস্ত মনে করে পণ্য বিক্রি করার পর দোষমুক্ত প্রমাণিত হলে বিক্রেতা এখতিয়ার পাবে না। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০]

ফায়দা : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পণ্যে দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর পণ্য ফেরত দেওয়ার যে অধিকার ক্রেতা লাভ করে, অর্থ বা মালের বিনিময়ে যদি ক্রেতা এ অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার শর্তে সন্ধি করে, তাহলে তা জায়েজ আছে। এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমতও এটাই। তবে খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুয়তের বেলায় তা নাজায়েজ। –[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯]

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, মূল পাঠে [মতনে] বলা হয়েছে যে, পণ্যে কোনো 'দোষ' পাওয়া গেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে। উক্ত বক্তব্যে 'দোষ' বলে ঐ দোষ উদ্দেশ্য, যা পণ্য কব্জা করার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়নি; বরং পণ্যটি বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই তাতে দোষটি বিদ্যমান ছিল এবং ক্রেতা ক্রয়কালে ও কব্জা করার সময় এ দোষ সম্পর্কে অবগত ছিল না। কারণ, যদি অবগত থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়– ক্রেতা জেনেশুনেই দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রয় করেছে। সুতরাং দোষযুক্ত পণ্য কেনার প্রতি তার সম্মতি আছে। আর একবার এরূপ সম্মতি সাব্যস্ত হলে পরবর্তিতে ক্রেতা খেয়ারে আইব পায় না।

قَالَ : وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ، لِأَنَّ التَّضَرُّرَ بِنُقْصَانِ الْمَالِيَّةِ، وَ ذٰلِكَ بِانْتِقَاصِ الْقِيمَةِ، وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُرْفُ أَهْلِهِ وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ فِي الصَّغِيرِ عَيْبٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَيْبٍ حَتّٰى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ، وَمَعْنَاهُ إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيْ صِغَرِهٖ ثُمَّ حَدَثَتْ، عِنْدَ الْمُشْتَرِيْ فِيْ صِغَرِهٖ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّهُ عَيْنُ ذٰلِكَ، وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوْغِهٖ لَمْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّهُ غَيْرُهُ، وَهٰذَا لِأَنَّ سَبَبَ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ يَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، فَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ فِي الصِّغَرِ لِضُعْفِ الْمَثَانَةِ ، وَبَعْدَ الْكِبَرِ لِدَاءٍ فِي الْبَاطِنِ، وَالْإِبَاقُ فِي الصِّغَرِ لِحُبِّ اللَّعْبِ، وَالسَّرِقَةُ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاتِ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِخُبْثٍ فِي الْبَاطِنِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الصَّغِيْرِ مَنْ يَعْقِلُ، فَأَمَّا الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ فَهُوَ ضَالٌّ لَا أَبِقٌ، فَلَا يَتَحَقَّقُ عَيْبًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল খুঁত ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে [দ্রব্যের] মূল্যহ্রাস ঘটায় তা-ই পণ্যের দোষ বলে বিবেচিত। কেননা, মূল্যমান হ্রাস পাওয়ার কারণেই ক্ষতি সাধিত হয়। আর মূল্যমান হ্রাস পায় মূল্য কমে যাওয়ার কারণে। আর মূল্য জানার মানদণ্ড হলো ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পলায়ন করা, বিছানায় পেশাব করা এবং চুরি করা ছোটদের বেলায় দোষ। যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন তা দোষ নয়; যদি [বিক্রেতার কাছে] প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পুনরায় তা দেখা না দেয়। অর্থাৎ যদি বিক্রেতার কাছে শৈশবেই এসব দোষ দেখা দেয়, এরপর শৈশবেই ক্রেতার কাছে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ক্রেতার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ, তা হুবহু পূর্বেরটাই। আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর এসবের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, এগুলো পূর্বেরগুলো থেকে ভিন্ন। এটা এজন্য যে, শৈশব ও বয়ঃপ্রাপ্তির কারণে এসব দোষের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শৈশবে বিছানায় পেশাব করার কারণ মূত্রথলির দুর্বলতা আর বয়ঃপ্রাপ্তির পর তা হয় অভ্যন্তরীণ কোনো রোগের কারণে। শৈশবে পলায়ন করার কারণ খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ আর চুরি করার কারণ দায়িত্ববোধে স্বল্পতা, আর এ দুটো বয়ঃপ্রাপ্তির পর হয় মন্দ স্বভাবের কারণে। [আলোচ্য মাসআলায়] ছোট দ্বারা এমন বালক উদ্দেশ্য, যার বোধশক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে যার বোধশক্তি নেই সে তো হারিয়ে যাওয়া শিশু, পলাতক নয়। সুতরাং তা দোষ বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত মাসআলায় বলা হয়েছে যে, পণ্য কব্জা করার পর তাতে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে। আলোচ্য ইবারতে পণ্যের কোন ধরনের খুঁতকে 'দোষ' বলে অভিহিত করা যাবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) একটি মূলনীতি বলেছেন। তিনি বলেন, দ্রব্যস্থিত যে সকল খুঁত ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে

দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটায়, তাই 'দোষ'। কেননা, মূল্যহ্রাসের কারণেই দ্রব্যের মানে ঘাটতি আসে। আর মানে ঘাটতি আসাতেই ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর মূল্যঘাটতি হলো কিনা তা বিচারের ভার এ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে। আর ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের বাজারদর সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়, তাই তাদের প্রচলনে যা দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটাবে তাই 'দোষ' বলে সাব্যস্ত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্বযুগে দাস/দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো; বরং বিক্রয়পণ্যের মাঝে দাস/দাসী একটি উল্লেখযোগ্য পণ্যরূপে বিবেচিত হতো। গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারত থেকে দাস/দাসীর কোন কোন জিনিসগুলো দোষ এবং ক্রয়কৃত দাস/দাসীতে সেগুলো কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে এ বিষয় আলোচনা করেছেন। আলোচ্য ইবারতের মাঝে তিনটি দোষের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যথা–

১. পলায়ন করা(اِبَاقٌ)

২. বিছানায় পেশাব করা

৩. চুরি করা

দাস/ দাসীর দু শ্রেণী। যথা– ১. নাবালেগ

২. বালেগ

নাবালেগ দাস/ দাসী আবার দু প্রকার। যথা– ১. বোধশক্তি নেই

২. বোধশক্তি আছে

বোধশক্তি নেই– এ শ্রেণীর দাস/দাসীর বয়সের সময়সীমা নির্ধারণে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। ঈযাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বাচ্চা একাকী খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়নি সে এ শ্রেণীভুক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সূত্রে এ ধরনের একটি রেওয়ায়েত আছে। কোনো কোনো বর্ণনায় একাকী শৌচকার্য করতে সক্ষম নয় এমন বাচ্চাদের এ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে সাত বছরের কম বয়সের বাচ্চারা এ শ্রেণীভুক্ত।– [বেনায়া : খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩] আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ও এ মত পোষণ করেন।

– [ফাতহুল কাদীর : খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০]

কেফায়া গ্রন্থকার পাঁচ বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। এ শ্রেণীর দাস/দাসীর বিছানায় পেশাব করা, পলায়ন করা এবং চুরি করা দোষ নয়। গ্রন্থকার (র.) বলেন, বোধশক্তি নেই এ শ্রেণীর দাস/দাসী পলাতক হয় না; বরং হারিয়ে যায়।

বোধশক্তি আছে এমন নাবালেগ দাস/ দাসীর বিছানায় পেশাব করা, চুরি করা ও পলায়ন করা দোষ। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, পলায়ন সফরের পরিমাণ দূরত্বে [৪৮ মাইল] হোক বা কম হোক, শহর থেকে গ্রামে হোক বা গ্রাম থেকে শহরে হোক তা দোষ বলে গণ্য হবে। [বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১] কেননা, পলায়ন করার কারণে মনিব তা দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। যদি দাস/দাসী ডাকাতের নিকট থেকে পালিয়ে স্বীয় মনিবের কাছে চলে আসে, তাহলে এটাকে পলায়ন বলা হবে না। যদি ডাকাতের নিকট থেকে পলায়ন করে, কিন্তু মনিবের কাছেও ফিরে আসে না এবং ডাকাতের কাছেও ফিরে না যায়, তাহলে এর দু সূরত–

১. সে মনিবের ঠিকানা জানে এবং সেখানে পৌঁছতে সক্ষম।

২. সে ঠিকানা জানে না, কিংবা জানে কিন্তু পৌঁছতে সক্ষম নয়।

প্রথম সুরতে পলায়ন বলে গণ্য হবে– আর দ্বিতীয় সুরতে পলায়ন বলে গণ্য হবে না।–[ফাতহুল কাদীর]

চুরি করা তা দশ দিরহাম পরিমাণ হোক বা তার চেয়ে কম হোক, স্বীয় মনিবের মাল চুরি করুক বা অন্য কারো মাল চুরি করুক

সবই দোষ বলে গণ্য হবে। যদি মনিবের সম্পদ থেকে খাওয়ার জন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য নেয়, তাহলে তা চুরি বলে গণ্য হবে না। তবে অন্যের সম্পদ থেকে নিলে চুরি বলে গণ্য হবে। যদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মনিবের সম্পদ থেকে কোনো খাদ্য দ্রব্য নেয়, তবে তাও দোষ বলে গণ্য হবে। কারণ, এতে মনিব তার সম্পদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবে এবং তা সংরক্ষণের জন্য তাকে সর্বদা কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

বিছানায় পেশাব করা, পলায়ন করা ও চুরি করা বালেগ দাস/দাসীর ক্ষেত্রেও দোষ। তবে নাবালেগ অবস্থার দোষ আর বালেগ হওয়ার পরের দোষ হুবহু এক নয়। কারণ শৈশবকালে ও বয়ঃপ্রাপ্তির পর এসব দোষের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِى الْفِرَاشِ وَالسَّرَقَةِ فِى الصَّغِيْرِ الخ : কুদূরীর উপরিউক্ত ইবারতে বর্ণিত মাসআলাটি বোধশক্তি আছে এমন নাবালেগ দাস/দাসী সম্পর্কে। গ্রন্থকার (র.) এর ব্যাখ্যায় তিনটি সুরত উল্লেখ করেছেন–

১. বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় নাবালেগ দাস/দাসী বিছানায় পেশাব করত কিংবা পলায়ন করত কিংবা চুরি করত। ক্রেতার কাছে আসার পর নাবালেগ অবস্থাতেই এসব দোষ প্রকাশ পেয়েছে, তাহলে এ দোষগুলো হুবহু ঐ দোষ বলে গণ্য হবে, যা বিক্রেতার কাছে ছিল এবং এর কারণে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে।

২. বিক্রেতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় এসব দোষ ছিল। বালেগ হওয়ার পর এসব দোষ দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ক্রেতার কাছে আসার পর এ দোষগুলো নতুন করে দেখা দিয়েছে। এ সুরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে না। কারণ, ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষগুলো বিক্রেতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া ঐ একই দোষ বলে গণ্য হবে না। আর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন দোষের কারণেই শুধু ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করে।

ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষগুলো কেন বিক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া ঐ একই দোষ বলে গণ্য হবে না– এর কারণ সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিক্রেতার কাছে দোষগুলো প্রকাশ পেয়েছিল নাবালেগ অবস্থায়, আর ক্রেতার কাছে প্রকাশ পেয়েছে বালেগ অবস্থায়। নাবালেগ অবস্থার দোষের কারণ ভিন্ন, আর বালেগ অবস্থার দোষের কারণ ভিন্ন। নাবালেগ অবস্থায় বিছানায় পেশাব করে মূত্রথলি দুর্বল হওয়ার কারণে, আর বালেগ অবস্থায় করে অভ্যন্তরীণ কোনো রোগের কারণে। নাবালেগ অবস্থায় চুরি করে পরিণতি সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে এবং পলায়ন করে খেলাধূলার আকর্ষণে, আর বালেগ হওয়ার পর চুরি ও পলায়ন করে মন্দ স্বভাবের কারণে। আর কারণ ভিন্ন হলে তার বিধানও ভিন্ন হয়। সুতরাং বিক্রেতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া দোষ আর বালেগ অবস্থায় ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ হুবহু এক নয়।

৩. হ্যাঁ, যদি বিক্রেতার কাছে বালেগ হওয়ার পর এসব দোষ দেখা যায়, এরপর ক্রেতার কাছে আসার পর এ দোষগুলো পুনরায় দেখা দেয়, তাহলে এ দোষগুলো হুবহু বিক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ বলে গণ্য হবে। কারণ, এ সুরতে ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষের কারণ এবং বিক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষের কারণ এক ও অভিন্ন। তাই এ সুরতে ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে।

قَالَ : وَالْجُنُوْنُ فِي الصِّغَرِ عَيْبٌ أَبَدًا، وَمَعْنَاهُ إِذَا جُنَّ فِي الصِّغَرِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْ فِي الْكِبَرِ يَرُدُّهُ، لِأَنَّهُ عَيْنُ الْأَوَّلِ، إِذِ السَّبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ، وَهُوَ فَسَادُ الْعَقْلِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَادِرٌ عَلٰى إِزَالَتِهِ، وَإِنْ كَانَ قَلَّ مَا يَزُوْلُ، فَلَابُدَّ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ لِلرَّدِّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শৈশবে পাগল হওয়া একটি স্থায়ী দোষ। অর্থাৎ যদি বিক্রেতার কাছে ছোটবেলায় পাগল হয় তারপর ক্রেতার হাতে ছোটবেলায় কিংবা বালেগ হওয়ার পর তার পুনরাবৃত্তি হয়, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। কারণ, তা হুবহু পূর্বের মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কেননা, উভয় অবস্থায় [মস্তিষ্ক-বিকৃতির] কারণ এক ও অভিন্ন। আর তা হলো, বোধশক্তি নষ্ট হওয়া। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ক্রেতার হাতে পাগলামির পুনঃপ্রকাশ ঘটা শর্ত নয়। কারণ, মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগ দূর হওয়া বিরল হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তো তা দূর করতে সক্ষম। সুতরাং ফেরত দেওয়ার জন্য পাগলামি পুনঃপ্রকাশ পাওয়া আবশ্যক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জামেউস সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নাবালেগ ছেলের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা একটি স্থায়ী দোষ। গ্রন্থকার (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, স্থায়ী দোষের অর্থ হলো, যদি বিক্রেতার কাছে নাবালেগ অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যায় এরপর ক্রেতার কাছে তা পুনঃপ্রকাশ পায়, তাহলে ক্রেতার হাতে নাবালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাক বা বালেগ অবস্থায় প্রকাশ পাক উভয় সুরতে তা হুবহু পূর্বের দোষ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে। কেননা, নাবালেগ ও বালেগ উভয় অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণ এক ও অভিন্ন। আর তা হলো বোধশক্তি নষ্ট হওয়া। আর একবার বোধশক্তি নষ্ট হলে সাধারণত তা ভালো হয় না। কিছুদিন সুপ্ত থেকে তা আবার প্রকাশ পায়।

তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেহেতু ভালো করে দিতে পারেন, তাই ক্রেতার খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার কাছে এ দোষটি প্রকাশ পাওয়া শর্ত। বিক্রেতার কাছে এ দোষটি দেখা দিয়েছিল শুধু এটুকুতে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। প্রকাশ পেলে তবেই এটা সাব্যস্ত হবে যে, পূর্বের দোষটি এখনও আছে। আর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন দোষ প্রমাণিত হলে তবেই ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করে।

ফায়দা : আল্লামা আইনী (র.) লিখেছেন, মস্তিষ্ক বিকৃতি কত সময় স্থায়ী হলে তা দোষ বলে গণ্য হবে এ বিষয়ে ফিক্হবিদগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তা দোষ বলে গণ্য হবে। কারো কারো মতে কমপক্ষে একদিন একরাত হতে হবে। কেউ কেউ বলেন, একদিন একরাতের চেয়ে বেশি সময় ধরে হতে হবে। কেউ কেউ বলেন, ক্রমাগত চলতে থাকলে তা দোষ বলে গণ্য হবে। যদি ক্রমাগত না চলে, তাহলে তা দোষ নয়।

-[বেনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪]

قَالَ : وَالْبَخَرُ وَالدَّفْرُ عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ قَدْ يَكُوْنُ الْاِسْتِفْرَاشَ، وَهُمَا يُخِلَّانِ بِهِ، وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِى الْغُلَامِ، لِأَنَّ الْمَقْصُوْدَ هُوَ الْاِسْتِخْدَامُ، وَلَا يُخِلَّانِ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ دَاءٍ، لِأَنَّ الدَّاءَ عَيْبٌ وَالزِّنَاءُ وَ وَلَدُ الزِّنَاءِ عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ دُوْنَ الْغُلَامِ، لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُوْدِ فِى الْجَارِيَةِ، وَهُوَ الْاِسْتِفْرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُوْدِ فِى الْغُلَامِ، وَهُوَ الْاِسْتِخْدَامُ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الزِّنَاءُ عَادَةً لَهُ عَلَى مَا قَالُوْا لِأَنَّ اِتِّبَاعَهُنَّ يُخِلُّ بِالْخِدْمَةِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দাসীর ক্ষেত্রে মুখের দুর্গন্ধ ও বগলের দুর্গন্ধ দোষ। কারণ, কখনো [দাসী ক্রয়ের] উদ্দেশ্য হয় [তাকে] শয্যাসঙ্গিনী করা, আর এ দুটো দোষ উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কিন্তু [এ দুটো] দাসের ক্ষেত্রে দোষ নয়। কারণ, [দাস ক্রয়ের] উদ্দেশ্য হলো সেবা গ্রহণ করা, আর এ দুটো দোষ তাতে বাধা সৃষ্টি করে না। হ্যাঁ, যদি দুর্গন্ধ কোনো রোগের কারণে হয় [তাহলে তা দোষ বলে গণ্য হবে]। কারণ, রোগ একটি দোষ। ব্যভিচার ও ব্যভিচারজাত সন্তান হওয়া দাসীর ক্ষেত্রে দোষ, দাসের ক্ষেত্রে নয়। কারণ, তা দাসীর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। আর উদ্দেশ্য হলো শয্যাসঙ্গিনী বানানো এবং সন্তান লাভ করা। কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে [তা] উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে না। উদ্দেশ্য হলো সেবা গ্রহণ করা। তবে ফিক্হবিদগণের উক্তি মতে, যদি জেনা তার স্বভাবে পরিণত হয় [তাহলে তা দোষ]। কেননা, মেয়েদের পিছু নেওয়ার বিষয়টি সেবার কাজকে ব্যাহত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْبَخَرُ وَالدَّفْرُ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুখের দুর্গন্ধ এবং বগলের দুর্গন্ধ দাসীর ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য; কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য নয়। কারণ, দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাকে শয্যাসঙ্গিনী বানানো। আর এ দুটো দোষ উদ্দেশ্য পূরণে বাধার সৃষ্টি করে, তাই দাসীর এ দুটোকে দোষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে গোলাম ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় তাকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা, তার থেকে সেবা গ্রহণ করা। আর এ দুটো বিষয় উদ্দেশ্য পূরণে বাধা সৃষ্টি করে না, তাই গোলামের ক্ষেত্রে এ দুটোকে দোষ সাব্যস্ত করা হয়নি। অবশ্য রোগের কারণে যদি গোলামের মুখে ও বগলে এ দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তাহলে এটাকেও দোষ গণ্য করা হবে। কারণ, রোগ নিঃসন্দেহে একটি দোষ।

ফায়দা : ফাতওয়ায়ে কাজীখান গ্রন্থে আছে, যদিও বগলের বা মুখের দুর্গন্ধ গোলামের ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য নয়, কিন্তু তা যদি স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে তা দোষ বলে গণ্য হবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, যদি দাঁত পরিষ্কার না করার কারণে মুখে গন্ধ হয়, তবে তা দোষ বলে গণ্য হবে না। কারণ, তা দাঁত পরিষ্কার করার দ্বারা দূর করা সম্ভব। -[ফাতহুল কাদীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২]

قَوْلُهُ وَالزِّنَاءُ وَ وَلَدُ الزِّنَاءِ الخ : ব্যভিচার এবং ব্যভিচারজাত সন্তান হওয়া– এ দুটো বিষয় দাসীর ক্ষেত্রে দোষ, কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে তা দোষ নয়। কারণ, এ দুটো বিষয় দাসী ক্রয়ের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, গোলাম ক্রয়ের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে না। দাসী ক্রয়ের সাধারণত উদ্দেশ্য থাকে– মনিব তাকে শয্যাসঙ্গিনী বানাবে এবং তার গর্ভে সন্তান লাভ করবে। কিন্তু চরিত্রবান লোক ব্যভিচারিণী দাসীকে শয্যাসঙ্গিনী বানাতে ঘৃণাবোধ করে, আর তার গর্ভে সন্তান লাভ করতে চায় না। কারণ, সন্তানকে লোকেরা "জারজ মায়ের সন্তান বলে গালি দেবে"।

পক্ষান্তরে গোলাম ক্রয়ের সাধারণত উদ্দেশ্য হয় তার থেকে সেবা গ্রহণ করা। আর সেবা গ্রহণে এ দুটো বিষয় বাধা সৃষ্টি করে না। তবে ব্যভিচার যদি গোলামের স্বভাবে পরিণত হয়, তাহলে ফুকাহায়ে কেরাম তা দোষ বলে গণ্য করেন। কারণ, স্বভাবগত কারণে যখন সে মেয়েদের খোঁজে থাকবে এবং তাদেরকে পটানোর ফিকিরে থাকবে, তখন মনিবের সেবা-কাজে ক্ষতি হবে। তাই ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণ্য আচরণে অভ্যস্ত হওয়া গোলামের ক্ষেত্রে দোষ।

قَالَ : وَالْكُفْرُ عَيْبٌ فِيْهِمَا، لِأَنَّ طَبْعَ الْمُسْلِمِ يَتَنَفَّرُ عَنْ صُحْبَتِهِ، وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِيْ بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ، فَتَخْتَلُّ الرَّغْبَةُ، فَلَوْ اِشْتَرَاهُ عَلٰى أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُّهُ، لِأَنَّهُ زَوَالُ الْعَيْبِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) : يَرُدُّهُ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِيْهِ الْمُسْلِمُ، وَفَوَاتُ الشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ قَالَ : فَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِيْضُ أَوْ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَهُوَ عَيْبٌ، لِأَنَّ إِرْتِفَاعَ الدَّمِ وَاسْتِمْرَارَهُ عَلَامَةُ الدَّاءِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِرْتِفَاعِ أَقْصٰى غَايَةِ الْبُلُوْغِ، وَهُوَ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً فِيْهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَيُعْرَفُ ذٰلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتُرَدُّ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُوْلُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কাফির হওয়া গোলাম ও বাঁদি উভয়ের ক্ষেত্রে দোষ। কারণ, মুসলমানের স্বভাব তার সঙ্গকে ঘৃণা করে। তাছাড়া কোনো কোনো কাফ্ফারায় তাকে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুতরাং [তার প্রতি] আগ্রহ ব্যাহত হবে। তবে যদি কেউ কাফির হওয়ার শর্তে গোলাম ক্রয় করে তারপর তাকে দেখে যে, সে মুসলিম, তাহলে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, এটা তো দোষমুক্ত হওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, কাফিরকে এমন কিছু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়, যে ক্ষেত্রে মুসলমানকে কাজে লাগনো যায় না। আর শর্তের অনুপস্থিতি দোষের পর্যায়ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি দাসী প্রাপ্তবয়স্কা হয়, কিন্তু তার হায়েয আসে না কিংবা সে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়, তাহলে তা দোষ। কেননা, রক্তস্রাব বন্ধ থাকা এবং রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা দুটোই রোগের লক্ষণ। রক্তস্রাব বন্ধ থাকার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বিবেচ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নারীর ক্ষেত্রে তা হলো সতের বছর। আর রক্তস্রাব বন্ধ থাকার বিষয়টি জানা যাবে দাসীর কথা দ্বারা। সুতরাং দাসীর কথার সাথে যখন বিক্রেতার পক্ষ থেকে কসমের অস্বীকৃতি মিলিত হবে, তখন দাসী ফেরত দেওয়া যাবে; কব্জার আগে হোক কিংবা পরে হোক। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكُفْرُ عَيْبٌ فِيْهِمَا الخ : একজন মুসলমান ক্রেতা এ শর্তে একটি গোলাম/বাঁদি ক্রয় করল যে, সে মুসলমান। কব্জা করার পর ক্রেতা দেখল গোলাম/ বাঁদিটি কাফির। তাহলে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে এবং ক্রয়কৃত গোলাম/বাঁদিকে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, "কুফর" গোলাম ও বাঁদি উভয়ের ক্ষেত্রে দোষ। এর দলিল হলো–

১. কাফির সে ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান বা অগ্নি-উপাসক বা হিন্দু, যাই হোক–মুসলমানের স্বভাব তার সঙ্গকে ঘৃণা করে। তাই কাফির গোলামের প্রতি মুসলমান ক্রেতার আগ্রহ কম থাকে। আর বিক্রীত-পণ্যের প্রতি আগ্রহ কম থাকা মূল্যহ্রাসের কারণ হয়। আর যা ব্যবসায়ীদের রীতি ও প্রচলন অনুসারে [দ্রব্যের] মূল্যহ্রাস ঘটায় তাই আইব বা দোষ। অতএব মুসলমান ক্রেতার জন্য ক্রয়কৃত গোলাম/বাঁদির কাফের হওয়া দোষ বলে গণ্য হবে।

২. কাফির গোলামকে কোনো কোনো কাফফারায় মুক্ত করা নিষিদ্ধ। ভুলক্রমে হত্যার (قَتْل خَطَأً) কাফফারা হিসেবে সর্বসম্মতভাবেই কাফির গোলাম মুক্ত করা নিষিদ্ধ। আর কসম ও যিহারের (ظِهَار) কাফফারা হিসেবে অনেকের মতে নিষিদ্ধ। তাছাড়া দীনি বিষয়ে তার সেবায় মুসলমান মনিব আশ্বস্ত নয়। যেমন– অজুর পানির ব্যবস্থা করা, কুরআন মাজীদ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা ইত্যাদি। তাই স্বাভাবিকভাবেই কাফির গোলামের প্রতি মুসলমান ক্রেতার আগ্রহ কম থাকে। আর আগ্রহ কম থাকা মূল্যহ্রাসের কারণ। আর যা মূল্যহ্রাসের কারণ হয় তা দোষ। সুতরাং কাফির হওয়া গোলাম/ বাঁদির ক্ষেত্রে দোষ বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি নিঃশর্ত চুক্তি হয় অর্থাৎ গোলামটি মুসলমান বা কাফির এ ধরনের কোনো শর্ত যদি বিক্রয়চুক্তিতে করা না হয় এবং কব্জা করার পর দেখা যায় গোলামটি কাফির, তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে না। কারণ, ক্রেতা নির্দিষ্ট গোলাম ক্রয় করেছে, আর ক্রয়ের আগে বাহ্যিক অবস্থা থেকে গোলামটি মুসলমান বলে কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তাই ক্রেতা সম্মত হয়েই কাফির গোলাম ক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ اِشْتَرَاهُ عَلٰى أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا الخ : যদি কোনো ব্যক্তি কাফির হওয়ার শর্তে গোলাম/ বাঁদি ক্রয় করে এবং কব্জা করার পর দেখে সে মুসলমান, তাহলে আমাদের মতে ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে না এবং উক্ত গোলাম/বাঁদিটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে এবং খেয়ার বলে উক্ত গোলাম/ বাঁদিটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। ইমাম আহমদও এ মত পোষণ করেন।

আমাদের দলিল হলো, যেহেতু "কুফর" গোলাম ও বাঁদির ক্ষেত্রে দোষ, তাই এ সুরতে তো বিক্রীত-পণ্য দোষমুক্ত প্রমাণিত হলো। আর বিক্রীত-পণ্য দোষমুক্ত হলে ক্রেতা খেয়ারে আইব পায় না। অতএব এ সুরতে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে না। এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি একটি দোষগ্রস্ত পণ্য ক্রয় করল, কিন্তু কব্জা করার পর দেখল তা দোষমুক্ত। এ সুরতে যেরূপ ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা গোলাম/ বাঁদিটি ফেরত দিতে পারবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, لِأَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِيْمَا لَا يُسْتَعْمَلُ الخ কাফির গোলাম/বাঁদিকে যে সব কাজে ব্যবহার করা যায় মুসলমান গোলাম/বাঁদিকে সে সব কাজে ব্যবহার করা যায় না। যেমন– নামাজের জামাতের সময় কাফির গোলাম/ বাঁদিকে দোকান/ প্রতিষ্ঠান দেখাশুনার কাজে নিযুক্ত করা যায়, কিন্তু মুসলমান মনিব তার মুসলমান গোলামকে এ কাজে ব্যবহার করা পছন্দ করবে না। তাছাড়া তুচ্ছ এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো মনিবের নিজে করা যেরূপ পছন্দ নয়, তেমনি তার মুসলমান গোলামের দ্বারা করানোও তার পছন্দ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে কাফির গোলামকে ব্যবহার করা যায়। তাই কখনো কখনো কাফির গোলাম/ বাঁদি ও আগ্রহের কারণ হয়। আর আগ্রহ সৃষ্টিকারী গুণের (وَصْفٌ مَرْغُوْبٌ فِيْهِ) অনুপস্থিতি দোষের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং কাফির হওয়ার শর্তে ক্রয় করার সুরতে যদি গোলাম কাফির না হয়, তাহলে তা দোষ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রেতা খেয়ার লাভ করবে। আর খেয়ার বলে সে মুসলমান গোলামকে ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ الخ : হায়েয (حَيْض) না আসা কিংবা ইস্তিহাযাগ্রস্ত (مُسْتَحَاضَةٌ) হওয়া উভয়টা প্রাপ্তবয়স্কা (بَالِغَةٌ) মহিলার ক্ষেত্রে দোষ। অপ্রাপ্তবয়স্কা (اَلصَّغِيْرَةُ) মেয়ের ক্ষেত্রে হায়েয না আসাটা সর্বসম্মতভাবে দোষ নয়। তদ্রূপ যে মহিলা সন্তান জন্মদানের বয়সের সময়সীমা অতিক্রম করেছে (آيِسَةٌ) তার ক্ষেত্রেও হায়েয না আসাটা সকল ফুকাহায়ে কেরামের মতে দোষ নয়। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮]

হায়েয না আসা কিংবা ইস্তিহাযাগ্রস্ত হওয়াটা বালেগা মহিলার ক্ষেত্রে দোষ কেন ? গ্রন্থকার (র.) বলেন, বালেগা মহিলার রক্তস্রাব বন্ধ থাকা (اِنْقِطَاعُ الدَّمِ) কিংবা রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা (اِسْتِمْرَارُ الدَّمِ) উভয়টা রোগের লক্ষণ। শায়খুল ইসলাম খাযদবী (র.) বলেন, "হায়েয নারীর সৃষ্টিগত বিষয়। যদি সময়মতো অর্থাৎ বালেগা হওয়ার পর হায়েয না আসে,

তাহলে এটাই বাস্তব যে, কোনো রোগের কারণে হায়েয আসছে না। আর রোগ একটি দোষ। [প্রাগুক্ত] তবে রক্তস্রাব বন্ধ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হবে বালেগা হওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা অতিবাহিত হলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নারীর বালেগা হওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা সতের বছর, আর সাহেবাইন [ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর মতে পনের বছর। অতএব পনের/সতের বছর অতিক্রম করার পরও যদি হায়েয না আসে, তবে তা দোষ বলে নির্ণীত হবে।

অতএব কোনো ব্যক্তি যদি সতের বছরোর্ধ্ব বালেগা বাঁদি ক্রয়ের পর দেখে তার হায়েয আসে না কিংবা সে ইস্তিহাযাগ্রস্ত, তাহলে সে খেয়ারে আইব তথা দোষজনিত এখতিয়ার লাভ করবে। তবে তার আগে এ দোষটি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল তা প্রমাণ করতে হবে। আর হায়েয বন্ধ থাকার বিষয়টি এমন যে, তা একমাত্র বাঁদিই বলতে পারে– অন্যের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এ বিষয়টি তার কাছ থেকেই জানা যাবে। সে যদি বলে যে, বিক্রেতার কাছে থাকাকালীন সময় থেকেই তার হায়েয আসে না, তাহলে নারীর সাক্ষী দুর্বল হেতু তার কথা দ্বারা আদালতে দোষ সাব্যস্ত হবে না, তবে তা আদালতে বিক্রেতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ক্রেতার পক্ষে দলিল হবে। এরপর বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কাছে থাকাকালে এ দোষটি ছিল? সে যদি হ্যাঁ বলে, তাহলে ক্রেতার খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হবে এবং সে বাঁদিটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা বলে, আমার কাছে থাকাকালে এ দোষ ছিল না; বরং ক্রেতার কাছে এসে এর সূচনা হয়েছে, তাহলে এ সুরতে বিক্রেতার কাছে থাকাকালে বাঁদির হায়েয আসেনি– ক্রেতা এ মর্মে বাদী (مُدَّعِيْ) হলো, বিক্রেতা তার অস্বীকারকারী (مُنْكِرْ) হলো। আর বিষয়টি অন্যের পক্ষে যেহেতু জানা সম্ভব নয়, তাই এ বিষয়ে কারো সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সাক্ষী এমন সব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হয় যা সাক্ষ্যদাতাদের জন্য জানা সম্ভব। আর হায়েয না আসা সম্পর্কে সাক্ষীদাতাদের জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। মোটকথা, যখন ক্রেতা [বাদী]-এর দলিল (بَيِّنَةٌ) পেশ করা অর্থাৎ তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব হয়, তখন ক্রেতা যদি বিক্রেতা [বিবাদী ও অস্বীকারকারী] থেকে কসমের দাবি করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দেবেন। যদি বিক্রেতা এই মর্মে কসম করে যে, তার কাছে থাকাকালে এ দোষ ছিল না, ক্রেতার কাছে আসার পর এর সূচনা হয়েছে, তাহলে মোকদ্দমা খারিজ হয়ে যাবে এবং ক্রেতা বাঁদি ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না। আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে বিচারকের রায় ক্রেতার পক্ষে যাবে এবং ক্রেতা খেয়ারে আইবের অধীনে বাঁদিটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

যদি ক্রেতা এই দাবি করে যে, বাঁদির ইস্তিহাযার দোষ আছে এবং এ দোষটি বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই ছিল– আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে দলিল তথা সাক্ষী পেশ করার নির্দেশ দেবেন। কারণ, ইস্তিহাযা এমন একটি বিষয়, যা ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা ছাড়া অন্যের পক্ষেও জানা সম্ভব। অবশ্য পুরুষদের জানা সম্ভব নয়, কিন্তু মহিলাদের জানা সম্ভব। আর যে সব বিষয়ে পুরুষদের জানা সম্ভব নয় সে সব বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব ক্রেতা যদি ইস্তিহাযা থাকা এবং তা বিক্রেতার কাছে থাকাকালেই বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ করে, তাহলে বিচারক ক্রেতার পক্ষে রায় দেবেন এবং ক্রেতা খেয়ারে আইবের অধীনে বাঁদিটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করতে অপারগ হয়, তাহলে বিক্রেতাকে কসম করার নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে রায় তার পক্ষে যাবে এবং ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে না। আর যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে এবং বাঁদিটি ফেরত দিতে পারবে। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০] গ্রন্থকার (র.) এ দীর্ঘ আলোচনাকেই তাঁর সংক্ষিপ্ত ইবারত وَيُعْرَفُ ذٰلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتُرَدُّ إِذَا انْضَمَّ الخ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَالَ : وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِيْ عَيْبٌ وَاطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ، وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيْعَ، لِأَنَّ فِي الرَّدِّ إِضْرَارًا بِالْبَائِعِ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا وَيَعُوْدُ مَعِيْبًا فَامْتَنَعَ، وَلَابُدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، فَتَعَيَّنَ الرُّجُوْعُ بِالنُّقْصَانِ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالضَّرَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি [কব্জার পর পণ্যে] ক্রেতার কাছে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হয়, অতঃপর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন আরেকটি দোষ সম্পর্কে ক্রেতা অবগত হয়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে; কিন্তু বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। কেননা, ফেরত দেওয়াতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। কারণ, পণ্য তার মালিকানা থেকে নতুন সৃষ্ট দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় বের হয়েছে, অথচ ফিরে আসবে দোষগ্রস্ত অবস্থায়। তাই ফেরত দেওয়া নিষেধ। আবার ক্রেতার ক্ষতি দূর করাও আবশ্যক। তাই ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াটা নির্ধারিত হয়ে গেল। তবে বিক্রেতা যদি [ক্রেতার কাছে সৃষ্ট দোষসহ] পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, সে ক্ষতি মেনে নিতে সম্মত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِيْ عَيْبٌ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, ক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলো। এরপর বিক্রেতার কাছে ছিল এমন আরেকটি দোষ সম্পর্কে ক্রেতা অবগত হলো, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে আসা পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। এর দলিল হলো, পণ্যটি ফেরত দেওয়াতে বিক্রেতার ক্ষতি হয়, আর এদিকে পুরাতন দোষসহ পণ্যটি গ্রহণে ক্রেতার ক্ষতি হয়। বিক্রেতার ক্ষতি এজন্য হয় যে, পণ্যটি যখন তার মালিকানা থেকে বের হয় তখন তাতে ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্ট দোষটি ছিল না। এখন যদি পণ্যটি ফেরত আসে নতুন তাহলে ঐ সৃষ্ট দোষসহ ফেরত আসবে। তাই ফেরত দেওয়া নিষেধ। আর ক্রেতার ক্ষতি এজন্য হয় যে, দোষের কারণে পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটে। আর পণ্যের মূল্যহ্রাস ঘটা ক্রেতার জন্য ক্ষতি। তাই এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে বিক্রেতারও ক্ষতি না হয়, আবার ক্রেতাও ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যায়। আর তা হলো ক্ষতিপূরণ নেওয়া। ক্রেতা পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিলেই উভয়দিক রক্ষা পায়। তাই ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াই নির্ধারিত হবে।

ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পদ্ধতি হলো, পুরাতন দোষসহ পণ্যটির বাজারমূল্য কত, আর দোষমুক্ত হলে কত দাম হতো এ দুটো বিষয় যাচাই করবে। এরপর দুটোর মূল্যে যে ব্যবধান হয় ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নেবে। উদাহরণত দোষমুক্ত অবস্থায় পণ্যটির বাজারদর একশ' টাকা আর দোষসহ পণ্যটির দাম আশি টাকা, তাহলে দোষের ক্ষতিপূরণ বিশ টাকা। ক্রেতা বিক্রেতা থেকে এ বিশ টাকা ফেরত পাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, দোষ পণ্যের একটি গুণ (وَصْفٌ)। দোষের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার অর্থ গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ স্থির করা। আর পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, গুণের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ হয় না। অতএব ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা বৈধ হয় না। এর উত্তরে আল্লামা আইনী (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তিতে গুণ যদি মুখ্য না হয় তাহলে গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ হয় না, কিন্তু যদি মুখ্য হয় তাহলে গুণের বিনিময়ে মূল্যের অংশ হয়। আর আলোচ্য মাসআলা হলো ঐ ক্ষেত্রেই যেখানে গুণ মুখ্য হয়।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ الخ : অবশ্য বিক্রেতা যদি নতুন সৃষ্ট দোষসহ পণ্যটি গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দেবে এবং পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে। কারণ, বিক্রেতার ক্ষতি রোধের জন্যই ক্রেতার ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া নির্ধারিত হয়েছিল। বিক্রেতা যদি নিজেই ক্ষতি মেনে নেয়, তাহলে এটা তার ব্যাপার। এটা সে করতে পারে। তাই ক্রেতা পণ্যটি ফেরত দিতে পারবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِالْقَطْعِ، فَإِنَّهُ عَيْبٌ حَادِثٌ، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ، أَنَا أَقْبَلُهُ كَذٰلِكَ كَانَ لَهُ ذٰلِكَ، لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِ، وَقَدْ رَضِيَ بِهِ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ الرَّدَّ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ بِرِضَاءِ الْبَائِعِ، فَيَصِيرُ هُوَ بِالْبَيْعِ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ، فَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে এবং তা কর্তন করে তারপর তাতে দোষ পায়, তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে। কেননা, কেটে ফেলার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হবে। কারণ, কেটে ফেলা একটি নতুন দোষ। তবে বিক্রেতা যদি বলে, আমি সেটা কাটা অবস্থাতেই [ফেরত] গ্রহণ করব, তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে। কারণ, [ফেরত দানের] নিষিদ্ধতা তার হক রক্ষার জন্য, অথচ সে কাটা কাপড় ফেরত গ্রহণে সম্মত আছে। যদি ক্রেতা কাটা কাপড়টি বিক্রি করে দেয়, তাহলে সে কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, বিক্রেতা [নতুন দোষসহ] ফেরত গ্রহণে সম্মত হলে কাপড়টি [এ সুরতে] ফেরত দেওয়া অসম্ভব ছিল না। সুতরাং ক্রেতাই বিক্রি করার মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্য আবদ্ধকারী হলো। সুতরাং সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا الخ : আলোচ্য মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) রচিত জামে সগীরের। তিনি বলেন, কেউ যদি কোনো কাপড় ক্রয় করে এবং তা কর্তন করে তারপর তাতে দোষ পায়, তাহলে সে দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে; কিন্তু কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, কেটে ফেলা একটি নতুন দোষ। আর বিক্রেতার মালিকানা থেকে কাপড়টি বের হওয়ার সময় এ দোষ ছিল না। এখন ফেরত দেওয়া বৈধ হলে বিক্রেতার মালিকানায় কাপড়টি দোষসহ ফেরত যাবে। এতে তার ক্ষতি হবে। তাই তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : أَنَا أَقْبَلُهُ كَذٰلِكَ الخ : তবে বিক্রেতা যদি কেটে ফেলা কাপড়টি ফেরত নিতে সম্মত হয়, তাহলে এ অধিকার তার রয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে কাপড়টি ফেরত দেবে এবং মূল্য পরিশোধ করে থাকলে তা ফেরত নেবে। কারণ, তার থেকে ক্ষতি রোধ করার এবং তার অধিকার রক্ষার জন্যই ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়ে ছিল। এখন সে যেহেতু ফেরত নিতে সম্মত হয়েছে, এর অর্থ হলো, সে স্বেচ্ছায় ক্ষতি বহনে এবং নিজ অধিকার ত্যাগে সম্মত। আর স্বেচ্ছায় নিজ অধিকার ত্যাগ করা বৈধ। অতএব এ সুরতে কাপড়টি ফেরত নেওয়া তার জন্য বৈধ হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ الخ : যদি কাপড়টি কাটার পর ক্রেতা কারো কাছে তা বিক্রি করে দেয়– দোষের কথা জেনে বিক্রি করুক বা না জেনে বিক্রি করুক, তাহলে সে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না। কারণ, নিয়ম হলো, দোষ প্রমাণিত হলে ক্রেতা খেয়ারে আইব পাবে এবং খেয়ার বলে সে বিক্রেতাকে কাপড়টি ফেরত দেবে। কিন্তু এখন কাপড়টি কেটে ফেলায় ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কাপড়টি ফেরত দেওয়া যেত; কিন্তু বিক্রি করে দেওয়ায় কাপড়টিতে আরেকজনের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এখন বিক্রেতা কাটা কাপড়টি ফেরত নিতে সম্মত হলেও ক্রেতার পক্ষে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ক্রেতা বিক্রেতার কাছে কাপড়টি ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করল। আর নিয়ম হলো, ক্রেতা স্বীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দোষগ্রস্ত পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না। অতএব আলোচ্য সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না।

فَإِنْ قَطَعَ الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ، لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الْفَسْخِ فِي الْأَصْلِ بِدُوْنِهَا، لِأَنَّهَا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ، وَلَا وَجْهَ إِلَيْهِ مَعَهَا، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ، فَامْتَنَعَ أَصْلًا وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ، لِأَنَّ الْامْتِنَاعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لَا لِحَقِّهِ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ، لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْتَنِعٌ أَصْلًا قَبْلَهُ، فَلَا يَكُوْنُ بِالْبَيْعِ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ، وَعَنْ هٰذَا قُلْنَا : إِنَّ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَخَاطَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا يَرْجِعُ، لِأَنَّ التَّمْلِيكَ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ، وَفِي الثَّانِي بَعْدَهُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ۔

অনুবাদ : যদি ক্রেতা [ক্রয়ের পর] কাপড়টি কাটে এবং তা সেলাই করে কিংবা তাকে লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করে অথবা ছাতুকে ঘি দ্বারা মেখে ফেলে, এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, [এ সুরতে] অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, যুক্ত জিনিসটি যেহেতু পৃথক করা সম্ভব নয়, তাই সেটাকে বাদ দিয়ে মূল কাপড় ও ছাতুতে বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব নয়। আবার যুক্ত জিনিসটি যেহেতু বিক্রীত-পণ্য নয়, তাই তা সহ [কাপড় ও ছাতু ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে] বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বতই [তা ফেরত দেওয়া] নিষিদ্ধ। আর বিক্রেতার জন্য [যুক্ত জিনিসসহ] বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, এ নিষিদ্ধতা শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে; বিক্রেতার অধিকারের প্রেক্ষিতে নয়। যদি দোষ দেখার পরও [যুক্ত জিনিসসহ] ছাতু বা কাপড়টি ক্রেতা বিক্রি করে দেয়, তাহলেও সে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কারণ, বিক্রি করার আগে থেকেই সর্বোতই তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং বিক্রি করার দ্বারা সে পণ্য আবদ্ধকারী বিবেচিত হবে না। এ কারণেই আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে অতঃপর তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির উদ্দেশ্যে তা কাটে এবং সেলাই করে, এরপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যদি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে ফেরত নিতে পারবে। কারণ, প্রথম সুরতে কাপড়ে [অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের] মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে সেলাই করার আগে, আর দ্বিতীয় সুরতে সাব্যস্ত হয়েছে সেলাই করার পর প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কাছে তা অর্পণ করার দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَطَعَ الثَّوْبَ الخ : মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে, এরপর জামা তৈরির উদ্দেশ্যে কাপড়টি কাটে এবং তা সেলাই করে কিংবা তাকে লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করে অথবা ছাতু ক্রয় করে এবং তাকে ঘি দ্বারা মেখে ফেলে, এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, যদিও নিয়ম হচ্ছে, দোষ প্রমাণিত হলে খেয়ারে আইবের অধীনে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়া, কিন্তু এ সুরতে অতিরিক্ত জিনিস যোগ করার কারণে কাপড়টি ফেরত দেওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে এ বাধাপ্রাপ্ততার জন্য ক্রেতার হস্তক্ষেপকে দায়ী করা যায় না। কারণ, পণ্যে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ায় তার পক্ষে ফেরত দেওয়া সম্ভব, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে অন্য কারণে। আর তা হলো, যুক্ত জিনিসটিকে বাদ দিয়ে মূল কাপড় ও ছাতু ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যুক্ত জিনিসটি কাপড় ও ছাতু থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। আবার যুক্ত জিনিসটি সহ কাপড় ও ছাতু ফেরত দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, যুক্ত জিনিসটি বিক্রীত-পণ্য নয়। যখন কোনোভাবেই ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, তখন দোষের ক্ষতি থেকে বাঁচানোর বিকল্প উপায় হিসেবে ক্রেতার জন্য ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ الخ : পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে যে, যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত কাপড় কেটে ফেলার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হয় এবং বিক্রেতা ঐ কাটা কাপড় ফেরত নিতে সম্মত হয়, তাহলে সে তা ফেরত নিতে পারবে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলা হলো, বিক্রেতা যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাতু ফেরত নিতে সম্মত হলেও সে তা ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, দু মাসআলায় স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বোক্ত মাসআলায় কাটা কাপড় ফেরত দেওয়া নিষেধ বিক্রেতা থেকে ক্ষতি রোধ করা এবং তার অধিকার রক্ষার জন্য। আর সে যেহেতু স্বেচ্ছায় ক্ষতি বহনে এবং নিজ অধিকার ত্যাগে সম্মত, তাই সে কাটা কাপড় নিতে পারবে। আর আলোচ্য মাসআলায় যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাতু ফেরত নিলে যেহেতু তা সুদ হবে, তাই কাপড় বা ছাতু ফেরত নেওয়া শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে নিষেধ। অতএব পূর্বোক্ত মাসআলায় ক্রেতার জন্য কাটা কাপড় ফেরত নেওয়া বৈধ হলেও আলোচ্য মাসআলায় যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাতু ফেরত নেওয়া বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ الخ : যদি দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ক্রেতা যুক্ত জিনিসসহ কাপড় বা ছাতু বিক্রি করে, তাহলেও সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, বিক্রির পূর্বেই কাপড় বা ছাতু ফেরত দেওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং বিক্রি করার মাধ্যমে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। তাই বিক্রি করা সত্ত্বেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে।

قَوْلُهُ وَعَنْ هٰذَا قُلْنَا : إِنَّ مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা নিজ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দোষগ্রস্ত পণ্য বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে যেহেতু সে ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তাই আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় ক্রয় করে তারপর তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির উদ্দেশ্যে তা কাটে এবং সেলাই করে, এরপর কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু সন্তান যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে ফেরত নিতে পারবে। কারণ, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পোশাক তৈরির নিয়তে যখন ক্রেতা কাপড়টি কাটে, তখনি তাতে সন্তানের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি বিক্রেতা কাটা কাপড় ফেরত নিতে সম্মত হতো, তাহলে ক্রেতার জন্য তা ফেরত দেওয়া সম্ভব হতো না। অতএব ক্রেতা সেলাই করার আগেই কাপড়টি ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করল। আর ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে যেহেতু ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তাই ক্রেতা সেলাই করার পরও ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না।

পক্ষান্তরে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের কাছে কোনো জিনিস অর্পণ করার পর সে তার মালিক হয়, তাই সেলাই করার আগে কাপড়ে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। বরং ক্রেতা নিজের মালিকানাধীন কাপড় সেলাই করেছে। আর সেলাই যুক্ত হওয়ার কারণে শরিয়তের অধিকারের প্রেক্ষিতে কাপড়টি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এ সুরতে ক্রেতা তা ফেরত দেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। অতএব সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاَعْتَقَهٗ اَوْ مَاتَ عِنْدَهٗ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلٰى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهٖ، أَمَّا الْمَوْتُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَهِىْ بِهٖ، وَالْاِمْتِنَاعُ حُكْمِىٌّ لَا بِفِعْلِهٖ، وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيْهِ أَنْ لَّا يَرْجِعَ، لِأَنَّ الْاِمْتِنَاعَ بِفِعْلِهٖ، فَصَارَ كَالْقَتْلِ، وَفِى الْإِسْتِحْسَانِ يَرْجِعُ، لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنْهَاءُ الْمِلْكِ، لِأَنَّ الْأٰدَمِيَّ مَا خُلِقَ فِى الْأَصْلِ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيْهِ مُوَقَّتًا إِلَى الْإِعْتَاقِ، فَكَانَ إِنْهَاءً، فَصَارَ كَالْمَوْتِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الشَّيْئَ يَتَقَرَّرُ بِإِنْتِهَائِهٖ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ، وَالرَّدُّ مُتَعَذِّرٌ، وَالتَّدْبِيْرُ وَالْاِسْتِيْلَادُ بِمَنْزِلَتِهٖ، لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّقْلِ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِيِّ، وَإِنْ أَعْتَقَهٗ عَلٰى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْئٍ، لِأَنَّهٗ حَبَسَ بَدَلَهٗ، وَحَبْسُ الْبَدَلِ كَحَبْسِ الْمُبْدَلِ، وَعَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهٗ يَرْجِعُ، لِأَنَّهٗ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ، وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করে এবং তাকে আজাদ করে দেয় অথবা সে তার কাছে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, এরপর ক্রেতা কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে সে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ এই যে, মৃত্যুর দ্বারা মালিকানার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর [ফেরত দেওয়ার পথে] বাধা এসেছে শরিয়তের বিধানগত কারণে, ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়। আর আজাদ করার ক্ষেত্রে কিয়াস [এর দাবি] হলো ক্রেতার ক্ষতিপূরণ ফেরত না পাওয়া। কেননা, এখানে বাধা সৃষ্টি হয়েছে তার নিজস্ব কর্মের কারণে। সুতরাং এটা [গোলামকে] হত্যা করার মতো হয়ে গেল। তবে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে ক্রেতা [ক্ষতিপূরণ] ফেরত পাবে। কেননা, আজাদ করা মানে মালিকানার পরিসমাপ্তি ঘটা। কারণ, মানুষকে মূলত মালিকানাধীন বস্তুরূপে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং তাতে আজাদ করার সময়কাল পর্যন্ত মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আজাদ করার অর্থ হলো, মালিকানার পরিসমাপ্তি। কাজেই তা মৃত্যুর মতো হলো। আর এটা এজন্য যে, একটি জিনিস পরিসমাপ্তির মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে, মালিকানা বাকি আছে, কিন্তু ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়ে পড়েছে। আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বানানো আজাদ করার পর্যায়ভুক্ত। কারণ, মালিকানা আরোপের পাত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মালিকানা হস্তান্তর অসাধ্য হওয়াটা শরিয়তের বিধানগত কারণে। [তার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়।] যদি ক্রেতা গোলামকে মাল প্রদানের শর্তে আজাদ করে, তাহলে সে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সে গোলামের বিনিময় আবদ্ধ করেছে। আর বিনিময় আবদ্ধ করা মূল বস্তু আবদ্ধ করার মতো। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। কেননা, বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে আজাদ করা হলেও তা মালিকানাকে সমাপ্ত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاَعْتَقَهُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি গোলাম ক্রয় করার পর আজাদ করে দেয় কিংবা গোলাম ক্রেতার কব্জায় আসার পর মৃত্যুবরণ করে, এরপর ক্রেতা গোলামের এমন কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় যা বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল, তাহলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এজন্য নিতে পারবে যে, মৃত্যুর মাধ্যমে মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমেই জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও যেন গোলামের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা বহাল আছে, কিন্তু তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর এ অসাধ্যতা ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে নয়; বরং মৃত্যু তথা অনিচ্ছাকৃত বিষয়ের কারণে। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার ক্ষেত্রে ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী না হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। তাই মৃত্যুবরণ করার সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيْهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ الخ : আর গোলাম ক্রয় করে আজাদ করে দেওয়ার সুরতে কিয়াসের দাবি হলো, ক্ষতিপূরণ ফেরত না পাওয়া। কারণ, এ ক্ষেত্রে ফেরত দিতে না পারার পিছনে ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী। সুতরাং তা গোলামকে হত্যা করার মতো হলো। গোলামকে হত্যা করার পর দোষ প্রকাশ পেলে, ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী হওয়ায় যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তেমনি আজাদ করার সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না।

আর ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি হলো ক্ষতিপূরণ ফেরত পাওয়া। এটাই ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত। কারণ, মানুষকে মূলত মালিকানাধীন বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আজাদ করার সময়কাল পর্যন্ত তাতে মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আজাদ করার মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমেই জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই আজাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (وَلَاء) আজাদকারী পায়। সুতরাং বলা যায় আজাদ করা সত্ত্বেও যেন মালিকানা বাকি আছে। কিন্তু আজাদ করায় বিক্রেতাকে তা ফেরত দেওয়া অসাধ্য। এ অসাধ্যতা যদিও ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে, কিন্তু তা এমন একটি কর্ম যা শরিয়ত কামনা করে। আর তাই ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার কর্মকে দায়ী করা হবে না। সুতরাং তা মৃত্যুবরণ করার মতো হয়ে গেল। মৃত্যুবরণ করার সুরতে ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার কর্ম দায়ী না হওয়ায় যেরূপ ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়, তেমনি আজাদ করার সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيْرُ وَالْاِسْتِيْلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ، لِأَنَّ تَعَذُّرَ النَّقْلِ الخ : মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বানানো আজাদ করার সমপর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ গোলাম আজাদ করার পর দোষ সম্পর্কে অবহিত হলে যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় তেমনি গোলামকে মুদাব্বার বা বাঁদিকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদে ক্রেতার মালিকানা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর এ অসাধ্যতার জন্য ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশের কারণেই ফেরত দেওয়া অসাধ্য। কারণ, শরিয়ত মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মালিকানা পরিবর্তনকে অনুমোদন করে না। তাই ক্রেতা ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ الخ : যদি ক্রেতা মাল বা অর্থের বিনিময়ে গোলাম আজাদ করে, এরপর এমন কোনো দোষ সম্পর্কে অবগত হয় যা বিক্রেতার কাছে থাকাকালে ছিল, তাহলে গ্রন্থকার (র.)-এর মতে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, সে গোলামের বিনিময় আবদ্ধ করেছে। আর বিনিময় আবদ্ধ করা মূল বস্তু আবদ্ধ করার মতো। সুতরাং এটা গোলাম বিক্রি করে দেওয়ার মতো হলো। ক্রেতা গোলামকে বিক্রি করে দেওয়ার সুরতে– নিজস্ব কর্মের কারণে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হওয়ায় যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না, তেমনি আলোচ্য সুরতেও পাবে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে হলেও তার মাধ্যমে মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। আর সে কারণেই বিনিময় গ্রহণ করে আজাদ করা হলেও আজাদকৃত গোলামের উত্তরাধিকারী না থাকলে আজাদকারী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (وَلَاء) লাভ করে। সুতরাং তা বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আজাদ করার মতো হলো। বিনিময় গ্রহণ ছাড়া আজাদ করার সুরতে ক্রেতা যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়, তেমনি বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে আজাদ করা হলেও ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে।

فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) . أَمَّا الْقَتْلُ فَالْمَذْكُوْرُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَرْجِعُ، لِأَنَّ قَتْلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ دُنْيَاوِيٌّ، فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَيَكُوْنُ إِنْهَاءً، وَ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوْجَدُ إِلَّا مَضْمُوْنًا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ هٰهُنَا بِاعْتِبَارِ الْمِلْكِ، فَيَصِيْرُ كَالْمُسْتَفِيْدِ بِهِ عِوَضًا بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ، لِأَنَّهُ لَا يُوْجِبُ الضَّمَانَ لَا مَحَالَةَ كَإِعْتَاقِ الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرِكًا، وَأَمَّا الْأَكْلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ، وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ إِسْتِحْسَانًا .

অনুবাদ : যদি ক্রেতা গোলামকে হত্যা করে অথবা খাদ্যদ্রব্য হলে তা খেয়ে ফেলে, [এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়] তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। হত্যা সম্পর্কিত উল্লিখিত সিদ্ধান্তটি হলো জাহের রেওয়ায়েত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কেননা, মনিব কর্তৃক স্বীয় গোলামকে হত্যা করার সঙ্গে জাগতিক কোনো বিধান [কিসাস, দিয়ত ইত্যাদি] জড়িত নয়। সুতরাং [এদিক থেকে] এটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো হয়ে গেল। তাই হত্যা করাটা হবে মালিকানার পরিসমাপ্তি। আর জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হলো, কোনো হত্যা দায়মুক্ত হয় না। এ ক্ষেত্রে দায় রহিত হচ্ছে মালিকানার দিক বিবেচনায়। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির মতো হবে– যে মালিকানার পরিবর্তে বিনিময় লাভ করে কিন্তু আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তা কোনোভাবেই দায়বদ্ধতাকে আবশ্যক করে না। যেমন– দরিদ্র ব্যক্তি কর্তৃক শরিকানাভুক্ত গোলামকে আজাদ করে দেওয়া। [তখন গোলামকেই উপার্জনের মাধ্যমে অপর মালিকের দায় পরিশোধ করতে হয়।] আর খাদ্যদ্রব্যের বিষয়টিও মতবিরোধপূর্ণ। সাহেবাইন [ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর মতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইসতিহসান হিসেবে ফেরত নিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِيْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে।

১. এক ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করে তাকে হত্যা করেছে। এরপর গোলামের এমন দোষ সম্পর্কে অবগত হয়েছে, যা বিক্রেতার কাছে ছিল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটি জাহের রেওয়ায়েত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। য়ানাবী'-এর বর্ণনা মতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও এটি।

২. এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে খেয়ে ফেলেছে কিংবা কাপড় ক্রয় করে তা পরিধান করেছে এবং তা ছিড়ে ফেলেছে এরপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়েছে, তাহলে সাহেবাইন (র.) -এর অভিমতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-ও এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতও এটি। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইসতিহসান হিসেবে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। −[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ لِأَنَّ قَتْلَ الْمَوْلٰى عَبْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ الخ : প্রথম মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মনিব কর্তৃক গোলামকে হত্যা করার সাথে জাগতিক কোনো হুকুম জড়িত নয়। অর্থাৎ মনিবের উপর কিসাস বা দিয়ত আবশ্যক হয় না। সুতরাং তা স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো। স্বাভাবিক মৃত্যুর সুরতে যেরূপ ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আলোচ্য সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ এ জন্য ফেরত নিতে পারে যে, মৃত্যুর মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানার সমাপ্তি ঘটে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। অতএব যেন ক্রেতার গোলামে মালিকানা বাকি আছে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করার কারণে গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হচ্ছে; তবে এ অসাধ্যতার জন্য ক্রেতার কর্ম দায়ী নয়। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার জন্য যদি ক্রেতার কর্ম দায়ী না হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে।

قَوْلُهُ وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوجَدُ إِلَّا مَضْمُونًا الخ : কিন্তু জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হলো, কোনো হত্যা দায়মুক্ত হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ دَمٌ مُفْرَجٌ "ইসলামে কোনো রক্ত বৃথা যায় না"। কিসাস কিংবা দিয়ত, দুটির যে কোনো একটি অবশ্যই অনিবার্য হবে। কিন্তু মনিব কর্তৃক গোলামকে হত্যা করার ক্ষেত্রে দায় (ضَمَانٌ) রহিত হচ্ছে মালিকানার দিক বিবেচনায়। যদি ক্রেতা অন্য কোনো ব্যক্তির গোলামকে হত্যা করত সেক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা (قَتْلُ عَمْدٍ) করলে তার উপর কিসাস, আর ভুলক্রমে হত্যা (قَتْلُ خَطَاءٍ) করলে তার উপর দিয়ত আবশ্যক হতো। কিন্তু মালিকানার কারণে তার উপর কিসাস বা দিয়ত আবশ্যক হচ্ছে না। অতএব যেন মালিকানার বিনিময় স্বরূপ কেসাস বা দিয়ত থেকে সে বেঁচে যাচ্ছে। সুতরাং হত্যা করাটা বিক্রি করার মতো হলো। বিক্রি করার সুরতে যেমন ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ، لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ الخ : কিন্তু গোলাম আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, তা কোনোভাবেই দায়বদ্ধতা (ضَمَانٌ)-কে আবশ্যক করে না। উদাহরণত একটি গোলামে দু-ব্যক্তির অংশীদারিত্ব আছে। তাদের একজন দরিদ্র। দরিদ্র ব্যক্তি তার অংশকে আজাদ করে দিল। এতে গোলামের অপর অংশও আজাদ হয়ে যায়। কিন্তু এজন্য আজাদকারীর উপর কোনো দায় (ضَمَانٌ) আরোপিত হয় না; বরং গোলাম শ্রম ও মেহনতের মাধ্যমে এ অর্ধেকের মূল্য মালিককে পরিশোধ করবে। অতএব হত্যা করার সুরতে মালিকানার বিনিময় স্বরূপ কেসাস বা দিয়ত থেকে যেরূপ ক্রেতা মুক্তি লাভ করে, আজাদ করার সুরতে মালিকানার পরিবর্তে ক্রেতা এ ধরনের কোনো বিনিময় লাভ করছে না। তাই হত্যা করাটা বিক্রি করার মতো হলেও আজাদ করাটা বিক্রি করার মতো নয়; বরং তা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার মতো। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার পর যদি ক্রেতা দোষ সম্পর্কে অবগত হয় সেক্ষেত্রে যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আজাদ করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলেও ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ حَتّٰى تَخَرَّقَ، لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِى الْمَبِيْعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيْهِ فَاَشْبَهَ الْاِعْتَاقَ، وَلَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِفِعْلٍ مَضْمُوْنٍ مِنْهُ فِى الْمَبِيْعِ، فَاَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتْلَ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكَوْنِهِ مَقْصُوْدًا، أَلَا تَرٰى أَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ، ثُمَّ هُوَ يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ، فَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ (رح)، لِأَنَّ الطَّعَامَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ، فَصَارَ كَبَيْعِ الْبَعْضِ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِى الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِىَ، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيْضُ ـ

অনুবাদ : একই মতপার্থক্য রয়েছে, যদি [বিক্রীত-পণ্য কাপড় হয় আর] ক্রেতা কাপড় পরিধান করে এবং তা ছিঁড়ে-ফেটে যায়। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যে উদ্দেশ্যে পণ্য ক্রয় করা হয়ে থাকে, ক্রেতা পণ্যে তাই করেছে। আর এ ধরনের আচরণ করার প্রচলনও আছে। সুতরাং তা আজাদ করার সদৃশ হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– বিক্রীত দ্রব্যটি ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়েছে বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে ক্রেতার দায়বদ্ধ কর্মের কারণে। সুতরাং তা বিক্রি করা ও হত্যা করার সদৃশ হলো। আর কৃতকর্মের [অর্থাৎ খাওয়া ও পরিধান করা] উদ্দেশ্যভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। তুমি কি দেখ না যে, কখনো কখনো বিক্রি করাও ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। যদি ক্রেতা [ক্রয়কৃত] খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ খায় তারপর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একই বিধান। কারণ, সম্পূর্ণ খাবারটি একটি বস্তুর মতো। সুতরাং এটা বিক্রীত-পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে দেওয়ার মতো হলো। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ খাবারটার দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। তাঁদের থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনা আছে যে, ক্রেতা অবশিষ্ট অংশটুকু বিক্রেতাকে ফেরত দেবে, আর ভক্ষিত অংশের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে। কেননা, খাদ্যদ্রব্য খণ্ডিতকরণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِى الْمَبِيْعِ مَا يُقْصَدُ بِشِرَائِهِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে– পণ্য যে উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়ে থাকে ক্রেতা পণ্যে অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যে এবং কাপড়ে তাই করেছে। আর মানুষের এ ধরনের কাজ অর্থাৎ খাবারের জিনিস খেয়ে ফেলা এবং কাপড় পরিধান করা একটি প্রচলিত বিষয়ও। খাদ্যদ্রব্যকে খেয়ে ফেলার দ্বারা এবং কাপড়কে পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলার দ্বারা ক্রেতার মালিকানার সমাপ্তি ঘটেছে। আর সমাপ্তির মাধ্যমে জিনিস পূর্ণতা লাভ করে। অতএব খাদ্যদ্রব্যকে খেয়ে ফেলা এবং কাপড়কে পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলা গোলামকে আজাদ করার মতো হলো। আর গোলাম আজাদ করার সুরতে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে, তেমনি আলোচ্য সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِفِعْلٍ مَضْمُوْنٍ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হিসেবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যখন ক্রেতা পণ্যকে খেয়ে ফেলল কিংবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলল, তখন পণ্যকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া ক্রেতার এমন কর্মের কারণে অসাধ্য হলো যার উপর দায় (ضَمَانٌ) আরোপিত হয়। যদি ক্রেতা অন্যের মালিকানাধীন জিনিস খেত কিংবা অন্যের মালিকানাধীন কাপড় পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলত, তাহলে তার উপর অবশ্যই দায় (ضَمَانٌ) আরোপিত হতো। কিন্তু ক্রেতা যেহেতু নিজেই মালিক, তাই দায় আরোপিত হয়নি। সুতরাং যেন ক্রেতা স্বীয় মালিকানা অর্থাৎ পণ্যের বিপরীতে বিনিময় স্বরূপ দায় থেকে মুক্তি লাভ করেছে। যখন ক্রেতা বিনিময় লাভকারী হলো, তখন এ সুরতও পণ্য বিক্রি করা এবং হত্যা করার মতো হলো। আর এ দু-সুরতে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি পণ্যকে খেয়ে ফেলার বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলার সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِكَوْنِهِ مَقْصُوْدًا الخ : গ্রন্থকার (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলেন, দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতা খাদ্যদ্রব্য বা কাপড় কি উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছে তা বিবেচ্য নয়। কারণ, অনেক সময় ব্যবসা হিসেবে বিক্রি করাও ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয়। আর পণ্য বিক্রি করার পর দোষ প্রকাশ পেলে ক্রেতা কিছুতেই ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ খাওয়ার পর ক্রেতা দোষ সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একই বিধান অর্থাৎ ক্রেতা দোষের কারণে অবশিষ্ট অংশ ফেরতও দিতে পারবে না আবার ভক্ষিত অংশ ও অবশিষ্ট অংশের ক্ষতিপূরণ ফেরতও নিতে পারবে না। কারণ, সম্পূর্ণ খাবার একটি দ্রব্যের মতো। আর দোষের কারণে একই দ্রব্যের কিছু অংশ ফেরত দেওয়া, আর কিছু অংশ রেখে দেওয়া জায়েজ নেই। আর সম্পূর্ণ পণ্যটি ফেরত দিতে না পারার জন্য ক্রেতার নিজস্ব কর্ম দায়ী। আর ক্রেতার নিজস্ব কর্মের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া অসাধ্য হলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না। তাই এ সুরতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

এটা পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হওয়ার মতো হলো। পণ্যের কিছু অংশ বিক্রি করার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হলে ক্রেতা যেরূপ ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে না, তেমনি আলোচ্য সুরতেও ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না।

সাহেবাইন (র.) থেকে এ মাসআলায় দুটি রেওয়ায়েত আছে। এক রেওয়ায়েত হলো, বিক্রেতা থেকে সম্পূর্ণ খাদ্যদ্রব্যের দোষের ক্ষতিপূরণ ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে। অর্থাৎ যেটুকু খেয়েছে তার ক্ষতিপূরণও ফেরত নিতে পারবে এবং যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুর ক্ষতিপূরণও ফেরত নিতে পারবে; কিন্তু অবশিষ্ট অংশটুকু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, সম্পূর্ণ খাবারটি একটি দ্রব্যের মতো। সুতরাং ভাগ করায় তাতে নতুন একটি দোষ সৃষ্টি হলো। আর ক্রেতার কব্জায় কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন অর্থাৎ বিক্রেতার কব্জায় থাকা দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না। তাই ক্রেতা অবশিষ্ট অংশ ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কারণ, সাহেবাইন (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ খাদ্যদ্রব্যটি খেয়ে ফেলার সুরতে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। সুতরাং কিছু খেয়ে ফেলার সুরতে আরো উত্তমভাবেই ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

অন্য রেওয়ায়েত হলো, যেটুকু খেয়ে ফেলেছে ক্রেতা সেটুকুর দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে আর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। কারণ, খাদ্যদ্রব্য ভাগ করা ক্ষতিকর নয়। যখন ভাগ করা ক্ষতিকর নয় তখন ক্রেতার কব্জায় পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলো না। আর ক্রেতার কব্জায় নতুন দোষ সৃষ্টি না হলে পুরাতন দোষের কারণে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারে। তাই ক্রেতা অবশিষ্ট খাবার ফেরত দিতে পারবে। আর ভক্ষিত অংশে দোষের কারণে ক্রেতার যেহেতু ক্ষতি হয়েছে, তাই ক্রেতা ভক্ষিত অংশের দোষের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى بَيْضًا اَوْ بِطِّيْخًا اَوْ قِثَّاءً اَوْ خِيَارًا اَوْ جَوْزًا فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُعْتَبَرُ فِى الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ عَلٰى مَا قِيْلَ، لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِاعْتِبَارِ اللُّبِّ، وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ، وَلٰكِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : يَرُدُّهُ، لِأَنَّ الْكَسْرَ بِتَسْلِيْطِهِ، قُلْنَا : اَلتَّسْلِيْطُ عَلَى الْكَسْرِ فِىْ مِلْكِ الْمُشْتَرِىْ لَا فِىْ مِلْكِهِ، فَصَارَ كَمَا اِذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضَ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيْلٌ جَازَ الْبَيْعُ اِسْتِحْسَانًا، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلٍ فَاسِدٍ، وَالْقَلِيْلُ مَا لَا يَخْلُوْ عَنْهُ الْجَوْزُ عَادَةً كَالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ فِى الْمِائَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيْرًا لَا يَجُوْزُ، وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ، لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ، فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِّ وَعَبْدِهِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি ডিম, খরবুজা, কাঁকড়ি, শসা বা আখরোট ক্রয় করার পর ভেঙ্গে দেখতে পায় যে, তা নষ্ট। এখন যদি তা উপকার লাভের যোগ্য না হয়, তাহলে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে। কারণ, তা মালই নয়। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এক মতানুসারে আখরোটের বেলায় তার খোসার উপযোগিতা বিবেচ্য হবে না। কারণ, তার মূল্যমান শাঁসের উপর নির্ভর করে। আর যদি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও উপকার লাভের যোগ্য হয়, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, ভেঙ্গে ফেলাটা একটি নতুন দোষ। তবে ক্রেতা দোষজনিত ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। যাতে যথাসম্ভব [উভয় পক্ষের] ক্ষতি রোধ করা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা তা ফেরত দেবে। কেননা, ভেঙ্গে ফেলাটা [যদিও একটি নতুন দোষ কিন্তু তা] বিক্রেতার প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হলো, ভাঙ্গার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ক্রেতার মালিকানায়, বিক্রেতার মালিকানায় নয়। সুতরাং এটা ঐ সুরতের মতো হলো যে, বিক্রীত, পণ্য ছিল কাপড়, আর ক্রেতা তা কেটে ফেলেছে, [এরপর দোষ প্রকাশ পেয়েছে]। যদি ক্রেতা কিছু [অংশ] নষ্ট পায় এবং তা সামান্য হয়, তাহলে ইসতিহসান হিসেবে বিক্রয় বৈধ হবে। কারণ, কোনো দ্রব্যই কিছু [অংশ] নষ্ট হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর আখরোট তো সাধারণত কিছু [অংশ] নষ্ট না হয়ে থাকে না। যেমন– শতের মধ্যে এক-দুটি। আর যদি নষ্টের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ নেই। ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে। কারণ, বিক্রেতা এখানে মাল এবং যা মাল নয় উভয়কে একত্র করেছে। সুতরাং এটা স্বাধীন মানুষ ও দাস একত্র করার মতো হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى بَيْضًا الخ : ডিম, খরবুজা, তরমুজ, কাঁকড়ি, শসা, আখরোট, বাদাম বা এ জাতীয় কোনো ফল ক্রয় করার পর ক্রেতা ভেঙ্গে দেখতে পেল যে, তা নষ্ট। এখন যদি এ পরিমাণ নষ্ট হয় যে, তা কোনোভাবেই উপকার লাভের যোগ্য নয়, মানুষের খাবারেরও উপযুক্ত নয় এবং পশুর খাবারেরও উপযুক্ত নয়, তাহলে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। কারণ, তা ভেঙ্গে ফেলার পর জানা গেছে যে, তা মাল নয়। কারণ, মাল এরূপ বস্তুকে বলা হয়, যা দ্বারা এখনি কিংবা একটু পর উপকার লাভ করা যায়। আর আলোচ্য সুরতে যেহেতু পণ্য কোনো অবস্থাতেই উপকার লাভের যোগ্য নয়, তাই তা মাল নয়। আর বিক্রীত-পণ্য মাল না হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং এ সুরতে যেন বিক্রয়ই হয়নি। যখন বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল্য বাবদ দেওয়া অর্থ বিক্রেতার কাছে আমানত হবে। আর ক্রেতা আমানত রাখা অর্থ বা দ্রব্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রাখে। অতএব আলোচ্য সুরতে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِى الْجَوْزِ صَلَاحَ قِشْرِهِ عَلَى الخ : গ্রন্থকার (র.) এ ইবারতের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আখরোটের শাঁস খারাপ হওয়ায় যদিও তা মাল নয়, কিন্তু অনেক সময় কোনো কোনো স্থানে এর খোসা মূল্যসম্পন্ন হয়। কারণ, তা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উপকার লাভের যোগ্য হওয়ায় তা মাল। তাই শাঁসে বিক্রয় বাতিল হলেও খোসায় তদানুপাত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হওয়া উচিত। তাই ক্রেতা খোসার বিনিময়মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নেবে। কোনো কোনো মাশায়েখ এ ধরনের মতও ব্যক্ত করেছেন। -[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০]

গ্রন্থকার (র.) এর উত্তরে বলেন, আখরোটের মাঝে খোসা ভালো হওয়া বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ, ভাঙ্গার আগে আখরোটের মূল্যমান শাঁসের হিসাবে; খোসার হিসাবে নয়। শাঁস খারাপ হওয়ায় তা মাল বলে গণ্য হবে না। আর মাল না হওয়ায় বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেন কোনো বিক্রয়চুক্তিই হয়নি। ফলে নষ্ট আখরোটগুলো ক্রেতার কাছে আমানত হবে। ক্রেতা আমানতের মাল হিসাবে বিক্রেতাকে তা ফেরত দেবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ الخ : আর যদি নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো উপকার লাভের যোগ্য হয়, তাহলে ক্রেতা সেগুলো বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে না। কারণ, ভেঙ্গে ফেলাটা একটি নতুন দোষ। আর নিয়ম হলো, ক্রেতার কব্জায় সৃষ্ট নতুন দোষের উপস্থিতিতে বিক্রেতার কাছে থাকা পুরাতন দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না। কারণ, এতে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই আলোচ্য সুরতে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। তবে তার ক্ষতি রোধকল্পে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) يَرُدُّهُ لِاَنَّ الْكَسْرَ بِتَسْلِيْطِهِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা এ সুরতেও পণ্য ফেরত দিতে পারবে। তাঁর দলিল হলো, ভাঙ্গা যদিও একটি নতুন দোষ বটে, কিন্তু বিক্রেতাই তো ক্রেতাকে ভাঙ্গার ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং যেন বিক্রেতাই ভেঙ্গেছে এবং এর প্রতি সে সম্মত আছে। অতএব ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হয়নি। আর নিয়ম হলো, ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি না হলে ক্রেতা পুরাতন দোষের কারণে বিক্রেতাকে পণ্য ফেরত দিতে পারে। তাই আলোচ্য সুরতে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য ফেরত দিয়ে দেবে এবং পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে।

قَوْلُهُ قُلْنَا : اَلتَّسْلِيْطُ عَلَى الْكَسْرِ فِى مِلْكِ الْمُشْتَرِىْ الخ : আমাদের পক্ষ হতে জবাব হলো, ক্রেতা ফলগুলো ভাঙ্গার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বিক্রেতার পক্ষ থেকে পেয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা তাকে তার মালিকানায় ভাঙ্গার ক্ষমতা দিয়েছে;

নিজের মালিকানায় নয়। কারণ, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কারণে ফলগুলোর মালিক ক্রেতা হয়ে গেছে। আর মালিক তার মালিকানাধীন জিনিস ভাঙ্গলে এর জন্য তার কর্মই দায়ী হয়। অতএব আলোচ্য সুরতে ফলগুলো ভাঙ্গার দ্বারা পণ্যে ক্রেতার পক্ষ থেকেই নতুন দোষ সৃষ্টি হয়েছে। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন দোষ সৃষ্টি হলে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া যায় না। অতএব ক্রেতা ফলগুলো ফেরত দিতে পারবে না।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা ক্রয়কৃত কাপড় কাটার পর দোষ সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এ সুরতে পণ্যটি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার মাধ্যমে কাটার ক্ষমতা বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদান করা সত্ত্বেও যেহেতু তা ক্রেতার মালিকানায় হয়েছে তাই ক্রেতা দোষের কারণে কাপড়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে না। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতেও ফলগুলো ক্রেতা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيْلٌ الخ : আর যদি আখরোট বা এ জাতীয় পণ্য কিছু অংশ নষ্ট বের হয়, তাহলে এর দু সুরত–

১. নষ্টের পরিমাণ কম, তাহলে ইসতিহসান হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে। কারণ, অনেকগুলো আখরোটের মাঝে সামান্য কিছু নষ্ট হয়েই থাকে। সুতরাং তা গমের সাথে লেগে থাকা মাটির মতো। গম থেকে মাটি পরিষ্কার করে বিক্রি করা যেরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তেমনি নষ্টমুক্ত আখরোট বেছে বেছে বিক্রি করাও কষ্টসাধ্য। তাছাড়া গুটিকতেক নষ্টের কারণে যদি অবশিষ্ট সবগুলোতেই বিক্রয় ফাসিদ হয়, তাহলে স্বাভাবিক বেচাকেনার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে।

তবে কি পরিমাণকে অল্প বলা হবে তা নির্ধারণে গ্রন্থকার (র.) বলেন, শতের মাঝে এক–দুটোকে অল্প বলা হবে। ফকীহ আবুল লাইস (র.) জামে সগীরের ব্যাখ্যায় শতের মাঝে পাঁচ/ছয়টিকে কম বলে নির্ধারণ করেছেন। যখীরা গ্রন্থে আছে যে, কেউ যদি একশ' ডিম ক্রয় করে এবং তন্মধ্যে একটি বা দুটি কিংবা তিনটি পচা পায়, তাহলে ক্রেতা কোনো ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। সুতরাং যখীরা গ্রন্থকার শতের মাঝে তিনটিকে কম বলে নির্ধারণ করেছেন।

২. নষ্টের পরিমাণ বেশি, তাহলে সবগুলোই বিক্রয় নাজায়েজ। ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে ধরা হবে যে, বিক্রেতা মাল ও যা মাল নয় উভয়টাকে এক চুক্তিতে একত্র করেছে। আর মাল ও যা মাল নয় উভয়টাকে এক চুক্তিতে একত্র করা হলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। যেমন– কেউ গোলাম ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একই চুক্তিতে একত্র করল। গোলাম হলো মাল, আর স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয়। দুটোকে এক চুক্তিতে একত্র করায় উভয়টিতেই বিক্রয় ফাসিদ।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ، فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِى بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ، لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ، لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنَ الْأَصْلِ، فَجُعِلَ الْبَيْعُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ، لٰكِنَّهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ، فَأُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ، وَهٰذَا بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِالْبَيِّنَةِ، حَيْثُ يَكُوْنُ رَدًّا عَلَى الْمُوَكِّلِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ، وَالْمَوْجُوْدُ هٰهُنَا بَيْعَانِ، فَبِفَسْخِ الثَّانِى لَا يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তা আবার বিক্রি করে, এরপর ক্রেতার কাছে [গোলামটি] দোষজনিত কারণে ফেরত আসে এখন যদি ক্রেতা স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ বা কসমে অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বিচারকের রায়ক্রমে [গোলামটি] গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে গোলামটি তার বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা, এটা হলো মূল বিক্রয়চুক্তি রহিতকরণ। অতএব ধরে নেওয়া হবে যেন দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি অস্তিত্বই লাভ করেনি। [তাই বিক্রেতাকে ক্রেতা গোলামটি ফেরত দিতে পারবে।] [অস্বীকৃতির ভিত্তিতে বিচারকের রায়ের সুরতে] সর্বোচ্চ এটা বলা যেতে পারে যে প্রথম ক্রেতা দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল, কিন্তু বিচারকের রায়ের মাধ্যমে শরিয়ত কর্তৃক সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায়ের অর্থ এই যে, দ্বিতীয় বিক্রেতা [পূর্বের] স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর তা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। বিক্রয়ের উকিলের চেয়ে আলোচ্য মাসআলাটি ভিন্ন। বিক্রয়ের উকিলের কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষজনিত কারণে যদি বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে তা মুআক্কিলের কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য হয়। কেননা, সেক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি একটিই, আর আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি দুটি। সুতরাং দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হওয়ায় প্রথমটি বিলুপ্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا الخ : এক ব্যক্তি একটি গোলাম বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা আবার তা বিক্রি করল, এরপর দ্বিতীয় ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রথম ক্রেতার কাছে গোলামটি দোষজনিত কারণে ফেরত আসল, প্রথম ক্রেতা গোলামটিকে ফেরত গ্রহণ করল বিচারকের ফয়সালাক্রমে অথবা বিচারকের ফয়সালা ছাড়া। বিচারকের ফয়সালার তিনটি ভিত্তি হতে পারে–

১. প্রথম ক্রেতার স্বীকারোক্তি (إِقْرَارٌ)। গ্রন্থকার (র.) বলেন, وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ الخ অর্থাৎ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালার অর্থ হলো, প্রথম ক্রেতা বিচারকের অনুপস্থিতিতে এ কথা স্বীকার করে যে, দ্বিতীয় ক্রেতা পণ্যে যে দোষের দাবি করেছে তা পণ্যটি তার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু বিচারকের সম্মুখে এ স্বীকারোক্তিকে সে অস্বীকার করে। এরপর দ্বিতীয় ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার স্বীকারোক্তিকে সাব্যস্ত করে।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হিদায়া গ্রন্থকার (র.) মতনের "স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালা" বক্তব্যের উক্ত ব্যাখ্যা এজন্য দিয়েছেন যে, প্রথমবার দোষের কথা স্বীকার করার পর যদি প্রথম ক্রেতা তা পুনরায় অস্বীকার না করে, তাহলে পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয় না; বরং স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতেই তা ফেরত দেওয়া যায়।

২. দ্বিতীয় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ। দ্বিতীয় ক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে পণ্যে যে দোষের দাবি করেছে তা পণ্যটি প্রথম ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল।

৩. প্রথম ক্রেতার কসমে অস্বীকৃতি। অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রেতা তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়ে প্রথম ক্রেতার কাছে এ মর্মে কসম দাবি করল যে, সে যে দোষের দাবি করছে তা পণ্যটি তার [অর্থাৎ প্রথম ক্রেতার] কাছে থাকা অবস্থায় ছিল না। কিন্তু প্রথম ক্রেতা কসম করতে অস্বীকৃতি জানাল।

এ তিনটির কোনো একটির ভিত্তিতে বিচারকের ফয়সালাক্রমে যদি প্রথম ক্রেতা পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে তার এ অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে ঐ পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে; যদি দোষটি তার নিজের কব্জায় থাকা অবস্থায় সৃষ্টি না হয়ে থাকে। কারণ, বিচারকের ফয়সালাক্রমে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করায় দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি মূল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেন দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি কখনো অস্তিত্বই লাভ করেনি। অতএব ধরে নেওয়া হবে যে, ক্রয়ের পর পণ্যে প্রথম ক্রেতা এমন কোনো হস্তক্ষেপ করেনি, যার ফলে পণ্যটি দোষজনিত কারণে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়। তাই ক্রেতা ইচ্ছা করলে পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে।

قَوْلُهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যের মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি মূলত ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিচারকের ফয়সালার ভিত্তিতে প্রথম ক্রেতা কর্তৃক বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অর্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে সে তার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যে দোষ থাকার কথা অস্বীকার করেছে, যার কারণে বিচারকের ফয়সালার প্রয়োজন হয়েছে। যখন সে পণ্যে দোষ থাকার কথা অস্বীকারই করল তখন কোন ভিত্তিতে সে প্রথম বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে?

এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, প্রথম ক্রেতা দোষ থাকার কথা অস্বীকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে সে শরিয়ত কর্তৃক মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যটিতে উক্ত দোষ ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে এবং তার দোষ না থাকার উক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং যেন সে দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেনি। তাই বিক্রেতার কাছে দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত দেওয়ায় কোনো বাধা নেই।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالْبَيْعِ إِذَا الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যের মাধ্যমে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, বিক্রয়ের উকিলের কাছে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দোষজনিত কারণে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্য ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে তা মুআক্কিলের কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য হয়। আলাদাভাবে উকিলের মুআক্কিলের কাছে ফেরত দিতে হয় না। তাহলে আলোচ্য মাসআলায় বিচারকের ফয়সালাক্রমে প্রথম ক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত প্রদানকে কেন বিক্রেতার কাছে ফেরত প্রদান বলে গণ্য করা হবে না?

এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, ওকালতির সুরতে বিক্রয়চুক্তি একটি। উকিল ও মুআক্কিলের মাঝে কোনো বিক্রয়চুক্তি হয়নি। বরং উকিলের বিক্রয় করা আর মুআক্কিলের বিক্রয় করা এক কথা। উকিলের কাছে ফেরত আসা মানে মুআক্কিলের কাছে ফেরত আসা। আর আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি দুটি। প্রথমটি হলো, বিক্রেতা ও প্রথম ক্রেতার মাঝে। আর দ্বিতীয়টি হলো, প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতার মাঝে। যেহেতু উভয় চুক্তিই স্বতন্ত্র চুক্তি, তাই দ্বিতীয়টি বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারা প্রথমটি বিলুপ্ত হবে না। এ কারণেই প্রথমটি বিলুপ্ত করার জন্য প্রথম ক্রেতাকে বিক্রেতার কাছে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে হবে।

وَإِنْ قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِيْ حَقِّ ثَالِثٍ، وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فِيْ حَقِّهِمَا وَالْأَوَّلُ ثَالِثُهُمَا، وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ : وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الَّذِيْ بَاعَهُ، وَبِهٰذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجَوَابَ فِيْمَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَفِيْمَا لَا يَحْدُثُ سَوَاءٌ، وَفِيْ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُيُوْعِ : أَنَّ فِيْمَا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ .

অনুবাদ : আর যদি বিচারকের রায় ব্যতীত [তথা দ্বিতীয় বিক্রেতা] ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে সে তা [প্রথম বিক্রেতাকে] ফেরত দিতে পারবে না। কারণ, যদিও তাদের দু জনের [প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রেতার] ক্ষেত্রে এ ফেরত গ্রহণ [দ্বিতীয়] বিক্রয়চুক্তির বিলোপ বলে বিবেচিত, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর [আলোচ্য মাসআলায়] তাদের দু জনের জন্য প্রথম বিক্রেতাই তৃতীয়জন। জামে সগীরে আছে, যদি প্রথম ক্রেতার কাছে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের রায় ছাড়াই এমন দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত প্রদান করা হয় যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, তাহলে তার কাছে যে বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধে সে দাবি উত্থাপন করতে পারবে না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে, আর যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না উভয় ক্ষেত্রেই হুকুম এক ও অভিন্ন। [মাবসূত কিতাবের] ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না সেক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা [প্রথম বিক্রেতা থেকে] ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। কারণ, এটা নিশ্চিত যে, প্রথম বিক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় পণ্যে এ দোষটি ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ قَبِلَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ الخ : আর যদি বিচারকের ফয়সালা ছাড়া প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পণ্যটি ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্য হলো, প্রথম ক্রেতার এ অধিকার থাকবে না যে, সে ইচ্ছা করলে ঐ পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারে।

দোষ দু ধরনের–

১. যে দোষ প্রথম ক্রেতার কাছে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। যেমন– বালেগ গোলাম পলায়ন বা চুরি করেছে।

২. যে দোষ প্রথম ক্রেতার কাছে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়; বরং পূর্ব থেকেই ছিল। যেমন– গোলামের হাতের আঙ্গুল ছয়টি কিংবা একটি চোখ টেরা। এ দু ধরনের দোষের হুকুম কি এক, না ভিন্ন ভিন্ন, তা ইমাম কুদূরী (র.)-এর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি।

জামে সগীরে আছে, যদি প্রথম ক্রেতার কাছে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের রায় ছাড়াই এমন দোষজনিত কারণে পণ্যটি ফেরত প্রদান করা হয়, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না, তাহলে তার কাছে যে ব্যক্তি বিক্রি করেছে তার বিরুদ্ধে সে দাবি উত্থাপন করতে পারবে না।

গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামে সগীরের এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারা আর নতুনভাবে সৃষ্টি হতে না পারা উভয় প্রকার দোষের ক্ষেত্রেই হুকুম এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যটি ফেরতও দিতে পারবে না এবং দোষের ক্ষতিপূরণও ফেরত পাবে না।

কিন্তু মাবসূত কিতাবের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যে দোষ নতুনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না সেক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে, তবে পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। এ বর্ণনায় দু ধরনের দোষের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে।

মাবসূত কিতাবের বর্ণনার দলিল হলো, যে দোষ নতুন করে সৃষ্টি হতে পারে না তা যে পণ্য প্রথম বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই তাতে ছিল এ বিষয়টি নিশ্চিত। কিন্তু বিচারকের ফয়সালা ছাড়া ফেরত নেওয়ায় পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হচ্ছে, তাই প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

জামে সগীর ও কুদূরীর বক্তব্যের দলিল হলো, বিচারকের ফয়সালা ছাড়া স্বীয় সম্মতিক্রমে গোলাম ফেরত গ্রহণ করাটা যদিও তাদের দুজনের [প্রথম ক্রেতা ও দ্বিতীয় ক্রেতার] ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তির বিলুপ্তি সাধন বলে বিবেচিত, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর বিক্রেতা এ ক্ষেত্রে তাদের দুজনের জন্য তৃতীয়জন। সুতরাং বিক্রেতার হিসাবে যেন প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে গোলামটি নতুন করে ক্রয় করল। আর নতুন করে ক্রয় করার সুরতে যেহেতু দোষের প্রতি সম্মতি বুঝায়, তাই বিক্রেতার বিরুদ্ধে প্রথম ক্রেতা দাবি উত্থাপনেরও অধিকার পাবে না এবং বিক্রেতা থেকে দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়ারও অধিকার পাবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَقَبَضَهُ فَادَّعٰى عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلٰى دَفْعِ الثَّمَنِ حَتّٰى يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يُقِيْمَ الْمُشْتَرِى الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوْبَ دَفْعِ الثَّمَنِ حَيْثُ أَنْكَرَ تَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعْوَى الْعَيْبِ، وَ دَفْعُ الثَّمَنِ أَوَّلاً لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ بِإِزَاءِ تَعَيُّنِ الْمَبِيْعِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَضٰى بِالدَّفْعِ فَلَعَلَّهُ يَظْهَرُ الْعَيْبُ فَيَنْتَقِضُ الْقَضَاءُ فَلَا يَقْضِىْ بِهِ صَوْنًا لِقَضَائِهِ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِى : شُهُوْدِىْ بِالشَّامِ اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَ دُفِعَ الثَّمَنُ، يَعْنِىْ إِذَا حَلَفَ وَلَا يَنْتَظِرُ حُضُوْرَ الشُّهُوْدِ، لِأَنَّ فِى الْاِنْتِظَارِ ضَرَرًا بِالْبَائِعِ، وَلَيْسَ فِى الدَّفْعِ كَثِيْرُ ضَرَرٍ بِهِ، لِأَنَّهُ عَلٰى حُجَّتِهِ، أَمَّا إِذَا نَكَلَ أُلْزِمَ الْعَيْبُ، لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তা কব্জা করে, এরপর কোনো দোষের দাবি করে, তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না; যতক্ষণ না বিক্রেতা [দোষ নেই মর্মে] কসম করবে কিংবা ক্রেতা [দোষের প্রমাণে] সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। কেননা, দোষ দাবি করার মাধ্যমে ক্রেতা যেহেতু তার অধিকার নির্দিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করেছে সেহেতু সে [নিজের উপর] মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করেছে। আর প্রথমে মূল্য পরিশোধ করা [-এর আবশ্যকতা] এজন্য যে, যাতে বিক্রীত-পণ্য নির্দিষ্ট হওয়ার বিপরীতে [বিক্রয়মূল্যে] বিক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়। [অথচ আলোচ্য সুরতে বিক্রীত-পণ্যই নির্দিষ্ট হয়নি।] তাছাড়া বিচারক যদি [মূল্য] পরিশোধের ফয়সালা দেন, তাহলে হতে পারে যে, পরে দোষ প্রকাশিত হবে, ফলে উক্ত ফয়সালা বাতিল হয়ে যাবে। তাই বিচারক তার ফয়সালার সুরক্ষার্থে মূল্য পরিশোধের ফয়সালা দেবেন না। যদি ক্রেতা বলে যে, আমার সাক্ষীরা শাম দেশে রয়েছে, তাহলে বিক্রেতা থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি কসম করে, তাহলে মূল্য প্রদান করা হবে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতির অপেক্ষা করা হবে না। কারণ, অপেক্ষা করার মাঝে বিক্রেতার ক্ষতি আছে; কিন্তু মূল্য পরিশোধে ক্রেতার খুব বেশি ক্ষতি নেই। কেননা, সে তো তার প্রমাণে অবশিষ্ট আছে। আর যদি বিক্রেতা কসমে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে দোষ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, দোষ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কসমের অস্বীকৃতি একটি দলিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَقَبَضَهُ الخ : **মাসআলাটির বিবরণ :** জামে সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি গোলাম ক্রয় করল এবং তাকে কব্জা করল। এরপর বিক্রেতা আদালতে তার বিরুদ্ধে মূল্য পরিশোধের দাবি জানাল। ক্রেতা বলল, গোলামে এই এই দোষ আছে, তুমি আমার কাছে তা গোপন করেছ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ সুরতে বিচারক মূল্য

পরিশোধে ক্রেতাকে বাধ্য করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতা পণ্য বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই দোষটি ছিল মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে কিংবা সাক্ষীদের অনুপস্থিতে বিক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থাতেই দোষটি ছিল না মর্মে কসম করে। যদি ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ক্রেতার পণ্য ফেরত প্রদানের এখতিয়ার থাকবে। আর যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তাহলে বিক্রেতা থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি বিক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ ছিল না মর্মে কসম করে, তাহলে এ সুরতে ক্রেতাকে বিচারক মূল্য পরিশোধের জন্য বাধ্য করবে।

মাসআলাটির প্রকৃত বিবরণ এটাই। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) জামে সগীরের যে মতন (مَتَنْ) উল্লেখ করেছেন তাতে কিছু জটিলতা আছে। কারণ, মতন থেকে বাহ্যিকভাবে বিবরণটি এ রকম মনে হয় যে, যদি ক্রেতা গোলাম কব্জা করার পর তার মাঝে দোষের দাবি করে, তাহলে বিচারক তাকে মূল্য পরিশোধের উপর বাধ্য করবে; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিক্রেতা কসম করে কিংবা ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করে। তাহলে অর্থ দাঁড়াল যে, বিক্রেতা দোষ না থাকার উপর কসম করুক কিংবা ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করুক উভয় সুরতে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কারণ, ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সুরতে তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হয় না; বরং গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার সে এখতিয়ার পায়। তাই জামে সগীরের ইবারতের সমাধানে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা করা হয়–

১. ইবারতের لَمْ يُجْبَرْ [বাধ্য করা হবে না] শব্দের উদ্দেশ্য হবে يَنْتَظِرُ [অপেক্ষা করবে।] لَمْ يُجْبَرْ শব্দটি لَازِمْ আর يَنْتَظِرُ তার مَلْزُوْمٌ। বিচারক মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না– এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো, বিচারক অপেক্ষা করবেন। ইবারতে لَازِمْ বলে মূলত مَلْزُوْمٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। সুতরাং পুরা ইবারতের অর্থ দাঁড়ায়, যদি ক্রেতা গোলামে দোষের দাবি করে তাহলে বিচারক অপেক্ষা করবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিক্রেতা দোষ না থাকার উপর কসম করে কিংবা ক্রেতা দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে মূল্য পরিশোধে ক্রেতাকে বাধ্য করা হবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে বিক্রেতার নিকট গোলাম ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার দেবেন।

২. ইবারতে একটি বাক্যকে উহ্য ধরা হবে। মূল ইবারতটি এভাবে ছিল যে, لَمْ يُجْبَرْ عَلَىٰ دَفْعِ الثَّمَنِ وَلَا يَكُوْنُ لِلْمُشْتَرِىْ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ حَتّٰى يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَوْ يُقِيْمَ الْمُشْتَرِىْ الْبَيِّنَةَ তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, যদি কব্জা করার পর ক্রেতা গোলামে দোষের দাবি করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না এবং ক্রেতাও বিক্রেতাকে গোলাম ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না, যতক্ষণ না বিক্রেতা কসম করবে। আর যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে, তাহলে বিক্রেতাকে গোলাম ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে।

৩. أَوْ يُقِيْمَ الْمُشْتَرِىْ الْبَيِّنَةَ এ বাক্যের أَوْ অব্যয়টি إِلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরতে حَتّٰى يَحْلِفَ الْبَائِعُ হবে لَمْ يُجْبَرْ-এর শেষ সীমা (غَايَةٌ) আর يُقِيْمُ الْمُشْتَرِىْ الْبَيِّنَةَ হবে حَتّٰى يَحْلِفَ-এর শেষ সীমা (غَايَةٌ)। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে, যদি ক্রেতা কব্জা করা গোলামের মাঝে দোষের দাবি করে, তাহলে ক্রেতাকে বিচারক মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না, যতক্ষণ না বিক্রেতা পণ্যটি তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ না থাকার ব্যাপারে কসম করে। কসম করলে তবেই ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন। কিন্তু ক্রেতা যদি দোষ থাকার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে দেয়, তাহলেও তাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না; বরং সেক্ষেত্রে ক্রেতা গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।

এখন কথা হলো, ক্রেতা যদি কব্জাকৃত গোলামের মাঝে দোষের দাবি করে তাহলে তাকে মূল্য পরিশোধে কেন বাধ্য করা হবে না? এর দলিল হিসেবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যখন ক্রেতা পণ্যে দোষের দাবি করে, তার অধিকার নির্দিষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করল, এর দ্বারা সে মূলত তার উপর মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হওয়াকে অস্বীকার করল। কারণ, যখন পণ্যে দোষ

আছে তখন এ পণ্য ফেরত দেওয়ার উপযুক্ত। যেহেতু পণ্য ফেরত দেওয়ার উপযুক্ত, তাই তাতে ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি। যখন ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি, তখন তার উপর মূল্য পরিশোধও আবশ্যক হয়নি। কেননা, ক্রেতার প্রতি প্রথমে মূল্য পরিশোধ আবশ্যক তখনি হয়, যখন বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতার অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। দোষের দাবি করার কারণে যেহেতু পণ্যে তার অধিকার নির্দিষ্ট হয়নি তাই তার উপর মূল্য পরিশোধও আবশ্যক হবে না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন, আর পরে দোষ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারকের নির্দেশটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। তাই বিচারক তাঁর ফয়সালার মর্যাদা রক্ষার্থে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেবেন না।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِى شُهُوْدِىْ بِالشَّامِ الخ : যখন ক্রেতা গোলাম কব্জা করার পর দোষের দাবি করল আর বিক্রেতা তার কাছে সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করল, তখন ক্রেতা যদি বলে যে, আমার সাক্ষীগণ শাম দেশে আছে অর্থাৎ সফরের দূরত্বে [৪৮ মাইল] আছে, তাই আমাকে কয়েকদিনের সুযোগ দেওয়া হোক, যাতে আমি এ ক'দিনে সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করতে পারি কিংবা এ সুযোগ দেওয়া হোক যে, সাক্ষীগণ যে শহরে আছে সেখানকার বিচারকের সম্মুখে তারা সাক্ষী দেবে আর সেই বিচারক লিখিতভাবে তা মামলা যে বিচারকের বিচারাধীনে আছে তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে ক্রেতার এ ওজর ও আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং বিচারক বিক্রেতার কাছে গোলামটি থাকা অবস্থায় দাবিকৃত দোষটি ছিল না মর্মে বিক্রেতা থেকে কসম নেবেন। যদি বিক্রেতা এই মর্মে কসম করে যে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার কাছে বিক্রয়চুক্তির বিধানানুসারে এ গোলামটি অর্পণ করেছি, আর তখন এ দোষটি ছিল না, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন এবং সাক্ষীগণের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করবেন না। কেননা, সাক্ষীগণের উপস্থিতি পর্যন্ত অপেক্ষা করা বিক্রেতার জন্য বড় ধরনের ক্ষতি। কারণ, অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত নেই তাই তা দীর্ঘ হতে পারে। আর বিনিময়মূল্য ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে পণ্য অন্যের দখলে থাকা একটি ক্ষতি। পক্ষান্তরে মূল্য পরিশোধের মাঝে ক্রেতার তেমন কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, মূল্য পরিশোধের পরেও তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার সুযোগ থাকছে। যখন তার সাক্ষীগণ ফিরে আসবে তখন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিলে প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিতে পারবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, বিক্রেতার কসমের প্রেক্ষিতে যদি বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন, তাহলে এ সুরতেও তো বিচারকের নির্দেশ বাতিল হলো। কারণ, ক্রেতার সাক্ষীগণের উপস্থিতির পর বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ ছিল মর্মে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয়, তাহলে মূল্য পরিশোধের নির্দেশটি বাতিল হয়ে যাবে; বরং ক্রেতা পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।

আল্লামা আইনী (র.) এর উত্তরে বলেন, বিক্রেতার কসমের প্রেক্ষিতে বিচারকের মূল্য পরিশোধের নির্দেশটি মূলত ক্রেতার সাক্ষ্য পেশ করার পূর্ব পর্যন্তই। তাই সাক্ষ্য পেশ করা এবং ক্রেতা কর্তৃক মূল্য ফেরত নেওয়ায় বিচারকের নির্দেশ বাতিল হয় না; বরং নির্দেশের উপরই আমল করা হয়। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭]

قَوْلُهُ أَمَّا إِذَا نَكَلَ أَلْزِمَ الْعَيْبَ، لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيْهِ : হ্যাঁ, বিক্রেতা যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে দোষ সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং বিচারক ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করবেন না; বরং বিক্রীত গোলামটি ক্রেতা তাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে। কেননা, কসম থেকে অস্বীকৃতি মূলত এ স্বীকারোক্তি যে, পণ্যে দোষ আছে। আর বিক্রেতার স্বীকারোক্তি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে দলিল। তাই বিক্রেতার কসম খেতে অস্বীকৃতি জানানোর সুরতে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে না; বরং সে পণ্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার লাভ করবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَادَّعٰى إِبَاقًا لَمْ يُحَلَّفِ الْبَائِعُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْمُشْتَرِى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ، وَالْمُرَادُ التَّحْلِيْفُ عَلٰى أَنَّهُ لَمْ يَأْبِقْ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلَهُ وَلٰكِنْ إِنْكَارُهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ بِهِ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ، وَمَعْرِفَتُهُ بِالْحُجَّةِ، فَإِذَا أَقَامَهَا حُلِّفَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَمَا أَبَقَ عِنْدَهُ قَطُّ، كَذَا قَالَ فِى الْكِتَابِ، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللّٰهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِىْ يَدَّعِىْ أَوْ بِاللّٰهِ مَا أَبَقَ عِنْدَكَ قَطُّ، أَمَّا لَا يُحَلِّفُهُ بِاللّٰهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هٰذَا الْعَيْبُ وَلَا بِاللّٰهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ هٰذَا الْعَيْبُ، لِأَنَّ فِيْهِ تَرْكَ النَّظَرِ لِلْمُشْتَرِىْ، لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَحْدُثُ بَعْدَ الْبَيْعِ، قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، وَهُوَ مُوْجِبٌ لِلرَّدِّ، وَالْأَوَّلُ ذُهُوْلٌ عَنْهُ، وَالثَّانِىْ يُوْهِمُ تَعَلُّقَهُ بِالشَّرْطَيْنِ فَيَتَأَوَّلُهُ فِى الْيَمِيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقْتَ التَّسْلِيْمِ دُوْنَ الْبَيْعِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে তারপর [গোলামের মধ্যে] পলায়নের দোষ আছে বলে দাবি করে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করবে যে, গোলামটি তার নিকট থেকে পলায়ন করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতাকে কসম করানো হবে না। [বিক্রেতাকে] কসম করানোর উদ্দেশ্য হলো, এ মর্মে কসম করানো যে, গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় পলায়ন করেনি। কেননা, যদিও তার [বিক্রেতার] কথা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তার অস্বীকারটা ক্রেতার কজায় গোলামের মাঝে দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরই বিবেচ্য হবে। আর দোষ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি জানা যাবে সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা। যখন ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে তখন বিক্রেতাকে আল্লাহর নামে কসম করানো হবে যে, গোলামটি সে বিক্রি করেছে এবং তাকে অর্পণ করেছে, আর গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় কখনও পলায়ন করেনি। কিতাব [জামে সগীর/মাবসূত]-এ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এরূপই বলেছেন। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] যদি বিচারক চান তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে আল্লাহর কসম করাবেন যে, যে সূত্রে ক্রেতা দাবি করে সে সূত্রে তোমার কাছে ফেরত দেওয়ার অধিকার তার নেই। কিংবা এ মর্মে আল্লাহর নামে শপথ করাবেন যে, তোমার কাছে সে কখনও পলায়ন করেনি। তবে বিচারক এ মর্মে কসম করাবেন না যে, আল্লাহর কসম! গোলামটি বিক্রি করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না এবং এ মর্মেও কসম করাবেন না যে, আল্লাহর কসম! সে গোলামটি বিক্রি করার সময় এবং অর্পণ করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না। কেননা, এ ধরনের কসমের বাক্যে ক্রেতার কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। কারণ, কখনও বিক্রি করার পর অর্পণের আগে দোষ সৃষ্টি হয়। আর তা ফেরত প্রদানকে আবশ্যক করে। অথচ প্রথম বাক্যে এটা উপেক্ষিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্য এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, দোষ না থাকার বিষয়টি [যুগপৎ] উভয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে বিক্রেতা কসমে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারে যে, দোষ পণ্য অর্পণের সময় ছিল, কিন্তু বিক্রি করার সময় ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পলায়ন করা হলো গোলামের ক্ষেত্রে একটি দোষ। কিন্তু পলায়নের কারণে ক্রেতা ক্রয়কৃত গোলাম বিক্রেতাকে তখনি ফেরত দিতে পারবে, যখন ক্রেতার নিকট থেকে যে অবস্থায় গোলামটি পলায়ন করেছে ঠিক ঐ একই অবস্থায় যদি বিক্রেতার নিকট থেকে পলায়ন করে থাকে। অর্থাৎ বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছেও যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে কিংবা বিক্রেতার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছেও যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত প্রদান করতে পারে এবং দেয়-মূল্য ফেরত নিতে পারে। কিন্তু বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করার পর ক্রেতার কাছে যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে কিংবা শুধু বিক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে– প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হোক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় হোক, কিন্তু ক্রেতার কাছে পলায়ন করেনি তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে না এবং গোলামটিকে বিক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারবে না।

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَادَّعٰى إِبَاقًا الخ : জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ গোলাম ক্রয় করে কব্জা করার পর গোলামটিতে পলায়নের দোষ থাকার দাবি করে, আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক ক্রেতাকে নির্দেশ দেবেন যে, তুমি আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে গোলামটি যে তোমার কাছ থেকে পলায়ন করেছে তা প্রথমে প্রমাণ কর। ক্রেতা তার কাছ থেকে পলায়ন করার বিষয়টি প্রমাণ করার পূর্বে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন না। কারণ, কসম হয় বাদীর দাবি অস্বীকারের প্রেক্ষিতে। আর অস্বীকারটা তখনই বিবেচ্য হবে, যখন ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করার বিষয়টি প্রমাণিত হবে এবং ক্রেতা একই অবস্থায় বিক্রেতার কাছেও দোষ ছিল বলে দাবি করবে। সুতরাং ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি পলায়ন করেছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পূর্বে বিক্রেতাকে বিচারক কসম করাবেন না।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ التَّحْلِيْفُ عَلٰى أَنَّهُ لَمْ يَأْبِقْ عِنْدَهُ الخ : বিক্রেতাকে কসম করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ মর্মে কসম করানো যে, বিক্রেতার কাছে থাকাকালে গোলামটি পলায়ন করেনি কিংবা পলায়ন করেছে, কিন্তু ক্রেতার কাছে যে অবস্থায় পলায়ন করেছে ঐ একই অবস্থায় পলায়ন করেনি অর্থাৎ ক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়, আর বিক্রেতার কাছে পলায়ন করেছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়।

قَوْلُهُ فَإِذَا أَقَامَهَا حَلَفَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ الخ : যদি ক্রেতা তার কাছ থেকে গোলামটি পলায়ন করেছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে লক্ষ্য করে বলবে, এ পলায়নের দোষটি কি তোমার কাছেও ঐ একই অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় ক্রেতার কাছে প্রকাশ পেয়েছে? যদি বিক্রেতা বলে, হ্যাঁ, আমার কাছেও এ দোষ ঐ অবস্থায় ছিল, যে অবস্থায় ক্রেতা দাবি করেছে, তাহলে ক্রেতা গোলামটি খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর যদি বিক্রেতা তার কাছে দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা ভিন্ন অবস্থায় থাকার দাবি করে অর্থাৎ ক্রেতা দাবি করে যে, আমার কাছে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পলায়ন করেছে, আর বিক্রেতা বলে, আমার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করেছে, তাহলে এ সুরতে বিচারক ক্রেতাকে বলবে, তোমার কাছে গোলামটি যে অবস্থায় [প্রাপ্তবয়স্ক/ অপ্রাপ্তবয়স্ক] পলায়ন করেছে, ঐ একই অবস্থায় বিক্রেতার কাছেও যে গোলামটি পলায়ন করেছে– এর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ কর। যদি ক্রেতা এর উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি ফেরত প্রদানের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু ক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে; বরং বিক্রেতা থেকে কসমের দাবি করে, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবে। কসমের বাক্য তিন ধরনের হতে পারে। যে কোনো একটি বাক্যে বিক্রেতা কসম করবে।

১. বিক্রেতা বলবে, আল্লাহর কসম ! আমি গোলামটি বিক্রি করেছি এবং ক্রেতার কাছে সোপর্দ করেছি, আর সোপর্দ করা পর্যন্ত আমার কব্জায় থাকাকালে কখনো পলায়ন করেনি। গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামে সগীরে বা মতান্তরে মাবসূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ বাক্য ব্যবহার করেছেন। –[বিনায়া, ফাতহুল কাদীর]

২. কিংবা বলবে, আল্লাহর কসম! ক্রেতা যে সূত্রে দাবি করছে সে সূত্রে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই।

৩. কিংবা এভাবে বলবে যে, আল্লাহর কসম ! আমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামটি কখনো পলায়ন করেনি।

قَوْلُهُ أَمَّا لَا يُحَلِّفُهُ بِاللّٰهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ هٰذَا الْعَيْبُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিচারক নিম্নোক্ত দু-বাক্যে বিক্রেতাকে কসম করাবেন না–

১. আল্লাহর কসম! আমি গোলামটি বিক্রি করেছি এমতাবস্থায় যে, তাতে এ দোষ ছিল না।

২. আল্লাহর কসম! গোলামটি বিক্রয় করার সময় এবং অর্পণ করার সময় তাতে এ দোষ ছিল না।

এ দু-বাক্যে কসম এজন্য করাবেন না–যেহেতু এ ধরনের শপথ বাক্যে শুভঙ্করের ফাঁকি থাকায় ক্রেতার কল্যাণ উপেক্ষিত হয়। প্রথম বাক্যের কথা ধরুন– বিক্রেতা কসম করেছে যে, বিক্রি করার সময় এ দোষ ছিল না। কিন্তু বিক্রির পর অর্পণের সময় এ দোষ ছিল কিনা তা তার কসম থেকে জানা যায় না। অথচ অনেক সময় বিক্রির পরও অনেক দিন পণ্য বিক্রেতার কাছে থাকে। এ সময়ের মাঝে যদি পণ্যে দোষ সৃষ্টি হয়, তাহলেও ক্রেতা পণ্য ফেরত প্রদানের অধিকার লাভ করে। বিক্রেতার মতলব সম্পর্কে অবগতি না থাকায় বিচারক তার কসমের প্রেক্ষিতে গোলামটি ক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারবে না মর্মে রায় দেবেন, অথচ বিক্রি করার পর অর্পণের আগে দোষ সৃষ্টি হলে ক্রেতা ফেরত প্রদান করতে পারে। এতে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি দেখুন। দ্বিতীয় বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. বিক্রি ও অর্পণ উভয় সময়ের কোনো সময়েই দোষ ছিল না।

২. দোষ না থাকার বিষয়টি যুগপৎ উভয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত; বিক্রি ও অর্পণ এ উভয় সময় দোষ ছিল না, একটির সময় ছিল, অর্থাৎ পণ্য অর্পণের সময় ছিল, কিন্তু বিক্রি করার সময় ছিল না। বিক্রেতা যদি তার কসমে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নেয় আর বিচারক প্রথম অর্থ বুঝেন, তাহলে বিক্রেতা তার কসমেও সত্যবাদী থাকবে, আবার দোষ থাকা সত্ত্বেও পণ্যটি তার কাছে ফেরত প্রদান করা হবে না। অথচ অর্পণ করার সময় দোষ থাকায় ক্রেতা পণ্য ফেরত প্রদান করার অধিকার পায়। বিক্রেতার এ কৌশলময় বাক্যে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِيْ بَيِّنَةً عَلٰى قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، وَأَرَادَ تَحْلِيْفَ الْبَائِعِ بِاللّٰهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ يُحَلَّفُ عَلٰى قَوْلِهِمَا، وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ عَلٰى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ). لَهُمَا أَنَّ الدَّعْوٰى مُعْتَبَرَةٌ حَتّٰى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَكَذَا يَتَرَتَّبُ التَّحْلِيْفُ، وَلَهُ عَلٰى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ أَنَّ الْحَلْفَ يَتَرَتَّبُ عَلٰى دَعْوٰى صَحِيْحَةٍ، وَلَيْسَتْ تَصِحُّ إِلَّا مِنْ خَصْمٍ، وَلَا يَصِيْرُ خَصْمًا فِيْهِ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ، وَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ عِنْدَهُمَا يُحَلَّفُ ثَانِيًا لِلرَّدِّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ قَدَّمْنَاهُ: قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، إِذَا كَانَ الدَّعْوٰى فِيْ إِبَاقِ الْكَبِيْرِ يُحَلَّفُ مَا أَبَقَ مُنْذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، لِأَنَّ الْإِبَاقَ فِي الصِّغَرِ لَا يُوْجِبُ رَدَّهُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ .

অনুবাদ : আর যদি ক্রেতা তার কাছে থাকা অবস্থায় দোষ দেখা দেওয়ার অনুকূলে সাক্ষ্য পেশ করতে না পারে এবং বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করাতে চায় যে, আল্লাহর কসম! ক্রেতার কাছে গোলামটি পলায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। কিন্তু মাশায়েখগণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। সাহেবাইন [ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)]-এর দলিল হলো, ক্রেতার দাবি গ্রহণযোগ্য, তাই তার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তায়। অতএব কসম করানোর বিষয়টিও বর্তাবে। আর কারো কারো মত অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কসম করার বিষয়টি বর্তায় শুদ্ধ দাবির ভিত্তিতে। আর বাদীর অস্তিত্ব ছাড়া দাবি শুদ্ধ হয় না। আর আলোচ্য মাসআলায় [সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে] দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরই ক্রেতা বাদী হবে। আর যদি বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে [গোলামটি] ফেরত প্রদানের জন্য তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পূর্ববর্ণিত বাক্যে কসম করানো হবে। গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি প্রাপ্তবয়স্ক গোলামের পলায়নের দাবি হয়, তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করানো হবে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর [তার নিকট থেকে] গোলামটি পলায়ন করেনি। কেননা, শৈশবে পলায়ন করাটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ফেরত প্রদানকে আবশ্যক করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِيْ بَيِّنَةً عَلٰى قِيَامِ الْعَيْبِ الخ : যদি ক্রেতা তার কাছে দোষ দেখা দেওয়ার অর্থাৎ গোলামটি যে তার কাছ থেকে পলায়ন করেছে এর অনুকূলে সাক্ষী পেশ করতে না পারে এবং বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করাতে চায় যে, বলো, আল্লাহর কসম! ক্রেতার কাছে গোলামটি পলায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর অনুরূপ অর্থাৎ বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর অভিমত হলো, কসম করাবেন না। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০]

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ الدَّعْوٰى مُعْتَبَرَةٌ حَتّٰى يَتَرَتَّبَ الخ :

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : গোলামের মাঝে পলায়নের দোষ আছে– ক্রেতার এ দাবি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। সে কারণেই তার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তেছে এবং বিচারকের পক্ষ থেকে দোষ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। আর যে দাবির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব বর্তায় তার উপর কসম করানোর বিষয়টিও বর্তায়। তাই ক্রেতার দাবির প্রেক্ষিতে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে।

قَوْلُهُ أَنَّ الْحَلَفَ يَتَرَتَّبُ عَلٰى دَعْوٰى صَحِيْحَةٍ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বশেষ অভিমতের সপক্ষে দলিল : কসম করার বিষয়টি বর্তায় শুদ্ধ দাবির ভিত্তিতে। আর বাদীর অস্তিত্ব ছাড়া দাবি শুদ্ধ হয় না। আর আলোচ্য সুরতে ক্রেতার কাছ থেকে গোলামটি যে পলায়ন করেছে তা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার পরই ক্রেতা বাদী হিসেবে বিবেচিত হবে। যেহেতু তা সাব্যস্ত হয়নি তাই ক্রেতা বাদী হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আর বাদী না হওয়াতে তার দাবিও শুদ্ধ নয়। আর দাবি শুদ্ধ না হলে কসম করানোর বিষয়টি বর্তায় না। অতএব বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবেন না।

قَوْلُهُ وَإِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ عِنْدَهُمَا يُحَلَّفُ ثَانِيًا الخ : সাহেবাইন (র.)-এর মতানুযায়ী যদি বিচারক 'গোলামটি ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করেছে বলে তার জানা নেই' মর্মে বিক্রেতার কাছে কসম তলব করেন, আর বিক্রেতা কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোলামটি ফেরত প্রদানের জন্য তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের পূর্ববর্ণিত বাক্যে কসম করানো হবে। কারণ, প্রথমবার কসমে অস্বীকৃতির কারণে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, গোলামটি ক্রেতার কাছ থেকে পলায়ন করেছে। ক্রেতার কাছে পলায়ন তথা দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পরের পর্যায় হলো, বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেও এ দোষটি ছিল কিনা তা সাব্যস্ত করা। এজন্য ক্রেতাকে বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার নির্দেশ দেবেন। যদি ক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে গোলামটি সে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামের মাঝে এ দোষটি ছিল কিনা? বিক্রেতা যদি দোষ থাকার কথা স্বীকার করে, তাহলে ক্রেতা খেয়ারে আইব লাভ করবে। আর বিক্রেতা যদি তার কাছে এ দোষ থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা ক্রেতা যে অবস্থায় অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় দোষের দাবি করেছে, সে ঐ অবস্থায় দোষ থাকার কথা অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক তার কাছে এ মর্মে কসম তলব করবেন যে, আল্লাহর কসম! আমার কাছে থাকা অবস্থায় গোলামটি কখনো পলায়ন করেনি কিংবা এ মর্মে কসম তলব করবেন যে, ক্রেতা যে সূত্রে দাবি করছে সে সূত্রে গোলামটি ফেরত দেওয়ার সে অধিকার রাখে না। যদি বিক্রেতা কসম করে, তাহলে খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হবে না এবং ক্রেতা গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার পাবে না। আর যদি কসমে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে খেয়ারে আইব সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার লাভ করবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَ الدَّعْوٰى فِيْ إِبَاقِ الْكَبِيْرِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা যদি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়নের দাবি করে, তাহলে বিক্রেতাকে এ মর্মে কসম করানো হবে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর আমার কাছ থেকে পলায়ন করেনি। কারণ, বিক্রেতার কাছে অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পলায়ন করে থাকলে তা হুবহু ক্রেতার কাছে প্রকাশ পাওয়া দোষ বলে গণ্য হবে না এবং এর কারণে ক্রেতা গোলামটি ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً وَتَقَابَضَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ هٰذِهٖ وَأُخْرٰى مَعَهَا ، وَقَالَ الْمُشْتَرِىْ بِعْتَنِيْهَا وَحْدَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ لِأَنَّ الْاِخْتِلَافَ فِىْ مِقْدَارِ الْمَقْبُوْضِ فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ ، كَمَا فِى الْغَصْبِ ، وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلٰى مِقْدَارِ الْمَبِيْعِ وَاخْتَلَفَا فِى الْمَقْبُوْضِ لِمَا بَيَّنَّا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো দাসী ক্রয় করে এবং উভয় পক্ষ [পণ্য ও মূল্য] কব্জা করে নেয়। অতঃপর ক্রেতা দাসটিতে দোষ পায়, আর বিক্রেতা [ক্রেতাকে] বলে– আমি তোমার কাছে এটি এবং এর সঙ্গে আরেকটি [দাসী] বিক্রি করেছি, কিন্তু ক্রেতা বলে– তুমি আমার কাছে শুধু এ দাসীটিকেই বিক্রি করেছ, তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, মতবিরোধ হলো কব্জাকৃত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে। সুতরাং কব্জাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন আত্মসাৎকৃত [বস্তুর] ক্ষেত্রে হয়। তদ্রূপ হুকুম হবে যদি পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা একমত হয়, কিন্তু কব্জাকৃত পণ্যের বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সগীরে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং ক্রেতা দাসীটি এবং বিক্রেতা বিক্রয়মূল্য কব্জা করল। এরপর ক্রেতা দাসীতে কোনো দোষ পেল। দোষের প্রেক্ষিতে ক্রেতা দাসীটি ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিতে চাইল। বিক্রেতা বলল, আমি তো তোমার কাছে দুটি দাসী বিক্রি করেছি– একটি এটি এবং এর সঙ্গে আরেকটি দাসী [বিক্রি করেছি]। তুমি একটি ফেরত দিতে চাইছ, তাই একটির পরিমাণ মূল্য ফেরত পাবে। ক্রেতা বলল, তুমি আমার কাছে একমাত্র এ দাসীটি বিক্রি করেছ, তাই তোমাকে পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে। ঘটনাক্রমে দুজনের কারো পক্ষেই কোনো সাক্ষী নেই, তাহলে এ সুরতে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, দুজনের মাঝে মূলত কব্জাকৃত পণ্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। বিক্রেতা দাবি করছে যে, ক্রেতা দুটি দাসী কব্জা করেছে– আর ক্রেতা দাবি করছে, আমি একটি দাসী কব্জা করেছি। আর কব্জাকৃত পণ্যের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ হলে কব্জাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ, সে-ই কব্জাকৃত বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে ভালো জানে। আর এ ক্ষেত্রে কব্জাকারী হলো ক্রেতা। তাই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এর উদাহরণ হলো, ছিনতাইকৃত বস্তুর পরিমাণ নিয়ে আত্মসাৎকারী ও আত্মসাতের শিকার ব্যক্তির মধ্যবর্তী মতবিরোধ। যেমন– ছিনতাইকারী দাবি করল, আমি একটি গোলাম আত্মসাৎ করেছি, আর আত্মসাতের শিকার ব্যক্তি দাবি করে, তুমি দুটি গোলাম আত্মসাৎ করেছ, তাহলে ছিনতাইকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ সে কব্জাকারী।

قَوْلُهٗ وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلٰى مِقْدَارِ الْمَبِيْعِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, অনুরূপভাবে বিক্রীত-পণ্যের পরিমাণ সম্পর্কে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়, কিন্তু কব্জাকৃত পণ্যের ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়, যেমন– বিক্রীত-পণ্য দুটি গরু। বিক্রেতা বলছে, তুমি দুটিই কব্জা করেছ আর ক্রেতা বলছে, আমি একটি কব্জা করেছি, তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, সে কব্জাকারী। আর কব্জাকৃত বস্তুর পরিমাণ সম্পর্কে কব্জাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَ وَجَدَ بِالْاٰخَرِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَدَعُهُمَا، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ بِقَبْضِهِمَا فَيَكُوْنُ تَفْرِيْقُهَا قَبْلَ التَّمَامِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ، فَالتَّفْرِيْقُ فِيْهِ كَالتَّفْرِيْقِ فِى الْعَقْدِ، وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوْضِ عَيْبًا اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ، وَيُرْوٰى عَنْ أَبِىْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا، لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ تَتَعَلَّقُ بِقَبْضِ الْمَبِيْعِ، وَهُوَ اِسْمٌ لِلْكُلِّ فَصَارَ كَحَبْسِ الْمَبِيْعِ، لِمَا تَعَلَّقَ زَوَالُهُ بِاسْتِيْفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُوْلُ دُوْنَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একই বিক্রয়চুক্তিতে দুটি গোলাম ক্রয় করে, আর দুটির একটি কব্জা করে আর অপরটিতে দোষ পায়, তাহলে হয় সে উভয়টা গ্রহণ করবে কিংবা উভয়টা পরিত্যাগ করবে। কেননা, উভয়টা কব্জা করার দ্বারাই বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং একটি গ্রহণ করা আর অপরটি পরিত্যাগ করার বিষয়টি পূর্ণতা লাভের পূর্বেই বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করবে। এ বিষয়টি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর কব্জার ক্ষেত্রে বিক্রীত-পণ্যের মাঝে খণ্ডিতকরণ এজন্য জায়েজ নেই যে, বিক্রয়চুক্তির সাথে কব্জার সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং কব্জার ক্ষেতে খণ্ডিতকরণটা বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের মতো হবে। [আর বিক্রয়চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ জায়েজ নেই, তাই কব্জায় খণ্ডিতকরণও জায়েজ হবে না।] আর যদি ক্রেতা কব্জাকৃত গোলামে দোষ পায়, তাহলে এর হুকুম সম্পর্কে ফিক্‌হবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কব্জাকৃতটিই শুধু ফেরত দেবে। [গ্রন্থকার (র.) বলেন,] কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, ক্রেতা হয় উভয়টিকে গ্রহণ করবে কিংবা উভয়টিকে ফেরত দেবে। কেননা, বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা বিক্রীত-পণ্যের কব্জার সাথে সম্পৃক্ত। আর বিক্রীত-পণ্য হলো চুক্তিভুক্ত সমগ্রপণ্য। সুতরাং চুক্তির পূর্ণতার বিষয়টি [মূল্য উসুল করার জন্য] বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার মতো হলো। বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার সম্পর্ক যেহেতু মূল্য উসুল করার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু পূর্ণ মূল্য উসুল করা ছাড়া আটক রাখার অধিকার বিলুপ্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدَيْنِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে দুটি গোলাম ক্রয় করেছে এবং দুটির একটিকে কব্জা করেছে এবং সেটা ছিল দোষমুক্ত– আর অপরটিকে দোষগ্রস্ত পেয়েছে, তাহলে তার জন্য এটা জায়েজ নেই যে, সে দোষমুক্ত পণ্যটি গ্রহণ করবে, আর দোষগ্রস্ত পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দেবে; বরং গ্রহণ করলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে উভয়টিকে গ্রহণ করবে অথবা উভয়টি ফেরত দেবে। দলিল হলো– খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার পর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আলোচ্য চুক্তিতে দুটি গোলাম মিলিতভাবে বিক্রীত-পণ্য। অতএব আলোচ্য

মাসআলায় চুক্তি তখন পূর্ণতা লাভ করবে যখন উভয়টিকে কব্জা করা হবে। যদি উভয়টি কব্জা না করে কোনো একটিকে ফেরত প্রদান করা হয়, তাহলে পূর্ণতা লাভের পূর্বেই চুক্তিকে খণ্ডিত করা হবে। আর পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ (تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ) বৈধ নয়। অতএব কব্জার মাঝেও খণ্ডিতকরণ অর্থাৎ দোষমুক্ত গোলামটি রেখে দোষগ্রস্ত গোলামটি ফেরত দান বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شِبْهٌ بِالْعَقْدِ الخ : কব্জার মাঝে খণ্ডিতকরণ (تَفْرِيْق) কেন বৈধ নয়? কারণ, বিক্রয়চুক্তির সাথে কব্জার সাদৃশ্য রয়েছে। কব্জার উদ্দেশ্য হলো পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করা। আর চুক্তির মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্যের মালিকানা লাভ হয়। আর মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যও হলো পণ্যে হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করা। উদ্দেশ্যের দিক থেকে কব্জাটি বিক্রয়চুক্তির মতো। সুতরাং কব্জার ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণটা বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের মতো হবে। আর বিক্রয়চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ জায়েজ নেই, তাই কব্জায় খণ্ডিতকরণও জায়েজ হবে না।

বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণের উদাহরণ হলো, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি তোমার কাছে এ দুটি গোলাম এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম। ক্রেতা বলল, আমি একটি গোলামে বিক্রয় কবুল করলাম। এটা জায়েজ নেই। কারণ, এতে বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوْضِ عَيْبًا اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ الخ : যদি ক্রেতা কব্জাকৃত গোলামটিতে দোষ পায়, তাহলে তার হুকুম নিয়ে ফিক্‌হবিদগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা শুধু কব্জাকৃত গোলামটি ফেরত দিতে পারবে এবং তার অংশের মূল্য ফেরত নেবে। কিন্তু গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, ক্রেতা হয় পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে উভয় গোলাম রাখবে অথবা উভয় গোলাম ফেরত দিয়ে দেবে। কারণ, বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতা (تَمَامُ الصَّفْقَةِ) বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার পর বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর বিক্রীত-পণ্য তা-ই, যার উপর চুক্তি হয়। আলোচ্য মাসআলায় দু গোলামের উপর চুক্তি হয়েছে। অতএব উভয় গোলাম কব্জা করার পরই বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করবে। এর উদাহরণ হলো, মূল্য উসুল করার জন্য বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখা। বিক্রীত-পণ্য আটকে রাখার অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার সম্পর্ক যেহেতু মূল্য উসুল করার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু পূর্ণ মূল্য উসুল করা ছাড়া আটক রাখার অধিকার বিলুপ্ত হয় না। অনুরূপভাবে চুক্তির পূর্ণতা লাভের বিষয়টি চুক্তিভুক্ত পণ্য কব্জা করার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সমগ্র পণ্য কব্জা করা না হলে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করবে না।

আলোচ্য সুরতে ক্রেতা যেহেতু একটি গোলাম কব্জা করেছে এবং অপর গোলামটি কব্জা করেনি, তাই আলোচ্য সুরতে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। যখন চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি, তখন একটি গোলাম ফেরত দিলে পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিকে খণ্ডিত করা আবশ্যক হবে। আর পূর্ণতা লাভের পূর্বে চুক্তিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নেই। তাই এ সুরতেও একটি গোলামকে রাখা এবং অপরটিকে ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً، خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ)، هُوَ يَقُولُ، فِيْهِ تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَعْرِىْ عَنْ ضَرَرٍ، لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِضَمِّ الْجَيِّدِ إِلَى الرَّدِيِّ، فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، وَلَنَا أَنَّهُ تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ، لِأَنَّ بِالْقَبْضِ تَتِمُّ الصَّفْقَةُ فِيْ خِيَارِ الْعَيْبِ، وَفِيْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ لَا تَتِمُّ بِهِ عَلٰى مَا مَرَّ، وَلِهٰذَا لَوِ اسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْأٰخَرَ.

অনুবাদ : যদি উভয় গোলাম কব্জা করে, এরপর কোনো একটিতে দোষ পায়, তাহলে দোষগ্রস্তটিই শুধু ফেরত দেবে। অবশ্য ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, এতেও বিক্রয়চুক্তি বিখণ্ডিত হয়। আর এটা ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়। কেননা, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পণ্য মিলিয়ে বিক্রয় করাই প্রচলিত নিয়ম। সুতরাং তা কব্জা করার পূর্বে কিংবা দেখার এখতিয়ার বা শর্তভিত্তিক এখতিয়ারের কারণে [একটিকে ফেরত দেওয়ার] সাদৃশ্য হলো। আমাদের দলিল হলো, এটা হলো চুক্তি পূর্ণতা লাভের পর খণ্ডিতকরণ। কেননা, দোষজনিত খেয়ারের সুরতে [বিক্রীত-পণ্য] কব্জা করার দ্বারা চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর শর্তভিত্তিক খেয়ার ও দেখার খেয়ারের সুরতে কব্জা করার দ্বারাও চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণেই কব্জা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً الخ : যদি উভয় গোলাম কব্জা করে এরপর কোনো একটিতে দোষ পায়, তাহলে যেটিতে দোষ পাবে শুধু সেটিকেই ফেরত দিতে পারবে। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে হয় দুটোই রাখবে অথবা দুটোই ফেরত দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতও এটি। ইমাম যুফার (র.) বলেন, কব্জা করার পরও একটা রেখে অপরটা ফেরত দেওয়ার মাঝে যদিও পূর্ণতা লাভের পর বিক্রয়চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়, কিন্তু খণ্ডিত তো হয়। কেননা, চুক্তি হয়েছিল দুটি গোলামের উপর। আর এ খণ্ডিতকরণ ক্ষতিমুক্ত নয়। কারণ, প্রচলিত নিয়ম হলো, ব্যবসায়ীগণ ভালো ও খারাপ পণ্য মিলিয়ে বিক্রি করে। দোষের কারণে যদি ক্রেতা একটি গোলাম ফেরত দেয়, তাহলে খারাপটা ফেরত দেবে, আর ভালোটা তার কাছে রেখে দেবে। আর আলাদাভাবে খারাপটা বিক্রি করা বিক্রেতার পক্ষে কঠিন হবে। যদি বিক্রি করতে পারেও, কম দামে বিক্রি করতে হবে। এতে বিক্রেতার ক্ষতি হবে। তাই একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ : গ্রন্থকার (র.) ইমাম যুফার (র.)-এর অনুকূলে তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন–

১. উভয় গোলাম কব্জা করার পূর্বে সর্বসম্মতভাবে একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, এতে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয় এবং এর ফলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর উভয় গোলাম কব্জা করার পর একটিকে ফেরত দেওয়াতেও চুক্তি খণ্ডিত হয় এবং এর ফলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব উভয় সুরতে হুকুম এক হবে। বিক্রেতার ক্ষতি রোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রথম সুরতে সর্বসম্মতভাবে একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। অতএব এ সুরতেও জায়েজ হবে না।

২. খেয়ারে রুয়তের সুরতে বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম হলে উভয়টিকে কব্জা করার পর একটি গোলামকে ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। সেক্ষেত্রে যেরূপ একটিকে ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয় তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও একটি ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

৩. তিন দিনের খেয়ারের শর্তে কেউ দুটি গোলাম ক্রয় করার পর উভয়টি কব্জা করুক বা না করুক– তার জন্য একটি গ্রহণ করা আর অপরটি ফেরত দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, এতে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হয়। আলোচ্য মাসআলায়ও কব্জা করার পর একটি ফেরত দিলে চুক্তি খণ্ডিত হয়। তাই আলোচ্য সুরতেও একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّهُ تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ الخ : আমাদের দলিল হলো, উভয় গোলাম কব্জা করার পর কোনো একটিকে ফেরত দিলে চুক্তি অবশ্যই খণ্ডিত হয়, তবে পূর্ণতা লাভের পর খণ্ডিত হয়। আর পূর্ণতা লাভের পর চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ জায়েজ আছে। অতএব আলোচ্য মাসআলায় একটি গোলাম ফেরত দেওয়া জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে উভয় গোলাম কব্জা করার পূর্বে একটিকে ফেরত দেওয়া হলে যেহেতু সম্পূর্ণতা লাভের আগেই চুক্তিকে খণ্ডিতকরণ হয়, তাই তা জায়েজ হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের উত্তরে আমরা বলি, খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুয়তকে খেয়ারে আইবের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুয়ত-এর সাথে খেয়ারে আইব [দোষজনিত খেয়ার]-এর পার্থক্য আছে। খেয়ারে আইবের সুরতে বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। আর এ কারণেই কব্জা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার নেই। কারণ, কব্জা করার দ্বারা ঐ গোলামটিতে বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভের পর ক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না। কিন্তু খেয়ারে শর্ত ও খেয়ারে রুয়তের সুরতে পণ্য কব্জা করার দ্বারা চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে না। খেয়ারে শর্ত বা খেয়ারে রুয়তের সুরতে কব্জা করার পর যদি দুই গোলামের একটির মালিক তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রেতার অপর মালিক গোলামটি ফেরত দেওয়ার অধিকার রাখে। কারণ, ঐ গোলামটিতে বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। আর বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণতা লাভের পূর্বে ক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে। মোটকথা, এসব পার্থক্যের কারণে খেয়ারে আইবের উপর খেয়ারে শর্ত বা খেয়ারে রুয়তকে কিয়াস করা শুদ্ধ নয়।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ اَوْ يُوْزَنُ فَوَجَدَ بِبَعْضِهٖ عَيْبًا رَدَّهٗ كُلَّهٗ اَوْ اَخَذَهٗ كُلَّهٗ، وَمُرَادُهٗ بَعْدَ الْقَبْضِ، لِاَنَّ الْمَكِيْلَ اِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشَيْئٍ وَاحِدٍ، اَلَا تَرٰى اَنَّهٗ يُسَمّٰى بِاسْمٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْكُرُّ وَنَحْوُهٗ، وَقِيْلَ : هٰذَا اِذَا كَانَ فِيْ وِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَاِنْ كَانَ فِيْ وِعَائَيْنِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدَيْنِ، حَتّٰى يَرُدَّ الْوِعَاءَ الَّذِيْ وُجِدَ فِيْهِ الْعَيْبُ دُوْنَ الْاٰخَرِ وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُهٗ فَلَا خِيَارَ لَهٗ فِيْ رَدِّ مَا بَقِيَ، لِاَنَّهٗ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيْضُ، وَالْاِسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ، لِاَنَّ تَمَامَهَا بِرِضَاءِ الْعَاقِدِ لَا بِرِضَاءِ الْمَالِكِ، وَهٰذَا اِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، اَمَّا لَوْ كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهٗ اَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ وَاِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ، لِاَنَّ التَّشْقِيْصَ فِيْهِ عَيْبٌ، وَقَدْ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ الْاِسْتِحْقَاقُ، بِخِلَافِ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত কিংবা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আর তার কিছু অংশে দোষ পায়, তাহলে সমগ্র দ্রব্য ফেরত দেবে অথবা সমগ্রটা রেখে দেবে। [গ্রন্থকার বলেন] তাঁর উদ্দেশ্য হলো কজা করার পর [যদি কিছু অংশে দোষ পায় তাহলে]। কেননা, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য একই জাতিভুক্ত হলে তা একটি দ্রব্যের মতো। তাইতো সবগুলোর উপর একই নাম আরোপিত হয়। যেমন– এক 'কুর' এবং এরূপ শব্দ [মন, টন, ওয়াসাক ইত্যাদি]। কারো কারো মতে উল্লিখিত হুকুম প্রযোজ্য হবে সমগ্র দ্রব্য এক পাত্রে হলে। যদি দুই পাত্রে হয়, তাহলে তা দুই গোলামের পর্যায়ভুক্ত। তাই যে পাত্রটিতে দোষ পাওয়া যায় ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে, অপরটি নয়। যদি কিছু দ্রব্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মালিকানা প্রকাশ পায়, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে না। কেননা, এক্ষেত্রে বিভক্তিকরণ ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। আর অন্যের মালিকানা প্রকাশ পাওয়া বিক্রয়চুক্তির পূর্ণতায়ও বাধা দেয় না। কেননা, চুক্তির পূর্ণতা লাভ হয় চুক্তিকারীর সম্মতির মাধ্যমে, মালিকের সম্মতির মাধ্যমে নয়। তবে অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দিতে না পারার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য হবে, যখন কজার পর অন্যের মালিকানা প্রকাশ পায়। যদি কজার আগে অন্যের মালিকানা প্রকাশিত হয়, তাহলে পূর্ণতা লাভের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে। আর যদি দ্রব্যটি কাপড় হয়, তাহলে [কজার পর অন্যের মালিকানা প্রকাশিত হলেও] অবশিষ্ট কাপড় ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, কাপড়ের ক্ষেত্রে খণ্ডিতকরণ একটি দোষ হিসেবে বিবেচিত। আর তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানা প্রকাশিত হওয়ায় সাব্যস্ত হয় যে, এ দোষটি বিক্রয়চুক্তির সময়ই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য ও পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের কথা ভিন্ন। [কারণ, তাতে খণ্ডিতকরণ দোষ হিসেবে বিবেচিত নয়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ الخ : জামে সগীরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ক্রয় করে এবং তা কজা করে, এরপর কিছু অংশে দোষ পায়, উদাহরণত তিন মন গম ক্রয় করল এবং তা কজা করার পর এক মন গমে দোষ পেল, তাহলে সমগ্র দ্রব্য এক পাত্রে হোক বা একাধিক পাত্রে হোক– ক্রেতা ঐ দ্রব্য রাখা/না রাখার এখতিয়ার পাবে। যদি রাখে, তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে সমগ্র দ্রব্য রাখতে হবে। যদি না রাখে, তাহলে সমগ্র দ্রব্য ফেরত দিতে হবে। যে দুই মন গমে দোষ নেই তা রাখবে, আর যে মনে দোষ আছে তা ফেরত দেবে– তা পারবে না।

উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত মাসআলায় গেছে, যদি সম্পূর্ণ বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার পর একাংশে দোষ পায়, তাহলে যে অংশে দোষ পাবে শুধু সে অংশ ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। যেমন– বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম। উভয়টা কব্জা করার পর কোনো একটিতে দোষ পাওয়া গেলে শুধু দোষগ্রস্ত গোলামটি ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। উভয় গোলাম তথা সম্পূর্ণ বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় গেল যে, কব্জা করার পর একাংশে দোষ পেলে হয় সমগ্রটুকু রাখবে অথবা সমগ্রটুকু ফেরত দেবে। হুকুমের এ ভিন্নতা মূলত দ্রব্যের শ্রেণীভিন্নতার কারণে। দ্রব্য যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَكِيْلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَوْزُوْنُ) হয়, তাহলে হুকুম হলো কব্জা করার পর দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে হয় সম্পূর্ণ দ্রব্য রাখবে কিংবা সম্পূর্ণ দ্রব্য ফেরত দেবে। আর দ্রব্য যদি এছাড়া অন্য শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে সম্পূর্ণ দ্রব্য কব্জা করার পর একাংশে দোষ পাওয়া গেলে সম্পূর্ণ দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে না; বরং শুধু দোষগ্রস্ত অংশ ফেরত দিতে পারবে। অবশ্য সম্পূর্ণ দ্রব্য কব্জা করার পূর্বে একাংশে দোষ পাওয়া গেলে দ্রব্য যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, হয় সম্পূর্ণ দ্রব্য রাখবে বা সম্পূর্ণ ফেরত দেবে।

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْمَكِيْلَ اِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ الخ :

আলোচ্য মাসআলার দলিল : পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَكِيْلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَوْزُوْنُ) বিক্রীত-দ্রব্য এক জাতিভুক্ত হলে তা সামষ্টিকভাবে একটি বস্তুর মতো। উদাহরণত বিক্রীত- দ্রব্য তিন মন গম, এ তিন মন গম সমষ্টিগতভাবে একটি গোলামের মতো। কারণ, সামষ্টিকতার হিসেবেই এসব দ্রব্য মূল্যসম্পন্ন মাল। একটি গমের দানা আলাদাভাবে মূল্যসম্পন্ন নয় এবং সে কারণেই একটি গমের দানা বিক্রি করা জায়েজ নেই। সুতরাং পণ্য হিসেবে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَكِيْلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَوْزُوْنُ) দ্রব্য সামষ্টিকভাবে একটি বস্তুর মতো। আর তাই সবগুলোর উপর এক নাম আরোপিত হয়। যেমন বলা হয়– এক 'কুর' গম, তিন মন গম, পাঁচ টন চাল ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নমুনা হিসেবে অল্প কিছু দেখাই সবগুলো দেখা বলে গণ্য হয়। আর একই বস্তুর একাংশকে দোষগ্রস্ত পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় পুরাটা ফেরত দেয় কিংবা পুরোটা রেখে দেয়। কারণ, ক্রেতা যদি দোষগ্রস্ত অংশটুকু ফেরত দেয় আর দোষমুক্ত অংশটি নিজের কাছে রেখে দেয়, তাহলে বিক্রীত-পণ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হয়। আর পণ্যে অংশদারিত্ব একটি দোষ। ক্রেতা দোষগ্রস্ত অংশ ফেরত দিতে গেলে এ দোষটি ক্রেতার পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না। তাই ক্রেতাকে হয় পূর্ণ দ্রব্যটি গ্রহণ করতে হয় কিংবা পূর্ণ দ্রব্যটি ফেরত দিতে হয়। অতএব আলোচ্য মাসআলায়ও পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَكِيْلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَوْزُوْنُ) দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় সমগ্র পণ্য রাখবে অথবা সমগ্র পণ্য ফেরত দেবে।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ : هٰذَا اِذَا كَانَ فِيْ وِعَاءٍ وَاحِدٍ الخ : পাত্র দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَكِيْلُ) বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত (اَلْمَوْزُوْنُ) দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে ক্রেতা হয় সমগ্র পণ্য রাখবে অথবা সমগ্র পণ্য ফেরত দেবে। ফিক্হবিদগণের কারো কারো মতে এ বিধান ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন সমগ্র দ্রব্য একটি পাত্রে থাকে, দোষগ্রস্ত দ্রব্য ও দোষমুক্ত দ্রব্য মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। আর যদি দ্রব্য একাধিক পাত্রে থাকে, তাহলে তা দুই গোলামের পর্যায়ভুক্ত। বিক্রীত-পণ্য দুটি গোলাম হলে এবং উভয়টি কব্জা করার পর কোনো একটিতে দোষ পেলে যেরূপ দোষগ্রস্ত গোলামটিই শুধু ক্রেতা ফেরত দিতে পারে, তেমনি আলোচ্য মাসআলায় যে পাত্রটিতে দোষ পাওয়া যাবে ক্রেতা শুধু সেই পাত্রের দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে, অপর পাত্রেরগুলো নয়। ফকীহ আবুল লাইস (র.) জামে সগীরের শরাহতে এ মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে এ ধরনের মত বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُهٗ فَلَا خِيَارَ لَهٗ فِي الخ : যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত কোনো দ্রব্য ক্রয় করে এবং তা কব্জা করে, এরপর কিছু অংশের দাবিদার বের হয় এবং সে তার অংশ নিয়ে নেয়, উদাহরণত ক্রেতা তিন মন গম ক্রয় করল এবং তা কব্জা করার পর এক মন গমে দাবিদার বের হলো এবং সে তা নিয়ে গেল, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকবে না। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা তদনুপাত মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

গ্রন্থকার (র.) এর যে দলিল পেশ করেছেন তা একটি প্রশ্নের উত্তরও বটে। প্রশ্নটি হলো, যেমন পূর্বোক্ত মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে যে, আংশিক দ্রব্যের দাবিদার বের হলে অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার রাখে। যেমন–

বিক্রীত-পণ্য একটি কাপড় বা একটি গরু। যদি এগুলোর একাংশের দাবিদার বের হয়, তাহলে অবশিষ্টাংশ ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার আছে। তেমনিভাবে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের একাংশে দাবিদার বের হলেও অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকা উচিত।

এ ছাড়াও আরেকটি প্রশ্ন হয়। তা হলো, পূর্বোক্ত মাসআলায় গেল যে, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য এক জাতিভুক্ত হলে তা একটি দ্রব্যের মতো। সুতরাং কব্জার পর একাংশে দোষ পাওয়া গেলে হয় সমগ্র দ্রব্য ফেরত দেবে অথবা সমগ্র দ্রব্য রাখবে। আর দ্রব্যে অংশীদারিত্বও একটি দোষ। একাংশের দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতা ও দাবিদার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ দ্রব্যটির মালিক হয়। অতএব দ্রব্যের একাংশে দোষ পাওয়া গেলে যেরূপ ক্রেতা এখতিয়ার লাভ করে তদ্রূপ দাবিদার বের হওয়ার সুরতেও ক্রেতার এখতিয়ার লাভ করা উচিত।

গ্রন্থকার (র.) প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কাপড়, গোলাম ইত্যাদি যে সব দ্রব্য ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সব দ্রব্যের অংশবিশেষের দাবিদার বের হলে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার রাখে। কিন্তু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য যেমন– ধান, চাল, গম ইত্যাদি ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। তাই এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট দ্রব্য ক্রেতা ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো, যেহেতু পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য ভাগ ও খণ্ডিত করা হলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই তাতে অংশীদারিত্ব দোষ নয়। অংশীদারিত্ব দোষ হলে তবেই দ্বিতীয় প্রশ্ন সঠিক হতো।

قَوْلُهُ وَالْإِسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকা পূর্ণতার আগে বিক্রয়চুক্তির খণ্ডিতকরণকে আবশ্যক করে। কারণ, মালিক ও ক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে। যে ব্যক্তি একাংশের দাবি করে তা নিয়ে নিল সে একাংশের মালিক। অথচ সে বিক্রয়চুক্তিতে সম্মত ছিল না। তার সম্মতি না থাকায় চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। তাই উল্লিখিত বিধানানুসারে যদি ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না পায়, তাহলে পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তি খণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিকে খণ্ডিত করা জায়েজ নেই। আর নাজায়েজ কাজ থেকে বাঁচা জরুরি। তাই ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকা চাই।

এর উত্তরে গ্রন্থকার (র.) বলেন, দ্রব্যের একাংশের দাবিদার বের হওয়াটা চুক্তির পূর্ণতা লাভে বাধা দেয় না। কারণ, চুক্তির পূর্ণতা চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্মতির উপর নির্ভর করে, মালিকের সম্মতির উপর নির্ভর করে না। আলোচ্য মাসআলায় চুক্তিকারীদ্বয় হলো ক্রেতা ও বিক্রেতা। ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তিতে সম্মত থাকায় চুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকায় পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিতে খণ্ডিতকরণ আবশ্যক হয় না– পূর্ণতা লাভের পরে খণ্ডিতকরণ হয়। আর তা জায়েজ। সুতরাং কোনো সমস্যা নেই। –[বিনায়া, প্রাগুক্ত খণ্ড, পৃ. ১৭৬]

قَوْلُهُ وَهٰذَا إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, দ্রব্যের একাংশে দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার না থাকাটা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন দাবিদার বের হওয়ার আগেই ক্রেতা দ্রব্য কব্জা করে নেয়। যদি কব্জার আগে দাবিদার বের হয় এবং সে অংশবিশেষ নিয়ে নেয়, তাহলে ক্রেতার অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। কারণ, চুক্তি পূর্ণতা লাভ করে দু জিনিসের কারণে। ১. চুক্তিকারীদ্বয়ের পারস্পরিক সম্মতি। ২. ক্রেতার দ্রব্য কব্জা করা। আলোচ্য সুরতে ক্রেতা যেহেতু দ্রব্য কব্জা করেনি, সেহেতু চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেনি। এখন দাবিদারের অংশ ছাড়া অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার যদি ক্রেতার না থাকে, তাহলে পূর্ণতা লাভের আগে চুক্তিকে খণ্ডিত করা হবে। আর তা জায়েজ নেই। তাই আলোচ্য সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ الخ : আর যদি বিক্রীত-দ্রব্য কাপড় হয় এবং কব্জা করার পর তার একাংশের দাবিদার বের হয়, তাহলে ক্রেতা অবশিষ্টাংশ ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে। কারণ, কাপড়ে খণ্ডিতকরণ একটি দোষ। এর ফলে কাপড়ের মূল্যহ্রাস ঘটে। আর যে জিনিস দ্রব্যের মূল্যহ্রাস ঘটায় তা দোষ হিসেবে বিবেচিত। আর অংশবিশেষে দাবিদার বের হওয়ায় সাব্যস্ত হয় যে, এ দোষটি বিক্রয়চুক্তির সময়ই বিদ্যমান ছিল। অতএব দোষটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে এসেছে। আর যে দোষ বিক্রেতার কাছ থেকে আসে তার কারণে ক্রেতা খেয়ারে আইবের ভিত্তিতে দ্রব্য ফেরত দেওয়ার অধিকার পায়। তাই এ সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে। পক্ষান্তরে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য খণ্ডিত করা হলে যেহেতু ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, তাই তা তাতে দোষ নয়। যেহেতু দোষ নয় সেহেতু কব্জার পর দাবিদার বের হওয়ার সুরতে ক্রেতা অবশিষ্ট দ্রব্য ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না।

وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْحًا فَدَاوَاهَا أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا فِىْ حَاجَتِهٖ فَهُوَ رِضًا ، لِأَنَّ ذٰلِكَ دَلِيْلُ قَصْدِهِ الْاِسْتِبْقَاءَ، بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ، لِأَنَّ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلْاِخْتِبَارِ وَإِنَّهٗ بِالْاِسْتِعْمَالِ، فَلَا يَكُوْنُ الرُّكُوْبُ مُسْقِطًا ، وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلٰى بَائِعِهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِىَ لَهَا عَلَفًا فَلَيْسَ بِرِضًا ، أَمَّا الرُّكُوْبُ لِلرَّدِّ فَلِأَنَّهٗ سَبَبُ الرَّدِّ، وَالْجَوَابُ فِى السَّقْيِ وَاشْتِرَاءِ الْعَلَفِ مَحْمُوْلٌ عَلٰى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ، إِمَّا لِصُعُوْبَتِهَا أَوْ لِعَجْزِهٖ أَوْ لِكَوْنِ الْعَلَفِ فِىْ عِدْلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ لِانْعِدَامِ مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُوْنُ رِضًا ـ

অনুবাদ : কেউ যদি কোনো দাসী ক্রয় করে এবং তাতে কোনো জখম পায় আর সে তার চিকিৎসা করে, কিংবা বিক্রীত-পণ্য ছিল বাহনজন্তু আর সে তার প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে। কেননা, এগুলো তার রেখে দেওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ। তবে খেয়ারে শর্তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেক্ষেত্রে এখতিয়ার হলো যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে। আর তা হয় ব্যবহারের দ্বারা। সুতরাং [সেক্ষেত্রে] আরোহণ খেয়ারকে রহিত করবে না। আর যদি ক্রেতা তাতে এজন্য আরোহণ করে যে, তাকে নিয়ে যেয়ে বিক্রেতাকে ফেরত দেবে কিংবা তাকে পানি পান করাবে অথবা তার জন্য খাদ্য কিনে আনবে, তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে না। ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে আরোহণের বিষয়টি এজন্য সম্মতি বলে গণ্য হবে না যে, এটা হলো ফেরত প্রদানের মাধ্যম। আর পানি পান করানো ও খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে হুকুমটা প্রয়োগ হবে তখন যখন আরোহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে, জন্তুর অবাধ্যতার কারণে হোক কিংবা ক্রেতার অক্ষমতার কারণে হোক কিংবা খাদ্যের বোঝা একপার্শ্বে হওয়ার কারণে হোক। পক্ষান্তরে যখন আমাদের উল্লেখকৃত কারণগুলো না থাকায় আরোহণ করা ছাড়াও অন্য উপায় থাকে, [এতদসত্ত্বেও সে আরোহণ করে] তাহলে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করল এবং কব্জা করার পর তার মাঝে কোনো জখম দেখতে পেল, ফলে সে তার চিকিৎসা করল। কিংবা বিক্রীত-পণ্য ছিল বাহনজন্তু আর সে তার প্রয়োজনে তাতে আরোহণ করল, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে এবং তার খেয়ারে আইব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, দোষ দেখার পরও দাসীর চিকিৎসা করা কিংবা বাহনজন্তুতে আরোহণ করা এগুলো রেখে দেওয়ার ইচ্ছার প্রমাণ বহন করে। আর দোষগ্রস্ত পণ্য রেখে দেওয়ার ইচ্ছা করলে খেয়ারে আইব বাতিল হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, বিক্রীত-পণ্যের দোষ সম্পর্কে অবগতির পর তাতে দোষের প্রতি সম্মতি বুঝায়– এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা হলে তা বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান এবং ক্ষতিপূরণ গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন– বিক্রির জন্য পেশ করা, ইজারা দেওয়া, পরিধান করা, চিকিৎসা করা, বন্ধক রাখা, ক্রীতদাসের সাথে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তির চুক্তি করা, সেবা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ الخ : তবে খেয়ারে শর্তের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ, সেক্ষেত্রে এখতিয়ারটা হয় পণ্য কব্জা করার পর যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে। আর যাচাই-বাছাই হয় ব্যবহারের দ্বারা। সুতরাং খেয়ারে শর্তে বাহনজন্তু ক্রয় করার পর যদি তাতে ক্রেতা আরোহণ করে, তবে তা বাহনজন্তু রাখার প্রতি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে না এবং এর ফলে তার খেয়ার বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا اَوْ الخ : আর যদি দোষ সম্পর্কে অবগতির পর বাহনজন্তুর উপর এজন্য আরোহণ করে যে, তাকে নিয়ে বিক্রেতাকে ফেরত দেবে অথবা তাকে পানি পান করাবে অথবা তার জন্য ঘাস-পাতা ও খাদ্য কিনে আনবে, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে না। গ্রন্থকার (র.) বলেন, ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে যাওয়ার পথে বাহনজন্তুতে আরোহণ করে, চাই আরোহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকুক বা না থাকুক, তা দোষযুক্ত বাহনজন্তুটি রাখার প্রতি সম্মতি বলে এজন্য গণ্য হবে না যে, তা ফেরত দানকে আরো জোরালো করে– সম্মতির প্রমাণ বহন করে না। তাই এ উদ্দেশ্যে আরোহণ করাকে দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য করা হবে না এবং এর ফলে তার খেয়ারে আইব বাতিল হবে না।

আর পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে কিংবা বাহনজন্তুর জন্য খাদ্য ক্রয় করে আনার উদ্দেশ্যে যদি ক্রেতা আরোহণ করে এবং তাছাড়া অন্য কোনো উপায় যদি না থাকে, উদাহরণত ক্রেতা অশীতিপর বৃদ্ধ; হেঁটে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার অন্য কোনো বাহনজন্তুও নেই কিংবা বাহনজন্তুটি অবাধ্য; তার উপর আরোহণ করা ছাড়া তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না অথবা খাদ্যদ্রব্যের বোঝা একটি, যা বাহনজন্তুর পালানের একপাশে রাখা হয়েছে, এমতবস্থায় বোঝার ভারসাম্য রক্ষার জন্য যদি ক্রেতা বাহনজন্তুতে আরোহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি আরোহণ করতে বাধ্য না হয়, উদাহরণত পূর্ববর্ণিত সমস্যা তার নেই, তাহলে তা দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য হবে এবং তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهٖ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِىْ، لَهٗ أَنْ يَرُدَّهٗ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالَا : يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيْمَتِهٖ سَارِقًا إِلٰى غَيْرِ سَارِقٍ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِحْقَاقِ عِنْدَهٗ، وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا، لَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ، وَإِنَّهٗ لَا يُنَافِى الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقْدُ فِيْهِ، لٰكِنَّهٗ مُتَعَيِّبٌ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِهٖ عِنْدَ تَعَذُّرِ رَدِّهٖ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرٰى جَارِيَةً حَامِلًا فَمَاتَتْ فِىْ يَدِهٖ بِالْوِلَادَةِ، فَإِنَّهٗ يَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ قِيْمَتِهَا حَامِلًا إِلٰى غَيْرِ حَامِلٍ، وَلَهٗ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوْبِ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ، وَالْوُجُوْبُ يُفْضِىْ إِلَى الْوُجُوْدِ، فَيَكُوْنُ الْوُجُوْدُ مُضَافًا إِلَى السَّبَبِ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قُتِلَ الْمَغْصُوْبُ أَوْ قُطِعَ بَعْدَ الرَّدِّ بِجِنَايَةٍ وُجِدَتْ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَمْنُوْعَةٌ۔

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ না জেনে এমন গোলাম ক্রয় করে যে চুরি করেছে, আর ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় [তার হাত] কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ক্রেতার গোলামটি ফেরত দেওয়ার এবং মূল্য ফেরত নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। আর সাহেবাইন [ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)]-এর মতে চোর গোলাম ও যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে। যদি বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো কারণে গোলামকে হত্যা করা হয় সেক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য। এ মতপার্থক্যের মূলকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ দোষ [বিক্রীত-পণ্যের একাংশের] দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দোষের পর্যায়ভুক্ত। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় হাত কাটা ও প্রাণদণ্ড সাব্যস্তকারী কারণ পাওয়া গেছে। আর তা [গোলামের] সম্পদগুণ ও অর্থমূল্যতার পরিপন্থি নয়। সুতরাং তাতে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে। কিন্তু তা [ক্রেতার কব্জায় আসার সময়] দোষগ্রস্ত। তাই [হাত কাটা ও প্রাণদণ্ডের কারণে] তাকে ফেরত দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, [না জেনে] গর্ভবতী কোনো দাসী ক্রয়ের পর ক্রেতার হাতে প্রসবজনিত কারণে দাসীটি মারা গেল। এ সুরতে ক্রেতা গর্ভবতী এবং গর্ভবতী নয় এমন দাসীর মূল্যে যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, [হাত কাটা বা মৃত্যুদণ্ড] অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণ বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় বিদ্যমান হয়েছে। আর অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া অস্তিত্ব লাভ করাকে আবশ্যক করে। সুতরাং হাত কাটা ও মৃত্যুদণ্ডের অস্তিত্ব লাভটা পূর্ববর্তী কারণের দিকে সম্পৃক্ত হবে। আর বিষয়টি এমন হলো যে, অপহরণকারীর কব্জায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো অপরাধের কারণে মালিকের কাছে ফেরত দেওয়ার পর অপহরণকৃত গোলামকে হত্যা করা হলো কিংবা তার হাত কাটা হলো। আর [গর্ভবতী দাসীর] যে মাসআলাটি [সাহেবাইনের পক্ষ থেকে] উল্লিখিত হয়েছে তা সর্বস্বীকৃত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ الخ :

বর্ণিত মাসআলাটির বিবরণ : যদি কেউ এমন কোনো গোলাম ক্রয় করে, যে বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় চুরি করেছে, কিন্তু ক্রয়ের সময়ও ক্রেতা তা জানত না এবং কব্জা করার সময়ও তা জানতে পারেনি। এরপর ক্রেতার কব্জায় ঐ গোলামের হাত কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ক্রেতা এখতিয়ার পাবে। ইচ্ছা করলে ঐ গোলাম ফেরত দিয়ে বিক্রেতা থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে, ইচ্ছা করলে ঐ গোলাম রেখে দেবে এবং কাটা হাতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিক্রেতা থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নেবে। কারণ, মানুষের হাত তার অর্ধেকের মূল্য রাখে। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ক্রেতা ঐ গোলাম বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার এখতিয়ার পাবে না। তবে চুরির দোষে দূষিত গোলাম ও যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্য নিরূপণ করবে এবং উভয়ের মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। উদাহরণত চুরির দোষে দূষিত গোলামের মূল্য পাঁচশ' টাকা, আর যে গোলাম চোর নয় তার মূল্য এক হাজার টাকা। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পাঁচশ' টাকা ফেরত নেবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ : উল্লেখ্য যে, যদি বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত কোনো কারণে গোলামকে হত্যা করা হয় সেক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য। অর্থাৎ কেউ যদি এমন কোনো গোলাম ক্রয় করে, যে বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ডাকাতি করেছিল কিংবা কাউকে হত্যা করেছিল আর এর শাস্তিস্বরূপ ক্রেতার কব্জায় আসার পর তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত পূর্ববর্তী মাসআলার মতো। সাহেবাইন (র.) বলেন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোলাম ও যে গোলাম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নয় উভয়ের মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং উভয়ের মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। উদাহরণত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গোলামের দাম একশ টাকা, আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নয় এমন গোলামের দাম এক হাজার টাকা। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে নয়শ' টাকা ফেরত নেবে।

قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْاِسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মধ্যবর্তী এ মতপার্থক্যের মূলকথা হলো, গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বিক্রীত-পণ্য এমন একটি দ্রব্য যা পাল্লা দ্বারা পরিমাপিত বা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য নয়, যেমন– গোলাম, কব্জার পর এমন দ্রব্যের একাংশের দাবিদার বের হলে ক্রেতা যেরূপ দ্রব্য ফেরত দিয়ে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পায়, তেমনি আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পাবে। আর সাহেবাইন (র.) -এর মতে গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া দোষের পর্যায়ভুক্ত। যদি পণ্য দোষগ্রস্ত হয় এবং তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য হয়, তাহলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত পায়। আলোচ্য মাসআলায়ও গোলামের হাত কর্তনযোগ্য হওয়া অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া একটি দোষ। এ দোষটি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। হত্যা করার সুরতে অসাধ্য হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। কারণ, গোলামকে তো হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং তাকে ফেরত দেবে কি করে ? আর হাত কাটার সুরতে আসাধ্য হওয়ার কারণ হলো, হাত কাটা একটি নতুন দোষ। অথচ বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হওয়ার সময় গোলামের হাত কাটা ছিল না। আর ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে বিক্রেতাকে পণ্য ফেরত দেওয়া যায় না, তবে পুরাতন দোষের ক্ষতিপূরণ নেওয়া যায়। তাই আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ الْمَوْجُوْدَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ الخ :

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় হাত কাটা ও প্রাণদণ্ডের কারণ পাওয়া গেছে। আর তা গোলামের সম্পদগুণ ও অর্থমূল্যতার পরিপন্থি নয়। যদি পরিপন্থি হতো অর্থাৎ গোলামটি মূল্যসম্পন্ন মাল না হতো, তাহলে

তাতে বিক্রয় শুদ্ধ হতো না, বিক্রয়ের পর তাকে আজাদ করা শুদ্ধ হতো না। অথচ তাতে বিক্রয় শুদ্ধ, তাকে আজাদ করাও শুদ্ধ। সুতরাং গোলামটি মূল্যসম্পন্ন মাল। আর বিক্রীত-পণ্য মূল্যসম্পন্ন মাল হলে তাতে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়। অতএব আলোচ্য সুরতে গোলামে বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে। তবে প্রাণদণ্ডযোগ্য বা হস্তকর্তনযোগ্য হওয়ায় গোলামটি দোষগ্রস্ত। দোষগ্রস্ত অবস্থায় ক্রেতার কব্জায় এসেছে। আর দোষগ্রস্ত পণ্য ফেরত দেওয়া অসাধ্য হলে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। অতএব উল্লিখিত সুরতেও ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ফেরত দেওয়া কেন এবং কিভাবে অসাধ্য হয় তা একটু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা একটি দাসী ক্রয় করল এবং তা কব্জা করল, পরে দেখা গেল দাসীটি গর্ভবতী। কিন্তু ক্রয়কালেও ক্রেতা তা জানতে পারেনি এবং কব্জা করার সময়ও জানতে পারেনি। এরপর ক্রেতার হাতে প্রসবজনিত কারণে দাসীটি মারা গেল। এ সুরতে ক্রেতা গর্ভবতী এবং গর্ভবতী নয় এমন দাসীর মূল্যে যে ব্যবধান হয়, এ ব্যবধান পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারে। অতএব আলোচ্য সুরতেও চুরির দোষে দূষিত গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্যে যে ব্যবধান হয় সে পরিমাণ মূল্য ক্রেতা ফেরত নিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوْبِ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ الخ : গোলামের হাত কাটা বা তার উপর প্রাণদণ্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায়। আর কোনো জিনিস ওয়াজিব হলেই তা অস্তিত্ব লাভ করে। ওয়াজিব হওয়ার কারণ যেহেতু বিক্রেতার কাছে পাওয়া গেছে, তাই অস্তিত্ব লাভটাও যেন তার কাছে হয়েছে। অতএব যেন বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থাতেই গোলামটিকে হত্যা করা হয়েছে কিংবা তার হাত কাটা হয়েছে। সুতরাং হত্যার ক্ষেত্রে গোলামটি যেন বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তই হয়নি; বরং বিক্রয়চুক্তির সময় তার অস্তিত্বই ছিল না। আর বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়াতে তাতে কব্জাও হয়নি। যখন কব্জা হয়নি, তখন ক্রেতা তার দেওয়া মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নিয়ে নেবে।

এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি গোলাম অপহরণ করল। গোলামটি তার কাছে থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করল কিংবা ডাকাতি করল বা মুরতাদ হয়ে গেল। এরপর অপহরণকারী গোলামটিকে তার মালিকের কাছে ফেরত দিল। মালিকের কাছে আসার পর তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলো। এ সুরতে মালিকের কব্জায় থাকা অবস্থায় গোলামটির প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলেও কিংবা হাত কাটা হলেও যেহেতু হত্যার কারণ অপহরণকারীর কব্জায় থাকাকালে পাওয়া গেছে, তাই মালিক অপহরণকারী থেকে পূর্ণ মূল্য উসুল করবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হলেও কিংবা হাত কাটা হলেও এর কারণ যেহেতু বিক্রেতার কাছে পাওয়া গেছে, তাই ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পূর্ণ মূল্য উসুল করবে।

قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَمْنُوْعَةٌ : সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে সম্পর্কে গ্রন্থকার (র.) বলেন, গর্ভবতী দাসীর যে মাসআলাটি উল্লিখিত হয়েছে তা সর্বস্বীকৃত নয়। আর সর্বস্বীকৃত মাসআলা দ্বারাই উদাহরণ পেশ করা যায়। উল্লিখিত অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সেক্ষেত্রেও ক্রেতা বিক্রেতা থেকে দাসীর পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.) গর্ভবতী দাসীর মাসআলায়ও সাহেবাইন (র.)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, সুতরাং তা দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে দলিল দেওয়া চলে না।

وَلَوْ سَرَقَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ فَقُطِعَ بِهِمَا عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِدُوْنِ رِضَاءِ الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ، وَيَرْجِعُ بِرُبُعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ فَبِثَلٰثَةِ الْأَرْبَاعِ، لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْأٰدَمِيِّ نِصْفُهُ، وَقَدْ تَلِفَتْ بِالْجِنَايَتَيْنِ، وَفِيْ إِحْدٰهُمَا الرُّجُوْعُ فَيَتَنَصَّفُ، وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِيْ ثُمَّ قُطِعَ فِيْ يَدِ الْأَخِيْرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ عِنْدَهُ، كَمَا فِي الْاِسْتِحْقَاقِ، وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ الْأَخِيْرُ عَلٰى بَائِعِهِ، وَلَا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلٰى بَائِعِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ "وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِيْ" يُفِيْدُ عَلٰى مَذْهَبِهِمَا لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ، وَلَا يُفِيْدُ عَلٰى قَوْلِهِ فِي الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْاِسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوْعَ .

অনুবাদ : যদি বিক্রীত গোলাম বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় চুরি করে, এরপর ক্রেতার কব্জায় এসেও চুরি করে এবং উভয় চুরির প্রেক্ষিতে হাত কাটা যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে আমাদের উল্লিখিত নিয়মে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [ক্রেতার কাছে সৃষ্ট] নতুন দোষের কারণে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া তাকে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে না। তবে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। যদি বিক্রেতা তাকে ফেরত গ্রহণ করে, তাহলে [ক্রেতা] তিন-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। কেননা, মানুষের হাত তার অর্ধেক [এর সমতুল্য]। আর [গোলাম] তা হারিয়েছে দুই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ; যার একটির বিপরীতে ক্ষতিপূরণ ফেরত হবে। সুতরাং অর্ধেক মূল্য দুই অর্ধেকে বিভক্ত হবে। যদি [বিক্রেতার কব্জায় থাকাকালে চুরি করার পর গোলামের মালিকানা] কয়েক হাত বদল হয় এবং সর্বশেষ ব্যক্তির অধিকারে থাকা অবস্থায় [হাত] কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতাগণ একে অপরের কাছ থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে [এবং গোলাম ফেরত দেবে]; যেমন দাবিদার প্রমাণিত হলে হয়ে থাকে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বশেষ ব্যক্তি তার বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেবে, কিন্তু তার বিক্রেতা উপরস্থ বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, [তাঁদের মতে] এটা দোষের পর্যায়ভুক্ত। জামে সগীরের ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য– 'যদি ক্রেতা না জানে' তা সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব মতে ঠিক আছে। কেননা, দোষ সম্পর্কে অবগতি [সত্ত্বেও পণ্য গ্রহণ করা] দোষের প্রতি সম্মতি বলে গণ্য। বিশুদ্ধ অভিমত অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব মতে তা কার্যকরী নয়। কেননা, দাবিদার সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে অবগতি ফেরত দানকে বাধাগ্রস্ত করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ سَرَقَ فِيْ يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ فَقُطِعَ الخ : যদি বিক্রীত গোলাম বিক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় একবার চুরি করে, এরপর ক্রেতার কব্জায় এসেও চুরি করে এবং উভয় চুরির প্রেক্ষিতে তার হাত কাটা যায়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতা হাতকাটা গোলামটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। তবে উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ চুরির দোষে

দূষিত গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মূল্যে যে ব্যবধান হয় ক্রেতা সে পরিমাণ মূল্য বিক্রেতা থেকে ফেরত নিতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও ক্রেতা হাতকাটা গোলামটি বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ফেরত দিতে পারবে না। কেননা, ক্রেতার কাছে আসার পর গোলামটির মাঝে একটি নতুন দোষ সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হলো চুরি করা এবং হাত কাটা যাওয়া। আর পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ক্রেতার কব্জায় থাকা অবস্থায় বিক্রীত-পণ্যে নতুন কোনো দোষ সৃষ্টি হলে পুরাতন দোষের কারণে ক্রেতা পণ্য ফেরত দিতে পারবে না। তবে পুরাতন দোষের কারণে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। কেননা, মানুষের হাত তার অর্ধেকের মূল্য রাখে। আর তা কাটা গেছে দুই চুরির কারণে। তন্মধ্যে একটি চুরি পাওয়া গেছে বিক্রেতার কাছে, আরেকটি পাওয়া গেছে ক্রেতার কাছে। ক্রেতা বিক্রেতার কাছে করা চুরির বিপরীতে শুধু ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। আর এক চুরির বিপরীতে আসে অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ গোলামের পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ। তাই ক্রেতা বিক্রেতা থেকে এক-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে।

তবে বিক্রেতা যদি তাকে ফেরত গ্রহণে সম্মত হয়, তাহলে ক্রেতা তিন-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত নেবে। ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় চুরি করার বিপরীতে পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ক্রেতার পক্ষে থেকে যাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ ক্রেতা পাবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِىْ ثُمَّ قُطِعَ فِىْ يَدِ الْأَخِيْرِ الخ : যদি বিক্রেতার কব্জায় থাকাকালে চুরি করার পর গোলামের মালিকানা কয়েক হাত বদল হয় এবং সর্বশেষ ব্যক্তির অধিকারে থাকা অবস্থায় তার হাত কাটা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতাগণ একে অপরের কাছ থেকে পূর্ণ মূল্য ফেরত নেবে এবং গোলাম ফেরত দেবে; যেমন দাবিদার প্রমাণিত হলে হয়ে থাকে। শাফেয়ী ফিক্হবিদদের অনেকের মতও এটি। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা [হাত কাটা] দোষের পর্যায়ভুক্ত। আর বিক্রেতার কাছে থাকা দোষের কারণে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারে। কিন্তু ক্রেতার নিজস্ব হস্তক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি ফেরত দান অসাধ্য হয়, তাহলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারে। আলোচ্য মাসআলায় সর্বশেষ বিক্রেতার মালিকানা থেকে গোলামটি বের হওয়ার সময় হাতকাটার দোষ থেকে মুক্ত ছিল। এখন ফেরত আসলে দোষযুক্ত অবস্থায় ফেরত আসবে। তাই বিক্রেতাকে ফেরত দান অসাধ্য। তবে এ অসাধ্যতার জন্য সর্বশেষ ক্রেতার নিজস্ব হস্তক্ষেপ দায়ী নয়; বরং বিক্রেতার কাছে থাকা দোষই এর জন্য দায়ী। তাই সর্বশেষ ক্রেতা উল্লিখিত নিয়মে অর্থাৎ চোর গোলাম এবং যে গোলাম চোর নয় উভয়ের মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান হয়, সে পরিমাণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার বিক্রেতা থেকে ফেরত নেবে। কিন্তু এ বিক্রেতা তার উপরস্থ বিক্রেতা থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, বিক্রেতাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার উপরস্থ বিক্রেতাকে গোলামটি তাদের নিজস্ব হস্তক্ষেপের কারণে ফেরত দেওয়া অসাধ্য। আর নিয়ম হলো, ফেরত দিতে না পারার জন্য নিজস্ব কর্ম দায়ী হলে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পায় না।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ "وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِىْ" يُفِيْدُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, জামে সগীরের ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে বলেছেন, وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِىْ অর্থাৎ 'বিক্রেতার কাছে থাকাকালে গোলামটি চুরি করেছে এ বিষয়টি ক্রেতা ক্রয়কালে জানতে পারেনি' এ বক্তব্যটি সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব অনুসারে ঠিক আছে। কারণ, তাঁদের মতে গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়া একটি দোষ। আর দোষ সম্পর্কে অবগতি সত্ত্বেও ক্রয় করা কিংবা কব্জা করা দোষের প্রতি সম্মতির প্রমাণ। আর নিয়ম হলো, ক্রেতা দোষের প্রতি সম্মত থাকলে ক্ষতিপূরণও ফেরত পায় না এবং পণ্য ফেরতও দিতে পারে না। তাই অবগতি ছাড়া যদি ক্রেতা ক্রয় করে, তাহলেই শুধু ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেহেতু গোলামের হাত কর্তনযোগ্য অথবা প্রাণদণ্ডযোগ্য হওয়াকে দোষ মনে করেন না, তাই এ বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তাঁর মতে এটা দাবিদার বের হওয়ার পর্যায়ভুক্ত। আর দাবিদার সম্পর্কে অবগতি সত্ত্বেও ক্রয় করা হলে তা ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া কিংবা পণ্য ফেরত দেওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْعُيُوْبَ بِعَدَدِهَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : لَا يَصِحُّ الْبَرَاءَةُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْحُقُوْقِ الْمَجْهُوْلَةِ لَا يَصِحُّ، هُوَ يَقُوْلُ إِنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْلِيْكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَتَمْلِيْكُ الْمَجْهُوْلِ لَا يَصِحُّ، وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيْ ضِمْنِهِ التَّمْلِيْكُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيْمِ، فَلَا تَكُوْنُ مُفْسِدَةً، وَيَدْخُلُ فِي هٰذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُوْدُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : لَا يَدْخُلُ فِيْهِ الْحَادِثُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (رحـ)، لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ، وَلِأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّ الْغَرَضَ إِلْزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ، وَذٰلِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنِ الْمَوْجُوْدِ وَالْحَادِثِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো গোলাম বিক্রি করে এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে দায়মুক্তির শর্ত আরোপ করে, তাহলে কোনো দোষের কারণে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার ক্রেতার থাকবে না; যদিও বিক্রেতা নাম ধরে ধরে দোষের উল্লেখ না করে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয়। কারণ, তাঁর মাযহাব মতে অজ্ঞাত অধিকার থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, দায়মুক্তির মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে, তাই তা প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। আর অজ্ঞাত জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। আমাদের দলিল হলো, [দায়মুক্তির অর্থ হলো অধিকার রহিত করা, আর] অধিকার রহিতকরণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না; যদিও তাতে পরোক্ষভাবে মালিকানা প্রদানের দিক রয়েছে। কারণ, এ ক্ষেত্রে [কোনো কিছু] অর্পণ করার প্রয়োজন হয় না। তাই এ ধরনের অজ্ঞতা চুক্তি বিনষ্টকারী নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে এ দায়মুক্তকরণের মাঝে বর্তমান দোষ এবং কব্জার আগে সৃষ্ট দোষ অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাতে নতুন সৃষ্ট দোষ অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটা ইমাম যুফার (র.)-এরও অভিমত। কেননা, দায়মুক্তকরণ তৎকালে বিদ্যমান দোষকে অন্তর্ভুক্ত করে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, [দায়মুক্তকরণ দ্বারা] উদ্দেশ্য হলো ক্রেতা কর্তৃক নিজের দোষমুক্ত দ্রব্য লাভের অধিকার রহিতকরণের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তিকে অবশ্য সাব্যস্ত করা। আর তা হয় তৎসময়ে বিদ্যমান ও পরবর্তীতে নতুন সৃষ্ট উভয় প্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তকরণের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি গোলাম বিক্রি করে এবং বিক্রয়কালে সর্বপ্রকার দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে আর ক্রেতা তা মেনে নেয়, যেমন– বিক্রেতা বলল, এ গোলামে যদি কোনো দোষ পাওয়া যায় আমি তা থেকে মুক্ত, তার দায়দায়িত্ব আমার উপর আসবে না, তাহলে বিক্রেতা কি কি দোষ থেকে দায়মুক্ত– নাম ধরে ধরে তার উল্লেখ করুক বা না করুক, ঐ সকল দোষ সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবগতি থাকুক বা না থাকুক, ক্রেতা গোলামে কোনো দোষ পেলে গোলামটি ফেরত দিতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَصِحُّ الْبَرَاءَةُ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়–

১. প্রসিদ্ধ মত হলো, এ ধরনের দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয় অর্থাৎ দায়মুক্তির শর্ত সহকারে বিক্রয় করলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ মতটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও এটি।

২. আমাদের অনুরূপ মত অর্থাৎ দায়মুক্তি শুদ্ধ আছে এবং ক্রেতা কোনো দোষের কারণে বিক্রীত-পণ্য ফেরত দিতে পারবে না।

৩. যে সকল দোষ সম্পর্কে বিক্রেতা অবগত নেই সেগুলো থেকে দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ আছে। যেগুলো সম্পর্কে অবগত আছে সেগুলো থেকে দায়মুক্তির শর্ত করা শুদ্ধ নয়।

ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো পণ্যে দায়মুক্তির শর্ত শুদ্ধ নয়। প্রাণীর যে সব দোষ জানা নেই সেগুলো থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ। যেগুলো জানা যায় সেগুলো থেকে দায়মুক্তি শুদ্ধ নয়।–[বিনায়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪]

قَوْلُهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতটি তাঁর ঐ মূলনীতির আলোকে যে, অজ্ঞাত অধিকার থেকে দায়মুক্তকরণ শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে। এ কারণেই পাওনাদার যদি দেনাদারকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দেয় আর সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে এ দায়মুক্তকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তীতে দেনাদারকে এ দায় পরিশোধ করতে হয়। দেনাদারের প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাওয়া থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের মাধ্যমে পাওনাদার দেনাদারকে দেনার মালিক বানাতে চেয়েছে, কিন্তু দেনাদারের যেহেতু কোনো কিছুর মালিক না বনার অধিকার আছে, সেহেতু সে মালিক হওয়ার বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। যদি দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ না থাকত, তাহলে দেনাদারের প্রত্যাখ্যান দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হতো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের মাঝে মালিক বানানোর অর্থ আছে। আর অজ্ঞাত জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। অতএব ক্রেতার অজ্ঞাতসারে দায়মুক্তকরণও শুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِيْ الخ : আমাদের দলিল হলো, দায়মুক্তকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ রহিতকরণ; মালিক বানানো তার পরোক্ষ অর্থ। কেননা, দায়মুক্তকরণ শব্দযোগে [যেমন– إِبْرَاءٌ] কোনো জিনিসের মালিক বানানো শুদ্ধ নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, দায়মুক্তকরণের প্রত্যক্ষ অর্থ মালিক বানানো নয়; বরং রহিতকরণ। আর দায় রহিতকরণের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না। কেননা, অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ ঐ সব ক্ষেত্রে হয় যেখানে কিছু অর্পণ করতে হয়। আর রহিতকরণের ক্ষেত্রে যেহেতু কিছু অর্পণের ব্যাপার নেই, তাই তা ঝগড়ার কারণ হয় না। আর যে অজ্ঞতা ঝগড়ার কারণ হয় না তা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে না। অতএব দায়মুক্তকরণ বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করবে না।

قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِيْ هٰذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ الخ : গ্রন্থকার (র.) বলেন, বিক্রেতা যদি বিক্রয়কালে পণ্যের সকল দোষ থেকে দায়মুক্তির শর্ত করে, তাহলে এ শর্তের অধীনে বিক্রি করার সময় পণ্যে যে সব দোষ থাকবে এবং শর্ত করার পর কব্জার আগে যে সব দোষ নতুন সৃষ্টি হবে সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতও এটি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শর্ত করার পর কব্জার আগে সৃষ্টি হওয়া নতুন দোষগুলো শর্তের আওতায় আসবে না। এটাই ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এরও অভিমত।

–[বিনায়া, প্রাগুক্ত খণ্ড, পৃ. ১৮৬]

তাঁদের দলিল হলো, দায়মুক্তি তৎসময়ে বিদ্যমান দোষগুলোকেই শুধু শামিল করে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তির পর কব্জার আগে সৃষ্টি হওয়া দোষ তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ক্রেতা তার কারণে খেয়ার লাভ করবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ক্রেতা কর্তৃক নিজের দোষমুক্ত দ্রব্য লাভের অধিকার রহিতকরণের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি অবশ্য সাব্যস্ত করাই দায়মুক্তির শর্ত করার উদ্দেশ্য। আর তা অর্জিত হবে বিক্রয়চুক্তির সময়ের দোষ এবং পরবর্তীতে কব্জার আগে সৃষ্টি হওয়া দোষ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই। তাই বিক্রয়চুক্তির সময়ে বিদ্যমান এবং কব্জার আগে সৃষ্ট সকল দোষই দায়মুক্তির শর্তের আওতাভুক্ত হবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَمَمْلُوْكٍ : كَالْحُرِّ، قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيْفُ، هٰذِهِ فُصُوْلٌ جَمَعَهَا، وَفِيْهَا تَفْصِيْلٌ نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، فَنَقُوْلُ : اَلْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ بَاطِلٌ، وَكَذَا بِالْحُرِّ، لِانْعِدَامِ رُكْنِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّ هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُعَدُّ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ، وَالْبَيْعُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ فَاسِدٌ لِوُجُوْدِ حَقِيْقَةِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّهُ مَالٌ عِنْدَ الْبَعْضِ .

পরিচ্ছেদ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়

অনুবাদ : [ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে] দুই বিনিময় বস্তুর একটি অথবা উভয়টি যদি হারাম বস্তু হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। যেমন মৃত, রক্ত, মদ ও শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা। এমনিভাবে যদি বিনিময় দ্রব্যটি মালিকানাযোগ্য না হয় [তবে সে ক্ষেত্রেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে], যেমন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করা। লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী এখানে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি মাসআলাকে একত্রে আলোচনা করেছেন এবং এতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা এর বিবরণ দিব। আমাদের কথা এই যে, মৃত ও রক্তের বিনিময়ে [কোনো কিছু] বিক্রয় করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। এমনিভাবে স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময় বানালেও তা বাতিল হবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের মূল রুকন অনুপস্থিত। আর তা হচ্ছে মালের বিনিময়ে মাল লেনদেন করা, অথচ এগুলো কারো কাছেই মাল বলে গণ্য নয়। পক্ষান্তরে মদ ও শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা ফাসিদ। [বাতিল নয়।] কেননা, এতে বিক্রয়ের মূল রুকন তথা "মাল দ্বারা মালের বিনিময়" এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা এদুটো বস্তু কোনো কোনো [অমুসলিম সম্প্রদায়]-এর মতে মাল রূপে বিবেচিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : ক্রয়-বিক্রয় প্রধানত দু'প্রকার, বৈধ ক্রয়-বিক্রয় ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়। বৈধ ক্রয়-বিক্রয় আবার দু'প্রকার, লাযেম ও গায়রে লাযেম তথা যা অনিবার্য এবং যা অনিবার্য নয়। পিছনের অধ্যায়গুলোতে বৈধ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের বিশদ বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় মোট চার প্রকার–

১. বাতিল ক্রয়-বিক্রয়,

২. ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়,

৩. মুলতবি ক্রয়-বিক্রয়,

৪. মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়।

বাতিল ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি : هُوَ بَيْعٌ مَا لَا يَكُوْنُ صَحِيْحًا أَصْلًا وَ وَصْفًا অর্থাৎ, যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবে অবৈধ, তাকে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

অন্যমতে اَلْبَاطِلُ مَا لَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا بِأَصْلِهِ وَ وَصْفِهِ অর্থাৎ, যে ক্রয়-বিক্রয় মূলগত ও গুণগত কোনভাবে শরিয়তসম্মত নয় তাকে বাতিল ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

কেউ কেউ এভাবে সংজ্ঞা বর্ণনা করেন যে, كُلُّ مَا أَوْرَثَ خَلَلًا فِيْ رُكْنِ الْمَبِيْعِ فَهُوَ مُبْطِلٌ অর্থাৎ, যা বিক্রীত দ্রব্যের মাঝে সমস্যা সৃষ্টিকারী তা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে। যেমন– বিক্রয় অযোগ্য কোনো কিছু বিক্রয় করা। যেমন– মৃতজন্তু, মদ, মুদাব্বার দাস ইত্যাদি বিক্রয় করা অথবা অস্তিত্বহীন কোনো কিছু বিক্রয় করা।

ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি : هُوَ مَا يَكُوْنُ صَحِيْحًا أَصْلًا لَا وَصْفًا অর্থাৎ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় এমন ক্রয়-বিক্রয়কে, যা মূলগতভাবে বিশুদ্ধ, তবে গুণগতভাবে বিশুদ্ধ নয়।

কেউ কেউ বলেন, هُوَمَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا بِأَصْلِهِ دُوْنَ وَصْفِهِ অর্থাৎ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় এমন ক্রয়-বিক্রয়কে, যা মূলগতভাবে বৈধ, তবে গুণগতভাবে নয়। এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, كُلُّ مَا أَوْرَثَ خَلَلًا فِيْ غَيْرِ رُكْنِ الْمَبِيْعِ فَهُوَ مُفْسِدٌ অর্থাৎ, বিক্রীত দ্রব্য ছাড়া অন্য বিষয়ের সমস্যা সৃষ্টিকারীকে ফাসেদকারী বলা হয়। আর যে বিক্রয়ে এরূপ বিষয় পাওয়া যায় তাকে ফাসিদ বিক্রয় বলা হয়। যেমন– আদান-প্রদানের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা ভোগ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করা অথবা শর্তহীন ক্রয়-বিক্রয় শর্তযুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি। যেমন– হস্তান্তরযোগ্য মালামাল বিক্রয় করা, পলাতক ক্রীতদাসকে বিক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে অযৌক্তিক শর্ত যুক্ত করা। যেমন– কেউ বলল, আমি তোমার কাছে বকরিটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, এর দুধ আমি ভোগ করব।

মওকুফ তথা মুলতবি ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি :

وَهُوَ بَيْعٌ مَا يَكُوْنُ صَحِيْحًا أَصْلًا وَ وَصْفًا لٰكِنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلٰى إِجَازَةِ الْاٰخَرِ عَنِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ .

মওকূফ ক্রয়-বিক্রয় বলতে এমন ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয় যা মূলগত ও গুণগতভাবে বিশুদ্ধ, তবে তা কার্যকর হওয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতির উপর নির্ভরশীল। যেমন– কোনো ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে দেওয়া। এ বিক্রয়ের বৈধতা মনিবের অনুমতির উপর নির্ভরশীল, তদ্রূপ নাবালক শিশু বা কিশোরের কোনো ক্রয়-বিক্রয় তার পিতার অনুমতির উপর নির্ভরশীল।

মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয় পরিচিতি : هُوَ مَا يَصِحُّ أَصْلًا وَ وَصْفًا لٰكِنْ يَتَّصِلُ مَعَهُ فِعْلٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়, এমন ক্রয়-বিক্রয়কে যা মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবে বিশুদ্ধ, তবে তাতে অন্য কোনো নিষিদ্ধ কর্ম যুক্ত হয়ে যায়। যেমন– জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা।

উল্লিখিত ক্রয়-বিক্রয়সমূহের হুকুম :

১. **বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** এর দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। দখলের আগেও নয় এবং দখলের পরেও নয়। সুতরাং কেউ যদি মৃত লাশের বিনিময়ে ক্রীতদাস ক্রয় করে এবং তাকে দাসত্ব মুক্ত করে দেয়, তাহলে দাস তার মালিকানায় আসবে না এবং দাস মুক্তও হবে না।

২. **ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্য দখলে [কব্জায়] এলে ক্রেতার মালিকানা লাভ হয়, দখলের আগে মালিকানা লাভ হয় না। উদাহারণস্বরূপ কেউ একটি ক্রীতদাস মদের বিনিময়ে ক্রয় করল, অতঃপর ক্রীতদাস তার দখলে আসার পর তাকে আজাদ করে দিল, তাহলে তার মালিকানা নিশ্চিত হবে এবং আজাদ করা কার্যকর হবে। তবে ক্রেতাকে ক্রীতদাসের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা, তার দেওয়া মদ মাল নয় এবং এ কারণেই তার ক্রয় ফাসিদ হয়েছে।

৩. **মওকূফ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** মওকুফ বা মুলতবি ক্রয়-বিক্রয় এক পর্যায়ে অর্থাৎ অনুমতি পাওয়ার পর মালিকানা নিশ্চিত করে। অনুমতি পাওয়ার আগে মালিকানা লাভ হয় না এবং বেচাকেনাও কার্যকর হয় না।

৪. **মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম :** মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়ে মালিকানা লাভ হয়। তবে মাকরূহ হওয়ার কারণে ভিন্ন গুনাহ হয়।
ইমাম কুদূরী (র.) ও হিদায়ার লেখক সহীহ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা প্রথমে করেছেন, এরপর ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, সহীহ হচ্ছে আসল ও মূল বিষয়, তাছাড়া এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে– ক্রয়-বিক্রয়ে দীনি বিধি-বিধান সমুন্নত রাখা ও এর অনুসরণের মাধ্যমে যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করা। আর এসবই সহীহ ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় তো দীনি বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। আর ফাসিদ লেনদেনের দ্বারা যদিও এক পর্যায়ে মৌলিক উদ্দেশ্য তথা মালিকানা লাভ হয়, তবু এর দ্বারা কোনো পূর্ণতা অর্জিত হয় না। কেননা, এর দ্বারা বিক্রীত দ্রব্যে বিক্রেতার অধিকার ও ক্রেতার দ্রব্যের মূল অধিকার রহিত হয় না, বরং প্রত্যেকের জন্য ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখান করা ওয়াজিব।

জ্ঞাতব্য : এ পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু এতে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের আরো তিন প্রকার যথা বাতিল, মাকরূহ ও মওকূফ সবই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের হেতুগুলো ব্যাপক। ফলে এটি ব্যাপকভাবে সমাজে সংঘটিত হয়, তাই এ পরিচ্ছেদের শিরোনাম ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এ পরিচ্ছেদের কোথাও কোথাও বাতিল এর স্থলে ফাসিদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও প্রকৃতার্থে আবার কোথাও বাতিলের স্থলে রূপকার্থে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যদি বিক্রয়ের মাল ও বিনিময় মূল্যের কোনো একটি অথবা উভয়টি হারাম বস্তু হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হবে, যেমন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর ও মদের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করল এবং এগুলোকে বিনিময় মূল্যরূপে নির্ধারণ করল। হেদায়ার মুছান্নেফ (র.) [লেখক] বলেন, এসবগুলোর বিক্রয়কে ইমাম কুদূরী (র.) ফাসিদ বিক্রয় বলেছেন। সম্ভবত তিনি ফাসিদ শব্দটিকে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করেছেন, যাতে ফাসিদ ও বাতিল উভয় প্রকার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তার বর্ণিত সবগুলো ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ নয়; বরং এর কয়েকটি ফাসিদ এবং কয়েকটি বাতিল। লেখক বলেন, এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিবরণটি হচ্ছে যদি মৃতজন্তু অথবা রক্ত অথবা কোনো স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে অন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহলে লেনদেনটি বাতিল সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ লেনদেনটির বৈধতার কোনো সুযোগ নেই।

কেননা, এতে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল রুকন অনুপস্থিত। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল রুকন হচ্ছে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা।" যেহেতু উপরিউক্ত তিনটি বস্তু কোনো ধর্ম মতেই মাল বলে স্বীকৃত নয়। অতএব এখানে মালের বিনিময়ে মাল হচ্ছে না; বরং মাল বলে স্বীকৃত নয় এমন কিছুকে মালের বিনিময়ে মেনে নেওয়া হচ্ছে।

সাধারণভাবে মাল-সম্পদ বলা হয় এমন কিছুকে, যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং তা সংরক্ষণযোগ্য। রক্ত ও মৃতজন্তু কোনোটার প্রতি মানুষের কোনো আকর্ষণ নেই এবং এগুলো সংরক্ষণযোগ্য নয়। তাই এগুলোতে মালের সংজ্ঞা কার্যকর নয়। অতএব ক্রয়-বিক্রয়ের রুকন এ ক্রয়ের মধ্যে অনুপস্থিত। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে মূল রুকন অবিদ্যমান থাকে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং রক্ত, মৃত ও স্বাধীন ব্যক্তি বিনিময় হওয়াতে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয় করা হলে সে ক্রয় / বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের হাকীকত ও মূল রুকন [মালের বিনিময়ে মাল হওয়া] বিদ্যমান আছে। মদ ও শূকর ইসলামের দৃষ্টিতে মাল না হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে তা মাল হিসেবে বিবেচিত। উল্লেখ্য যে, মালের স্বীকৃতি শুধুমাত্র ইসলামি দৃষ্টিতে হতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই; বরং কোনো না কোনো ধর্মের বিধান মতে তা মাল রূপে বিবেচিত হলেই তা বিনিময়যোগ্য হয়ে যাবে। মদ ও শূকর অমুসলিম নাগরিকদের কাছে মাল, তাই এখানে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "মাল দ্বারা মালের বিনিময়" বিদ্যমান। অতএব বিক্রয়ের হাকীকত তথা মূল রুকনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোনো মুসলমানের পক্ষে শূকর কিংবা মদ আদান-প্রদান করা সম্ভব নয়। ফলে এটা غَيْرُ مَقْدُوْرِ التَّسْلِيْمِ وَالتَّسَلُّمِ - "আদান-প্রদান করার অযোগ্য" হয়ে গেছে। আর বেচা-কেনার মধ্যে আদান-প্রদানের অযোগ্য কোনো দ্রব্য থাকলে সেই বেচা-কেনা ফাসিদ হয়ে যায়। অতএব কিতাবে বর্ণিত মদ ও শূকরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণিত মাসআলায় মদ ও শূকরকে পণ্যের মূল্য হিসেবে উল্লেখ করে তার বিধান পেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মদ ও শূকরকে যদি বিক্রীত-পণ্য করা হয়, আর তার মূল্য টাকা-পয়সাকে নির্ধারণ করা হয়। তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

বর্ণিত মাসআলা এবং এ মাসআলার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, মদকে যদিও বা কোনো সম্প্রদায়ের নিকট মাল বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু ইসলামি শরিয়ত মদকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। এটাকে বিক্রীত পণ্যরূপে গ্রহণ করা হলে এটি মুখ্য বিষয়ে পরিগণিত হয় এবং কাম্য বস্তু হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী মাসআলায় মদ ও শূকরকে বিনিময়মূল্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই সেই অবস্থাটি ফাসিদ। কিন্তু এ মাসআলায় মদ ও শূকর পণ্যরূপে উপস্থাপিত হওয়াতে এ বিক্রয়চুক্তি বাতিল।

উল্লিখিত মাসআলাগুলোতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হওয়ার দলিল হলো এই– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ বলেছেন–
ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُعْطِيَ بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ الخ

উক্ত হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিবসে আমি সেই ব্যক্তিকে আসামী করব যে, কোনো স্বাধীন লোককে বিক্রয় করে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ মদের সাথে জড়িত দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করেন, এদের মধ্যে বিক্রয়কারী এবং এর মূল্য ভোগকারীও রয়েছে।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَجَمَّلُوْهَا فَبَاعُوْهَا فَاَكَلُوْا ثَمَنَهَا অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

শেষোক্ত দুটি হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হারাম দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন, এ থেকে এও বুঝা যায় যে, হারাম দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম এবং এর মূল্য ভোগ করাও হারাম।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাসআলায় মৃত জন্তু দ্বারা মাসআলায় এরূপ প্রাণী উদ্দেশ্য, যার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পক্ষান্তরে যে জন্তু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা গর্তে পতিত হয়ে মারা গেছে, তার বিক্রয় যদি অমুসলিম নাগরিকদের মাঝে সংঘটিত হয়, তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় তাদের জন্য বৈধ। কেননা এরূপ মৃতজন্তু অমুসলিমদের কাছে মাল বলে গণ্য। আর কোনো মুসলমান তাকে পণ্যমূল্য বানালে তখন বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

وَالْبَاطِلُ لَا يُفِيْدُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ فِيْهِ يَكُوْنُ أَمَانَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّ الْعَقْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَبَقِيَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَكُوْنُ مَضْمُوْنًا، لِأَنَّهُ لَا يَكُوْنُ أَدْنٰى حَالًا مِنَ الْمَقْبُوْضِ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَ قِيْلَ : اَلْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَالثَّانِيْ قَوْلُهُمَا، كَمَا فِيْ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَالْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ عِنْدَ اِتِّصَالِ الْقَبْضِ بِهِ وَيَكُوْنُ الْمَبِيْعُ مَضْمُوْنًا فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ فِيْهِ، وَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح)، وَسَنُبَيِّنُهُ بَعْدَ هٰذَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَكَذَا بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِّ بَاطِلٌ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَمْوَالًا فَلَاتَكُوْنُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ .

অনুবাদ : বাতিল বিক্রয়দ্রব্য সত্তার মালিকানা এবং তাসাররুফ তথা পণ্যে ক্রেতার অধিকার চর্চার মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর বাতিল বিক্রয়ের মধ্যে যদি ক্রেতার হাতে বিক্রীত পণ্য বিনষ্ট হয় তবে কোনো কোনো মাশায়েখের মতে সেটা আমানত বলে গণ্য হবে। [অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।] কেননা, বিক্রয়চুক্তিটি অগ্রহণযোগ্য, সুতরাং ক্রেতার কব্জা মালিকের অনুমতি-ক্রমে বহাল রয়েছে। পক্ষান্তরে কারও কারও মতে বস্তুটি আর্থিক দায়যুক্ত হবে। কেননা, এটাতো সেই পণ্যের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়, যেটাকে কেবল ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ করে কব্জা করা হয়। কেউ কেউ বলেন, প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত, আর দ্বিতীয়োক্ত সিদ্ধান্তটি সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত। যেমন উম্মে ওলাদ ও মুদাব্বারের ক্ষেত্রে, যা আমরা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বর্ণনা করব। ফাসিদ বিক্রয়-চুক্তির সাথে ক্রেতার দখল যুক্ত হলে তখন তা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করে, আর এ ধরনের বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্যটি ক্রেতার হাতে আর্থিক দায়যুক্ত অবস্থায় থাকে। এতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্নমত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ের পর আমরা তা আলোচনা করব। এমনিভাবে মৃত, রক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। কেননা, এগুলো মাল নয়, সুতরাং তা বিক্রয়-পাত্র হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে বাতিল ও ফাসিদ বিক্রয়-চুক্তির হুকুম এবং এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, লেখক (র.) বলেন, বাতিল বিক্রয়চুক্তি দ্বারা বিক্রীত পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ক্রেতা যদি উক্ত পণ্য কব্জা করে দখলে নেয় তবু তা ব্যবহার করা বা তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার তার নেই। তবে তার এ কব্জা কি আমানতের কব্জা, নাকি জামানতের কব্জা, এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মাশায়েখের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল মনে করেন, ক্রেতার হাতে বাতিল বিক্রয়-চুক্তির মাধ্যমে কব্জাকৃত পণ্য আমানতরূপে থাকবে। অর্থাৎ উক্ত পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতার কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁদের দলিল এই যে, বিক্রয়চুক্তিটি তো গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা বাতিল হওয়ার কারণে বিবেচনার মধ্যে পড়ে না। তবে ক্রেতা যে বিক্রীত পণ্যকে কব্জা করেছে তা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে, ক্রয়ের ভিত্তিতে নয়।

আর যে দ্রব্য অনুমতিক্রমে কজা করা হয়, তা আমানত বলে গণ্য হয়। আর আমানতের বস্তু নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, ক্ষতিপূরণ বাজার মূল্য দ্বারাও হয়, আবার ক্রয়মূল্য দ্বারাও হয়, এ মাসআলায় ক্রেতার উপর কোনোটাই প্রদান করা আবশ্যক নয়। এ মতটি পোষণ করেন আবুন নাছর ইবনে আহমদ তাওয়াবীসী। এরূপ একটি উক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান ইবনে যিয়েদ রিওয়ায়াত করেন।

পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলেন, ক্রেতার কজা দায়যুক্ত কজা হবে। অর্থাৎ ক্রেতার দখলে থাকা অবস্থায় সেই পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে উক্ত পণ্যের মতো আরেকটি পণ্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে অথবা পণ্যের বাজার মূল্য পরিশোধ করবে। এ মতটি পোষণ করেন ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী (র.)। এটা ইমাম আহমদ (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম মালিক (র.) -এরও অভিমত।

তাঁদের দলিল হচ্ছে, বাতিল বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কজাকৃত পণ্যটি কেবল ক্রয়মূল্য বলে কজা করে নেওয়া পণ্যের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের নয়; বরং তার চেয়ে উচ্চপর্যায়ের। কেননা, বাতিল বিক্রয়চুক্তির মধ্যে ক্রয় করার একটি বাহ্যিক রূপ পাওয়া গেছে, পক্ষান্তরে কেবল ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ করে কজা করে নেওয়া পণ্যটিতে ক্রয় করার বাহ্যিক রূপও পাওয়া যায়নি। আর এরূপ পণ্য বিনষ্ট হলে তাতে বাজার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, সুতরাং বাতিল বিক্রয়-চুক্তির দ্বারা কজাকৃত পণ্য বিনষ্ট হলে তাতেও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হবে।

مَقْبُوضٌ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ -এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ কারও নিকট থেকে কোনো বস্তু এ বলে নিয়ে গেল যে, আমি এটি নিয়ে গেলাম। তুমি সম্মত থাকলে দশ টাকা মূল্য দিয়ে দেব। পণ্যটি উক্ত ক্রেতার হাতে যে অবস্থায় রয়েছে সে অবস্থাকে مَقْبُوضٌ عَلٰى سَوْمِ الشِّرَاءِ বলা হয়। হিদায়ার লেখক বলেন, কারও কারও মতে, প্রথমোক্ত মতটি ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) -এর। আর দ্বিতীয়োক্ত মতটি সাহেবাইন (র.)-এর। মুদাব্বার, ও উম্মে ওলাদের বিক্রয়ের মাসআলায়ও তাদের মধ্যে এরূপ মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ মুদাব্বার কিংবা উম্মে ওলাদকে ক্রয় করে এবং এগুলো ক্রেতার কজায় থাকা অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার উপর এগুলোর ক্ষতিপূরণ দান আবশ্যক নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে এগুলোর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ক্রেতার উপর আবশ্যক। লেখক বলেন, তাদের মতবিরোধ সংক্রান্ত মাসআলার বিশদ বিবরণ ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে প্রদান করব।

লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়চুক্তির দ্বারা ক্রেতার মালিকানা হয়। অর্থাৎ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের পর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীতপণ্যকে কজা করে, তাহলে সে সেই পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় যদি বিক্রীত পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা ক্রেতার উপর দায়যুক্ত থাকবে। সাদৃশ্যশীল বস্তু হলে সদৃশ বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে আর তা না হলে বাজারমূল্য পরিশোধ করবে। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয়চুক্তির মজলিসেই পণ্য কজা করে তার বিধানও এরূপই।

লেখক বলেন, এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, ইমাম আহমদ (র.) এবং মালিক (র.) -এরও এই অভিমত। তাঁদের মতে ফাসিদ ও বাতিল একই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর সাথে ইমাম আজম (র.)-এর এ মতবিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তী অনুচ্ছেদ (اَحْكَامُ بَيْعِ الْفَاسِدِ) -এ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

লেখক বলেন, মৃত, রক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তিকে যেমন কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যায় না এবং করলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়, তদ্রূপ এগুলোকে পণ্য স্থির করা হলেও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এগুলো মাল নয়, আর যা মাল নয় এমন দ্রব্যকে বিক্রয় পাত্র বানানো যায় না। কারণ, বিক্রয়ের মধ্যে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ বিদ্যমান হওয়া আবশ্যক। অন্যথা বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ নয়।

وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِيْرِ إِنْ كَانَ قُوْبِلَ بِالدَّيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ قُوْبِلَ بِعَيْنٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، حَتّٰى يَمْلِكَ مَا يُقَابِلُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْخَمْرَ مَالٌ، وَكَذَا الْخِنْزِيْرُ مَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ، لِمَا أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بِإِهَانَتِهِ وَتَرْكِ إِعْزَازِهِ، وَفِيْ تَمَلُّكِهِ بِالْعَقْدِ مَقْصُوْدًا إِعْزَازٌ لَهُ، وَهٰذَا لِأَنَّهُ مَتٰى اِشْتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ فَالدَّرَاهِمُ غَيْرُ مَقْصُوْدَةٍ، لِكَوْنِهَا وَسِيْلَةً لِمَا أَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُوْدُ الْخَمْرُ، فَسَقَطَ التَّقَوُّمُ اَصْلًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الثَّوْبَ بِالْخَمْرِ، لِأَنَّ مُشْتَرِيَ الثَّوْبِ إِنَّمَا يَقْصِدُ تَمَلُّكَ الثَّوْبِ بِالْخَمْرِ، وَفِيْهِ إِعْزَازُ الثَّوْبِ دُوْنَ الْخَمْرِ، فَبَقِيَ ذِكْرُ الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِيْ تَمَلُّكِ الثَّوْبِ، لَا فِيْ حَقِّ نَفْسِ الْخَمْرِ، حَتّٰى فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ وَ وَجَبَتْ قِيْمَةُ الثَّوْبِ دُوْنَ الْخَمْرِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ بِالثَّوْبِ، لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ شِرَاءُ الثَّوْبِ بِالْخَمْرِ، لِكَوْنِهِ مُقَايَضَةً.

অনুবাদ : অনির্ধারিত মুদ্রা তথা দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে যদি মদ ও শূকর বিক্রয় করা হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। আর যদি তা সুনির্দিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। ফলে এর বিনিময়রূপে নির্ধারিত বস্তুটিতে [মূল্য আদায় করার শর্তে] মালিকানা অর্জিত হবে; যদিও মদ ও শূকর মালিকানাধীন হয় না। মাসআলাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে– মদ ও শূকর জিম্মী [তথা অমুসলিম] সম্প্রদায়ের কাছে মাল বলে গণ্য। তবে [শরিয়তের দৃষ্টিতে] তা মূল্যমানযোগ্য নয়। কেননা, শরিয়ত এগুলোর প্রত্যেকটিকে তুচ্ছজ্ঞান করতে এবং মর্যাদাহীন মনে করতে আদেশ দিয়েছে। অথচ বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে মুখ্য ও উদ্দিষ্টরূপে মালিক হলে এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া হয়। আর মর্যাদা দানের ব্যাপারটি এভাবে ঘটে যে, যখন কেউ এ দু'টিকে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে, তখন মুদ্রাগুলো বিনিময়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য হয় না। কেননা, এগুলো জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর উদ্দেশ্য হয় মদ। ফলে তা মোটেও মূল্যমানযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে মদের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় করার মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম। কেননা, কাপড় ক্রয়কারী তো কেবল মদের বিনিময়ে কাপড়ের মালিক হতে চায়। আর এতে কাপড়কে মর্যাদা দান করা হয়, মদকে নয়। ফলে কাপড়ের মালিকানা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মদের উল্লেখ বিবেচ্য হবে। মদের আপন সত্তার ক্ষেত্রে তা ধর্তব্য নয়। ফলে [বিনিময় মাধ্যমরূপে] মদের উল্লেখ ফাসিদ হবে এবং মদের পরিবর্তে কাপড়ের বাজার মূল্য ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ কাপড়কে বিনিময় মাধ্যম করে মদ বিক্রয় করলে

একই বিধান প্রযোজ্য। কেননা, এখানে মদের বিনিময়ে কাপড় ক্রয় বিবেচ্য হবে। কারণ, এটি পণ্য বিনিময় মূলক বিক্রয়চুক্তি [যাতে উভয় বিনিময়কে মূল্য এবং পণ্য বিবেচনা করা যায়। তাই আমরা এখানে কাপড়কে পণ্য বিবেচনা করেছি বিক্রয়চুক্তিটি বৈধ করার জন্য]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য অংশে লেখক বলেন, মদ ও শূকরকে দুভাবে লেন-দেন করা যায়–

১. হয়ত এগুলোকে অনির্ণয়যোগ্য বস্তু তথা মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করা হবে। উল্লেখ্য যে, সোনা-রূপা হচ্ছে সৃষ্টিগতভাবে অনির্দিষ্ট ও অনির্ণয়যোগ্য। এগুলোকে মূল্যরূপে ব্যবহার করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত এগুলো বিক্রয়বস্তু নয়। বর্তমান যুগের সব ধরনের মুদ্রা যথা টাকা, রুপিয়া, ডলার ইত্যাদি সোনা-রূপার হুকুম রাখে। এগুলোকে ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় دَيْن [দাইন] বলা হয়। মোটকথা, মদ ও শূকরকে মুদ্রা দ্বারা বিনিময় করা হলে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হবে।

২. হয়ত এগুলোকে সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করা হবে। যেমন, কাপড়ের বিনিময়ে মদ ক্রয় করা হলো।
   এখানে একটি মূলনীতি প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রয়দ্রব্য (مَبِيْع) মুখ্য ও উদ্দেশ্য হয়। আর মূল্য (ثَمَن) উদ্দেশ্য হয় না। অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তির মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে– বিক্রীতব্য পণ্যটি। তার মূল্য কি হলো তা বিবেচ্য নয়।

উপরের দুটি লেন-দেনের হুকুম হচ্ছে– প্রথমোক্ত লেন-দেন তথা মুদ্রা বিনিময়ে মদের ক্রয় চুক্তিটি বাতিল, এর দ্বারা মদ ও মুদ্রা কোনোটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। দ্বিতীয়োক্ত লেন-দেন তথা কাপড়ের বিনিময়ে মদ ক্রয় চুক্তিটি ফাসিদ। এতে কাপড়ের ক্রেতা বাজার মূল্য পরিশোধের শর্তে কাপড়ের থানের মালিক হবে। তবে বিক্রেতা তার বিনিময়ে মদ কিংবা শূকরের মালিক হবে না। এরপর লেখক এ দুটি মাসআলার মাঝে যে হুকুমগত পার্থক্য, তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, মদ ও শূকর জিম্মি ও অমুসলিমদের কাছে মাল। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর কোনো মূল্যমান নেই এবং এগুলো দ্বারা কোনোরূপ সুবিধা ভোগ করা নিষিদ্ধ, শরিয়তের দৃষ্টিতে এগুলোর মূল্যমান না থাকার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে ঘৃণা ও তুচ্ছ জ্ঞান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আদেশ করেছেন যেন এগুলোকে কোনোভাবে মর্যাদা না দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী– إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ অন্য কিছু নয়। অতএব তোমরা কল্যাণ ও সফলতা লাভ করার জন্য এগুলো থেকে নিরস্ত থাক।– [সূরা মায়িদা : ৯০]

এ আয়াতে মদকে অপবিত্র ও শয়তানের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কোনো নাপাক বস্তু মর্যাদা লাভ করতে পারে না; বরং তা ঘৃণার পাত্র, শূকর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ অর্থাৎ মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের গোশ্ত তোমাদের জন্য হারাম, [সূরা মায়িদা : ৩]। বলা বাহুল্য যে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম, তা কোনোভাবেই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নয়; বরং হারাম বস্তু ঘৃণার পাত্র, সুতরাং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শূকর ও মদ ঘৃণার পাত্র এবং এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া যায় না।

মদ ও শূকরকে যদি মুদ্রার বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়, তখন মদ ও শূকর হয় বিক্রয়পণ্য, আর মুদ্রা হয় তার মূল্য। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পণ্যটি উদ্দেশ্য ও মুখ্য হয়। মূল্য উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা পণ্য সংগ্রহ করার একটি মাধ্যম ও অসিলা হিসেবে বিবেচিত। কেননা, মূল্য তথা মুদ্রা সোনা– রূপা অথবা টাকা যাই হোক না কেন তা জিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর যে বস্তু জিম্মায় ওয়াজিব হয়, তা উদ্দেশ্য হয় না। মোটকথা, এটাই প্রমাণিত হলো যে, মুদ্রা ও মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ে উদ্দেশ্য ও মুখ্য হয় না। বরং উদ্দেশ্য হয় বিক্রয়দ্রব্য বা পণ্য। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মুদ্রা তথা দিরহাম ও দিনার হচ্ছে গৌণ বিষয় রূপে বিবেচিত। আর মদ ও শূকর হলো মুখ্য ও উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মদ ও শূকরকে উদ্দেশ্য করা হলে

এগুলোকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ এগুলোকে মর্যাদা দেওয়া শরিয়তে নিষিদ্ধ। এগুলোকে মর্যাদাহীন করার উদ্দেশ্যে [শরিয়ত কর্তৃক] মূল্যহীন ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং যখন এগুলো মূল্যহীন ও ঘৃণার বস্তু হিসেবে বিবেচিত, তখন এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় মূল্যহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হলো। আর মূল্যহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়। তাই উপরিউক্ত প্রথম অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, বাতিল বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। তাই এখানেও কোনো বিনিময়ের মালিকানা লাভ হবে না।

পক্ষান্তরে মদ ও শূকরের বিনিময়ে যদি কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু [মূল্যরূপে নির্ধারিত নয় এমন] উল্লেখ করা হয়, যেমন কাপড়ের বিনিময়ে মদ অথবা শূকর উল্লেখ করা হয়, এ অবস্থায় লেন-দেন বা বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হবে। এতে মদ অথবা শূকরকে পণ্য অথবা মূল্য যে হিসেবেই উপস্থাপন করা হোক না কেন ? যদি বলা হয় কাপড় পণ্য আর মদ হচ্ছে মূল্য তাহলেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি বলা হয় মদ পণ্য আর কাপড় তার মূল্য, তবুও বিক্রয় ফাসিদ হবে বাতিল নয়। এ অবস্থায় উভয়টিকে পণ্য ও মূল্যরূপে সাব্যস্ত করা বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, এটি بَيْعُ مُقَايَضَة [পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়]। বাইয়ে মুকায়াযার মধ্যে দুই বিনিময়ের প্রত্যেকটি মূল্যও হতে পারে, আবার পণ্যও হতে পারে। সুতরাং আমরা কাপড়ের থানকে পণ্য এবং মদকে মূল্য সাব্যস্ত করব। তাহলে বিক্রয়চুক্তিতে কাপড়কে মর্যাদাদান করা হবে, মদকে নয়। কেননা, এখানে মদ কাপড় লাভ করার একটি মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই এ ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশের উপেক্ষা বা খেলাফ হয় না। অতএব বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং ফাসিদ হবে। কারণ, এতে মূল্য হলো মদ। শরিয়তের দৃষ্টিতে মদের কোনো মূল্য নেই এবং মুসলমানের জন্য এর আদান-প্রদান উভয়টিই নাজায়েজ।

মোটকথা, বিক্রয়চুক্তিতে মদ ও শূকরকে মূল্যরূপে উপস্থাপন করা ফাসিদ এবং এ কারণে বিক্রয়চুক্তিটিও ফাসিদ হবে। এ অবস্থায় বিক্রয়টি শুদ্ধ করার উপায় হচ্ছে কাপড়ের ক্রেতা মদের পরিবর্তে কাপড়ের বাজারমূল্য পরিশোধ করলে বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, যখন উভয় পণ্যকে বিনিময় মূল্য ও পণ্য আখ্যা দেওয়া যায়, তখন কাপড়কে পণ্য আর মদকে বিনিময়মূল্য কেন সাব্যস্ত করা হলো ? এর উত্তর হলো, মদকে পণ্য বিবেচনা করলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মদকে মূল্য বিবেচনা করলে বিক্রয়টি ফাসিদ হয়। সুতরাং মুসলমানের কারবারকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বিক্রয়কে বাতিল না বলে ফাসিদ বলা হয়েছে। কারণ, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধরূপ দেওয়া যায়, কিন্তু বাতিল ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধরূপ দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

قَالَ : وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ، وَمَعْنَاهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اِسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ قَدْ ثَبَتَ لِأُمِّ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ (ع) أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَسَبَبُ الْحُرِّيَّةِ اِنْعَقَدَ فِي حَقِّ الْمُدَبَّرِ فِي الْحَالِ لِبُطْلَانِ الْأَهْلِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمُكَاتَبُ اِسْتَحَقَّ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ لَازِمَةً فِي حَقِّ الْمَوْلَى، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لَبَطَلَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فَلَا يَجُوْزُ، وَلَوْ رَضِيَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ، وَالْمُرَادُ الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ دُوْنَ الْمُقَيَّدِ، وَفِي الْمُطْلَقِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ (رح)، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْعِتَاقِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাবকে ক্রয়-বিক্রয় করা ফাসিদ অর্থাৎ বাতিল। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীনতা লাভ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কারণ, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, "তাকে [মারিয়া কিবতিয়াকে] তার সন্তান স্বাধীন করে দিয়েছে।" আর মুদাব্বারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভের কারণ বর্তমানেই সাব্যস্ত যুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, মৃত্যুর পর তো মনিবের মুক্তি দানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যায়। আর মুকাতাবের এমন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ হয়েছে, যা তার মনিবের জন্য কার্যকর। যদি এদের বিক্রয় করার দ্বারা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদের প্রাপ্ত সব অধিকার বাতিল হয়ে যায়। অতএব এদের ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে না। আর মুকাতাব যদি তাকে বিক্রয় করার বিষয়টি মেনে নেয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট নীতি অনুসারে তা জায়েজ। এখানে মুদাব্বার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃশর্ত মুদাব্বার, শর্তযুক্ত মুদাব্বার নয়। নিঃশর্ত মুদাব্বার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। দাসমুক্তি অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ক্রীতদাসের আরো কয়েকটি প্রকারের বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন– উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাব।

উম্মে ওয়ালাদ বলা হয় ঐ দাসীকে, যার সাথে তার মনিব সহবাস করার ফলে সে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করেছে। মুদাব্বার দু'প্রকার– ১. মুদাব্বারে মুতলাক। ২. মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ।

১. মুদাব্বারে মুতলাক বলা হয় এমন দাসকে, যার দাসমুক্তি তথা স্বাধীনতা তার মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ যাকে তার মালিক বলেছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত।

২. মুদাব্বারে মুকাইয়্যাদ বলা হয় এমন দাসকে, যার দাস মুক্তিকে মালিক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়। যেমন মালিক বলল, অমুকের শরীর সুস্থ হলে তুমি মুক্ত। অথবা বলল, অমুক মারা গেলে তুমি মুক্ত।

মুকাতাব পরিচিতি : মোকাতাব বলা হয় এমন দাসকে, যে তার মালিকের সাথে দাসত্বমুক্তির জন্য আর্থিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যেমন কোনো দাস তার মালিককে বলল, আমি বিশ হাজার টাকা দিলে আমাকে মুক্ত করে দিবেন। আর মালিক উক্ত চুক্তি মেনে নিল। চুক্তির টাকাকে 'বদলে কিতাবাত' বলা হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ, মুকাতাব ও মুদাব্বারের ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ। লেখক বলেন, এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। অর্থাৎ ইমাম কুদূরী (র.)-এর ফাসিদ শব্দটি এখানে বাতিলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাতিল বলার কারণ হলো, এগুলোর দ্বারা কোনোরূপ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, এমনকি যদি ক্রেতা এগুলোকে কব্জাও করে নেয় তবুও নয়। কিন্তু ফাসিদ বলা হলে এ ধারণা হতো যে, এগুলোর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে না, তাই এগুলো বাতিলই হবে। উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, তার মধ্যে আজাদ হওয়ার অধিকারের আগমন অর্থাৎ উম্মে ওয়ালাদ হওয়া মাত্রই দাসী স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। এর দলিল হলো, রাসূল ﷺ তার দাসী মারিয়া কিব্‌তিয়া (রা.) সম্পর্কে বলেন, "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" পুরো হাদীসটি হচ্ছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيْمَ (مَارِيَةُ الْقِبْطِيَةِ) عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا.
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَ قُطْنِىْ)

অর্থ– রাসূল ﷺ -এর কাছে [তার পুত্র ইব্‌রাহীমের জন্মের পর] তার মা মারিয়া কিব্‌তিয়া এর স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন, তাঁর পুত্র তাকে মুক্ত করে দিয়েছে। হাদীসের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছেলে প্রকৃতই তাকে আজাদ করে দিয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর অর্থ করেছেন যে, আজাদের অধিকার দিয়েছে। এ অর্থ সকলের ঐকমত্যে গৃহীত। সারকথা হচ্ছে– এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, উম্মে ওয়ালাদের মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে দাসমুক্তির গুণ এসে গেছে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়। এ হাদীস দাউদ জাহেরী-এর বিপক্ষে দলিল। উল্লেখ্য যে, দাউদ জাহেরী উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় বৈধ মনে করেন। এমনিভাবে মুদাব্বার বিক্রি করাও বাতিল। কারণ, তার মধ্যে মুদাব্বার হওয়ার সাথে সাথে স্বাধীন হওয়ার গুণ চলে আসে। তবে তৎক্ষণাৎ দাসত্বমুক্তির উপস্থিতিকে লেখক এভাবে প্রমাণ করেন যে, মালিকের মৃত্যুর পর তার দাসমুক্ত করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে বর্তমানে তো সে দাসত্বমুক্ত নয়; বরং মালিকের মৃত্যুর পর তার মাঝে দাসমুক্ত হওয়ার গুণ আসে। তাহলে এ কথা বলা আবশ্যক হয় যে, মালিকের মৃত্যুর পর তার মাঝে দাসমুক্ত করার যোগ্যতা থাকে। অথচ মৃত্যু যে-কোনো ধরনের যোগ্যতাকে বাতিল করে। অতএব বুঝা গেল যে, মুদাব্বারের মাঝে বর্তমানেই দাসত্ব মুক্তির কারণ রয়েছে। কিন্তু তার হুকুম বিলম্বিত হয়ে তার মনিবের মৃত্যুর পরে তার কাছে আগমন করবে। অতএব এটা অসিয়তের মতো হয়ে গেল। কেননা, যাকে অসিয়ত করা হয় সে সেই অসিয়ত দ্বারা বর্তমানে অসিয়তকারীর স্থলবর্তী হবে। কিন্তু তার কার্যকারিতা হয় অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর।

মুকাতাবের ব্যাপার এই যে, মুকাতাব তার নিজের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার যোগ্যতা লাভ করে, তার এই হস্তক্ষেপ তার মুনিবের ক্ষেত্রে অবশ্য কার্যকর, কিন্তু তার নিজের ব্যাপারে কার্যকর নয়। মালিকের ব্যাপারে তার তাসাররুফ কার্যকর এ কারণে যে, মালিক তার মুকাতাবের সম্মতি ছাড়া 'বদলে কিতাবাত' তথা আর্থিক চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

পক্ষান্তরে মুকাতাব চুক্তিমতে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে মালিকের সম্মতি ছাড়াই চুক্তিটি বাতিল করতে পারে। তাই তার জন্য এ হস্তক্ষেপ-তাসাররুফ অনাবশ্যক। মুকাতাবের আপন নিয়ন্ত্রণাধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তার বিক্রয় বৈধ হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের বিক্রয় দ্বারা ক্রেতার মালিকানা প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ ক্রেতা যদি প্রকৃতই উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার ও মুকাতাবের মালিক হয়ে যায়, তাহলে উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীন হওয়ার অধিকার, মুদাব্বারের স্বাধীন হওয়ার সবব ও মুকাতাবের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সবই বাতিল ও অর্থহীন হয়ে যাবে। কেননা, উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকার প্রাপ্ত হওয়া এবং ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এ দু'য়ের মাঝে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। তদ্রূপ মুদাব্বারের মুক্ত হওয়ার কারণ ও ক্রেতার মালিকানা এবং মুকাতাবের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও ক্রেতার মালিকানা লাভ– এর মধ্যেও পরস্পর বৈপরীত্য বিদ্যমান। এমতাবস্থায় দুই বিপরীতধর্মী বিষয়ের একটি বহাল থাকবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে অপরটি তিরোহিত হবে। কেননা, এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, এ দুই বিপরীতধর্মীর একটির অস্তিত্ব অপরটির অনস্তিত্ব ঘোষণা করে। এ নিয়মানুসারে যখন ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীন হওয়ার সবব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সবই বাতিল হয়ে যাবে।

অথচ এ তিন বিষয় যে প্রমাণিত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যখন এ তিনটি প্রমাণিত হলো, তখন ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, পরস্পর বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয় একত্রিত হতে পারে না। কাজেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। আর যে বিক্রয়চুক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। অতএব উল্লিখিত দাসদের বিক্রয় বাতিল হবে।

গ্রন্থকার বলেন, মুকাতাব যদি নিজের বিক্রির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ হবে কি না? এ ব্যাপারে দু'টি রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক রিওয়ায়েত অনুসারে তা বৈধ। অন্য বর্ণনা মতে তা অবৈধ। লেখক বলেন, বৈধতার পক্ষের মতটি অধিকতর জাহির। কারণ, মুকাতাবের বিক্রয়ের অবৈধতার কারণ স্বয়ং মুকাতাবই। সে চুক্তির মাধ্যমে এ অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন সে তার নিজ অধিকার প্রত্যাখ্যান করল, তখন চুক্তি বাতিল হয়ে তার বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এর সমর্থন বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়। বর্ণনাটি হচ্ছে, হযরত আয়েশা (রা.) বনূ হিলাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির সাথে অর্থ পরিশোধের চুক্তিতে আবদ্ধা দাসী বারীরাকে তার সম্মতিক্রমে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নাওয়াদিরের রিওয়ায়েত অনুসারে মুকাতাব বিক্রয় নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। বিশুদ্ধতম অভিমত হলো নাজায়েজ। ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত হলো, বিক্রয় বৈধ। লেখক বলেন, মূল ইবারতে বর্ণিত মুদাব্বার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুদাব্বারে মুতলাক। মুকায়্যাদ নয়, মুকায়্যাদের ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, তাকে বিক্রয় করা বৈধ। মুদাব্বারে মুতলাক বিক্রয় করা হানাফী ফিকহ অনুসারে বৈধ নয়, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে মুতলাক মুদাব্বারের ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল হচ্ছে ঐ হাদীস, যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মুদাব্বার বিক্রয় করেছিলেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে তাদের যৌক্তিক দলিল, মুদাব্বারে মুতলাকের মধ্যে দাসের মুক্তিকে মালিক তার মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করেছে। মুক্ত জীবনকে কোনো বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা [যেমন- إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَانْتَ حُرٌّ - তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে মুক্ত] বিক্রয় ও দান-হেবার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং মুদাব্বারে মুতলাক তথা দাসের স্বাধীন হওয়াকে মৃত্যুর সাথে শর্তযুক্ত করা তার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

আমাদের [হানাফীদের] দলিল হলো হাদীসে রাসূল। রাসূল ﷺ বলেন, اَلْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ অর্থাৎ মুদাব্বারকে বিক্রয় ও দান করা যাবে না এবং কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে এর মালিক হবে না। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুদাব্বারকে বিক্রয় করা যায় না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব, রাসূল ﷺ নিঃশর্ত মুদাব্বারকে বিক্রয় করেননি; বরং তিনি শর্তযুক্ত মুদাব্বারকে বিক্রয় করেছিলেন। এ বিষয়ে عِتَاقٌ অধ্যায়ের اَلتَّدْبِيْرُ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

قَالَ : وَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ أَوِ الْمُدَبَّرُ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالَا : عَلَيْهِ قِيْمَتُهُمَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ، لَهُمَا أَنَّهُ مَقْبُوْضٌ بِجِهَةِ الْبَيْعِ، فَيَكُوْنُ مَضْمُوْنًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلَانِ تَحْتَ الْبَيْعِ حَتّٰى يَمْلِكَ مَايُضَمُّ إِلَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ، لِأَنَّهُ فِيْ يَدِ نَفْسِهٖ، فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيْ حَقِّهِ الْقَبْضُ، وَهٰذَا الضَّمَانُ بِالْقَبْضِ، وَلَهُ أَنَّ جِهَةَ الْبَيْعِ إِنَّمَا تَلْحَقُ بِحَقِيْقَتِهٖ فِيْ مَحَلٍّ يَقْبَلُ الْحَقِيْقَةَ، وَهُمَا لَا يَقْبَلَانِ حَقِيْقَةَ الْبَيْعِ، فَصَارَا كَالْمُكَاتَبِ، وَلَيْسَ دُخُوْلُهُمَا فِي الْبَيْعِ فِيْ حَقِّ أَنْفُسِهِمَا، وَ إِنَّمَا ذٰلِكَ لِيَثْبُتَ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيْمَا ضُمَّ إِلَيْهِمَا، فَصَارَ كَمَالِ الْمُشْتَرِيْ لَا يَدْخُلُ فِيْ حُكْمِ عَقْدِهٖ بِانْفِرَادِهٖ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الدُّخُوْلِ فِيْمَا ضَمَّهُ إِلَيْهِ ، كَذَا هٰذَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি উম্মে ওয়ালাদ অথবা মুদাব্বার ক্রেতার হস্তাধীনে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এর জন্য ক্রেতার উপর কোনো আর্থিক দায় আবশ্যক হবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতার উপর তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আজম (র.) থেকে এরূপ একটি অভিমত বর্ণিত রয়েছে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল এই যে, এটা বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার হস্তাধীনে এসেছে। সুতরাং অন্য সব বস্তুর মতো এটাও বাজারমূল্য দ্বারা দায়যুক্ত হবে। আর এটা [অর্থাৎ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়ের সুরতে ক্রেতার হস্তাধীনে আসা] এভাবে যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে; তাই তাদের সাথে বিক্রয়চুক্তিতে অন্য যেকোনো বিক্রয়পণ্য যুক্ত করা হয় তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য মুকাতাবের বিষয়টি এরূপ নয়। কারণ, মুকাতাব নিজ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তার উপর অন্যের দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর এ [উপরিউক্ত] আর্থিক দায় দখলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– বিক্রয়ের সুরতকে প্রকৃত বিক্রয়ের সাথে কেবল এমন ক্ষেত্রেই যুক্ত করা হবে, যে ক্ষেত্র প্রকৃত বিক্রয়কে গ্রহণ করতে পারে। অথচ উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার প্রকৃত বিক্রয়কে গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। ফলে এ দুটি মুকাতাবের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল। আর তাদের বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি– সেতো আপন সত্তাগত যোগ্যতা বলে নয়। এটা তো কেবল তাদের সাথে যুক্ত করা দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। সুতরাং এটা ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুর মতো হয়ে গেল, যা স্বতন্ত্রভাবে তো তার সম্পাদিত চুক্তির বিধানভুক্ত হয় না। তবে তার মালের সাথে বিক্রেতা যে মাল যুক্ত করেছে তাতে [ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য] অন্তর্ভুক্তির বিধান সাব্যস্ত হয়। আলোচ্য মাসআলাটিও তদ্রূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় সঠিক নয়। তারপরেও যদি উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারকে বিক্রয় করা হয় এবং তা ক্রেতা নিজ দখলে নিয়ে আসে তাহলে ক্রেতার দখল কোন ধরনের হবে তা উপরিউক্ত ইবারতে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উম্মে ওয়ালাদ অথবা মুদাব্বার যদি ক্রেতা ক্রয় করে তার দখলে নেওয়ার পর মারা যায় তাহলে ইমাম আজমের মতে ক্রেতার কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার উপর ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত মুদাব্বার কিংবা উম্মে ওয়ালাদের বাজার মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে। লেখক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ অভিমত বর্ণিত আছে। কিতাবের ইবারত দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বার উভয়ের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি অভিমত রয়েছে। এক মতে ক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় মুদাব্বার কিংবা উম্মে ওয়ালাদ মৃত্যুবরণ করলে তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অন্য মতে এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি এমন নয়, বরং বিশুদ্ধ কথা হলো– মুদাব্বারের ক্ষেত্রে তাঁর দু'টি মত রয়েছে। অর্থাৎ যদি মুদাব্বার ক্রেতার দখলে থাকাবস্থায় মারা যায় তাহলে এক মতে ক্রেতার ক্রয়মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্য মতে ক্রয়মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং তার উপর কোনো কিছু আবশ্যকও হবে না। উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। এতে তাঁর থেকে ভিন্ন কোনো মত বর্ণিত নেই।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন, ক্রেতার হাতে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের দখল বিক্রয়ের সুরতে হয়ে থাকে, কারণ, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যা বিক্রয়ের সুরতে কারো দখলে আসে তা বাজারমূল্য দ্বারা দায়যুক্ত থাকে। কোনো কারণে এটা যদি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ যে বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তার প্রমাণ এই যে, যদি কেউ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের সাথে অন্য ক্রীতদাস বিক্রয় করে তাহলে ক্রেতা ক্রীতদাসটির মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তার মালিক হয়ে যায়। যদি মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত না হতো, তাহলে যে ক্রীতদাস এদের সাথে যুক্তভাবে বিক্রয় করা হলো ক্রেতা তার মালিক হতো না। যেমন কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে সংযুক্ত করে দাসের সাথে মিলিয়ে বিক্রয় করা হলে ক্রেতা ক্রীতদাসটির মালিক হয় না। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তিটি বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

মোটকথা, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয়চুক্তির অধীন হয়। আর যে বস্তু বিক্রয়চুক্তির অধীন হয় তা ক্রেতার হাতে বিক্রয়ের ভিত্তিতে দখলভুক্ত থাকে। আর যে কোনো বিক্রয়ের ভিত্তিতে দখলভুক্ত বস্তু আর্থিক দায়যুক্ত থাকে। অর্থাৎ এটি কোনো কারণে ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হলে ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য হয়। যেমন ক্রয়ের মূল্য উল্লেখ পূর্বক নিয়ে যাওয়া কোনো দ্রব্য যদি ক্রেতার হস্তাধীনে থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয় তাহলে ক্রেতার উপর তার বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। কেননা, এগুলোকে বিক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, কোনো বস্তু বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা এবং এর সাথে যুক্ত অন্য বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি যদি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হওয়া কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণকে আবশ্যক করে তবে মুকাতাব ক্রেতার আয়ত্তে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাতেও বাজারমূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সাহেবাইনের মতে আবশ্যক হওয়া উচিত ছিল। অথচ সাহেবাইন (র.) মুকাতাবের ক্ষেত্রে তা বলেন না। এ পার্থক্যের কারণ কি? এর উত্তরে লেখক বলেন, মুকাতাবের নিয়ন্ত্রণ তার নিজ হাতেই থাকে। তাই তার উপর ক্রেতার দখল প্রতিষ্ঠিত হয় না, অথচ দখলের কারণেই ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়। এখানে দখলই যেহেতু প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই তার মৃত্যুতে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে না। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, দখল প্রতিষ্ঠা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সবব, কোনো বস্তু বিক্রয়চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা থাকা এবং বিক্রয়চুক্তিভুক্ত অন্য

বস্তুর উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হওয়া কোনো বস্তুর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার সবব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে- বিক্রয়চুক্তির সুরতে হাসিল হওয়া দখল কেবল সেসব মালের মধ্যে ক্ষতিপূরণকে ওয়াজিব করে, যেসব মালে বিক্রয়চুক্তির সুরতকে প্রকৃত বিক্রয়-চুক্তির সাথে যুক্ত করা যায়। প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি দ্বারা এরূপ বিক্রয়চুক্তি উদ্দেশ্য যা বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানাকে অপরিহার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। অর্থাৎ যেসব মালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেসব মালে ক্ষতিপূরণ যুক্ত হয়। কেননা, ক্ষতিপূরণ মালিকানার পরিবর্তে আসে। আমাদের আলোচ্য মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে যদিও বিক্রয়ের সুরত পাওয়া যায়, কিন্তু মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব, তাদের উপর ক্ষতিপূরণ যুক্ত হবে না। ফলে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ মুকাতাবের মতোই হয়ে গেল। মালিকানা ছাড়া কেবল বিক্রয়ের সুরত যেহেতু গ্রহণযোগ্য নয়, তাই যেন ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদকে কব্জা করল। এ ধরনের কব্জা আমানতের কব্জারূপে সাব্যস্ত হয়। তাই কব্জাকৃত ব্যক্তি বা বস্তু বিনষ্ট হলে এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ دُخُوْلُهُمَا فِى الْبَيْعِ الخ : এ বাক্য দ্বারা সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাই এগুলো ক্রেতার কব্জায় বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণও আসবে।

এর উত্তরে বলা হবে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ যেহেতু বিক্রয়ের পাত্র নয়, তাই এগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং এগুলো বিক্রয়ের অন্তর্গত হয় ঐ দ্রব্যের বা ব্যক্তির মাঝে বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যা এদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আর এরকম প্রক্রিয়া শরিয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এমনই একটি উদাহরণ যেমন : কোনো ব্যক্তি তার নিজ ক্রীতদাস ও রাশেদের দাস একত্রে রাশেদের কাছে বিক্রয় করল। তাহলে রাশেদ বিক্রেতার দাসের মূল্যের বিনিময়ে দাসটির মালিক হয়ে যাবে। এখানে বিক্রেতার দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয় বিশুদ্ধ হয়েছে। আর ক্রেতার অর্থাৎ রাশেদের দাস বিক্রয়ের মধ্যে হুকুমের মাঝে স্বীয় সত্তাগতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বরং বিক্রেতার দাসের মধ্যে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য মাসআলাতেও মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ সত্তাগতভাবে বিক্রয়ের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বরং যে দাসকে মিলিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিক্রয়ের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেহেতু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আপন সত্তাগতভাবে বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই ক্রেতা এদের কব্জা করলে সেই কব্জাও বিক্রয়ের ভিত্তিতে হলো না। বিক্রয়ের ভিত্তিতে কব্জা না হওয়াতে এটা বিক্রেতার অনুমতি নিয়ে কব্জা করা হলো। আর এ রকম কব্জাতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না যা ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبْلَ أَنْ يَصْطَادَ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ، وَلَا فِي حَظِيرَةٍ إِذَا كَانَ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِصَيْدٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، وَمَعْنَاهُ إِذَا أَخَذَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِيهَا، وَلَوْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ جَازَ، إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِأَنْفُسِهَا وَلَمْ يُسَدَّ عَلَيْهَا الْمَدْخَلُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মাছ ধরার পূর্বে বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, সে এমন দ্রব্য বিক্রয় করলো যার সে মালিক নয়। তদ্রূপ ঘেরের মাছ বিক্রয় জায়েজ নেই, যখন তা শিকার করা ব্যতীত ধরা না যায়। কারণ, এটা অর্পণ করা বিক্রেতার ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অর্থ হলো "যখন বিক্রেতা মাছ ধরে ঘেরের মধ্যে ফেলে দেয়। আর [এমতাবস্থায়] যদি বিশেষ কৌশল ব্যতীত মাছ ধরা যায়, তাহলে বিক্রয় বৈধ। তবে যদি ঘেরের মধ্যে মাছ এমনিতেই নিজে নিজে জমা হয়ে থাকে এবং ঘেরের প্রবেশ মুখ বন্ধ না থাকে [তাহলে বিক্রয় জায়েজ নয়] মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত ইবারতে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পরিচিত পদ্ধতি তথা– নিজস্ব চাষ করা মাছ ব্যতীত সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল বা পুকুর ইত্যাদিতে যেসব মাছ এমনিতে হয় তার ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরতে মাসআলা বর্ণনার পূর্বে حظيرة সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন। حظيرة -এর বাংলা প্রতিশব্দ ঘের বা চর্তুদিকে পরিবেষ্টিত বিশেষ সংরক্ষিত স্থান। যেমন পশু ধরার বিশেষ বেষ্টনী বা মাছ ধরার বিশেষ ঘের। আমাদের দেশে দু'রকম ঘের দেখা যায়। তথা–

১. নদ-নদী বা খাল-বিল থেকে নালা কেটে অদূরবর্তীস্থানে গর্ত করা যাতে নদী/ খালের মাছ সেটিতে আটকা পড়ে।
২. বাঁশের তৈরি বিশেষ বেড়ার সাহায্যে হাওড়-বিলে সংরক্ষিত মাছ ধরার স্থান।

মাসআলার স্বরূপ এই যে, মাছ ধরার পূর্বে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, বড় পুকুর ও হাওড়ের মাছ বিক্রয় করা নাজায়েজ। কেননা, এ ধরনের মাছ বিক্রয়ে দু'টি অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত নদ-নদী, খাল-বিলের মাছ কারো মালিকানাধীন নয়। সকলের জন্য এ মাছ ধরা ও খাওয়া বৈধ। মালিকানাধীন নয় এমন বস্তু বিক্রয় অবৈধ। দ্বিতীয়ত এসব মাছ বিক্রয়ের সময় অর্পণের অযোগ্য। অর্পণ-অযোগ্য বস্তুর বিক্রয় বৈধ নয়।

যদি মাছ ঘেরের মধ্যে থাকে তাহলে দু'অবস্থা–

১. বড় ঘের। যার মাছ হাতে ধরা যায় না। জাল ইত্যাদির সাহায্যে ধরা হয়।
২. ছোট ঘের বা এমন ঘের যার মাছ হাতে ধরা যায়।

যদি ঘের বড় হয় যাতে ভিন্নস্থান থেকে মাছ ঘেরে ফেলা হয়েছে এবং ঘের থেকে মাছ বের হওয়ার কোনো রাস্তা না থাকে, তবুও মাছ বিক্রয় অবৈধ। কারণ মাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন হলেও তা অর্পণ অযোগ্য।

আর যদি ঘের ছোট হয় তাহলে দু'অবস্থা–

ক. যদি এতে মাছ ধরে রাখা হয় এবং তার থেকে মাছ বের হওয়ার কোনো রাস্তা না থাকে তাহলে মাছ বিক্রয় বৈধ। কেননা, মাছ বিক্রেতার মালিকানাধীন ও অর্পণযোগ্য।
খ. ছোট ঘের যাতে আপনা-আপনি মাছ এসে গেছে কিংবা ঘের বা গর্তের মুখ খোলা থাকে এবং গমনাগমনের পথও খোলা থাকে তাহলে এ মাছ বিক্রয় অবৈধ। কেননা, বিক্রেতা মাছ জমা করার কিংবা সংরক্ষণ করার কোনো দায়িত্বই পালন করেনি। তাই এ মাছ তার মালিকানাধীন বলে সাব্যস্ত হবে না। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মালিকানাধীন নয় এমন বস্তু বিক্রয় করা নাজায়েজ। তবে যদি বিক্রেতা ঘেরের প্রবেশ মুখ বন্ধ করে ফেলে তাহলে মাছ বিক্রয় বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, যেসব অবস্থায় মাছ বিক্রয় বৈধ সেসব অবস্থায় ক্রেতার মাছ ধরার পর خيار رؤية লাভ হবে। কেননা পানির ভিতর থাকা মাছ দেখা এবং পানি থেকে উপরে তোলা মাছ দেখার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই মাছ ধরার পর ক্রেতার خيار رؤية হাসিল হবে।

নোট : যদি কেউ খাল থেকে মাছ ধরে ঘেরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে তাহলে উক্ত মাছ তার মালিকানাধীন হয়ে যায়। এতে অন্য কারো কোনো অধিকার থাকে না।

قَالَ : وَلَا بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْأَخْذِ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، وَلَا بَيْعُ الْحَمْلِ وَلَا النِّتَاجِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা অবৈধ। কেননা, তা ধরার পূর্বে মালিকানাধীন নয়। তদ্রূপ যদি ক্রেতা তার হাত থেকে ছেড়ে দেয়। কেননা, এটা অর্পণ অযোগ্য। গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং গর্ভস্থ মাদি ভ্রূণের ভ্রূণ বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূল ﷺ গর্ভস্থ ভ্রূণ এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পরবর্তী সম্ভাব্য গর্ভের ভ্রূণ বিক্রয় করতে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এতে এক ধরনের প্রতারণা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আরো কয়েকটি প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এরূপ যে, পাখি বিক্রয় মোট চার ধরনের–

১. আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করা।

২. শিকার করার পর হাত অথবা সংরক্ষিত স্থান থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বিক্রয় করা।

৩. এমন পাখি যা আসা-যাওয়া করে যেমন কবুতর ইত্যাদি বিক্রয় করা।

৪. পাখি শিকার করার পর সংরক্ষিত স্থানে হেফাজত করে বিক্রয় করা।

উল্লিখিত প্রকারগুলোর প্রথম দু'অবস্থায় পাখি বিক্রয় অবৈধ। ৩য় অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে বিক্রয় বৈধ। আর ৪র্থ অবস্থায় বিনাশর্তে বিক্রয় বৈধ।

প্রথম অবস্থায় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো পাখিটি বিক্রেতার মালিকানাভুক্ত না থাকা, যেহেতু বিক্রেতা পাখিটির মালিক নয়। তাই এর বিক্রয় বৈধ নয়। বরং বিক্রয় করা ফাসিদ, তাছাড়া এটা অর্পণযোগ্যও নয়।

দ্বিতীয় অবস্থায় পাখিটির মালিকানা যদিও শিকার করার দ্বারা হাসিল হয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে পাখিটি অর্পণযোগ্য নয়। আর অর্পণ অযোগ্য বস্তু বিক্রয় অবৈধ, তাই পাখিটির বিক্রয় অবৈধ হবে। তৃতীয় অবস্থার ব্যাখ্যা হলো, যদি পাখিটিকে কোনো কৌশল ছাড়া এমনিতেই ধরা সম্ভব হয় তাহলে এ বিক্রয় বৈধ। কেননা তখন এটা অর্পণযোগ্য বিবেচিত হবে। আর যদি কোনো কৌশল ছাড়া ধরা সম্ভব না হয় তাহলে এর বিক্রয় অবৈধ।

চতুর্থ অবস্থায় বিক্রয় সার্বিক বিবেচনায় বৈধ। কেননা, শিকার করার দ্বারা বিক্রেতা পাখির মালিক হয়েছে, আর হিফাজত করার দ্বারা পাখিটি অর্পণযোগ্যও হয়েছে।

ইবারতে উল্লিখিত দ্বিতীয় মাসআলাটি হচ্ছে, গর্ভের ভ্রূণ বিক্রয় সংক্রান্ত। জাহেলী যুগে ভ্রূণ বিক্রয়ের রেওয়াজ ছিল। এমন কি তারা গর্ভে যে ভ্রূণ রয়েছে তা মাদি হলে এবং সেটা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাতে যে ভ্রূণ জন্মাবে তাও বিক্রয় করত। এ সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভ্রূণ এবং মাদি ভ্রূণের সম্ভাব্য ভ্রূণ কে বিক্রয় করা অবৈধ। যেমন কোনো ক্রেতা উটনী বা বকরির মালিক কে বলল, তোমার উটনী অথবা বকরির গর্ভস্থ ভ্রূণ-বাচ্চাকে একশত টাকায় ক্রয় করলাম। উত্তরে বিক্রেতা বলল, আমি তা গ্রহণ করলাম। حَبَلُ الْحَبَلَةِ বা نِتَاجٌ -এর বিক্রয়ের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, ক্রেতা বলল, এই উটনীর

গর্ভে যদি মাদি বাচ্চা হয়, তাহলে উক্ত বাচ্চা বড় হওয়ার পর যে বাচ্চা প্রসব করবে আমি তা ক্রয় করলাম পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে। বিক্রেতা তার প্রস্তাব গ্রহণ করল। জাহেলী-অন্ধকার যুগে এসব ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। ইসলাম এসব ক্রয়-বিক্রয়কে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

হাদীসে রাসূল ﷺ এ বর্ণিত– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبْلَةِ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কয়টি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُسَيَّبٍ اَنَّهٗ قَالَ لَا رِبًا فِى الْحَيَوَانِ وَاِنَّمَا نُهِىَ عَنِ الْحَيَوَانِ عَنِ الثَّلَاثِ عَنِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلَاقِيْحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ . اَخْرَجَهٗ مَالِكٌ .

একই হাদীস মু'জামে তাব্‌রানীতে হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, দ্বিতীয়োক্ত হাদীসটি মাক্‌তূ' রূপে বর্ণিত হলেও হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে সেটি মারফূ'রূপে বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লিখিত مَضَامِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরুষ উটের ঔরশে-বীর্যের মাধ্যমে যে সন্তান অবস্থান করছে তা বিক্রয় করা। مَلَاقِيْح শব্দের অর্থ হচ্ছে গর্ভস্থ ভ্রূণ। তবে শব্দ দুটির ব্যাখ্যা বর্ণিত ব্যাখ্যার ঠিক উল্টোরূপেও বর্ণিত আছে।

মোটকথা হচ্ছে, উপরিউক্ত দুটি হাদীস দ্বারা ভ্রূণ এবং মাদি ভ্রূণের সম্ভাব্য পরবর্তী ভ্রূণের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আর নিষিদ্ধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হেদায়ার লেখকের বর্ণিত হাদীস نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ শাব্দিকভাবে প্রমাণিত নয়। অর্থাৎ এ শব্দে হাদীসটি কোনো প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ হয়নি। তবে হাদীসের অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে لَمْ اَرَهٗ بِهٰذَا اللَّفْظِ [আমি এ শব্দে হাদীসটি পায়নি]। আল্লামা যিলায়ীর মন্তব্য হচ্ছে غَرِيْبٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ [এ শব্দে হাদীসটি গরীব]। সারকথা হচ্ছে, হাদীস দ্বারা লেখক যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা যেহেতু অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাই আর কোনো সমস্যা নেই।

লেখক কর্তৃক উল্লেখিত দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে যুক্তি : আর তা হচ্ছে এ ধরনের বিক্রয়ে প্রতারণা রয়েছে। কেননা একে তো গর্ভে ভ্রূণ আছে কি নাই? তা নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয়ত ভ্রূণ যদি থেকেও থাকে তা জীবিত অবস্থায় জন্মাবে কিনা তাও নিশ্চিত নয়। রাসূল ﷺ প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব, ভ্রূণ এবং ভ্রূণের ভ্রূণ বিক্রয় নিষিদ্ধ।

قَالَ : وَلَا اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ لِلْغَرَرِ، فَعَسَاهُ إِنْتِفَاخٌ، وَلِأَنَّهُ يُنَازِعُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلْبِ، وَرُبَّمَا يَزْدَادُ، فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيْعُ بِغَيْرِهِ، قَالَ : وَلَا الصُّوفُ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ، لِأَنَّهُ مِنْ أَوْصَافِ الْحَيَوَانِ، وَلِأَنَّهُ يَنْبُتُ مِنْ أَسْفَلَ فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيْعُ بِغَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْقَوَائِمِ، لِأَنَّهَا تَزِيْدُ مِنْ أَعْلَى، وَبِخِلَافِ الْقَصِيْلِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ قَلْعُهُ، وَالْقَطْعُ فِي الصُّوفِ مُتَعَيِّنٌ فَيَقَعُ التَّنَازُعُ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي يُوسُفَ (رح) فِي هٰذَا الصُّوفِ حَيْثُ جَوَّزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ওলানে অবস্থিত দুধ বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হতে পারে ওলান এমনিতেই ফোলা রয়েছে। তা ছাড়া দোহন পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ ঘটতে পারে। কখনও দুধ নতুন করে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে বিক্রীত দুধ অবিক্রীত দুধের সাথে মিশে যাবে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মেষের পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, এটা পশুর গুণবিশেষ। তাছাড়া এটা নিচ থেকে গজায়। ফলে বিক্রীত পশম অবিক্রীত পশমের সাথে মিশে যাবে। গাছের ডালপালা এর ব্যতিক্রম। কেননা, তা উপর থেকে বাড়ে। এবং সবুজ শস্য-সবজিও এর থেকে ভিন্ন। কেননা, তার মূলোৎপাটন সম্ভব। পশমের কেটে নেওয়ার পদ্ধতিটি নির্ধারিত। অতএব এতে কাটার স্থান নিয়ে বিবাদ হবে। আর সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ পিঠে অবস্থিত পশম, ওলানস্থিত দুধ ও দুধস্থিত ঘি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। এ হাদীস ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বিপক্ষে পশম বিক্রয়ের ব্যাপারে দলিল। কেননা, তার থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পিঠস্থ পশম বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (রা.) বলেন, পশুর ওলানের দুধ ওলানে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এতে ক্রেতার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন পশুর ওলান ফোলা দেখা গেল। ক্রেতা মনে করল যে, এতে প্রচুর দুধ আছে অথচ তাতে দুধ নেই। অন্য কোনো কারণে ফুলে আছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা দুধ মনে করে প্রতারিত হতে পারে। আর যে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার লেন-দেন রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন। নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে– দোহন পদ্ধতি নিয়ে বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রেতার চাহিদা থাকবে যে, ওলানে যেন এক ফোটা দুধও না থাকে; পক্ষান্তরে বিক্রেতা চাইবে যেন ওলানে কিছু দুধ অবশিষ্ট থাকে। ইতঃপূর্বে এ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেসব ক্রয়-বিক্রয় ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে সেসব ক্রয়-বিক্রয় শরিয়ত অনুমোদিত নয়। অতএব ওলানস্থ দুধের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

তৃতীয় দলিল হচ্ছে– ওলানে দুধ বিন্দু বিন্দু করে একত্রিত হয় এবং দুধ দোহন কিংবা বাচ্চা দুধপানের সময় আরো দুধ পর্যায়ক্রমে জমা হয়, অর্থাৎ বিক্রয়ের সময় ওলানের মধ্যে যে দুধ ছিল না তা দোহনের সময় জমা হয়। আর এটা স্পষ্ট যে, বিক্রয়ের পর উৎপাদিত দুধ অবিক্রীত, যার মালিক ও হকদার হচ্ছে বিক্রেতা। আর যে দুধ বিক্রয়ের সময় ওলানে জমা ছিল, সেগুলো হচ্ছে বিক্রীত, যার মালিক হচ্ছে ক্রেতা। দুধ দোহনের পর দোহনকৃত দুধে বিক্রীত ও অবিক্রীত দুধ এমনভাবে মিশে গেছে যে, এখন আর পৃথক করার কোনো অবকাশ নেই। বরং এটা অসম্ভব। আর মূলনীতি অনুসারে বিক্রীত দ্রব্যের সাথে অবিক্রীত দ্রব্যের এমন মিশ্রণ, বিক্রয়কে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিক্রয়কে বাতিল করে দেয়। তাই আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয় অবৈধ হবে। একে বৈধ করার কোনো অবকাশ নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ভেড়া-বকরির গায়ে ও পিঠে যে পশম রয়েছে, তা না কেটে শরীরে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। কেননা, তা পশুর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত পশুর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত থাকে। গুণাবলি অনুবর্তী হয়। অনুবর্তী বিষয় মূল্যমানের উপযুক্ত নয়। তাই তার মূল বা যার মাধ্যমে সেটা অস্তিত্ববান হয় তা ব্যতীত তাকে বিক্রয় করা বৈধ হয় না।

অবৈধতার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে– পশম গোড়া থেকে বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ এই যে, বকরির পশমে যদি রং দেওয়া হয়। এবং এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হয়, তাহলে দেখা যাবে তার পশমের উপরিভাগ উক্ত রং দ্বারা রাঙানো আর নিচের দিকে সেই কৃত্রিম রং নেই। বরং প্রাকৃতিক রং বিদ্যমান। অতএব পশম যে নিচ থেকে বাড়ে তাই প্রমাণিত হলো। আর এটাও আমরা জানি যে, পশম ক্রমবর্ধমান। সুতরাং ক্রেতার ক্রয়ের পর বিক্রীত পশম গ্রহণ করার পূর্বে যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাতেও পশমের কিছুটা প্রবৃদ্ধি ঘটবে। বাড়তি যোগ হওয়া পশম বিক্রীত দ্রব্য নয়; বরং এটা বিক্রেতার মালিকানাধীন। আর ক্রয়ের সময় যে পশম শরীরে ছিল তা হচ্ছে ক্রেতার অংশ। এখন ক্রেতার অংশ বিক্রেতার অংশ এমনভাবে মিশে গেছে যা পৃথক করা আদৌ সম্ভব নয়। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ক্রেতার অংশ যদি বিক্রেতার অংশের সাথে মিশে যায় এবং সেটাকে পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিক্রয় অবৈধ। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিতেও ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গাছের ঢাল-পালা গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা তো নিষিদ্ধ নয়। অথচ সেটাও ক্রমবর্ধমান। এবং ক্রয় ও তা গ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময়ে এর বৃদ্ধি ঘটে। সুতরাং গাছের ডাল-পালা বিক্রয় বৈধ হলে, পশম বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে কেন? এর উত্তর হচ্ছে– গাছের ডাল-পালার বিষয়টি এমন নয়। কারণ, গাছের ডাল-পালার প্রবৃদ্ধি ঘটে উপর দিক থেকে। এর প্রমাণ হচ্ছে যদি ডালের গোড়ার দিকে একটি সুতা বেঁধে দেওয়া হয়, এরপর কিছু দিন অতিবাহিত হয় তাহলে সুতাটি আগে যে স্থানে ছিল সে স্থানেই থাকবে। ডালের গোড়ার সাথে বাঁধার সময় যে দূরত্ব ছিল পরেও সেই সমান দূরত্ব বজায় থাকবে, তবে সুতার সাথে ডগার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, গাছের ডাল-পালা, শাখা-প্রশাখা উপর দিক থেকেই বাড়ে, ডালের উপরিভাগের মালিকানা ক্রেতার। অতএব যতটুকুই বৃদ্ধি পাক না কেন? তা ক্রেতার মালিকানাধীন থাকবে, ফলে বিক্রীত দ্রব্যের সাথে অবিক্রীত দ্রব্যের মিশ্রণ ঘটবে না। আর মিশ্রণ না ঘটলে ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল হবে না।

তদ্রূপ সবজি ক্ষেতের মাসআলাটি পশমের মাসআলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। কেননা, সবজি মাটি থেকে উপড়ে ফেলা সম্ভব যদি কাটার স্থান নিয়ে মতবিরোধ হয়। আর উপড়ে ফেললে মতবিরোধ নিঃশেষ হবে। মোটকথা, সবজি পশমের মতো হলেও এর মতবিরোধ ও বিবাদ নিরসন করার পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু পশমের মধ্যে কেটে নেওয়া ছাড়া অন্যকোনো উপায় নেই। তাই কাটার স্থান নিয়ে বিবাদ থাকবে, যেমন ক্রেতা দাবি করবে, যেন চামড়ার সাথে মিলিয়ে পশম কাটা হয়, পক্ষান্তরে বিক্রেতা চাইবে যেন কিছু পশম রেখে কাটা হয়। তাদের এই বিবাদ বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দিবে। কেননা, ইতঃপূর্বে মূলনীতি আকারে বলা হয়েছে যে, যা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে তা বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ করে দেয়। অতএব পশুর পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা অবৈধ হবে। কিন্তু ক্ষেতে থাকা সবজি বিক্রয় করা শুদ্ধ হবে।

হিদায়ার লেখক এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস দ্বারা দলিলে পেশ করেন। হাদীসটি এরূপ –

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتّٰى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صُوْفٌ عَلٰى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِىْ ضَرْعٍ . (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ)

হাদীস এখানে মারফূ' রূপে বর্ণিত হয়েছে, এটি কখনো মাওকূফ আবার কখনো মুরসাল রূপেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি "হাসান" পর্যায়ের। এর রাবী ওমর ইবনে ফাররুখ সম্পর্কে جَرْح ও تَعْدِيْل উভয়টি পাওয়া যায়। যদি হাদীসের মারফূ' সনদকে দুর্বলও বলা হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মুরসাল এবং মাওকূফ বর্ণনাগুলো মারফূ হাদীসকে শক্তিশালী করেছে। হাদীসটি তাবরানীসহ বায়হাকী ও দারাকুতনীও বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অর্থ রাসূল ﷺ খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল, পিঠে থাকা অবস্থায় পশম এবং স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা বৈধ। তার দলিল হচ্ছে– পশম মূল্যমানযোগ্য সম্পদ। এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এটাকে অর্পণ করাও সম্ভব। যে মালে এ তিনটি বিষয় [মূল্যমান যোগ্য, উপকারী ও অর্পণ সম্ভব] পাওয়া যায় তার বিক্রি বৈধ। অতএব বকরির পিঠে অবস্থিত পশম বিক্রি করা বৈধ হবে। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের বিপক্ষে দলিল, তাই হাদীসের বিপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

قَالَ : وَجِذْعٌ فِى السَّقْفِ وَ ذِرَاعٌ مِنْ ثَوْبٍ ذَكَرَا الْقَطْعَ اَوْ لَمْ يَذْكُرَاهُ لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ اِلَّا بِضَرَرٍ بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ نُقْرَةِ فِضَّةٍ لِاَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِى تَبْعِيْضِهٖ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا لَا يَجُوْزُ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِلْجَهَالَةِ اَيْضًا وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الذِّرَاعَ اَوْ قَلَعَ الْجِذْعَ قَبْلَ اَنْ يَفْسَخَ الْمُشْتَرِىْ يَعُوْدُ صَحِيْحًا لِزَوَالِ الْمُفْسِدِ بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ النَّوٰى فِى التَّمْرِ وَالْبَذْرَ فِى الْبِطِّيْخِ حَيْثُ لَا يَكُوْنُ صَحِيْحًا وَاِنْ شَقَّهُمَا وَاَخْرَجَ الْمَبِيْعَ لِاَنَّ فِىْ وُجُوْدِهِمَا اِحْتِمَالًا اَمَّا الْجِذْعُ فَعَيْنٌ مَوْجُوْدٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ছাদের সাথে সংযুক্ত কড়িকাঠ এবং [কাটার দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা চতুষ্পার্শ্ব একই মানের নয় এমন] কাপড়ের একগজ বিক্রি করা বৈধ নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা কেটে দেওয়ার কথা উল্লেখ করুক অথবা নাই করুক। কেননা, এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত অর্পণ করা সম্ভব নয়, তবে রূপার পাত থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ এ রকম বিক্রি জায়েজ], কেননা, রূপা খণ্ডিত করাতে কোনো ত্রুটি হয় না। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে আমাদের বর্ণিত দলিলের কারণে বৈধ হবে না। তাছাড়া বিক্রীত অংশ অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে অবৈধ হয়ে যাবে। যদি ক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাখান করার পূর্বেই বিক্রেতা একগজ কেটে দেয় কিংবা কড়িকাঠ পৃথক করে ফেলে তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রয় বিনষ্টকারী কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি খেজুরের অথবা তরমুজের বিচি বিক্রয় করে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না, যদিও বিক্রেতা তা ভেঙ্গে বিক্রীত বিচি বের করে দেয়। কেননা, বিক্রয়ের সময় বিচির অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে। আর কড়িকাঠ তো বিদ্যমান বস্তু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جِذْعٌ বলা হয় ঘরের ছাদ ধারণের কাঠকে। সংক্ষেপে একে কড়ি বা কড়িকাঠ বলা হয়। এগুলো সাধারণত পৃথক করা যায় না বা পৃথক করলে ছাদ ধ্বসে পড়ে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কড়িকাঠ ছাদে সংযুক্ত অবস্থায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। তদ্রূপ এমন কাপড় যা থেকে কিছু অংশ কেটে নিলে ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায় যেমন, জামা, পাগড়ি, পায়জামা ইত্যাদি তার একগজ বিক্রয় করা বৈধ নয়। ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে এগুলো কেটে নেওয়ার কথা উল্লেখ করুক কিংবা না-করুক তাতে মাসআলার হুকুমের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। নাজায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রেতার পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতীত বিক্রীত কাঠ কিংবা কাপড় অর্পণ করা সম্ভব নয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, বিক্রেতা যদি নিজের ক্ষতি নিজে স্বীকার করে নেয় তাতে সমস্যা কোথায়? এর উত্তর হচ্ছে– সে শুদ্ধ বিক্রয়চুক্তি করছে। আর শুদ্ধ বিক্রয়চুক্তি এরূপ ক্ষতিকর হয় না। অতএব শুদ্ধ চুক্তির দাবি মতে এ বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা এমন কাপড়ের একগজ বিক্রয় করে, যা খণ্ডিত করলে ত্রুটিযুক্ত হয় না, যেমন থান কাপড়; তাহলে বিক্রয় সহীহ হবে। এর উদাহরণ হলো, শস্যস্তূপের থেকে এক বা একাধিক সের শস্য বিক্রয় করা বৈধ। কেননা, স্তূপ থেকে কিছু অংশ বিক্রি করলে কোনো ক্ষতি হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেদ্রব্য খণ্ডিত করলে দ্রব্যটি ত্রুটিযুক্ত

করে দেয় তার খণ্ড বা অংশবিশেষ বিক্রয় বৈধ, আর যেদ্রব্য এরূপ নয় তার অংশ বিশেষ বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কেউ রূপার পাত থেকে দশ দিরহাম পরিমাণ বিক্রি করল, তাহলে তার এ বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ। কারণ, দিরহাম বা রূপা বিক্রিতে অবশিষ্টাংশের কোনো ক্ষতি হয়নি। এরপর লেখক বলেন, যদি ক্রেতা বিক্রয়চুক্তি নাকচ করার আগেই বিক্রেতা কড়িকাঠ ছাদ থেকে পৃথক করে নেয় কিংবা কাটলে ক্ষতি হয় এমন কাপড় থেকে একগজ কেটে দেয় তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিষয় এখন আর নেই। অর্থাৎ বিক্রয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গিয়েছে। এরপর লেখক বলেন, যদি কড়িকাঠ ও কাপড়ের একগজ নির্দিষ্ট না হয় বিক্রয় বৈধ হবে না। এর দু'টি কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন–

১. বিক্রেতা কোনো ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ করতে সক্ষম নয়;

২. এ অবস্থায় বিক্রীত দ্রব্যটি অনির্দিষ্ট।

আর বিক্রীত পণ্য অনির্দিষ্ট থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। সে মতে এখানেও বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর পরের মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি খেজুরের মধ্যে অবস্থিত বিচি কিংবা তরমুজের মধ্যে অবস্থিত বিচি বিক্রয় করে তাহলে এ বিক্রয় সহীহ হবে না। এমনকি বিক্রেতা যদি ক্রেতার বিক্রয়চুক্তি নাকচ করে দেওয়ার পূর্বেই খেজুর ও তরমুজ কেটে কিংবা ভেঙ্গে বিচি বের করে ফেলে তবুও বিক্রি সহীহ হবে না। এর কারণ হচ্ছে– বিক্রয়চুক্তির সময় বিচিগুলো দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই এগুলোর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত ছিল না। এ সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল যে, খেজুরের ভিতর হয়তো বিচি নেই; কিংবা আছে, কিন্তু তা খারাপ। ফলে চুক্তিটির অবস্থা এ দাড়ায় যে, বিক্রয় চুক্তিতে বিক্রয়পণ্য অবিদ্যমান। আর বিক্রয় পণ্য ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করা বাতিল। আর নিয়মানুসারে বাতিল ক্রয়-বিক্রয়কে কোনোভাবে শুদ্ধ করা যায় না। তাই বিক্রেতা যদি খেজুর ও তরমুজ কেটে কিংবা ভেঙ্গে বিচি বের করেও ফেলে তবু বিক্রয় বৈধ হবে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তি বাতিল করে দেওয়ার পর তা শুদ্ধ করা যায় না। পক্ষান্তরে ছাদের কড়িকাঠ কিংবা কাপড়ের একগজ প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এবং বিদ্যমান, তাই এর বিক্রয় বৈধ বলে গণ্য হবে, বাতিল হবে না; বরং এখনই অর্পণযোগ্য নয় এ কারণে ফাসিদ। তবে ফাসাদ যে কারণে হয়। তা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ হয়ে যায়।

قَالَ : وَضَرْبَةُ الْقَانِصِ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الصَّيْدِ بِضَرْبِ الشَّبْكَةِ مَرَّةً لِاَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلِاَنَّ فِيْهِ غَرَرًا قَالَ : وَبَيْعُ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى النَّخِيْلِ بِتَمْرٍ مَجْذُوْذٍ مِثْلَ كَيْلِهِ خَرْصًا لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ فَالْمُزَابَنَةُ مَا ذَكَرْنَا وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِيْ سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلَ كَيْلِهَا خَرْصًا وَلِاَنَّهُ بَاعَ مَكِيْلًا بِمَكِيْلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا يَجُوْزُ بِطَرِيْقِ الْخَرْصِ كَمَا اِذَا كَانَ مَوْضُوْعَيْنِ عَلَى الْاَرْضِ وَكَذَا الْعِنَبُ بِالزَّبِيْبِ عَلٰى هٰذَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا وَهُوَ اَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ قُلْنَا اَلْعَرِيَّةُ الْعَطِيَّةُ لُغَةً وَتَاوِيْلُهُ اَنْ يَبِيْعَ الْمُعَرَّى لَهُ مَا عَلَى النَّخِيْلِ مِنَ الْمُعَرِّيْ بِتَمْرٍ مَجْذُوْذٍ وَهُوَ بَيْعٌ مَجَازًا لِاَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ فَيَكُوْنُ بِرًّا مُبْتَدِأً .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শিকারীর এক ক্ষেপ বিক্রি করা জায়েজ নয়। শিকারীর এক ক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য একবার জাল মারার দ্বারা যতটুকু শিকার ধরা পড়ে। কেননা, এখানে বিক্রয় পণ্য অজ্ঞাত, আর এজন্য যে, এতে প্রতারণা রয়েছে। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুযাবানা পদ্ধতির বিক্রয়-চুক্তি বৈধ নয়। মুযাবানা মানে গাছে অবস্থিত খেজুরকে অনুমান করে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা। কেননা, রাসূল ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। আর মুযাবানা মানে তা-ই, আমরা যা উল্লেখ করলাম। আর মুহাকালা মানে শিষের ভিতরের গমকে অনুমান করে সে পরিমাণ শিষমুক্ত গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর এটা নিষিদ্ধ এ কারণে যে, বিক্রেতা পাত্র পরিমাপ্য দ্রব্যকে তদ্রূপ পাত্র-পরিমাপ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে আর এটা অনুমানের মাধ্যমে সম্পাদন করা জায়েজ নয়। যেমন একই শ্রেণীর দ্রব্য [গম বা চাল] দুটিকে মাটিতে রাখা অবস্থায় অনুমান করে বিক্রয় করা বৈধ নয়। একই পদ্ধতিতে আঙুরকে কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাঁচ ওসাকের চেয়ে কম পরিমাণে [এ পদ্ধতিতে] বিক্রয় করা জায়েজ; কেননা, রাসূল ﷺ মুযাবানা নিষিদ্ধ করেছেন, আর আরায়া (عَرَايَا) -এর অনুমতি প্রদান করেছেন। আর আরায়া মানে পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণ গাছের খেজুরকে কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে عَرِيَّة শব্দটি অভিধানে দান ও উপঢৌকনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং হাদীসের অর্থ এই যে, দানগ্রহীতা গাছে বিদ্যমান খেজুর দাতার কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। এটা রূপকার্থে বিক্রয়চুক্তি। কেননা, গ্রহীতা তো [কব্জা না করার কারণে] এখনো [খেজুরের] মালিক হয়নি। ফলে কর্তিত খেজুর দান যেন নতুন আরেকটি অনুগ্রহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম কুদূরী (র.) তৎকালীন প্রচলিত কতিপয় ফাসিদ বিক্রয়ের উল্লেখ করে সেগুলোর হুকুম বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রথম উল্লেখ করেছেন ضَرْبَةُ الْقَانِصِ বিক্রয়চুক্তি কে। ضَرْبَةُ الْقَانِصِ-এর ব্যাখ্যায় হিদায়ার লেখক বলেন, শিকারী ক্রেতাকে বলল, এ ক্ষেপ অর্থাৎ এইবার জালে যে পরিমাণ শিকার [মাছ ও পাখি] ইত্যাদি উঠবে তা তোমার কাছে এতো টাকায় বিক্রি করলাম। এ ধরনের বিক্রি অবৈধ হওয়ার দুটি কারণ লেখক উল্লেখ করেছেন–

১. এতে বিক্রীত দ্রব্য অজ্ঞাত, এটা ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা কারো জানা নেই যে, কি পরিমাণ শিকার–মাছ, পাখি ইত্যাদি জালে আটকিবে। বরং এ আশঙ্কা রয়েছে যে, এতে কোনো শিকারই উঠবে না।

২. এতে প্রতারণা ও ধোঁকা রয়েছে। কারণ, হতে পারে জালে কোনো মাছ আটকিল না। মাছের পরিবর্তে এতে সাপ, শামুক আটকিল।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো অনুলিপিতে قَانِصٌ শব্দের পরিবর্তে غَائِصٌ শব্দটি রয়েছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় তাহযীবুল আজহারীর এক বর্ণনা দ্বারা। غَائِصٌ শব্দের অর্থ ডুবুরী। যে মুক্তা তোলার উদ্দেশ্যে ডুব দেয়। সে মতে এক ডুবে যা তোলা যায় তা বিক্রি করা অবৈধ। এরপর ইমাম কুদূরী মুযাবানা ও মুহাকালা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ দু'টি বিক্রয়ও ফাসিদ লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে অবৈধ।

মুযাবানা-এর সংজ্ঞা : মুযাবানা বলা হয় গাছে বিদ্যমান খেজুর [বা অন্যান্য ফল] কে একই পরিমাণ কর্তিত-আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। যেমন গাছের খেজুর বা ফল অনুমান করে বলা হলো যে, পাঁচমণ খেজুর রয়েছে। এরপর গাছ থেকে আহরিত-কর্তিত খেজুর পাত্র কিংবা ওজনের মাধ্যমে পাঁচমণ পরিমাপ করে তা বিক্রি করা হলো গাছের খেজুরের বিনিময়ে। এখানে লক্ষণীয় যে, গাছে যে পরিমাণ খেজুর অনুমান করা হয়েছে, বাস্তবে খেজুর তার চেয়ে বেশিও হতে পারে, আবার অনুমানের চেয়ে কমও হতে পারে, আবার যা অনুমান করা হয়েছে ঠিক তাও হতে পারে [যা এক রকম অসম্ভব]। অনুমানের চেয়ে গাছের খেজুর কম কিংবা বেশি হলে রিবা-সুদ হয়ে যাবে। আর সুদি কারবার শরিয়তে হারাম। সে জন্যে এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম হবে।

মুহাকালা-এর সংজ্ঞা : মুহাকালা এর সংজ্ঞা মুযাবানা এর অনুরূপ। পার্থক্য এতটুকু যে, শস্যের ক্ষেত্রে এমন অনুমান নির্ভর ক্রয়-বিক্রয়কে মুহাকালা বলা হয়। যেমন কেউ শিষের মধ্যে বিদ্যমান গম অনুমান করার পর একই পরিমাণ শিষমুক্ত গমের বিনিময়ে বিক্রি করল। উদাহরণ স্বরূপ শিষের মধ্যে বিদ্যমান গমের অনুমান করা হলো যে, এতে পাঁচমণ গম রয়েছে, তারপর এর বিনিময়ে পাঁচমণ শিষমুক্ত গম মেপে দেওয়া হলো। পূর্বোক্ত কারণে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন, পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে মুযাবানা ও মুহাকালা বৈধ। পাঁচ ওসাকের বেশি পরিমাণে অবৈধ। আর সমান পাঁচ ওসাকের ক্ষেত্রে তার দু'টি অভিমত রয়েছে, বৈধ ও অবৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল একটি হাদীস। নিম্নে হাদীসটি তুলে ধরা হলো–

عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِيْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত,

عَنْ سَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذٰلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ اِلَّا اَنَّهُ رَخَّصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَاْخُذُهَا اَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا كَيْلًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হাদীস দু'টি দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) দলিল পেশ করেন এভাবে যে, عَرَايَا শব্দটি عَرِيَّةٌ-এর বহুবচন। আর عَرِيَّةٌ বলা হয় পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে গাছে অবস্থিত খেজুর অনুমান করে একই পরিমাণ কর্তিত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা, যেমন : গাছের খেজুর অনুমান করা হলো যে, এতে চার ওসাক খেজুর রয়েছে। এরপর কর্তিত খেজুর চার ওসাক মেপে তার বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করে দেওয়া। যেহেতু রাসূল ﷺ মুযাবানা নিষিদ্ধ করে আরায়ার অনুমতি দিয়েছেন [যেমনটি হাদীস

থেকে বুঝা গেল। তাই পাঁচ ওয়াসাকের কমে অনুমান করে গাছের খেজুর/ফল ইত্যাদি বিক্রি করা যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর সংজ্ঞাটি হাদীসের শব্দের সাথেও মিলে যায়। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসের শব্দ হচ্ছে–

رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِىْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ـ

আহনাফের দলিল : রাসূল ﷺ জাহেলিযুগে প্রচলিত মুযাবানা ও মুহাকালা বিক্রয়চুক্তি নিষিদ্ধ করেন।

১. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ زَادَ مُسْلِمٌ وَعَنِ الثُّنْيِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِىْ رُؤُوْسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ ـ

৩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

৪. عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা স্পষ্টতই মুযাবানা ও মুহাকালার নিষিদ্ধতা প্রমাণ হয়।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, মুযাবানা ও মুহাকালায় বিক্রীত পণ্য ও মূল্য উভয়টা একই জিনসের, আর পরিমাপের ক্ষেত্রও এক [হয়তো ওজন কিংবা পাত্র পরিমাপ]। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, জিনস ও কদর এক হয়ে গেলে অনুমানের উপর ভিত্তি করে পণ্য বিনিময় করা যায় না, কেননা, এতে সুদের সন্দেহ ও আশঙ্কা থাকে। আর প্রকৃত সুদ যেমন হারাম তেমনি সুদের সন্দেহ যাতে থাকে এমন বিষয়ও হারাম। অতএব মুযাবানা ও মুহাকালা এর পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। লেখক বলেন, খেজুর কিংবা শস্য দানা যদি পণ্য ও মূল্য হয় আর উভয়টা কর্তিত অবস্থায় থাকে, তাহলে যেমন পণ্য [খেজুর]-কে ও মূল্য [খেজুর] -কে অনুমান করে বিনিময় করা যায় না; বরং প্রত্যেকটিকে আলাদা করে মাপতে হয়, তেমনি গাছের খেজুর [পণ্য]-কে এবং কর্তিত খেজুর [মূল্য]-কে অনুমান করে বিক্রয় ও বিনিময় করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব : আহনাফ বলেন, عَرِيَّة -এর যে সংজ্ঞা ইমাম শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন তা সঠিক নয়, বরং এর সংজ্ঞা হলো এই, عَرِيَّة শব্দটির আভিধানিক অর্থ দান। পরিভাষায় عَرِيَّة বলা হয়, কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি কোনো দরিদ্র লোককে তার বাগানের কয়েকটি গাছের খেজুর দান করল। দরিদ্র লোকটি তার খেজুরের জন্য বাগানে আসা-যাওয়া করে। ফলে বাগানের মালিকের কষ্ট হয়। মালিক তার কষ্ট লাঘব করা এবং দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে চিন্তা করে যে, আমি তাকে আমার কাছে সংরক্ষিত খেজুর দিয়ে দিলে তার প্রয়োজনও পূরণ হলো, আর আমার কষ্টও দূর হলো। কিন্তু সেই সাথে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গেরও ভয় ছিল। কারণ, বাগানের মালিক দরিদ্র লোকটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাকে গাছের খেজুরগুলো দেওয়া হবে। হাদীসের মাধ্যমে তার উক্ত সমস্যার সমাধান দেওয়া হয় যে, এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয়; বরং এটা রূপকার্থে বিক্রয়। যদিও মূলত এটা বিক্রয়চুক্তি নয়। কারণ, عَرِيَّة এক ধরনের দান বা হেবা। আর হেবার নিয়মানুসারে গ্রহীতা দানকৃত বস্তু কব্জা না করলে তার মালিক হয় না। এ কারণে হেবার মধ্যে সবার মতে কব্জা করা আবশ্যক। এখানে গ্রহীতা খেজুরগুলো গাছে থাকার কারণে কব্জা করতে পারেনি। যার ফলে খেজুরের উপর তার মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর এটা পূর্ব থেকেই জানা যে, মালিকানা বহির্ভূত বস্তু বিক্রি করা যায় না। ফলে এখানে যেন দাতা দরিদ্র গ্রহীতার প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে তাকে পুনরায় দান করল। তাই এটি কোনো বিক্রয় নয় এটাই সাব্যস্ত হলো। তাহলে হাদীসে পাঁচ ওয়াসাকের কথা কেন বলা হলো ? এর উত্তর হচ্ছে তাদের এ ধরনের লেন-দেন পাঁচ ওয়াসাকের কমেই হতো। আর হাদীসের رُخْصَة -এর অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারে অবকাশ দান।

উল্লেখ্য যে, আরায়ার আরেকটি সংজ্ঞা ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে। তা হলো, কোনো ব্যক্তি একটা অথবা দুইটা খেজুর গাছের মালিক। তার এ খেজুর গাছগুলো আবার কোনো এক লোকের বাগানের মাঝে অবস্থিত। তার গাছগুলো ছাড়া সবই বাগানের মালিকের। ফল পাকার সময় হলে মদীনাবাসীরা পরিবার-পরিজন নিয়ে বাগানে আসে। তখন দু'একটি গাছের মালিকও তার পরিবার নিয়ে বাগানে যায় ফলে বেশি সংখ্যক গাছের মালিকের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তখন বেশি গাছের মালিক সেই স্বল্প গাছের মালিককে তার ফল অনুমান করে সেই পরিমাণ কর্তিত ফল দিয়ে দেয়, যাতে স্বল্প গাছের মালিক তার পরিবার নিয়ে প্রস্থান করে। এটাকে আরায়া বলা হয়। এ সংজ্ঞাটিকে ইমাম মালেক (র.)-এর অনুসৃত বলা হলে মূলত ইমাম মালিক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) বর্ণিত সংজ্ঞাকেই সমর্থন করেন।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، وَهٰذِهِ بُيُوعٌ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلَانِ عَلٰى سِلْعَةٍ أَىْ يَتَسَاوَمَانِ فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِىْ أَوْ نَبَذَهَا إِلَيْهِ الْبَائِعُ أَوْ وَضَعَ الْمُشْتَرِىْ عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ فَالْأَوَّلُ بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالثَّانِىْ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَالثَّالِثُ إِلْقَاءُ الْحَجَرِ وَقَدْ نَهَى النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَلِأَنَّ فِيْهِ تَعْلِيْقًا بِالْخَطَرِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পাথর নিক্ষেপের দ্বারা, স্পর্শ করার দ্বারা এবং বিক্রীত-পণ্য ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে বিক্রয় বৈধ নয়। এ বিক্রয়-পদ্ধতিগুলো জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। এর প্রক্রিয়া ছিল এরূপ যে, দু'ব্যক্তি পণ্য সম্পর্কে দরদাম করত, ইতোমধ্যে ক্রেতা যদি পণ্যটি স্পর্শ করত কিংবা বিক্রেতা পণ্যটি ক্রেতার প্রতি ছুঁড়ে দিত, অথবা ক্রেতা পণ্যের উপর কঙ্কর রেখে দিত তাহলে উল্লিখিত মূল্যে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যেতো। প্রথমটি "বাইয়ে মুলামাসা" আর দ্বিতীয়টি "বাইয়ে মুনাবাযাহ" এবং তৃতীয়টি "বাইয়ে ইলকায়ে হাজার" [পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয়] আর মহানবী ﷺ মুলামাসা ও মুনাবাযা এর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণেও যে, এতে মারাত্মক ঝুঁকি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপরিউক্ত ইবারতে লেখক জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো কয়েকটি ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। সে ক্রয়-বিক্রয়গুলো এই- (১) بَيْعٌ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ (২) بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ (৩) بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ

بَيْعٌ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ **-এর পরিচয় :** এ ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি ছিল, একই ধরনের কয়েকটি বস্তু বিদ্যমান থাকত, যেমন- কয়েকটি থান কাপড়, ক্রেতা ও বিক্রেতা সেগুলোর মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। বিক্রেতা পণ্য বিষয়ক তথ্য দিত, আর পণ্যের মূল্য উল্লেখ করত, এমতবস্থায় ক্রেতা একটি কঙ্কর কোনো একটি থানে ছুঁড়ে মারত। যে থানটিতে কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হতো, তাতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যেতো। এতে বিক্রেতা সম্মত হোক বা না হোক, এবং এতে ক্রেতারও মত পরিবর্তন করার সুযোগ থাকত না।

بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ **-এর পরিচয় :** এর পদ্ধতি ছিল, ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। ইতোমধ্যে ক্রেতা পণ্যটি স্পর্শ করলে পণ্য ক্রেতার হয়ে যেতো। বিক্রেতা বিক্রয়ে সম্মত হোক কিংবা না হোক।

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ **-এর পরিচয় :** এর পদ্ধতি ছিল, দুজন ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে পণ্যের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করত। সেই মুহূর্তে বিক্রয়কে অপরিহার্য করার জন্য বিক্রেতা ক্রেতার প্রতি পণ্যটি নিক্ষেপ করত এতে বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য হয়ে যেত। চাই এতে ক্রেতার সম্মতি থাকুক কিংবা না-থাকুক এতে ক্রেতার বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করারও কোনো সুযোগ থাকত না। রাসূল ﷺ এ ধরনের অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ زَادَ مُسْلِمٌ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ فَيَلْزَمُ اللَّامِسُ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ لَهُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَ مُسْلِمٌ)

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে مُلَامَسَة ও مُنَابَذَة -এর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। بَيْعٌ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ -এর ক্ষেত্রে যদিও স্পষ্ট কোনো হাদীস পাওয়া যায় না, কিন্তু এটাকে মুনাবাযা ও মুলামাসার সমগোত্রীয়রূপে গণ্য করা হয়। নিষেধাজ্ঞা কারণ হলো- ১. ক্রয়-বিক্রয়ে উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি আবশ্যক। এখানে তা পাওয়া যায়নি। ২. বিক্রয় দ্বারা মালিকানা প্রমাণিত হয় আর মালিকানাকে একটি দোদুল্যমান বিষয়ের সাথে যুক্ত করা এক ধরনের জুয়া, আর জুয়া নিঃসন্দেহে হারাম। অতএব এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হবে। এগুলোর মধ্যে জুয়ার অর্থ এভাবে পাওয়া যায় যে, বিক্রেতা এসে তাকে বলল, তুমি যে পণ্যের উপর কঙ্কর মারবে, সেটি আমি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম। কঙ্কর সেই পণ্যের গায়ে লাগতে পারে, আবার নাও লাগতে পারে। মুনাবাযার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে তুমি উদাহরণ স্বরূপ কাপড়টি আমার প্রতি নিক্ষেপ কর নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আমি তা ক্রয় করলাম। আর মুলামাসার মধ্যে বিক্রেতা-ক্রেতাকে বলে, তুমি এই কাপড়গুলোর মধ্যে যেটা স্পর্শ করবে, সেটি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম। মোটকথা, এ তিন প্রকার বিক্রয়ে শর্তগুলোর কারণে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বিরাজ করে। আর এরূপ অনিশ্চিয়তা জুয়ার সাথে তুলনীয়। অতএব, এ বিক্রয়চুক্তিগুলো শুদ্ধ নয়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ لِجَهَالَةِ الْمَبِيْعِ، وَلَوْ قَالَ : عَلٰى اَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي اَنْ يَّأْخُذَ اَيَّهُمَا شَاءَ جَازَ الْبَيْعُ اِسْتِحْسَانًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِفُرُوْعِهِ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرَاعِي وَلَا اِجَارَتُهَا ، وَالْمُرَادُ الْكَلَأُ، اَمَّا الْبَيْعُ فَلِاَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مَا لَا يَمْلِكُهُ، لِاِشْتِرَاكِ النَّاسِ فِيْهِ بِالْحَدِيْثِ، وَاَمَّا الْاِجَارَةُ فَلِاَنَّهَا عَقَدَتْ عَلٰى اِسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ عَقَدَتْ عَلٰى اِسْتِهْلَاكِ عَيْنٍ مَمْلُوْكٍ بِاَنِ اسْتَاْجَرَ بَقَرَةً لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا لَا يَجُوزُ، فَهٰذَا اَوْلٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু কাপড়ের মধ্য হতে অনির্দিষ্টভাবে একটি কাপড় বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, এতে বিক্রেয়পণ্যটি অজ্ঞাত। আর যদি বিক্রেতা বলে যে, ক্রেতার এ এখতিয়ার আছে যে, সে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে ইস্তিহসানের বিবেচনায় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আমরা এ বিষয়টি তার শাখাগত মাসায়েল সহকারে ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চারণভূমি বিক্রয় কিংবা ইজারা দেওয়া বৈধ নয়। চারণভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য ঘাস [যা সংরক্ষিত নয়]। এ বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, বিক্রয়চুক্তিটি এমন জিনিসের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে, বিক্রেতা যার মালিক নয়। কেননা, হাদীস দ্বারা [প্রমাণিত যে,] এতে সকল মানুষের শরিকানা রয়েছে। আর ইজারা অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, সকলের জন্য বৈধ, [কারো একক মালিকানাধীন নয়] এমন একটি জিনিস যা ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করার উদ্দেশ্যে ইজারা-চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে, অথচ যদি কোনো মালিকানাধীন জিনিস ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইজারা-চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবু তা বৈধ হয় না। যেমন– কেউ দুধ পানের উদ্দেশ্যে গাভী ইজারা নিল, [যা বৈধ নয়।] সুতরাং এটা বৈধ না হওয়া আরও স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ :وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, একাধিক কাপড় থেকে অনির্দিষ্টভাবে কোনো একটি ক্রয় বা বিক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ, এখানে বিক্রীত কাপড়টি অজ্ঞাত। তাও আবার এমন অজ্ঞাত যে, এ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিতে পারে, যেমন– তিন কাপড়ের মধ্যে একটি ভালো, আরেকটি মধ্যম, আর তৃতীয়টি নিম্নমানের। এমতাবস্থায় ক্রেতা সবচেয়ে ভালো মানের কাপড়টি নিতে চাইবে, বিক্রেতা দিতে চাইবে নিম্ন বা মধ্যমমানের কাপড়। এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হবে। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ঝগড়া সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর উপস্থিতি বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। অতএব এখানে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করে, কিংবা ক্রেতা বেছে নেওয়ার শর্ত করে বিক্রয়চুক্তিতে সম্মত হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ইস্তিহসানের বিবেচনায় সহীহ হয়ে যাবে। হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইতঃপূর্বে [خِيَارُ شَرْط -এর পরিচ্ছেদে] এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর লেখক জামিউস সাগীর গ্রন্থের একটি মাসআলা উল্লেখ করেন। উক্ত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চারণভূমি বিক্রয় কিংবা ইজারা দেওয়া বৈধ নয়। লেখক চারণভূমির ব্যাখ্যায় বলেন, চারণভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য এর ঘাস। কারণ, আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের ব্যবহার রীতি অনুসারে স্থান বলে স্থানের দ্রব্যাদি উদ্দেশ্য করা হয়।

এরপর লেখক অসংরক্ষিত ঘাস বিক্রয়ের অবৈধতার কারণ বর্ণনা করেন। তা হলো, ঘাস কারও মালিকানাধীন নয়; বরং এতে সব মানুষের অংশিদারিত্ব রয়েছে। সবার অংশিদারিত্বের বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ : اَلْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ . (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ)

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ : اَلْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

হাদীস দুটি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘাস, পানি ও আগুনে সব মানুষের অংশিদারিত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত হাদীসে বিশেষভাবে বলা হয়েছে এগুলোর বিক্রয়ের মূল্য ভোগ করা হারাম। মোটকথা, অসংরক্ষিত ঘাসে সবার অংশিদারিত্ব রয়েছে, তাই এটি ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। ঘাস ইজারা দান অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, এখানে ইজারা-চুক্তিটি সকলের জন্য বৈধ এমন জিনিস নিঃশেষ করার জন্য সম্পন্ন হচ্ছে। অতএব এটা বৈধ হবে না। এর দলিল হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কারও ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্রব্যকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইজারা নেয়, তবু তা জায়েজ নয়। যেমন, কারও গাভীর দুধ পানের উদ্দেশ্যে গাভীটি ভাড়া নেওয়া জায়েজ নয়। মালিকানাধীন দ্রব্য যদি ব্যবহার দ্বারা নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য ইজারা নেওয়া বৈধ না হয়, তাহলে তো যা মালিকানাধীন নয়; বরং সকলের শরিকানাভুক্ত বস্তুতে তা কোনোভাবেই বৈধ হবে না। কারণ, ইজারা নেওয়ার বিধান কেবল (مَنَافِعْ) সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে, মূল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এবং তা নিঃশেষ করার জন্য নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাড়া নেয়, সে কেবল সুবিধাদি ভোগ করে। সে মূল দ্রব্যটি নষ্ট করা বা নিঃশেষ করার মালিক হয় না। মূল দ্রব্যটির মালিক ইজারাদাতা থেকে যায় অথচ এখানে ইজারা প্রদান করা হচ্ছে মূল দ্রব্য যথা ঘাস এবং তা নিঃশেষ করা হচ্ছে। যেমন– কেউ যদি দুধ পানের উদ্দেশ্যে কোনো গাভী ভাড়া নিতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে না। মোটকথা, আমাদের আলোচ্য ঘাস ইজারা প্রদান দু কারণে অবৈধ।

১. এতে মালিকানাধীন নয় এমন জিনিস ইজারা দেওয়া হয়, যা শরিয়তসম্মত নয়।

২. এতে কোনো বস্তুকে ইজারার মাধ্যমে গ্রহণ করে ব্যবহারের মাধ্যমে তা নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। অথচ এটা জায়েজ নয়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (رحـ)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : يَجُوزُ إِذَا كَانَ مُحْرَزًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (رحـ)، لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ، كَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِّ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالزَّنَابِيرِ، وَالْاِنْتِفَاعُ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَا بِعَيْنِهِ، فَلَا يَكُونُ مُنْتَفَعًا بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ، حَتّٰى لَوْ بَاعَ كُوَّارَةً، فِيهَا عَسَلٌ، بِمَا فِيهَا مِنَ النَّحْلِ، يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ (رحـ) -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণনা করেন, মৌমাছি বিক্রি করা জায়েজ নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত। আর মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি তা সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে, তবে বিক্রি করা জায়েজ হবে। আর এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত। কেননা, বাস্তবিকপক্ষে এবং শরিয়তের বিধান মতে এটা এমন একটি প্রাণী যা থেকে উপকার গ্রহণ করা যায়। ফলে তা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। যদিও তা খাওয়া যায় না। যেমন– গাধা ও খচ্চর। শায়খাইনের দলিল এই যে, এটা কীট-প্রতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। যেমন– ভিমরুল। আর উপকার লাভ করা হয় তার থেকে নির্গত পদার্থ দ্বারা, ঐ প্রাণীর সত্তা দ্বারা নয়। সুতরাং মধু বের হওয়ার আগে মৌমাছি উপকারযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে যদি কেউ মধুপূর্ণ মৌচাক বিক্রি করে যাতে মৌমাছি রয়েছে, তাহলে মৌচাকের অনুবর্তীরূপে বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম কারখী (র.) এরূপ উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّحْلِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মৌমাছি বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর জামিউস সাগীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মৌমাছি বিক্রয় অবৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে সংরক্ষিত অবস্থায় মৌমাছি বিক্রয় করা বৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মৌমাছি এমন প্রাণী যা বাস্তবেও উপকারী এবং শরিয়তের দৃষ্টিতেও উপকারী। বাস্তবে উপকারী হওয়া তো বলা বাহুল্য যে, এর থেকে মধু ও মোম তৈরি করা হয়, যা মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরিয়তগতভাবেও উপকারী। এ কারণেই শরিয়ত এর ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। যে বস্তু বাস্তবিকপক্ষে এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে উপকারী প্রমাণিত হয় তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বিবেচিত হয়। সুতরাং মৌমাছি বিক্রি করাও বৈধ হবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মৌমাছি তো খাবারের উপযুক্ত নয়, তবে এর বিক্রয় কিভাবে বৈধ হবে? এর উত্তর হচ্ছে, খাওয়ার অযোগ্য হওয়া বিক্রয়ের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন– গাধা ও খচ্চর খাওয়ার অযোগ্য, কিন্তু এর ক্রয়-বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তদ্রূপ ভূমি খাওয়ার অনুপোযুক্ত, কিন্তু এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। সুতরাং মৌমাছি খাওয়ার অযোগ্য হলেও তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

শায়খাইন (র.)-এর দলিল হচ্ছে, মৌমাছি কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। আর কীট-পতঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন– ভিমরুল, সাপ ও বিচ্ছু ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। সুতরাং মৌমাছিও যেহেতু কীট-পতঙ্গের অন্তর্গত, তাই এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিলে উপকারী প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে যে বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল– এর উত্তরে শায়খাইন (র.) বলেন, মৌমাছি সরাসরি উপকারী নয়; বরং উপকারী হলো মৌমাছি থেকে নির্গত রস ও মোম। এজন্যই মোমও মধু নির্গত হওয়ার পূর্বেই মৌমাছি উপকারী নয়। যখন প্রমাণিত হলো যে, মৌমাছি স্বয়ং উপকারী নয়, তাহলে তা মাল রূপে বিবেচিত হবে না। আর যে জিনিস মাল নয় তার ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়।

লেখক বলেন, এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি মধুপূর্ণ মৌচাক বিক্রি করে, যাতে মৌমাছি আছে, তাহলে মধুপূর্ণ মৌচাকের অনুবর্তীরূপে মৌমাছির বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র.) এভাবেই মাসআলাটিকে তাঁর মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে যদি কেউ মৌমাছিসহ মধু বিক্রি করে, তাহলে মৌমাছি অনুবর্তীরূপে বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ مِنَ الْهَوَامِّ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) يَجُوزُ إِذَا ظَهَرَ فِيهِ الْقَزُّ تَبَعًا لَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَجُوزُ كَيْفَ مَا كَانَ، لِكَوْنِهِ مُنْتَفِعًا بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ، لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ، وَقِيلَ : أَبُو يُوسُفَ (رحـ) مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ)، كَمَا فِي دُودِ الْقَزِّ، وَالْحَمَامِ إِذَا عُلِمَ عَدَدُهَا وَأَمْكَنَ تَسْلِيمُهَا جَازَ بَيْعُهَا، لِأَنَّهُ مَالٌ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে গুটিপোকা [রেশমকীট] বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, এটা কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গুটিপোকায় রেশমের আচ্ছাদন প্রকাশিত হলে [রেশমের] অনুবর্তীরূপে বিক্রি করা বৈধ হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে কোনো অবস্থায় গুটিপোকা বিক্রি করা জায়েয। কেননা, এটা উপকারী প্রাণী। গুটিপোকার ডিম বিক্রয় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নাজায়েজ। তবে সাহেবাইন (র.)-এর মতে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা জায়েজ। কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে রয়েছেন। যেমন− [গায়ে রেশম প্রকাশ না পাওয়া] গুটিপোকার ক্ষেত্রে। কবুতরের সংখ্যা যদি জানা থাকে এবং তা অর্পণ করা সম্ভব হয়, তবে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। কেননা, তা অর্পণযোগ্য মাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে রেশমকীট ও কবুতরের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রেশমকীট যা আমাদের দেশে গুটিপোকা নামে পরিচিত, এর ক্রয়-বিক্রয় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে জায়েজ নেই। কেননা, এটা কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত। জমিনের কীট-পতঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, তাই রেশমকীট বিক্রি করা অবৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে যদি পোকার শরীরে রেশম বিদ্যমান থাকে, তাহলে রেশমের অনুবর্তীরূপে কীটের বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। যেমন− মৌমাছিকে মধুর সাথে বিক্রয় করা জায়েজ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে গুটিপোকা যে কোনোভাবে বিক্রয় করা বৈধ। অর্থাৎ গুটিপোকার শরীরে রেশম প্রকাশ পাক বা না পাক− উভয় অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ। তাঁর দলিল হলো, রেশমকীট দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। তাছাড়া এর ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদাও রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফাতওয়া।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضِهِ الخ : গুটিপোকার ডিম বিক্রয় করা সাহেবাইন (র.)-এর মতে বৈধ, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অবৈধ। সাহেবাইন (র.) -এর দলিল এই যে, গুটিপোকার ডিম ক্রয়-বিক্রয় করার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে তা জায়েজ হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হচ্ছে, ডিম দ্বারা সরাসরি কোনো উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই; বরং ডিম থেকে বাচ্চা ফুটালে এবং তা বড় হলে এক পর্যায়ে উপকারযোগ্য হয়।

মোটকথা, বর্তমানে তা উপকারযোগ্য না হওয়ার কারণে এর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। কতিপয় মাশায়েখের মতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। যেমন– তিনি গুটিপোকার উপর রেশম না থাকলে এর বিক্রয় নাজায়েজ বলেন– তেমনি গুটিপোকার ডিমের বিক্রয়ও তাঁর মতে নাজায়েজ। এখানে লক্ষণীয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) মৌমাছির ক্ষেত্রে যে অভিমত পোষণ করেছেন গুটিপোকার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও একই রকম। অর্থাৎ তিনি মৌমাছি বিক্রি করা যেমন বৈধ বলেছেন, তেমনি গুটিপোকার বিক্রয়ও বৈধ বলেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তাঁর পূর্ব মতানুসারে অবৈধ বলা উচিত ছিল। আবার ইমাম কারখী (র.) -এর বর্ণনানুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের সাথে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর একমত হওয়া উচিত। অর্থাৎ রেশম ছাড়া গুটিপোকার বিক্রয় অবৈধ, আর রেশমসহ অবস্থায় রেশমের অনুবর্তীরূপে গুটিপোকার বিক্রয়ও বৈধ। অতএব এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) একাকী ভিন্নমত পোষণ করার বিষয়টি ইমাম কারখী (র.)-এর বর্ণনানুসারে কিছুটা বেমানান। তবে গুটিপোকা আর মৌমাছি ছাড়া অন্য যে-কোনো কীট বিক্রয় অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এরপর লেখক কবুতর বিক্রি সম্পর্কে বলেন, কবুতরের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে এবং ক্রেতার কাছে অর্পণ করা সম্ভব হলে এ বিক্রয় জায়েজ। কেননা, এটা মাল এবং অর্পণ করার উপযুক্ত। যে কোনো দ্রব্যের মধ্যে এ দুটো বিষয় বিদ্যমান থাকলে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়ে যায়। অতএব কবুতরের মাঝে উক্ত দু শর্ত পাওয়া গেলে তা বিক্রি বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, কবুতর যদি তার ঘরে থাকে এবং তার ঘরের প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকে, তাহলে তো নিঃসন্দেহে বিক্রয় বৈধ। আর যদি তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে এবং অভ্যাসমতো ঘরে ফিরে আসে, তবু বিক্রয় বৈধ। যদি বলা হয়– না আসার তো সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা কোনো বিপদাপদেরও তো সম্ভবনা আছে, তবু কি বিক্রয় বিশুদ্ধ হবে? এর উত্তর হলো, এরূপ আশঙ্কা বৈধতার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন– সাধারণ বিক্রিতে পণ্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিক্রয়কে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। যদি প্রকৃতই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিক্রয় রহিত হয়ে যাবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْاٰبِقِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهٖ، اِلَّا اَنْ يَّبِيْعَهٗ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ اَنَّهٗ عِنْدَهٗ، لِاَنَّ الْمَنْهِيَّ بَيْعُ اٰبِقٍ مُطْلَقٍ، وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ اٰبِقًا فِىْ حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَهٰذَا غَيْرُ اٰبِقٍ فِىْ حَقِّ الْمُشْتَرِىْ، وَلِاَنَّهٗ اِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِىْ اِنْتَفَى الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيْمِ، وَهُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ لَا يَصِيْرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ اِذَا كَانَ فِىْ يَدِهٖ، وَكَانَ اَشْهَدَ عِنْدَ اَخْذِهٖ، لِاَنَّهٗ اَمَانَةٌ عِنْدَهٗ، وَقَبْضُ الْاَمَانَةِ لَا يَنُوْبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ يَجِبُ اَنْ يَّصِيْرَ قَابِضًا، لِاَنَّهٗ قَبْضُ غَصْبٍ، وَلَوْ قَالَ : هُوَ عِنْدَ فُلَانٍ فَبِعْهُ مِنِّىْ فَبَاعَهٗ لَا يَجُوْزُ، لِاَنَّهٗ اٰبِقٌ فِىْ حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَلِاَنَّهٗ لَا يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهٖ، وَلَوْ بَاعَ الْاٰبِقَ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْاِبَاقِ لَا يَتِمُّ ذٰلِكَ الْعَقْدُ، لِاَنَّهٗ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَّةِ، كَبَيْعِ الطَّيْرِ فِى الْهَوَاءِ، وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّهٗ يَتِمُّ الْعَقْدُ اِذَا لَمْ يَفْسَخْ، لِاَنَّ الْعَقْدَ اِنْعَقَدَ بِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ، وَالْمَانِعُ قَدِ ارْتَفَعَ، وَهُوَ الْعَجْزُ عَنِ التَّسْلِيْمِ، كَمَا اِذَا اَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَهٰكَذَا يُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدٍ (رح) .

অনুবাদ : পলাতক দাস বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, এ সম্পর্কে নবী ﷺ-এর নিষধাজ্ঞা রয়েছে। আর এ কারণে যে, বিক্রেতা তা সমর্পণ করতে সক্ষম নয়। তবে যদি কেউ এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে যে দাসটি তার কাছে আছে বলে সে দাবি করে। কেননা, হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে পরিপূর্ণ পলাতক গোলাম বিক্রি করা। আর পূর্ণ পলাতক মানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে পলাতক। আর এখানে তো ক্রেতার ক্ষেত্রে সে পলাতক নয়। আর এ কারণে যে, যখন সে [দাস] ক্রেতার কাছেই রয়েছে তখন অর্পণের অক্ষমতা রইল না। আর সেটাই ছিল বাধা। অতঃপর শুধুমাত্র চুক্তি দ্বারাই ক্রীতদাস কব্জাকারী সাব্যস্ত হবে না, যদি পলাতক ক্রীতদাস তার হাতে থাকে এবং সে তাকে নেওয়ার সময় সাক্ষী রেখে থাকে। কেননা, পলাতক দাস তার কাছে আমানত ছিল, আর আমানতের কব্জা বিক্রয়ের কব্জার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। আর যদি সে দাসটি নেওয়ার সময় সাক্ষী না রাখে, তাহলে কেবল বিক্রয়চুক্তি দ্বারাই নিশ্চিত কব্জাকারী বা দখলদার সাব্যস্ত হবে। কেননা, তা ছিল অপহরণমূলক কব্জা। যদি ক্রেতা বলে, পলাতক দাসটি অমুকের কাছে রয়েছে, সুতরাং আপনি তা আমার কাছে বিক্রয় করুন। অতঃপর সে বিক্রয় করল, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, সে এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় চুক্তিকারীর কাছেই পলাতক রয়েছে। তাছাড়া এ কারণে যে, মালিক তাকে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। যদি কেউ পলাতক দাস বিক্রয় করে, অতঃপর সে পলাতক অবস্থা থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঐ বিক্রয়চুক্তি পূর্ণতা পাবে না। কেননা, গোলামটিতে বিক্রেয়পাত্র হওয়ার গুণ বিদ্যমান না থাকার কারণে উক্ত বিক্রয়চুক্তি বাতিলরূপে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন– শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রয়

করা। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, চুক্তি রহিত না করে থাকলে চুক্তিটি সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, চুক্তিটি সংঘটিত হয়েছিল মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে। আর প্রতিবন্ধকটি উঠে যাচ্ছে। আর তা হলো অর্পণের অক্ষমতা। যেমন– যদি পলাতক হয় বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করার পর। এরূপই ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْأٰبِقِ الخ : পলাতক দাস দু ধরনের হতে পারে। পূর্ণপলাতক অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে পলাতক, আর এমন পলাতক– যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছে পলাতক নয়। মাসআলা হলো, পূর্ণ পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসটি এই–

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ شِرَاءِ مَا فِىْ بُطُوْنِ الْاَنْعَامِ حَتّٰى تَضَعَ وَعَنْ بَيْعِ مَا فِىْ ضَرْعِهَا وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ اٰبِقٌ الخ .(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পলাতক দাসের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞার দ্বিতীয় কারণ এই যে, পলাতক দাস অর্পণ করার যোগ্য না হওয়া। যে বস্তু অর্পণ করার যোগ্য নয়, তার বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে যদি কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, পলাতক দাসটি তার কাছে আছে, আর মালিক তার কাছেই বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা, এ দাস পূর্ণ পলাতক দাস নয়। কারণ, সে বিক্রেতার কাছে পলাতক হলেও ক্রেতার কাছে পলাতক নয়। আর ক্রেতার কাছে পলাতক না হলে সে পূর্ণ পলাতক হিসেবে বিবেচিত হবে না। অতএব এর বিক্রি অবৈধ হবে না। হাদীসে পূর্ণ পলাতক দাসের বিক্রয়চুক্তিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় দলিল হলো, যখন দাস ক্রেতার কাছেই রয়েছে, তখন বিক্রেতার পক্ষে দাস অর্পণ করা কষ্টসাধ্য কিংবা অসম্ভব নয়। অথচ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার মুখ্য কারণ এটাই ছিল। সুতরাং যখন অর্পণের অক্ষমতা রইল না, তখন বিক্রয়চুক্তিও নিষিদ্ধ হবে না। লেখক বলেন, যেহেতু দাস ক্রেতার কাছেই রয়েছে সেহেতু ক্রয়ের সাথে সাথে ক্রেতা দাসটির কব্জাকারী বলে গণ্য হবে কিনা তা নির্ভর করবে ক্রেতা গোলামকে প্রথম কব্জা কিভাবে করেছিল তার উপর। ক্রেতা গোলামকে তিনভাবে কব্জা করতে পারে– ১. ক্রেতা নিজের জন্যই কব্জা করেছে। ২. মালিকের কাছে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে কব্জা করেছে এবং গোলামকে ধরার সময় দুজন সাক্ষী করেছে এই মর্মে যে, সে গোলামটি মালিকের কাছে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে ধরেছে। ৩. মালিককে ফেরত দানের উদ্দেশ্যে ধরেছে, কিন্তু কোনো সাক্ষী রাখেনি।

প্রথম অবস্থায় ক্রেতা দাসটি ক্রয়মাত্রই কব্জাকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রয়ের পর যদি দাস ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে বিক্রয় ও দখল সম্পন্ন হয়েছে সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতার পক্ষে দাসের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, তার দাসটির দখল ছিল অপহরণের দখল, তার অপহরণের দখল ক্রয়ের দখলে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই কেনামাত্রই ক্রেতা দাসটির মালিক হয়ে যাবে এবং তার দখল পূর্ণ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রয় করা মাত্রই ক্রেতা দখলদার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, ক্রয়ের পূর্বে বর্তমান ক্রেতার দখল ছিল আমানতের দখল। এজন্যই দাসটি যদি মালিকের কাছে প্রত্যাবর্তন করানোর পূর্বেই মারা যায়, তবে এজন্য দখলদারের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না; বরং মালিকের মাল থেকে এটি বিনষ্ট হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা, যদি ক্রয়মাত্রই ক্রেতার কব্জা সাব্যস্ত হতো, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হতো এবং তার কব্জাটি দায়যুক্ত কব্জা বিবেচিত হতো। অথচ ক্রেতার পূর্ববর্তী কব্জাটি ছিল আমানত তথা দায়মুক্ত কব্জা। আর ক্রয়ের কারণে সে যে দখলের উপযুক্ত হয়েছে, তা হলো ক্রয়ের দখল বা দায়যুক্ত কব্জা দখল। আর এটা জানা কথা যে, আমানতের কব্জা হলো সাধারণ কব্জা, আর বিক্রয়ের কব্জা হলো সেই তুলনায় শক্তিশালী ও মজবুত কব্জা এবং এতে আর্থিক দায়যুক্ত থাকে। তাই বিক্রয়ের কব্জা আমানতের কব্জার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কারোই ক্রয়ের দ্বারা আমানতের কব্জাকারী ক্রয়ের কব্জাকারী সাব্যস্ত হবে না; বরং ক্রেতাকে তা প্রথমে মালিকের হাতে হস্তান্তর করতে হবে, অতঃপর মালিক ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে এবং ক্রেতা ক্রয়ের কব্জা করবে।

তৃতীয় অবস্থায় শুধুমাত্র বিক্রয়ের দ্বারাই ক্রেতার দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, ক্রেতা ইতঃপূর্বে কব্জা করার সময় যেহেতু কোনো সাক্ষী রাখেনি, তাই তার কব্জা অপহরণের কব্জা সাব্যস্ত হবে। অপহরণের কব্জা আর্থিক দায়যুক্ত হয়। আর **বিক্রয়ের কব্জাও দায়যুক্ত কব্জা অর্থাৎ উভয়টিই দায়যুক্ত কব্জা।** সুতরাং এদের একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এ কারণে তৃতীয় অবস্থায় ক্রেতা শুধুমাত্র বিক্রয়চুক্তি করার দ্বারা দখলদার সাব্যস্ত হবে। এ অবস্থায় বর্তমান ক্রেতার দাসটিকে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার, অতঃপর পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

যদি ক্রেতা দাস-মালিককে বলে, তোমার পলাতক দাসটি অমুক ব্যক্তির কাছে রয়েছে, আমার কাছে বিক্রি কর। তারপর মালিক ক্রেতার কাছে বিক্রয়ও করে তবু তাদের ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় দাসটি বিক্রেতা ও ক্রেতা কারো কাছে নেই। সুতরাং দাসটি পালাতক হওয়ার কারণে এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, বিক্রেতা পলাতক দাসটিকে ক্রেতার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম নয়। আর অর্পণ অযোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় অবৈধ হওয়ায় এ দাসের বিক্রয়ও অবৈধ সাব্যস্ত হবে।

যদি কেউ কোনো পলাতক দাস বিক্রয় করল, অতঃপর দাসটি পলাতক অবস্থা থেকে মালিকের কাছে ফিরে আসল, তাহলে এ বিক্রয়চুক্তিটি বহাল থাকবে কিনা? এ ব্যাপারে জাহিরুর রিওয়ায়াতের বক্তব্য হলো, পূর্বের বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি করতে হবে। কেননা, পলাতক অবস্থায় তার বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল ছিল। কারণ, বিক্রয়ে দ্রব্যটি অর্পণযোগ্য না হওয়াতে যেন অস্তিত্বহীন একটি পণ্য বিক্রয় করা হলো। আর অস্তিত্বহীন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হয়। সুতরাং আমাদের ফিরে আসা গোলামের ইতঃপূর্বে সম্পাদিত চিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর নিয়মানুসারে বাতিল হয়ে যাওয়া বিক্রয়চুক্তি কখনও শুদ্ধ হতে পারে না, ফলে উল্লিখিত বিক্রয়চুক্তিটি পলাতক দাস ফিরে আসার পর সহীহ বিক্রয়ে রূপান্তরিত হবে না; বরং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এর উদাহরণ হলো এমন যে, কোনো ব্যক্তি আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয় করে দিল। অতঃপর বিক্রয় বৈঠকেই পাখিটি ধরে ক্রেতার হাতে অর্পণ করল, তবু বিক্রয়চুক্তিটি সহীহ হয় না। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনা এরূপ পাওয়া যায় যে, যদি দাস ফিরে আসার পূর্বে বিক্রয়চুক্তি রহিত না করা হয়, তাহলে কৃতচুক্তিটি বহাল থাকবে। কেননা, দাসের মধ্যে মাল হওয়ার গুণাগুণ বিদ্যমান ছিল। আর এ কারণেই বিক্রয়চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল। মাল হওয়ার গুণাগুণ বিদ্যমান বলেই মনিব পলাতক দাসকে পূর্ণ আজাদ কিংবা মুদাব্বার করলে তা সঠিক বিবেচিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, পলায়নের কারণে যদি তার সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা রহিত হয়ে যেত, তাহলে তার আজাদ করা ও মুদাব্বার করা সঠিক এবং কার্যকর হতো না। তবে বিক্রয় বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকটি ছিল তা হচ্ছে অর্পণ করার অক্ষমতা। তা তো দাসটি ফিরে আসার কারণে দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না। তাই পূর্ববর্তী বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর হবে। এতে আপত্তি করার মতো কিছু নেই। এটা যেন এমনই হলো যে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা দাসটি হস্তগত করার পূর্বেই পালিয়ে গেল। তাহলে যেমন বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়, তেমনি এখানেও চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)ও একই মত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ পলাতক দাস বিক্রয় করল এবং দাস পলায়নের কারণে বিক্রেতা অর্পণ করতে অক্ষম হয়ে গেল। ক্রেতা দাস আদায়ের উদ্দেশ্যে বিচারকের সমীপে মোকাদ্দমা পেশ করল, অতঃপর বিচারকের মাধ্যমে বিক্রেতার কাছে দাসটি দাবি করল, কিন্তু বিক্রেতা দাস প্রদানে তার অপারগতা জানাল। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার পর পলাতক দাসটি ফিরে আসলে পূর্ববর্তী বিক্রয় কার্যকর হবে না; বরং নতুনভাবে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

قَالَ : وَلَا بَيْعُ لَبَنِ امْرَأَةٍ فِي قَدَحٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) : يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ مَشْرُوبٌ طَاهِرٌ، وَلَنَا أَنَّهُ جُزْءُ الْآدَمِيِّ، وَهُوَ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُكَرَّمٌ مَصُونٌ عَنِ الْابْتِذَالِ بِالْبَيْعِ، وَلَا فَرْقَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ لَبَنِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رحـ) أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْأَمَةِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا، فَكَذَا عَلَى أَجْزَائِهَا، قُلْنَا : اَلرِّقُّ قَدْ حَلَّ نَفْسَهَا، فَأَمَّا اللَّبَنُ فَلَا رِقَّ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِمَحَلٍّ يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْقُوَّةُ الَّتِي هِيَ ضِدُّهُ، وَهُوَ الْحَيُّ، وَلَا حَيٰوةَ فِي اللَّبَنِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পাত্রে রাখা কোনো স্ত্রীলোকের দুধ বিক্রি করা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বিক্রি করা বৈধ হবে। কেননা, তা পবিত্র পানীয়। আমাদের দলিল হলো, এটা তো মানুষের অংশ। আর মানুষের শরীর তার সব অংশসহ সম্মানযোগ্য এবং পণ্যায়নের হীনতা থেকে হেফাজতযোগ্য। জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী স্বাধীন নারীর দুধ ও দাসীর দুধে কোনো পার্থক্য নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, দাসীর দুধ বিক্রি করা বৈধ। কেননা, তার দেহসত্তার উপর বিক্রয়চুক্তি আরোপ করা বৈধ। সুতরাং তার অংশবিশেষের উপরও তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তি আরোপ করা বৈধ হবে। আমাদের বক্তব্য হলো, তার দেহ সত্তায় প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু দুধের মধ্যে তো কোনো দাসত্ব গুণ নেই। কেননা, দাসত্ব এমন ক্ষেত্রের সাথে বিশিষ্ট, যেখানে তার বিপরীত শক্তি [স্বাধীনতা] সাব্যস্ত হতে পারে। আর সে ক্ষেত্র হলো জীবন্ত সত্তা। অথচ দুধে কোনো প্রাণ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَيْعُ لَبَنِ امْرَأَةٍ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে জামিউস্ সাগীরের আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। মাসআলাটি হলো, কোনো মহিলার স্তনের দুধ পেয়ালায় রেখে তা বিক্রি করা বৈধ কিনা। হানীফী মাযহাব মতে, এর ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ অবৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, স্বাধীনা নারী কিংবা দাসী যে কোনো নারীর দুধ পবিত্র ও পানীয়। আর যে দ্রব্য পবিত্র ও পানাহারযোগ্য হয় তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়। যেমন– গাভী ও ছাগীর দুধ ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এরূপভাবে স্ত্রীলোকের দুধও ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে, দাসীর দুধ বিক্রি করা যাবে। তাঁর দলিল হলো, দাসীকে যেহেতু বিক্রি করা যায়, তাই তার অংশবিশেষও বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) جُزْء-কে كُلّ-এর উপর কিয়াস করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল এই যে, মহিলার দুধ তার শরীরের অংশবিশেষ তথা মানুষের শরীরের অংশবিশেষ। মানবদেহের কোনো অংশ মাল অর্থাৎ পণ্য হতে পারে না। আর যে দ্রব্য মাল অর্থাৎ পণ্য নয় তার বিক্রয় বৈধ নয়। স্ত্রীলোকের দুধ যে তার অংশবিশেষ তার প্রমাণ হলো, শরিয়তে দুধপানের দ্বারা যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করা হয়,

তার ভিত্তি হলো দুধমা ও দুধপানকারী সন্তানের মাঝে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক। অর্থাৎ দুধপান করার কারণে সন্তান তার দুধমায়ের অংশ সাব্যস্ত হয়। আর মানুষের অংশ মাল সাব্যস্ত হয় না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, মানবদেহ তার সব অঙ্গসহ সম্মানের যোগ্য। একে পণ্য বানানোর দ্বারা এর মর্যাদা হানি হয়। আর মর্যাদাহীনতা থেকে হেফাজত করার জন্য তার বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, মহিলাদের দুধ তো সাধারণভাবে পানীয়রূপে গণ্য নয়। শিশুর দুগ্ধপানের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে দু বছর। এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকের দুধ শিশুর জন্য পানীয়। এরপর স্ত্রীলোকের দুধপান হারাম। আর যে বস্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে খাদ্য বিবেচিত হয় তা মাল হওয়া আবশ্যক নয়। যেমন– মৃতব্যক্তির গোশত অপারগ অবস্থায় খাওয়া বৈধ, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা মাল নয়। মোটকথা, নারীর দুধ মাল নয়। আর যা মাল নয় তার বিক্রয়ও বৈধ নয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব এই যে, দাসীর দাসত্ব কেবল তার দেহ-সত্তার মধ্যে, দুধের মধ্যে কোনো দাসত্ব নেই। কেননা, দাসত্ব এমন ক্ষেত্রে থাকতে পারে যেখানে তার বিপরীত শক্তি [অর্থাৎ স্বাধীনতা] অবস্থান করতে পারে। আর স্বাধীনতা অবস্থানের জায়গা জীবন্ত সত্তা। দুধের মধ্যে যেহেতু প্রাণসত্তা নেই, তাই এতে স্বাধীনতা আসবে না। ফলে এতে দাসত্বও আসবে না। সুতরাং তা বিক্রি করা যাবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, জাহেরী রেওয়ায়েত অনুসারে স্বাধীনা স্ত্রী ও দাসীর দুধে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ বিষয়টি এমন নয় যে, স্বাধীনা স্ত্রীর দুধ তো বিক্রয়যোগ্য নয়; কিন্তু দাসীর দুধ বিক্রয়যোগ্য। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيْرِ، لِاَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، فَلَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ اِهَانَةً لَهُ، وَ يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَرْزِ لِلضَّرُوْرَةِ، فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَمَلَ لَا يَتَاَتّٰى بِدُوْنِهِ، وَيُوْجَدُ مُبَاحَ الْاَصْلِ. فَلَا ضَرُوْرَةَ اِلَى الْبَيْعِ، وَلَوْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ الْقَلِيْلِ اَفْسَدَهُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يُفْسِدُهُ، لِاَنَّ اِطْلَاقَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ دَلِيْلُ طَهَارَتِهِ، وَلِاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّ الْاِطْلَاقَ لِلضَّرُوْرَةِ، فَلَا تَظْهَرُ اِلَّا فِىْ حَالَةِ الْاِسْتِعْمَالِ، وَحَالَةُ الْوُقُوْعِ تُغَايِرُهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শূকরের পশম বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, শূকর সমস্তটাই নাপাক। সুতরাং তার হীনতা প্রকাশার্থে বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জুতা-মোজা সেলাইয়ের কাজে তার পশম ব্যবহার বৈধ। কারণ, জুতা ও মোজা সেলাইয়ের কাজ সাধারণত তা ব্যতীত সম্ভব হয় না। [এটা লেখকের যুগের কথা।] আর তা এমনিতে মালিকানাবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়, ফলে তার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন নেই। আর যদি তা [শরিয়ত নির্ধারিত] অল্প পানিতে পতিত হয়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তা পানিকে নাপাক করে দেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে তা নাপাক করবে না। কেননা, তা ব্যবহার করার শর্তহীন বৈধতা তার পবিত্র হওয়ার প্রমাণ। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, শর্তহীন ব্যবহারানুমতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দেওয়া হয়। সুতরাং এ প্রয়োজন শুধুমাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর পানিতে পতিত হওয়ার অবস্থা ব্যবহারের অবস্থার বিপরীত। [তাই পানি নাপাক বলে গণ্য হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيْرِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, [সর্বসম্মত অভিমতানুসারে] শূকরের পশম বিক্রয়যোগ্য নয়। কারণ, এর গোটা দেহটাই নাপাক। সুতরাং শূকরের বা তার দেহাংশের হীনতা প্রকাশ করার জন্য এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। তবে জুতা বা মোজা সেলাইয়ের কাজে শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। জুতা বা মোজা সেলাই ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাধারণভাবে এ জাতীয় কাজ শূকরের পশম দ্বারাই সম্পন্ন করা হতো। তবে বর্তমানে জুতা মোজা সেলাইয়ের কাজ শূকরের পশমের উপর নির্ভরশীল তো নয়ই; বরং কদাচিৎ এর ব্যবহার দেখা যায়। তাই এর ব্যবহার বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَيُوْجَدُ مُبَاحُ الْاَصْلِ الخ : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, যদি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শূকরের পশম ব্যবহার করা বৈধ হয়, তাহলে তো এর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হওয়া উচিত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, শূকরের পশম মালিকানাবিহীন হওয়াতে বিনামূল্যে এটা লাভ করা যায়, তাই এটার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে স্মরণযোগ্য যে, যদি তা বিনামূল্যে লাভ করা না যায়, তাহলে ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী (র.)-এর মতে এর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

এর পরবর্তী মাসআলা হলো, যদি অল্প পানিতে অর্থাৎ জারি অথবা শরিয়তের সংজ্ঞামতে বড় হাউজ না হলে অল্প পানিতে শূকরের পশম পড়ে গেলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পানি নাপাক হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দান প্রকারান্তরে তাকে পবিত্র বলে ঘোষণা দেওয়া। আর পবিত্র বস্তু পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হয় না। অতএব শূকরের পশম পানিতে পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো, শূকরের পশম দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়েছে। আর যে হুকুম বিশেষ প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে প্রদান করা হয়, তা অন্যদিকে সম্প্রসারিত হয় না, বরং যে স্থলে হুকুম এসেছে সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণে শূকরের পশম ব্যবহারের প্রয়োজন জুতা ইত্যাদি সেলাইয়ের কাজে তো প্রমাণিত। তাই এছাড়া অন্য কাজে এর ব্যবহার আবশ্যক নয়। পানিতে পতিত হওয়ার বিষয়াদি কোনো প্রয়োজন নয়, যাতে ব্যবহারানুমতি দেওয়া যেতে পারে; বরং পানিতে পতিত হওয়ার বিষয়টি ব্যবহারের বিপরীত। তাই এর পবিত্রতার বিধানও এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। এতে পবিত্রতার বিধান জারি না হলে পতিত হওয়ার কারণে পানি নাপাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর ফতোয়া।

প্রকাশ থাকে যে, যারা জুতা সেলাইয়ের কাজ করে তারা যদি শূকরের পশমসহ নামাজে দাঁড়ায় এবং পশম এক দিরহামের চেয়ে বেশি হয়, তাহলেও নামাজ হয়ে যাবে। এ মাসআলা যারা পশম পবিত্র বলেন তাদের মতানুসারে সঠিক হলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে সঠিক নয়। কারণ, তারা নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পশম সাথে রাখার প্রতি বাধ্য নয়; বরং তাদের পক্ষে পশম পৃথক কোনো স্থানে রেখে নামাজ আদায় করা সম্ভব। তাই নামাজরত অবস্থায় পশম থেকে দূরে থাকতে হবে এবং সাথে এক দিরহাম পরিমাণ পশম থাকলে নামাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

একটি পর্যালোচনা : হিদায়া প্রণেতার দুটি ইবারতের মধ্যে দৃশ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তা এভাবে যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা বস্তুর মান কমে যায়। যেমন– তিনি বলেছিলেন, মানুষের অঙ্গসমূহ সম্মানিত। তাই এগুলোকে বিক্রয়ের দ্বারা অপমান করা যায় না, সম্মান বজায় রাখার জন্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক কথায় বিক্রয়কে মানহানির কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। আর এখানে তিনি বলেছেন, শূকরের পশম বিক্রির বৈধতা পশমের জন্য সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়। কেননা, তিনি বলেছেন, শূকরের পশম বিক্রি এজন্য অবৈধ যে, এটাকে তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য। আর এটা তুচ্ছ বিবেচিত হবে যদি এর বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। আর এ কারণেই শূকরের পশম বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, একই বস্তু তুচ্ছতা ও সম্মানের দলিল হয় কিভাবে? এর উত্তর হলো, একটি বিষয় কারও জন্য সম্মানের কারণ হয়, আবার কারও জন্য সেটা তুচ্ছতারও কারণ হয়। যেমন– সম্রাট যদি এক হতদরিদ্র কৃষককে বলেন, তুমি লোকদের সাথে দরবারে বস, তাহলে এটা কৃষকের জন্য সম্মান ও সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে। পক্ষান্তরে সম্রাট যদি প্রধান বিচারককে বলেন, আপনি দরবারে উপস্থিত লোকদের সাথে বসে পড়ুন, তাহলে এটা প্রধান বিচারকের জন্য দুর্ভাগ্য ও অপমানের বিষয় হবে। এ উদাহরণ দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে, একই বিষয় কারও জন্য সম্মানের হয়, আবার কারও জন্য অসম্মানের হয়। আরেকটি উদাহরণ দেখুন– বোঝা বহন করা গাধার জন্য একটা সম্মানজনক কাজ, কিন্তু বোঝা বহন মানুষের জন্য অসম্মানের কাজ। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে মানুষ অনেক সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন, সেই তুলনায় শূকরের পশম নাপাক ও তুচ্ছ বস্তু। তাই মানুষের অঙ্গ-পতঙ্গ, তার অংশবিশেষ বিক্রয় করা ও এর বিনিময় গ্রহণ করা এবং মানুষকে জড় পদার্থের স্থলে নামিয়ে দেওয়া তার জন্য মর্যাদাহানিকর। তাই স্ত্রীলোকের দুধ বিক্রয় করা তার অসম্মানের কারণ। পক্ষান্তরে শূকর সর্বনিকৃষ্ট প্রাণী। তার গোটা দেহই নাপাক এবং এটা তুচ্ছ বস্তু। এটাকে যদি পণ্যরূপে বিক্রি করে এর বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা মর্যাদা লাভ করল এবং সম্মানের যোগ্য হয়ে গেল। তাই শূকরের পশম বিক্রয় একটি মর্যাদা লাভের দলিল হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ، وَلَا الْإِنْتِفَاعُ بِهِ، لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكَرَّمٌ لَا مُبْتَذَلٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَذَلًا، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، اَلْحَدِيثُ، وَإِنَّمَا يُرَخَّصُ فِيمَا يُتَّخَذُ مِنَ الْوَبَرِ، فَيَزِيدُ فِي قُرُونِ النِّسَاءِ وَ ذَوَائِبِهِنَّ ـ

অনুবাদ : মানুষের চুল বিক্রি করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। কেননা, মানুষ সম্মানযোগ্য– হীনকরণের বস্তু নয়। সুতরাং তার দেহের কোনো অংশকে অসম্মান ও হীন করা বৈধ হতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের চুল সংযুক্তকারিণী এবং সংযুক্ত করার আদেশকারিণীকে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করুন। তবে মেয়েদের খোঁপা ও বেণি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পশুর পশম ব্যবহারের অনুমতি আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُوْرِ الْإِنْسَانِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের প্রথম মাসআলাটি হলো, মানব কেশ ক্রয়-বিক্রয় কিংবা তার দ্বারা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। আর এর অবৈধতার কারণ হলো মানবদেহ এবং দেহের অংশবিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তাঁর মতে মানুষের চুল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথার চুল মুণ্ডিয়ে সাহাবীগণের মাঝে বণ্টন করে দেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল দ্বারা বরকত লাভ করতেন, তাদের রোগ-ব্যাধি ইত্যাদিতে তাঁর চুল ভিজানো পানি খেয়ে আরোগ্য লাভ করতেন। মানুষের চুল যদি ব্যবহার অযোগ্য হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল এভাবে বণ্টন করে দিতেন না। এমনকি সাহাবীগণও এর দ্বারা উপকৃত হতেন না। নাপাক তো নয়ই। এ বিষয়ে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ তায়বা মতান্তরে আবূ যাবইয়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রক্ত বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সেবন করেছিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভবিষ্যতে এরূপ করতে বারণ করেন। এতে বুঝা যায় যে, নাপাক দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত ঘটনা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল বণ্টন করা এবং সাহাবীগণের দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানবকেশ পবিত্র এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

মূল ইবারতে বর্ণিত জাহের রেওয়ায়েতের দলিল হচ্ছে মানুষ সম্মানযোগ্য। অসম্মান ও তুচ্ছ করার পাত্র মানুষ নয়। যে জিনিস সম্মান লাভের যোগ্য তার অংশবিশেষ কিংবা কোনো অঙ্গ-পতঙ্গকে হেয় করা বৈধ নয়। মানুষের চুল বিক্রয় কিংবা তা ব্যবহার করার দ্বারা তার চুলের অবমাননা হয়। এ কারণে তা বিক্রয় কিংবা তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। এর সমর্থন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ـ

وَاصِلَةٌ বলা হয় এমন মহিলাকে যে কোনো মহিলার চুল আরেকজনের চুলের সাথে সংযুক্ত করে। আর যে মহিলা এরূপ করার নির্দেশ প্রদান করে, তাকে مُسْتَوْصِلَةٌ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু ধরনের নারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের উল্লেখ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের চুল দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। আর এটাতো স্বাভাবিক কথা যে, যখন উপকৃত হওয়াই বৈধ নয় তখন বিক্রি করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

তবে বিভিন্ন প্রাণীর লোম-পশম ব্যবহার করে রমণীদের চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাতে কোনো বাধা নেই।

قَالَ : وَلَا بَيْعُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْبَغَ، لِاَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ، وَهُوَ اِسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوْغِ عَلٰى مَامَرَّ فِىْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا وَالْاِنْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ، لِاَنَّهَا طَهُرَتْ بِالدِّبَاغِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِىْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصَبِهَا وَصُوْفِهَا وَقَرْنِهَا وَشَعْرِهَا وَ وَبَرِهَا وَالْاِنْتِفَاعِ بِذٰلِكَ كُلِّهِ، لِاَنَّهَا طَاهِرَةٌ، لَا يَحُلُّهَا الْمَوْتُ، لِعَدَمِ الْحَيٰوةِ، وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَالْفِيْلُ كَالْخِنْزِيْرِ نَجِسُ الْعَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح)، وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ، حَتّٰى يُبَاعَ عَظْمُهُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দাবাগাত করার পূর্বে মৃত পশুর চামড়া বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা, তা উপকার লাভযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা মৃত পশুর কাঁচা [অর্থাৎ দাবাগাত করা হয়নি এমন] চামড়া দ্বারা উপকৃত হয়ো না। আর [উক্ত হাদীসে উল্লিখিত] ইহাব বলা হয় দাবাগাতহীন কাঁচা চামড়াকে [যা এখনও পাকা করা হয়নি]। যেমন সালাত অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দাবাগাত করার পর তা বিক্রয় করা ও তা দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা, তা দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয়ে গেছে। আমরা সালাত অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। মৃতপশুর হাড়, রগ, পশম, শিং, চুল ও লোম বিক্রি করা এবং এসব দ্বারা উপকার লাভ করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এগুলো পবিত্র, এগুলোতে প্রাণ বিদ্যমান না থাকায় মৃত্যু প্রবিষ্ট হয় না। আমরা ইতঃপূর্বে [তাহারাত অধ্যায়ে] বিষয়টি প্রমাণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হাতিও শূকরের মতো সামগ্রিকভাবে নাপাক। আর শায়খাইনের মতে, হাতি হিংস্রজন্তুর পর্যায়ভুক্ত। তাই এর হাড় বিক্রয় করা যায় এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ الخ : অর্থাৎ মৃত জন্তু তথা জবাইকৃত নয় এমন মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগাত করার পূর্বে বিক্রি করা নাজায়েজ। এর কারণ হলো, দাবাগাত করার পূর্বে চামড়া নাপাক থাকে। আর নাপাক বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করার বিধান নেই। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِاِهَابٍ অর্থাৎ 'তোমরা মৃত পশুর ইহাব দ্বারা উপকৃত হয়ো না।' ইহাব বলা হয় দাবাগাত করা হয়নি এমন কাঁচা চামড়াকে। এমন কাঁচা চামড়া নাপাক বিধায় এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই। মোটকথা, মৃত পশুর কাঁচা চামড়া শরিয়তের দৃষ্টিতে অব্যবহারযোগ্য এবং নাপাক হওয়ার কারণে এর বিক্রয় অবৈধ। তবে দাবাগাত করার পর এর বিক্রয় ও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কারণ, দাবাগাত দ্বারা চামড়া

শুকিয়ে তার অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। যেমন– জবাই করার দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। كِتَابُ الصَّلٰوةِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের প্রস্তুতি পর্ব তথা তাহারাত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

দাবাগাত মানে রোদে শুকান কিংবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চামড়া পরিশোধন করা। পরিশোধন দ্বারা চামড়া শুকিয়ে পবিত্র হয়। মৃত পশুর হাঁড়, শিরা-রগ, মৃত ভেড়া-বকরির পশম, শিং, অন্য মৃত পশুর লোম ও চুল বিক্রয় এবং এর দ্বারা যে কোনোভাবে উপকৃত হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা, এসব বস্তু পবিত্র। প্রথম থেকেই এগুলো প্রাণহীন হওয়ার কারণে এগুলোতে মৃত্যু প্রবিষ্ট হয় না। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, নিষ্প্রাণ বস্তুর মৃত্যু হয় না।

قَوْلُهُ وَالْفِيْلُ كَالْخِنْزِيْرِ الخ : এখানে লেখক হাতি সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে হাতিও শূকরের মতো সর্বস্ব নাপাক অর্থাৎ তার শরীরের কোনো অংশই পবিত্র নয়। তার চামড়া জবাই করার দ্বারা কিংবা দাবাগাত করার দ্বারা কোনোভাবেই পবিত্র হবে না।

পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) বলেন, হাতি হিংস্রপ্রাণীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এর ঝুটা ও গোশত নাপাক, তবে তা সত্তাগতভাব সর্বস্ব নাপাক নয়। তাই এর হাড়, দাঁত ইত্যাদি বিক্রয় করা ও ব্যবহার করা বৈধ। যেমন– হাতির দাঁত থেকে চিরুনি ও অন্যান্য অলঙ্কার তৈরি হয় এবং নারীরা ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়া হাতির উপর মানুষ আরোহী হয়ে একস্থান হতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে এবং হাতির উপর বোঝা বহন করে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতিমা (রা.) -এর জন্য হাতির দাঁতের তৈরি একজোড়া চুড়ি ক্রয় করেছিলেন। এসবের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাতি "নাজিসুল আইন"তথা সত্তাগতভাবে সর্বস্ব নাপাক নয়।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ السُّفْلُ لِرَجُلٍ وَعِلْوُهُ لِآخَرَ، فَسَقَطَا أَوْ سَقَطَ الْعِلْوُ وَحْدَهُ، فَبَاعَ صَاحِبُ الْعِلْوِ عِلْوَهُ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ حَقَّ التَّعَلِّيْ لَيْسَ بِمَالٍ، لِأَنَّ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ إِحْرَازُهُ، وَالْمَالُ هُوَ الْمَحَلُّ لِلْبَيْعِ، بِخِلَافِ الشِّرْبِ، حَيْثُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمُفْرَدًا فِيْ رِوَايَةٍ، وَهُوَ إِخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخَ (رح)، لِأَنَّهُ حَظٌّ مِنَ الْمَاءِ، وَلِهٰذَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ، وَلَهُ قِسْطٌ مِنَ الثَّمَنِ عَلٰى مَا نَذْكُرُهُ فِيْ كِتَابِ الشِّرْبِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ভবনের নিচতলা একজনের এবং উপরতলা আরেকজনের হয়, আর উভয়তলা [কোনো কারণে] ধ্বসে যায় অথবা শুধু উপরতলা ধ্বসে যায়। অতঃপর উপরতলার মালিক উপরতলা বিক্রি করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, উপরতলার অধিকার মাল নয় [যে, তা বিক্রি করা যাবে]। কেননা, মাল বলা হয় এমন দ্রব্যকে, যা সংরক্ষণ করা সম্ভব। আর মালই হলো বিক্রয়ের বস্তু, তবে শিরব তথা জমি সেচের অধিকারের প্রশ্নটি ভিন্ন। বর্ণিত সব মতানুসারে ভূমির অনুবর্তীরূপে তার বিক্রয় বৈধ। একটি রেওয়ায়েত তো এমনও আছে যে, পৃথকভাবেও এর বিক্রি বৈধ। এটা বলখের মাশায়েখগণের গৃহীত অভিমত। কেননা, এটা পানির অংশ, তাই [কারো] পানির হক নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং জমির দামের একটি অংশ তার জন্য ধার্য হয়। শিরব-বিষয়ক অধ্যায়ে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ السُّفْلُ لِرَجُلٍ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যদি কোনো ভবনের নিচতলার মালিক একজন হয় এবং আরেকজন উপরতলার মালিক হয়, [বর্তমান যুগে বহুতল বিশিষ্ট ভবনের এপার্টমেন্ট ও ফ্ল্যাটের যেমন একাধিক মালিক থাকে] অতঃপর কোনো কারণে উভয়তলা কিংবা উপরতলা ধ্বসে পড়ে। এমতাবস্থায় উপরতলার মালিক যদি উপরতলা তৈরি করার অধিকার অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, তার বিক্রীত বস্তু হলো উপরতলার অধিকার। আর উপরতলার অধিকার মাল নয়। আর মাল নয় এমন জিনিস বিক্রি করা বৈধ নয়। মাল না হওয়ার কারণ এই যে, উপরতলার অধিকার এমন খোলা স্থান যাতে শুধুমাত্র বাতাস রয়েছে। বাতাস কোনো মাল নয়। কারণ, বাতাস অধিকারে আনা যায় না এবং সংরক্ষণ করা যায় না। তবে উপরতলা যদি ভূপতিত না হয় এবং বসবাসযোগ্য হয়, তাহলে এর বিক্রয় বৈধ। কেননা, তখন বিক্রীত দ্রব্য হবে উপরতলা, যাতে দেয়াল-ছাদ, দরজা ও জানালা ইত্যাদি রয়েছে। আর এসব নিঃসন্দেহে মালরূপে গণ্য, আর মালতো বিক্রি করা যায়। যদি বিক্রয়ের সময় উপরতলা থাকে, কিন্তু ক্রেতার দখলে আসার পূর্বেই তা ধ্বসে পড়ে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, ক্রেতার দখলের পূর্বেই বিক্রীত পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিয়মানুসারে কব্জার পূর্বে পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং একই নিয়মে এখানেও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشِّرْبِ الخ : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, شِرْب বা পানি সেচের অধিকার তো জমির অধিকার সাব্যস্ত হয়, এতদসত্ত্বেও এর বিক্রয় বৈধ, অথচ এখানে উপরতলার অধিকার বিক্রয় বৈধ নয়। এ দুই হকের মাঝে তারতম্য কেন করা হলো? এর উত্তর হচ্ছে, شِرْب [পানি সেচের অধিকার] বলা হয় পানির একটি অংশকে। পানি তো মাল। এ কারণে কেউ যদি অন্যের شِرْب তথা পানির অংশ নিজের জমিতে সেচ দেয়, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ আদায় করা আবশ্যক হয়।

আর আমরা জানি মাল বিনষ্ট করার দ্বারা ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়, মাল নয় এমন বস্তু নষ্ট করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, সেচের অধিকার মাল, যার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হয় এবং শিরব এর বিনিময়ে মূল্য প্রদান করতে হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে ভূমি এবং ভূমির হক তথা শিরবসহ ক্রয় করল দশ হাজার টাকায়। এরপর পানি সেচের অংশের ভিন্ন এক দাবিদার বের হলো। অর্থাৎ অন্য এক ব্যক্তি শিরব দাবি করে তা নিয়ে নিল। অতঃপর ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পানির সেচের অংশ বাবদ কিছু ফেরত নিল। বিক্রেতাও তা সহজভাবে ফেরত দিল। এতে প্রমাণিত হলো যে, 'শিরব'-এর বিনিময়ে টাকা আসে এবং এটা আর্থিক দায়যুক্ত। আর যে জিনিসের বিনিময়ে মূল্য প্রদান করতে হয় তা অবশ্যই মাল। সুতরাং পানির হিস্যা মাল। আর মাল তো বিক্রয় করা যায়। সে মতে পানির হিস্যা বিক্রয় করা যাবে।

আর উপরতলার অধিকার সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, এটা মাল নয়। তাই তার বিক্রয় বৈধ হয় না। শিরব তথা পানির হিস্যা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা শিরব-বিষয়ক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য যে, পানির হিস্যা বিক্রয়ের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। সবার ঐকমত্যে ভূমির অনুবর্তীরূপে পানির হিস্যা বিক্রয় বৈধ। আর এক বর্ণনা অনুযায়ী পৃথকভাবেও পানির হিস্যা বিক্রি করা বৈধ। দ্বিতীয় মতটি বলখের মাশায়েখগণ কর্তৃক গৃহীত।

এখানে একটি প্রশ্ন এটাও সৃষ্টি হতে পারে যে, পানির হিস্যা বিক্রি বৈধ হওয়ার কারণ হলো, পানি মাল। আর মালের ক্রয়-বিক্রয় তো বৈধ। কিন্তু যদি ব্যাপার এমন হয় যে, পানি আগমনের স্থানে পানি অবিদ্যমান। এমতাবস্থায় শিরব বিক্রি বৈধ বলা হলে অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রয় করা হচ্ছে। আর অস্তিত্বহীন বস্তুর বিক্রি তো বৈধ নয়। সে মতে এ বিক্রি অবৈধ হওয়া সমীচীন। এর উত্তর হলো, পানির অবর্তমানে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পানির অস্তিত্ব কল্পনা করে বিক্রি করা হবে। যেমন– বাইয়ে সলমের মধ্যে একই ভিত্তিতে বিক্রয়কে বৈধ করা হয়েছে। বাইয়ে সালামের মধ্যে পণ্য অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে যেমন বিক্রয় বৈধ, তেমনি এখানেও পানির অনুপস্থিতিতে বিক্রয় বৈধ হবে। মোটকথা, পানির অবর্তমানে পানির অস্তিত্ব ধরে নিয়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিক্রয় বৈধ করা হয়েছে।

قَالَ : وَبَيْعُ الطَّرِيْقِ وَهِبَتُهُ جَائِزٌ، وَبَيْعُ مَسِيْلِ الْمَاءِ وَهِبَتُهُ بَاطِلٌ، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ، وَبَيْعُ حَقِّ الْمُرُوْرِ وَالتَّسْيِيْلِ، فَإِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ اَنَّ الطَّرِيْقَ مَعْلُوْمٌ، لِاَنَّ لَهُ طُوْلاً وَعَرْضًا مَعْلُوْمًا وَاَمَّا الْمَسِيْلُ فَمَجْهُوْلٌ، لِاَنَّهُ لَا يُدْرٰى قَدْرُ مَا يَشْغُلُهُ مِنَ الْمَاءِ، وَاِنْ كَانَ الثَّانِيْ فَفِيْ بَيْعِ حَقِّ الْمُرُوْرِ رِوَايَتَانِ، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ عَلٰى اَحَدِهِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ التَّسْيِيْلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُوْرِ مَعْلُوْمٌ لِتَعَلُّقِهِ بِمَحَلٍّ مَعْلُوْمٍ، وَهُوَ الطَّرِيْقُ، اَمَّا الْمَسِيْلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُوَ نَظِيْرُ حَقِّ التَّعَلِّيْ، وَعَلَى الْاَرْضِ مَجْهُوْلٌ لِجَهَالَةِ مَحَلِّهِ، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ حَقِّ الْمُرُوْرِ وَحَقِّ التَّعَلِّيْ عَلٰى اِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اَنَّ حَقَّ التَّعَلِّيْ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ لَا تَبْقٰى، وَهُوَ الْبِنَاءُ، فَاَشْبَهَ الْمَنَافِعَ، اَمَّا حَقُّ الْمُرُوْرِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبْقٰى، وَهُوَ الْاَرْضُ، فَاَشْبَهَ الْاَعْيَانَ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাস্তা বিক্রি করা এবং দান করা উভয়টি বৈধ। তবে পানির প্রবাহস্থান বিক্রি করা ও দান করা উভয় বাতিল। আলোচ্য মাসআলার দুটি সুরত রয়েছে– ১. খোদ রাস্তা এবং প্রবাহের স্থানটিই বিক্রয় করা, ২. পথ চলাচলের ও পানি প্রবাহিত করার অধিকার বিক্রয় করা। যদি এখানে প্রথম সুরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দুই মাসআলার মাঝে পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, রাস্তা জ্ঞাত হয়। কেননা, তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জানা থাকে। পক্ষান্তরে পানি প্রবাহের স্থান অজ্ঞাত। কেননা, এটা জানা যায় না যে, পানি কতটুকু স্থান পরিব্যাপ্ত করবে। আর যদি দ্বিতীয় সুরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে চলাচলের অধিকার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি বর্ণনা রয়েছে। [এক বর্ণনা মতে বিক্রয় বৈধ, অন্য মতে অবৈধ।] এক বর্ণনা [তথা বৈধ] মতে চলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকারের মাঝে পার্থক্য হলো, নির্দিষ্টস্থানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে চলাচলের অধিকারও জ্ঞাত এবং সুনির্দিষ্ট হয়। সে নির্দিষ্টস্থান হলো রাস্তা। আর ছাদের উপর পানি প্রবাহিত করার অধিকার তো কোনো ভবনের উপরিভাগের অধিকারের মতো। আর ভূমির উপর প্রবাহের অধিকার, সে তো জায়গার পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে অনির্দিষ্ট। দু বর্ণনার এক বর্ণনা মতে পথ চলাচলের অধিকার এবং বাড়ির উপরিভাগের অধিকারের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, বাড়ির উপরিভাগের অধিকারের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী বস্তুর সাথে [অর্থাৎ নিচতলা]। ফলে তা সংশ্লিষ্ট বস্তুর সুবিধার সদৃশ হলো। আর পথচলার অধিকারের সম্পর্ক স্থায়ী বস্তু তথা ভূমির সাথে, ফলে এটা বস্তু সদৃশ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبَيْعُ الطَّرِيْقِ وَهِبَتِهِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে মানুষ চলাচলের পথ ও পানি প্রবাহের স্থান সম্পর্কিত যে মাসআলা আলোচনা করেছেন উপরিউক্ত ইবারতে সে আলোচনাই করা হয়েছে। তিনি বলেন, চলাচলের পথ বিক্রি করা ও দান করা উভয় বৈধ, আর পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা ও দান করা বৈধ নয়। আর উল্লিখিত মাসআলার বিশ্লেষণে হিদায়া প্রণেতা বলেন, মাসআলাটির দুটি সুরত হতে পারে–

১. মানুষ চলাচলের পথ বিক্রি করা ও পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা।

২. চলাচলের পথ বিক্রি দ্বারা উদ্দেশ্য চলাচলের অধিকার বিক্রি করা, আর প্রবাহের স্থান বিক্রি করা দ্বারা উদ্দেশ্য পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা।

দ্বিতীয় সুরতে কোনো স্থান বিক্রি হচ্ছে না; বরং স্থানের উপর দিয়ে চলাচলের কিংবা প্রবাহিত হওয়ার অধিকারটুকু বিক্রি করা হচ্ছে। এরপর লেখক বলেন, প্রথম অবস্থায় স্বয়ং চলাচলের রাস্তাটুকু বিক্রি করা বৈধ, কিন্তু স্বয়ং পানি প্রবাহের স্থান বিক্রি করা অবৈধ। এ অবস্থায় একটির বিক্রয় অবৈধ আর অপরটির বিক্রয় বৈধ এ দুয়ের মাঝে স্পষ্টত পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, রাস্তা ও চলাচলের পথ সুনির্দিষ্ট। কেননা, এর নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে। যদি রাস্তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করে দেওয়া হয় তাহলে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। আর যদি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা নাও করা হয়, তবু তা শরিয়তগত বা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নির্ধারিত থাকে। যেমন– আমরা দেখতে পাই পৌরসভা, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কিংবা ইউনিয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে কোন রাস্তা কতটুকু হবে তা নির্ধারিত করা থাকে, শরিয়তগত নির্ধারণ সম্পর্কে বলা হয় বাড়ির প্রধান ফটক সমান রাস্তার প্রস্থ, আর তার দৈর্ঘ্য হবে মূল সড়কের সাথে সংযুক্ত হওয়া পর্যন্ত স্থানটুকু। মোটকথা, যেহেতু রাস্তার স্থানটুকু সুনির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত, সেহেতু তা নিয়ে বিবাদ ও ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কা নেই কিংবা খুবই কম। আর বিবাদ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হলে বিক্রয় বৈধ হয়।

পক্ষান্তরে পানি প্রবাহের স্থান পরিজ্ঞাত হয় না। প্রথমত এর কোনো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সুনির্দিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়ত প্যানির প্রবাহ কম ও বেশি হওয়ার ভিত্তিতে কখনো বেশি স্থান জুড়ে পানি প্রবাহিত হয়, ফলে পানি প্রবাহের স্থান অজ্ঞাত থাকে কিংবা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হয় না। আর এর দ্বারা বিক্রীত অংশ অজ্ঞাত হওয়াই প্রমাণিত হয়। আর নিয়মানুসারে বিক্রীত অংশ অজ্ঞাত হলে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হয়, তাই এ অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে। তবে যদি পানি প্রবাহের স্থানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট হয় এবং তা বিক্রয়চুক্তির মাঝে বর্ণনাও করা হয়, তাহলে পানি প্রবাহের স্থান বিক্রয় বৈধ হবে।

আর দ্বিতীয় সুরত যদি উদ্দেশ্য হয় [অর্থাৎ রাস্তার দ্বারা উদ্দেশ্যে] পথচলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকার। এমতাবস্থায় পথ চলাচলের অধিকার বিক্রয়ের ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। প্রথমত ইবনে সামাআর বর্ণনা অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি বৈধ। আর এটা অধিক সংখ্যক আলিমের মত।

দ্বিতীয়ত যিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনানুসারে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ। এ মতটি ইমাম কারখী (র.)-ও ফকীহ আবুল লাইছ (র.) গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটির তথা অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, পথচলাচলের অধিকার হলো সুবিধা ভোগের অধিকার। আর স্বতন্ত্রভাবে তা বিক্রি করা অবৈধ, তাই এর বিক্রিও অবৈধ হবে।

পক্ষান্তরে সব বর্ণনা অনুযায়ী পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা নাজায়েজ। সুতরাং যিয়াদাত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী পথ চলাচলের অধিকার ও পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রয়ের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। কেননা, উভয়ের বিক্রি অবৈধ, তবে ইবনে সামাআর বর্ণনা মতে পানি প্রবাহের অধিকার ও পথ চলাচলের অধিকার বিক্রির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর মতে পথ চলাচলের অধিকার বিক্রি করা বৈধ, আর পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ। এ দুটির মাঝে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে

লেখক বলেন, পথ চলাচলের অধিকার জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট। কারণ, এর সম্পর্ক নির্দিষ্ট স্থানের সাথে যুক্ত, সেই নির্দিষ্ট স্থান হচ্ছে রাস্তা, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করার দ্বারা কিংবা শরিয়ত/ স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে রাস্তার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে মোটকথা, যেভাবে হোক না কেন রাস্তা পরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট থাকে। তাই চলাচলের অধিকার রাস্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে পরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট হয়। আর যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়। এর বিপরীতে রয়েছে পানি প্রবাহের অধিকার। সাধারণভাবে পানি প্রবাহের অধিকার দু ধরনের হয়। পানি ছাদের উপর প্রবাহিত হয় অথবা পানি ভূমির উপরে প্রবাহিত হয়। যদি পানি ছাদের উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে এর অধিকার বিক্রি করা দু কারণে অবৈধ। প্রথমত ছাদে পানি প্রবাহের অধিকারের সম্পর্ক শূন্যের সাথে। আর শূন্যস্থান মাল নয়। ফলে এটা বাড়ির উপরিভাগের অধিকার সদৃশ হয়ে গেল। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বাড়ির উপরিভাগের অধিকার বিক্রি করা নাজায়েজ। সুতরাং পানি প্রবাহের অধিকার বিক্রি করাও নাজায়েজ হবে। দ্বিতীয়ত পানি প্রবাহের অধিকার অজ্ঞাত। কেননা, পানির স্বল্পতা ও আধিক্যের কারণে প্রবাহের মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে। আর যে কোনো অজ্ঞাত বিষয়ের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। তাই পানির প্রবাহের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ হবে। আর যদি পানি ভূমির উপরে প্রবাহিত হয়, তাহলে এর অবৈধতার কারণ হলো অজ্ঞতা। অর্থাৎ পানি প্রবাহের স্থান জ্ঞাত হয় না। আর যে কোনো অজ্ঞাত-অনির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু বিক্রি অবৈধ হয়ে থাকে। হযরত ইবনে সামাআর বর্ণনা অনুযায়ী পথ চলাচলের অধিকার বিক্রি করা বৈধ।

পক্ষান্তরে বাড়ির উপরিভাগের অধিকার [পূর্ব বর্ণিত] অবৈধ। এ দুয়ের মাঝের পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, উপরতেব্র অধিকারের সম্পর্ক এমন বস্তুর সাথে জড়িত, যা ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। সে বস্তু হলো নিচতলার বিল্ডিং। ফলে বাড়ির উপরিভাগের অধিকার সুবিধাদির সদৃশ হয়ে গেল। সুবিধাদির মতো বলার যুক্তি হলো, সুবিধাদি ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, এমনই বিল্ডিংও ক্ষণস্থায়ী হয়। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দিক থেকে একটি অপরটির মতো। আর বস্তুর সুবিধাদি বস্তু ছাড়া স্বতন্ত্র বিক্রি করা যায় না। সে মতে ঘর বা বাড়ির উপরিভাগের অধিকারও বিক্রি করা যাবে না। অন্যদিকে পথ চলাচলের অধিকারের সম্পর্ক স্থায়ী বস্তুর সাথে। এখানে সেই স্থায়ী বস্তুটি হলো ভূমি। এর ফলে পথ চলাচলের অধিকার মূলবস্তু সদৃশ হয়ে গেল। এখানেও দুয়ের মাঝে সাদৃশ্য স্থায়িত্বের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন মূলবস্তু স্থায়ী হয় তেমনি পথ চলাচলের অধিকারও স্থায়ী থাকবে। কথাটিকে এভাবেও বলা যায় যে, স্থায়ী বস্তুর সাথে যার সম্পর্ক হয় সেটাকেও স্থায়ী গণ্য করা হয়। আর যে কোনো মূলবস্তুর বিক্রয় বৈধ। সুতরাং পথ চলাচলের অধিকার বিক্রয়ও বৈধ হবে। তবে অনেকে লেখকের উক্ত পার্থক্য বর্ণনাকে নাকচ করে দেন এভাবে যে, স্থায়ী বস্তুর বিক্রয় যেমন বৈধ হয়, তেমন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর বিক্রয়ও ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ হয়, যদিও তা সুবিধাদির সদৃশ হয়ে থাকে। আবার স্থায়ী বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের বিক্রয়ও ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ হয় না। যেমন– বসবাসের অধিকার। বসবাসের সম্পর্ক বাড়ির সাথে। বাড়ি একটা স্থায়ী বস্তু এবং নিঃসন্দেহে মাল। তবু বসবাসের অধিকার বিক্রি করা অবৈধ। এসব বিবেচনা করে ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী সব ধরনের সুবিধা ভোগের অধিকার বিক্রয়কে অবৈধ বলেছেন। চাই সেটা পথ চলাচলের অধিকার হোক কিংবা পানি প্রবাহের অধিকার হোক। এজন্যই তিনি যিয়াদাতের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ، فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ كَبْشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ، حَيْثُ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ، وَالْفَرْقُ يَبْتَنِي عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي النِّكَاحِ لِمُحَمَّدٍ (رحـ)، وَهُوَ أَنَّ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَمَعَتَا فَفِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمّٰى وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، وَفِي مُتَّحِدِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَيَنْعَقِدُ لِوُجُوْدِهِ وَيَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ، كَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا عَلٰى أَنَّهُ خَبَّازٌ، فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثٰى مِنْ بَنِي اٰدَمَ جِنْسَانِ، لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَغْرَاضِ، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلتَّقَارُبِ فِيهَا، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هٰذَا دُوْنَ الْأَصْلِ، كَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ جِنْسَانِ، وَالْوَذَارِيِّ وَالزَّنْدَنِيْجِيِّ عَلٰى مَا قَالُوْا جِنْسَانِ مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি দাসী বিক্রি করল, অতঃপর দেখা গেল যে, সে দাস [দাসী নয়] তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে ভেড়া বিক্রি করে অতঃপর দেখা গেল যে, সেটা ভেড়ি তাহলে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হবে। তবে ক্রেতা [গ্রহণ ও বর্জনের] ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। এ দুটি মাসআলার পার্থক্য একটি মূলনীতির ভিত্তিতে হয়েছে, যা আমরা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনুসৃত নীতিরূপে বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। মূলনীতিটি হচ্ছে, কোনো বস্তুর নামোল্লেখ এবং তার প্রতি ইশারা যদি একই সাথে হয় অতঃপর ইশারাকৃত বস্তুটি ও উল্লিখিত নামের বস্তু ভিন্ন শ্রেণী হয়, তাহলে চুক্তিটি উল্লিখিত নামের বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর সেই উল্লিখিত নামের বস্তুটি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উল্লিখিত নাম ও ইশারাকৃত বস্তু একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে চুক্তি সম্পৃক্ত হবে এবং সেই বস্তুটি বিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি সম্পাদিত হবে। তবে উল্লিখিত গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। যেমন– কেউ এ শর্তে একজন দাস ক্রয় করল যে, সে রুটি প্রস্তুত করার কাজে অভিজ্ঞ। অতঃপর দেখা গেল যে, সে একজন লেখক। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মানবের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগত বেশি পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষকে ভিন্ন শ্রেণীরূপে বিবেচনা করা হয়। আর পশুদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত নৈকট্যের কারণে দুটিকে একই শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করা হয়। আর শ্রেণীগত ভিন্নতা-অভিন্নতার ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যগত দিকটিই গ্রহণযোগ্য, সত্তাগত বিষয় বিবেচ্য নয়। যেমন– সিরকা ও আঙ্গুরের সিরাকে [মূল এক হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে] দুটি ভিন্নশ্রেণী বিবেচনা করা হয়। আর ওয়াযারী ও যানদানিজী কাপড়কে ফিকহবিদগণের মতানুযায়ী উভয়টির উৎস অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুটি ভিন্ন শ্রেণী বিবেচনা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাগুলো আলোচনা করেন। প্রথম মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি এক দাসী বিক্রয় করল, ক্রেতা দাসী হিসেবে সেটিকে ক্রয় করে নিল, অতঃপর দেখা গেল যে, ক্রয়কৃত মানুষটি দাস-দাসী নয়। তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অনুষ্ঠিত চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর

তিনি দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করেন। মাসআলাটি হলো, কেউ একটি ভেড়া বিক্রি করল, বিক্রেতা বলল, আমি ভেড়া বিক্রি করলাম, উত্তরে ক্রেতা বলল, আমি ভেড়াটি ক্রয় করলাম। পরবর্তীতে যাচাই করে দেখা গেল যে, ক্রয়কৃত জন্তুটি ভেড়া নয়, ভেড়ি; তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অনুষ্ঠিত বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে।

মাসআলা দুটির মাঝে বিধানগত সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথম মাসআলায় চুক্তি বাতিল। আর দ্বিতীয় মাসআলায় উল্লিখিত পশু এবং বাস্তব পশু ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি বহাল থাকবে। এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হয়েছে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অনুসৃত একটি মূলনীতির ভিত্তিতে। সেই মূলনীতির আলোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা দরকার।

১. মানুষের মধ্যে নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন শ্রেণী, কিন্তু পশু-প্রাণীর মধ্যে নারী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন শ্রেণী নয়; বরং একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া কিংবা ভিন্ন হওয়া নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। যদি দুটির উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় তাহলে ভিন্ন শ্রেণী, যদিও উভয়ের মূল ও উৎস একই হয়। পক্ষান্তরে যদি দুটির উদ্দেশ্য এক হয় তাহলে একই শ্রেণীভুক্ত হবে, যদিও উভয়ের মূল ও উৎস ভিন্ন হয়। যেমন– আঙ্গুরের তৈরি সিরা ও আঙ্গুরের তৈরি সিরকা দুটি ভিন্ন শ্রেণী। যদিও উভয়ের উৎস ও মূল এক, অর্থাৎ আঙ্গুর। কেননা, যে উদ্দেশ্যে সিরকা তৈরি, সে উদ্দেশ্যে সিরা তৈরি নয়; বরং ভিন্ন। এমনিভাবে ওয়াযারী কাপড়, যা সমরকন্দের একটি গ্রাম ওযারে প্রস্তুত হয় এবং যানদানিজী কাপড়, যা বুখারার একটি গ্রাম যানদানায় প্রস্তুত হয়, এ দুটিকে ভিন্ন শ্রেণী গণ্য করা হয়। অথচ উভয় কাপড়ের মূল উৎস হচ্ছে তুলা। কারণ, দুটি দু উদ্দেশ্যে তৈরি এবং দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

   এ পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, মানবের পুরুষ ও স্ত্রী সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তাই পুরুষ ও নারী ভিন্ন শ্রেণী বিবেচিত হবে। দাস ও দাসীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, দাসী ঘরের অভ্যন্তরীণ ও গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত হয়, তা ছাড়া দাসী কখনো বিছানার সঙ্গিনী ও জননীরূপে ব্যবহৃত হয়। আর দাসকে ব্যবহার করা হয় ঘরের বাইরের কাজে। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ ও অন্যান্য কাজে। পক্ষান্তরে পশুদের স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ সবার মূল উদ্দেশ্য একটাই। যেমন– গোশ্‌ত খাওয়া, আরোহণ করা ও বোঝা বহন করানো ইত্যাদি। তাই পশুদের স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ একই শ্রেণীর অন্তর্গত হবে।

২. যদি কোনো বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় এবং তার প্রতি ইশারাও করা হয়, তাহলে দেখতে হবে ইশারাকৃত এবং নাম উচ্চারিত বস্তুটির শ্রেণী একই কিনা? যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে চুক্তির সম্পর্ক হবে ইশারাকৃত বস্তুটির সাথে। আর শ্রেণী যদি ভিন্ন হয়, তাহলে চুক্তির সম্পর্ক হবে নামোল্লিখিত বস্তুর সাথে।

৩. বিক্রয়চুক্তির মধ্যে বিক্রীত-পণ্য যদি অস্তিত্বহীন হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আর যদি বিক্রীত-পণ্যটি উপস্থিত থাকে, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষগুণ অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়। তবে ক্রেতার চুক্তি বাতিল করার অধিকার লাভ হয়।

   এ তিনটি বিষয়ের সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতি জড়িত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইশারা এবং নাম উচ্চারণ একত্রিত হয়, তাহলে দু সুরত–

১. ইশারাকৃত বস্তু এবং নাম উচ্চারিত বস্তুর শ্রেণী এক হলে চুক্তির সম্পর্ক হবে ইশারাকৃত বস্তুর সাথে এবং চুক্তিটি বিদ্যমান হওয়াতে চুক্তি বহাল থাকবে। তবে বিশেষ গুণের অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে।

২. ইশারাকৃত বস্তু ও নাম উচ্চারিত বস্তুদ্বয়ের শ্রেণী ভিন্ন হলে চুক্তির সম্পর্ক হবে নাম উচ্চারিত বস্তুর সাথে এবং সেই বস্তুটি অবিদ্যমান হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

এখন আসা যাক আমাদের আলোচ্য মাসআলায় : প্রথম মাসআলায় ইশারাকৃত হলো দাস, আর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে দাসীর। দাস ও দাসী ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। অতএব বিক্রয়-চুক্তির সম্পর্ক হবে নাম উচ্চারিত তথা দাসীর সাথে এবং দাসী এখানে অনুপস্থিত। আর অনুপস্থিত বস্তুর বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়। সেমতে এখানেও ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কৃতচুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্বের চুক্তিটি রহিত হবে। আলোচ্য দ্বিতীয় মাসআলায় ইশারাকৃত হলো ভেড়ি, আর নাম উচ্চারিত হয়েছে ভেড়ার। এ দুটির শ্রেণী এক। এ কারণে বিক্রয়চুক্তির সম্পর্ক হবে ভেড়ির সাথে। আর ভেড়ি বিদ্যমান। নিয়মানুযায়ী বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি সহীহ হয়ে যায়। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে নাম উচ্চারিত হয়েছিল ভেড়ার অর্থাৎ পুংলিঙ্গের। পুংলিঙ্গ হওয়া পশুদের মধ্যে একটি গুণবিশেষ। সেই গুণটি আমাদের এ বিক্রয়চুক্তিতে অবিদ্যমান। অথচ বিক্রয়চুক্তির সময় তা বিদ্যমান হওয়ার প্রতিশ্রুতি বিক্রেতার পক্ষ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে ক্রেতা সেটা অনুপস্থিত পেল, তাই ক্রেতার বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার অধিকার লাভ হবে। এখন ক্রেতা ইচ্ছা করলে চুক্তি রহিত করতে পারে, আবার রাখতেও পারে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِاَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةً اَوْ نَسِيْئَةً، فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنَ الْبَائِعِ بِخَمْسِ مِائَةٍ قَبْلَ اَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ لَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ الثَّانِىْ، وَقَالَ الشَّافِعِىُّ (رحـ) : يَجُوْزُ، لِاَنَّ الْمِلْكَ قَدْ تَمَّ فِيْهَا بِالْقَبْضِ، فَصَارَ الْبَيْعُ مِنَ الْبَائِعِ وَمِنْ غَيْرِهٖ سَوَاءً، وَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ اَوْ بِالزِّيَادَةِ اَوْ بِالْعَرْضِ، وَلَنَا قَوْلُ عَائِشَةَ (رضـ) لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتِّ مِائَةٍ بَعْدَمَا اِشْتَرَتْ بِثَمَانِ مِائَةٍ : بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ، اَبْلِغِىْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ : اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبْطَلَ حَجَّهٗ وَجِهَادَهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اِنْ لَمْ يَتُبْ، وَلِاَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِىْ ضَمَانِهٖ، فَاِذَا وَصَلَ اِلَيْهِ الْمَبِيْعُ وَ وَقَعَتِ الْمُقَاصَّةُ، بَقِىَ لَهٗ فَضْلُ خَمْسِ مِائَةٍ، وَ ذٰلِكَ بِلَا عِوَضٍ، بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَ بِالْعَرْضِ، لِاَنَّ الْفَضْلَ اِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নগদ অথবা বাকিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে অতঃপর তা কব্জা করে। তারপর মূল্য পরিশোধের পূর্বেই বিক্রেতার কাছে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বৈধ হবে। কেননা, কব্জা করার দ্বারা দাসীর উপর ক্রেতার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে এখন বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করা আর অন্যদের কাছে বিক্রয় করা একই পর্যায়ের হয়ে গেছে। তাছাড়া [কমমূল্যে] বিক্রয়টি প্রথম মূল্যে বিক্রি করা অথবা বেশি মূল্যে বিক্রি করা কিংবা পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করার মতোই হলো। আমাদের দলিল হলো, হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি "তোমার ক্রয় ও বিক্রয় খুবই নিকৃষ্ট হয়েছে।" কথাটি তিনি সেই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, যে আটশ দিরহামে ক্রয় করে ছয়শ দিরহামে বিক্রি করেছিল। [তিনি আরও বলেছিলেন,] তুমি যায়েদ ইবনে আরকামকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, সে যদি তওবা না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে করা তার হজ ও জিহাদ বাতিল করে দেবেন। তাছাড়া এজন্য যে, [বিক্রেতা মূল্য কব্জা না করার কারণে] মূল্য এখনো বিক্রেতার দায়ভুক্ত হয়নি। এখন যদি বিক্রীত-পণ্য তার মালিকানায় পৌঁছে যায় এবং [প্রথম বিক্রয় ও দ্বিতীয় বিক্রয়ের] মূল্য কাটাকাটি হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতার কাছে পাঁচশ দিরহাম উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আর এটা থাকে কোনো বিনিময় ছাড়াই [যা শরিয়তে নিষিদ্ধ]। পণ্যের বিনিময়ে বিক্রির মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, উদ্বৃত্তটা শ্রেণী অভিন্নতার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস্ সাগীর গ্রন্থে উপরিউক্ত মাসআলাটি আলোচনা করেন।
মাসআলা : কেউ নগদ কিংবা বাকিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করল এবং তা কব্জাও করল। তারপর মূল্য পরিশোধের আগেই বিক্রেতার কাছেই পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে দাসীটি বেচে দিল, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রিটি শুদ্ধ হলো কিনা ? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আহনাফের অভিমত হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও এ মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য যে, এখানে উদাহরণস্বরূপ দাসী ও পাঁচশ দিরহামের উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং যদি দাসী ছাড়া অন্য কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয় এবং প্রথম মূল্যের চেয়ে কম যে কোনো অঙ্ক হয়, তাহলেও একই কথা প্রযোজ্য। যেমন- কেউ বিক্রেতার কাছে এক হাজার টাকায় পণ্য কিনে সেটাকে আবার নয়শত পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করল তাতেও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ আমাদের মতে দ্বিতীয় বিক্রয় অবৈধ, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে বৈধ। ফকীহগণের পরিভাষায় এ মাসআলাটিকে "شِرَاء مَا بَاعَ بِاَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ" বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে بَيْعِ عَيْنَه -ও বলা হয়। উল্লেখ্য যে, মাসআলাটির কয়েকটি সুরত হতে পারে। প্রথমত ক্রেতা যার কাছ থেকে কিনেছে তার কাছে সরাসরি বিক্রি না করে অন্য ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে এবং সেই ব্যক্তি প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে, তাহলে এ বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ হবে। এ সুরত অর্থাৎ কোনো মাধ্যমে যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে পূর্ব মূল্যে কিংবা তার চেয়ে কমে অথবা তার চেয়ে বেশি মূল্যে কিংবা অন্য পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলে সবার ঐকমত্যে বিক্রি শুদ্ধ হবে। আর যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে সরাসরি বিক্রি করে, তাহলে দু সুরত-

১. প্রথম মূল্যের কমে বিক্রি করবে।

২. প্রথম মূল্যের কম ছাড়া যে কোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করবে।

দ্বিতীয় সুরতটি সবার ঐকমত্যে বৈধ। প্রথম সুরতটির মধ্যেই কেবল মতবিরোধ। এ সুরতটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বৈধ, আর অন্যদের মতে অবৈধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, যখন ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য অধিকার করে ফেলে, তখন তার মালিকানা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। মালিকানা সম্পূর্ণ হওয়ার কারণেই বিক্রেতা ছাড়া অন্য যে কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা বৈধ হয়ে যায়। সেহেতু অন্য যে কারোর হাতে বিক্রি বৈধ,তাই বিক্রেতার কাছেও বিক্রি করা বৈধ হবে। তাছাড়া বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যে কিংবা প্রথম মূল্যের বেশি দামে অথবা পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করা যেহেতু বৈধ, সুতরাং প্রথম মূল্যের কমেও বিক্রি করা বৈধ হবে মোটকথা, ইমাম শাফেয়ী (র.) বিরোধপূর্ণ এ মাসআলাটিকে বিরোধমুক্ত বৈধ মাসআলার উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলিল হলো যুক্তি এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস। হিদায়ায় বর্ণিত হাদীসটি এই-

قَوْلُ عَائِشَةَ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِتِّ مِائَةٍ بَعْدَمَا اشْتَرَتْ بِثَمَانِ مِائَةٍ : بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَاشْتَرَيْتِ اَبْلِغِيْ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبْطَلَ حَجَّهٗ وَجِهَادَهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَّمْ يَتُبْ .

এ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রেতা ছিলেন যায়েদ ইবনে আরকাম, আর ক্রেতা ছিলেন মহিলা। সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফা হয়েছে হযরত যায়েদ (রা.) -এর। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর রেওয়ায়েত। এ রেওয়ায়েতটি মুসনাদে ইমামে আ'যমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِىِّ عَنِ امْرَأَةِ اَبِى السَّفَرِ اَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اِنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ بَاعَنِىْ جَارِيَةً بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنِّىْ بِسِتِّ مِائَةٍ فَقَالَتْ اَبْلِغِيْهِ عَنِّىْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَبْطَلَ جِهَادَهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَتُبْ .

হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ঘটনায় হযরত যায়েদ (রা.) ছিলেন বিক্রেতা এবং তাঁরই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। তবে হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত অন্যরা এভাবে বর্ণনা করেন যে,

رَوَى الْاِمَامُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ عَنْ اِمْرَأَتِهِ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى عَائِشَةَ هِىَ وَاُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ فَقَالَتْ اُمُّ وَلَدِ زَيْدٍ لِعَائِشَةَ اِنِّىْ بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ غُلَامًا بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً وَاشْتَرَيْتُهُ بِسِتِّ مِائَةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ اَبْلِغِىْ زَيْدًا اَنَّكَ قَدْ اَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَّا اَنْ تَتُوْبَ. بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتَ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتَ.

এ রেওয়ায়েতটিতে দেখা যাচ্ছে বিক্রেতা ও মুনাফা অর্জনকারী হচ্ছে মহিলা আর ক্রেতা হচ্ছেন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম। দুটি রেওয়ায়েতের মধ্যে দ্বিতীয়টি সনদের বিচারে উত্তম। হাদীসটি বর্ণনাকারী আবূ ইসহাকের স্ত্রী 'আলিয়া' সম্পর্কে দারাকুতনীর মন্তব্য যে, 'তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ছিলেন' তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইবনে সা'দ তাবাকাতে উল্লেখ করেন।

সারকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যদের বর্ণনার মাঝে সামান্য পার্থক্য থাকলেও প্রথম মূল্যের কমে দ্বিতীয় বিক্রয় হারাম হওয়া কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায় দুই রেওয়ায়েত দ্বারাই। একথা তো বলাই বাহুল্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জেনেই উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী তা করেননি। কেননা, এটা ইজতিহাদী বিষয়ও নয়। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) এ ধরনের চুক্তি যারা করে তাদের শাস্তি বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ্ তার হজ ও জিহাদ বাতিল করে দেবেন। যে কোনো কাজের শাস্তি কিংবা পুরস্কার ইজ্‌তিহাদ বা যুক্তির আলোকে বর্ণনা করা যায় না। তাই তিনি যা কিছু এ ব্যাপারে বলেছেন, অবশ্যই তা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শ্রুত হয়েই বলেছেন। আর এটাও সুনিশ্চিত যে, এ ধরনের ধমক ও শাস্তি কোনো শুদ্ধ চুক্তির ব্যাপারে বলা হবে না, বরং অশুদ্ধ চুক্তির ব্যাপারেই ধমক আসতে পারে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, شِرَاء مَا بَاعَ بِاَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ অবশ্যই ফাসিদ ও অগ্রাহ্য চুক্তি। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, হাদীসের শব্দ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ যে, بِعْتُهَا مِنْ زَيْدٍ بِثَمَانِ مِائَةٍ اِلَى الْعَطَاءِ অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করা হবে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা পাওয়ার পর এই শর্তে বিক্রয় করেছি। اِلَى الْعَطَاءِ -এর কয়েদের কারণে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যায়। اِلَى الْعَطَاءِ অর্থাৎ 'বেতন-ভাতা পাওয়ার পর' কথাটি একটি অনির্দিষ্ট সময়। আর বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের সময় অনির্দিষ্ট থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়। অতএব একই কারণে এখানেও বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে শাস্তির বর্ণনা এসেছে। মোটকথা, শাস্তির বর্ণনা بَيْع اِلَى الْعَطَاء -এর কারণে এসেছে; প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয়ের কারণে নয়। এর উত্তর হলো, এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) -এর মাযহাব হলো, بَيْع اِلَى الْعَطَاء শুদ্ধ এবং বৈধ। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) -এর মতে بَيْع اِلَى الْعَطَاء শুদ্ধ ও বৈধ, সেহেতু তিনি এ ব্যাপারে শাস্তি বর্ণনা করতে পারেন না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, بَيْع اِلَى الْعَطَاء -এর ব্যাপারে শাস্তি বর্ণিত হয়নি; বরং শাস্তির বর্ণনা এসেছে شِرَاء مَا بَاعَ بِاَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ -এর উপর, তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন بِئْسَ مَا شَرَيْتَ। আর দ্বিতীয় বিক্রিতে মূল্য বাকি রাখা হয়নি, এভাবেও প্রমাণিত হয় যে, মেয়াদ অজ্ঞাত রাখার কারণে শাস্তির বর্ণনা আসেনি।

এখানে এ প্রশ্নও জাগতে পারে যে, হাদীসে শাস্তি বর্ণনা এ কারণে এসেছে যে, মহিলাটি দাসী নিজ কব্জায় নেওয়ার আগেই তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ اَلتَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ-এর কারণেই শাস্তির ঘোষণা এসেছে। এর উত্তর হলো, যখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের কথা হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) জানতে পারেন, তখনই তিনি এ ব্যাপারে

দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভুল স্বীকার করেন। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) তার সামনে সুদ সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন। সুদের আয়াত তিলাওয়াত এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁর শাস্তি বর্ণনা মূলত সুদের কারণেই– কব্জা করার পূর্বে হস্তক্ষেপের কারণে নয়। উল্লেখ্য যে, আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, شِرَاءُ مَا بَاعَ بِاَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ-এর মধ্যে সুদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সুতরাং এ পদ্ধতির বিক্রয়ের ব্যাপারেই শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা এও বর্ণনা করেছি যে, এ ধরনের বিক্রয়কে بَيْعِ عَيْنِيَه বলা হয়। আর بَيْعِ عَيْنِيَه সম্পর্কে অন্য হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হাদীসটি এই–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتٰى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَرٰى اَحَدُنَا اَنَّهٗ اَحَقُّ بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرَاهِمِ مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ اَصْبَحَ الدِّيْنَارُ وَالدَّرَاهِمُ اَحَبَّ اِلٰى اَحَدِنَا مِنْ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا ضَمِنَ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرَاهِمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعَيْنِيَةِ وَاتَّبَعُوْا اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتّٰى يُرَاجِعُوْا مَا بَيْنَهُمْ قَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَ رِجَالُهٗ ثِقَاتٌ ـ

এ হাদীস দ্বারাও بَيْعِ عَيْنِيَه নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়। এ জাতীয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার যুক্তি হলো, মূল্য এখনও বিক্রেতার আয়ত্তে আসেনি। এরপর যখন পণ্য পুনরায় বিক্রেতার কাছে চলে আসল অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিক্রয় হলো এবং মূল্য কাটাকাটি হয়ে গেল, তারপরেও বিক্রেতার পাওনা হলো পাঁচশত টাকা। এ পাঁচশ টাকা সে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই লাভ করল। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম বিক্রিতে [উদাহরণস্বরূপ] যায়েদ এক হাজার টাকায় একটি দাসী খালেদের কাছে বিক্রি করল। খালেদ দাসী কব্জা করল, কিন্তু এখনও মূল্য পরিশোধ না করেই আবার দাসীটি যায়েদের কাছেই বিক্রি করে দিল পাঁচশ টাকায়। এতে পরস্পরে মূল্য কাটাকাটি করার পর খালেদের পাওনা মিটে গেল এবং যায়েদের পাঁচশ পাওনাও মিটে গেল। এরপরেও যায়েদের পাঁচশ পাওনা রয়ে গেল। এ পাঁচশ টাকা যায়েদ পাচ্ছে, অথচ বিনিময়ে তাকে কোনো কিছুই দিতে হচ্ছে না। আর বিনিময় ছাড়া যে কোনো লাভ বা অতিরিক্ত পাওনা সুদ বিবেচিত হয়, আর সুদ হারাম। এখানে যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয় সুদের উৎস, তাই দ্বিতীয় বিক্রয় অবৈধ ও হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে দাসীটি পণ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে– উদাহরণস্বরূপ দাসীটি গমের বিনিময়ে বিক্রি করল, তাহলে এ বিক্রয় বৈধ, যদিও পণ্যের মূল্য প্রথম মূল্যের চেয়ে কম হয়ে থাকে। তবে এ কম হওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা, প্রকৃত কমবেশি তখনই প্রকাশ পাবে, যখন প্রথম মূল্য ও দ্বিতীয় মূল্য এই শ্রেণীর হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিনিময় মাধ্যম ছিল দিরহাম এবং পরবর্তী বিনিময় মাধ্যমও দিরহাম, তাহলে একই শ্রেণীর হলো। এখন প্রথম দিরহামের চেয়ে পরবর্তী দিরহাম পরিমাণে ও সংখ্যায় কম হলে প্রকৃত কমবেশি হলো। একই শ্রেণীভুক্ত না হলে প্রকৃতার্থে কমবেশি নিরূপণ করা যায় না। যেমন– কেউ প্রশ্ন করল যে, হাতি বড় নাকি গাছ বড়? এর উত্তরে বলা হবে, এটা একটা অনর্থক প্রশ্ন। কেননা, ছোট-বড় একই শ্রেণীর দুটি জিনিসের মধ্যে প্রকাশ করা যায়। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছোট-বড় নিরূপণ করা যায় না। হাতি এবং গাছ দুটি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। এর কোনোটি ছোটও না, আবার কোনোটি বড় নয়। সুতরাং প্রথম মূল্য ও দ্বিতীয় মূল্য যদি ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে এদের মাঝে অতিরিক্ত অংশ নির্ধারণ করা যাবে না, যা সুদ বলে গণ্য হতে পারে। আর সুদই ছিল নিষেধাজ্ঞার কারণ। যেহেতু পণ্যের বিনিময়ে সুদ হয় না, তাই দ্বিতীয় বিক্রি অবৈধ হবে না। এমনিভাবে যদি বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তাহলেও বৈধ। কেননা, তখন লাভ বিক্রেতার হচ্ছে না; বরং লাভ হচ্ছে অন্য ব্যক্তির। আর বিক্রেতার বিনিময় ছাড়া লাভই সুদ গণ্য হয়।

এমনিভাবে যদি ক্রেতা বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে [সুদ না হওয়ার কারণে] দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ। তদ্রূপ ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তাহলেও দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হবে। এ অবস্থায় মুনাফা হবে ক্রেতার, আর পণ্য/ দাসীটি বিক্রেতার হাতে চলে যাবে। আর ক্রেতার যে লাভ হলো তা অবশ্য কোনো বিনিময় ছাড়া নয়; বরং তার এ মুনাফা হয়েছে বিক্রীত-পণ্যের পরিবর্তে বা বিনিময়ে। আমরা জানি যে, যে মুনাফা কোনো কিছুর বিনিময়ে হয় তা সুদ নয়। অতএব এ সুরতটিও নিঃসন্দেহে বৈধ।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِخَمْسِ مِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأُخْرٰى مَعَهَا مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ بِخَمْسِ مِائَةٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِى الَّتِىْ لَمْ يَشْتَرِهَا مِنَ الْبَائِعِ وَيَبْطُلُ فِى الْأُخْرٰى، لِأَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ بِمُقَابَلَةِ الَّتِىْ لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْهُ، فَيَكُوْنُ مُشْتَرِيًا لِلْأُخْرٰى بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ ، وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَنَا ، وَلَمْ يُوْجَدْ هٰذَا الْمَعْنٰى فِىْ صَاحِبَتِهَا ، وَلَا يَشِيْعُ الْفَسَادُ ، لِأَنَّهُ ضَعِيْفٌ فِيْهَا ، لِكَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيْهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ الرِّبٰوا ، أَوْ لِأَنَّهُ طَارٍ ، لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِانْقِسَامِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُقَاصَّةِ ، فَلَا يَسْرِىْ إِلٰى غَيْرِهَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ একটি দাসী পাঁচশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল, তারপর এটি এবং এর সাথে আরেকটি দাসীকে একত্রে বিক্রেতার কাছে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই পাঁচশ দিরহামে বিক্রি করে দিল, তাহলে যে দাসীটি বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেনি তার ক্ষেত্রে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হবে। আর অন্যটির ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, যে দাসীটি সে বিক্রেতা থেকে কিনেনি তার জন্য কিছু মূল্য ধরা আবশ্যক, আর তখন অন্যটি বিক্রয়মূল্য থেকে কমে কেনা হলো। আর তা আমাদের কাছে ফাসিদ। তার সঙ্গী দাসীর মধ্যে এ ব্যাপারটি পাওয়া যাচ্ছে না। আর বিক্রয়ের একাংশের ফাসাদ ও অবৈধতা এই দাসীর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবে না। কেননা, মাসআলাটি ইজতিহাদ নির্ভর হওয়ার কারণে যে দাসী কিনে বিক্রি করা হয়েছে তার মধ্যে ফাসাদের উপস্থিতি দুর্বল। অথবা সুদের সাদৃশ্যের কারণে ফাসাদ এসেছে। [এখন যদি আমরা পরবর্তী দাসীটির ক্ষেত্রে ফাসাদকে প্রসারিত করি, তাহলে তা হবে সুদের সদৃশ এর সদৃশ। আর তা ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে না।] অথবা তা পরবর্তীতে উদ্ভূত। কেননা, তা [ফাসাদ] মূল্যকে বণ্টন করার দ্বারা অথবা কাটাকাটি করার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে তা অন্যের প্রতি প্রসারিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً اَلخ : উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত একটি মাসআলা জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাসআলাটি পূর্বের মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। মাসআলাটির সুরত হলো, এক ব্যক্তি পাঁচশ দিরহামে একটি দাসী কিনে নিল। তারপর মূল্য শোধ করার আগেই ক্রেতা এই দাসী ও তার সাথে অন্য এক দাসী একত্রে বিক্রেতার কাছেই পাঁচশ দিরহামে বেচে দিল। তাহলে যে দাসীটি বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেনি তার বিক্রয় বৈধ হবে আর যে দাসীটি বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেছিল তার বিক্রয় বৈধ হবে না। এর দলিল হলো, ক্রেতা দুটি দাসী বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করছে পাঁচশ টাকায়। তাই এ পাঁচশ টাকা উভয় দাসীর বিনিময় সাব্যস্ত হলো। অর্থাৎ পাঁচশ দিরহামের কিছু অংশ সেই দাসীর বিনিময় হবে যা সে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করেনি। আর বাকি অংশ সেই দাসীর বিনিময়ে হবে যা সে ক্রেতার কাছ থেকে কিনেছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, দাসীটি পাঁচশ টাকায় কেনা হয়েছে। এখন আবার দাসীটি পাঁচশ দিরহামের কমে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এতে شِرَاء مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ প্রযোজ্য হচ্ছে। আমাদের মতে এটা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং বিক্রেতা থেকে কেনা দাসীটির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়

দাসী যাকে ক্রেতা তার নিজের পক্ষ থেকে যুক্ত করেছে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এতে شِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ যেহেতু হয়নি এবং এতে সুদের সৃষ্টি হয়নি, তাই এর বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে।

وَلَا يَشِيعُ الْفَسَادُ লেখক এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের অপনোদন করছেন। প্রশ্নটি হলো, বিক্রেতা যে দাসীটি বিক্রি করেছিল সেটা কেনা যেহেতু তার জন্য ফাসিদ ও অবৈধ হওয়া প্রমাণিত হলো, তখন যে দাসীটি সে বিক্রি করেনি সেটির ক্রয়ও ফাসিদ ও অবৈধ হওয়া উচিত। কারণ, দুটি দাসীকে এখন সে একত্রে এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে ক্রয় করছে। একই চুক্তির অধীনে দুটি দাসীর মধ্যে একটিতে বিক্রি বৈধ– অন্যটিতে বিক্রি অবৈধ তা কি করে হয়? এর উত্তর হলো, বিক্রেতা যে দাসীটি পাঁচশ টাকায় বিক্রি করেছিল তা কিনতে গিয়ে যে সমস্যা তাতে সৃষ্টি হয়েছে তাতো একান্ত তার মাঝেই হয়েছে দ্বিতীয়টির মধ্যে তা হয়নি। আর প্রথমটির অবৈধতা ও বাতিল হওয়া দ্বিতীয়টির মধ্যে সম্প্রসারিত হবে না। কেননা, প্রথম দাসীর মধ্যে যে ফাসাদের উপস্থিতি রয়েছে তা দুর্বল ও কম শক্তিশালী। আর দুর্বল ফাসাদ ও অবৈধতা অন্যটির প্রতি স্থানান্তরিত ও প্রসারিত হতে পারে না। তাই এ ফাসাদ দ্বিতীয় ও পরবর্তীতে যুক্ত করা দাসীর মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না। এখন এ প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, প্রথমটির মধ্যে ফাসাদ ও অবৈধতা দুর্বল কেন? এর উত্তর হলো, কয়েক কারণে এর মধ্যে ফাসাদের উপস্থিতি দুর্বল–

১. উল্লিখিত 'প্রথম মূল্যের কম মূল্যে দ্বিতীয় বিক্রি' অবৈধ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ইজতিহাদ নির্ভর মাসআলা। এর সপক্ষে প্রত্যক্ষ নস নেই। ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে আহনাফ এটাকে অবৈধ বলেন আবার ইমাম শাফিঈ (র.) একে বৈধ বলেন। উল্লেখ্য যে, যে মাসআলায় ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে মতবিরোধ হয় সে মাসআলার অবৈধতার বিষয়টি দুর্বল বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং এ মাসআলার অবৈধতা-ফাসাদ দুর্বল।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, যে দাসীকে বিক্রেতা পাঁচশ টাকায় বিক্রি করেছিল সেটাকে আবার মূল্য পরিশোধের পূর্বেই প্রথম মূল্যের কমে ক্রয় করার কারণে এতে সুদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, আর সুদ যেমন অবৈধ, তেমনি সুদের সন্দেহপূর্ণ বিষয়ও অবৈধ। তবে এটা স্পষ্ট যে, কোনো বিষয়ে সুদের সন্দেহ থাকা নিশ্চিত সুদের উপস্থিতির চেয়ে দুর্বল। এ কারণে বেচে দেওয়া দাসী কেনাতে যে ফাসাদ ও অবৈধতা সৃষ্টি হয়েছে তাও দুর্বল।

৩. দুর্বলতার তৃতীয় কারণ হলো, বিক্রেতা যে দাসী বেচে দিয়েছিল তা আবার কম মূল্যে ক্রয় করতে যাওয়ার কারণে যে দুর্বলতা তাতে সৃষ্টি হয়েছে তা দ্বিতীয় বিক্রয়ের কারণে উদ্ভব হয়েছে। সে অবৈধতা প্রথম চুক্তি ও বিক্রির মধ্যে ছিল না। অবৈধতা দুভাবে সৃষ্টি হয়–

১. ক্রেতা যখন দুটি দাসী একত্রে পাঁচশ টাকায় বিক্রেতার কাছে পুনরায় বিক্রি করছে, তখন দুটি দাসীর বিনিময় পাঁচশ টাকা নির্ধারণ করা শুদ্ধ হবে। কেননা, ক্রেতার পক্ষ থেকে কোন দাসীর কত মূল্য তা নির্ধারণ করা হয়নি। কিন্তু উভয়টির জন্য এক এক অংশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এখন বিক্রেতা যে দাসী বিক্রি করেছিল তার মূল্য হবে পাঁচশ দিরহামের একাংশ, আর অন্য দাসীর বাকি অংশ। এখন বিক্রেতা তার বেচে দেওয়া দাসী পুনরায় গ্রহণ করলে তাতে প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে দাসীটি গ্রহণ করা হচ্ছে। আর এতেই এর মধ্যে অবৈধতা প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২. দ্বিতীয়ত বিক্রেতা ক্রেতার কাছে দাসী বাবদ পাঁচশ টাকা পায় এবং ক্রেতার জিম্মায় সেটা আদায় করা আবশ্যক। এরপর সেই দাসীটি বিক্রেতার কাছে ফিরে আসার ফলে ক্রেতার পাঁচশ টাকা বিক্রেতার উপর প্রদান করা আবশ্যক হলো। এখন বিক্রেতা ক্রেতার কাছে পায় পাঁচশ এবং ক্রেতা বিক্রেতার কাছে পায় পাঁচশ, উভয়ের টাকা কাটাকাটি হয়ে গেল, এখন কেউ কারো কাছে টাকা পায় না। দেনা-পাওনা শেষ করার পর দেখা গেল বিক্রেতার হাতে একটি অতিরিক্ত দাসী রয়ে গেল, যার বিনিময়ে বিক্রেতাকে কোনো কিছুই খরচ করতে হলো না। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিনিময় ছাড়া এমনিতে অর্জিত বস্তু সুদ বিবেচিত হয়, যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রির কারণে একটি দাসী অতিরিক্ত হাতে আসল, তাই দ্বিতীয় বিক্রির মধ্যে ফাসাদের উদ্ভব ঘটল।

মোটকথা, বিক্রেতার বেচে দেওয়া দাসী পুনরায় কম মূল্যে ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে ফাসাদ ও অবৈধতা তা নতুন আগমনকারী। আর নতুন আগমনকারী ফাসাদ ও অবৈধতা দুর্বল হয়ে থাকে, তাই এই ফাসাদও দুর্বল। আর যে কোনো দুর্বল ফাসাদ-অবৈধতা প্রসারিত হয় না। এ কারণে বিক্রেতার বেচে দেওয়া দাসীর ক্ষেত্রেই কেবল ফাসাদ হবে, অন্য দাসীর ক্ষেত্রে ফাসাদ আসবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى زَيْتًا عَلٰى اَنْ يَزِنَهُ بِظَرْفِهٖ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرْفٍ خَمْسِيْنَ رِطْلًا فَهُوَ فَاسِدٌ، وَاِنِ اشْتَرٰى عَلٰى اَنْ يَطْرَحَ عَنْهُ بِوَزْنِ الظَّرْفِ جَازَ، لِاَنَّ الشَّرْطَ الْاَوَّلَ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ، وَالثَّانِيْ يَقْتَضِيْهِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এই শর্তে তেল ক্রয় করে যে, বিক্রেতা তাকে তার পাত্রসহ তেল মেপে দিবে এবং প্রত্যেক পাত্রের পরিবর্তে সে পঞ্চাশ রিতল ক্রেতার প্রাপ্ত হিসাব থেকে বাদ দিবে। তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। আর যদি এই শর্তে ক্রয় করে যে, পাত্রের ওজন পরিমাণ তার থেকে বাদ দিবে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, প্রথম শর্তটিকে বিক্রয় চুক্তি চায় না, আর দ্বিতীয়টি বিক্রয়চুক্তির চাহিদা অনুসারে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى زَيْتًا الخ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত উপরিউক্ত মাসআলাটি জামিউস সাগীর থেকে হিদায়ার লেখক সংগ্রহ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এই শর্তে তেল কিনে যে, বিক্রেতা তাকে পাত্রসহ তেল মেপে দিবে এবং প্রত্যেক পাত্রের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উদাহরণ স্বরূপ পঞ্চাশ রিতল তেল কম দিবে, তাহলে এটা ফাসিদ বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত হবে।

মাসআলাটির উদাহরণ এরূপ যে, কোনো ব্যক্তি এক হাজার রিতল যাইতুনের তেল কিনল। অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতাকে একটি পাত্রসহ দিল মেপে দেওয়ার জন্য। সেই পাত্রে তেল ভরা হলো, এরপর পাত্রভর্তি তেল ওজন দেওয়া হলো, এতে দেখা গেল পাত্রসহ তেলের ওজন হচ্ছে একশত রিতল। ক্রেতা বলল, পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল হিসাব থেকে বাদ দাও। অথচ পাত্রের সঠিক ওজন কতটুকু তা জানা নেই। যেন ক্রেতা বলল, এ পাত্র দিয়ে বিশবার তেল ঢেলে দাও তাহলে এক হাজার রিতল হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক বার পাত্রের ওজন বাবদ পঞ্চাশ রতল বাদ পড়বে। ক্রেতার এ ধরনের শর্ত দ্বারা চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, ক্রেতার এই শর্তটি বিক্রয়চুক্তির চাহিদার বিপরীত শর্ত। বিক্রয়চুক্তি এ ধরনের শর্তকে গ্রহণ করে না। কেননা, পাত্রের সঠিক মাপ জানা নেই, তাই হতে পারে পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল থেকে কম, আবার পাত্রের ওজন পঞ্চাশ রিতল থেকে বেশিও হতে পারে। এ অজ্ঞাত অবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার শর্তারোপ করা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি। আর বিক্রয়চুক্তি পরিপন্থি যে কোনো শর্তের আরোপ বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। এ কারণে এ অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এ শর্তের উপর তেল ক্রয় করে যে, পাত্রের সঠিক ওজন যতটুকু ততটুকুই মূল পরিমাণ থেকে বাদ দেওয়া হবে তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে। কেননা, এই শর্তটি এমন যা চুক্তির পরিপন্থি নয়; বরং চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী। এটা এমন একটা শর্ত যার দ্বারা পণ্যের প্রকৃত ওজন সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। যাতে সঠিক মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

এর সূরত এই যে, প্রথমে বিক্রেতা পাত্রটি [তেল ছাড়া] ওজন দিয়ে দেখবে কি পরিমাণ পাত্রের ওজন। এরপর প্রত্যেকবার ততটুকু পরিমাণ মূল হিসাব থেকে বাদ দিবে, আর এভাবেই সঠিক ওজন বের হয়ে আসবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى سَمْنًا فِىْ زِقٍّ فَرَدَّ الظَّرْفَ، وَهُوَ عَشَرَةُ اَرْطَالٍ، فَقَالَ الْبَائِعُ الزِّقُّ غَيْرُ هٰذَا، وَهُوَ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ، لِاَنَّهُ اِنِ اعْتُبِرَ اِخْتِلَافًا فِىْ تَعْيِيْنِ الزِّقِّ الْمَقْبُوْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ ضَمِيْنًا كَانَ اَوْ اَمِيْنًا، وَاِنِ اعْتُبِرَ اِخْتِلَافًا فِى السَّمْنِ فَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ اِخْتِلَافٌ فِى الثَّمَنِ، فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِىْ لِاَنَّهُ يُنْكِرُ الزِّيَادَةَ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি চামড়ার পাত্রে ঘি ক্রয় করে, তারপর পাত্রটি ফেরত দেয়। [খালি পাত্রটি মেপে দেখা গেল] এর ওজন দশ রিতল। কিন্তু বিক্রেতা বলে ঘিয়ের পাত্র এটা নয়, অন্যটা সেটার ওজন ছিল পাঁচ রিতল। এমতাবস্থায় ক্রেতার মতটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যদি বলা হয় এ মতবিরোধ কব্জাকৃত চামড়ার পাত্র সম্পর্কে তাহলে তো কব্জাকারীর কথাই ধর্তব্য হবে। চাই সে যামীন হোক অথবা আমানতদার হোক। আর যদি মতবিরোধ ঘিয়ের পরিমাণ সম্পর্কে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এটা প্রকৃতপক্ষে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কিত মতবিরোধ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে অতিরিক্ত পরিমাণকে অস্বীকার করছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى سَمْنًا الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ চামড়ার একটি পাত্রে করে ঘি ক্রয় করল এবং তা সে কব্জা করল এরপর ক্রেতা পাত্রটি খালি করে ফেরত দিল। খালি পাত্রটির ওজন মেপে দেখা গেল, তার ওজন দশ রিতল। কিন্তু বিক্রেতা পাত্রটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, এটা সেই পাত্র নয়। বরং আমার পাত্রটির ওজন পাঁচ রিতল ছিল। মোটকথা বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। ক্রেতার ফেরত দেওয়া পাত্রের ওজন দশ রিতল। আর বিক্রেতার দাবি অনুযায়ী সেটার ওজন ছিল পাঁচ রিতল। এ অবস্থায় ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে শর্ত এই যে, দু'টি [এক] বিক্রেতার পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই ঘিয়ের পাত্রের [দুই] ক্রেতা শপথ করে বলছে, এটা সেই পাত্র যাতে ঘি ছিল। এখানে দলিলের পূর্বে সুরতে মাসআলাটি আলোচনা করা দরকার। সুরতে মাসআলা এরূপ: এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে একটি পাত্রে রাখা ঘি কিনল, প্রত্যেক রিতল এক দিরহাম করে। পরে পাত্রসহ ঘি মেপে দেখা গেল যে, একশত রিতল। এরপর ক্রেতা পাত্রসহ ঘি কব্জা করে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাড়িতে ঘি রেখে খালি পাত্রটি নিয়ে আসল এবং বিক্রেতাকে বলল, আমি নব্বই রিতল ঘি পেয়েছি আর পাত্রটির ওজন হচ্ছে দশ রিতল। বিক্রেতা বলল, না, পাত্রের ওজন পাঁচ রিতল, আর ঘিয়ের ওজন ছিল পচানব্বই রিতল। এ অবস্থায় আমরা তাদের মতবিরোধকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করতে পারি–

১. তাদের মতবিরোধ পাত্রটির ওজন নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে।

২. তাদের মতবিরোধ ঘিয়ের ব্যাপারে। যেহেতু ঘিয়ের পরিমাণ পাত্রের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাই বাহ্যিকভাবে পাত্র নিয়ে তারা বির্তকে লিপ্ত হয়েছে।

লেখক বলেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের মত বিরোধ পাত্রকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে হয়েছে, তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। কারণ, ক্রেতা ছিল কব্জাকারী। কব্জাকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। চাই তার দখল আমানতের দখল হোক কিংবা

জামানতের দখল হোক। জামানত বা দায়যুক্ত কব্জা যেমন ডাকাত-ছিনতাইকারীর কব্জা। আমানত বা দায়মুক্ত কব্জা যেমন আমানতদারের কব্জা, অর্থাৎ আপনি কারো কাছে কোনো বস্তু আমানত রাখলেন তারপর সেটা আমানতদারের হাতে বিনষ্ট হয়ে গেলে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন।

আর যদি বলা হয়, ক্রেতা ও বিক্রেতার মতবিরোধ মূলত ঘিয়ের পরিমাণ নির্ধারণ নিয়ে হয়েছে, তাহলে এটা প্রকৃতার্থে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ। অর্থাৎ ঘিয়ের মূল্য কত। বিক্রেতা পাঁচ রিতল অতিরিক্ত [৯০ + ৫ = ৯৫] দাবি করছে। আর ক্রেতা অতিরিক্ত পাঁচ রিতলের মূল্য প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এক কথায় বিক্রেতা হচ্ছে দাবিদার, আর ক্রেতা অস্বীকারকারী। নিয়মানুযায়ী দাবিদারের পক্ষে সাক্ষী না থাকলে বা সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীর কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এখানে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এ মাসআলার উপর দু'টি আপত্তি রয়েছে। অর্থাৎ দু'মাসআলা দ্বারা এর উপর আপত্তি তোলা হয়–

১. কেউ দু'টি দাস ক্রয় করে কব্জা করল। ঘটনাচক্রে ক্রেতার হাতে একটি দাসের মৃত্যু হলো আর অন্যটিকে ক্রেতা দোষের কারণে ফেরত দিল, এরপর তাদের মাঝে মৃত দাসটির মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মতবিরোধ হয়ে গেল। এমতবস্থায় বিক্রেতার কথামত ফয়সালা হবে। [মাসআলাটি بَابُ التَّحَالُفِ এ আলোচিত হবে]

২. নিয়ম হলো, মূল্যের ব্যাপারে যে কোনো মতবিরোধ হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের শপথ করতে হয়। অথচ আলোচ্য মাসআলায় শুধুমাত্র ক্রেতা শপথ করছে। সারকথা, উল্লিখিত দু'টি মাসআলা আমাদের আলোচ্য মাসআলার সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং মাসআলা দু'টির ব্যাপারে আমাদের কী জবাব হবে?

প্রথম মাসআলাটির জবাব হচ্ছে– এখানে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্যের দাবি অস্বীকার করার কারণে। অর্থাৎ ক্রেতা এখানে অস্বীকারকারী। সেখানে বিক্রেতার কথা একই কারণে গ্রহণযোগ্য। সেখানে বিক্রেতা ক্রেতার দাবিকৃত অতিরিক্ত মূল্য অস্বীকার করছে এ কারণে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় মাসআলাটির জবাব হলো, উভয়ের শপথ যুক্তি বিরুদ্ধভাবে সেখানেই প্রয়োগ হয়, যেখানে প্রকৃতই এবং উদ্দেশ্যগতভাবে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে উদ্দেশ্যগতভাবে মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ নয়, উদ্দেশ্যগত মতবিরোধ হলো ঘিয়ের পরিমাণের ব্যাপারে। অনুবর্তী হিসেবে পরে তা মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধে পরিণত হয়েছে, অথবা মূলত মতবিরোধ হলো পাত্রের ব্যাপারে।

قَالَ : وَإِذَا اَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ اَوْ بِشِرَائِهَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا لَا يَجُوْزُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الْخِنْزِيْرُ، وَعَلٰى هٰذَا تَوْكِيْلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهٖ، لَهُمَا اَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَلِيْهِ فَلَا يُوَلِّيْهِ غَيْرَهُ، وَلِاَنَّ مَا يَثْبُتُ لِلْوَكِيْلِ يَنْتَقِلُ اِلَى الْمُوَكِّلِ، فَصَارَ كَاَنَّهٗ بَاشَرَهٗ بِنَفْسِهٖ فَلَا يَجُوْزُ، وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَكِيْلُ بِاَهْلِيَّتِهٖ وَ وَلَايَتِهٖ، وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ اِلَى الْاٰمِرِ اَمْرٌ حُكْمِيٌّ، فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْاِسْلَامِ، كَمَا اِذَا وَرِثَهُمَا، ثُمَّ اِنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِّلُهَا، وَاِنْ كَانَ خِنْزِيْرًا يُسَيِّبُهٗ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুসলিম যদি কোনো খ্রিস্টানকে মদ ক্রয় বা বিক্রি করার আদেশ করে, অতঃপর খ্রিস্টান ব্যক্তিটি তাই করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, মুসলমানের জন্য তা [প্রতিনিধি নিয়োগ] বৈধ নয়। একই মতবিরোধ রয়েছে শূকরের ব্যাপারেও। মুহরিম কর্তৃক অন্য কাউকে তার [ইহরামের পূর্বে] শিকারকৃত জন্তুর বিক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করার ব্যাপারেও একই মতবিরোধ রয়েছে। সাহেবাইনের দলিল হচ্ছে– মক্কেল যে বিষয়ের ক্ষমতা রাখে না সে বিষয়ে অন্যকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে না। তা ছাড়া উকিলের পক্ষে যা সাব্যস্ত হবে, তা মক্কেলের দিকে স্থানান্তরিত হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো, যেন মক্কেল নিজেই তা সম্পাদন করল। আর তা সম্পাদন করা মক্কেলের জন্য বৈধ নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– [এখানে] চুক্তিকারী হচ্ছে স্বয়ং উকিল, যে তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে চুক্তি সম্পাদন করছে। আর নিয়োগ দাতার প্রতি মালিকানার স্থানান্তর সে তো বিধানগত ব্যাপার। সুতরাং ইসলামের কারণে উকিলের চুক্তি নিষিদ্ধ হবে না। যেমন মুসলমান যদি মদ ও শূকরের উত্তরাধিকারী হয়। তারপর যদি মদ হয় তাহলে সিরকায় রূপান্তরিত করবে। আর যদি শূকর হয় তবে ছেড়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَاِذَا اَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীরের কয়েকটি মাসআলা উদ্ধৃত করেছেন। ইবারতে মোট তিনটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে–

প্রথম মাসআলা : মুসলিম কোনো খ্রিস্টানকে মদ বেচার কিংবা কেনার জন্য উকিল নিযুক্ত করল।

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো মুসলিম কোনো খ্রিস্টানকে শূকর বিক্রি অথবা ক্রয়ের উকিল নিযুক্ত করল।

তৃতীয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পূর্বে শিকার করল, অতঃপর ইহরাম বেঁধে ফেলল। তারপর ইহরাম বাঁধেনি এমন ব্যক্তিকে তার শিকারকৃত জন্তু বেচে দেওয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। এ তিনটি মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উকিল নিযুক্ত করা এবং উকিলের ক্রয়-বিক্রয় করা উভয়ই বৈধ। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, উকিল বানানো এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় কোনোটাই বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এরও একই অভিমত।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশীয় পরিভাষায় যারা কোর্টে মামলা-মোকাদ্দমা পরিচালনা করে তাদেরই কেবল উকিল বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ও নিয়োগকৃত যে কোনো লোককে উকিল বলা হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো লোক উকিল হতে পারে।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : মক্কেল প্রথম দুটি মাসআলায় মুসলমান, আর তৃতীয় মাসআলায় মুহরিম, তারা স্বয়ং উক্ত লেন-দেন করার ক্ষমতা রাখেন না। অর্থাৎ মুসলিম কোনো অবস্থাতেই মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে না। এবং মুহরিম ইহরামের পূর্বে কৃত শিকারকে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিক্রি করতে পারে না। মানুষ যে বিষয়ের অধিকার রাখে না সে অধিকার অন্য কাউকে প্রদান করতে পারে না। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি অবস্থায় মক্কেলের পক্ষে উকিল বানানো বৈধ নয়।

দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে– যে বিষয় উকিলের অনুকূলে সাব্যস্ত হয় তা হুবহু মক্কেলের পক্ষে সাব্যস্ত হয় বা মক্কেলের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং খ্রিস্টান উকিলের মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় মুসলমান মক্কেলের জন্য সাব্যস্ত হবে এবং তার দিকে স্থানান্তরিতও হবে। তদ্রূপ শিকারকৃত জন্তুর বিক্রির বিষয়টি উকিলের নির্দেশদাতা ও নিয়োগদাতা মক্কেলের প্রতি স্থানান্তরিত হবে। ফলে বিষয়টি এমনই হলো যে, মক্কেল নিজেই যেন উক্ত কাজগুলো সম্পাদন করেছেন। সুতরাং যেহেতু প্রথম দু'টি মাসআলায় মুসলমানের পক্ষে মদ ও শূকর বেচা-কেনা করা এবং তৃতীয় মাসআলায় মুহরিমের শিকারকৃত জন্তু বিক্রি করা অবৈধ, কাজেই, এসব বিষয়ে উকিল বানানোও অবৈধ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে দুটো যোগ্যতাই গ্রহণযোগ্য। একটি উকিলের, অপরটি মক্কেলের। উকিলের জন্য লেন-দেন করার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। খ্রিস্টানের লেন-দেন করার যোগ্যতা আছে। কেননা, সে স্বাধীন, জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক। পক্ষান্তরে মক্কেলের জন্য এতটুকু যোগ্যতা থাকা আবশ্যক যে, বিক্রয়ের হুকুম তথা মূল্য অথবা পণ্যের মালিকানা তার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। কাউকে উকিল বানালে মালিকানা মক্কেলের দিকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মদ ও শূকর-এর মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা মক্কেল তথা মুসলমানের অবশ্যই রয়েছে যেমন উত্তরাধিকারের সূত্রে মুসলমান অনিচ্ছা সত্ত্বেও শূকর ও মদের মালিক হয়ে যায়। উত্তরাধিকারী সূত্রে মদ ও শূকরের মালিক হওয়ার সুরতে মাসআলা হচ্ছে এরূপ যে, কোনো ব্যক্তি পূর্বেই খ্রিস্টান ছিল এবং সে অবস্থায় তার কাছে মদ ও শূকর ইত্যাদি ছিল, অতঃপর সে মুসলামন হয়ে যায়। আর তার ছেলে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল। তারপর নও মুসলিম [খ্রিস্টান] পিতা ইন্তেকাল করল। ফলে তার মুসলমান পুত্র পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে অন্যান্য মালের সাথে মদ ও শূকরের মালিক হয়ে গেল। এখানে শূকর ও মদের মালিকানা পুত্রের প্রতি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তরাধিকার সূত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তার এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে যে, তার প্রতি মালিকানা স্থানান্তরিত হলে সে মালিক হয়ে যায়। এমনিভাবে খ্রিস্টান উকিল মদ ও শূকর বিক্রি করলে অথবা ক্রয় করলে তার মক্কেল তথা মুসলমান উকিল নিয়োগদাতা মদ ও শূকর অথবা তার মূল্যের মালিক হয়ে যাবে। আর মালিকানা মক্কেলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার প্রতি স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। মোটকথা, যখন উকিল এবং মক্কেল উভয়ের মাঝে পূর্ণযোগ্যতা রয়েছে, তখন উকিল বানানো শুদ্ধ হবে, আর উকিল বানানো শুদ্ধ হলে উকিলের কর্মকাণ্ডও শুদ্ধ হবে। কেউ যদি এখানে আপত্তি করেন যে, মালিকানা অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে আসে ঠিক, কিন্তু এখানে মালিকানার সবব তো উকিল বানানো, যা মক্কেল ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। সুতরাং সে যেন ইচ্ছাকৃতই মালিক হলো। এর উত্তর হচ্ছে, মালিকানার সবব উকিল বানানো নয়। বরং মালিকানার সবব হলো ক্রয় করা, আর ক্রয় করা উকিলের ইখতিয়ারভুক্ত কাজ, মক্কেলের নয়। আর ক্রয়ের সববও ওকালত নয়। বরং ওকালত ক্রয়ের জন্য শর্ত।

তবে জানা উচিত যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, এ ধরনের উকিল বানানো মাকরূহে তাহরীমী। অতএব এটা বৈধ হলেও মাকরূহে তাহরীমী হওয়ার কারণে তা থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন হয় যে, যদি ঘটনাচক্রে মুসলমান মদ ও শূকরের মালিক হয়ে যায় তাহলে সে এগুলোকে কি করবে? এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেন, এমতাবস্থায় মুসলমান মদকে সিরকা বানিয়ে তা ব্যবহার করতে পারে। আর শূকরকে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবে। আর যদি এগুলো বিক্রি করা হয় আর মুসলামান তার মূল্যের মালিক হয় তাহলে সে তা দান-সদকা করে দিবে। কেননা, শূকর ও মদের বিনিময়ে অর্জিত হওয়ার কারণে এতে অবৈধতা সৃষ্টি হয়েছে আর যে অর্থ ভোগ করা অবৈধ হয় তা সদকা করা ওয়াজিব।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى اَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِى اَوْ يُدَبِّرَهُ اَوْ يُكَاتِبَهُ اَوْ اَمَةً عَلَى اَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لِاَنَّ هٰذَا بَيْعٌ وَشَرْطٌ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، ثُمَّ جُمْلَةُ الْمَذْهَبِ فِيْهِ اَنْ يُقَالَ : كُلُّ شَرْطٍ يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِىْ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ لِثُبُوْتِهٖ بِدُوْنِ الشَّرْطِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ اَوْ لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِحْقَاقِ يُفْسِدُهٗ، كَشَرْطِ اَنْ لَا يَبِيْعَ الْمُشْتَرِى الْعَبْدَ الْمَبِيْعَ، لِاَنَّ فِيْهِ زِيَادَةً عَارِيَةً عَنِ الْعِوَضِ، فَيُؤَدِّىْ اِلَى الرِّبٰوا، اَوْ لِاَنَّهٗ يَقَعُ بِسَبَبِهِ الْمُنَازَعَةُ فَيَعْرِى الْعَقْدُ عَنْ مَقْصُوْدِهٖ، اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مُتَعَارَفًا، لِاَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَوْ كَانَ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ لِاَحَدٍ لَا يُفْسِدُهٗ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْمَذْهَبِ، كَشَرْطِ اَنْ لَا يَبِيْعَ الْمُشْتَرِى الدَّابَّةَ الْمَبِيْعَةَ، لِاَنَّهٗ اِنْعَدَمَتِ الْمُطَالَبَةُ، فَلَا يُؤَدِّىْ اِلَى الرِّبٰوا وَلَا اِلَى الْمُنَازَعَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি এ শর্তে দাস বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে মুক্ত করে দিবে, বা মুদাব্বার বানাবে কিংবা মুকাতাব বানাবে। অথবা দাসী বিক্রি করে এই শর্তে যে, ক্রেতা তাকে উম্মে ওলাদ বানাবে, তাহলে এ বিক্রি ফাসিদ হবে। কেননা, এটা হলো শর্তযুক্ত বিক্রি। অথচ মহানবী ﷺ শর্তযুক্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবের মূলনীতি হলো, যেসব শর্ত বিক্রয়চুক্তির চাহিদা মুতাবিক হয়, যেমন ক্রেতার জন্য মালিকানার শর্ত করা, এর দ্বারা চুক্তি বাতিল হবে না। কেননা, এগুলো তো শর্ত করা ছাড়াই সাব্যস্ত হয়। আর যে সব শর্ত বিক্রয়চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী না হয় এবং এতে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোনো এক পক্ষের অথবা চুক্তিকৃত পণ্যের স্বার্থ আছে এবং পণ্যটিও স্বার্থ ভোগ করার যোগ্যতা সম্পন্ন, তাহলে এমন শর্ত চুক্তিকে ফাসিদ করে দিবে। যেমন শর্ত হলো যে, ক্রেতা বিক্রয়কৃত দাসটি বিক্রয় করতে পারবে। কেননা এতে বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত হয়েছে। ফলে তা সুদ জন্ম দিবে। অথবা এর কারণে বিবাদ ও ঝগড়া সংঘটিত হবে। আর তখন বিক্রয়চুক্তি তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে কোনো শর্ত যদি প্রচলিত বিষয় হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা, প্রচলন কিয়াসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আর যদি শর্ত বিক্রয় চুক্তির চাহিদা মুতাবিক না হয় এবং তাতে কোনো পক্ষের স্বার্থ না থাকে তাহলে তা বিক্রয়-চুক্তিকে ফাসিদ করবে না। এটাই আমাদের মাযহাবের স্পষ্ট বক্তব্য। যেমন এ শর্ত করা যে, ক্রেতা বিক্রীত জন্তুটি বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, এতে পশুর পক্ষ থেকে কোনো দাবি নেই, ফলে এটা সুদ কিংবা বিবাদ কিছুই সৃষ্টি করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يُّعْتِقَهُ الخ : উক্ত ইবারাত ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দেওয়া। শর্ত জুড়ে বেচা-কেনা করলে তা ফাসিদ হয়ে যায়। তবে যে কোনো শর্ত জুড়লেই ফাসিদ হয় না; বরং এ ব্যাপারে কিছু মূলনীতি রয়েছে যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শর্ত করার বিষয়টি বুঝিয়ে বলেছেন। যেমন কোনো ব্যক্তি নিজ দাস এ শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তার দাসটি মুক্ত করে দিবে, কিংবা মুদাব্বার বানাবে অথবা মুকাতাব বানাবে। অথবা কেউ নিজ দাসী এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা দাসীটিকে উম্মে ওলাদ বানাবে। লেখক বলেন, এসব শর্ত দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। ফাসিদ হওয়ার কারণ এই যে, এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং এতে সুদের উপস্থিতি রয়েছে। এ জাতীয় বিক্রয়কে بَيْعٌ مَعَ شَرْطٍ অর্থাৎ, শর্তযুক্ত বিক্রয় বলা হয়। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে মু'জামে তাবারানীর বরাতে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়, হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ بِهَا اَبَا حَنِيْفَةَ وَابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى وَابْنَ شُبْرُمَةَ، فَسَأَلْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا وَشَرَطَ شَرْطًا فَقَالَ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ اَتَيْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ اَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ جَائِزٌ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوْا فِىْ مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَاَتَيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : لَا اَدْرِىْ مَا قَالَا حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ .

অর্থাৎ আব্দুল ওয়ারিস ইবনে সাঈদ মক্কায় আগমন করে বিখ্যাত তিন ফকীহ আবূ হানীফা (র.), ইবনে আবূ লায়লা ও ইবনে শুবরুমার সাক্ষাৎ করেন এবং শর্তযুক্ত বিক্রির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তারপর তিনি তিনজন থেকে তিন ধরনের বক্তব্য। এরপর তিনি আবূ হানীফা (র.) -কে তার মতের পক্ষে প্রমাণ চাইলে তিনি রাসূল ﷺ -এর হাদীস পেশ করেন। যাতে রাসূল ﷺ শর্ত যুক্ত বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেন। এর দ্বারা এও বুঝা যায় যে, বিক্রয় বাতিল এবং শর্তও বাতিল, আর ইবনে আবূ লায়লা তাঁর অভিমতের সপক্ষে হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীস দ্বারা দলিল দেন। হাদীসটি এই :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاُعْتِقُهَا .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বিক্রয় বৈধ আর শর্ত বাতিল। এরপর ইবনে শুবরুমা তার মতের পক্ষে হাদীস পেশ করেন, عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ نَاقَةً وَشَرَطَ لِىْ حُمْلَانَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শর্তসহ বিক্রয় বৈধ এবং শর্তও বৈধ।

হিদায়ার লেখক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের সারকথা হচ্ছে– বিক্রয় চুক্তির মধ্যে যে সব শর্ত করা হয় তা মোটামুটি তিন ধরনের– ১. এমন শর্ত যা চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়। ২. এমন শর্ত যা চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এর দ্বারা কোনো চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো এক পক্ষের কিংবা বিক্রীত-পণ্যের স্বার্থ রক্ষিত হয়। ৩. এমন শর্ত যা চুক্তির পরিপন্থি, কিন্তু এর দ্বারা কোনো দুই পক্ষের মধ্যে কোনো এক পক্ষের কিংবা পণ্যের কোনোরূপ স্বার্থ জড়িত থাকে না।

এ তিন ধরনের শর্তের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত বিক্রয়চুক্তিতে থাকলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম ও তৃতীয় শর্ত থাকে তাহলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না।

১. **প্রথম শর্তের ব্যাখ্যা :** এরূপ শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদা মুতাবিক ও অনুযায়ী হয় অর্থাৎ শর্ত করার দ্বারা সেই উপকার পাওয়া যায়, যা শর্ত করা ছাড়া এমনিতেই শর্তবিহীন চুক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন কোনো ক্রীতাদাসকে এই শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা উক্ত ক্রীতদাসের মালিক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, যদি এ শর্ত নাও করা হতো তবুও ক্রেতা দাস কেনার সাথে সাথেই দাসের মালিক হয়ে যেত। অথবা শর্ত করা হলো যে, দাস কেনার পর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে, কিংবা ক্রেতা বলল, আমি দাস এই শর্তে ক্রয় করছি যে, বিক্রেতা আমাকে দাসটি হস্তান্তর করবে। দু'টি শর্তও এমন যে, যদি শর্ত না করা হতো তবুও ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে এবং বিক্রেতা দাস হস্তান্তর করতে বাধ্য হতো। এ জাতীয় শর্ত বৈধ এবং

এ জাতীয় শর্ত একটা অতিরিক্ত বিষয়, যা করা বা না করা উভয়ই সমান। কেউ যদি আপত্তি করে যে, রাসূল ﷺ তো মুতলাকভাবে বিক্রয়ে শর্ত করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল ﷺ -এর হাদীস মতে তো এ জাতীয় শর্তও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অথচ এ জাতীয় শর্ত বৈধ। এর উত্তর এই যে, এটা প্রকৃতপক্ষে শর্তই নয়। কারণ, শর্ত বলা হয় এমন কিছু যা দ্বারা নতুন কোনো কিছু আবশ্যক হয়। অথচ এই শর্তগুলো এমন অর্থ দিচ্ছে যা সাধারণ বিক্রয়চুক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং এগুলো শর্ত করা বা না করা উভয়ই সমান।

২. দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা :

ক. এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং শর্ত করার দ্বারা ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কিংবা বিক্রীত ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা হয়। যেমন বিক্রেতা দাস বিক্রি করল এই শর্তে যে, ক্রেতা এ দাসটি বিক্রি করতে পারবে না। এই শর্তের মধ্যে বিক্রীত দাসের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে। কারণ, দাস বিভিন্ন লোকের দাসত্ব গ্রহণ করা পছন্দ করে না। বরং এক লোকের অধীন থাকাটাই বেশি পছন্দ করে। এখানে দাস তার শর্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার পাওয়ার জন্য দাবিও করতে সক্ষম।

আরেকটি উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি লুঙ্গি কিনল এই শর্তে যে, বিক্রেতা এটাকে সেলাই করে দিবে। এ শর্তের দ্বারা ক্রেতার স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে। অথবা কেউ বাড়ি বিক্রি করল এই শর্তে যে, বিক্রেতা বাড়িটিতে একমাস থাকবে, তারপর ক্রেতার হাতে বাড়িটি অর্পণ করবে। এই শর্তটি দ্বারা বিক্রেতার স্বার্থ উদ্ধার হচ্ছে। উপরের তিন উদাহরণে শর্তগুলোর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে, ফাসিদ হওয়ার কারণ হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন তাদের পণ্য ও মূল্য বিনিময় করল তখন তাদের এই বিনিময় শর্তবিহীন হলো এবং শর্ত বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হলো না; বরং তা বিনিময়ের অতিরিক্ত বলে গণ্য হলো। আর বিনিময়ের অতিরিক্ত যে কোনো বস্তু বা বিষয় সুদ বিবেচিত হয়। এখানে শর্তের কারণে উক্ত সুদ আবশ্যক হচ্ছে। আর সুদ হলো অবৈধ ও হারাম। আর যে বিষয়ের দ্বারা হারাম কাজে লিপ্ত হতে হয় তাও হারাম ও অবৈধ বলে গণ্য হয়। উক্ত অবৈধ শর্ত যুক্ত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তি অবৈধ বলে গণ্য হয়।

অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ জাতীয় শর্তের কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়। বিক্রয়চুক্তি উভয়ের সন্তুষ্টিক্রমে সম্পাদন হওয়া আবশ্যক। যেখানে ঝগড়া উদ্ভুত হয় সে বিক্রি অবৈধ বলে গণ্য হয়। আর লেন-দেনের উদ্দেশ্য হলো কোনো বিবাদ ছাড়া পণ্য ইত্যাদি বিনিময় করা।

খ. এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এর দ্বারা ক্রেতা বা বিক্রেতার স্বার্থ হাসিল হয়। কিন্তু শর্তটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও প্রচলিত। অর্থাৎ, সর্বস্তরের লোকজন এরূপ শর্তের সাথে কেনাবেচা করে। যেমন কেউ জুতা এই শর্তে খরিদ করল যে, বিক্রেতা এতে ফিতা লাগিয়ে দিবে। অথবা মাছ এই শর্তে খরিদ করল যে, বিক্রেতা মাছের জন্য পলিথিন দিয়ে দিবে। এ ধরনের শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা, যে বিষয় সামাজিকভাবে প্রচলিত তা অনেকটা শরিয়তের দলিলের মতো। তবে শর্ত এই যে, সামাজিক প্রচলন শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হতে হবে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর বক্তব্য হচ্ছে– مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায় যাকে উত্তম মনে করে, তা আল্লাহর কাছেও উত্তম। অথবা আমরা বলব, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া হচ্ছে 'ইজমা'। আর ইজমা হলো শরিয়তের দলিল। সুতরাং সামাজিক প্রচলন যদি কিয়াসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, তাহলে عرف বা সামাজিক প্রচলনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এই ভিত্তিতে যে, সামাজিক প্রচলনের গ্রহণযোগ্যতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিংবা বলব, সামাজিক প্রচলন হলো "ইজমা"। ইজমা ও হাদীস কিয়াসের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রাধান্য পাবে।

৩. তৃতীয় শর্তের ব্যাখ্যা : তৃতীয় প্রকারের শর্ত হচ্ছে– এমন শর্ত যা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি, কিন্তু এর সাথে কোনো পক্ষের স্বার্থ জড়িত নেই। যেমন বিক্রেতা শর্তারোপ করল যে, ক্রেতা তার গরুটি অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে না। এ জাতীয় শর্তের ক্ষেত্রে জাহেরী মাযহাব হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হবে। তবে এ প্রকারের শর্ত অনর্থক। এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ শর্তের কারণে গরুর পক্ষ থেকে কোনো আবদার-দাবি আসবে না। সুতরাং এতো সুদের অর্থ পাওয়া যাবে না এবং এর কারণে কোনো বিবাদও লাগবে না। অথচ এ দুটি বিষয়ই বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং অবৈধ করে দেয়। যেহেতু এ দুটি বিষয় অনুপস্থিত তাই বিক্রয় শুদ্ধ হবে। তবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ জাতীয় শর্ত করলেও তা বিক্রয়চুক্তি বাতিল তথা ফাসিদ করে দিবে।

إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ : هٰذِهِ الشُّرُوْطُ لَا يَقْتَضِيْهَا الْعَقْدُ، لِاَنَّ قَضِيَّتَهُ الْإِطْلَاقُ فِي التَّصَرُّفِ وَالتَّخْيِيْرُ لَا الْإِلْزَامُ حَتْمًا، وَالشَّرْطُ يَقْتَضِيْ ذٰلِكَ، وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ (رحـ) وَاِنْ كَانَ يُخَالِفُنَا فِي الْعِتْقِ وَيَقِيْسُهُ عَلٰى بَيْعِ الْعَبْدِ نَسَمَةً فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَتَفْسِيْرُ الْبَيْعِ نَسَمَةً اَنْ يُبَاعَ مِمَّنْ يُعْلَمُ اَنَّهُ يُعْتِقُهُ، لَا اَنْ يُشْتَرَطَ فِيْهِ، فَلَوْ اَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِيْ بَعْدَمَا اِشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْعِتْقِ صَحَّ الْبَيْعُ، حَتّٰى يَجِبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَقَالَا : يَبْقٰى فَاسِدًا، حَتّٰى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِيْمَةُ، لِاَنَّ الْبَيْعَ قَدْ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، كَمَا اِذَا تَلَفَ بِوَجْهٍ اٰخَرَ، وَلِاَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَايُلَائِمُ الْعَقْدَ عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلٰكِنْ مِنْ حَيْثُ حُكْمِهِ يُلَائِمُهُ، لِاَنَّهُ مُنْهٍ لِلْمِلْكِ، وَالشَّيْئُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ، وَلِهٰذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الرُّجُوْعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، فَاِذَا تَلَفَ مِنْ وَجْهٍ اٰخَرَ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُلَائَمَةُ، فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ، وَاِذَا وُجِدَ الْعِتْقُ تَحَقَّقَتِ الْمُلَايَمَةُ، فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْجَوَازِ، فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ ذٰلِكَ مَوْقُوْفًا ـ

অনুবাদ : যখন এটি সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলব, [মূল পাঠে উল্লিখিত] এই শর্তগুলোকে বিক্রয়চুক্তি চায় না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির অনিবার্য দাবি হলো, ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান, জবরদস্তিমূলক দায় আরোপ নয়, অথচ আরোপিত শর্ত জবরদস্তিমূলক দায়কেই দাবি করে এবং এতে বিক্রীত-পণ্যের স্বার্থ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.) আজাদ করার শর্তের ব্যাপারে যদিও আমাদের বিপক্ষে মত পোষণ করেন এবং তিনি মাসআলাটিকে ক্রীতদাসের সত্তা বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন, কিন্তু আমরা যে দলিল উল্লেখ করেছি তা তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ। بَيْع نَسَمَة [ক্রীতদাসের সত্তা বিক্রয়] এর ব্যাখ্যা এই যে, ক্রীতদাস এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যার সম্পর্কে জানা যায় যে, সে দাসটি মুক্ত করে দিবে। মুক্ত করার শর্ত করে বিক্রি করা নয়। যদি ক্রেতা আজাদ করে দেওয়ার শর্তে খরিদ করার পর আজাদ করে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হয়ে যাবে এবং তার উপর মূল্য আদায় করা আবশ্যক হবে। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, বিক্রয় ফাসিদরূপে বহাল থাকবে সুতরাং ক্রেতার উপর বাজার মূল্য প্রদান করা আব্যশক হবে। কেননা, বিক্রয় ফাসিদরূপে সম্পাদিত হয়েছে, তাই তা বৈধ অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে না। যেমন দাসটি অন্যভাবে নষ্ট হয়ে গেলে তা বৈধ হিসেবে রূপান্তরিত হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হচ্ছে– আজাদ করার শর্ত সত্ত্বাগতভাবে বিক্রয়চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। তবে হুকুমের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, এটা মালিকানাকে সম্পূর্ণ করে দেয়। আর যে কোনো বস্তু সম্পূর্ণ হলে স্থিতিশীল হয়। এ কারণেই মুক্তিদান দোষজনিত ক্ষতিপূরণ গ্রহণে বাধা দেয় না। আর

যদি অন্য কোনো কারণে বিনষ্ট হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য সাব্যস্ত হয় না। ফলে বিক্রয়ের মধ্যে ফাসাদ স্থিত হয়ে পড়ে। আর যখন মুক্তি দান পাওয়া গেল, তখন বিক্রয়চুক্তির সাথে মুক্তি দানের শর্তের সামঞ্জস্য সাব্যস্ত হলো ফলে বৈধতার দিকটি প্রাধান্য লাভ করল। তাই মুক্তি দানের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি অবস্থাটি মুলতবি থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে হিদায়ার লিখক পূর্ববর্তী আলোচনার বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী ইবারতে শর্ত সম্পর্কে যে ব্যাখা প্রদান করা হয়েছে তার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মূল ইবারতে যে শর্তগুলি উল্লেখ করা হয়েছে এর সবগুলোই বিক্রয়চুক্তির পরিপন্থি। কেননা, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো বিক্রেতার মূল্যের উপর ও আর ক্রেতার পণ্যের উপর যথেচ্ছা ব্যবহারে পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিঃশর্ত অধিকার লাভ হওয়া। বিক্রয়চুক্তির দাবি নয় যে, ক্রেতার উপর মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি আবশ্যক হতে হবে। অথচ শর্তের দাবি হলো ক্রেতা দাসমুক্তি দিক এবং শর্ত মুতাবিক অন্যান্য কাজগুলো সম্পাদন করুক। আর এ শর্তের মধ্যে বিক্রীত দাসের উপকারিতাও বিদ্যমান। সুতরাং চুক্তির দাবি ও শর্তের দাবির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এ দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমরা উভয়ের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে বলেছি যে, এ বিক্রয় ফাসিদ। অর্থাৎ সত্তাগতভাবে এটা শরিয়তসম্মত হলেও গুণগতভাবে এটা শরিয়তসম্মত নয়। আর এ কারণেই বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ। ইমাম শাফেয়ী (র.) মুদাব্বার বানানোর শর্ত, মুকাতাব করার শর্ত ও দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর শর্তের ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত অর্থাৎ এসব শর্তের কারণে তার মতেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। কিন্তু দাসকে মুক্তি দেওয়ার শর্তের ব্যাপারে তার ভিন্নমত রয়েছে। যেমন তার থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তি দেওয়ার শর্ত করা সত্ত্বেও বিক্রয় বৈধ। ইমাম শাফেয়ী (র.) দাসমুক্তির শর্তকে بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَمَةً [দাসকে এমন কারো কাছে বিক্রি করা যে, তাকে আজাদ করে দিবে] এর উপর কিয়াস করেন। بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَمَةً -এর একটি ব্যাখ্যা মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত এভাবে যে, দাসমুক্তি দানের শর্তে দাসকে বিক্রি করা। তখন ইমাম শাফেয়ী مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه -এর উপর এ আপত্তি হবে যে, তাহলে তো قِيَاسُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِه লাযেম হলো। তবে হিদায়ার লেখকের بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَمَةً -এর বর্ণিত সংজ্ঞা দ্বারা কোনো আপত্তি আসবে না। তিনি বলেছেন যে, بَيْعُ الْعَبْدِ نَسَمَةً -এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তির কাছে দাস বিক্রি করা, যার ভাবসাব দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে দাসটি ক্রয় করেই মুক্ত করে দেবে অর্থাৎ সে মুক্ত করার জন্যই কিনছে। তবে তাকে মুক্ত করতে হবে এমন শর্ত দিয়ে বিক্রি করা নয়।

লেখকের সংজ্ঞা অনুসারে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর কিয়াস যথার্থ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল রূপে কেউ কেউ হযরত বারিরা (রা.) সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ أَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَأَعْتِقُهَا -এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ আজাদ করার শর্তে ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আজাদ করার শর্তে বিক্রি করা বৈধ। এ হাদীসের জবাব হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা.) রাবিরাকে মুক্তি দেওয়ার শর্তে ক্রয় করেননি, বরং তিনি কোনো শর্ত ছাড়াই ক্রয় করেছিলেন। তবে তিনি হযরত বাবিরাকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি বিক্রয়ে রাজি হয়ে যান। কেননা, বারিরা তার মনিবের সাথে চুক্তিপত্র করে ফেলেছিলে যে, এত টাকা দিলে তারা তাকে মুক্ত করে দিবেন। নিয়মানুযায়ী মুকাতাবের বিক্রি তার সন্তুষ্টি ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। তাই তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) তাকে ক্রয় করে তার সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছিলেন, তাছাড়া আমাদের বর্ণিত হাদীস نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ স্পষ্টভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপক্ষে দলিল এবং তাছাড়া আমাদের বর্ণিত যুক্তিও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিরুদ্ধে দলিল।

উল্লেখ্য যে, نَسَمَةٌ শব্দটির অর্থ হলো মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দাসকে পেশ করা হয়েছে। اَلنَّسَمَةُ শব্দটি মুক্ত করার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, فُكَّ الرَّقَبَةَ وَاَعْتِقِ النَّسَمَةَ, তাই এখানে এ মুক্ত করার অর্থে نَسَمَةٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পরের মাসআলা হলো, যদি কেউ মুক্ত করার শর্তে দাস বিক্রি করে আর ক্রেতা উক্ত শর্তের সাথে কিনে দাসটিকে আজাদ করে দেয়, তাহলে তার মুক্তিদান সঠিক হবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো, বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং তার মুক্ত করাও শুদ্ধ হবে। বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার কারণেই ক্রেতার উপর তাদের ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَنٌ) প্রদান করা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) বলেন, তার বিক্রয় পূর্বাবস্থার ন্যায় ফাসিদই থাকবে। এ কারণে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য (قِيْمَتٌ) প্রদান করা আবশ্যক হবে। কেননা বিক্রয় ফাসিদ হলে বাজার মূল্য আবশ্যক হয়।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, বিক্রয়ের শর্ত ছিল চুক্তিবিরোধী ও এর পরিপন্থি। তাই বিক্রয়চুক্তি প্রথমেই ফাসিদ হয়ে যায়। নিয়মানুসারে (اَلْفَاسِدُ لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا) ফাসিদ কখনো জায়েজে রূপান্তরিত হতে পারে না। এর উদাহরণ এই যে, যদি দাসটি মুক্ত না হয়ে অন্যভাবে ধ্বংস কিংবা হাত ছাড়া হয়ে যেত যেমন ক্রেতা সেটাকে নিজ আয়ত্তে নেওয়ার পর মরে গেল কিংবা পালিয়ে চলে গেল, তখন বিক্রয় ফাসিদ রূপেই বহাল থাকে এবং ক্রেতার উপর বাজার মূল্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। তদ্রূপ ক্রেতা দাসকে মুক্ত করে দিলে তার উপর বাজার মূল্য আবশ্যক হবে এবং বিক্রয়চুক্তি ফাসিদরূপে বহাল থাকবে। এমনিভাবে তাদের মতে যদি মুদাব্বার অথবা মুকাতাব বানানোর শর্তে কিংবা দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানোর শর্তে বিক্রি করে, আর সেই শর্তসমূহ পূরণ করে তবুও বিক্রি ফাসিদরূপেই বহাল থাকবে। জায়েজ রূপান্তরিত হবে না। ক্রেতার উপর বাজার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হলো, বিক্রয়ের মধ্যে আজাদ করার শর্তারোপ করা সত্তাগতভাবে বিক্রয়চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বিষয় ইতিপূর্বে আমরা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যে, আজাদ করে দেওয়ার শর্ত ক্রেতার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। কেননা, বিক্রয়চুক্তির দাবি হলো ক্রেতার নিঃশর্ত অধিকার ও স্বেচ্ছাব্যবহারের স্বাধীনতা, আর শর্তারোপের দ্বারা সেই স্বাধীনতা ব্যহত হয়। আজাদীর শর্তারোপ করা তাই সত্তাগতভাবে চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে হুকুম হিসেবে আজাদ করার শর্ত চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আজাদকরণ ক্রেতার মালিকানা সমাপ্ত করে দেয়। আর যে বস্তু তার সমাপ্তিতে পৌছে তা স্থিতিশীল হয়ে যায়। তাই ক্রেতা দাসকে মুক্ত করে দেওয়ার পর যদি তার কোনো ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে। তার এই অধিকার এ কথাই প্রমাণ করে যে, তার মালিকানা নিঃশেষ হয়নি, বরং চূড়ান্তে পৌছে স্থিতিশীল হয়েছে। কিন্তু যদি অন্যভাবে দাস হাতছাড়া হয় যেমন, দাসটি মারা গেল বা নিহত হলো কিংবা ক্রেতা বিক্রি করে দিল বা দান করে দিল, তখন ক্রেতা তার কোনো ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারলেও তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে না। তাহলে অন্যভাবে হাত ছাড়া হওয়া ও আজাদ করে দেওয়া এক নয়। তাই একটিকে অন্যটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয় এবং এও বুঝা গেল যে, অন্যভাবে নষ্ট হলে তাতে মালিকানা থাকে না। তবে আজাদ করার পরও মালিকানা নিঃশেষ হয় না; বরং তা অবশিষ্ট থাকে।

তাছাড়া আজাদির শর্ত করার পর আজাদ করলে তাতে মালিকানা স্থিতিশীল হয়, পক্ষান্তরে ফাসিদ হলে তার কোনো স্থিতিশীলতা থাকে না। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ করার পর সেটা সহীহরূপে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অন্য কোনোভাবে হাতছাড়া হলে তা সহীহরূপে রূপান্তরিত হয় না, বরং এতে ফাসাদ আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়। সুতরাং যখন দাসটিকে আজাদ করা হলো তখন শর্তটি চুক্তির অনুযায়ী হলো এবং অবৈধতার উপর বৈধতা প্রাধান্য লাভ করল। মুক্তিদানের পূর্বে বিক্রয়চুক্তি মুলতবি ছিল, অর্থাৎ যখন আজাদ করার শর্তে দাস বিক্রি করা হলো তখন বিক্রয় বৈধতা ও অবৈধতার মাঝে দোদুল্যমান ছিল। এমতাবস্থায় দাস যদি আজাদ না করে অন্যভাবে বিনষ্ট বা হাতছাড়া হয়ে যেত তাহলে ফাসিদ হওয়ার বিষয় স্থির হয়ে যেত। কিন্তু যদি ক্রেতা দাসটি মুক্ত করে দেয় তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يَسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا اَوْ دَارًا عَلٰى اَنْ يَسْكُنَهَا اَوْ عَلٰى اَنْ يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِىْ دِرْهَمًا اَوْ عَلٰى اَنْ يُهْدِىَ لَهُ هَدِيَّةً، لِاَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ، وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَلِاَنَّهُ (ع) نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَلِاَنَّهُ لَوْكَانَ الْخِدْمَةُ وَالسُّكْنٰى يُقَابِلُهُمَا شَيْئٌ مِنَ الثَّمَنِ يَكُوْنُ اِجَارَةً فِىْ بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَابِلُهُمَا يَكُوْنُ اِعَارَةً فِىْ بَيْعٍ، وَقَدْ نَهَى النَّبِىُّ (ع) عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِىْ صَفْقَةٍ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তদ্রূপ [বিক্রয়-চুক্তি ফাসিদ হবে] যদি কেউ ক্রীতদাস এই শর্তে বিক্রি করে যে, বিক্রেতা তার থেকে একমাস খিদমত গ্রহণ করবে। অথবা বাড়ি বিক্রি করে এই শর্তে যে, বিক্রেতা তাতে বাস করবে, কিংবা এ শর্তে যে, ক্রেতা তাকে এক দিরহাম ঋণ দিবে অথবা তাকে কোনো উপঢৌকন প্রদান করবে। কেননা, এগুলো চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী শর্ত নয় এবং এতে দু'পক্ষের কোনো এক পক্ষের স্বার্থ রয়েছে। আর এ কারণে যে, রাসূল ﷺ ঋণসহ বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করেছেন। আর এ কারণে যে, যদি খিদমত ও বসবাসের বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে ইজারা প্রদান করা হলো। আর যদি খিদমত ও বসবাসের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারিত না থাকে, তাহলে বিক্রয়চুক্তির সাথে বিনিময়হীন ব্যবহারানুমতি প্রদান করা হল। অথচ রাসূল ﷺ এক চুক্তির মধ্যে দুই চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বে আলোচিত বিক্রয়ের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত শর্তাদিকে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে এবং এগুলোর ফাসিদ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : কোনো ব্যক্তি একটি দাস এই শর্তে বিক্রি করল যে, দাসটি একমাস বিক্রেতার খিদমত করবে। অর্থাৎ সে বিক্রীত-পণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার শর্ত করল। অথবা বিক্রেতা বাড়ি বিক্রি করল এই শর্তে যে, বিক্রীত বাড়িটিতে সে একমাস থাকবে অথবা বিক্রেতা কোনো কিছু এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তাকে এক দিরহাম ঋণ দিবে কিংবা এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা তাকে কিছু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করবে। এসব শর্ত করলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। এর ফাসিদ হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন।

১. এ শর্তাবলি বিক্রয়ের চাহিদা অনুযায়ী তো হয়ইনি; বরং এগুলো বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এগুলো দ্বারা কোনো এক পক্ষের [এখানে বিক্রেতার] স্বার্থ রয়েছে। আর ইতঃপূর্বে মূলনীতি আকারে বলা হয়েছে যে, যেসব শর্ত চুক্তির পরিপন্থি এবং এতে কোনো পক্ষের স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে তা বিক্রয়কে বাধাগ্রস্ত করে এবং ফাসিদ করে দেয়। তাই এসব শর্তের বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

২. অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল রাসূল ﷺ-এর হাদীস–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ـ

আরেকটি হাদীস এই-

رَوٰى اَصْحَابُ السُّنَنِ اِلَّا ابْنَ مَاجَةَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِىْ بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

উপরিউক্ত দু'টি হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ কোনো শর্তসহ বিক্রয় চুক্তি করতে এবং ঋণসহ বিক্রয়চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এমন বিক্রয় যাতে বিক্রয়ের সাথে এই শর্ত থাকবে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে ঋণ দিবে। এ হাদীস তৃতীয় শর্তটির ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল।

৩. অবৈধ হওয়ার তৃতীয় দলিল এই যে, দাসের থেকে একমাস খিদমত নেওয়ার শর্ত অথবা বাড়িতে একমাস থাকার শর্তকে দু'ভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে-

ক. বিক্রেতা একমাস থাকবে বা খিদমত নিবে এর বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ উদাহরণ স্বরূপ মূল্য ধরা হলো এক হাজার টাকা, এর মধ্য থেকে আটশ টাকা বিক্রয় মূল্য, আর বাকি দু'শ টাকা থাকার বা খিদমতের বিনিময়।

খ. অথবা বিক্রেতা বাড়িতে একমাস থাকবে অথবা খিদমত নিবে এর বিনিময়ে মূল্যের একটা অংশ নির্ধারিত থাকবে না। বরং বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকার প্রদানের অনুমতি হিসেবে সেটাকে গ্রহণ করবে।

প্রথম সুরতে তার সুবিধা গ্রহণ হলো ইজারা বা ভাড়া হিসেবে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকার প্রদান হিসেবে, যাই হোক না কেন তা বিক্রয়চুক্তির সাথে হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রয়ের সাথে বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকারের অনুমতি কিংবা বিক্রয়ের সাথে ইজারা-চুক্তি। অথচ রাসূল ﷺ এক লেন-দেনের মাঝে অন্য লেন-দেন যুক্ত করতে নিষেধ করেছেন।

নিষেধের হাদীসটি এই-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِىْ صَفْقَةٍ . (اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِىُّ)

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাড়িতে অবস্থান করা কিংবা দাস থেকে খিদমত গ্রহণ করার [বিনিময়হীন ব্যবহারাধিকারে অনুমতি বা ইজারা হিসেবে] শর্তারোপ করার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلٰى اَنْ لَا يُسَلِّمَهُ اِلٰى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، لِاَنَّ الْاَجَلَ فِى الْمَبِيْعِ الْعَيْنِ بَاطِلٌ، فَيَكُوْنُ شَرْطًا فَاسِدًا ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْاَجَلَ شُرِعَ تَرْفِيْهًا ، فَيَلِيْقُ بِالدُّيُوْنِ دُوْنَ الْاَعْيَانِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ কোনো জিনিস এই শর্তে বিক্রি করে যে, মাস শেষের পূর্বে তা অর্পণ করবে না, তাহলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে। কেননা, বিক্রীত নগদ বস্তুর ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করা বাতিল। সুতরাং এটা একটা ফাসিদ শর্ত হবে। আর এ ধরনের মেয়াদ বাতিল হওয়ার কারণ হলো, শরিয়তে মেয়াদ গ্রহণকে অনুমোদন করেছে লেন-দেন সহজ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এ সহজীকরণ দায়ন [স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা ইত্যাদি]-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلٰى الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মেয়াদ গ্রহণ করা যায় বিক্রীত বস্তু যদি দায়ন জাতীয় হয়, আর ঐ বিক্রীত-পণ্য যদি আইন হয় তাহলে তাতে মেয়াদ নেওয়া যায় না।

প্রথমতঃ আমাদের دَيْن ও عَيْن -এর পরিচয় জানতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা ছাড়া যাবতীয় বস্তুকে আইন বলা হয়। আইন এর শাব্দিক অর্থ বস্তু বা জিনিস।

আর স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুদ্রা দায়ন বলা হয় এগুলোকে বস্তুর মূল্যরূপে ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে নির্দিষ্ট করা যায় না।

মাসআলা : কেউ যদি কোনো জিনিস আইন বিক্রয় করে এই শর্তে যে, তা সে চলতি মাসের শেষে কিংবা আগামী মাসের শুরুতে প্রদান করবে, তাহলে তার এই শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এর দলিল হলো–

১. মেয়াদ এজন্যই শরিয়ত অনুমোদন করেছে, যাতে উক্ত মেয়াদের মধ্যে সেই দ্রব্য অর্জন করা যায় যার জন্য মেয়াদ নেওয়া হয়েছে। তাই মেয়াদ মুদ্রা দ্রব্যের জন্য উপযোগী। জিনিস পত্রের ক্ষেত্রে সেটা উপযোগী এবং প্রযোজ্য নয়।

২. নির্দিষ্ট জিনিসপত্র যেহেতু হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই তার জন্য মেয়াদ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, মেয়াদ নেওয়াই হয় অনুপস্থিত বস্তু অর্জন করার জন্য। যেমন 'বাইয়ে সলমের' মধ্যে সময় নেওয়া হয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য। তাই যে দ্রব্য উপস্থিত আছে তাতে সময় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে দায়ন তথা স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা প্রথমত এগুলো নির্দিষ্ট করা যায় না। দ্বিতীয়ত এগুলো মানুষ ধীরে ধীরে অর্জন করে, আর যদি এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর স্থলে অন্য স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা প্রদান করলে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, হিদায়ার লেখক مَبِيْع শব্দের পর عَيْن শব্দটি এ জন্য বৃদ্ধি করেছেন, যাতে বাইয়ে সলমের مُسْلَمْ فِيْه -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়। কেননা, বাইয়ে সলমের মধ্যে مُسْلَمْ فِيْه যদিও বিক্রীত-পণ্য বটে, কিন্তু সেটা আইন নয়। বরং مُسْلَمْ اِلَيْه [বিক্রেতা] -এর জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং তা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অর্পণ করা হয়। আর এটা স্বীকৃত যে, বাইয়ে সালামের মধ্যে مُسْلَمْ فِيْه অর্পণের-এর জন্য সময় নেওয়া আবশ্যক।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً اِلَّا حَمْلَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَالْاَصْلُ اَنَّ مَالَا يَصِحُّ اِفْرَادُهٗ بِالْعَقْدِ لَا يَصِحُّ اِسْتِثْنَاؤُهٗ مِنَ الْعَقْدِ، وَالْحَمْلُ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ، وَهٰذَا لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ اَطْرَافِ الْحَيَوَانِ لِاِتِّصَالِهٖ بِهٖ خِلْقَةً، وَبَيْعُ الْاَصْلِ يَتَنَاوَلُهَا. فَالْاِسْتِثْنَاءُ يَكُوْنُ عَلٰى خِلَافِ الْمُوْجَبِ فَلَمْ يَصِحَّ، فَيَصِيْرُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَ الْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهٖ، وَالْكِتَابَةُ وَالْاِجَارَةُ وَالرَّهْنُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ، لِاَنَّهَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، غَيْرَ اَنَّ الْمُفْسِدَ فِى الْكِتَابَةِ مَا يَتَمَكَّنُ فِىْ صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ لَا تَبْطُلُ بِاِسْتِثْنَاءِ الْحَمْلِ، بَلْ يَبْطُلُ الْاِسْتِثْنَاءُ، لِاَنَّ هٰذِهِ الْعُقُوْدَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهٖ، لٰكِنْ يَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ، حَتّٰى يَكُوْنَ الْحَمْلُ مِيْرَاثًا وَالْجَارِيَةُ وَصِيَّةً، لِاَنَّ الْوَصِيَّةَ اُخْتُ الْمِيْرَاثِ، وَالْمِيْرَاثُ يَجْرِىْ فِيْمَا فِى الْبَطْنِ، بِخِلَافِ مَااِذَا اسْتُثْنِىَ خِدْمَتُهَا، لِاَنَّ الْمِيْرَاثَ لَا يَجْرِىْ فِيْهَا -

---

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ গর্ভস্থ সন্তান বাদ দিয়ে শুধু কোনো দাসীকে ক্রয় করে তাহলে ক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে জিনিসকে স্বতন্ত্রভাবে চুক্তিবদ্ধ করা যায় না, তা বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও যায় না। গর্ভস্থ সন্তান এ পর্যায়ভুক্ত। আর এটা এ কারণে যে, গর্ভস্থ সন্তান প্রাণীর সাথে সৃষ্টিগতভাবে যুক্ত হওয়ার কারণে তা প্রাণীর অঙ্গ-প্রতঙ্গের পর্যায়ভুক্ত। আর মূল জিনিসের বিক্রি তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং সেগুলোকে পৃথক রাখা বিক্রয়চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি হবে কাজেই তা শুদ্ধ নয়। ফলে এটা ফাসিদ শর্ত হয়ে যাবে। আর ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবাত চুক্তি, ইজারা চুক্তি ও বন্ধকী চুক্তি বিক্রয়চুক্তির পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এগুলোও অবৈধ শর্তারোপ করার দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, কিতাবাতচুক্তি এমন শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয়, যে শর্ত মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। হেবা, সদকাহ, বিবাহ, খোলা ও ইচ্ছাকৃত খুনের আপোষচুক্তি গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়ার দ্বারা বাতিল হয় না, বরং বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা বাতিল হয়। কেননা, এসব চুক্তি অবৈধ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না [বরং অবৈধ শর্তই বাতিল হয়ে যায়।] এমনিভাবে ওসিয়ত অবৈধ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। তবে এতে বাদ দেওয়া শুদ্ধ হয় ফলে গর্ভস্থ সন্তান উত্তরাধিকার–সম্পদরূপে গণ্য হবে, আর দাসীটি ওসিয়ত হবে। কেননা, ওসিয়ত উত্তরাধিকারী সম্পদের সমপর্যায়ের। গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যেও উত্তরাধিকারের বিধান জারি হয়। তবে যদি দাস বা দাসীর সেবাগ্রহণকে পৃথক করা হয় সেটা বৈধ হবে না। কেননা, সেবা গ্রহণের মধ্যে উত্তরাধিকার চলে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের আরেকটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মাসআলাটির দ্বারা এও উদ্দেশ্য যে, কোন কোন দ্রব্য মূল বস্তু থেকে ইস্‌তিছনা বা বাদ রাখা যায়, আর কোনগুলো বাদ রাখা যায় না, তা বর্ণনা করা।

মাসআলা : কেউ একটি গর্ভবতী দাসী বিক্রয় করল, তবে সে দাসীটির গর্ভস্থ সন্তান তথা ভ্রূণটিকে বিক্রয় থেকে বাদ দিল, তাহলে তার বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে। ফাসিদ হওয়ার কারণ সম্পর্কে লেখক যা বলেন, তা এই যে, মূল বস্তু থেকে কোনো কিছু ইস্‌তিছনা করার তিনটি সুরত হতে পারে– ১. এমন চুক্তি যা থেকে কোনো কিছু ইস্‌তিছনা করার দ্বারা চুক্তি ও ইস্‌তিছনা উভয় বাতিল হয়ে যায়। ২. মূল বস্তুর ক্ষেত্রে চুক্তিটি সহীহ থাকে তবে ইস্‌তিছনা বাতিল হয়ে যায়। ৩. মূল বস্তুর ক্ষেত্রে চুক্তি ঠিক থাকে এবং এর থেকে ইসতিছনাও শুদ্ধ হয়। প্রথম প্রকারের চুক্তিগুলো হলো বিক্রয়চুক্তি, কিতাবাত বা মালিকের সাথে দাস/ দাসীর মুক্তিপণচুক্তি, ইজারাচুক্তি ও বন্ধকীচুক্তি। এর উদাহরণ হলো– ১. কেউ দাসী ক্রয় করল, কিন্তু দাসী গর্ভস্থ বাচ্চাকে বিক্রয় চুক্তি থেকে বাদ দিল। ২. কেউ দাসীর বিনিময়ে ঘর ভাড়া দিল, তবে দাসী থেকে তার গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দিল। ৩. কেউ তার দাসীকে অন্যের কাছে বন্ধক দিল, তবে বন্ধক থেকে দাসীর ভ্রূণকে পৃথক রাখল। তদ্রূপ কেউ তার দাসের সাথে মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তে মুক্ত করার চুক্তি করল এবং দাসের মুক্তিপণ নির্ধারণ করল একটি গর্ভবতী উটনী, তবে তার গর্ভস্থ বাচ্চাটি ব্যতীত ইত্যাদি।

উপরোক্ত উদাহরণগুলোর সবকটিতেই বিক্রয় ফাসিদ হবে। কারণ শর্তগুলো অবৈধ। আর অবৈধ শর্ত বিক্রয়চুক্তির মধ্যে জুড়ে দিলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল তথা ফাসিদ হয়ে যায়। বিক্রয়চুক্তি ব্যতীত তিনটি চুক্তি তথা কিতাবাত, বন্ধক এবং ইজারাও যেহেতু বিনিময়চুক্তি তাই এতে বিক্রয়চুক্তির অনুরূপ হুকুম প্রদান করা হবে। ইস্‌তিছনা তথা পৃথকীকরণ চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি বিষয়, তাই এটা ফাসিদ ও অবৈধ শর্ত গণ্য হবে। আর অবৈধ শর্তের কারণে এসব চুক্তিগুলো বাতিল হয়ে যাবে। তবে স্মরণযোগ্য এই যে, সব বস্তুর ইস্‌তিছনা অগ্রাহ্য নয়। বরং ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেসব দ্রব্য পৃথক ও স্বতন্ত্র বিক্রি করা যায় সেগুলো মূল বস্তু থেকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইস্‌তিছনা তথা পৃথক রাখা যায়। যেমন এক পাত্র গম পৃথকভাবে বিক্রি করা যায়, আবার একস্তুপ গম থেকে এক পাত্র পৃথক রাখাও যায়। পক্ষান্তরে যে বস্তু পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা যায় না, তা মূল বস্তু থেকে পৃথক রেখে বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করা যায় না, ভ্রূণ বা গর্ভস্থ সন্তান এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। ভ্রূণ আলাদাভাবে বিক্রি করা যায় না। তাই এটাকে বিক্রয়চুক্তির মধ্যে দাসী থেকে পৃথকও রাখা যায় না। ভ্রূণ আলাদাভাবে বিক্রয় করা যায় না। এর কারণ এই যে, ভ্রূণ প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যায়ভুক্ত। যেমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জন্মগতভাবে প্রাণীর সাথে যুক্ত, তেমনি গর্ভস্থ সন্তানও মায়ের সাথে জন্মগত ও সৃষ্টিগতভাবে যুক্ত। কোনো প্রাণী বিক্রি করা হলে তার থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চুক্তি থেকে পৃথক রাখা চুক্তির চাহিদার বিপরীত ও পরিপন্থি। তদ্রূপ গর্ভস্থ সন্তানকে বিক্রয়চুক্তি থেকে পৃথক রাখা চাহিদার পরিপন্থি। আর যে শর্ত বিক্রয়চুক্তির স্বাভাবিক দাবির পরিপন্থি হয়, তা ফাসিদ ও অবৈধ হয়। এ কারণে গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়া ফাসিদ ও অবৈধ হবে। ফাসিদ শর্তের অন্তর্ভুক্তির কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই বিক্রয়চুক্তি থেকে ভ্রূণকে বাদ দিলে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কিতাবাত, ইজারা ও বন্ধক যেহেতু বিক্রয়ের সমপর্যায়ের তাই এগুলোর মধ্যে এমন শর্ত করা হলে এগুলোও বাতিল হয়ে যাবে।

তবে কিতাবাতের সাথে বিক্রয়ের সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এই যে, বিক্রয়ের মধ্যে যে কোনো ফাসিদ শর্ত যুক্ত হলে চুক্তি ফাসিদ হয়। চাই সে শর্ত বিক্রয়ের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হোক কিংবা না হোক। উভয় অবস্থায় বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে কিতাবাত যে কোনো ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না। বরং শর্তটি কিতাবাতের সত্তার সাথে যুক্ত হলে কেবল তখনই ফাসিদ হবে। যেমন কোনো মুসলিম মালিক তার দাসের মুক্তিপণ নির্ধারণ করল মদ কিংবা শূকরকে। এমন শর্ত করার দ্বারা কিতাবাত বাতিল হবে। অন্যথায় যদি সে এমন শর্তারোপ করে যা তার সত্তার সাথে যুক্ত নয়, যেমন কোনো ব্যক্তি তার মুকাতাবকে শর্ত দিল যে, মুকাতাব ঢাকার বাইরে যেতে পারবে না। প্রথম শর্ত ছিল চুক্তির সত্তার সাথে সম্পৃক্ত পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শর্তটি কিতাবাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এজন্য প্রথম সুরতে মুক্তিপণ চুক্তি শুদ্ধ হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে কিতাবাতচুক্তি ফাসিদ হবে না, শুদ্ধ হবে। মুকাতাব শর্ত অমান্য করে ঢাকার বাইরে যেতে পারবে। শর্তটি বাতিল ও অর্থহীন হয়ে যাবে। কিতাবাতের ক্ষেত্রে শর্তগত পার্থক্য হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবাত বিক্রয় ও বিবাহ উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কিতাবাত চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কারণ মুকাতাব তার মনিবের কাছে মালরূপে বিবেচিত। তাই মনিব মুকাতাবের

বিনিময়ে মুক্তিপণ লাভ করে। আবার কিতাবাত বিবাহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেননা মুকাতাব তার নিজের কাছে মাল নয়, তাই মুকাতাব মুক্তিপণের বিনিময়ে কোনো কিছুই লাভ করে না। কিতাবাতের এই দ্বৈত অবস্থার কারণে যে সব শর্ত কিতাবাতের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, সে সব শর্তের ক্ষেত্রে তাকে আমরা বিক্রয়চুক্তির সাথে যুক্ত করেছি। অর্থাৎ যেভাবে ফাসিদ শর্ত দ্বারা বিক্রয় বাতিল হয়, তেমনি কিতাবাত চুক্তি বাতিল হবে। আর যে সব শর্ত মূল সত্তার সাথে যুক্ত নয়, সেসব শর্তের বেলায় কিতাবাতকে বিবাহের সাথে যুক্ত করে দিয়েছি। অর্থাৎ বিবাহ যেমনটা ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না, বরং শর্তগুলিই অর্থহীন হয়ে যায়। তেমনি এমন শর্তাদি যা কিতাবাতের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তার উপস্থিতিতে কিতাবাত বাতিল হবে না। বরং অবৈধ শর্তগুলোই অকার্যকর হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার এমন চুক্তিসমূহ, যাতে ফাসিদ শর্তাদি করা হলেও চুক্তি বাতিল হয় না; বরং ফাসিদ শর্তাদি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এতে এসব চুক্তিতে ইস্‌তিস্‌না করা হলে চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ইস্‌তিস্‌না বাতিল হয়ে যায়। এ প্রকারের চুক্তিগুলো হচ্ছে : হেবা, সদকা, বিবাহ-শাদী, খোলা' ও ইচ্ছাকৃত হত্যা করার পর শাস্তির ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের সাথে আপোষচুক্তি। উদাহরণস্বরূপ –১. কোনো ব্যক্তি তার গর্ভবতী দাসীটি হেবা করল, কিন্তু তার ভ্রূণকে বাদ রাখল এবং এটাকে দান-হেবা করল না। ২. দাসীকে সদকা করে দিল, কিন্তু তার গর্ভস্থ সন্তানকে দান করল না ৩. দাসীকে মহর নির্ধারণ করল, কিন্তু দাসীর ভ্রূণকে বাদ দিল। ৪. অথবা কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খোলা' করল একটি গর্ভবতী দাসীর বিনিময়ে, তবে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়া হলো। ৫. স্বেচ্ছায় হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের সাথে একটি গর্ভবতী দাসীর সাহায্যে আপোষ করল, তবে দাসীর গর্ভের সন্তানকে বাদ দিল। দ্বিতীয় প্রকারের চুক্তিগুলোতে গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ দেওয়ার যে ফাসিদ শর্ত করা হয়েছে, এর কারণে চুক্তিগুলো বাতিল হবে না। তবে এই শর্তসমূহ সবই অর্থহীন হয়ে যাবে। তবে চুক্তির মধ্যে গর্ভস্থ সন্তান এবং মা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং শুধুমাত্র মা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এসব চুক্তি ফাসিদ শর্ত দ্বারা ফাসিদ হয় না। এর কারণ এই যে, প্রথম প্রকার অবৈধ শর্তের দ্বারা ফাসিদ হতো সুদের জন্য। অর্থাৎ শর্তগুলো সুদের অস্তিত্ব ডেকে আনত। আর আমরা জানি সুদ উদ্ভব হয় শুধুমাত্র বিনিময় চুক্তিসমূহের মধ্যে, অথচ দ্বিতীয় প্রকারে উল্লিখিত চুক্তিসমূহ যথা: হেবা, সদকা ইত্যাদি বিনিময় চুক্তি নয়; বরং এগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাদান ও এক পক্ষের খরচ। এতে সুদের উদ্ভদ কোনোভাবেই হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু এই চুক্তিগুলোতে অবৈধতার হেতুই পাওয়া যাচ্ছে না তখন এগুলো অবৈধ শর্তের কারণে ফাসিদ হবে না। বরং অবৈধ শর্ত অকার্যকর ও অর্থহীন হয়ে যাবে। হেবা দ্বারা যদিও মালিক বানানো হয় তবু এটা অবৈধ শর্ত দ্বারা ফাসিদ না হওয়ার কারণ এই যে, হাদীসে রাসূল ﷺ। যেমন রাসূল ﷺ এই শর্তের সাথে হেবা করাকে বৈধ বলেছেন। যেমন কেউ দান গ্রহীতাকে বলল, এই গোলাম আপনার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার জন্য। আপনার মৃত্যুর পর আমার [দাতার] কাছে দানকৃত বস্তুটি ফেরত আসবে। এধরনের শর্তের সাথে হেবা করলেও হেবা শুদ্ধ হবে এবং শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। দান গ্রহীতার মৃত্যুর পর দানকৃত বস্তুটি দাতার কাছে ফেরত যাবে না। বরং দানগ্রহীতার উত্তরাধিকারীরা সেটা পাবে। রাসূল ﷺ কর্তৃক উক্ত বৈধ শর্তের সাথে হেবাকে শুদ্ধ বলার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফাসিদ ও অবৈধ শর্ত হেবাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। বরং অবৈধ শর্তই অকার্যকর ও বাতিল হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রকার এই যে, এমন চুক্তি যাতে উপরিউক্ত ইস্‌তিছনা করা সত্ত্বেও ইস্‌তিছনা ও চুক্তি উভয়ই শুদ্ধ হবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ মুমূর্ষু অবস্থায় তার দাসীকে এক ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করল, তবে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে বাদ রাখল, এমতাবস্থায় গর্ভকে বাদ রাখার কারণে অসিয়ত বাতিল হবে না এবং বাদ রাখাও অকার্যকর হবে। এভাবে অসিয়ত করার কারণে দাসী পাবে ঐ ব্যক্তি, যার জন্য দাসীর মালিক ওসিয়ত করেছে। আর দাসীর গর্ভস্থ সন্তান পাবে অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারগণ। উক্ত শর্ত সত্ত্বেও অসিয়ত বাতিল না হওয়ার কারণ এই যে, অসিয়ত বিনিময়চুক্তি নয়। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিনিময়চুক্তি না হলে তাতে সুদের সম্ভাবনা থাকে না, তাই এগুলো বাতিল হয় না। তবে শর্ত তথা ইস্‌তিছনা শুদ্ধ হওয়ার কারণ ভিন্ন আরেকটি বিষয়। আর তা হলো অসিয়ত হতো উত্তরাধিকারের মতো। কেননা, উভয়ের বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা মৃত্যুর পর। উত্তরাধিকার গর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে জারি হয়। কারণ, গর্ভস্থ সন্তান অস্তিত্ববান সত্তা। যে কোনো অস্তিত্ববান সত্তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর হয়, তাই গর্ভস্থ সন্তানে উত্তরাধিকার জারি হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি দাসীকে অসিয়ত করে তার সেবা গ্রহণকে ইস্‌তিছনা করে তাহলে এ ইসতিছনা শুদ্ধ হবে না, কেননা, খিদমত বা সেবাগ্রহণ কোনো বস্তু নয়, যাতে উত্তরাধিকার চলবে। যার মধ্যে উত্তরাধিকার কার্যকর হয় না তা ইসতিছনা করা যায় না, সুতরাং এমন শর্ত করা হলে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আর খিদমতও যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সেই লাভ করবে, উত্তরাধিকারীগণ লাভ করবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى اَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَيَخِيْطَهُ قَمِيْصًا اَوْ قَبَاءً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لِاَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيْهِ الْعَقْدُ، وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَلِاَنَّهُ يَصِيْرُ صَفْقَةً فِيْ صَفْقَةٍ عَلٰى مَامَرَّ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى نَعْلًا عَلٰى اَنْ يَحْذُوَهُ الْبَائِعُ اَوْ يُشَرِّكَهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، قَالَ (رض) : مَا ذَكَرَهُ جَوابُ الْقِيَاسِ، وَ وَجْهُهُ مَابَيَّنَّا، وَفِي الْاِسْتِحْسَانِ يَجُوْزُ لِلتَّعَامُلِ فِيْهِ، فَصَارَ كَصَبْغِ الثَّوْبِ، وَلِلتَّعَامُلِ جَوَّزْنَا الْاِسْتِصْنَاعَ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ কাপড় কিনল এই শর্তে যে, বিক্রেতা কাপড় কেটে জামা কিংবা আলখেল্লা সেলাই করে দিবে তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। কেননা, এটা এমন শর্ত, যা চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী হয়নি এবং এতে এক পক্ষের স্বার্থ বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এতে এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার নিষিদ্ধতা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন, যদি কেউ এই শর্তে চামড়া কিনল যে, বিক্রেতা চামড়া দ্বারা জুতা বানাবে কিংবা ফিতা বানাবে তাহলে তার বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। হিদায়ার মুসান্নিফ বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) বর্ণনা যা করলেন তা তো কিয়াসানুযায়ী এবং এর অবৈধ হওয়ার কারণও আমরা বর্ণনা করেছি। তবে ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে এটা বৈধ। কারণ, সমাজে এটা প্রচলিত। ফলে এটা কাপড় রং করে দেওয়ার শর্তে কাপড় ক্রয়ের মতো হয়ে গেল। আর প্রচলনের কারণেই আমরা কারিগর দ্বারা [অর্ডার দিয়ে] কোনো বস্তু তৈরি করাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দু'টি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : কেউ কাপড় বিক্রেতা থেকে এই শর্তে কাপড় ক্রয় করল যে, বিক্রেতা কাপড় কেটে জামা [সেলাই করে] বানিয়ে দিবে অথবা আলখেল্লা বানিয়ে দিবে। তাহলে উক্ত শর্তের সাথে বিক্রয়চুক্তিটি চার ইমামের সকলের মতে ফাসিদ হবে। কেননা, তার শর্তটি চুক্তির চাহিদার পরিপন্থি এবং এতে একপক্ষ তথা ক্রেতার লাভও বিদ্যমান রয়েছে। পূর্ব বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী যেসব শর্ত চুক্তি বিরোধী এবং এতে কোনো একপক্ষের স্বার্থ থাকে তার উপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। সে মতে এখানেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দলিল এই যে, কাপড় কাটা ও সেলাই বাবদ মূল্যের অংশ নির্ধারণ থাকবে কিনা ? যদি বলা হয় মূল্যের একটা অংশ কাপড় কাটা ও সেলাইয়ের জন্য হবে তাহলে তা হবে ইজারা, যা বিক্রয় চুক্তির মাঝে প্রবিষ্ট করা হয়েছে অথবা এর বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারণ করা হবে না। তাহলে এটা হবে ঋণ ও ধার। আর তখন বিক্রয়চুক্তির মাঝে ঋণ প্রবিষ্ট হচ্ছে। উভয় অবস্থাতে চুক্তির মাঝে অন্য চুক্তি প্রবিষ্ট হচ্ছে। আর এক চুক্তির সাথে অন্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই এ ধরনের চুক্তি করা হলে রাসূল ﷺ -এর নিষেধের লঙ্ঘন হবে। এর ফলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, عَلٰى مَامَرَّ দ্বারা نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِيْ صَفْقَةٍ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : কেউ চামড়া বিক্রেতা থেকে এই শর্তে চামড়া ক্রয় করল যে, বিক্রেতা চামড়া দ্বারা জুতা তৈরি করে দিবে অথবা জুতার মধ্যে চামড়ার ফিতা লাগিয়ে দিবে। এ বিক্রয়টি কিয়াস অনুসারে ফাসিদ। ইমাম কুদূরী (র.) কিয়াসানুযায়ী এটা ফাসিদই বলেছেন। কিন্তু হিদায়ার লেখকের বক্তব্য ভিন্ন। তিনি বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) -এর বর্ণিত মাসআলাটি কিয়াসানুযায়ী বলা হয়েছে। এর ফাসিদ হওয়ার কারণ এই যে, এটা এমন শর্ত যা চুক্তির দাবির পরিপন্থি। আর এতে এক পক্ষের স্বার্থও বিদ্যমান রয়েছে। নিয়মানুযায়ী এমন শর্তের উপস্থিতি চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়, তাই এ চুক্তি ফাসিদ হওয়া উচিত। ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও তাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে এমন বিক্রয় প্রচলিত থাকার কারণে ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে এটাকে বৈধ বলা হয়েছে। যেমন রঙকারিগরকে কাপড় রাঙানোর উদ্দেশ্যে ভাড়া নেওয়া যুক্তি মতে অবৈধ। কেননা, ইজারা বলা হয় সুবিধা বিক্রিকে। অথচ এখানে মূল বস্তু তথা রঙই বিক্রি করা হচ্ছে, তাই এটা অবৈধ হবে। যেমন দুধপানের উদ্দেশ্যে গাভী ভাড়া নেওয়া অবৈধ হয়ে থাকে। কিন্তু রঙ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রংকারকে ভাড়া নেওয়া ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে বৈধ। তাই আমাদের আলোচ্য জুতা তৈরি করার শর্তে চামড়া বিক্রিও বৈধ হবে। এর আরেক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ফরমায়েশী বিক্রয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, টাকা দিয়ে জুতা ইত্যাদি বানানোর অর্ডার দেওয়া। যেমন কেউ মুচিকে বলল, আমি তোমাকে দু'শ টাকা দিচ্ছি, তুমি আমার পায়ের অমুক মডেলে এক জোড়া জুতা বানিয়ে দাও। এ জাতীয় বিক্রি বৈধ। যদিও এ জাতীয় বিক্রি কিয়াসের খেলাফ বা যুক্তি বিরুদ্ধ। কিন্তু সমাজে এ ধরনের বিক্রির বহুল প্রচলন রয়েছে। তাই প্রচলনের কারণে যুক্তি বিরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটা ইস্‌তিহ্‌সান হিসেবে বৈধ। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাটি বৈধ হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বের আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে, সামাজিক রেওয়াজ ও প্রচলন কিয়াসের উপর প্রাধান্য লাভ করে। এ কারণে এ মাসআলাটির ব্যাপক প্রচলনের উপর ভিত্তি করে বৈধতার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

قَالَ : وَالْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوْزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارٰى وَفِطْرِ الْيَهُوْدِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَبَايِعَانِ ذٰلِكَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ، وَهِيَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الْبَيْعِ لِابْتِنَائِهَا عَلَى الْمُمَاكَسَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ، لِكَوْنِهِ مَعْلُوْمًا عِنْدَهُمَا، أَوْ كَانَ التَّاجِيْلُ إِلَى فِطْرِ النَّصَارٰى بَعْدَمَا شَرَعُوْا فِيْ صَوْمِهِمْ، لِأَنَّ مُدَّةَ صَوْمِهِمْ بِالْأَيَّامِ مَعْلُوْمَةٌ، فَلَا جَهَالَةَ فِيْهِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নব দিবস মেলা, খ্রিস্টানদের উপবাস ও ইহুদিদের উপবাস ভঙ্গের তারিখে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বিক্রি করা ফাসিদ। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা এগুলোর তারিখ না জানে। কেননা, [এখানে] সময় অজ্ঞাত। আর অনির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রয়চুক্তি বিবাদ সৃষ্টি করে। কেননা, বিবাদের উৎস হলো কষাকষি-তিক্ততা [আর বিক্রয়ের মধ্যে সেটা রয়েছে]। তবে যখন উভয়ে এগুলোর তারিখ জানবে [তখন বিবাদ হবে না] কেননা, তখন উভয়ের কাছে মেয়াদ জ্ঞাত থাকবে। এমনিভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের উপবাস শুরু করার পর যদি তাদের উপবাস ভঙ্গের তারিখ নির্ধারণ করা হয় [তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে]। কেননা, তাদের উপবাসের দিনগুলো জ্ঞাত। ফলে তাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوْزِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট মেয়াদে লেনদেন করলে তা ফাসিদ হওয়ার মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

نَيْرُوْز শব্দটি نوروز [ফারসি] -এর আরবিরূপ। এর অর্থ নব দিবস। বসন্তকালের প্রথমদিন। এ দিন সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) বলেন, كُلُّ يَوْمٍ لَنَا نوروز আমাদের প্রতিটি দিনই নওরোজ। পারস্যের কাফির সম্প্রদায় এদিনে উৎসব পালন করত। বসন্তকালের প্রথমদিনটিকে তারা نوروز বলত।

مِهْرَجَانْ শব্দটি مهرگان [ফারসি] -এর আরবিরূপ, শরৎকালের প্রথম দিনকে مِهْرَجَانْ নামে অবহিত করা হতো, এদিনে তারা মেলা-প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসব করত।

صَوْم نَصَارٰى খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপবাস শুরু হতো বসন্ত কালের প্রথম দিন থেকে টানা পঞ্চাশ দিন তারা উপবাস ব্রত পালন করে।

قَوْلُهُ فِطْرُ الْيَهُوْدِ : ইহুদি সম্প্রদায়ও খ্রিস্টানদের মতো পঞ্চাশদিন উপবাস ব্রত পালন করে। তাদের সেই উপবাসপর্ব শুরু হয় রমযানের পহেলা তারিখ থেকে। আমাদের ঈদের দিনও তারা উপবাস ভাঙ্গে না। পঞ্চাশদিন পুরা করে তারা উপবাস ভাঙ্গে। উল্লেখ্য যে, নওরোজ, মেহেরগান ও খ্রিস্টানদের উপবাস ইত্যাদি দিবসগুলো তারা গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির সাহায্যে নির্ধারণ করে। এর সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ তাদেরও পূর্ব থেকে জানা থাকে না। আধুনিক যুগে হয়তো এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট তারিখ তারা নির্ধারণ করে থাকবে। ইহুদি সম্প্রদায়ের উপবাস শুরু হওয়ার পর মাসের [উনত্রিশ বা ত্রিশ এর] কারণে তাদের উপবাস ভঙ্গের তারিখও রদবদল হতো।

সূরতে মাসআলা : কেউ কোনো পণ্য খরিদ করে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নওরোজ বা মেহেরগানের দিন নির্ধারণ করল, অথবা সে বিক্রেতাকে বলল, যেদিন খ্রিস্টান সম্প্রদায় উপবাস শুরু করবে অথবা ইহুদি সম্প্রদায় যেদিন উপবাস ভাঙ্গবে সেদিন তথা তাদের ঈদের দিন মূল্য পরিশোধ করব, উপরিউক্ত সব অবস্থাতে শর্তগুলোর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উক্ত দিবসগুলোর তারিখ না জানে। যদি তারা দিবসগুলোর সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। আমাদের বাংলাদেশী সমাজে এর উদারহরণ এই যে, ক্রেতা কোনো দ্রব্য কিনে বিক্রেতাকে বলল, বিজয় দিবসে টাকা শোধ করবে। অথচ ক্রেতা ও বিক্রেতা কেউই জানে না বিজয় দিবস কবে? ফাসিদ ও অবৈধ হওয়ার কারণ এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার দিবসগুলোর তারিখ না জানার কারণে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। মেয়াদী বিক্রয়ে মেয়াদ অজ্ঞাত হলে টাল বাহানা হবে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়চুক্তির যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে তা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। এ কারণে উল্লিখিত শর্তের উপস্থিতিতে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার দিবসগুলোর তারিখ জানা থাকলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কারণ তখন তো মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

লেখক বলেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপবাস শুরুর পর যদি মূল্য পরিশোধের দিন ধার্য করা হয় উপবাস ভাঙ্গার দিন, তাহলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা এ অবস্থায় যেহেতু তাদের উপবাসের দিন জানা আছে অর্থাৎ পঞ্চাশ দিন কিংবা পঞ্চান্ন দিন তাই পরিশোধের দিন নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে যে, তাদের উপবাস শুরুর পর যেদিন বিক্রয় হলো সেদিনটি তো নির্দিষ্ট। সেদিনের পূর্বে কয়টি উপবাস দিন গেল সেটা গণনা ফেললে বের হয়ে যাবে উপবাস সমাপ্ত হওয়ার কয়দিন বাকি আছে। উদাহরণ স্বরূপ দশদিন যাওয়ার পর চুক্তি হলে আরও থাকবে চল্লিশ/ পয়তাল্লিশ দিন। তখন তার মূল্য পরিশোধের মেয়াদ হবে একচল্লিশতম দিন/ ছেচল্লিশতম দিন।

মোটকথা, এ অবস্থায় উপবাস ভাঙ্গার দিন সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হতে আর কোনো বাধা থাকবে না।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى قُدُومِ الْحَاجِّ، وَكَذٰلِكَ إِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْقِطَافِ وَالْجِزَازِ، لِأَنَّهَا تَتَقَدَّمُ وَتَتَاخَّرُ، وَلَوْ كَفَلَ إِلَى هٰذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمَّلَةٌ فِي الْكَفَالَةِ، وَهٰذِهِ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ (رض) فِيهَا، وَلِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْأَصْلِ، أَلَا تَرٰى أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَةَ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ، بِأَنْ تَكَفَّلَ بِمَا ذَابَ عَلٰى فُلَانٍ، فَفِي الْوَصْفِ أَوْلٰى، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهَا فِي أَصْلِ الثَّمَنِ، فَكَذَا فِي وَصْفِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مُطْلَقًا، ثُمَّ أَجَّلَ الثَّمَنَ إِلَى هٰذِهِ الْأَوْقَاتِ حَيْثُ جَازَ، لِأَنَّ هٰذَا تَاجِيلٌ فِي الدَّيْنِ، وَهٰذِهِ الْجَهَالَةُ فِيهِ مُتَحَمَّلَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ، وَلَا كَذٰلِكَ اِشْتِرَاطُهُ فِيْ أَصْلِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাজীগণের [হজ থেকে] প্রত্যাবর্তনের সময় মূল্য পরিশোধ করার শর্তে বিক্রয় বৈধ হবে না। এমনিভাবে ফসল তোলা, ফসল মাড়ানি, আঙ্গুর তোলা ও পশম কাটার সময় মূল্য আদায় করার শর্তে বিক্রয় করা বৈধ নয়। কেননা, এ মৌসুমগুলো অগ্রবর্তী ও বিলম্বিত হয়। যদি এ সময় পর্যন্ত কেউ জামিন হয় তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, জামানতের মধ্যে সামান্য অস্পষ্টতাতে সমস্যা নেই। এই অস্পষ্টতা সামান্য যার প্রতিকার করা সম্ভব। এর প্রমাণ এই যে, সাহাবীগণের এ জাতীয় অস্পষ্ট সময়ের বৈধতার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে [কারও মতে এটা বৈধ, কারও মতে অবৈধ]। তাছাড়া [সময়ের সামান্য হেরফের হলেও] মূল বিষয়টি জ্ঞাত। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, জামানতের ক্ষেত্রে ঋণের মূল পরিমাণের অজ্ঞতা পর্যন্ত সহনীয়। যেমন বলা হয় যে, অমুকের উপর যে পরিমাণ ঋণ রয়েছে সে তার জামিন। সুতরাং গুণগত অজ্ঞতা তো আরো উত্তমভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে বেচাকেনার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে অজ্ঞতা গ্রহণীয় হয় না। সুতরাং তার গুণগত বিষয়েও তদ্রূপ হবে। তবে এরও ব্যতিক্রম হলো যখন কেউ নিঃশর্তভাবে বিক্রয় করে তারপর মূল্য পরিশোধের জন্য এ সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করে। তখন তা বৈধ হবে। কেননা এটা তো ঋণ আদায়ের জন্য সময় নেওয়া হলো। ঋণের ক্ষেত্রে জামানতের মতো [সামান্য] এ জাতীয় অজ্ঞতা সহনীয়। মূল চুক্তির মধ্যে এ জাতীয় অজ্ঞাত সময়ের শর্তারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিক্রয়চুক্তি অবৈধ শর্তের কারণে বাতিল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى قُدُومِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মূল্য পরিশোধের অজ্ঞাত সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে–

প্রথম মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছ থেকে পণ্য বিক্রয় করল একশ টাকায়। ক. ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি এই শর্তে ক্রয় করছি যে, মূল্য শোধ করব হাজী সাহেবান হজ থেকে ফিরে আসলে। অথবা খ. ফসল কাটার মৌসুমে কিংবা গ. ফসল মাড়ানির সময়ে [মূল্য পরিশোধ করব] অথবা ঘ. আঙ্গুর তোলার সময়ে অথবা ঙ. পশুর লোম ও পশম কাটার

মৌসুমে মূল্য পরিশোধ করব। উপরিউক্ত পাঁচটি অবস্থাতেই বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে। অবৈধতার কারণ উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করা। কেননা এগুলোর সুনিশ্চিত কোনো সময় নেই। রোদ-বৃষ্টি, খরা-বন্যা ও অন্যান্য কারণে কখনো এগুলোর মৌসুম অগ্রবর্তী হয়. আবার মৌসুম কখনো পিছিয়ে যায়। যেহেতু এগুলোর মৌসুম সুনিশ্চিত এবং নির্ধারিত নেই, তাই মূল্য পরিশোধের সময় অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। আর সময় বা মেয়াদ অস্পষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়, তাই এখানেও বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : যদি কেউ কারো ঋণ পরিশোধের জন্য উপরিউক্ত সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করে জামিন হয় তাহলে জামিন হওয়া বৈধ হবে। যেমন কেউ বলল, আমি তোমার ঋণের জামিন হলাম। আর আমি হাজী সাহেবান আগমনের সময় কিংবা ফসল ঘরে তোলার সময় উক্ত ঋণ শোধ করব, তাহলে তার উক্ত জামানত বা জামিনদারী বৈধ। কারণ জামানতের ক্ষেত্রে সামান্য অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা দোষের কিছু নয় এবং এতটুকু অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য। তবে বেশি রকমের অজ্ঞতা হলে জামানতও গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরোক্ত সময়গুলোকে মেয়াদ নির্ধারণ করার দ্বারা যতটুকু অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তা নিতান্তই সামান্য। এর প্রতিকার সম্ভব এবং তা আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে।

এগুলোর অজ্ঞতা যে সামান্য ও সহনীয় এর প্রমাণ এই যে, এ ব্যাপারে সাহাবীগণের মতপার্থক্য রয়েছে। সাহাবীদের একদল মনে করেন এতটুকু অজ্ঞতার পরও বিক্রয় বৈধ হবে। অন্য দল মনে করেন এতটুকু অজ্ঞতার কারণে বিক্রয় অবৈধ হবে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) মনে করেন, এতটুকু অজ্ঞতা বিক্রয়চুক্তির জন্য প্রতিবন্ধক নয় এবং এতটুকু অজ্ঞতার পরও বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর এ জন্যই তিনি بَيْعٌ إِلَى الْعَطَاءِ [এর আলোচনা গত হয়েছে]-কে বৈধ মনে করেন। عَطَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক ভাতা। এ ভাতা প্রতি বছর নিশ্চিতভাবে পাওয়া যেত, তবে সময়ের হেরফের হতো। যেমনটা হাজীদের আগমন, ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, আঙ্গুর তোলা ও পশুর লোম ও পশম কাটা প্রতিবছর নিশ্চিতভাবে হয়েই থাকে। তবে সময় আগ-পিছ হয়। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) بَيْعٌ إِلَى الْعَطَاءِ কে বৈধ মনে করতেন না। অর্থাৎ তার মতে সামান্য অজ্ঞতাও বিক্রয়চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এর কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। মোটকথা, এসব অজ্ঞতার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি অবৈধ হবে, না বৈধ হবে, এ নিয়ে সাহাবীগণের মতপার্থক্য দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয় যে, এ অজ্ঞতা সামান্য ও সাধারণ পর্যায়ের। সামান্য না হলে বৈধতার পক্ষে কেউই অভিমত ব্যক্ত করতেন না। সুতরাং যখন সাহাবীগণের মত পার্থক্য দ্বারা বিষয়টি হালকা ও সাধারণ হয়ে গেল তখন সংশ্লিষ্ট অজ্ঞতাকে সামান্য বলে অভিহিত করাই সমীচীন। কেউ কেউ অবশ্য সামান্য ও বড় অজ্ঞতার পরিচয় এভাবে দিয়েছেন যে, ক. সামান্য অজ্ঞতা হলো এমন বিষয়ে যার বাস্তবতা নিশ্চিত, কিন্তু সন্দেহ শুধুমাত্র অগ্রবর্তী ও পশ্চাদবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে। খ. বড় ও মারাত্মক অজ্ঞতা হলো এমন বিষয়, যার বাস্তবতা ও সংঘটিত হওয়া অনিশ্চিত এবং এর সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ বিদ্যমান।

লেখক উপরোক্ত বিষয়গুলোর অজ্ঞতা সামান্য হওয়ার দ্বিতীয় দলিল দিচ্ছেন এই বলে যে, এ সব বিষয়ের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। অর্থাৎ বছরের মধ্যে এ কাজগুলো যে সংঘটিত হবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হাজীগণ নিশ্চিতভাবে বছরের মধ্যেই আসবেন। ফসল কাটা, ফল পাড়া, ফসল মাড়ান ও পশুদের শরীর থেকে লোম ও পশম কাটাও বছরের মধ্যেই হবে নিশ্চিতভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে মূলকাজের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ কেবল সময় নির্ধারণে, সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, মূল কাজ সন্দেহমুক্ত, সন্দেহ হচ্ছে গুণসংক্রান্ত তথা মেয়াদ সংক্রান্ত। অতএব এ অজ্ঞতা সাধারণ অজ্ঞতাই বিবেচিত হবে।

কাফালাহ শব্দের অর্থ জামিন হওয়া, দায়িত্ব নেওয়া ও জিম্মাদার হওয়া ইত্যাদি। কাফালাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে কাফালাহ তথা জামিন হওয়ার প্রসঙ্গটি এভাবে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি কারো ঋণ ইত্যাদির জামিন হয় আর সেই ঋণ শোধ করার মেয়াদ নির্ধারিত করে ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, হাজীদের আগমনের সময় ও ফল পাড়ার মৌসুম ইত্যাদিকে, তাহলে তার জামিন হওয়া বৈধ হবে। কারণ, জামানতের ক্ষেত্রে সামান্য অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য ও সহনীয়। সুতরাং বিক্রয়চুক্তির সাথে জামানতের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। লেখক এই পার্থক্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে জামানতের প্রসঙ্গটি এখানে টেনে এনেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে যে, জামানতের মধ্যে সামান্য অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় কেন?

এর প্রথম উত্তর তো এই যে, জামানত হলো একটা স্বেচ্ছাকার্যক্রম ও একজনের অনুগ্রহণ প্রদর্শন। আর এ জাতীয় স্বেচ্ছাকার্যক্রমে উদারতা অবশ্যই লক্ষ্যণীয়। তাই এতে সাধারণ অজ্ঞতা এমন দূষণীয় নয়, যার দ্বারা জামানতই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত জামানত প্রাথমিক অবস্থায় মান্নত সদৃশ। মান্নতের মধ্যে অপরিহার্য নয় এমন কাজকে নিজের উপর অপরিহার্য করা হয়। (اِيْجَابُ مَالَمْ يَكُنْ وَاجِبًا) একইভাবে জামানতের মধ্যে জামিনদারের উপর যে ঋণ আবশ্যক নয় তা তার জামিন হওয়ার কারণে তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। এটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায়। কিন্তু জামানত চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয় সদৃশ। অর্থাৎ বিক্রয়ের মতো বিনিময়চুক্তি। কেননা, জামিনদার পাওনাদারকে তার পাওনা ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার পর যার পক্ষে জামিন হয়েছিল তার থেকে সেই পরিমাণ পাওনা আদায় করে। সুতরাং পরিণাম বিচারে এটা বিনিময় চুক্তি হলো। নিয়মানুযায়ী মান্নতের মধ্যে সাধারণ অজ্ঞতা ও বড় অজ্ঞতা উভয়ই গ্রহণযোগ্য। উপরোক্ত মেয়াদগুলো উল্লেখ করলেও মান্নত হবে, আবার কোনো মেয়াদ উল্লেখ না করলেও মান্নত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রয়চুক্তিতে সাধারণ ও বড় কোনো ধরনের অজ্ঞতাই গ্রহণযোগ্য নয়। ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কাফালাহ বা জামানত মান্নত ও বিক্রয় উভয়ের সাথে [প্রাথমিক ও চূড়ান্ত বিচারে] সামঞ্জস্য রাখে। উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, জামানত সামান্য অজ্ঞতা ধারণ করে [যেমন মান্নত অজ্ঞতা ধারণ করে] এবং বেশি রকমের অজ্ঞতা ধারণ করে না [যেমন বিক্রয় অজ্ঞতা ধারণ করে না] এককথায় বলা যায়, উভয়ের মাঝে এভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যে, সামান্য অজ্ঞতার ক্ষেত্রে মান্নতের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা হয়েছে। আর চরম অজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা হয়েছে।

লেখক দাবি করেন জামানতের মধ্যে ঋণের মূল পরিমাণ অজ্ঞাত থাকলেও জামানত শুদ্ধ হয়। যেমন, এভাবে কেউ জামিন হলো যে, অমুকের যত ঋণ আছে সবই প্রদানের আমি জামিন হলাম। তিনি বলতে চান যে, জামানতের মধ্যে যেহেতু মৌলিক বিষয়ের অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য সেহেতু গুণসংক্রান্ত অজ্ঞতা তো আরো উত্তম ও নিশ্চিতভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং আলোচ্য মেয়াদগুলোতে সুনিশ্চিতভাবেই কাফালত তথা জামানত গ্রহণযোগ্য হবে।

কিন্তু বিক্রয়চুক্তি সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। বিক্রয়চুক্তিতে যদি মূল্য অজ্ঞাত থাকে তাহলে বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয় না। সুতরাং গুণসংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থাৎ মূল্য আদায়ের মেয়াদের অজ্ঞতাও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ গুণ মূলের অনুবর্তী হয়, মূলের ক্ষেত্রে যা ঘটে অনুবর্তীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয় না। যদি তা হয় তাহলে মূলের সাথে অনুবর্তীর বিরোধিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়। অনুবর্তী তার মূলের বিরোধী হতে পারে না। তাই বিক্রয়ে মেয়াদগত অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখানে একটি আপত্তি হতে পারে যে, মূল হচ্ছে শক্তিশালী, আর গুণ হচ্ছে দুর্বল, তাই মূলের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হলে যে গুণের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হবে এমন নয়।

এর উত্তর এই যে, মূল এবং অনুবর্তী [গুণ]-এর মাঝে যদি ইল্লত এক থাকে তাহলে তাদের হুকুমও এক হবে। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় মূলের অজ্ঞতা অগ্রাহ্য হওয়ার ইল্লত হলো বিবাদের আশঙ্কা। অর্থাৎ বিবাদের আশঙ্কার কারণে অজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সেই ইল্লত তো গুণ তথা মেয়াদের অজ্ঞতার মধ্যেও বিদ্যমান। সুতরাং মেয়াদের অজ্ঞতাও অগ্রাহ্য হবে। কারণ, ইল্লতের ঐক্য হুকুমের ঐক্যকে আবশ্যক করে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مُطْلَقًا الخ : লেখক এখানে একটা ব্যতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। যেমন কেউ নিঃশর্তভাবে কোনো কিছু বিক্রি করল। অর্থাৎ মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো মেয়াদের উল্লেখ করল না। চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের [ফসল কাটা, হাজীদের আগমন, মাড়ানি ইত্যাদির] যে কোনো একটিকে মেয়াদ নির্ধারণ করল তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এমন করা অবশ্যই বৈধ। কেননা, মূল্য এখন ক্রেতার জন্য অন্যান্য ঋণের মতো একটা ঋণ। আর ঋণ আদায়ের জন্য অজ্ঞাত মেয়াদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই [যেমন ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে]। হ্যাঁ, তবে যদি এ শর্তটি মূল চুক্তির মধ্যে করা হতো তাহলে চুক্তি অবৈধ হতো। এখানে তো মূল চুক্তি সম্পন্ন করার পর মেয়াদ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা মূল্য পরিশোধের জন্য অজ্ঞাত মেয়াদ যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে নির্ধারণ করা হয় তাহলে বিক্রয় ফাসিদ হবে। আর যদি তা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর করা হয় তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

وَلَوْ بَاعَ إِلَى هٰذِهِ الْآجَالِ، ثُمَّ تَرَاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْلَ قُدُوْمِ الْحَاجِّ جَازَ الْبَيْعُ أَيْضًا، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) : لَا يَجُوْزُ لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا، وَصَارَ كَإِسْقَاطِ الْأَجَلِ فِي النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ، وَلَنَا أَنَّ الْفَسَادَ لِلْمُنَازَعَةِ، وَقَدِ ارْتَفَعَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ، وَهٰذِهِ الْجَهَالَةُ فِيْ شَرْطٍ زَائِدٍ، لَا فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ، فَيُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، ثُمَّ أَسْقَطَا الدِّرْهَمَ الزَّائِدَ لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَهُوَ عَقْدٌ غَيْرُ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ : "ثُمَّ تَرَاضَيَا" خَرَجَ وِفَاقًا، لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْأَجَلُ يَسْتَبِدُّ بِإِسْقَاطِهِ، لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهِ ـ

অনুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত সময়গুলোকে [মূল্য পরিশোধের] মেয়াদ নির্ধারণ করে বিক্রয় করে, তারপর লোকজন ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি শুরু করার পূর্বেই এবং হাজীদের আগমনের পূর্বেই তারা [ক্রেতা-বিক্রেতা] উভয়েই যদি মেয়াদ রহিত করতে সম্মত হয় তাহলেও বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, বৈধ হবে না। কেননা, এ বিক্রয় ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছে, তাই তা বৈধরূপে রূপান্তরিত হবে না। এবং এটা যেন সাময়িক বিবাহের সময়কে রহিত করে দেওয়ার মতো। আমাদের দলিল এই যে, [বিক্রয়ে অনির্দিষ্ট মেয়াদের] অবৈধতা ছিল বিবাদাশঙ্কার কারণে, অথচ সেই বিবাদ স্থিত হওয়ার আগেই অপসৃত হয়ে গেছে। তা ছাড়া এই অজ্ঞতা মূল চুক্তিতে তো নয়; বরং অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে। সুতরাং এটাকে পরিহার করা সম্ভব। এর ব্যতিক্রম হলো যদি কেউ এক দিরহামকে দু'দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর অতিরিক্ত দিরহামকে বাদ দিল [তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না]। কেননা, এখানে ফাসাদ মূল চুক্তিতেই। এবং সাময়িক বিবাহ এর থেকে ভিন্ন। কারণ, সাময়িক বিবাহ হচ্ছে মুতা। মুতা চুক্তি আর বিবাহ চুক্তি এক নয়, [লেখক বলেন] মূল কিতাবে ইমাম কুদূরীর বাক্য ثُمَّ تَرَاضَيَا প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। কেননা, যার অনুকূলে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তা বাতিল করার অধিকারও একমাত্র তাঁর। কেননা, এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ إِلَى هٰذِهِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটি এর পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, যদি কেউ হাজীদের আগমনের সময়, ফসল কাটা, ফসল মাড়ানি, ফল পাড়া, ও পশুর পশম কাটার মৌসুম ইত্যাদিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে কোনো কিছু কিনে তাহলে তার বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই ফাসিদ চুক্তির পর মেয়াদ আসার আগেই যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মেয়াদ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে সম্মত ও একমত হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি বৈধ ও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়টি বৈধ হবে না; বরং পূর্বাবস্থায় ফাসিদ রূপে বহাল থাকবে। তার দলিল এই যে, যে চুক্তি একবার অবৈধ বিবেচিত হয় বা ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়, তা আর কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়টি যেহেতু ফাসিদ শর্তের কারণে অবৈধ হয়েছিল তাই এটা আবার বৈধ রূপান্তরিত হবে না। যদিও অবৈধ শর্তটিকে প্রত্যাহার করা হয়। যেমন [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও] যদি কেউ স্বল্প সময়ের জন্য

বিবাহ করে, অতঃপর সময়কে প্রত্যাহার করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সেই বিবাহ বৈধরূপ লাভ করে না। এমনিভাবে যদি সাক্ষীবিহীন বিবাহ করে পরে সাক্ষী করা হয় তাহলেও বিবাহ বৈধ হয় না। কেননা বিবাহটি ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈধরূপ লাভ করে না। তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রি করল। এ জাতীয় বিক্রয় সর্বসম্মতভাবে অবৈধ। তারপর অতিরিক্ত দিরহামটি বাদ দিয়ে বিক্রয়কে বৈধ করার চেষ্টা করা হলেও বিক্রয়টি পুনরায় বৈধ হবে না। এমনিভাবে আলোচ্য মাসআলায় মেয়াদ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে যখন বিক্রয় অবৈধ ও ফাসিদ হয়েছে তা আবার অজ্ঞাত মেয়াদকে বাদ দিলেও তা শুদ্ধতায় রূপান্তরিত হবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে, ইমাম যুফার (র.) তার বক্তব্যকে আরো তিনটি মাসআলার সাহায্যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সুদৃঢ় করেছেন।

আমাদের দলিল হলো, মেয়াদ ও সময় অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় অবৈধ হয়, আর অজ্ঞাত-অনির্দিষ্ট মেয়াদের কারণেই ক্রেতা ও বিক্রেতার বিবাদ ও ঝগড়া সৃষ্টি হয়। আসলে বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো বিবাদের আশঙ্কা। সুতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা অজ্ঞাত মেয়াদটি যখন প্রত্যাহার করবে, তখন বিক্রয় অবৈধ ও ফাসিদকারী বিষয়টি অপসৃত হয়ে যাবে। অথচ ফাসিদকারী বিষয়টি স্থিত হতে পারেনি। অর্থাৎ ফাসাদ স্থিত হওয়ার আগেই রহিত হয়ে গেছে। ফাসাদকারী দূর হওয়াতে বিক্রয় অবৈধ থাকার কোনো মানে হয় না। তাই বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে আরোপিত প্রশ্নটি ছিল যখন চুক্তিতে প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞতা ও অবৈধতা স্থান করে নিল তখন পরবর্তীতে তাকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো উপকার হবে না। যেমন অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে তা হয় না, যেমন : কেউ যদি এক দিরহামের বিনিময়ে দু'দিরহাম বিক্রি করে তাহলে বিক্রয়টি ফাসিদ হয়ে যায়। পরে অতিরিক্ত দিরহাম বাদ দিলেও চুক্তিটি বৈধতা পায় না, এ জাতীয় কমপক্ষে আরো দু'টি উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এ দিরহামের বিক্রয়ে যেমন পরবর্তী কোনো প্রচেষ্টা বিক্রয়টির বৈধতা প্রদান করতে পারে না, তেমনি আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি অবৈধ হওয়ার পরে তা বৈধ হবে না।

এর জবাব হলো, বিক্রয়চুক্তিতে মেয়াদ অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অজ্ঞতার অবস্থান থাকে অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে। মূল বিক্রয় তথা পণ্য ও মূল্যে কোনো সমস্যা নেই। অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে অজ্ঞতা ও ফাসাদের অবস্থানের কারণে তা দূরীভূত করা সম্ভব এবং তা ফলদায়কও বটে। পক্ষান্তরে এক দিরহামকে দুদিরহামের বিনিময়ে বিক্রির মধ্যে যে ফাসাদ রয়েছে, তা মূল বিক্রয় তথা বিনিময়যোগ্য দুটি বস্তুর একটির মধ্যে রয়েছে। আর এ কারণে তা দূরীভূত করা সম্ভব নয়।

ইমাম যুফার (র.)-এর দ্বিতীয় কিয়াস ছিল মেয়াদী বিবাহ বা মুতা [বিবাহের] উপর। এর উত্তরে লেখক বলেন, বিক্রয়ের মধ্যে কোনো ফাসাদ ও অবৈধতা স্থিত হওয়ার আগে বিদূরীত হলে বিক্রয় শুদ্ধ ও বৈধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক ধরনের চুক্তি আমূলে পরিবর্তন হয়ে আরেকটি চুক্তি হতে পারে না কিছুতেই।

নির্দিষ্ট মেয়াদের বিবাহ কে মুতা বলা হয়। মুতা কোনো শরিয়ত অনুমোদিত চুক্তি নয়। শরিয়তে তাকে বিবাহ বলে স্বীকৃতি দেয় না, বরং একে ভিন্ন নামে [মুতা বলে] অবহিত করা হয়। সুতরাং মুতা পরিবর্তিত হয়ে বিবাহ হতে পারে না। পক্ষান্তরে অস্পষ্ট মেয়াদ যা অবৈধ হওয়ার কারণ ছিল তা বাতিল করার পূর্বে চুক্তিটি বিক্রয়চুক্তি ছিল, এবং অস্পষ্ট মেয়াদ দূর করার পরও সেটা বিক্রয়চুক্তিই থাকে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্বে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ ছিল এখন সেটা বৈধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মেয়াদ অজ্ঞতার বিক্রয়কে সাময়িক বিবাহের সাথে কিয়াস করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইমাম যুফার (র.) কিয়াস করেছিলেন সাক্ষী ব্যতীত সংঘটিত বিবাহের উপর যে, সেটা ফাসিদ হওয়ার পর সাক্ষী উপস্থিত করা হলেও যেমন বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তদ্রূপ এখানেও ফাসিদ হওয়ার পর পুনরায় বিক্রয় বৈধ হবে না, অথচ সাক্ষীবিহীন বিবাহের মধ্যে ফাসাদ মূল চুক্তির মধ্যে নয়। তার এ কিয়াসের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ মাসআলায় বিবাহ শুদ্ধ ও বৈধ না হওয়ার কারণ হলো বিবাহের শর্তের অনুপস্থিতি, বিবাহের শর্ত হচ্ছে সাক্ষী রাখা। শর্তের অনুপস্থিতির কারণে যে ফাসাদ হয় তা শক্তিশালী হয়। এটা মূল চুক্তির ফাসাদের পর্যায়ের, তা দূর করা সম্ভবও হয় না এবং ফলদায়কও হয় না। যেমন কেউ অজু ছাড়াই সালাত শুরু করল, তারপর সে অজু করে নিল এতে তার অজুবিহীন আদায় করা সালাত শুদ্ধ ও বৈধ হবে না। কেননা, তার সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত না পাওয়া যাওয়ায় তা ফাসিদ হয়েছে, তাই এটা বৈধ হবে না।

লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারত : ثُمَّ تَرَاضَيَا بِإِسْقَاطِ الْأَجَلِ প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, শর্তরূপে বলা হয়নি, অর্থাৎ অজ্ঞাত মেয়াদ প্রত্যাহার করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মত হওয়া শর্ত নয়। প্রকৃত পক্ষে যার অনুকূলে মেয়াদ নেওয়া হয়েছে সে একাই তা রহিত করতে পারে। কেননা, এ তার একান্ত ও নিজস্ব অধিকার। এতে অন্যপক্ষের মতামতের কোনোই প্রয়োজন নেই।

قَالَ : وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيْهِمَا، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ)، إِنْ سَمّٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا جَازَ فِي الْعَبْدِ وَالشَّاةِ الذَّكِيَّةِ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهٖ وَعَبْدِ غَيْرِهٖ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهٖ مِنَ الثَّمَنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) : فَسَدَ فِيْهِمَا، وَمَتْرُوْكُ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا كَالْمَيْتَةِ، وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ، لَهُ الْاِعْتِبَارُ بِالْفَصْلِ الْأَوَّلِ، إِذْ مَحَلِّيَّةُ الْبَيْعِ مُنْتَفِيَةٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّ، وَلَهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ، فَلَا يَتَعَدّٰى إِلَى الْقِنِّ، كَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَأُخْتِهٖ فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ مَجْهُوْلٌ، وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ أَصْلًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، وَالْبَيْعُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَكَانَ الْقَبُوْلُ فِي الْحُرِّ شَرْطًا لِلْبَيْعِ فِي الْعَبْدِ، وَهٰذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে একত্রে অথবা জবাইকৃত বকরি ও মৃত বকরিকে একত্রে বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রয় উভয়ের ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি প্রত্যেকটির জন্য পৃথক মূল্য উল্লেখ করে, তাহলে দাস ও জবাইকৃত বকরির মধ্যে বিক্রয় বৈধ হবে। আর যদি দাস ও মুদাব্বারকে একত্রে অথবা নিজ ক্রীতদাস ও অন্যের ক্রীতদাস একত্রে বিক্রি করে, তাহলে আমাদের তিন ইমামের মতে দাসের মধ্যে আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বৈধ হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়ের মধ্যেই বিক্রয় ফাসিদ হবে। যে পশুর জবাইয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা মৃত পশুর ন্যায়। মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদ মুদাব্বারের বিধানভুক্ত। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস। কেননা, বিক্রয়ের সম্পর্ক সমগ্র পণ্যের সাথে করার কারণে, তাতে বিক্রয়ের যোগ্যতা রহিত হয়ে গেছে। সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হলো, ফাসাদকারীর পরিমাণানুযায়ী ফাসাদ নির্ণীত হয়। সুতরাং ফাসাদ দাসের প্রতি সম্প্রসারিত হবে না। যেমন– কেউ কোনো অপরিচিতা নারী ও তার বোনকে একত্রে বিবাহ করল [তাহলে অপরিচিতার ক্ষেত্রে বিবাহ বৈধ এবং বোনের ক্ষেত্রে অবৈধ]। এর ব্যতিক্রম হবে যদি প্রত্যেকটির মূল্য উল্লেখ না করে। কেননা, মূল্য তখন অজ্ঞাত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আর এটাই দু মাসআলার মাঝে বিভাজন রেখা– স্বাধীন ব্যক্তি কোনোভাবেই বিক্রয়চুক্তির আওতায় আসতে পারে না। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয়, আর বিক্রয় হলো একটি মাত্র চুক্তি। সুতরাং তখন দাসের বিক্রি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হবে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়কে কবুল করা। আর এটা তো একটি ফাসিদ শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : কেউ স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাস একত্রে বিক্রি করল অথবা জবাইকৃত বকরি এবং মৃত বকরি একত্রে বিক্রি করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় বিক্রি বাতিল হবে। প্রত্যেকটির মূল্য পৃথকভাবে বর্ণনা করুক অথবা নাই করুক। উভয় অবস্থায় বিক্রি বাতিল। ইমাম মালিক (র.)-এর মতও তাই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তি এমনই। আর ইমাম আহমদ (র.) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সাহেবাইন (র.) বলেন, যদি বিক্রেতা তার বিক্রীত দুটি পণ্যের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করে। যেমন– এভাবে বলে, দাসের মূল্য পাঁচশত, আর স্বাধীন ব্যক্তির মূল্য পাঁচশত। একত্রে এক হাজার। তদ্রূপ যদি বলে জবাইকৃত বকরি ও মৃত বকরি একত্রে পাঁচশত টাকা। প্রত্যেকটির মূল্য আড়াইশ করে, তাহলে তার বিক্রয় প্রথম মাসআলায় ক্রীতদাসের মধ্যে, আর দ্বিতীয় মাসআলায় জবাইকৃত বকরির মধ্যে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত বকরির মধ্যে বৈধ হবে না। কারণ, এগুলো মালই নয়। আর যদি প্রত্যেকটির মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ না করে; বরং একত্রে মূল্য উল্লেখ করে, যেমন বলল, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস এক হাজার টাকায় বিক্রি করলাম, তাহলে উভয়ের বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এক কথায় সাহেবাইন মূল্য আলাদা করে বর্ণনা করার সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর আলাদা মূল্য বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সাথে একমত পোষণ করেন।

দ্বিতীয় মাসআলা : কেউ দাস ও মুদাব্বার একত্রে বিক্রি করল কিংবা নিজের দাস অন্যের দাস একত্রে বিক্রি করল, উভয় অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন সকলের মতেই মালিকানাধীন দাসটির মধ্যে তার মূল্য অনুপাতে বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। তবে মুদাব্বার ও অন্যের দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয় বৈধ হবে না। লেখক বলেন, যে জন্তুর জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা মৃত জন্তুর সমতুল্য। সুতরাং আল্লাহর নামে জবাইকৃত জন্তু এবং আল্লাহর নামে জবাইকৃত নয় এমন দুই জন্তু একত্রে যদি বিক্রি করে, তাহলে বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত হবে। যেমন– মৃত জন্তুর সাথে একত্রে বিক্রি করলে বাতিল হয়।

ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়াতে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রশ্ন উল্লেখ করে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি এমন জন্তু খাওয়ার উপযুক্ত কিনা? এটি একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলা। হানাফী মাযহাবে এমন জন্তু খাওয়ার অযোগ্য। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীদের মতে তা খাওয়ার যোগ্য। ইমামগণের মতবিরোধের কারণে মাসআলাটির অবৈধতার মাত্রা হালকা হয়ে গেছে। তাই এর হুকুম মুদাব্বারের ন্যায় হওয়া উচিত। গোলামের সাথে মুদাব্বার বিক্রি করলে গোলামের বিক্রয় যেমন বৈধ হয়, তেমনি বিশুদ্ধভাবে জবাইকৃত জন্তুর সাথে আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া জবাইকৃত জন্তুর বিক্রি বৈধ হওয়া উচিত। প্রশ্নটির উত্তর হলো, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম ছাড়া জবাইকৃত জন্তুটির খাওয়ার বিষয় মূলত মতপার্থক্যপূণ্য মাসআলা নয়; বরং এরূপ জন্তুর হালাল হওয়ার অভিমত পোষণ করা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের লঙ্ঘন।

আয়াতটি এই– وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ 'তোমরা যাতে [ইচ্ছাকৃতভাবে] আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খেয়ো না।' –[সূরা আনআম]

তাই যারা এ অভিমত পোষণ করে তাদের মতবিরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই যদি বিচারক ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম ছেড়ে দেওয়া জন্তুর হালাল হওয়ার রায় দেন সে রায় কার্যকর হবে না। সুতরাং এটা মুদাব্বারের সমতুল্য হবে না; বরং এটা মৃত জন্তুর সমতুল্য।

লেখক বলেন, মুকাতাব ও উম্মে ওলাদ মুদাব্বারের ন্যায়। সুতরাং মুকাতাব ও উম্মে ওলাদকে যদি দাসের সাথে একত্রে বিক্রি করা হয়, তাহলে দাসের বিক্রি তার আনুপাতিক মূল্যে বৈধ হবে। কিন্তু মুকাতাব ও উম্মে ওলাদের বিক্রি সহীহ হবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, মুদাব্বার ও দাস এবং নিজ দাস ও অন্যের দাস একত্রে বিক্রি করা বৈধ নয়। উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি ফাসিদ।

ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল : ইমাম যুফার (র.) দ্বিতীয় মাসআলাকে প্রথম মাসআলার উপর কিয়াস করেন। তিনি বলেন, প্রথম মাসআলায় স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের সাথে মিলানোর কারণে যেমন উভয়ের বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে, তেমনি মুদাব্বারকে দাসের সাথে একত্রিত করার কারণে উভয়ের বিক্রি ফাসিদ হবে। উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য হলো, স্বাধীন ব্যক্তি যেমন বিক্রয়ের পাত্র নয়, তেমনি মুদাব্বার এবং অন্যের গোলামও বিক্রয়ের পাত্র নয়। সুতরাং বিক্রয়ের পাত্র না হওয়ার কারণে যদি প্রথম মাসআলায় সম্পূর্ণ বিক্রয় ফাসিদ হয়ে থাকে, তাহলে এখানেও তাই হবে। কেননা, ইল্লত এক হলে হুকুমও এক হয়। তিনি আরো বলেন, এখানে বিক্রয়ের নিসবত করা হয়েছে উভয়ের দিকে। উভয়ে মিলে একটা সত্তা হয়েছে। যে সত্তার পুরোটা মাল নয়; বরং একাংশ মাল। যেহেতু বিক্রির সম্পর্ক সমগ্রের সাথে, আর সমগ্র বা উভয়ের সম্মিলিত অংশ মাল নয়, তাই বিক্রি বৈধ হবে না।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল : ফাসাদ সৃষ্টিকারীর পরিমাণানুযায়ী ফাসাদ সংঘটিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেখানে ফাসাদ সৃষ্টিকারী থাকবে সেখানেই ফাসাদ বিস্তৃত হবে। যেখানে ফাসাদ সৃষ্টিকারী নেই সেখানে ফাসাদও ছড়াবে না। স্বাধীন ও মৃতের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টিকারী রয়েছে। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত আদৌ মাল নয়। আর মাল না হওয়ার কারণে বিক্রয়ের পাত্রও নয়। কারণ, বিক্রয়ের পাত্র বা বিক্রয়যোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো মাল হওয়া। যেহেতু ফাসাদ শুধুমাত্র স্বাধীন ও মৃতের মধ্যেই রয়েছে তাই এ দুয়ের মধ্যেই কেবল বিক্রয় ফাসিদ হবে, গোলাম ও জবাইকৃত বকরির মাঝে উক্ত ফাসাদ সম্প্রসারিত হবে না। তাই একত্রে বিক্রি করা অবস্থায় দাস ও মুদাব্বারের মধ্যে শুধুমাত্র মুদাব্বারের বিক্রয় ফাসাদ হয়। দাসের মধ্যে ফাসাদ বিস্তৃত হয় না। তাঁরা এর সমর্থনে একটি মাসআলা পেশ করেন যে, যদি কেউ কোনো অপরিচিতা নারী এবং নিজ বোনকে একত্রে বিবাহ করে, তাহলে বোনের বিবাহ ফাসিদ হয়, কিন্তু অপরিচিতা নারীর সাথে তার বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। এ মাসআলাতে বোনের বিবাহের ফাসাদ অপরিচিতা নারীর প্রতি বিস্তৃত হয়নি, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক তাই। তবে যদি কেউ স্বাধীন ব্যক্তি ও দাসকে একত্রে বিক্রি করে এবং প্রত্যেকের মূল্য আলাদাভাবে উল্লেখ না করে, তাহলে বিক্রয় উভয়ের ক্ষেত্রে ফাসিদ হবে। কেননা, এ অবস্থায় দাসের মূল্য অজ্ঞাত। আর মূল্যের অজ্ঞতা বিক্রয়চুক্তিকে ফাসিদ করে দেয়। তাই এখানে দাসের ক্ষেত্রেও বিক্রয় ফাসিদ হবে। পক্ষান্তরে যখন উভয়ের মূল্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে, তখন মূল্য সংক্রান্ত অজ্ঞতা থাকবে না বিধায় বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিলটি প্রথম মাসআলা ও দ্বিতীয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশক। আর তা হলো, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তু কোনোক্রমেই মাল নয়। তাই এরা বিক্রয়ের পাত্র হতে পারে না। কেননা, মাল নয় এমন বস্তু বিক্রয়চুক্তির অধীন হয় না। স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের বিক্রি এক চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে। এমনিভাবে মৃত বকরি ও জবাইকৃত বকরির বিক্রি একই চুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। একই চুক্তির মাধ্যমেই যে হয়েছে এর দলিল হলো, ক্রেতা যদি শুধুমাত্র ক্রীতদাস ও জবাইকৃত জন্তুর মধ্যে বিক্রয় কবুল করে, আর স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তুর মধ্যে বিক্রয় কবুল না করতে চায়, তাহলে তা পারবে না; বরং ক্রেতা রাজি হলে উভয়ের মধ্যে রাজি হতে হবে, আর যদি বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করে তাহলে উভয়ের ব্যাপারে বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, মৃত জন্তু ও জবাইকৃত জন্তুর বিক্রয় এক চুক্তির অধীন, আর ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে যে, স্বাধীন ব্যক্তি ও মৃত জন্তু মাল না হওয়ার কারণে বিক্রেয় বস্তু নয়। সুতরাং একই চুক্তির মধ্যে দাস [বিক্রয়যোগ্য] এবং স্বাধীন ব্যক্তি [অবিক্রয়যোগ্য] একই সাথে জমা হয়েছে, ফলে ব্যাপারটা এমন হলো যে, বিক্রেতা যেন দাসের মধ্যে বিক্রয় গ্রহণ করার জন্য বিক্রয়যোগ্য নয় অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রয় কবুল করার শর্ত করল। যেন সে বলল, দাস নিতে হলে তোমাকে স্বাধীন ব্যক্তিটিও নিতে হবে। আর এ শর্তটি একটি অন্যায় ও ফাসিদ

শর্ত। ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। এ কারণে দাসের মধ্যেও বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিলের ব্যাপারে দুটি আপত্তি করা হয়–

প্রথম আপত্তি : যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তো একটি চুক্তি হয় না; বরং দুটো পৃথক ও আলাদা চুক্তি হয়। আর যদি পৃথক চুক্তি হয়, তাহলে দাসের মধ্যে বিক্রয় গ্রহণযোগ্যতার জন্য স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করতে হবে এমন কোনো শর্ত করা হলো না। কেননা, তখনই এরূপ শর্তারোপ করা হয়েছে, যখন একটি মাত্র চুক্তি হয়। যখন দুটি ভিন্ন চুক্তি হলো তখন একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক রইল না।

দ্বিতীয় আপত্তি : কোনো শর্ত ফাসিদ হওয়ার জন্য এটাও একটা শর্ত যে, এতে ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো এক পক্ষের স্বার্থ থাকতে হবে। অথবা ন্যূনতম বিক্রীত-বস্তুর স্বার্থ থাকতে হবে। বলা বাহুল্য উল্লিখিত শর্ত তথা স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করার শর্তে কোনো এক পক্ষের স্বার্থ নেই। এমনকি এতে বিক্রীত ব্যক্তিরও কোনো উপকারিতা নেই। যেহেতু এতে কারো স্বার্থ নেই, তাই এটা ফাসিদ শর্ত সাব্যস্ত হবে না।

প্রথম আপত্তির উত্তর : স্বাধীন ও দাস উভয়ের মূল্য পৃথকভাবে করা সত্ত্বেও চুক্তি একটিই হয়েছে। কেননা, এখানে "বিক্রয়" ও "ক্রয়" কোনোটিই একাধিকবার উল্লেখ করা হয়নি। যে পর্যন্ত "বিক্রয়" ও "ক্রয়" বাচক শব্দ একাধিকবার উল্লিখিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় একটিই হবে– একাধিক হবে না।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর : স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করার শর্তের মধ্যে বিক্রেতার সুবিধা রয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতার লাভ এভাবে যে, স্বাধীন ও ক্রীতদাস একসাথে এক হাজার টাকার বিক্রি করা হচ্ছে। স্বাধীন ব্যক্তি মাল নয় সুতরাং তার অনুকূলে মূল্যও আসবে না। ক্রীতদাসের একক মূল্যও এক হাজার হবে না। বিষয়টি যেন এমন হলো যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলছে, আমি এই দাস পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছি এই শর্তে যে, তুমি আরও পাঁচশ টাকা আমাকে অতিরিক্ত প্রদান করবে। এমতাবস্থায় বিক্রেতা বিনিময় ছাড়াই পাঁচশ টাকা লাভ করল, আর এটাই হলো সুদ। সুতরাং স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে একটি ফাসিদ শর্ত। বিক্রয়ে ফাসিদ শর্তের উপস্থিতির কারণে বিক্রয়টি বাতিল সাব্যস্ত হবে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দাস ও স্বাধীন ব্যক্তিকে একটি চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করার কারণে সেটা প্রাথমিক স্তরেই আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় হলো। অর্থাৎ শুরুতে মূল্য উভয়ের জন্য ভাগ করতে হবে। আর প্রাথমিক স্তরে বা শুরুতে আনুপাতিক মূল্যে বিক্রি করা ফাসিদ ও অবৈধ।

بِخِلَافِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ فِيْ هٰؤُلَاءِ مَوْقُوْفٌ، وَقَدْ دَخَلُوْا تَحْتَ الْعَقْدِ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ، وَلِهٰذَا يَنْعَقِدُ فِيْ عَبْدِ الْغَيْرِ بِإِجَازَتِهِ، وَفِي الْمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي الْمُدَبَّرِ بِقَضَاءِ الْقَاضِيْ، وَكَذَا فِيْ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) إِلَّا أَنَّ الْمَالِكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْمَبِيْعَ وَهٰؤُلَاءِ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ أَنْفُسَهُمْ رَدُّوا الْبَيْعَ، فَكَانَ هٰذَا إِشَارَةً إِلَى الْبَقَاءِ، كَمَا إِذَا اشْتَرٰى عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهٰذَا لَا يَكُوْنُ شَرْطًا لِلْقَبُوْلِ فِيْ غَيْرِ الْمَبِيْعِ، وَلَا بَيْعًا بِالْحِصَّةِ اِبْتِدَاءً، وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ فِيْهِ۔

অনুবাদ : বিবাহের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, বিবাহ ফাসিদ শর্তের কারণে বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে অন্যের দাস, মুদাব্বার, মুকাতাব ও উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি মুলতবি থাকে। আর এগুলো মাল হওয়ার যোগ্যতা থাকার কারণে বিক্রয়চুক্তির আওতাভুক্ত হয়। আর এ কারণেই অন্যের দাসের ক্ষেত্রে তার অনুমতি সাপেক্ষে বিক্রয় কার্যকর হয়। মুকাতাবের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী তার সম্মতিক্রমে বিক্রয় কার্যকর হয়। মুদাব্বারের ক্ষেত্রে বিচারকের রায়ে বিক্রয় শুদ্ধ হয়। এমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রেও বিক্রয় কার্যকর হয়। তবে বিক্রীত দাসের উপর মালিকের অধিকার থাকার কারণে এবং মুদাব্বার সহ অন্যদের নিজ সত্তার উপর অধিকার বলে তারা বিক্রয়চুক্তিকে নাকচ করে দেয়। তাদের এ বিক্রয় প্রত্যাখ্যান বিক্রয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। যেমন– কেউ দুটি গোলাম খরিদ করল, আর এদের একটি দখলে নেওয়ার পূর্বেই মরে গেল। আর এটা বিক্রীত-পণ্য নয় এমন কিছুতে বিক্রয় কবুল করার শর্ত হলো না এবং প্রথম থেকেই আনুপাতিক হারের বিক্রয় হলো না। আর এ কারণে প্রত্যেকটির মূল্য উল্লেখ করা শর্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ الخ : বলে সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সাহেবাইন (র.) এটাকে বিবাহের উপর কিয়াস করেছিলেন। উত্তরে লেখক বলেন, বিবাহের উপর কিয়াস করা যথার্থ নয়। কারণ, বিবাহে ফাসিদ শর্তারোপ করলেও বিবাহ ফাসিদ হয় না; বরং শর্তই বাতিল হয়ে যায়। বিক্রয়ের ব্যাপার তার থেকে ভিন্ন। কারণ, বিক্রয়ে ফাসিদ শর্ত করা হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং কিয়াস শুদ্ধ হয়নি। কারণ, কিয়াস করার অন্যতম শর্ত হলো مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه উভয়ের মান এক হতে হবে।

দ্বিতীয় মাসআলায় বলা হয়েছে– মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের ক্রীতদাস যুক্ত করে বিক্রি করা হলে দাসের ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে, আর এগুলোর ক্ষেত্রে বিক্রয় স্থগিত থাকবে।

আর দ্বিতীয়ত এগুলোসহ বিক্রি করা হলে এগুলো বিক্রয়ভুক্ত হবে। কারণ, এগুলোর মধ্যে মাল হওয়ার গুণ বিদ্যমান রয়েছে। মাল হওয়ার বিষয়টি দুটি বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয়– ১. দাসত্বের বিদ্যমানতা, ২. মূল্যমান থাকা। মুদাব্বার, মুকাতাব, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের দাসের মধ্যে দাসত্ব ও মূল্যমান উভয়ই রয়েছে। যেহেতু উভয় বিষয় এদের মধ্যে বিদ্যমান, তখন এদের মধ্যে মাল হওয়ার গুণও বিদ্যমান। মাল হওয়ার গুণ থাকার কারণে এগুলো বিক্রয়ের পাত্র হবে। তবে এগুলোর বিক্রি [পূর্বে যেমন বলা হয়েছে] স্থগিত ও মুলতবি থাকবে এবং বিক্রয়ের হুকুম তথা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এদের মধ্যে মুদাব্বারের বিক্রি বিচারকের রায়ের উপর মুলতবি থাকবে। মুকাতাবের বিক্রি তার অনুমতির উপর নির্ভরশীল। উম্মে ওয়ালাদের বিক্রি শায়খাইনের মতানুযায়ী বিচারকের রায় পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত এবং অন্যের দাসের বিক্রয় তার মালিকের সম্মতির উপর মুলতবি থাকবে। এ কারণেই মুদাব্বারের বিক্রয় বিচারকের রায়ে কার্যকর হয়ে যায়, মুকাতাবের বিক্রয় তার অনুমতিক্রমে শুদ্ধ হয়ে

যায় এবং শায়খাইনের মতানুযায়ী উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয় বিচারকের রায়ে কার্যকর হয়ে যায়। এমনিভাবে অন্যের দাসের বিক্রয় তার মালিকের অনুমতিক্রমে শুদ্ধ হয়ে যায়।

উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিচারকের রায়েও উম্মে ওলাদের বিক্রয় কার্যকর হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবীদের মাঝেও মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন– হযরত ওমর (রা.) এ বিক্রয় কোনোক্রমেই বৈধ মনে করতেন না। পক্ষান্তরে হযরত আলী (র.) বৈধ মনে করতেন। অধিক সংখ্যক সাহাবী হযরত ওমর (রা.)-এর মত অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে তাবেয়ীদের যুগে হযরত ওমর (রা.)-এর মতের উপর ইজমা হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মনে করেন, তাবেয়ীদের ইজমা সাহাবীদের মতবিরোধকে অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। সুতরাং বিচারকের ফয়সালা এখন ইজমার বিপক্ষে যাবে, তাই বিচারকের রায় কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) মনে করেন, তাবেয়ীদের ইজমা এতটুকু শক্তি শক্তিশালী নয় যে, তার দ্বারা সাহাবীগণের কারো মতকে অগ্রাহ্য করা যাবে, তাই তাদের মতবিরোধ এখনও গ্রহণযোগ্য। আর মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাতে বিচারকের রায়ই সর্বশেষ কথা। তাই তারা বলেন, যদি বিচারক উম্মে ওয়ালাদের বিক্রয়ের অনুকূলে মত দেন, তাহলে তাই গ্রহণযোগ্য। তাদের এ মতপার্থক্য মূলত মূলনীতি সংক্রান্ত।

এখানে হিদায়া প্রণেতার ইবারতের উপর একটি আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, অধ্যায়ের শুরুভাগে তিনি বললেন, بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ بَاطِلٌ অথচ এখানে বললেন أَمَّا الْبَيْعُ فِيْ هٰؤُلَاءِ مَوْقُوْفٌ দু-স্থানে তার ইবারত দু-রকম হয়ে গেল। এর উত্তরে বলা হয় যে, এদের বিক্রয় তখনই বাতিল হবে যখন মুকাতাব সম্মতি না দেবে। তদ্রূপ উম্মে ওয়ালাদ ও মুদাব্বারের বিক্রয়ের অনুকূলে বিচারক রায় না দেবেন। তবে বিচারকের রায় ও মুকাতাবের সম্মতি ও অসম্মতির পূর্বে বিক্রয় মওকুফ থাকবে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّ الْمَالِكَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা হিদায়া প্রণেতা একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। আপত্তিটি হলো, যখন মুকাতাব, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও অন্যের দাস বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো মাল হওয়ার গুণের কারণে, তখন তো এদের বিক্রয় ফাসিদ না হওয়া সমীচীন ছিল, কিন্তু তা না হয়ে মওকুফ হলো কেন? এর উত্তর হলো, এগুলো বিক্রয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও তা ছিল অন্যের মতামত বা রায়ের উপর নির্ভরশীল। যাদের উপর নির্ভরশীল ছিল তারা তাদের ক্ষমতা বলে বিক্রয়কে বহাল যেমন রাখতে পারে, তেমনি তারা বিক্রয়কে বাতিলও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের ক্ষমতা বলে বিক্রয়কে বাতিল করেছে, তাই বিক্রয় ফাসিদ হয়েছে। অন্যদের ক্ষমতার বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো, অন্যের দাসের বেলায় দাসের উপর মালিকের অধিকার রয়েছে। আর মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ও মুকাতাবের নিজেদের স্বীয় সত্তার উপর অধিকার রয়েছে। তারা প্রত্যেকে আপন অধিকার বলে বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাদের বিক্রয় প্রত্যাখ্যান এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে, তাদের মধ্যে বিক্রয় সংঘটিত ছিল। ছিল বলেই তারা প্রত্যাখান করেছে। যখন তাদের মাঝে বিক্রয়ের ব্যাপারটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো, তখন এটাও প্রমাণিত হলো যে, তারা বিক্রয়ের পাত্র বটে। আর যে দাসের সাথে তাদের যুক্ত করে বিক্রি করা হয়েছিল তাতো নিঃসন্দেহে বিক্রয়ের পাত্র। সুতরাং উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কারণে বিক্রয়দ্রব্যের মধ্যে বিক্রয় কবুল করার জন্য বিক্রয়দ্রব্য নয় এমন জিনিসের বিক্রয় কবুল করার শর্ত করা হয়নি; বরং বিক্রয় নয় এমন কিছুই এখানে নেই। সুতরাং যখন এমন শর্ত করা হয়নি তখন দাসের মধ্যে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। অথচ প্রতিপক্ষ বিক্রয় অবৈধ হওয়ার মূল কারণ এটাকে বর্ণনা করেছিল।

অবৈধ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল ছিল প্রাথমিক অবস্থায় মূল্য ভাগ করা আবশ্যক হয়। এর উত্তর হলো, এখানে প্রাথমিক অবস্থায় মূল্য ভাগ করা আবশ্যক নয়। কারণ, যখন মুদাব্বার ও অন্যরা বিক্রয়ের অধীন হয়ে গেল, তখন চুক্তির শুরুতেই মূল্য ভাগ করা হয়নি; বরং এটা হবে তখন, যখন বিক্রয়ের পর কব্জা করার সময় হবে। আর একে প্রাথমিক অবস্থায় আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বলে না; বরং পরিণামগত আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয় বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিক্রয় অবৈধ নয়। আর এখানে দ্বিতীয় প্রকারের بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ [আনুপাতিক মূল্যে বিক্রয়] হয়েছে। তাই উপরের সবগুলো অবস্থাতেই ক্রীতদাসের বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এ কারণেই ক্রীতদাস ও মুদাব্বারের আলাদা মূল্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর উদাহরণ এরূপ যে, কেউ দুটি ক্রীতদাস বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা তার আয়ত্তে নেওয়ার আগেই একটি মরে গেল, তাহলে অপর দাসের বিক্রয় তার মূল্য অনুপাতে বৈধ হয়ে যাবে। কেননা, এতে বিক্রয়ের পাত্র নয় এমন দ্রব্যের কবুল করার কোনো অবৈধ শর্তও নেই, আবার এটা بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ ও নয়। আর এ দুটো বিষয় বিক্রয় ফাসিদ করে দেয়। মোটকথা, স্বাধীন ও ক্রীতদাস একত্রে বিক্রি করাতে বিক্রয়ের পাত্র নয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বিক্রয় কবুল করা আবশ্যক হয় এবং এতে প্রাথমিক অবস্থায় بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ আবশ্যক হয়, তাই এ অবস্থায় ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তি উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুদাব্বারকে ক্রীতদাসের সাথে যুক্ত করে একত্রে বিক্রি করলে بَيْعٌ بِالْحِصَّةِ আবশ্যক হয় না, তাই এ অবস্থায় ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হয়ে যায়।

فَصْلٌ فِىْ اَحْكَامِهٖ

وَاِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمَبِيْعَ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِاَمْرِ الْبَائِعِ، وَفِى الْعَقْدِ عِوَضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ، مَلَكَ الْمَبِيْعَ وَلَزِمَتْهُ قِيْمَتُهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح): لَا يَمْلِكُهُ وَاِنْ قَبَضَهُ، لِاَنَّهُ مَحْظُوْرٌ، فَلَا يُنَالُ بِهٖ نِعْمَةُ الْمِلْكِ، وَلِاَنَّ النَّهْىَ نَسْخٌ لِلْمَشْرُوْعِيَّةِ لِلتَّضَادِ، وَلِهٰذَا لَا يُفِيْدُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَصَارَ كَمَا اِذَا بَاعَ بِالْمَيْتَةِ اَوْ بَاعَ الْخَمْرَ بِالدَّرَاهِمِ، وَلَنَا اَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهٖ مُضَافًا اِلٰى مَحَلِّهٖ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهٖ، وَلَا خَفَاءَ فِى الْاَهْلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَّةِ، وَرُكْنُهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَفِيْهِ الْكَلَامُ، وَالنَّهْىُ يُقَرِّرُ الْمَشْرُوْعِيَّةَ عِنْدَنَا، لِاِقْتِضَائِهِ التَّصَوُّرَ، فَنَفْسُ الْبَيْعِ مَشْرُوْعٌ، وَبِهٖ تُنَالُ نِعْمَةُ الْمِلْكِ، وَاِنَّمَا الْمَحْظُوْرُ مَا يُجَاوِرُهُ، كَمَا فِى الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ ـ

অনুচ্ছেদ : ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম

অনুবাদ : যদি ক্রেতা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতিতে বিক্রীত-পণ্য কব্জা করে। আর বিক্রয়চুক্তিতে এমন দুটি বিনিময়-দ্রব্য থাকে, যার প্রতিটি মালরূপে বিবেচিত, তাহলে সে বিক্রীত-পণ্যটির মালিক হয়ে যাবে এবং তার উপর পণ্যের বাজারমূল্য [পরিশোধ করা] আবশ্যক হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হবে না; যদিও সে পণ্যটি কব্জা করে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ বিক্রি, তাই এর দ্বারা মালিকানার নিয়ামত লাভ করা যেতে পারে না। তাছাড়া এজন্য যে, এর নিষিদ্ধতা শরিয়তের অনুমোদনকে রহিতকারী। কেননা, নিষেধাজ্ঞা ও অনুমোদনের মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর এজন্যই তো দখলের পূর্বে তা মালিকানা সাব্যস্ত করে না। ফলে এটা মৃতের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো হলো, অথবা মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করার মতো হলো। আমাদের দলিল হলো, বিক্রয়ের রুকন [তথা প্রস্তাব ও গ্রহণ] তার যথাযোগ্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং তাকে যোগ্য স্থানেই প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা আবশ্যক। আর [বিক্রেতার বিক্রয় সম্পাদনের] যোগ্যতা ও বিক্রেয়পাত্র হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। বিক্রয়ের রুকন হলো মালের দ্বারা মালের বিনিময় করা। আর এটিই হলো মতপার্থক্যের বিষয়। আমাদের মতে নিষেধাজ্ঞা কোনো বিষয়ের শরিয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি সুসাব্যস্ত করে। কেননা, এ নিষেধাজ্ঞা নিষেধকৃত কাজটির সম্ভাব্যতাকে দাবি করে। সুতরাং মূল বিক্রয়কর্ম শরিয়তসম্মত। আর তা [বিক্রয়কর্ম] দ্বারাই মালিকানা লাভের নিয়ামত অর্জিত হয়। নিষিদ্ধ তো ঐ বিষয়, যা বিক্রয়চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন–জুমার নামাজের আজানের সময় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ فِىْ اَحْكَامِهٖ : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তারিত আলোচনার পর লেখক এ অনুচ্ছেদে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের اَحْكَامٌ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। اَحْكَامٌ শব্দটি حُكْمٌ -এর বহুবচন। কোনো বিষয়ের ফলাফলকে حُكْمٌ [হুকুম] বলা হয়। ফলাফল যেহেতু কর্মের পরে হয়, সেহেতু ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনার পর লেখক এর হুকুম বর্ণনা করেছেন। বিক্রয়ের

হুকুম হলো মালিকানা লাভ হওয়া। ফাসিদ বিক্রির দ্বারা মালিকানা লাভ হবে কিনা এ অনুচ্ছেদে তারই বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হানাফী মাযহাবে ফাসিদ ও বাতিল– বিক্রয়ের পৃথক দুটি প্রকার। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে ফাসিদ ও বাতিল একই জিনিস। এ দুয়ের মাঝে তাঁর মতে কোনো পার্থক্য নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِيْ الخ : যে মাসআলাটির কথা প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ক্রেতা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অনুমতি নিয়ে বিক্রেয়পণ্যটি কব্জা করে, আর উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের উভয় বিনিময়-দ্রব্য শরিয়তের দৃষ্টিতে মাল হয়, তাহলে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যাবে এবং তার উপর পণ্যের বাজারমূল্য (قِيْمَتْ) পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। তাদের উভয়ের মাঝে ধার্যকৃত (ثَمَنْ) মূল্য প্রদান আবশ্যক হবে না। উল্লেখ্য যে, উভয় বিনিময়-দ্রব্য মাল না হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে এবং এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। যেমন মৃত লাশ কিংবা রক্তের বিনিময়ে কোনো পণ্য বিক্রি করা। বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। কব্জা করার পূর্বে কিংবা পরে– কোনো অবস্থাতেই নয়।

প্রকাশ থাকে যে, মালিকানা লাভের বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বিক্রয়ে خِيَار شَرْط না থাকে। যদি 'খিয়ারে শর্ত' থাকে, তাহলে কব্জা করলেও এর দ্বারা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা, শুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়েই 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে এর দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ইবারতে বলা হয়েছে যে, ক্রেতার উপর বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক বা ওয়াজিব। এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিক্রীত-পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি পণ্যটি হাতে থাকে, তখন তার উপর ওয়াজিব পণ্যটি ফেরত দানের মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা।

সারকথা হলো, আমাদের মতে ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য কব্জা করলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য দখলে নিলেও এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে না। ইমাম মালিক এবং আহমদ (র.) -এর মতও এরূপই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল : ফাসিদ বিক্রয় একটি হারাম পদ্ধতি। অন্যদিকে মালিকানা লাভ করা একটা নিয়ামত। হারাম কাজ কোনো নিয়ামত লাভের মাধ্যম বা সবব হতে পারে না। سَبَبْ শব্দের অর্থ কার্যকারণ বা হেতু। সবব পাওয়া গেলে তার মুসাব্বাব পাওয়া যাবে। সেই সাথে সবব ও মুসাব্বাব উভয়ের মাঝে সম্পর্ক অবশ্যই থাকতে হবে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফাসিদ বিক্রয় বা হারাম কাজটি হলো সবব। আর মুসাব্বাব বা ফলাফল হলো মালিকানার নিয়ামত লাভ। অথচ এ দুয়ের মাঝে কোনোই সম্পর্ক নেই। এ কারণে ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানার নিয়ামত লাভ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দ্বিতীয় দলিল হলো, জাহিলিয়া যুগে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম সেগুলোর অবৈধতা ঘোষণা করে। শরিয়ত প্রবর্তকের নিষেধবাণী এর বৈধতাকে রহিত করে দিয়েছে। রহিত হওয়ার কারণ হলো, নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতা এ দুয়ের মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। কেননা, নিষেধাজ্ঞার দাবি হলো এটার নিকৃষ্টতা প্রমাণিত করা। পক্ষান্তরে বৈধতা বিষয়টির সৌন্দর্য ও উত্তম হওয়া প্রমাণ করে। উত্তম ও নিকৃষ্ট এ দুয়ের মাঝে খোলাখুলি বৈপরীত্য রয়েছে। ফলে এগুলোকে যা টেনে আনে তথা নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতার মাঝেও বৈপরীত্য রয়েছে। যখন উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য প্রমাণিত হয়ে গেল তখন এগুলো একই সময়ে একত্রিত হওয়ার অসম্ভাবতাও প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং কোনো বিষয় একই সাথে বৈধ ও নিষিদ্ধ হতে পারবে না। সুতরাং যখন কোনো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আসল তার সাথে সাথে সে বিষয়ের বৈধতা রহিত হয়ে গেল।

অতএব ফাসিদ বিক্রয়ের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। এজন্যই তো ফাসিদ বিক্রয় কব্জার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে না। কেননা, ফাসিদ বিক্রয় যদি শরিয়ত সমর্থিত হতো, তাহলে কব্জার পূর্বেই এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতো। কব্জার আগে মালিকানা অর্জিত না হওয়াটাই ফাসিদ বিক্রয়ের বৈধতা রহিত হওয়ার দলিল।

যে বিষয়ের অনুমোদন রহিত হয়ে যায় তা কোনো শরিয়তের হুকুমকে বাস্তবায়ন করতে পারে না। আর এ কারণে ফাসিদ বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। ফলে এটা এমন হয়ে গেল যে, কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য মৃত লাশের বিনিময়ে বিক্রি করল, অথবা সে মদকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করল। এ জাতীয় বিক্রয়ের ক্রেতা যদি পণ্য কব্জা করে, তবু আহনাফের মতে ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে না। সুতরাং যেভাবে এসব স্থানে বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হবে না, তেমনি আলোচ্য ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্য কব্জা করলেও এর মালিক হবে না।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইমাম শাফেয়ী (র.) كَمَا إِذَا بَاعَ بِالْمَيْتَةِ বলে ফাসিদ বিক্রয়কে বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, তাঁর মতে ফাসিদ ও বাতিলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই [যা আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি]।

আমাদের দলিল হলো, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় তথা যে ক্রয়-বিক্রয়ে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ [উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান] পাওয়া গেছে, কিন্তু বিক্রয়চুক্তিটি কোনো অবৈধ শর্তের কারণে ফাসিদ হয়েছে বিক্রয়ের রুকন তথা ইজাব ও কবুল এমন ব্যক্তিদ্বয় থেকে সংঘটিত হয়েছে, যারা এ কাজের যোগ্য [অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন] এবং বিক্রয়ের রুকন এমন পাত্রে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যা প্রকৃতই বিক্রয়দ্রব্য ও বিক্রয়যোগ্য মাল। সুতরাং যখন বিক্রয়ের রুকন যোগ্য লোক থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং বিক্রয়ের পণ্যও মাল হিসাবে গণ্য, তখন তো বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। যখন বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে তখন তার হুকুমও পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। আর বিক্রয়ের হুকুম হলো পণ্যের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

লেখক বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগ্যতার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, তেমনি বিক্রয়ের পাত্র তথা বিক্রেয়পণ্য মাল হওয়ার ব্যাপারেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। সব যোগ্যতা পাওয়া যাওয়ার পর যথানিয়মে বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ পরস্পরে সম্মতিক্রমে তারা মাল বিনিময় করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিক্রয়ের রুকন হচ্ছে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ [উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মাল বিনিময় করা]। আর বিনিময় সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুল দ্বারা। সুতরাং পরস্পর বিনিময়ের অর্থই হচ্ছে ইজাব ও কবুল করা। সুতরাং চূড়ান্ত বিচারে বিক্রয়ের রুকন হলো ইজাব ও কবুল। অতএব ইজাব-কবুল হওয়ার পর বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা থাকতে পারে না।

উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে উভয় বিনিময় মাল হয়ে থাকে। যদি কোনো একটি মাল না হয়, তাহলে বিক্রয়ের রুকন পাওয়া যাবে না বা মালের বিনিময়ে মাল হবে না। এর ফলশ্রুতিতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন- মদের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য কেনা হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়। আর বিক্রয়চুক্তি বাতিল হলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না। সারকথা, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ে 'মালের বিনিময়ে মাল' বিদ্যমান, বিক্রয়ের রুকন ইজাব ও কবুলযোগ্য লোক থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং বিক্রয়ের পাত্রও যথার্থ। সুতরাং ফাসিদ বিক্রয় সত্তাগতভাবে শুদ্ধ ও শরিয়তসম্মত। আর শরিয়তসম্মত যে কোনো বিক্রয়ের দ্বারা মালিকানা লাভ হবেই।

এখানে একটি আপত্তি হয় যে, ফাসিদ বিক্রয়ের ব্যাপারে যেহেতু শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই এটা কোনোভাবেই শরিয়তসম্মত হতে পারে না, আর শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ কোনো চুক্তি দ্বারা মালিকানা কিভাবে লাভ হবে?

এর জবাবে লেখক বলেন, وَالنَّهْيُ يُقَرِّرُ الْمَشْرُوْعِيَّةَ অর্থাৎ আমাদের মতে نَهْيٌ [নিষেধাজ্ঞা] দু প্রকার :

১. نَهْيٌ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়ত অনুমোদিত কাজে নিষেধবাণী। এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞা মূলত এমন কাজের ব্যাপারে হয়, যে কাজ শরিয়তে বৈধ, তবে এতে পারিপার্শ্বিক কারণে অবৈধতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে কাজটিতে পারিপার্শ্বিক কারণে নিষেধাজ্ঞা আসে তা আপন সত্তাগতভাবে বৈধ। তার সত্তাতে কোনো অবৈধতা নেই। তবে তার কোনো গুণ কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবৈধতা বিদ্যমান। আর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা গুণটির কারণেই সেটা অবৈধ। বিষয়টিকে আরবিতে এভাবে প্রকাশ করা যায় যে, حَسَنٌ لِذَاتِهِ وَقَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ। যেমন- জুমার আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। এ মাসআলাতে ক্রয়-বিক্রয় যদিও সত্তাগতভাবে সহীহ, কিন্তু আজানের সময়ে হওয়ার কারণে এটি মাকরূহ হয়ে গেছে।

২. نَهْيٌ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ : এরূপ কাজকে أَفْعَالِ حِسِّيَّة বলা হয়, যার অস্তিত্ব শরিয়ত প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এর পরিচয় শরিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন ব্যভিচার, মদ পান, মিথ্যা ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজ শরিয়ত আগমনের অনেক আগ থেকেই মানুষের জানা রয়েছে এবং শরিয়তের আগমনের কারণে এগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি। এ ধরনের কাজ সত্তাগতভাবে অবৈধ এবং মূল কাজটাই খারাপ ও নিকৃষ্ট।

আমাদের আলোচ্য মাসআলায় نَهْيٌ [নিষেধবাণী] হলো প্রথম প্রকারের, যা নিষেধকৃত কাজের অস্তিত্বকে দাবি করে। এ কারণে উক্ত নিষেধাজ্ঞা কাজের বৈধতা ও শরিয়ত অনুমোদিত হওয়াকে রহিত করে না; বরং বৈধতাকে নিশ্চিত ও পাকাপোক্ত করে। তাই এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, কাজটি বৈধ, তবে শর্ত ফাসিদ ও অবৈধ। সুতরাং ফাসিদ বিক্রয়ের অবস্থায় বিক্রয়চুক্তিটি বৈধ হবে এবং শর্তটি ফাসিদ হবে। আর মালিকানার নিয়ামত লাভ করার জন্য বিক্রয়ের সত্তাগত বৈধতাই যথেষ্ট। অতএব বিক্রয়ের সত্তার কারণে মালিকানা অর্জিত হবে। আর যখন মূল বিক্রয়ের কারণে মালিকানা লাভ হলো এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের পরিবর্তে মালিকানা লাভ হলো না [যেমনটা ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছিলেন] তখন আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْلَا يُؤَدِّيَ إِلَى تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الْمُجَاوِرِ، إِذْ هُوَ وَاجِبُ الرَّفْعِ بِالْاِسْتِرْدَادِ فَبِالْاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمُطَالَبَةِ أَوْلَى، وَلِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعُفَ لِمَكَانِ اِقْتِرَانِهِ بِالْقَبِيحِ، فَيُشْتَرَطُ اِعْتِضَادُهُ بِالْقَبْضِ فِي إِفَادَةِ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ، وَالْمَيْتَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ، فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ، وَلَوْ كَانَ الْخَمْرُ مُثْمَنًا فَقَدْ خَرَّجْنَاهُ، وَشَيْءٌ أُخَرُ وَهُوَ أَنَّ فِي الْخَمْرِ الْوَاجِبُ هُوَ الْقِيمَةُ، وَهِيَ تَصْلُحُ ثَمَنًا لَا مُثْمَنًا ـ

অনুবাদ : আর কজার পূর্বে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না এজন্য যে, যেন তা সংশ্লিষ্ট ফাসাদকে স্থিতির দিকে না নিয়ে যায়। কেননা, বিক্রীত-দ্রব্য ফেরত আনার মাধ্যমে উক্ত ফাসাদ বিদূরিত করা ওয়াজিব। সুতরাং ক্রেতার [বিক্রীত-দ্রব্য কব্জা করার] তাগাদা করা থেকে বিরত থাকা উত্তম। তা ছাড়া নিকৃষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে মালিকানার সবব ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সুতরাং মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে কব্জা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করার শর্ত করা হয়; হেবার অনুরূপ। মৃত লাশ তো মাল নয়। সুতরাং এতে বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত। আর মদ যদি বিক্রয়পণ্য হয়, তাহলে তো এর প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তাছাড়া আরেকটি বিষয় হলো, মদের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তো বাজারমূল্য আবশ্যক হয়। আর বাজারমূল্য তো ধার্যকৃত মূল্যের স্থলবর্তী হয়– বিক্রয়পণ্যের স্থলবর্তী হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারত দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফাসিদ বিক্রয়ের কব্জা পরবর্তী অবস্থাকে কব্জা পূর্ববর্তী অবস্থার উপর কিয়াস করেছিলেন। তিনি বলেন, কব্জা পূর্ববর্তী অবস্থায় যেমন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি কব্জা পরবর্তী অবস্থায় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এর উত্তরে লেখক বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর উক্ত কিয়াস সঠিক নয়। কেননা, ফাসিদ বিক্রয়ে যদি কব্জা করার পূর্বেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিক্রেতার উপর বিক্রয়পণ্য অর্পণ করা আবশ্যক হবে। আর ক্রেতার মূল্য প্রদান করা ও বিক্রেতার বিক্রয়পণ্য প্রদান করার দ্বারা বিক্রয়ের সাথে যুক্ত হওয়া ফাসাদ ও অবৈধতা সুদৃঢ় করা হবে। আর যে কোনো ধরনের ফাসাদকে সুদৃঢ় করা নাজায়েজ। অথচ শরিয়তে ফাসাদকে দূর করার নির্দেশ দিয়েছে। তা এভাবে যে, ক্রেতা যদি বিক্রেয়পণ্য কব্জা করে, তাহলে তার উপর বিক্রয়পণ্য ফেরত দিয়ে ফাসাদ দূর করা ওয়াজিব। যা দূর করা ওয়াজিব, তা সুদৃঢ় করা অবশ্যই অবৈধ ও নাজায়েজ। সুতরাং যখন ক্রেতার উপর দখলকৃত বিক্রয়পণ্যকে ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, তখন ক্রেতার পক্ষে বিক্রয়পণ্যকে অর্পণ করার দাবি থেকে বিরত থেকে ফাসাদকে দূর করা আরো স্বাভাবিকভাবে ওয়াজিব হবে। কেননা, ক্রেতার পক্ষে বিক্রয়পণ্য অর্পন করার দাবি থেকে বিরত থাকা বিক্রেয়পণ্য কব্জা করার পর তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে সহজ। মোটকথা, বিক্রয়ের মধ্যে সেই ফাসাদকে দূর করা আবশ্যক, সেই ফাসাদকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা অবৈধ ও নাজায়েজ। ফাসাদ সুদৃঢ় হয় কব্জার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা। আর এজন্যই আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে কব্জার পূর্বে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাছাড়া আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যদি কব্জার পূর্বেই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বিক্রেয়পণ্য ও মূল্য প্রদান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হবে। ফলে একই কাজে আদেশ ও নিষেধ তথা পরস্পর বিরোধী বিধান আসতে হয় যা অসম্ভব।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, কব্জা করার পর যদি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেও তো এ মালিকানা ফাসাদ ও অবৈধতাকে সুদৃঢ় করছে। অতএব কব্জা করার পরও ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এর উত্তরে লেখক বলেন, কব্জার পর ক্রেতার জন্য মালিকানা এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ক্রেতা যখন দ্রব্যটি কব্জা করল, তখন দ্রব্যটি ক্রেতার দায়ে চলে গেল অর্থাৎ দ্রব্যটি যদি ক্রেতার অধিকারে থাকা অবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং যখন বিক্রয়পণ্য ক্রেতার দায়ে চলে গেল এবং বিক্রেতা বিক্রয়পণ্যের পরিবর্তে মূল্যের মালিক হয়ে গেল, এমতাবস্থায় যদি বিক্রয়পণ্যের মালিকানা বিক্রেতা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ক্রেতার মালিকানায় না যায়,

তাহলে উভয় বিনিময় তথা পণ্য ও মূল্য একপক্ষ অর্থাৎ বিক্রেতার মালিকানায় থাকছে, আর অন্যপক্ষ তথা ক্রেতার মালিকানায় কোনো বিনিময়ই থাকছে না। আর ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, একপক্ষের মালিকানায় উভয় বিনিময় একত্রিত হওয়া অবৈধ। আর এজন্যই বলা হয়েছে যে, কব্জা করার পর বিক্রয়পণ্যের মালিকানা ক্রেতার পক্ষে চলে আসবে। পক্ষান্তরে কব্জা করার পূর্বে উভয় পণ্যের মালিকানা যেহেতু এক ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় না, তাই কব্জা করার পূর্বে বিক্রয়পণ্যের মালিকানা ক্রেতার জন্য হবে না। তাছাড়া ফাসিদ বিক্রয়ে কব্জার পূর্বে মালিকানা লাভ না হওয়া এবং কব্জার পর মালিকানা লাভ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হলো, মালিকানা লাভের সবব তথা ফাসিদ বিক্রয় ফাসিদ শর্তের কারণে দুর্বল। আর দুর্বল বস্তুর মধ্যে তার হুকুম যুক্ত হয় না যে পর্যন্ত না এর সাথে কোনো শক্তিশালী বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে শক্তিশালী বিষয়টি হলো কব্জা। এজন্য যদি ফাসিদ বিক্রয়ে কব্জা পাওয়া যায়, তাহলে ফাসিদ বিক্রয়ে এর হুকুম আবশ্যক হবে অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেয়পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। আর যদি কব্জা না পাওয়া যায়, তাহলে ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম পাওয়া যাবে না।

দ্বিতীয় জবাব হলো, যদি মালিকানা কব্জার পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়ের সত্তার সাথে ফাসাদ সম্পৃক্ত হবে, আর বিক্রয় অনুমোদন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। ফলে ফাসাদ সম্পৃক্ত হবে আল্লাহ তা'আলা তথা শরিয়ত প্রবর্তকের সাথে। পক্ষান্তরে কব্জার পরে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে এর সম্পর্ক হবে কব্জার সাথে। আর কব্জা কব্জাকৃত বস্তুর মাঝে দায়কে ওয়াজিব করে। এমতাবস্থায় ফাসাদের সম্পর্ক হবে মানুষের সাথে।

তৃতীয় জবাব হলো, যদি ফাসিদ বিক্রয়ে মালিকানা কব্জা করার আগে ও পরে উভয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে এটা সহীহ বিক্রয়চুক্তির মতো হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কব্জা করার পরও এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এটা বাতিল বিক্রয়চুক্তির মতো হয়ে যাবে। উভয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কব্জার পর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিধানকে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করি।

قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ : অর্থাৎ লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের বিষয়াদি হেবার মতো। হেবার মধ্যে গ্রহীতা দান করা বস্তু কব্জা করার পর সে তার মালিক হয় এবং এর দ্বারা হেবা পূর্ণতা লাভ করে। কব্জা করার পূর্বে হেবা পূর্ণতা পায় না এবং গ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

قَوْلُهُ وَالْمَيْتَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ফাসিদ বিক্রয়কে মৃত জন্তু বিক্রি করা তথা বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেন। উত্তরের সারকথা হলো, মৃত লাশ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তো লাশ মাল নয়। ফলে বিক্রয়ের রুকন তথা مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ [মালের বিনিময়ে মাল] -ই অনুপস্থিত। বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত হওয়ার কারণে বিক্রয় সংঘটিত হবে না। বিক্রয় সংঘটিত না হলে এর দ্বারা মালিকানা লাভ হবে না, দখল করার আগে বা পরে কোনো অবস্থাতেই নয়। পক্ষান্তরে যদি ফাসিদ বিক্রয় সংঘটিত হয়, তবে ফাসিদ ও অবৈধ শর্তের কারণে এতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। সুতরাং দুটি বিক্রয় ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْخَمْرُ الخ : এখান থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কিয়াসের দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারকথা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মদ বিক্রয়পণ্য হয়, [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণনানুসারে] তাহলে এর বিধান কি হবে সে সম্পর্কে আমরা ফাসিদ বিক্রয় সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের শুরুভাগে আলোচনা করেছি যে, বিক্রয়পণ্যই বিক্রয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ফলে এ অবস্থায় মদই হবে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এবং সম্মানের যোগ্য; অথচ শরিয়ত একে অসম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা বাতিল বলে গণ্য হবে। আমাদের মাযহাবে ফাসিদ ও বাতিল বিক্রয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য বিধায় ফাসিদ বিক্রয়কে বাতিল বিক্রয়ের উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। তাছাড়া মদকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা ফাসিদ হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হলো, যদি মদের বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। মদ প্রদান করা আবশ্যক হবে না। কেননা, কোনো মুসলমানের পক্ষে মদ অর্পণ করা বা তা গ্রহণ করা কোনোটাই বৈধ নয়। আর এটা সর্বস্বীকৃত বিধান যে, বাজারমূল্য বিক্রয়ের মধ্যে মূল্যরূপে বিবেচিত হয়– বিক্রয়পণ্যরূপে বিবেচিত হয় না। সুতরাং আমরা যদি দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রয়চুক্তিকে সংঘটিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করি, তাহলে মদের বাজারমূল্য বিক্রয়পণ্য হবে। ফলে মদের বাজারমূল্য, যা বিক্রেতার উপর আবশ্যক হয়েছে তা বিক্রেয়পণ্য হচ্ছে। অথচ শরিয়তে বাজারমূল্যকে মূল্যরূপে উপস্থাপন করেছে– বিক্রীত-পণ্য রূপে নয়। উপরিউক্ত সুরতটিতে শরিয়তের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। অথচ শরিয়তের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা কিংবা রদবদল করা অবৈধ ও আমাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। এ কারণে দিরহামের বিনিময়ে মদের বিক্রি অবৈধ ও বাতিল হবে। ফাসিদ বিক্রয়ের সাথে বাতিল বিক্রয়ের ভিন্নতা ও বৈপরীত্য থাকার কারণে একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা যেহেতু বৈধ নয়, তাই ফাসিদ বিক্রয়সমূহকে দিরহামের বিনিময়ে মদ বিক্রির উপর কিয়াস করা সঠিক নয়।

ثُمَّ شَرَطَ اَنْ يَكُوْنَ الْقَبْضُ بِاِذْنِ الْبَائِعِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، اِلَّا اَنَّهُ يُكْتَفٰى بِهٖ دَلَالَةً، كَمَا اِذَا قَبَضَهُ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ اِسْتِحْسَانًا، وَهُوَ الصَّحِيْحُ، لِاَنَّ الْبَيْعَ تَسْلِيْطٌ مِنْهُ عَلَى الْقَبْضِ فَاِذَا قَبَضَهُ بِحَضْرَتِهٖ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ بِحُكْمِ التَّسْلِيْطِ السَّابِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَصِحُّ اِسْتِحْسَانًا، وَشَرْطُهُ اَنْ يَكُوْنَ فِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ، لِيَتَحَقَّقَ رُكْنُ الْبَيْعِ، هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَيُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُرِّ وَالرِّيْحِ وَالْبَيْعُ مَعَ نَفْيِ الثَّمَنِ، وَقَوْلُهُ : لَزِمَتْهُ قِيْمَتُهُ، "فِيْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ" فَاَمَّا فِيْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ يَلْزَمُهُ الْمِثْلُ، لِاَنَّهُ مَضْمُوْنٌ بِنَفْسِهٖ بِالْقَبْضِ، فَشَابَهَ الْغَصْبَ، وَهٰذَا لِاَنَّ الْمِثْلَ صُوْرَةً وَمَعْنًى اَعْدَلُ مِنَ الْمِثْلِ مَعْنًى .

অনুবাদ : অতঃপর ইমাম কুদূরী (র.) বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রেয়পণ্য কব্জা করার শর্তারোপ করেছেন। আর এটাই জাহের রেওয়ায়েতের ভাষ্য। তবে পরোক্ষ অনুমতিকে যথেষ্ট মনে করা হবে ইসতিহসানের বিবেচনায়। যেমন– কেউ যদি চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার বৈঠকে বিক্রেতার উপস্থিতিতে কব্জা করল। আর এটাই সঠিক অভিমত। কেননা, বিক্রয়ের অর্থ হলো বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে কব্জা করার ক্ষমতা প্রদান। সুতরাং যখন ক্রেতা বিক্রেতার উপস্থিতিতে মজলিস বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই কব্জা করবে এবং বিক্রেতা তাকে বাধা না দেবে, তখনই কব্জা পূর্ব প্রদত্ত ক্ষমতার ফল রূপে সম্পন্ন হবে। এমনিভাবে হেবার ক্ষেত্রে চুক্তি অনুষ্ঠানের মজলিসে কব্জা গ্রহণ ইসতিহসানের ভিত্তিতে শুদ্ধ হবে। এছাড়া তিনি চুক্তির উভয় বিনিময়ের প্রত্যেকটি মাল হওয়ার শর্ত করেছেন, যাতে বিক্রয়ের রুকন বিদ্যমান থাকে। আর তা হচ্ছে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা। এরই ভিত্তিতে মৃত, রক্ত, স্বাধীন ব্যক্তি, বাতাসের বিনিময়ে বিক্রি করা এবং মূল্য ছাড়া [কোনো দ্রব্য] বিক্রি করার বিধান বের করা হয়। ইমাম কুদূরী (র.)-এর বাজার মূল্য সাব্যস্ত হওয়ার বক্তব্যটি হলো মূল্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে, পক্ষান্তরে সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর সদৃশ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। কেননা, [ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] কব্জা গ্রহণের কারণে বিক্রীত-দ্রব্যটি স্বয়ং দায়যুক্ত হয়। সুতরাং তা আত্মসাৎকৃত মালের মতো হলো। আর এ বিধান এজন্য যে, দৃশ্যত ও গুণগত সাদৃশ্য শুধু গুণগত সাদৃশ্য থেকে অধিক ন্যায়পূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ شَرَطَ اَنْ يَكُوْنَ الْقَبْضُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ইমাম কুদূরী (র.)-এর মূল পাঠের বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক বলেন, ইমাম কুদূরী (র.) মূল ইবারতে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কব্জা করার কথা বলেছেন। তাঁর এ মতটি জাহের রেওয়ায়েতেও রয়েছে। তবে এখানে অনুমতির ব্যাপারটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে মতে বিক্রেতার প্রত্যক্ষ অনুমতি

যেমন কার্যকর হবে, তেমনি বিক্রেতার মৌন অনুমতি এবং অবগতির পর নিষেধ না করাও এতে শামিল থাকবে। অর্থাৎ বিক্রেতার পরোক্ষ অনুমতির দ্বারাও যদি কব্জা করা হয়, তাহলে সে কব্জা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করবে। পরোক্ষ ও মৌন অনুমতির সুরত হলো, যে বৈঠকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রেতা বৈঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে যদি বিক্রেয়পণ্যটি বিক্রেতার উপস্থিতিতে গ্রহণ করে তার আয়ত্তে নিয়ে নেয়, আর বিক্রেতা এ ব্যাপারে কোনো বাধা প্রদান না করে, তাহলে তার এ কব্জাটি ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ হয়ে যাবে। আর এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ ও সহীহ মত।

এ ব্যাপারে ঈযাহ গ্রন্থের লেখকের একটি দুর্বল মত রয়েছে যে, এরূপ কব্জা করা হলে যথেষ্ট হবে না; বরং বিক্রেতার সুস্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে কব্জা করা হলে তা যেন অনমুতি ছাড়াই কব্জা করা হলো। অনুমতি ছাড়া কব্জা দ্বারা যেমন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তেমনি এ ধরনের কব্জা দ্বারাও মালিকানা লাভ হবে না।

সহীহ মতটির স্বপক্ষে দলিল হলো, বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় সম্পন্ন করার অর্থই হলো ক্রেতাকে বিক্রেয়পণ্য কব্জা করার ক্ষমতা প্রদান করা। সুতরাং ক্রেতা যদি চুক্তি অনুষ্ঠানের বৈঠকে বিক্রেতার উপস্থিতিতে কব্জা করে আর বিক্রেতা এ ব্যাপারে কোনো বাধা না দেয়, তাহলে এ কব্জা বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলেই হলো। আর যে কব্জা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে করা হয় তার দ্বারা অবশ্যই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ কব্জা দ্বারা ক্রেতার মালিকানা লাভ হবে। বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে পরোক্ষ অনুমতিই যথেষ্ট হবে। এখানে قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ এ কয়েদটি দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতার কব্জা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিক্রেতার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট অনুমতি লাগবে; বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পরোক্ষ অনুমতি যথেষ্ট হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ফাসিদ বিক্রয় অন্যান্য বিক্রয়ের তুলনায় দুর্বল, আর তাই শুধুমাত্র বিক্রয় দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না; বরং কব্জা করার প্রয়োজন হয়। আর এ দুর্বলতার কারণে এ বিক্রয় দ্বারা কব্জা করার ক্ষমতা লাভ করা যাবে না। অথচ ক্ষমতা লাভ করাটাই হচ্ছে সহীহ রেওয়ায়েতের মূল কারণ। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের দুর্বলতা তো তখনই হবে যখন এতে কব্জা থাকবে না। অর্থাৎ কব্জাবিহীন বিক্রয়ে দুর্বলতা রয়েছে। অথচ আমাদের আলোচনা চলছে কব্জা সহ বিক্রয় সম্পর্কে।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْهِبَةِ الخ : লেখক বলেন, আলোচ্য কব্জাটির অনুরূপ বিধান রয়েছে হেবার মধ্যে। হেবার কব্জার ব্যাখ্যা হলো, যদি গ্রহীতা হেবাকৃত দ্রব্যটি দাতার উপস্থিতিতে হেবা কারার মজলিসে কব্জা করে এবং তা আয়ত্তে নিয়ে নেয়, তাহলে কব্জা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং গ্রহীতার হেবাকৃত দ্রব্যে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। হেবা করার জন্য মজলিসের শর্ত এজন্যই করা হয়েছে যে, হেবার মধ্যে কব্জা হচ্ছে রুকন এবং গ্রহীতার মালিকানা প্রমাণ হওয়ার ক্ষেত্রে কব্জা হচ্ছে "কবুল" এর স্থলবর্তী। চুক্তির মধ্যে যেমন মজলিসেই কবুল করা শর্ত, তেমনি কব্জা করার ক্ষমতা প্রদানও মজলিসেই অপর্ণ করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) মালিকানা লাভের আরেকটি শর্ত করেছেন। শর্তটি হলো, ফাসিদ চুক্তির উভয় বিনিময় মাল হতে হবে। হিদায়া প্রণেতা ইমাম কুদূরী (র.)-এর উক্ত শর্তারোপের কারণ সম্পর্কে বলেন, এ শর্তারোপ করা হয়েছে বিক্রয়ের রুকন পাওয়া যাওয়ার জন্য। বিক্রয়ের রুকন হলো مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ অর্থাৎ 'ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা।' সুতরাং যে অবস্থাগুলোতে বিক্রয়পণ্য অথবা মূল্য মৃত লাশ, মদ, রক্ত, স্বাধীন ব্যক্তি ইত্যাদি হয়, সে সব বিক্রি যে কোনো একটি বিনিময় মাল না হওয়ার কারণে বাতিল হবে। আর যদি কেউ মূল্য বাদ দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে এক বর্ণনানুযায়ী এ ধরনের বিক্রিও বাতিল হবে। কেননা, মূল্য ছাড়া বিক্রয়ে 'মালের বিনিময়ে মাল' এ বিষয়টি অনুপস্থিত। বিক্রয়ের রুকন অনুপস্থিত হওয়ার কারণে বিক্রয়চুক্তিটি তো অসংঘটিত হয়ে গেল এবং বাতিল বলে গণ্য হলো।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মূল্যবিহীন বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, বিক্রয়ে মূল্যকে বাদ দেওয়া বৈধ নয়; কারণ, বিক্রয় বলা হয় এমন চুক্তিকে, যাতে উভয় বিনিময় বিদ্যমান থাকে এবং উভয়টা মাল হয়। যে চুক্তিতে দুই বিনিময় না থাকে, তাকে হেবা কিংবা সদকা বলা যেতে পারে। সুতরাং যখন মূল্যকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই, তখন এটা যেন এমন হয়ে গেল যে, ক্রেতা মূল্যকে উল্লেখ না করে চুপ রয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী কেউ যদি বেচাকেনা করে এবং তাতে মূল্য উল্লেখ না করে, তাহলে এ বিক্রয় ফাসিদরূপে সংঘটিত হয়। আর ফাসিদ বিক্রয়ে কব্জা দ্বারা ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, নিঃশর্ত চুক্তি বিক্রয়চুক্তির বিনিময় দাবি করে। সুতরাং যখন ক্রেতা মূল্য উল্লেখ না করে চুপ রইল, তখন সম্ভবত তার উদ্দেশ্য হলো বাজারমূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। সুতরাং এখানে বিক্রেতা যেন ক্রেতার কাছে বাজারমূল্যে বিক্রয় করল। আর কোনো বস্তু বাজারমূল্যে বিক্রি করা ফাসিদ। অতএব এখানে বিক্রি ফাসিদ হবে।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর বাক্য لَزِمَتْهُ قِيْمَتُهُ -এর ব্যাখ্যা হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার পর যদি সেই পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার জন্য কব্জার দিনের পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে। যদি কব্জা করার পর পণ্যের বাজারমূল্য বেড়ে যায় এরপর ক্রেতার হাতে তা বিনষ্ট হয়, তবু তার কব্জার দিনের বাজারমূল্য দিতে হবে। এর বেশি দিতে হবে না। লেখক বলেন, لَزِمَتْهُ قِيْمَتُهُ -এর হুকুম মূল্যনির্ভর বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন– প্রাণী, গণনা করে বিক্রি করা হয় এমন তারতম্যপূর্ণ বস্তুসমূহ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি বিক্রীত-পণ্যের নজির আছে এমন [সাদৃশ্য-নির্ভর বস্তুসমূহ] হয়, যেমন– পাত্র দ্বারা মাপা যায়, ওজন করা যায় এমন বস্তু হয় এবং তা ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর এর অনুরূপ বস্তু বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। কেননা, ক্রেতার কব্জা করার কারণে বিক্রয়পণ্যটি আপনাআপনি দায়যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। যেমন– আত্মসাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি আত্মসাৎকৃত বস্তুটি আত্মসাৎকারীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তা সাদৃশ্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে আত্মসাৎকারীর উপর তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। এ দু ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে একই ধরনের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক না হয়ে সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে অনুরূপ বস্তু প্রদান কেন আবশ্যক হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, কোনো বস্তুর সাদৃশ্য দু ধরনের হতে পারে–

১. বাহ্যিক সাদৃশ্য বা আকৃতিগত সাদৃশ্য।

২. মূলগত সাদৃশ্য।

কোনো বস্তুর সাদৃশ্য যদি অপর বস্তুর সাথে বাহ্যিক এবং মূলগত সাদৃশ্য হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে সর্বোত্তম সাদৃশ্য। আর যদি শুধু মূলগত সাদৃশ্য হয়, তাহলে সেটা প্রথম প্রকারের থেকে দুর্বল সাদৃশ্য। আমাদের আলোচ্য সাদৃশ্যনির্ভর বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু উভয় প্রকারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তাই এমন বস্তু বিনষ্ট হলে তার অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। কেননা, এটা শুধুমাত্র মূলগত পার্থক্যের চেয়ে উত্তম। আর এজন্যই দু প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রে দু ধরনের ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হয়।

قَالَ : وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ رَفْعًا لِلْفَسَادِ ، هٰذَا قَبْلَ الْقَبْضِ ظَاهِرٌ ، لِاَنَّهُ لَمْ يُفِدْ حُكْمَهُ ، فَيَكُوْنُ الْفَسْخُ اِمْتِنَاعًا مِنْهُ ، وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ ، اِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِىْ صُلْبِ الْعَقْدِ ، لِقُوَّتِهِ ، وَاِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذٰلِكَ دُوْنَ مَنْ عَلَيْهِ ، لِقُوَّةِ الْعَقْدِ ، اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقِ الْمُرَاضَاةُ فِىْ حَقِّ مَنْ لَهُ الشَّرْطُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রত্যেকেরই ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ফাসিদ বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করার এখতিয়ার রয়েছে। কব্জার পূর্বে তো এটা সুস্পষ্ট। কেননা, ফাসিদ বিক্রয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে না। সুতরাং প্রত্যাহার করার অর্থই হবে মালিকানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। তদ্রূপ কব্জা করার পরেও যখন ফাসাদ মূল বিক্রয়চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর যদি ফাসিদ অতিরিক্ত শর্তের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল তার রহিত করার অধিকার রয়েছে, যার বিপক্ষে শর্ত আরোপ করা হয়েছে তার জন্য নয়। কেননা, এক্ষেত্রে আকদ-চুক্তিটি শক্তিশালী। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, যার পক্ষে শর্তারোপ করা হয়েছে, তার সম্মতি কার্যকর হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইতঃপূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করা ওয়াজিব। কিন্তু সে প্রত্যাহার বা রহিত করার অধিকার কার ? এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, কব্জা করার পূর্বে বিধান হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ফাসিদ বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। কব্জা করার পূর্বে ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার মালিকানায় আসে না। সুতরাং কব্জা করার আগে প্রত্যাহার করার অর্থ হচ্ছে, মালিকানা বদলকে বাধা দেওয়ার বা মালিক হতে বাধা দেওয়ার অধিকার বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের রয়েছে। অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্যের মালিক হওয়াকে বাধা দিতে পারে, তেমনি ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মালিক হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। যেহেতু উভয়ের মালিক হওয়া থেকে বিরত থাকার অধিকার রয়েছে, তাই যে কেউ তার অধিকার প্রয়োগ করে বিক্রয়চুক্তি রহিত করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ইবারতের শব্দ رَفْعًا لِلْفَسَادِ -এর মধ্যে (بِالرَّاءِ) رَفْعًا হচ্ছে শুদ্ধ, (بِالدَّالِ) دَفْعًا শুদ্ধ নয়। কেননা, رَفْع অর্থ হচ্ছে কোনো সংঘটিত কাজকে রহিত করা, বাধা দেওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে دَفْع -এর অর্থ হচ্ছে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দেওয়া। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ফাসাদ সংঘটিত হয়ে গেছে, তাই এখানে رَفْع শব্দটি অধিকতর উপযুক্ত। কব্জা করার পর প্রত্যাহার করার অধিকার কি উভয়ের, নাকি একজনের? এ ব্যাপারে লেখক বলেন, কব্জা করার পর দু অবস্থা হতে পারে–

১. ফাসাদের সম্পর্ক মূল চুক্তির মাঝে হবে অথবা

২. ফাসাদের সম্পর্ক হবে অতিরিক্ত শর্তের সাথে। অর্থাৎ অতিরিক্ত শর্তটি ফাসিদ হলে তবে মূল চুক্তিতে কোনো ফাসাদ হয় না

প্রথম প্রকার তথা মূল চুক্তিতে ফাসাদের ব্যাখ্যা হলো, দুই বিনিময়ের কোনো একটি বিনিময় ফাসাদ হবে। যথা– এক দিরহামকে দু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা, অথবা বস্ত্রকে মদের বিনিময়ে বিক্রি করা ইত্যাদি। এ অবস্থায় ফাসাদ মূল চুক্তির মধ্যে হওয়ার কারণে ফাসাদ অনেক শক্তিশালী, আর ফাসাদ দূর করা শরিয়তের বিধান। আর উক্ত বিধানের কারণেই চুক্তিটি কার্যকর হয়নি। নিয়মানুযায়ী যে কোনো অকার্যকর বিক্রয় রহিত করার অধিকার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের রয়েছে। সে মতে ফাসাদ মূল চুক্তিতে হওয়ার কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের রহিত করার অধিকার রয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে-ই বিক্রয় রহিত করুক সে অপরের সামনে তথা অপরকে জানিয়ে বিক্রয় রহিত করবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মত হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার করার জন্য অপরজনকে জানানো আবশ্যক নয়; বরং জানিয়ে ও না জানিয়ে উভয় অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করা শরিয়তের বিধান। শরিয়তের বিধান কারো উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতির তোয়াক্কা করে না। এ কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার প্রতিপক্ষের অনুমতি বা অবগতির উপর নির্ভরশীল নয়।

তারফাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফাসিদ বিক্রয়ে ফাসাদ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে রহিত করা নিঃসন্দেহে শরিয়তের বিধান। কিন্তু রহিত করার দ্বারা প্রতিপক্ষের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। কেননা, মানুষ তখনই বিক্রয় রহিত করে যখন মনে করে বিক্রয়চুক্তিতে তার স্বার্থহানি ঘটেছে। সুতরাং সে যেন বিক্রয় রহিত করার দ্বারা তার প্রতিপক্ষের প্রতি তার ক্ষতি করার অভিযোগ করছে। আর অভিযোগ তোলার ক্ষেত্রে নীতি হলো যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। এজন্যই বিক্রয় রহিতকারী তার সাথির উপস্থিতিতে বিক্রয় রহিত করবে, তার অনুপস্থিতিতে রহিত করার ব্যাপারে শরিয়তের অনুমোদন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যদি ফাসাদ অতিরিক্ত শর্তের ক্ষেত্রে হয় এবং ক্রেতা যদি কব্জা করে ফেলে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুসারে যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল সেই প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখে। যেমন– ক্রেতা এ শর্তে জামা খরিদ করল যে, বিক্রেতা তাকে একটি রুমাল হাদিয়া দেবে কিংবা বিক্রেতা তাকে কিছু টাকা ঋণ দেবে, তাহলে এখানে শুধুমাত্র ক্রেতারই বিক্রয় রহিত করার অধিকার থাকবে বিক্রেতার কোনো অধিকার থাকবে না।

এ ব্যাপারে শায়খাইন (র.)-এর অভিমত হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে। লেখক এখানে শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতটিকে উল্লেখ করেছেন– মতবিরোধের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর মতের পক্ষে এভাবে দলিল বর্ণনা করেন যে, যখন অতিরিক্ত শর্তের মধ্যে ফাসাদ হয় তখন চুক্তি শক্তিশালী হয়, কিন্তু ফাসাদ শক্তিশালী হয় না। আর এজন্যই শুধুমাত্র যার অনুকূলে শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারবে। উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর উপর আপত্তি হলো, যদি বলেন চুক্তি শক্তিশালী হয়, তাহলে তো কারোই রহিত করার এখতিয়ার থাকার কথা নয়। এর উত্তর হলো, যার অনুকূলে শর্ত সে তো শর্ত ব্যতীত চুক্তি করতে সম্মত ছিল না, তাই তাকে বিক্রয় প্রত্যাহার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.) -এর দলিল হলো, ফাসাদ দূর করা শরিয়তের বিধান, এ কারণে চুক্তির কার্যকারিতা বহাল নেই। আর যে চুক্তি অকার্যকর তাকে উভয় পক্ষ রহিত করতে পারে। এ কারণে উল্লিখিত শেষ অবস্থাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চুক্তি রহিত করতে পারবে।

স্মর্তব্য যে, আলোচ্য মতবিরোধ তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ক্রেতার হাতে বিক্রীত-পণ্য স্বঅবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আর যদি কব্জাকৃত পণ্যটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন– বিক্রীত-পণ্যটির সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ হয় অথবা কোনো কিছুর হানি ঘটে এমতাবস্থায় ভিন্ন হুকুম হবে, যা সবিস্তারে সামনে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

قَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ مَلَكَهُ، فَمَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَسَقَطَ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ بِالثَّانِي، وَنَقْضُ الْأَوَّلِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ، وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، وَالثَّانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَ وَصْفِهِ، فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُّ الْعَبْدِ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ، وَ مَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنَ الشَّفِيعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রেতা যদি তা [অর্থাৎ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে কব্জাকৃত পণ্যটি] বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রি কার্যকর হবে। কেননা, সে পণ্যটির মালিক হয়েছে, অতএব সে পণ্যটির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিক্রির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির হক সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রথম বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। প্রথম বিক্রি বাতিল করা ছিল শরিয়তের হক, আর মানুষের হক [শরিয়তের হকের চেয়ে] অগ্রগণ্য। কেননা, মানুষ মুখাপেক্ষী। তাছাড়া প্রথম বিক্রয়টি মূলগতভাবে শরিয়তসম্মত, গুণগতভাবে নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিক্রয়টি মূলগত ও গুণগত উভয়ভাবেই শরিয়তসম্মত, তাই এর সাথে শুধু গুণগত অবৈধতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসতে পারে না। আর এজন্য যে, দ্বিতীয় বিক্রয়টি [প্রথম] বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েই করা হয়েছে। তবে 'শুফআর' অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়িতে ক্রেতার ব্যবহারের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এতে উভয়টি বান্দার হক, আর উভয়টি শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে সমান। আর ক্রেতার হস্তক্ষেপ শুফআর হকদারের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِيْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত পণ্যের বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের ক্রেতা যদি বিক্রীত-পণ্যটি কব্জা করে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার বিক্রি কার্যকর হবে। কারণ, ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্যটি কব্জা করার মাধ্যমে পণ্যটির মালিক হয়েছিল। মালিকানাধীন পণ্যে মালিকের যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে। যে কারণে আলোচ্য ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার মালিক। এখন সে পণ্যটিকে বিক্রি করতে পারে, দান করতে পারে, হেবা করতে পারে ইত্যাদি। সুতরাং পণ্য বিক্রয়ে সে তার প্রাপ্ত বৈধ এখতিয়ারের ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করেছে, তাই তার বিক্রয় কার্যকর হবে বৈকি।

তবে পণ্যটি যদি খাদ্যদ্রব্য হয়, তাহলে ক্রেতার জন্য তা ভক্ষণ করা জায়েজ নয়। যদি তার কোনো দাসী হয়, তাহলে ক্রেতার জন্য তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। দাসীর সাথে সঙ্গম করার ব্যাপারে শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর অভিমত হলো, সঙ্গম করা হারাম নয়, তবে মাকরূহ। উল্লেখ্য যে, ক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয়ে বিক্রেতা হচ্ছে, সে মতে দুটি চুক্তির মধ্যে দু জন বিক্রেতা। এজন্য ফাসিদ বিক্রয়ের বিক্রেতা হলো প্রথম বিক্রেতা, আর [দ্বিতীয় বৈধ] বিক্রয়ের বিক্রেতা হলো দ্বিতীয় বিক্রেতা।

قَوْلُهُ سَقَطَ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের হুকুম হলো বিক্রয় প্রত্যাহার করে কব্জাকৃত মাল ফেরত দেওয়া আবশ্যক। সে মতে দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানে তা করা হলো না কেন?

এর উত্তরে লেখক বলেন, যখন ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যটি বিক্রয় করে ফেলে, তখন প্রথম বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্যটি নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। এখন প্রথম বিক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল করে বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে না; বরং ক্রেতা [দ্বিতীয় বিক্রেতা]-এর উপর বিক্রীত-পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে– যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়। আর যদি তা সাদৃশ্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে এর অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক হবে। দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য পণ্যটি ব্যবহার করা বৈধ এবং শরিয়তসম্মত হবে। কেননা, দ্বিতীয় ক্রেতা একটি বৈধ বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে এর মালিক হয়েছে এবং পণ্যটির ব্যবহারও শরিয়ত অনুমোদিত অর্থাৎ পণ্যটি ব্যবহার করা হালাল, তবে প্রথম ক্রেতার জন্য পণ্যটি ব্যবহার করা হালাল ও বৈধ ছিল না; কেননা, প্রথম ক্রেতা একটি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিক হয়েছিল। তবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, ক্রেতার বিক্রয়ের পর [প্রথম] বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হবে কেন?

এর উত্তর হলো, দ্বিতীয় বিক্রয়ের দ্বারা দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা মানুষের বা বান্দার হক। আর ফাসাদের কারণে প্রথম বিক্রয়টি রহিত করা শরিয়তের হক। এখানে বান্দা ও শরিয়তের হকের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বান্দার হকের দাবি হলো দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর হোক। আর শরিয়তের হকের দাবি হলো দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল হওয়া। আর বান্দা ও শরিয়তের হক যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে বান্দার হককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ, শরিয়তদাতা [আল্লাহ] অমুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে বান্দা মুখাপেক্ষী। মুখাপেক্ষীর অধিকার অধিক বাস্তবায়নযোগ্য। এ কারণে আলোচ্য অংশে ক্রেতার অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং প্রথম বিক্রেতার পণ্য ফেরত দানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল করা হবে না।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হলো, প্রথম বিক্রয় সত্তাগতভাবে বৈধ, কিন্তু গুণগতভাবে অবৈধ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বিক্রয় সত্তা ও গুণগত উভয়ভাবে বৈধ। এক কথায় প্রথম বিক্রি ফাসিদ, আর দ্বিতীয় বিক্রি শুদ্ধ ও বৈধ। ফাসিদ ও বৈধ একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। এ কারণে প্রথম ফাসিদ বিক্রির কারণে দ্বিতীয় বৈধ বিক্রিটি বাতিল হবে না। যখন দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে, তখন পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

দ্বিতীয় বিক্রয় বৈধ হওয়ার তৃতীয় দলিল হলো, দ্বিতীয় বিক্রির অধিকার প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতা লাভ করেছে। কেননা, ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে বিক্রীত-পণ্যটি কব্জা করেছিল। সুতরাং প্রথম বিক্রেতা যদি বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নেয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল করা হয়। আর নিজের দ্বারা কৃত বিক্রয় রহিত করা বাতিল। আর এ কারণে প্রথম বিক্রেতা তার বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِيْ الخ এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, কোনো ব্যক্তি এমন একটি বাড়ি ক্রয় করল যার শুফআর দাবিদার রয়েছে এবং উক্ত দাবিদার বাড়িটি দাবিও করেছে। কিন্তু ক্রেতা বাড়িটি ক্রয় করে অন্য একজনের কাছে বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় শরিয়তের বিধান হলো, ক্রেতার মাধ্যমে সম্পাদিত দ্বিতীয় বিক্রয়টি রহিত করে শুফআর দাবিদারকে তার অধিকার দেওয়া হবে। অথচ এখানেও দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এ মাসআলাটি আমাদের বর্ণিত মাসআলার বিপরীত হলো।

এর উত্তর হলো, এখানে দ্বিতীয় ক্রেতার অধিকার ও শুফআর দাবিদারের অধিকার উভয়ই সমান। কারণ, দুটোই বান্দার হক। এজন্য দুটির কোনোটি অপরটির উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে না। বরং এ দুটোর মধ্যে শুফআর হক অধিক শক্তিশালী ও অগ্রগামী ছিল বিধায় সেটা অগ্রগণ্য হবে। অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়টি সংঘটিত হওয়া মাত্রই শুফআর দাবিদারের অধিকার তার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। ফলে এর পরবর্তী ক্রেতার যাবতীয় হস্তক্ষেপ করার বিষয়টি গ্রাহ্য হবে না। আর তার সবগুলি হস্তক্ষেপের পিছনে কোনো ভিত থাকবে না। আর ভিত্তিহীন কাজ ভঙ্গ করাতে কোনো সমস্যা নেই। আর এজন্যই ক্রেতার করা হস্তক্ষেপগুলো বাতিল করে শফীর অধিকার দেওয়া হবে। তাছাড়া শফীর হস্তক্ষেপ ও ক্রেতার হস্তক্ষেপ যেহেতু শরিয়ত অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে একই পর্যায়ের বলে বিবেচিত, তাই শফীর অধিকার প্রদান করা হবে, ক্রেতার বিক্রয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না।

তাছাড়া এখানের বিষয়টি প্রথম বিক্রেতার বিষয়ের অনুরূপ নয়। কারণ, সেখানে প্রথম বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রেতা হস্তক্ষেপ করেছিল, আর এখানে ক্রেতা শফীর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি, তাই ক্রেতার কৃতচুক্তি বাতিল করে শফীর অধিকার প্রদান করা হবে। আর এভাবে শুফআর অধিকার সংশ্লিষ্ট বাড়ির বিষয়টি আলোচ্য মাসআলার ব্যতিক্রম সাব্যস্ত হলো।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ فَقَبَضَهُ وَاَعْتَقَهُ اَوْ بَاعَهُ اَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَعَلَيْهِ الْقِيْمَةُ، لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ، فَيَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ. وَبِالْاِعْتَاقِ قَدْ هَلَكَ، فَتَلْزَمُهُ الْقِيْمَةُ، وَبِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ انْقَطَعَ الْاِسْتِرْدَادُ عَلٰى مَامَرَّ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهْنُ نَظِيْرُ الْبَيْعِ، لِاَنَّهُمَا لَازِمَانِ اِلَّا اَنَّهُ يَعُوْدُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ، وَ فَكِّ الرَّهْنِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَهٰذَا بِخِلَافِ الْاِجَارَةِ، لِاَنَّهَا تَفْسَخُ بِالْاَعْذَارِ، وَ رَفْعُ الْفَسَادِ عُذْرٌ، وَلِاَنَّهَا تَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَكُوْنُ الرَّدُّ اِمْتِنَاعًا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি মদ কিংবা শূকরের বিনিময়ে দাস কিনে, অতঃপর তা কব্জা করে তাকে আজাদ করে বা বিক্রি করে বা দান করত তা অর্পণ করে দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। আর ক্রেতার উপর দাসের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সে [ক্রেতা] কব্জা করার দ্বারা বস্তুটির মালিক হয়ে গেছে। ফলে তার সব হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে। আজাদ করার দ্বারা দাসত্ব নিঃশেষ হয়েছে, তাই তার উপর দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর বিক্রি ও হেবা [দান] করার দ্বারা পূর্ব বর্ণনানুযায়ী ফেরত নেওয়ার অধিকার খতম হয়ে গেছে। মুকাতাবের চুক্তি ও বন্ধকীচুক্তি বিক্রয়ের মতো। কেননা, এ দুটি চুক্তি আবশ্যক পর্যায়ের। তবে পার্থক্য এটুকু যে, এ দুয়ের মধ্যে ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রত্যাবর্তিত হয় মুকাতাব অক্ষম হলে এবং বন্ধক ছাড়ানো হলে। কেননা, এ দু অবস্থায় প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়ে যায়। আর এটা [অর্থাৎ ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হওয়ার বিষয়টি] ইজারা-চুক্তির ব্যতিক্রম। কেননা, তা বিভিন্ন ওজরবশত রহিত হয়ে যায়। ফাসাদ অপসারণ করাও একটি ওজর। তাছাড়া এটা [ইজারা-চুক্তি] পর্যায়ক্রমে অল্প অল্প করে সংঘটিত হয়। সুতরাং এতে ফেরত প্রদান করার অর্থ হবে চুক্তি বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا بِخَمْرٍ الخ : **মাসআলা :** কেউ যদি ফাসিদ ক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কোনো দাস খরিদ করে; যেমন– সে মদের কিংবা শূকরের বিনিময়ে কোনো দাস খরিদ করল, অতঃপর তা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কব্জা করে আজাদ করে দিল বা বিক্রি করে দিল অথবা কাউকে দান করত অর্পণ করে দিল, তাহলে ক্রেতার কৃত এ কাজগুলো বৈধ বলে গণ্য হবে এবং ক্রেতার উপর উক্ত দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্য কব্জা করে, তাহলে সে পণ্যটির মালিক হয়ে যায়। যেহেতু ক্রেতা কব্জা করার দ্বারা পণ্যটির মালিক হয়েছে, তাই এতে তার সব ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে মতে তার উপরিউক্ত হস্তক্ষেপগুলো কার্যকর হবে। ক্রেতার উপর বাজারমূল্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-পণ্য সত্তাগতভাবে দায়যুক্ত হয়। সত্তাগতভাবে দায়যুক্ত হওয়ার অর্থ হলো তা বিনষ্ট হলে যদি পণ্যটি সাদৃশ্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে এতে অনুরূপ বস্তু প্রদান করা আবশ্যক, আর যদি তা মূল্যনির্ভর বস্তু হয়, তাহলে এতে বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়। আলোচ্য মাসআলাতে বিক্রীত-পণ্য হলো ক্রীতদাস। ক্রীতদাস হলো মূল্যনির্ভর বস্তু–সাদৃশ্যনির্ভর নয়। তাই ক্রেতার উপর দাসের বাজারমূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

এ মাসআলায় বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার কিভাবে রহিত হলো এ সম্পর্কে লেখক বলেন, [মূলপাঠে বর্ণিত ক্রেতার হস্তক্ষেপ হচ্ছে তিন ধরনের যথা– আজাদ করা, বিক্রি করা ও দান করা। প্রথমত] আজাদ করার দ্বারা দাসের মাল

হওয়ার বিষয়টি নিঃশেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্রেতা যখন গোলাম খরিদ করে কব্জা করে তারপর সেটাকে আজাদ করে দেয়, তখন তার দাসত্ব রহিত হয়ে যায়। আর দাসত্বের কারণেই সেটা বিক্রয়যোগ্য ছিল। যখন দাসত্ব রহিত হলো, তখন সেটা বিক্রয়যোগ্য রইল না এবং তার দাসত্ব বিনষ্ট হয়ে গেল। দায়যুক্ত দ্রব্য বিনষ্ট হলে এতে বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। সুতরাং এখানে ক্রেতার উপর বাজারমূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হলো ছিনতাইকৃত গোলাম। ছিনতাইকৃত গোলাম যদি ছিনতাইকারীর হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে গোলামের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়।

আর দ্বিতীয় হস্তক্ষেপ হচ্ছে দাসটিকে বিক্রি করে দেওয়া বা দান করে দেওয়া। যদি ক্রেতা দাসটি বিক্রি করে দেয় কিংবা দান করে তা গ্রহীতার হাতে অর্পণ করে দেয়, তাহলে এ দু অবস্থায়ও দ্বিতীয় বিক্রি রহিত করত বিক্রীত-পণ্য প্রথম বিক্রেতা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, প্রথম ক্রেতা যখন পণ্যটি বিক্রয় করে ফেলেছে, তখন এর সাথে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকার যুক্ত হয়ে গেছে আর হেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার অধিকার যুক্ত হয়েছে।

আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, বান্দার হক শরিয়তের হকের তুলনায় অগ্রগণ্য। এখানে শরিয়তের হক হচ্ছে দ্বিতীয় বিক্রয়টি প্রত্যাহার করত বিক্রীত-পণ্যটি ফেরত দেওয়া। সুতরাং এখানে দ্বিতীয় ক্রেতা ও গ্রহীতার হক রক্ষায় দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল করত বিক্রেতার কাছে বিক্রীত-পণ্য ফেরত প্রদান করা হবে না।

মোটকথা, উপরিউক্ত দুটি সুরতসহ তিনটি সুরতেই বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে।

লেখক আরো বলেন, মুকাতাবের কিতাবাত-চুক্তি এবং বন্ধক [রেহেন]-চুক্তি বিক্রয়চুক্তির পর্যায়ের। এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে কোনো দাস ক্রয় করে, আর বিক্রেতার অনুমতিক্রমে সেটাকে কব্জা করত তাকে মুকাতাব বানিয়ে দেয় কিংবা কারো কাছে [রেহেন] বন্ধক রাখে, তাহলে এটা বিক্রয়ের মতো গণ্য হবে, অর্থাৎ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন প্রথম বিক্রেতার ফেরত আনার অধিকার রহিত হয় তেমনি কিতাবাত-চুক্তি ও বন্ধক রাখলে প্রথম বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

এ দুটি চুক্তি বিক্রয়ের মতো হওয়ার যুক্তি হলো, বিক্রয়চুক্তি যেমন একটি আবশ্যক চুক্তি, তেমনি এ দুটোও আবশ্যক চুক্তি। এজন্যই বন্ধকগ্রহীতা যখন বন্ধক দেওয়া বস্তুটি কব্জা করে ফেলে, তখন বন্ধক-চুক্তিটি বন্ধকদাতার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। এমনিভাবে কিতাবাত চুক্তি মনিবের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। কিতাবাত-চুক্তিতে মুকাতাবের হক তার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়, আর বন্ধকের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতার হক সম্পৃক্ত হয়। মুকাতাব ও বন্ধকগ্রহীতার হক সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ফাসিদ বিক্রয় রহিত করে বিক্রীত-পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া হবে না। অবশ্য বন্ধক ও কিতাবাত-চুক্তির দু অবস্থায় বিক্রেতার পণ্য তার কাছে ফেরত যেতে পারে। অবস্থা দুটো হলো, মুকাতাব যদি কিতাবাত-চুক্তি মোতাবেক বিনিময় প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, আর বন্ধকদাতা যখন বন্ধকের পরিবর্তে নেওয়া টাকা পরিশোধ করে, তখন বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার ফিরে আসে। কেননা, ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধক ছিল অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যের সাথে তৃতীয় ব্যক্তির অধিকারের সংশ্লিষ্টতা তা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং যখন প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হয়েছে, এখন বিক্রেতা ফাসিদ বিক্রয়কে রহিত করে বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার পুনরায় লাভ করবে।

লেখক বলেন, ইজারা-চুক্তিটি এর ব্যতিক্রম। ইজারা-চুক্তি বিক্রয়, হেবা ও আজাদ করার মতো নয়। কেননা, ইজারা-চুক্তি দ্বারা বিক্রেতার ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তিরোহিত হবে না; বরং বিক্রেতা ফাসিদ বিক্রয়কে রহিত করে বিক্রীত-পণ্যটি, যা ইজারা দেওয়া হয়েছে তা ক্রেতা থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। কেননা, ইজারা বিভিন্ন ওজরের কারণে রহিত হয়ে যায়। ফাসাদ দূর করা তো একটি বড় ওজর। সুতরাং ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ইজারাকে প্রত্যাহার করা হবে। যখন ফাসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে ইজারা রহিত হয়ে গেল, তখন বিক্রেতার বিক্রীত-পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার ফিরে আসল। দ্বিতীয় দলিল হলো, ইজারা-চুক্তির ক্ষেত্র হলো বস্তু থেকে মুনাফা ও সুবিধা ভোগ। স্বয়ং বস্তুটি ইজারা-চুক্তির ক্ষেত্র নয়। আর মুনাফা ও সুবিধা পর্যায়ক্রমে অস্তিত্বশীল হয়। একবারে বা একই সাথে পুরো লাভ পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন ইজারা-চুক্তিকে নিঃশেষ করার ইচ্ছা করা হয়, তখন এটা সেসব সুবিধা ও মুনাফা থেকে বিরত থাকা হয় যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি। সুতরাং এখানে চুক্তিটি নাকচ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না, বরং বলা হবে চুক্তি নবায়ন করা হচ্ছে না। আর ইজারার মাধ্যমে কাউকে কোনো কিছু প্রদান করা থেকে বিরত থাকার অধিকার ইজারাদাতার অবশ্যই আছে। আর এ কারণে উল্লিখিত অবস্থায় ইজারা-চুক্তি রহিত করে বিক্রীত-পণ্যকে বিক্রেতার হাতে ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ اَنْ يَاْخُذَ الْمَبِيْعَ حَتّٰى يَرُدَّ الثَّمَنَ، لِاَنَّ الْمَبِيْعَ مُقَابَلٌ بِهٖ، فَيَصِيْرُ مَحْبُوْسًا بِهٖ كَالرَّهْنِ، وَاِنْ مَاتَ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِىْ اَحَقُّ بِهٖ حَتّٰى يَسْتَوْفِىَ الثَّمَنَ، لِاَنَّهٗ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِىْ حَيَاتِهٖ، فَكَذَا عَلٰى وَرَثَتِهٖ وَغُرَمَائِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ، كَالرَّاهِنِ، ثُمَّ اِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الثَّمَنِ قَائِمَةً يَاْخُذُهَا بِعَيْنِهَا، لِاَنَّهَا تَتَعَيَّنُ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ الْاَصَحُّ، لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ، وَاِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً اَخَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে বিক্রীত-পণ্য গ্রহণ করা বিক্রেতার জন্য বৈধ নয়। কেননা, বিক্রীত-পণ্য মূল্যের বিনিময়। যা মূল্যের বিপরীতে আবদ্ধ থাকবে। যেমন– বন্ধকের ক্ষেত্রে [বন্ধকী বস্তু টাকার বিনিময়ে আবদ্ধ থাকে]। যদি বিক্রেতা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে পণ্যের মূল্য আদায় করার আগ পর্যন্ত ক্রেতাই পণ্যের বড় হকদার। কেননা, সে বিক্রেতার জীবদ্দশায় ক্রেতাকে বিক্রেতার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং বিক্রেতার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী ও পাওনাদারদের উপর ক্রেতার অগ্রাধিকার বহাল থাকবে। যেমন– বন্ধকদাতার অগ্রাধিকার থাকে। [বিক্রেতার মৃত্যুর পর লক্ষণীয় হলো,] যদি মূল্যরূপে পরিশোধকৃত দিরহামগুলো হুবহু বিদ্যমান থাকে, তাহলে ক্রেতা উক্ত দিরহামগুলোই নিয়ে নেবে। কেননা, বিশুদ্ধতম মতানুসারে ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য সুনির্দিষ্ট হয়। কেননা, এটা জবরদখলের পর্যায়ভুক্ত। আর যদি দিরহামগুলো বহাল না থাকে, তাহলে তার সমপরিমাণ দিরহাম নেবে, আমাদের পূর্ববর্ণিত দলিলের ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِى الْبَيْعِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ফাসিদ বিক্রয়ে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা তাদের মূল্য ও পণ্য বিনিময় করে ফেলে, তাহলে বিক্রয় প্রত্যাহারের সময়ে বিক্রেতা মূল্যরূপে যা গ্রহণ করেছে তা প্রথমে ক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দেবে, তারপরে ক্রেতা থেকে তার পণ্য গ্রহণ করবে। এখানে লক্ষণীয় হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ক্রেতার পক্ষ থেকে আদায়কৃত বস্তুকে ধার্যমূল্য (ثَمَنْ) বলেছেন। অথচ কারো কারো মতে শব্দটি হবে বাজারমূল্য (قِيْمَتْ)। কারণ, ফাসিদ বিক্রয়ে ধার্যমূল্য আবশ্যক নয়; বরং বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হয়। তবে ফাতহুল কাদীরের লেখক কারো কারো এ ব্যাখ্যাকে মানতে রাজি নন। কেননা, ফাসিদ বিক্রয়ে বাজারমূল্য তখনই আবশ্যক হয় যখন পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো পণ্যটি বিদ্যমান। সুতরাং তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে ধার্যমূল্যই প্রদান করা হবে। এজন্যই তো ইমাম মুহাম্মদ (র.) ثَمَنْ [বাজারমূল্য] শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ণিত আলোচ্য মাসআলায় পণ্য বিদ্যমান রয়েছে, তাই এখানে বাজারমূল্য শব্দ ব্যবহার না করে ধার্যমূল্য ব্যবহার করা অনুচিত হয়নি। তবে এখানে যদি ইবারত এভাবে বলা হয় যে, "বিক্রেতা তার পণ্য ফেরত নিতে পারবে না, যে পর্যন্ত না বিক্রেতা তার পণ্যের বিনিময়রূপে যা গ্রহণ করেছে তার ফেরত না দেয়।" তখন বিষয়টি ব্যাপক হয়ে যাবে। এতে মুদ্রা ও সাধারণ পণ্য উভয়ই শামিল থাকবে। তদ্রূপ এতে ধার্যমূল্য ও বাজারমূল্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হবে।

মোটকথা, ফাসিদ বিক্রি প্রত্যাহারের সময় বিক্রেতা পণ্যের বিনিময়ে যা গ্রহণ করেছিল তা ফেরত দেবে, তারপর তার পণ্যটি ক্রেতা থেকে নেবে। কেননা, পণ্যটি সেই বস্তুর বিনিময়, যা ক্রেতা বিক্রেতাকে প্রদান করেছে। আর তারই পরিবর্তে পণ্যটি ক্রেতার কাছে আবদ্ধ থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ বিক্রেতার পণ্যের বিনিময়টি ফেরত না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্যটি নিয়ে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। যেমন– বন্ধকী-পণ্য ঋণের পরিবর্তে আবদ্ধ থাকে। যখন ঋণশোধ করা হয়, তখনই কেবল বন্ধকী-পণ্যটি ছাড়িয়ে নিতে পারে। এখানে একই ব্যাপার। অর্থাৎ যতক্ষণ পণ্যের বিনিময় ফেরত না দেবে বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্য লাভ করার অধিকার পাবে না।

লেখক বলেন, যদি বিক্রেতা মারা যায়, তাহলে ক্রেতা বিক্রেয়পণ্যের অধিক হকদার সাব্যস্ত হবে যতদিন তার প্রদত্ত মূল্য উসূল না করে। কেননা, বিক্রেতার জীবদ্দশায়ও ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য উসূল করে না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রেয়পণ্যের অধিক হকদার ছিল সুতরাং বিক্রেতার মৃত্যুর পরও বিক্রেতার উত্তরাধিকারীগণ পাওনাদার থেকে মূল্য আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত বিক্রেয়পণ্যের ব্যাপারে তার কর্তৃত্ব বহাল থাকবে। যেমন– যদি বন্ধকদাতা মারা যায় আর তার উত্তরাধিকারী ও পাওনাদার থেকে থাকে, তাহলে পণ্যের ব্যাপারে বন্ধকগ্রহীতার অগ্রাধিকার বহাল থাকে যে পর্যন্ত না সে তার ঋণের টাকা সম্পূর্ণরূপে উসুল করে নেয়। বন্ধকগ্রহীতা তার পাওনা আদায় করার পর অন্য হকদার তাদের হক আদায় করবে।

লেখক এরপর প্রাসঙ্গিকক্রমে বলেন, যদি বিক্রেতার কাছে ক্রেতা প্রদত্ত বিক্রীত-পণ্যের মূল্য দিরহাম বা দিনার বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রেতাকে সেই দিরহাম বা দিনারই ক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। এর বিকল্প দিরহাম প্রদান করা যথেষ্ট হবে না। হ্যাঁ যদি ক্রেতা প্রদত্ত দিরহামগুলো খরচ কিংবা অন্য কোনোভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে এর বিকল্প প্রদান করাতে কোনো সমস্যা নেই

প্রথমাবস্থায় হুবহু দিরহাম প্রদানের কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে মুদ্রা যদিও চিহ্নিত করার দ্বারা চিহ্নিত হয় না; কিন্তু ফাসিদ বিক্রয়ে চিহ্নিত করার দ্বারা চিহ্নিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ফাসিদ বিক্রয় জবরদখলের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্যটির উপর ক্রেতার দখলকে জবরদখল গণ্য করা হয়। তদ্রূপ মূল্যের উপর বিক্রেতার দখলকে জবরদখলের অনুরূপ মনে করা হয়। যেহেতু জবরদখলের বেলায় জবরদখলকারীর উপর হুবহু পণ্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক এবং জবরদখলকৃত পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে তার অনুরূপ বস্তু দেওয়া ওয়াজিব হয়, সেহেতু মূল্যের দিরহাম- দিনার, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা যদি বিক্রেতার কাছে থাকে, তাহলে সেগুলো প্রদান করা আবশ্যক। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার সমপরিমাণ মুদ্রা প্রদান করা জরুরি।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا بَيْعًا فَاسِدًا فَبَنَاهَا الْمُشْتَرِى فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رح)، رَوَاهُ يَعْقُوْبُ عَنْهُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، ثُمَّ شَكَّ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الرِّوَايَةِ، وَقَالَا : يُنْقَضُ الْبِنَاءُ وَتُرَدُّ الدَّارُ، وَالْغَرْسُ عَلٰى هٰذَا الْاِخْتِلَافِ، لَهُمَا اَنَّ حَقَّ الشَّفِيْعِ اَضْعَفُ مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ، حَتّٰى يَحْتَاجَ فِيْهِ اِلَى الْقَضَاءِ، وَيَبْطُلُ بِالتَّاخِيْرِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْبَائِعِ، ثُمَّ اَضْعَفُ الْحَقَّيْنِ لَا يَبْطُلُ بِالْبِنَاءِ، فَاَقْوَاهُمَا اَوْلٰى، وَلَهُ اَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الدَّوَامُ، وَقَدْ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ، فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْاِسْتِرْدَادِ كَالْبَيْعِ، بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفِيْعِ، لِاَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ مِنْهُ التَّسْلِيْطُ، وَلِهٰذَا لَا يَبْطُلُ بِهِبَةِ الْمُشْتَرِى وَبَيْعِهِ، فَكَذَا بِبِنَائِهِ، وَشَكَّ يَعْقُوْبُ فِى حِفْظِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى الْاِخْتِلَافِ فِى كِتَابِ الشُّفْعَةِ فَاِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ، مَبْنِيٌّ عَلٰى اِنْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ بِالْبِنَاءِ، وَثُبُوْتُهُ عَلَى الْاِخْتِلَافِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে বাড়ি বিক্রি করে, অতঃপর ক্রেতা তাতে কোনো কোঠা নির্মাণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতার উপর উক্ত বাড়ির বাজার-মূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। এ মতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে রেওয়ায়েত করেন। এরপর অবশ্য বর্ণনাটির ব্যাপারে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সাহেবাইন (র.) বলেন, তৈরিকৃত কোঠা ভেঙ্গে ফেলা হবে এবং বাড়ি ফেরত দেওয়া হবে। রোপণকৃত গাছের ব্যাপারে একই মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের [সাহেবাইনের] দলিল হলো, শুফআর দাবিদারের হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। এজন্য শুফআর অধিকারের ক্ষেত্রে আদালতের ফয়সালার প্রয়োজন হয় এবং তা বিলম্বের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। বিক্রেতার হক এর ব্যতিক্রম। দুই হকের দুর্বলতম হক যেহেতু কোঠা নির্মাণ করার কারণে বাতিল হয় না, কাজেই সবল হকটি তো বাতিল না হওয়া আরও স্বাভাবিক। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল হচ্ছে– কোনো ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণ এমন কাজ, যার দ্বারা স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এটা বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হবে, যেমন বিক্রির বেলায় হয়। শুফআর দাবিদারের হক এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি পাওয়া যায়নি। আর এজন্যই তা [শুফআর দাবিদারের হক] ক্রেতার বিক্রয় ও দানের দ্বারা বাতিল হয় না। তদ্রূপ তার নির্মাণের দ্বারাও। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে রেওয়ায়তটি সংরক্ষণ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতপার্থক্যের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে শুফআ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কারণ, শুফআর হক সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তি হলো নির্মাণের দ্বারা বিক্রেতার হক বাতিল হওয়ার উপর। আবার শুফআর হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا بَيْعًا فَاسِدًا الخ : উল্লিখিত ইবারতে ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত জমিনে স্থায়ীভাবে কোনো কিছু নির্মাণ ইত্যাদি করলে জমিন বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে, নাকি তা রহিত হয়ে যাবে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর জামিউস সাগীর গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি প্রাচীর ইত্যাদির মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করা একটি বাড়ির জমিন ক্রয় করল ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে। এরপর ক্রেতা জমিনে কিছু ঘর তৈরি করল। অথবা জমিনটিতে বৃক্ষ রোপণ করল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ঘর নির্মাণ কিংবা বৃক্ষ রোপণের দ্বারা বিক্রেতার [ফাসিদ বিক্রয়ের কারণে] বিক্রীত জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর ক্রেতার উপর উক্ত জমিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) মনে করেন বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হবে না; বরং ক্রেতার নির্মিত ইমারত ভেঙ্গে ও বৃক্ষের মূলোৎপাটন করে জমিন ফেরত দিতে হবে।

লেখক বলেন, মাসআলাটি রেওয়ায়তের সিলসিলা এই : (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ) অর্থাৎ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মাসআলাটি বর্ণনা করার পর এ বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে শুনেছেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। উপরিউক্ত বর্ণনাটি যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ তাঁর মতে ক্রেতা জমিনে কোনো কিছু নির্মাণ করার পর বিক্রেতার সেই জমিন ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

সাহেবাইন (র.) -এর দলিল হচ্ছে– যদি কোনো জমিন কেউ ক্রয় করার পর তাতে কোনো কিছু নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষ রোপণ করে, তারপর তার কোনো প্রতিবেশী উক্ত জমিনের শুফআ দাবি করে তাহলে শুফআর দাবিদার ব্যক্তিকে জমিন খালি করে ফেরত দিতে হবে। শুফআর দাবিদারের হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। যেহেতু নির্মাণের কারণে শফী'-এর ফেরত চাওয়ার ও নেওয়ার অধিকার রহিত হয় না, সুতরাং বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার ও নেওয়ার অধিকার কি করে রহিত হবে?

শফীর হক দুর্বল হওয়ার প্রমাণ হলো, শফীর হক আদায়ের জন্য হয় বিচারকের রায় পেতে হয়, নয়তো ক্রেতার সন্তুষ্টির প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে শফী যদি তার হক দাবি করার ব্যাপারে সামান্য বিলম্ব করে তাহলে তার হক বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া শফী যদি মারা যায় তাহলে তার হক তার ওয়ারিশানের মাঝে স্থানান্তরিত হয় না। পক্ষান্তরে ফাসিদ বিক্রয়ে বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার ও চাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আদায়ে বিচারকের রায়ের অপেক্ষা কিংবা ক্রেতার সন্তুষ্টি কোনোটারই প্রয়োজন নেই। তদ্রূপ বিক্রীত পণ্যের ফেরত নেওয়ার অধিকার তলব করতে যদি বিলম্বও করে তবু তার সে তলব করার অধিকার রহিত হবে না। তাছাড়া বিক্রেতা যদি মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ তার উক্ত তলব করার হক লাভ করবে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শুফআর হক বিক্রয়ের হকের চেয়ে দুর্বল। সুতরাং এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ক্রেতার ইমারত নির্মাণ এবং বৃক্ষরোপণের দ্বারা যেহেতু শুফআর হক বাতিল হয় না, সুতরাং বিক্রেতার হক ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণের দ্বারা কিছুতেই বাতিল হবে না। এটাই যুক্তিযুক্ত দাবি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ক্রেতা দীর্ঘস্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এটা কেউ ভেঙ্গে ফেলার কিংবা উপড়ে ফেলার জন্য করে না। তাছাড়া বৃক্ষরোপণ ও ইমারত নির্মাণের কাজটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে হয়েছে। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই জমিন কব্জা করেছিল। আর নিয়মানুযায়ী বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রেতা যে সব হস্তক্ষেপ করে তার কারণে বিক্রেতার পণ্য ইত্যাদি ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। যেমন ক্রেতা যদি পণ্যটি অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলে তাহলে বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যায়। এরূপভাবে ক্রেতার ক্রয়কৃত জমিনের মধ্যে ইমারত নির্মাণ এবং বৃক্ষ রোপণের দ্বারা বিক্রেতার জমিন ফেরত চাওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

তবে ক্রেতার ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা শফীর হক বাতিল হবে না। যদিও শফীর হক বিক্রেতার হকের চেয়ে দুর্বল। এর কারণ হলো– শফীর পক্ষ থেকে ক্রেতা কোনো ক্ষমতা লাভ করে ঘর নির্মাণ করেনি। যেহেতু শফীর পক্ষ থেকে ক্রেতা কোনো ক্ষমতা-অনুমতি লাভ করেনি তাই ক্রেতার ক্রয়কৃত জমিনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার দ্বারা শফীর অধিকার বিনষ্ট হবে না। শফীর হক বাতিল না হওয়ার কারণে ক্রেতার নির্মিত ইমারত ও রোপিত বৃক্ষ অপসারণ করে শফীকে তার হক প্রদান করা হবে। যেহেতু ক্রেতার হস্তক্ষেপের দ্বারা শফীর হক বাতিল হয় না, তাই যদি ক্রেতা জমিন কারো কাছে বিক্রি করে দেয় কিংবা কাউকে দান করে সোর্পদ করে দেয়, তবুও শফীর হক বাতিল হবে না। বরং ক্রেতা দান করে থাকলে দানকৃত জমিনটি গ্রহীতার হাত থেকে গ্রহণ করত শফীর হাতে ফিরিয়ে দিবে। তদ্রূপ যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে বিক্রীত জমিনটি দ্বিতীয় ক্রেতার হাত থেকে গ্রহণ করে শফীকে ফিরিয়ে দিবে। মোটকথা, যেমনিভাবে দান ও বিক্রি করার দ্বারা শফীর অধিকার বাতিল হয় না, তেমনি ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণের দ্বারা শফীর হক বাতিল হবে না।

লেখক মূল পাঠে বর্ণিত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সন্দেহের ব্যাপারটিকে জোড়ালো করার জন্য আবার বলছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন যে, অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য- "ক্রেতার ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণের দ্বারা বিক্রেতার ফেরত চাওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং ক্রেতার উপর বিক্রীত জমিনের বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক হয়" তিনি শুনেছেন কিনা এ ব্যাপারেও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর কাছে এটা বর্ণনা করেছেন কিনা তা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ রয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাব যে এটাই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মাযহাব এই যে, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো জমিন খরিদ করে এতে ইমারত নির্মাণ করে কিংবা এতে বৃক্ষরোপণ করে তাহলে বিক্রেতার জমিন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। এর দলিল হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুশ শুফআতে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে এমন মাসআলাতে মতবিরোধ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণিত মাসআলাটির মতবিরোধের উৎস হলো এ মাসআলা। শুফআহ অধ্যায়ে বর্ণিত মাসআলাটি এরকম : "যদি কোনো ব্যক্তি ফাসিদ বিক্রর মাধ্যমে জামিন ক্রয় করে এতে কোনো ভবন নির্মাণ করে কিংবা বৃক্ষরোপণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এতে শফীর শুফআর হক অবশ্যই প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ শফীয়ের এই অধিকার রয়েছে যে, বিচারকের রায়ের মাধ্যমে উক্ত জামিন আদায় করবে, আর এ অবস্থায় ক্রেতার উপর আবশ্যক হলো, সে উক্ত জমিন তার ভবন ভেঙ্গে ও বৃক্ষ উৎপাটন করে শফীয়ের হাতে অর্পণ করতে হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) -এর মতে এ অবস্থায় শফী' তার শুফআর অধিকার লাভ করবে না। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) -এর এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো এই যে, ক্রেতা কর্তৃক ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত জমিনে ইমারত নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ করার দ্বারা বিক্রেতার জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শফীর শুফআর হক এমতাবস্থায় নিশ্চিত বহাল থাকবে, কিন্তু বিক্রেতার বিক্রীত পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে না। কেননা বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার ও শফীর শুফআর অধিকার– এ দু'য়ের মাঝে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে। বিক্রেতার হক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে ক্রেতার উপর জমিনের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে– ধার্যমূল্য নয়। কারণ, ফাসিদ বিক্রয়ের অবস্থায় ক্রেতার উপর বাজারমূল্য আবশ্যক হয়, ধার্যমূল্য নয়। মোটকথা, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হলো ক্রেতা যদি জমিনে ইমারত নির্মাণ কিংবা বৃক্ষরোপণ করে তাহলে বিক্রেতার জমিন ফেরত নেওয়ার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর ক্রেতার উপর জমিনের বাজারমূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে।

সাহেবাইন (র.) -এর মতে উপরিউক্ত অবস্থায় যেহেতু শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয় না। তাই বিক্রেতার হক বাতিল হবে না। বিক্রেতার ফিরিয়ে নেওয়া অধিকার বাতিল না হওয়ার কারণে ক্রেতার উপর ইমারত ভেঙ্গে ও বৃক্ষের মূলোৎপাটন করে জমিন ফেরত দেওয়া আবশ্যক।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَا فَبَاعَهَا وَ رَبِحَ فِيْهَا تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ، وَيَطِيْبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِى الثَّمَنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجَارِيَةَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ، فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهَا، فَيَتَمَكَّنُ الْخُبْثُ فِى الرِّبْحِ، وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ لَا تَتَعَيَّنَانِ فِى الْعُقُوْدِ، فَلَمْ يَتَعَلَّقِ الْعَقْدُ الثَّانِى بِعَيْنِهَا، فَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْخُبْثُ، فَلَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ، وَهٰذَا فِى الْخُبْثِ الَّذِىْ سَبَبُهُ فَسَادُ الْمِلْكِ اَمَّا الْخُبْثُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمُحَمَّدٍ يَشْمُلُ النَّوْعَيْنِ، لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ فِيْمَا يَتَعَيَّنُ حَقِيْقَةً وَفِيْمَا لَا يَتَعَيَّنُ شُبْهَةً مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ سَلَامَةُ الْمَبِيْعِ اَوْ تَقْدِيْرُ الثَّمَنِ، وَعِنْدَ فَسَادِ الْمِلْكِ يَنْقَلِبُ الْحَقِيْقَةُ شُبْهَةً، وَالشُّبْهَةُ تَنْزِلُ اِلٰى شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ، وَالشُّبْهَةُ هِىَ الْمُعْتَبَرَةُ دُوْنَ النَّازِلِ عَنْهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসী ক্রয় করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে [নিজ নিজ প্রাপ্য তথা পণ্য ও মূল্য] কব্জা করে অতঃপর সে দাসীটি বিক্রি করে এবং এতে মুনাফা লাভ করে তাহলে মুনাফা সদকা করে দিবে। পক্ষান্তরে প্রথম বিক্রেতার [দাসীর] মূল্যতে যে মুনাফা হয় তা বিক্রেতার জন্য বৈধ হবে। এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, বিক্রয় চুক্তির দ্বারা দাসী নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাই চুক্তির সম্পর্ক তার সাথেই হবে। ফলে মুনাফার মধ্যে অবৈধতা স্থির হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দিরহাম, দিনার [ও টাকা] চুক্তিগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় না। আর তাই দ্বিতীয় চুক্তি সরাসরি মুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হয়নি। সুতরাং অবৈধতা স্থির হতে পারেনি। তাই মুনাফা সদকা করা ওয়াজিব নয়। এ বিধান সেসব অবৈধতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার সবব বা মূল কারণ হলো মালিকানার ফাসাদ। আর যে অবৈধতা মালিকানা না থাকার কারণে হয় তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, যে বস্তু নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় প্রকৃত অবৈধতার ভিত্তিতে, আর যা নির্দিষ্ট হয় না [যথা দিরহাম মুদ্রা ইত্যাদি] তার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয় সন্দেহপূর্ণ অবৈধতার ভিত্তিতে; এভাবে যে, এর সাথে বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার বিষয় জড়িত থাকে কিংবা এর দ্বারা মূল্য নিরূপিত হয়। মালিকানা ফাসিদ হয়ে গেলে প্রকৃত অবৈধতার ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রবিষ্ট হয়। আর অবৈধতার সন্দেহ পর্যায়ে নেমে আসে। অথচ অবৈধতার সন্দেহ তো গ্রহণযোগ্য, এর নিম্নস্তরের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীর কিতাবে উপরিউক্ত মাসআলাটি আলোচনা করেন। মূল মাসআলা আলোচনার পূর্বে আমাদের অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, সব মাল [নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে] দু' প্রকার–

১. যেসব মাল চুক্তিতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, যেমন– স্বর্ণ, রূপা, তদীয় মুদ্রা ও যে কোনো মুদ্রা।

২. যেসব মাল নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন উপরিউক্ত স্বর্ণ, রূপা ও মুদ্রা ছাড়া সব কিছু।

আমাদের এটাও জানা দরকার যে, অবৈধতা দু' প্রকার–

১. মালিকানা ফাসিদ হওয়ার কারণে যে অবৈধতা হয়,

২. মালিকানা না থাকার যে অবৈধতা হয়।

প্রথম প্রকারের ফাসাদ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হয় এমন বস্তুর মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয় প্রকার ফাসাদ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় প্রকারের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

ইবারতের মাসআলার প্রকৃতি এই যে, কেউ যদি ফাসিদ বিক্রির মাধ্যমে এক ক্রীতদাসী ক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে দাসী ও তার মূল্য কব্জা করে। অর্থাৎ ক্রেতা দাসীটি বিক্রেতা থেকে বুঝে নিজের দখলে নিয়ে যায়, আর বিক্রেতা তার মূল্য ক্রেতা থেকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসে। এরপর যদি ক্রেতা উক্ত দাসী বিক্রয় করে কিছু মুনাফা অর্জন করে তাহলে তার জন্য উক্ত মুনাফা সদকা করে দেওয়া আবশ্যক, পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি দাসীর মূল্য দ্বারা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তার দ্বারা ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে তাহলে তার উক্ত মুনাফা তার জন্য হালাল ও বৈধ হবে এবং তা সদকা করা আবশ্যক হবে না।

উল্লিখিত দু'টি অবস্থায় যে পার্থক্য রয়েছে সে পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে বলেন, দাসী এমন জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যেহেতু দাসী সুনির্দিষ্ট তাই দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটির সম্পর্ক হবে দাসীর সত্তার সাথে। দাসীটি ফাসিদ বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ করার কারণে ক্রেতার মালিকানা ফাসিদ ছিল। ফলে ক্রেতা উক্ত দাসী বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা ফাসিদ মালিকানার মাধ্যমে অর্জন করেছে। আর যে মুনাফা ফাসিদ মালিকানা থেকে অর্জিত হয় তাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হয়ে যায়। আর যে বস্তুর মাঝে অবৈধতা ও হারাম পাওয়া যায় সে বস্তু সদকা করা আবশ্যক হয় এবং তা ব্যবহার করা বা তার দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হওয়া যায় না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা দাসী বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না এবং মুনাফা সদকা করে দেওয়া ক্রেতার উপর আবশ্যক হবে। পক্ষান্তরে দিরহাম, দিনার, টাকা ও অন্যান্য মুদ্রা আমাদের মতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। [অবশ্য ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।] বিক্রেতা ক্রেতার থেকে দাসীর মূল্য বাবদ যে মুদ্রা লাভ করেছে তা যেহেতু নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না সেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয়ের সম্পর্ক উক্ত মুদ্রার সত্তার সাথে হবে না। অর্থাৎ বিক্রেতা যদি উক্ত মুদ্রা দ্বারা কোনো দ্রব্য খরিদ করে যা সে ক্রেতার থেকে দাসীর মূল্য বাবদ লাভ করেছিল তাহলে তার এই [দ্বিতীয়] ক্রয় মুদ্রাগুলোর সত্তার সাথে সম্পর্কিত হবে না। কারণ, মুদ্রা নির্ধারিত করলেও নির্ধারিত হয় না। সুতরাং ক্রেতার থেকে অর্জিত মুদ্রা দ্বারাই যে উক্ত খরিদ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। অতএব যখন দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক মুদ্রাগুলোর সাথে সত্তাগতভাবে হয় না, তখন এই বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছে তাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হবে না। যখন এই মুনাফাতে হারাম ও অবৈধতা স্থিত হয়নি তাই তার এ মুনাফা তার জন্য বৈধ হবে এবং মুনাফা সদকা করা আবশ্যক হবে না।

লেখক বলেন, উক্ত বিধান অর্থাৎ مَا يَتَعَيَّنُ ও مَا لَا يَتَعَيَّنُ -এর সাথে যে পার্থক্য তার সবব বা হেতু হচ্ছে ফাসিদ মালিকানা অর্থাৎ যদি ফাসিদ মালিকানার কারণে "নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু" এর মধ্যে অবৈধতা ও হারাম সৃষ্টি হয় তাহলে তা উপার্জনকারীর জন্য হালাল নয়, বরং তা সদকা করে দেওয়া আবশ্যক। আর যদি ফাসিদ মালিকানার কারণে "নির্দিষ্ট করা যায় না এমন বস্তু" এর মাঝে অবৈধতা ও হারাম সৃষ্টি হয় তাহলে তা উপার্জনকারীর জন্য বৈধ হবে এবং তা সদকা করে দেওয়া আবশ্যক নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা উপরে করা হয়েছে।

কিন্তু যদি মুনাফার মধ্যে অবৈধতা আসে মালিকানা না থাকার কারণে যেমন কেউ একটি দাসী অপহরণ করে নিয়ে আসল, তারপর তা বিক্রি করে প্রকৃত মালিকের ক্ষতিপূরণ আদায় করল। ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর দেখা গেল অপহরণকারীর কিছু মুনাফা [অতিরিক্ত] হয়েছে, অথবা কেউ অন্যের কাছ থেকে স্বর্ণ বা রূপা ছিনতাই করে, তার বিনিময়ে কোনো দ্রব্য ক্রয় করতঃ তা বিক্রি করে মালিকের ক্ষতিপূরণ শোধ করল, কিন্তু তারপরেও তার কাছে কিছু মুনাফা রয়ে গেল, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ

হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ের মতে নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু এবং নির্দিষ্ট করা যায় না এমন বস্তু উভয়ের দ্বারা অর্জিত মুনাফাই সদকা করতে হবে এবং উপার্জনকারীর জন্য তা বৈধ হবে না। কেননা, মালিকানাহীনতার অবস্থায় যে ফাসাদ সৃষ্টি হয় তা উভয়কে প্রভাবান্বিত করে এবং উভয়ের মুনাফা অবৈধ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মালিকানাহীনতার মুনাফা [উদাহরণস্বরূপ] অপহরণকারীর জন্য হালাল ও বৈধ। তার মতে অপহরণকারী যখন ক্ষতিপূরণ মালিককে প্রদান করল তখন সে পণ্যটির মালিক হয়ে গেল। অতএব সে তার মালিকানাধীন দ্রব্য দ্বারা মুনাফা অর্জন করল, আর মালিকানাধীন দ্রব্যের মুনাফা মালিকের জন্য নিঃসন্দেহে বৈধ, কাজেই তা সদকা করা আবশ্যক নয়।

তারফাইন (র.) তাদের মতের পক্ষে দলিল পেশ করেন এই বলে যে, "নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তু" এর ক্ষেত্রে চুক্তি প্রকৃতভাবে সম্পৃক্ত হয়। অর্থাৎ যখন দাসীটি অপহরণ করে বিক্রি করা হয়, তখন বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক এর সাথে হবে সরাসরি; কেননা, বিক্রেতার জন্য এই দাসী স্থলে অন্য দাসী অর্পণ করা বৈধ নয়। এই দাসীটিই ক্রেতার হাতে সোর্পদ করতে হবে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি প্রকৃতই দাসীর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তাই এতে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা প্রকৃত অবৈধতা ও হারাম মিশ্রিত হবে। যেহেতু প্রকৃত অবৈধতা হালাল নয় তাই অবৈধ মুনাফাকে সদকা করে দিতে হবে। আর যে সব দ্রব্য নির্দিষ্ট করা যায় না- তার সাথে বিক্রয়চুক্তির সম্পর্ক হয়ে থাকে সন্দেহ যুক্ত। অর্থাৎ যখন ছিনতাইকারী মুদ্রা ছিনতাই করে অতঃপর উক্ত মুদ্রা দ্বারা কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তার এই ক্রয়চুক্তির সাথে মুদ্রার সম্পর্ক হবে সন্দেহের সাথে। কেননা ছিনতাইকৃত মুদ্রার দ্বারা যখন কোনো দ্রব্য কেনা হয় তাতে দু'টি অবস্থা হতে পারে–

১. হয়তো সেই দিরহামগুলোর প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছে।

২. অথবা ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। অথবা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু ইশারাকৃত মুদ্রাগুলো থেকে আদায় না করে অন্য মুদ্রা আদায় করা হয়েছে।

প্রথম অবস্থায় ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে বিক্রীত-পণ্য সংরক্ষিত থাকার বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত। কেননা যখন ছিনতাইকৃত মুদ্রাগুলো মূল্যরূপে নির্ধারিত হলো তখন এর জন্যই ছিনতাইকারীর উদ্দেশ্যে বিক্রীত-পণ্য সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে যখন ছিনতাইকৃত মুদ্রা বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার সবব বা মূল হেতু বলে গণ্য হয়, তখন মুদ্রার সাথে যদিও প্রকৃত বিক্রয়চুক্তি সম্পৃক্ত হবে না [কেননা মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না] কিন্তু যেহেতু মুদ্রা বিক্রীত পণ্য সংরক্ষিত থাকার মাধ্যম হয়, তাই এর সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে শুবহা বা সন্দেহের ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে মূল্য নির্ধারণ এর বিষয়টি সম্পৃক্ত হবে। অর্থাৎ যদিও ছিনতাইকৃত মুদ্রা মূল্যরূপে আদায় করা হয় তবুও এগুলোর সাহায্যে মূল্য কত হবে তা নির্ধারিত করা হয়। কেননা মূল্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও গুণাগুণ বর্ণনা করা আবশ্যক। আর এসবই ছিনতাইকৃত মুদ্রার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে চুক্তির সম্পর্ক প্রকৃতভাবে না হলেও সন্দেহপূর্ণভাবে অবশ্যই হয়। সারকথা এই দাঁড়াল যে, ছিনতাইকৃত মুদ্রার সাথে বিক্রয় চুক্তির সম্পর্ক সন্দেহপূর্ণভাবে অবশ্যই রয়েছে। যেহেতু চুক্তির সাথে এর সম্পর্ক হয় সন্দেহপূর্ণ, সেহেতু উক্ত চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাতে সন্দেহপূর্ণভাবে অবৈধতাও আসবে। যেহেতু প্রকৃত অবৈধতা ও সন্দেহপূর্ণ অবৈধতা উভয়ই হারাম, তাই উভয় মুনাফাকে সদকা করা আবশ্যক হবে। এ দু'য়ের অবৈধতার প্রমাণ হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ এর বাণী أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ সুদও সন্দেহপূর্ণ সুদের কারবার নিষিদ্ধ করেছেন।

পক্ষান্তরে মালিকানা ফাসিদ হওয়ার অবস্থায় মুনাফা যেহেতু অন্যের মাল থেকে অর্জিত হয় না; বরং নিজের মাল থেকে হয় [যদিও সে মালিকানা ফাসিদ], তাই মালিকানা ফাসিদ হলে প্রকৃত অবৈধতা পরিবর্তন হয়ে সন্দেহপূর্ণ অবৈধতায় পরিণত হয়, আর সন্দেহপূর্ণ ফাসাদ পরিবর্তন হয়ে দ্বিগুণ সন্দেহে পরিণত হয়। ফলে ফাসিদ মালিকানার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা যায় এমন বস্তুতে সন্দেহপূর্ণ অবৈধতা হয়, আর যা নির্দিষ্ট করা যায় না তাতে দ্বিগুণ সন্দেহ পূর্ণ অবৈধতা যুক্ত হয়। শরিয়তে যেহেতু একটি সন্দেহ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, দ্বিগুণ সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়, তাই ফাসিদ মালিকানার ক্ষেত্রে مَا يَتَعَيَّنُ -এর মাঝে যে মুনাফা হয় তা সদকা করতে হবে। কারণ, এটা এক সন্দেহযুক্ত অবৈধতা। আর مَا لَا يَتَعَيَّنُ -এর দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয় তা সদকা করা আবশ্যক নয়, কারণ এটি দ্বিগুণ সন্দেহযুক্ত হয়েছে [যার কারণে শরিয়তে কোনো দ্রব্য হারাম হয় না]।

قَالَ : وَكَذَا إِذَا ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ مَالاً فَقَضَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُدَّعِيْ فِي الدَّرَاهِمِ يَطِيْبُ لَهُ الرِّبْحُ لِأَنَّ الْخُبْثَ لِفَسَادِ الْمِلْكِ هٰهُنَا، لِأَنَّ الدَّيْنَ وَجَبَ بِالتَّسْمِيَةِ، ثُمَّ اسْتُحِقَّ بِالتَّصَادُقِ، وَبَدَلُ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوْكٌ فَلَا يَعْمَلُ فِيْمَا لَا يَتَعَيَّنُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এমনিভাবে যখন কেউ অপরের বিরুদ্ধে মাল পাওয়ার দাবি করে, অতঃপর বিবাদী দাবিদারের [দাবিকৃত] মাল পরিশোধ করে। তারপর তারা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যে, বিবাদীর উপর কোনো মাল পাওনা ছিল না। আর ইতোমধ্যে মালের দাবিদার মুদ্রাগুলোর দ্বারা মুনাফা অর্জন করে নেয়, তাহলে তার জন্য এ মুনাফা বৈধ বিবেচিত হবে। কেননা, এখানে ফাসাদ ছিল ফাসিদ মালিকানার জন্যে। কারণ একজন দাবিদারের পাওনা দাবি করার কারণে ঋণ ওয়াজিব হয়েছে। তারপর পরস্পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেই ঋণের হকদার সাব্যস্ত হয়েছে। আর হকদার স্বীকৃত ঋণের বদলে প্রদত্ত মাল মালিকানাধীন হয়ে থাকে। অতএব অপবিত্রতা এই প্রদেয় মুদ্রাগুলো, যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না- এর মাঝে কোনো প্রভাব ফেলবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَا إِذَا ادَّعٰى عَلٰى اٰخَرَ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে আল-জামিউস সাগীর থেকে চয়নকৃত পূর্ববর্তী মাসআলার সংশ্লিষ্ট আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরতে মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে পাওনা দাবি করল যে, তোমার কাছে আমি এতটাকা [দশ হাজার টাকা] পাব, সুতরাং তুমি উক্ত টাকা শোধ কর। সেমতে যার কাছে দাবি করা হয়েছে সে উক্ত দাবিকৃত [দশ হাজার] টাকা শোধ করল। সে টাকা দাবিদারের কাছে দীর্ঘদিন ছিল। দাবিদার উক্ত টাকার মাধ্যমে কিছু মুনাফাও অর্জন করল। এরপর একসময় তারা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছে যে, মূলত দাবিদার কোনো টাকাই পেত না। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা থেকে অর্জিত মুনাফার কি হুকুম? এর উত্তর হলো মুনাফা দাবিদারের জন্য বৈধ সাব্যস্ত হবে।

এর কারণ এই যে, এখানে মুনাফাতে যে অপবিত্রতা ও ফাসাদ এসেছে তা ফাসিদ মালিকানার কারণে। ফাসিদ মালিকানার কারণ হলো, দাবিদার যখন দশ হাজার টাকার পাওনা দাবি করল আর প্রতিপক্ষ তা স্বীকার করে নিল তখন দশ হাজার টাকা ঋণ সাব্যস্ত হয়ে গেল। শরিয়তের পরিভাষায় ঋণ (دَيْن) বলা হয় مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ -কে। এরপর যখন স্বীকৃত ঋণের বদলে দাবিদারকে দশ হাজার টাকা প্রদান করা হলো এবং দাবিদার তা কব্জা করল তখন এই দশ হাজার টাকা ঋণের বদল সাব্যস্ত হলো, স্বয়ং ঋণ নয়। কারণ ঋণ কোনো মালই নয়, বরং ঋণ তো হলো একটি হক, যে হকটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাঁধে আপতিত হয়। এরপর যখন দাবিদার ও বিবাদী এ ব্যাপারে ঐকমত্য হলো যে, মূলত দাবিদার কিছুই পেত না, তখন উক্ত ঋণের হকদার সাব্যস্ত হলো। অর্থাৎ ঋণ এমন হয়ে গেল যে, একজন হকদার রয়েছে, যে তার হক দাবি করছে। ঋণের হকদার বের হওয়ার কারণে এর বদলে দাবিদারের মালিকানা ফাসিদ হয়ে গেল। আর এজন্য দাবিদারকে উক্ত ঋণের বদল তথা দশ হাজার ফেরত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

এর উদাহরণ এরূপ যে, কেউ একটি দাসী ক্রয় করল দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। অতঃপর উক্ত দাসীর একজন হকদার বের হলো। এমতাবস্থায় দশ হাজার টাকা [যা ক্রেতা থেকে লাভ করেছিল] বিক্রেতার মালিকানাধীন হবে। তবে তা ক্রেতাকে ফেরত

দিতে হবে হকদার বের হওয়ার কারণে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় দশ হাজার টাকা [ঋণের বদলে প্রদত্ত] এর হকদার বের হওয়ার পর তা দাবিদারের মালিকানাধীন বটে, তবে তা ফাসিদ মালিকানার ভিত্তিতে। আর মালিকানা ফাসিদ হলে এর থেকে যে মুনাফা অর্জিত হয় তাতে অপবিত্রতা থাকে। সুতরাং দাবিদার দশহাজার টাকা থেকে যে মুনাফা লাভ করেছে তাতে অপবিত্রতা রয়েছে। এখানে সে অপবিত্রতা পাওয়া গেছে মুদ্রার মধ্যে, যা নির্ধারণ করলেও নির্ধারণ হয় না। ফলে উক্ত অপবিত্রতা মুদ্রার মধ্যে কার্যকর হবে না। কেননা [পূর্বে বলা হয়েছে] যে, অপবিত্রতা ফাসিদ মালিকানার কারণে হয়ে থাকে তা নির্ধারণ করা যায় না এমন বস্তুর মাঝে কার্যকর হয় না। যেহেতু এখানে অপবিত্রতা কার্যকর নয় তাই দাবিদারের জন্য উক্ত মুনাফা বৈধ এবং তা সদকা করা ওয়াজিব নয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে দাবি করা হয়েছে যে, যার মাঝে হকদার পাওয়া গিয়েছে তার বদল মালিকানাধীন বিবেচিত হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে– কেউ একটি দাস ক্রয় করল দাসীর বিনিময়ে কিংবা কাপড়ের বিনিময়ে। অতএব ক্রেতা দাসটিকে আজাদ করে দিল। এরপর দেখা গেল যে, দাসীটির অথবা কাপড়ের একজন হকদার বের হয়েছে, এতদসত্ত্বেও ক্রেতার দাস আজাদ করা শুদ্ধ হবে। এখানে দাসী কিংবা কাপড়ের বদল হচ্ছে দাস, যদি দাসের মালিকানা নিশ্চিত না হতো তাহলে ক্রেতার আজাদ করা বৈধ হতো না। কেননা, অন্যের মালিকানাধীন দাস আজাদ করা যায় না। মোটকথা, উক্ত উদাহরণে দাস হচ্ছে হকদার পাওয়া যাওয়া দাসীর বদল। আর তার মালিকানা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে কারো মনে এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে যে, بَدَلُ الْمُسْتَحِقِّ -এর মধ্যে মালিকানা ফাসিদ কেন?

এর উত্তর হলো, যখন ঋণের বদলের মধ্যে হকদার পাওয়া গেল তখন তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হয়। অথচ বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হয় না। ফলে এতে মালিকানাহীনতার একটি সন্দেহ এসে যায়। মালিকানাধীন মুদ্রার মাঝে যে মুনাফা হয় তাতে অপবিত্রতার সন্দেহ এসে যায়। আলোচ্য মাসআলায় উসূলকৃত মুদ্রার মাঝে মালিকানাহীনতার সন্দেহ বিদ্যমান। আর মুদ্রার মাঝে যে অপবিত্রতা তা [অনির্ধারিত হওয়ার কারণে] সন্দেহযুক্ত। সুতরাং এখানে সন্দেহ হলো দু'টো। এক মালিকানাহীনতার, দ্বিতীয় হলো মুদ্রাজনিত কারণে, দুই সন্দেহ শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য উক্ত মুনাফা দাবিদারের জন্য বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলার বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন দাবিদার তার ধারণা মতে মালিকানার পরিবর্তে দিরহাম বা দিনার ইত্যাদি গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে ঋণ দাবি করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে সে সেই মুদ্রাগুলোর মালিক হবে না। কেননা, তার মালিকানা থাকার বিষয়টি এখানে নিশ্চিত। মালিকানা না থাকলে মুনাফা গ্রহণও বৈধ হবে না।

فَصْلٌ فِيْمَا يُكْرَهُ

قَالَ : وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ اَنْ يَّزِيْدَ فِى الثَّمَنِ وَلَا يُرِيْدُ الشِّرَاءَ لِيُرَغِّبَ غَيْرَهٗ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَنَاجَشُوْا، قَالَ : وَعَنِ السَّوْمِ عَلٰى سَوْمِ غَيْرِهٖ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ، وَلِاَنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِيْحَاشًا وَاِضْرَارًا، وَهٰذَا اِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ عَلٰى مَبْلَغِ ثَمَنٍ فِى الْمُسَاوَمَةِ اَمَّا اِذَا لَمْ يَرْكَنْ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاٰخَرِ فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيْدُ، وَلَا بَأْسَ بِهٖ عَلٰى مَا نَذْكُرُهٗ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مَحْمَلُ النَّهْىِ فِى النِّكَاحِ اَيْضًا .

অনুচ্ছেদ : মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজাশ থেকে নিষেধ করেছেন। নাজাশ হলো ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে মূল্য বাড়িয়ে বলা। মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা মূল্য বাড়িয়ে ধোঁকা দিও না। তিনি বলেন, এবং [রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন] দরের উপর দর করাকে। রাসূল ﷺ বলেন, কেউ যেন তার [মুসলমান] ভাইয়ের দাম বলার উপর দাম না করে, আর তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তাছাড়া এটা অন্যের মনোকষ্টেরও ক্ষতির কারণ। অবশ্য এই মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা দরদামের ক্ষেত্রে মূল্যের নির্ধারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। আর যদি একজন অপরজনের [প্রস্তাবের] প্রতি ঝুঁকে না যায় তাহলে তো সেটা নিলাম বিক্রি [অর্থাৎ সর্বোচ্চ দাতার কাছে বিক্রি করা]। আর এ জাতীয় বিক্রয়ে কোনো সমস্যা নেই যা আমরা পরে আলোচনা করব। আর আমরা হাদীসের যে নিষিদ্ধতার ক্ষেত্র উল্লেখ করলাম, বিবাহের প্রস্তাবের নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রও সেটাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصْلٌ فِيْمَا يُكْرَهُ : এ অনুচ্ছেদে এমন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ। মাকরূহ বিক্রয় ফাসিদ বিক্রয়ের চেয়ে নিম্নস্তরের। তবে এটি ফাসিদের একটি শাখা। এজন্য ফাসিদের পরিচ্ছেদে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ফাসিদের পরপরেই এর আলোচনা আনা হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, মাকরূহ বিক্রয়ের স্তর শরিয়তের বিধানের বিবেচনায় সবসময় ফাসিদ বিক্রয়ের চেয়ে নিম্নস্তরের নয়। কারণ মাকরূহ এর অর্থ এখানে মাকরূহে তাহরীমী। ফাসিদ বিক্রয়গুলোর বিধানও তাই। সুতরাং মাকরূহ বিক্রয় ফাসিদ না হওয়ার বিবেচনায় ফাসিদের চেয়ে নিম্নস্তরের। ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতি সম্বলিত গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি অবৈধতা পারিপার্শ্বিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে এটা মাকরূহ। আর যে অবৈধতা সংশ্লিষ্ট গুণের কারণে হয়ে থাকে সেটা ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্গত। এ বক্তব্য দ্বারাও ফাসিদ ও মাকরূহ বিক্রয়ের পার্থক্য ও পরস্পর সম্পর্ক অনুমিত হয়। উল্লেখ্য যে, মাকরূহ দু'ধরনের, মাকরূহে তাহরীমি ও মাকরূহে তানযিহী।

قَوْلُهُ قَالَ : وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নাজাশ সংশ্লিষ্ট বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছেন। نَجْشٌ শব্দের অর্থ হলো, বিক্রেয়পণ্যের প্রশংসার মাধ্যমে বিক্রেতার অনুকূলে অবস্থান নেওয়া। অথবা বিক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রেতার দালালি করা। ইবারতে লেখক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি দু'টি হাদীস, আর ইমাম কুদূরী আরো দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। নাজাশ বা উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ক্রেতাকে প্রতারিত করে দাম বাড়ানো শরিয়তে নিষিদ্ধ। কারণ প্রতারণা একটি মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজ। নিকৃষ্ট কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বিক্রয়চুক্তিটি মাকরূহ হয়। তাছাড়া হাদীসের নিষেধের ক্ষেত্র হলো যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, এমনি মুহূর্তে মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে একজন মুসলমানকে প্রতারিত করা অন্যায় ও জুলুম। আর জুলুম করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। উক্ত গর্হিত কাজ বিক্রয়চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে বিক্রয়টি মাকরূহ হয়।

তবে যদি মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে নির্ধারিত না হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের দাম বাড়ানো বৈধ। কেননা, এতে একজন মুসলমানের পক্ষে উকালতি করার মাধ্যমে তার উপকার করা হচ্ছে, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করা হচ্ছে না। কেননা, এখানে ক্রেতার তখনো বাজার মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার অধিকার রয়েছে।

উপরিউক্ত নাজাশ নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস- نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ
অর্থাৎ রাসূল ﷺ ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দাম বাড়ানোকে নিষিদ্ধ করেছেন। সনদসহ হাদীসটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

رَوَى الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ .

হাদীসটি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে। নিষিদ্ধতা প্রমাণে লেখক আরেকটি হাদীস পেশ করেন,
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَنَاجَشُوْا এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমের সনদসহ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مُسَيَّبٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

এ হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে, আমাদের আলোচ্য وَلَا تَنَاجَشُوْا শব্দটি হাদীসটিতে বিদ্যমান। যার অর্থ হলো তোমরা মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পরস্পরকে প্রতারিত করো না।

ইমাম কুদূরী (র.)-এর পেশকৃত দ্বিতীয় হাদীসটি এই- نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ
অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির দরদামের উপর অযাচিতভাবে অপরের দরদাম করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। হাদীসটির বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে নিম্নোক্ত শব্দে রয়েছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক মুসলমান ভাইয়ের দরদামের উপর অন্য মুসলমানকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন। একই প্রসঙ্গে লেখক দ্বিতীয় হাদীস পেশ করেছেন- قَالَ ﷺ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ
লেখক উদ্ধৃত এই হাদীসটি ও ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

হাদীসের শেষাংশে রয়েছে- اَنْ يَّسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ

এই হাদীসটি কিতাবুল আসারে এভাবে রয়েছে-

رَوٰى مُحَمَّدٌ (رحـ) قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ .

হাদীসের لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ সুরত এই যে, [ত্বাহাবীর বর্ণনানুযায়ী] ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি দ্রব্য একটি মূল্যে বিক্রয় করার ব্যাপারে একমত হলো, অর্থাৎ বিক্রেতা বিক্রয় করার আর ক্রেতা ক্রয় করার ব্যাপারে সম্মত হলো। এরপর এক ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বলল, আমি এই দ্রব্যটি এর চেয়ে কম মূল্যে তোমার কাছে বিক্রয় করব অথবা সে বিক্রেতাকে বলল, আমি এই দ্রব্যটি এর চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করব। প্রথম অবস্থায় বিক্রেতার আর দ্বিতীয় অবস্থায় ক্রেতার ক্ষতি হচ্ছে। মোটকথা, এক ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দানের দ্বারা ক্রেতা অথবা বিক্রেতা যে কোনো একজনের ক্ষতি হচ্ছে এবং তাদের মনে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, আমরা পূর্বে বলেছি যে, কারো মনে কষ্ট দেওয়া কিংবা আর্থিক ক্ষতি করা গর্হিত কাজ। কিন্তু যেহেতু কাজটি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কাজ; তাই এ বিক্রয় মাকরূহ হবে।

লেখক বলেন, اَمَّا اِذَا لَمْ يَرْكَنْ الخ অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসগুলোর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র হলো তখন, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং পরস্পর বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় কেউ যদি এসে নতুন প্রস্তাব করে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। অন্যথায় যদি একে অনের প্রতি ঝুঁকে না যায় অর্থাৎ সম্মতি প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত না করে তাহলে এটা নিষিদ্ধ নয়। বরং এটা নিলাম বিক্রির মতো হয়ে যাবে, যাতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ ধরনের বিক্রির নজির রাসূলের জীবনেও পাওয়া যায়। যেমন হযরত আনাস (র.)-এর হাদীস-

عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ .

অর্থাৎ রাসূল ﷺ একটি পেয়ালা এবং একটি চটের বস্তা নিলামে বিক্রি করেন। এবং যে ব্যক্তি সর্বোচ্চ দাম বলে তাকে উক্ত পণ্যদ্বয় প্রদান করেন।

আর বিবাহের প্রস্তাব সংক্রান্তও হাদীস (لَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ)-এর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র তাই। অর্থাৎ একজন প্রস্তাব দেওয়ার পর অপরজন সম্মত হয়ে গেলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। আর যদি কোনো পক্ষ প্রস্তাবে সাড়া না দেয়, বরং প্রস্তাব বিবেচনাধীন থাকে তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। সারকথা হলো, অন্যের মনোকষ্টের কারণ হতে পারে এমতাবস্থায় দরদাম করা ও বিবাহের পয়গাম দেওয়া মাকরূহ।

قَالَ : وَعَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ، وَهٰذَا اِذَا كَانَ يَضُرُّ بِاَهْلِ الْبَلَدِ، فَاِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهٖ، اِلَّا اِذَا لَبَّسَ السِّعْرَ عَلَى الْوَارِدِيْنَ، فَحِيْنَئِذٍ يُكْرَهُ، لِمَا فِيْهِ مِنَ الْغُرُوْرِ وَالضَّرَرِ . قَالَ : وَعَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ، فَقَدْ قَالَ لَا يَبِيْعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِىْ، وَهٰذَا اِذَا كَانَ اَهْلُ الْبَلْدَةِ فِىْ قَحْطٍ وَعَوَزٍ، وَهُوَ يَبِيْعُ مِنْ اَهْلِ الْبَدْوِ طَمْعًا فِى الثَّمَنِ الْغَالِىْ، لِمَا فِيْهِ مِنَ الْاِضْرَارِ بِهِمْ، اَمَّا اِذَا لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ لَا بَأْسَ بِهٖ لِانْعِدَامِ الضَّرَرِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন শহর [হাট-বাজার] এর বাইরে গিয়ে শহরের দিকে আগত পণ্য অগ্রসর হয়ে কিনতে। এ নির্দেশ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন এর ফলে শহরবাসীদের ক্ষতি হয়। এর দ্বারা যদি শহরবাসীর ক্ষতি না হয় তাহলে এমন করাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যখন আগত ব্যাপারীদের কাছে প্রকৃত বাজার মূল্য অজ্ঞাত রাখা হয়। এমন করা হলে মাকরূহ হবে। কেননা, এতে ধোঁকা ও ক্ষতি রয়েছে। তিনি বলেন, আর [রাসূল ﷺ] নিষেধ করেছেন, গ্রাম্য লোকের কাছে [বেছে বেছে] শহুরের বিক্রি করাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন, শহুরে লোকেরা যেন [বেছে বেছে] গ্রাম্য লোকের কাছে বিক্রি না করে [অথবা বলেছেন, শহুরে লোকেরা যেন গ্রাম্য ব্যক্তিদের হয়ে বিক্রি না করে] এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন শহরবাসীরা অভাব-অনটনে ও মুখাপেক্ষী থাকে। অথচ শহুরে বিক্রেতা উচ্চমূল্য পাওয়ার লোভে গ্রাম্য লোকের কাছে বিক্রি করে। [এটা অবৈধ] কেননা, এতে শহরবাসীদের ক্ষতি করা হয়। আর যদি এমন না হয় তাহলে ক্ষতি না থাকার কারণে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَعَنْ تَلَقِّى الْجَلَبِ الخ : মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়ের আরেকটি প্রকার হলো تَلَقِّى الْجَلَبِ-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে–

১. শহরবাসীরা খাদ্যাভাবে রয়েছে। এমতাবস্থায় শহরের কতিপয় [অসাধু] ব্যবসায়ী গ্রাম থেকে খাদ্য-শষ্য নিয়ে আগত ব্যবসায়ীদের থেকে মালামাল শহরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ক্রয় করে নেওয়া, যাতে পরবর্তীতে শহরের ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামতো দামে সেগুলো বিক্রি করতে পারে।

২. শহরে খাদ্যাভাব নেই। এমতাবস্থায় কতিপয় ব্যবসায়ী শহরের বাইরে গিয়ে গ্রামের পাইকারদের থেকে যাবতীয় খাদ্যশষ্য কিনে নেওয়া।

৩. গ্রাম্য পাইকারদের থেকে কম মূল্যে মাল ক্রয় করা এবং প্রকৃত মূল্য তাদের অবগত না করানো। অথচ গ্রামের ব্যবসায়ীরা শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত।

৪. গ্রাম্য পাইকারদের থেকে মালামাল কম মূল্যে খরিদ করা, কিন্তু তারা শহরের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবহিত।

উল্লিখিত চার সুরতের মধ্য হতে প্রথম ও তৃতীয় সুরতে বেচা-কেনা মাকরূহ। প্রথম অবস্থায় যেহেতু শহরের লোকজন খাদ্যাভাবে ভুগছে। ব্যবসায়ীদের এ পদক্ষেপের কারণে তাদের দুর্দশা আরো ঘনীভূত হয়েছে। কাউকে সমস্যায় ফেলা গর্হিত কাজ। তবে এই গর্হিত কাজটি বিক্রয় চুক্তির মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উক্ত গর্হিত কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে

চুক্তিটি মাকরূহ। তৃতীয় অবস্থায় যেহেতু আগত পাইকারদের কাছে প্রকৃত মূল্য গোপন করে তাদের প্রতারিত করা হয়, আর প্রতারিত করাও গর্হিত কাজ, তাই উক্ত প্রতারণার কারণে বিক্রয়চুক্তিটি মাকরূহ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় ও ৪র্থ অবস্থায় কোনো সমস্যা না থাকার কারণে মাকরূহ ব্যতিরেকে বৈধ হবে।

মাকরূহ বিক্রয়চুক্তির আরেকটি প্রকার হলো। بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ এ জাতীয় বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কারণ হলো রাসূল ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা। ইত:পূর্বে এ সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যেমন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

হাদীসের بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ -এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে–

প্রথম ব্যাখ্যা : لِبَادٍ -এর لَامٌ এখানে مِنْ -এর অর্থে, এ অবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে, কোনো শহুরে ব্যবসায়ীর কাছে পণ্য রয়েছে। উক্ত পণ্য শহুরে কোনো ক্রেতার কাছে বিক্রি না করে গ্রাম্য লোক দেখে দেখে বিক্রয় করছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি করা। কারণ শহুরে লোকেরা বর্তমান বাজার সম্পর্কে অবগত। তাদের কাছে বেশি মূল্য আদায় করা যাবে না। তাছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ বিধায় তাদের ঠকানো যাবে না। পক্ষান্তরে গ্রামের লোকেরা হয় সাদাসিধে, বাজার মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাই তাদের সহজেই খপ্পরে ফেলা যাবে। এ সুরতে শহুরেদের অবস্থা আবার দু'ধরনের হতে পারে।

১. শহুরে লোকেরা খাদ্যাভাবে ভুগছে এবং তাদের মাঝে অর্থকষ্ট রয়েছে। ফলে তাদের এ ছলচাতুরীর কারণে শহরবাসী দুর্ভোগে পড়বে।

২. শহরবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে এবং খাদ্য সংকটে ভুগছে না।

প্রথমাবস্থায় বিক্রয় মাকরূহ, আর দ্বিতীয় অবস্থায় বিক্রয় মাকরূহ নয়।

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ -**এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা :** لِلْبَادِيْ -এর لَامٌ স্বীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য বা স্বার্থে। পুরো বাক্যের অর্থ এরূপ যে, শহুরে ব্যবসায়ী গ্রাম্য ব্যবসায়ীর উকিল হয়ে কোনো কিছু বিক্রি করা। এর সুরত এই যে, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি খাদ্যশষ্য নিয়ে শহরের বাজারে আসল। বাজারের প্রবেশ মুখে শহুরে এক ব্যবসায়ী তাকে বলল, তুমি তো শহুরে লোকের স্বভাব-প্রকৃতি সর্ম্পকে অবগত নও, তাদের কাছে বিক্রয়ে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। তুমি বরং আমার কাছে তোমার পণ্যগুলো দিয়ে দাও, আর আমি তোমার হয়ে তা বিক্রি করে দেই। এখানেও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যদি এ প্রক্রিয়ায় শহরবাসীরা ঠকে এবং তাদের দুর্দশা বাড়ে তাহলে তা মাকরূহ হবে, আর যদি শুধুমাত্র গ্রাম্যব্যক্তিকে প্রকৃত মূল্য প্রদান উদ্দেশ্য হয় এবং শহরবাসীরা এর দ্বারা না ঠকে তাহলে এটা মাকরূহ হবে না। বরং অপর একজন ব্যক্তিকে উপকার করা হলো। আর যদি গ্রাম্য ব্যক্তির বিক্রি করার দ্বারা তার ঠকা না হয় এবং শহরবাসীরা কিছুটা কম মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারে, তাহলে তা করতে দেওয়া উচিত। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ তোমরা লোকদের তাদের মতো ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা কতকের মাধ্যমে কতকের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এ হাদীসের মতলব এই যে, প্রত্যেককে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দাও।

قَالَ : وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَ ذَرُوا الْبَيْعَ، ثُمَّ فِيْهِ إِخْلَالٌ بِوَاجِبِ السَّعْيِ عَلٰى بَعْضِ الْوُجُوْهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِيْهِ فِيْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ قَالَ : كُلُّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ، لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيْ مَعْنًى خَارِجٍ زَائِدٍ، لَا فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا فِيْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং [রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন] জুমার আযানের সময় বেচা-বিক্রি করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, [যখন জুমার দিন জুমার নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের প্রতি ধাবিত হও] এবং তোমরা বেচা-কেনা বন্ধ কর। তাছাড়া এতে ক্ষেত্র বিশেষে জুমার নামাজে গমন করার ওয়াজিব কর্মে বিঘ্ন ঘটে। এখানে কোন আযান বিবেচ্য তা আমরা কিতাবুস সালাতের [জুমার অধ্যায়ে] বর্ণনা করেছি। তিনি বলেন, এ সব বিক্রি আমাদের বর্ণিত উল্লিখিত কারণে মাকরূহ। তবে এগুলো দ্বারা বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ফাসাদ বহির্গত ও অতিরিক্ত কারণে। ফাসাদ মূল চুক্তিতে নয় এবং বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যেও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ الخ : মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয়ের আরেকটি সুরত হচ্ছে জুমআর আযানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে– إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ অর্থ যখন জুমার নামাজের আযান হয়ে যায় তখন জুমার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট গমন কর এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। আয়াতে মোট দু'টি নির্দেশ রয়েছে–

১. বেচা-কেনা বন্ধ করা।

২. জুমার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও জুমায় গমন করা।

সুতরাং কেউ যদি আযানের পর বসে কিংবা দাঁড়িয়ে বেচা-কেনা করে তাহলে সে দু'টি নির্দেশ লঙ্ঘন করল। প্রথমত বেচা-কেনা বন্ধ করল না। তারপর জুমায় গমন করার নির্দেশ বেচা-কেনা করার মাধ্যমে অমান্য করল। ওয়াজিব নির্দেশ লঙ্ঘন করা কিংবা তাতে বিঘ্ন ঘটানো গর্হিত কাজ। উক্ত গর্হিত কাজ বেচা-কেনার সাথে যুক্ত হওয়াতে বিক্রয় চুক্তি মাকরূহ হবে। অবশ্য কেউ যদি জুমার নামাজে গমনরত অবস্থায় বেচা-কেনা করে তাহলে তা মাকরূহ হবে না। কারণ, এ বেচা-কেনার দ্বারা তার জুমাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। আয়াতের মর্মার্থও এটাই যে, যেন জুমার আযানের পর জুমার সম্মানার্থে পুরো সময়টুকু সেই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। এখন প্রশ্ন হলো জুমার নামাজে দু'টি আযান দেওয়া হয়, এখানে কোন আযান উদ্দেশ্য। এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেন, সালাত পর্বে জুমা অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, প্রথম আযানই উদ্দেশ্য। তবে প্রথম আযানটি অবশ্যই সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর হতে হবে।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, ইমাম কুদূরী (র.) -এর ইবারত অনুযায়ী মনে হয় যে, জুমার আযানের সময় বেচা-কেনা করার ব্যাপারে [যেমন আমরা তরজমা করেছি] রাসূল ﷺ এর নিষেধবাণী রয়েছে। কিন্তু লেখক রাসূল ﷺ -এর কোনো হাদীস এখানে উল্লেখ করেননি। তাহলে রাসূল ﷺ -এর নিষেধবাণী কি করে হলো, এর উত্তর হচ্ছে আয়াতে বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকেও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর সে দৃষ্টি ভঙ্গিতেই এখানে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন বলা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অনুচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যত বেচা-কেনার কথা উল্লেখ করা হলো (سَوْمٌ عَلٰى سَوْمٍ ,نَجْشٌ ,تَلَقِّى الْجَلَبِ ,غَيْرِهِ ,بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِىْ ও بَيْعٌ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ) সবই মাকরূহ। তবে মাকরূহ হওয়ার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। কেননা, ফাসাদগুলো বর্হিগত ও অতিরিক্ত বিষয়, যা বিক্রয়চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। মূল চুক্তির মধ্যে কিংবা বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলির মধ্যে কোনো ফাসাদ নেই। বিক্রয় বহির্ভূত ফাসাদের কারণে বিক্রয় মাকরূহ হয়, ফাসিদ হয় না। আর এ কারণে উপরোক্ত সব অবস্থায় বিক্রয় ফাসিদ হবে না।

قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ، وَتَفْسِيْرُهُ مَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدُ، وَلِاَنَّهُ بَيْعُ الْفُقَرَاءِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اِلَيْهِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নিলাম বিক্রিতে কোনো দোষ নেই। এর ব্যাখ্যা আমরা উল্লেখ করেছি। সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ একটি পেয়ালা ও একটি চট নিলামে বিক্রি করেছেন। তাছাড়া এটা তো দরিদ্রদের স্বার্থে বিক্রয়চুক্তি। আর এর প্রয়োজন [অবশ্যই] রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيْدَ الخ : بَيْعُ مَنْ يَزِيْدَ বা নিলাম বিক্রি নিঃসন্দেহে বৈধ। এটি মাকরূহ নয়। بَيْعِ مَنْ يَزِيْدَ -এর ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে যে, সমবেত ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মূল্যদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা অথবা অধিক মূল্য পাওয়ার আশায় ডাক উঠানো। আর ইতিপূর্বে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এমনটা করেছেন। হাদীসটি সনদসহ এখানে দেওয়া হলো–

عَنْ عَيْشِ بْنِ يُوْنُسَ عَنِ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَنَفِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَيْئٌ قَالَ بَلٰى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ الْمَاءَ، فَقَالَ اِئْتِنِىْ بِهِمَا فَاَتَاهُ بِهِمَا، فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ، وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ، وَقَالَ اِشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا / فَأْسًا فَاْتِنِىْ بِهِ، فَاَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهِ، فَقَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ، فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَجِئَ الْمَسْئَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا تَصْلُحُ اِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِىْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ. اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُوْجِعٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

হাদীসের অর্থ : এক আনসারী [দরিদ্র] ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই। সে বলল, হাঁ আছে। একটি চট, যার একাংশ আমরা বিছিয়ে শয়ন করি, আর বাকি অংশ গায়ে দিই। আরেকটি পেয়ালা আছে, যার সাহায্যে পানি পান করি। তিনি বললেন, উভয়টি আমার কাছে নিয়ে আস। অতঃপর সে উভয়টি রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসল। রাসূল ﷺ চট ও পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন, কে এই দু'টি জিনিস কিনবে? এক ব্যক্তি বলল, আমি এক দিরহামে এ দু'টি কিনব। তিনি বললেন, কে বেশি মূল্য প্রদান করবে। এ কথাটি দু'বার অথবা তিনবার বললেন, [প্রথমে কোনো সাড়া আসল না] অবশেষে এক ব্যক্তি বলল, আমি দু'দিরহামে তা ক্রয় করব। তিনি তাকে এ দু'টি দিয়ে দিলেন এবং তার থেকে দু'দিরহাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তা আনসারীকে দিলেন এবং বললেন, এক দিরহামে খাদ্য

ক্রয় কর ও তা পরিবারের লোকদের দাও, আর অন্য দিরহাম দ্বারা একটি কুঠার ক্রয় কর এবং তা আমার কাছে নিয়ে আস। সে কুঠার নিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে আসল। রাসূল ﷺ সেটাতে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তাকে বললেন, যাও, [এর সাহায্যে] কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি কর। আর আমি যাতে তোমাকে আগামী পনের দিন না দেখি। [কথামতো] সে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে লাগল এবং তা বিক্রি করতে লাগল। এরপর একদিন আসল। ততদিনে সে দশ দিরহাম উপার্জন করে ফেলেছে। আর তার কিছু দিয়ে কাপড় ক্রয় করেছে, বাকিটা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করেছে। রাসূল ﷺ তাকে [দেখে] বললেন, এ অবস্থা তোমার জন্য অনেক উত্তম। কিয়ামতের দিন চেহারায় ভিক্ষার অবমাননাকর চিহ্ন নিয়ে উত্থিত হওয়ার চেয়ে। [তিনি আরো বললেন] সুওয়াল করা কেবল তিন ব্যক্তির জন্য বৈধ−

১. সীমাহীন দরিদ্র, যে মাটিতে গড়াগড়ি খায়

২. ভয়ানক ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি

৩. রক্তপণ আদায়ে দায়গ্রস্ত ব্যক্তি, যার রক্তপণ প্রদানের মতো কোনো অর্থ নেই।

এ তিনজন প্রার্থীর জন্য সুওয়াল করা বৈধ। −[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্]

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নিলাম বিক্রি বৈধ। যদি তা বৈধ না হতো তাহলে স্বয়ং রাসূল ﷺ এটা করতেন না। দ্বিতীয় দলিল এই যে, নিলাম তোলা হয় দরিদ্রের স্বার্থে, দরিদ্রেরা এ ধরনের বিক্রির মাধ্যমে ভীষণ উপকৃত হয়। বর্তমানেও দরিদ্রের প্রয়োজনে এটা করা প্রয়োজন বিধায় এটা বৈধ হবে। কারণ, শরিয়ত মানুষের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে না।

نَوْعٌ مِنْهُ : قَالَ : وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ اَحَدُهُمَا ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْاٰخَرِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَكَذٰلِكَ اِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا كَبِيْرًا ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ، وَ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ (رضـ) غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ فَقَالَ : بِعْتُ اَحَدَهُمَا ، فَقَالَ (عـ) : اَدْرِكْ اَدْرِكْ، وَيُرْوٰى اُرْدُدْ اُرْدُدْ، وَلِاَنَّ الصَّغِيرَ يَسْتَانِسُ بِالصَّغِيْرِ وَبِالْكَبِيْرِ، وَالْكَبِيْرُ يَتَعَاهَدُهُ، فَكَانَ فِيْ بَيْعِ اَحَدِهِمَا قَطْعُ الْاِسْتِيْنَاسِ وَالْمَنْعُ مِنَ التَّعَاهُدِ، وَفِيْهِ تَرْكُ الرَّحْمَةِ عَلَى الصِّغَارِ، وَقَدْ اُوْعِدَ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : মাকরূহ বিক্রয়ের একটি প্রকার : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এমন দু'জন ক্রীতদাসের মালিক হলো যারা পরস্পর মাহরাম [নিকটাত্মীয়], তাহলে তাদের দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। এমনিভাবে যদি দু'জনের একজন বড় হয়। এ ব্যাপারে দলিল এই যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মা এবং তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে আল্লাহ তার এবং তার প্রিয়জনদের মাঝে কিয়ামতের দিন বিচ্ছেদ ঘটাবেন। [হাদীসে বর্ণিত আছে যে,] মহানবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি অল্পবয়স্ক সহোদর ক্রীতদাস দান করেন। তারপর একদা জিজ্ঞাসা করেন, গোলাম দু'টির কি অবস্থা? তিনি বললেন, তাদের একটিকে বিক্রি করে দিয়েছি, তিনি ﷺ বললেন, ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন। বর্ণনান্তরে ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। তাছাড়া এ কারণেও যে, বাচ্চারা অন্য বাচ্চার এবং তার চেয়ে বড় ছেলে মেয়ের সান্নিধ্যে স্বস্তি লাভ করে। এবং বড়জন তাকে আগলে রাখে। ফলে একজনকে বিক্রি করলে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে বাধা সৃষ্টি হয়, আর এতে ছোটদের প্রতি নির্দয়তা হয়। অথচ এরূপ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ نَوْعٌ مِنْهُ : قَالَ : وَمَنْ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিশেষ প্রকারের মাকরূহ বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে–
মাসআলা : কেউ যদি এমন দু'টি নাবালেগ বালকের মালিক হয় যারা পরস্পর সহোদর অথবা তাদের একজন প্রাপ্তবয়স্ক এমতাবস্থায় মালিকের জন্য তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ হবে না, মাকরূহ হবে।

বিচ্ছেদ কয়েকভাবে হতে পারে, যেমন একজনকে বিক্রি করে দেওয়া, দান করে দেওয়া, অথবা অসিয়ত করে দেওয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ এদের বিক্রি বা দান যদিও বৈধ, কিন্তু বিচ্ছিন্ন করার কারণে মাকরূহ হবে এবং গুনাহের কাজ সাব্যস্ত হবে। অবশ্য দু'জনকে একত্রে বিক্রি করাতে কোনো দোষ নেই। এমনিভাবে যদি উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে একজনকে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়ে মূল দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর হাদীস–

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَفِيْ رِوَايَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ ـ

অর্থ: হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কেউ কোনো মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে/ তার ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَبَا اَسَدٍ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَنَظَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِيْ فَقَالَ مَا شَانُكِ قَالَتْ بَاعَ اِبْنِيْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَبِعْتَ اِبْنَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فِيْمَنْ قَالَ فِيْ بَنِيْ عَبْسٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِرْكَبْ اَنْتَ بِنَفْسِكَ فَاْتِ بِهِ .

অর্থ : আবূ আসাদ (রা.) বাহরাইনের বন্দীদের নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন, রাসূল ﷺ তাদের মাঝে এক মহিলাকে ক্রন্দনরত দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, তিনি আমার ছেলে বেচে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ আবূ আসাদকে বললেন, তুমি কি তার ছেলে বেচে দিয়েছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, কাদের কাছে। তিনি বললেন, আবস গোত্রে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আস।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূল ﷺ বলেন, مَلْعُوْنٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ بَيْنَ الْاَخِ وَاَخِيْهِ অর্থ : যে ব্যক্তি মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় সে অভিশপ্ত। বর্ণনান্তরে যে ভাই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় । উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, মা ও সন্তান এবং ভাই ভাইয়ে বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'আলার অভিশাপের উপযুক্ত পর্যন্ত হয়ে যায়। যেহেতু এটা বিক্রয়ের মূল চুক্তির মধ্যে বিদ্যমান নয়, বরং বিক্রয়চুক্তির বহির্গত বিষয়, যা তার সাথে যুক্ত হয়েছে তাই এ বিক্রয় মাকরূহ হবে। কিতাবে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসটি এই :

اَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِيْ شَبِيْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُ اَحَدَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلَامُكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَبِيْعَ غُلَامَيْنِ اَخَوَيْنِ فَبِعْتُهُمَا فَفَرَّقْتُهُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَلَا تَبِعْهُمَا اِلَّا جَمِيْعًا .

উভয় হাদীসের মোটামুটি অর্থ এরূপ যে, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি নাবালক সহোদর গোলাম দান করলেন। তারপর তাদের খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, হযরত আলী (রা.) তাদের একটিকে বিক্রি করে দিয়েছেন। অথবা তিনি হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি গোলাম বিক্রি করে দিতে বললে হযরত আলী (রা.) আলাদাভাবে দু'স্থানে দু'টি বিক্রি করেন। এরপর রাসূল ﷺ যখন এ সম্পর্কে অবগত হন তখন বিক্রয় প্রত্যাহার করে দু'টি গোলামকে একত্রিত করতে বলেন। আর বলেন, যদি বিক্রি করতে হয় তাহলে যেন একত্রে একস্থানেই বিক্রি করা হয়। এ হাদীস দু'টিও ছোট দু'ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর অবৈধতা প্রমাণ করে। যেহেতু তাদের মাঝে উক্ত বিচ্ছিন্নতা বিক্রয়ের মাধ্যমেই হচ্ছে তাই বিক্রয় মাকরূহ হবে।

এ ব্যাপারে যুক্তি এই যে, এক শিশু/বালক অন্য শিশু/বালকের সান্নিধ্য উপভোগ করে, এমনিভাবে ছোট বাচ্চা তার নিকটাত্মীয় প্রাপ্তবয়স্কের সান্নিধ্যের মাধ্যমে মনে স্বস্তি অনুভব করে। এমতাবস্থায় দুই বালকের একজনকে যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের মানসিক প্রশান্তি দূরীভূত হবে এবং একাকিত্বের যন্ত্রণায় পিষ্ট হবে। এমনিভাবে ছোট ও বড় এদের দু'জনের একজনকে যদি বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে তারা তাদের মাঝে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ থেকে এবং বড়জনের দেখাশুনা ও অভিভাবকত্ব থেকেও বঞ্চিত হবে। তাছাড়া এর দ্বারা ছোটদের প্রতি বিশেষ স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের যে নির্দেশ হাদীস শরীফে রয়েছে তারও লঙ্ঘন হবে। হাদীস–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থ : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না সে আমার দলভুক্ত নয়। এ হাদীসে ছোটদের প্রতি দয়াহীনতা প্রদর্শনের ব্যাপারে বিশেষ সর্তকবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর সর্তকবাণী নাজায়েজ বিষয়ে আসে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, নাবালক দুই বাচ্চার মাঝে বিচ্ছেদ দয়াহীনতার সবব, তা শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ ও অবৈধ।

ثُمَّ الْمَنْعُ مَعْلُوْلٌ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ، حَتّٰى لَا يَدْخُلَ فِيْهِ مَحْرَمٌ غَيْرُ قَرِيْبٍ، وَلَا قَرِيْبٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ الزَّوْجَانِ، حَتّٰى جَازَ التَّفْرِيْقُ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، فَيَقْتَصِرُ عَلٰى مَوْرِدِهٖ، وَلَابُدَّ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا فِيْ مِلْكِهٖ، لِمَا ذَكَرْنَا، حَتّٰى لَوْ كَانَ اَحَدُ الصَّغِيْرَيْنِ لَهٗ وَالْاٰخَرُ لِغَيْرِهٖ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ كَانَ التَّفْرِيْقُ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ لَا بَأْسَ بِهٖ، كَدَفْعِ اَحَدِهِمَا بِالْجِنَايَةِ وَبَيْعِهٖ بِالدَّيْنِ، وَرَدِّهٖ بِالْعَيْبِ، لِاَنَّ الْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ غَيْرِهٖ، لَا الْاِضْرَارُ بِهٖ.

অনুবাদ : আর বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়তাকে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র বলা হয়েছে, যাতে অনিকটাত্মীয় মাহরাম এবং নিকটাত্মীয় গাইরে মাহরাম এই হুকুমে অন্তর্ভুক্ত না হয়। এতে স্বামী-স্ত্রীও অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাই তাদেরকে [বিক্রির মাধ্যমে] বিচ্ছিন্ন করা বৈধ। কেননা, হাদীসটি কিয়াসের বিপরীত। এজন্য তা হাদীসের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আর [নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্র তৈরির জন্য] উভয়ে তার মালিকানাধীন হওয়া শর্ত। আর তাই যদি দুই ছোট বাচ্চার একজন তার মালিকানাধীন হয়, আর অন্যজন অন্যের মালিকানায় থাকে তাহলে তাদের একজন বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। এমনিভাবে হকদার পাওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন করা হলেও কোনো সমস্যা নেই। যেমন অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে সমর্পণ করা, ঋণের কারণে বিক্রি করা কিংবা ত্রুটি পাওয়া যাওয়ার কারণে ফেরত দেওয়া ইত্যাদি। কেননা, এগুলোতে উদ্দেশ্য হলো অন্যের ক্ষতি অপসারণ করা, তাদের ক্ষতি করা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْمَنْعُ مَعْلُوْلٌ بِالْقَرَابَةِ الخ : লেখক বলেন, দুই নাবালকের মাঝে বিচ্ছেদ নাজায়েজ হওয়ার বিষয় শর্তযুক্ত। এ শর্ত হচ্ছে এমন আত্মীয়তা যার কারণে পরস্পরের মাঝে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে থাকে। অর্থাৎ দু'জন পরস্পর ذی رحم محرم হবে। যেমন– দুই সহোদর ভাই, দুই সাহোদর ভাইবোন, মাও ছেলে, বাবা ও মেয়ে, মামা ও ভাগ্নে/ভাগ্নি, চাচা ও ভাতিজা/ভাতিজি, পক্ষান্তরে যদি দু'জনের মাঝে বিবাহ হারাম বটে, কিন্তু আত্মীয়তা না থাকে, যেমন দু' দুধভাই, দু' দুধভাই বোন। অথবা দু'জনের মাঝে আত্মীয়তা আছে বটে, কিন্তু বিবাহ হারাম নয়। যেমন চাচাত ভাই-বোন, ফুফাত ভাই বোন– এমন হলে তারা নিষিদ্ধতার আওতায় আসবে না। অর্থাৎ দুই নাবালকের মাঝে যদি শুধু আত্মীয়তা কিংবা শুধু বিবাহ হারাম হয়, তাহলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো অবৈধ নয়। কেননা, নিষিদ্ধতার সবব বা কারণ অবিদ্যমান। উল্লিখিত শেষ দু'টি অবস্থায়ও যেহেতু আত্মীয়তা ও বিবাহ হারাম উভয়টি বিদ্যমান নয় তাই এ সুরতে বিচ্ছেদ ঘটানো অবৈধ নয়।

লেখক বলেন, স্বামী-স্ত্রী উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রী অল্প বয়স্ক হয় আর তারা দু'জন কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় তাহলে বিক্রয়ের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করা হয়– তা অবৈধ হবে না। যদি মালিক একজনকে বিক্রি করে দেয় বা দান করে তাহলে নাজায়েজ হবে না।

লেখক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এবং শুধু আত্মীয়তা বা শুধু বিবাহ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রগুলোতে বিচ্ছিন্ন করা যে, অবৈধ নয় এর পক্ষে দলিল দেন এভাবে যে, নিষিদ্ধতার হাদীস مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا وَبَيْنَ الْاَخِ وَاَخِيْهِ এবং اَدْرِكْ اَدْرِكْ وَارْدُدْ رُدَّهٗ কিয়াসের বিপরীতরূপে এসেছে। কিয়াসের দাবি অনুযায়ী এসব সুরতে বিক্রি বৈধ হওয়া উচিত। কারণ মালিকানার দাবি এটাই যে,

মালিক তার মালিকানাধীন দ্রব্যে সব ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে, সে ছোট নাবালক শিশুকে একত্রিত রাখতে পারে অথবা তার ইচ্ছামতো সে তাদের বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে পারে। যেমন বয়স্ক দু'জন ক্রীতদাসের ব্যাপারে তার ইখতিয়ার রয়েছে। আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাদীস দু'টি কিয়াসের বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে। আর যে বিধান কিয়াসের বিপরীতে প্রবর্তিত হয় তা হাদীসে উল্লিখিত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে প্রথম হাদীসের ক্ষেত্র হচ্ছে মা ও তার সন্তান, আর দ্বিতীয় হাদীসে ক্ষেত্র হচ্ছে দুই সহোদর ভাই। অর্থাৎ উভয় হাদীস বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মালিকের অধীনে আসা দু'জনের [ছোট কিংবা একজন ছোট অপরজন বড়] এর মধ্যে যদি আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্কের চিরস্থায়ী অবৈধতা থাকে তাহলে তাদের মাঝে বিক্রি, দান ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো অবৈধ।

পক্ষান্তরে যদি তাদের মাঝে উভয় দিক সম্বলিত সম্পর্ক না পাওয়া যায় তাহলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অবৈধ হবে না। লেখক বলেন, দু'ইজন ছোট বালক/বালিকা কিংবা একজন ছোট অপর বড়, এদের বিচ্ছিন্ন করা তখনই হারাম হবে, যখন উভয়ে একই মালিকের মালিকানাধীন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি একজন এক মালিকের অধীন, অন্যজন ভিন্ন মালিকের অধীন হয় তাহলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করাতে শরিয়তের কোনো বাধা নেই। কেননা, এখানে তো [প্রকৃতার্থে] বিচ্ছিন্ন করার অর্থটি অবিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ التَّفْرِيْقُ بِحَقٍّ مُسْتَحَقٍّ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক উল্লিখিত মাসআলার কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হওয়ার বিষয় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মাসআলাতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা জায়েজ। এখানে সেই মাসআলাগুলো উল্লেখ করেন। লেখক বলেন, যদি দু'জনের মধ্য হতে কোনো একজনের হকদার বের হয় তাহলে উক্ত আবশ্যকীয় হক তার পাওনাদারের কাছে সমর্পণ করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ। যেমন–

১. কোনো মালিকের অধীনে দু'জন নাবালক বাচ্চা রয়েছে। তাদের পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তা ও বিবাহ হারাম হওয়ার মতো সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তাদের একজন অন্য কাউকে হত্যা করল কিংবা কারো মাল বিনষ্ট করল। উদাহরণ স্বরূপ কোনো মুনিবের দু'টি ক্রীতদাস রয়েছে– রাশেদ ও খালেদ। যারা পরস্পর সহোদর। তাদের মধ্যে রাশেদ বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক আর খালেদ অপ্রাপ্তবয়স্ক- নাবালেগ। মুনিব বড়জনকে বাহিরে প্রেরণ করেন বিভিন্ন কাজে। একসময় বড় জন কারো সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে হত্যা করে ফেলল, অথবা কারো অঙ্গ হানি ঘটাল। অতঃপর বিচারক তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ রক্তপণ আরোপ করলেন। এমতাবস্থায় মালিক তাকে প্রদানের মাধ্যমে রক্তপণ আদায় করতে পারে।

২. অথবা প্রাপ্তবয়স্ক দাসটিকে মালিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করলেন, অতঃপর সে ব্যবসা করতে গিয়ে তার মূল্য পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হয়ে গেল। কিংবা অল্প বয়স্ক ক্রীতদাসটি কারো মাল এই পরিমাণ মালামাল নষ্ট করল, যা তার মূল্যের সমপরিমাণ। এমতাবস্থায় মুনিব ক্রীতদাস প্রদানের মাধ্যমে ঋণশোধ করতে পারে কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

৩. অথবা কেউ দু'জন নাবালেগ সহোদর ভাই ক্রয় করল, এরপর লক্ষ্য করল যে, একজনের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ের ত্রুটি রয়েছে। এমতাবস্থায় ত্রুটিজনিত কারণে একজনকে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ। উল্লিখিত তিনটি মাসআলায় যদিও দু'ভাইকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা অবৈধ নয়। কেননা এই বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা মুনিবের উদ্দেশ্য হচ্ছে সে নিজে যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা থেকে নিজেকে বাঁচানো, এখানে মুনিবের উদ্দেশ্য দাসকে বিপদে আপতিত করা নয়। আর শরিয়তে প্রত্যেকেরই ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। সে মতে গোলামের সৃষ্ট ক্ষতি থেকে মুনিবের আত্মরক্ষার অধিকার তো অবশ্যই আছে। আর এ কারণে এই বিচ্ছেদের দ্বারা কোনো গুনাহ বা ক্ষতি হবে না।

قَالَ : فَإِنْ فَرَّقَ كُرِهَ لَهُ ذٰلِكَ، وَجَازَ الْعَقْدُ، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْ قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ، وَيَجُوْزُ فِيْ غَيْرِهَا، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ لِمَا رَوَيْنَا، فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْإِدْرَاكِ وَالرَّدِّ لَا يَكُوْنُ إِلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَلَهُمَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِيْ مَحَلِّهِ، وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِمَعْنًى مُجَاوِرٍ، فَشَابَهَ كَرَاهَةَ الْإِسْتِيَامِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি সে বিচ্ছিন্ন করে তাহলে তা তার জন্য মাকরূহ হবে, তবে চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, জন্মসূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ হবে না তবে অন্য সূত্রের আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বৈধ হবে। তাঁর থেকে এও বর্ণিত আছে যে, সব অবস্থাতেই অবৈধ হবে। দলিল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীস। কেননা, ফিরিয়ে আনার নির্দেশ কেবল ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তাঁদের [ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) -এর] দলিল হলো, বিক্রয়ের রুকন যথোপযুক্ত ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং বিক্রয়ের পাত্রেই তা সম্পৃক্ত হয়েছে। আর মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি তো পারিপার্শ্বিক কারণে হয়েছে, ফলে এটা একজনের মূল্য প্রস্তাবের পর আরেকজন মূল্য প্রস্তাব করার মতো মাকরূহ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : فَإِنْ فَرَّقَ كُرِهَ لَهُ الخ : উল্লিখিত ইবারতে পূর্বোক্ত মাসআলার সংশ্লিষ্ট অংশ আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছিল যে, দুই নাবালক সহোদর একত্রে কারো মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় মালিকের জন্য একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করা মাকরূহ। সেই পৃথকীকরণ যদি বিক্রির মাধ্যমে হয় তাহলে বিক্রয়চুক্তি মাকরূহ সাব্যস্ত হবে। এখানে বলা হচ্ছে যে, কেউ যদি বিক্রির মাধ্যমে তাদের পৃথক করে ফেলে তাহলে কি হবে। ইমাম কুদূরী (র.) কোনো মতপার্থক্য উল্লেখ করা ছাড়াই বলেছেন যে, এ পৃথকীকরণ কর্তার জন্য মাকরূহ হবে। তবে কৃত বিক্রয়চুক্তিটি শুদ্ধ ও বৈধ হয়ে যাবে। এ পৃথককরণ কাজটি সকলের ঐকমত্যে মাকরূহ। তবে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ না অবৈধ এ ব্যাপারে আল্লামা বুরহানউদ্দিন আবু হাসান আলী [হেদায়ার লেখক] হানাফী মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিক্রয়চুক্তি ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) [তারফাইন]-এর মতে বৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও বটে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি দুই গোলামের মধ্যে জন্ম সূত্রের আত্মীয়তা থাকে, [যেমন, মা ও সন্তান, পিতা ও তার সন্তান] তাহলে যে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তাদের পৃথক করা হবে যেই বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিশুদ্ধতর অভিমত এটাই। আর যদি দু'জনের মাঝে জন্মসূত্রের আত্মীয়তা ছাড়া অন্য কোনো আত্মীয়তা থাকে [যেমন দু'ভাই] তাহলে তাদের পৃথক করার বিক্রয় চুক্তিটি বৈধ হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এই মতও বর্ণিত আছে যে, দুই ক্রীতদাসের মধ্যে [তারা উভয়ে ছোট কিংবা একজন ছোট] জন্মসূত্রের আত্মীয়তা ও অন্য আত্মীয়তা যাই থাকুক সর্বাবস্থায় পৃথক করার বিক্রি এবং অন্যান্য চুক্তি অবৈধ হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমতও তাই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) দলিল হযরত আলী (রা.) -এর হাদীস, যাতে রাসূল ﷺ হযরত আলীকে এরূপ পৃথক করার নির্দেশ দেন أَدْرِكْ أَدْرِكْ অথবা رُدَّهُ رُدَّهُ উল্লেখ্য যে, বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করা এবং ফিরিয়ে আনার নির্দেশ শুধুমাত্র ফাসিদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। মাকরূহ বিক্রয়ে বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের নির্দেশ দেওয়া হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিক্রয়চুক্তি বৈধ নয়; বরং ফাসিদ ও অবৈধ।

তারফাইন (র.)-এর দলিল হলো, উল্লিখিত বিক্রয়ে তার রুকন তথা ইজাব ও কবুল যোগ্য ব্যক্তি [জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক] থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা বিক্রয়ের পাত্র তথা মালিকানাধীন মালের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে। সুতরাং যখন ক্রেতা-বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি করার যোগ্য ব্যক্তি এবং বিক্রয় পাত্রেরও যোগ্যতা রয়েছে তখন বিক্রয়ের শুদ্ধতা ও বৈধতার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। বেশি থেকে বেশি এতটুকু বলা যায় যে, কারাহাত পরিপার্শ্বিক কারণে এসেছে। এখানে পরিপার্শ্বিক কারণটি হচ্ছে ছোট বালক কিংবা শিশুর মনে বিষণ্নতা সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রতি দয়াহীনতা প্রদর্শন করা। আর এতটুকু কারাহাতের সংশ্লিষ্টতার কারণে বিক্রয়চুক্তি নষ্ট হয়ে যায় না। এমন পারিপার্শ্বিক অবৈধতার উদাহরণ অনেক রয়েছে। যেমন একজন দরদাম করার পর এবং কথা পাকাপাকি হওয়ার পর আরেকজনের মূল্য প্রস্তাব করা। এখানে যেমন পার্শ্বকারণে মাকরূহ হয়, তেমনি বালক/ শিশু দু'টির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর দ্বারা নির্দয়তা প্রদর্শনের কারণে বিক্রয় মাকরূহ হবে :

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, أَدْرِكْ, اِرْتِجَاعْ ও رُدَّ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছওয়াবের আশায় একালা (إِقَالَةْ) করা অথবা বিক্রীত ভাইয়ের জন্য তার কাছে থাকা অবিক্রীত ভাইটিকে একই ব্যক্তি এর কাছে বিক্রি করে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, দু'জনকে পৃথক না করার নির্দেশ তাদের সাবালক হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ ব্যাপারে উবাদা ইবনুছ ছাবিতের হাদীস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُفَرِّقُوْا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فَقِيْلَ إِلٰى مَتٰى فَقَالَ إِلٰى أَنْ يَّبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيْضَ الْجَارِيَةُ.

অর্থ রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা মা ও তার সন্তানকে পৃথক কর না। তাকে জিজ্ঞসা করা হলো, কত কাল? তিনি বলেন, ছেলে সাবালক এবং মেয়ের ঋতুবর্তী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) -এর মতটিও এরূপ। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হলো বোধ জাগ্রত হওয়ার পূর্ব তথা সাত/ আট বছর বয়স পর্যন্ত বা বলা যায় দাঁত পড়ার বয়স পর্যন্ত। এ ব্যাপারে মাশায়েখগণের বক্তব্য হলো, যখন বালকরা প্রাপ্ত বয়স্কের দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায় এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হতে রাজি থাকে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে। কেননা, এ বয়সে তারা নিজের ভালমন্দ বুঝতে সক্ষম।

وَإِنْ كَانَا كَبِيْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْ مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ (ع) فَرَّقَ بَيْنَ مَارِيَةَ وَسِيْرِيْنَ وَكَانَتَا أَمَتَيْنِ أُخْتَيْنِ .

অনুবাদ : আর যদি তারা উভয়ে সাবালক হয় তাহলে তাদেরকে পৃথক করাতে দোষ নেই। তাছাড়া সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মারিয়া ও সীরীনকে আলাদা করেছিলেন। অথচ তারা দুই সহোদরা দাসী ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا كَبِيْرَيْنِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্ববর্তী মাসআলার শেষাংশ বর্ণনা করা হচ্ছে।

মাসআলা : যদি এক মালিকের অধীন দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক থাকে, যাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে হারাম। এদের দু'জনকে বিক্রি, দান ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথক করে দেওয়া মাকরূহ নয়। এটা কারাহাত ছাড়া এমনিতেই বৈধ। কারণ, হাদীসের নিষিদ্ধতা যে বিষয়ে এসেছে এ মাসআলা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আলী (রা.)-এর হাদীস দু'জন নাবালক সম্পর্কিত আর অন্য হাদীসটি মা ও ছেলের ব্যাপারে অর্থাৎ একজন বড় ও অন্যজন ছোট, এ বিষয়ে বর্ণিত। আর পূর্বে বলা হয়েছে যে, হাদীস দু'টি কিয়ামের বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে। আর যে কোনো যুক্তি বহির্ভূত নস বর্ণিত অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেটা স্থানান্তরিত হয় না। সে মতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বর্ণিত হাদীস দু'টির হুকুম স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক দু'জনের মধ্যে পৃথকীকরণে কোনো দোষ নেই।

তাছাড়া দু'জন ছোট দাস/দাসী অথবা একজন ছোট অপরজন বড়– এমন দু'জনকে পৃথক করার কারণে দয়াহীনতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের যে প্রশ্নটি আগে দেখা দিয়েছিল, সেটা এখানে দেখা দিচ্ছে না। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় পৃথক করলে নাবালেগের প্রতি যে স্নেহ-মমতার বিশেষ নির্দেশ রয়েছে তা লঙ্ঘন হয় এবং বড়জন ছোটকে রক্ষণাবেক্ষণ করত তাতেও বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় স্নেহ-মমতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার বিষয়টি পাওয়া যায় না। আর তাই দু'জনই বড় বয়স্ক হলে তাদেরকে পৃথক করা অবৈধ হবে না।

আরেকটি দলিল হলো, আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিশ হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতা'আহ [রাসূল ﷺ -এর দূত] -এর মাধ্যমে দু'জন দাসী রাসূল ﷺ -এর কাছে হাদিয়ারূপে প্রেরণ করেন। যাদের একজনের নাম মারিয়া, অন্যজনের নাম সীরীন, তারা পরস্পর সহোদরা ছিলেন, প্রথমোক্তজনকে রাসূল ﷺ নিজ ঘরে রেখে দেন, যার গর্ভে রাসূল ﷺ -এর পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীমের জন্ম হয়। আর দ্বিতীয়জনকে রাসূল ﷺ কবি হাসান ইবনে সাবিতের হাতে দানরূপে অর্পণ করেন। এ ঘটনায় দেখা যায়, রাসূল ﷺ দু'জন সহোদরা দাসীকে তার মালিকানায় আসার পর পৃথক করে দেন তাদের পরস্পর সহোদরা হওয়া সত্ত্বেও। রাসূল ﷺ কর্তৃক এই পৃথকীকরণ এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্কা দু'জন নিকটাত্মীয়র মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো বৈধ।

بَابُ الْاِقَالَةِ

اَلْاِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِى الْبَيْعِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ، لِقَوْلِهِ (ع) مَنْ اَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ اَقَالَ اللّٰهُ عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلِاَنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا ـ

পরিচ্ছেদ : ইকালাহ

অনুবাদ : বিক্রয়ের প্রথম মূল্যের অনুরূপ বিনিময়ে ইকালাহ [চুক্তি রহিত করা] বৈধ। এর দলিল রাসূল ﷺ -এর হাদীস– যে ব্যক্তি অনুতপ্ত ব্যক্তির [কৃত] বিক্রয়-ক্রয় বা চুক্তি প্রত্যাহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো থেকে তাকে রেহাই দিবেন। আর তাছাড়া চুক্তিটি তাদের উভয়ের অধিকার। সুতরাং তারা তাদের প্রয়োজনের নিমিত্তে সেটা প্রত্যাহার করারও অধিকার রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর সেটাকে প্রত্যাহার বা রহিত করার জন্য পরস্পর মতৈক্যের ভিত্তিতে যে [রহিতকরণ] চুক্তি করা হয় তাকে ইকালাহ বলা হয়। اِقَالَةٌ শব্দটি [একমতে] قَوْلٌ থেকে উদ্ভূত, শব্দের শুরুতে অবস্থিত অতিরিক্ত هَمْزَةٌ টি سَلْب -এর জন্য। সুতরাং اِقَالَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ হবে পূর্ববর্তী কথাকে প্রত্যাহার করা।

আল্লামা ইবনুল হুমাম ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে اِقَالَةٌ শব্দটি قَوْلٌ থেকে উদ্ভূত নয়। তারা উল্লিখিত মতটিকে অশুদ্ধ বলেন। তাদের মতে বিশুদ্ধ এই যে, اِقَالَةٌ শব্দটি قَيْلٌ থেকে উদ্ভূত। এ দাবির দলিল হলো (بِكَسْرِ الْقَافِ) قِلْتُ الْبَيْعَ ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ হলো আমি বিক্রয়চুক্তিটিকে রহিত করলাম। উল্লেখ্য যে, قِلْتُ -এর قَافٌ -এর যের তখনই ব্যবহার হয় যখন শব্দটি اَجْوَفُ يَائِىْ হয়, পক্ষান্তরে শব্দটি اَجْوَفُ وَاوِىْ হলে (بِضَمِّ الْقَافِ) قُلْتُ হবে। যেমন صُمْتُ [আমি রোজা রাখলাম] এর ফা কালিমায় পেশ এজন্যই হয়েছে যে, শব্দটি اَجْوَفُ وَاوِىْ সন্দেহাতীতভাবে। তাছাড়া বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ "সিহাহ" এর মধ্যে اِقَالَةٌ শব্দটিকে লেখক ق - ى - ل -এর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, তিনি শব্দটি কে ق - و - ل -এর অধ্যায়ে শব্দটি উল্লেখ করেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اِقَالَةٌ শব্দটি ধাতুগতভাবে اَجْوَفُ يَائِىْ তথা قَيْلٌ থেকে নির্গত হয়েছে। সারকথা হলো, اِقَالَةٌ শব্দটি بَابُ اِفْعَالٌ এর একটি মাসদার, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি রহিত করা।

পূর্বাপর সম্পর্ক : এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন এসে যায় যে, اِقَالَةٌ-এর সাথে পূর্ববর্তী ফাসিদ ও মাকরূহ বিক্রয়ের কি সম্পর্ক? এর উত্তর এই যে, ফাসিদ ও মাকরূহ বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের উপর গুনাহ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে পণ্য ও মূল্য প্রত্যর্পণ করা ওয়াজিব। আর প্রত্যর্পণ করার সুযোগ ইকালার মাধ্যমে অর্জিত হয় বলে ইকালার পরিচ্ছেদকে ফাসিদ ও মাকরূহ বিক্রয়ের অব্যবহিত পরেই আনা হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, ইকালার মাধ্যমে চুক্তি প্রত্যাহার বা রহিত করার পদ্ধতি জানা যায়। প্রত্যাহার বা রহিত করার পূর্ববর্তী বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হয়েছে বলে প্রমাণ করে। কারণ চুক্তি সংঘটিত না হলে সেটাকে কিভাবে রহিত করা হবে। সুতরাং এই পরিচ্ছেদের সাথে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের

সম্পর্ক এই যে, মাকরূহ ও ফাসিদ বিক্রি সহ যাবতীয় বিক্রয়চুক্তি দ্বারা চুক্তি করার নিয়ম-পদ্ধতি জানা গেছে, এরপর ইকালাহ দ্বারা সংঘটিত চুক্তি রহিত করার নিয়ম জানা যাবে।

قَوْلُهُ اَلْاِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِى الْبَيْعِ الخ : প্রথমে ইকালাহ এর সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম কুদূরী বলেন, বিক্রয়ের মধ্যে ধার্য প্রথম মূল্যের (اَلثَّمَنُ الْاَوَّلُ) অনুরূপ বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার করা হচ্ছে ইকালাহ।

অতঃপর ইকালা-এর বৈধতার দলিল পেশ করেন রাসূল ﷺ -এর হাদীস দ্বারা। হাদীসটি সনদসহ উদ্ধৃত করা হলো–

اَخْرَجَ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا بِعَيْنِهِ اَقَالَ اللّٰهُ عَثَرَاتِهِ زَادَ ابْنُ مَاجَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

উল্লেখ্য যে, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ ছাড়া ইবনে হিব্বান ও হাকেম (র.)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাদের কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেন। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং এর বর্ণনাকারীগণ উচ্চমানের। نَادِمًا শব্দটি আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ-এর বর্ণনায় না থাকলেও সেটা বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে। হাদীসের অর্থ রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি [বিক্রয় চুক্তি করে] অনুতপ্ত ব্যক্তির সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যাহার করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিচ্যুতিগুলো বিদূরিত করবেন।

ইকালাহ করার সুরত : কোনো ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কোনো কিছু ক্রয় করে কিংবা বিক্রি করার পর মনে করল যে, তার সেই দ্রব্যটি প্রয়োজন নেই, অথবা তার বিক্রীত দ্রব্যটি অতীব প্রয়োজন, অতঃপর তার অন্য পক্ষকে বলল, ভাই আমি আপনার পণ্যটি ফেরত দিচ্ছি, আপনি আমার প্রদত্ত মূল্য ফেরত দিন। ক্রেতার কথা মতো বিক্রেতা যদি প্রথম মূল্য অথবা তার অনুরূপ মূল্য বিনিময় রূপে প্রদান করলে সেটাই ইকালাহ হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে রাসূল ﷺ ইকালাহকারীর জন্য ছওয়াবের ঘোষণা করেছেন অথবা ছওয়াব লাভ করার জন্য দোয়া করেছেন। ছওয়াব বা ছওয়াবের দোয়া শরিয়ত অনুমোদিত কাজেই হতে পারে। শরিয়ত অনুমোদন করে না এমন কাজে ছওয়াব কিছুতেই আশা করা যায় না। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, ইকালাহ বা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার একটি বৈধ ও পুণ্যের কাজ।

যৌক্তিক দলিল : ইকালাহ হচ্ছে চুক্তি প্রত্যাহার করা, চুক্তি করা ক্রেতা ও বিক্রেতার একটি অধিকার। কেননা তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে সেটা সংঘটিত হয়। যেহেতু চুক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার এবং তা উভয়ের সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয় সেহেতু বিশেষ প্রয়োজনে এটাকে প্রত্যাহার করাটাও তাদেরই অধিকার। মোটকথা, উভয় পক্ষের যেমন চুক্তি করার অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদের রহিত করারও অধিকার রয়েছে।

فَإِنْ شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، إِلَّا أَنْ لَّا يُمْكِنَ جَعْلُهُ فَسْخًا فَتَبْطُلُ، وَهٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَعِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ (رحـ) هُوَ بَيْعٌ إِلَّا أَنْ لَّا يُمْكِنَ جَعْلُهُ بَيْعًا فَيُجْعَلُ فَسْخًا، إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ فَيَبْطُلُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) هُوَ فَسْخٌ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهُ فَسْخًا فَيُجْعَلُ بَيْعًا، إِلَّا أَنْ لَّا يُمْكِنَ فَيَبْطُلُ، لِمُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّ اللَّفْظَ لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ، وَمِنْهُ يُقَالُ أَقِلْنِيْ عَثَرَتِيْ فَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ قَضِيَّتُهُ، وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحْمَلُ عَلَى مُحْتَمَلِهِ، وَهُوَ الْبَيْعُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ الثَّالِثِ، وَلِأَبِي يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي، وَهٰذَا هُوَ حَدُّ الْبَيْعِ، وَلِهٰذَا يَبْطُلُ بِهَلَاكِ السِّلْعَةِ، وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، وَتَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ، وَهٰذِهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ .

অনুবাদ : যদি কেউ [ইকালার মধ্যে] প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা কমের শর্তারোপ করে, তাহলে শর্ত বাতিল হবে এবং সে [বিক্রেতা] প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ প্রত্যর্পণ করবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি [ইকালাহ] ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে রহিতকরণ চুক্তি, আর তারা ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন বিক্রয়চুক্তি। তবে [কোনো কারণে] যদি এটাকে রহিতকরণ চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি, তবে যদি [কোনো কারণে] এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত হবে। হ্যাঁ যদি [কোনো কারণে] বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। যদি এ প্রত্যাহার-চুক্তিকে প্রত্যাহার-চুক্তি বলা অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি বলা হবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ইকালাহ শব্দটি অভিধানে প্রত্যাহার ও রহিত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর থেকেই [দোয়াতে] বলা হয় (أَقِلْنِيْ عَثَرَتِيْ) 'হে আল্লাহ! আমার বিচ্যুতিগুলো দূর কর [ক্ষমা কর]।' সুতরাং শব্দটির 'অর্থ-চাহিদা' পরিপূর্ণ আদায় করতে হবে। তবে যখন এ অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর না হয়, তখন তার সম্ভাব্য অর্থের উপর তাকে ব্যবহার করা হবে, আর তা হলো বিক্রয়। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, এটা তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এটা [ইকালাহ] পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা। আর এটাই তো বিক্রয়ের সংজ্ঞা। এ কারণেই পণ্য বিনষ্ট হলে এটা বাতিল হয়ে যায় এবং ত্রুটিজনিত কারণে ফেরত দেওয়া হয়। আর এর দ্বারা শুফআহ অধিকার সাব্যস্ত হয়। এগুলো তো বেচা-কেনার বিধিবিধান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ اَكْثَرَ مِنْهُ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইকালাহ হচ্ছে প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য দ্বারা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা। ব্যতিক্রমি শর্তের ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : কেউ যদি প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা কম মূল্য পরিশোধের শর্তে ইকালাহ করে, তাহলে তার ইকালাহ-এর কি হুকুম হবে? ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপ শর্ত করা হলে শর্তটি বাতিল হবে, তবে ইকালাহ সংঘটিত হয়ে যাবে এবং বিক্রেতা ক্রেতা থেকে যে ধার্যকৃত মূল্য তথা ثَمَنٌ আদায় করেছিল তা ফেরত দেওয়া তার উপর আবশ্যক হবে। উদাহরণস্বরূপ যায়েদ এক হাজার টাকায় একটি কাপড় বিক্রি করেছিল, আর রাশেদ তা ক্রয় করেছিল। এরপর যায়েদ এক হাজার টাকা এবং রাশেদ কাপড় কব্জা করে নিয়েছে। এখন যদি কোনো একজন ইকালাহ করতে চায়, তাহলে যায়েদকে পূর্ণমূল্য এক হাজার টাকা এবং রাশেদকে বিক্রীত কাপড় ফেরত দিতে হবে। এখন যদি এক হাজারের থেকে দু-শ টাকা বেশি নেওয়ার কিংবা দু-শ টাকা কম দেওয়ার শর্ত করে, তাহলে এরূপ শর্ত আরোপ করা শুদ্ধ হবে না এবং শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। বিক্রেতা যায়েদের উপর এক হাজার টাকা প্রত্যর্পণ করা আবশ্যক হবে।

এরপর হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইকালাহ-এর স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনার অবতারণা করেন। ইকালাহ-এর স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের হানাফী মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া অন্য যে কোনো লোকের কাছে এটা একটা নতুন বিক্রয়চুক্তি। ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হওয়ার প্রথম দলিল−

ক. বিক্রেতার উপর শুধুমাত্র প্রথম মূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। প্রথম মূল্যের চেয়ে কম বা বেশি যে কোনো শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ক্ষেত্রে এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না হয়ে নতুন বিক্রয় বিবেচিত হতো, তাহলে তারা যে মূল্য নির্ধারণ করত চাই সেটা প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি কিংবা কম, সেটা প্রদান করা আবশ্যক হতো। প্রথম মূল্য প্রদান আবশ্যক হতো না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা আলোচনা করে যা নির্ধারণ করে, তাই অপরজনকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হয় না। যেহেতু ইকালার মধ্যে প্রথম মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়− ক্রেতা-বিক্রেতার পরবর্তীতে নির্ধারণ করা মূল্য প্রদান আবশ্যক হয় না, তাই বুঝা গেল যে, ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, নতুন বিক্রয়চুক্তি নয়।

খ. তাছাড়া ইকালাহ ফাসিদ শর্তারোপ করার দ্বারা বাতিল হয় না। যদি ইকালাহ নতুন বিক্রয়চুক্তি হতো, তাহলে ফাসিদ শর্তের দ্বারা বাতিল হয়ে যেত। কারণ, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। যেহেতু ইকালাহ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না সেহেতু ইকালাহ ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় নয়; বরং ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি।

গ. ইকালাহ যে ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি নয় এর তৃতীয় দিক হলো, ইকালাহ করার পর বিক্রেতা যদি ক্রেতা থেকে পণ্যটি কব্জা নাও করে তবু যদি উক্ত পণ্যটি ক্রেতার কাছে আবার বিক্রি করে দেয়, তাহলে উক্ত বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। এর দ্বারাও বুঝা গেল যে, ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। কেননা, ইকালাহ যদি নতুন বিক্রয় সাব্যস্ত হতো, তাহলে বিক্রয়পণ্য কব্জা করার পূর্বেই তা বিক্রি করা হতো। অথচ বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার পূর্বে ক্রেতার জন্য তা বিক্রয় করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। আর ইকালাহ করার পর বিক্রীত-পণ্যটি আয়ত্তে নেওয়া ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রি জায়েজ হবে না। কারণ, ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে ইকালাহ হলো নতুন বিক্রয়, আর বিক্রয়ের মধ্যে যেমন আয়ত্তে নেওয়া ছাড়া বিক্রি নাজায়েজ তেমনি বিক্রেতা [যে

ইকালার মধ্যে ক্রেতা ছিল] এর পক্ষে বিক্রীত-পণ্য কব্জা করা ছাড়া বিক্রয় বৈধ হবে না। উপরিউক্ত তিনটি দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি।

ইকালাহ যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় এর প্রমাণ নিম্নোক্ত উদাহরণে লক্ষণীয়– এক ব্যক্তি একটি জায়গা/প্লট খরিদ করল, বিক্রেতার জমিনের পার্শ্ববর্তী জমিনদার তার শুফআর দাবি করল না, বরং সে তার হক পরিত্যাগ করল, অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার ফলে স্থানটি পুনরায় বিক্রেতার অধীনে চলে আসল। এখন সেই শফী যদি তার শুফআহ দাবি করতে চায়, তাহলে সে সেটা করতে পারে। কেননা, শফীর ক্ষেত্রে সেটা নতুন বিক্রি, অর্থাৎ যেন ক্রেতা বিক্রেতার কাছে সেই স্থানটি বিক্রয় করেছে যে স্থানটি সে বিক্রেতা থেকে খরিদ করেছিল। যেহেতু বিক্রয়ের দ্বারা শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয়, তাই এখানে ইকালাহ [যা তৃতীয় পক্ষের জন্য বিক্রি]-এর দ্বারা শফীর হক প্রমাণিত হবে। আর তাই শফী শুফআর হক চাইতে পারবে। মোটকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইকালাহ ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। আর অন্য সবার ক্ষেত্রে এটা নতুন বিক্রয়চুক্তি।

কিন্তু যদি কোনো কারণে ইকালাহকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি দাসী বিক্রয় করেছে এবং ক্রেতা দাসীটি কব্জা করেছে, অতঃপর ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর দাসীটি একটি সন্তান জন্ম দিল। এখন ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার মনস্থ করল, কিন্তু তাদের জন্য ইকালাহ করা বৈধ হবে না। কেননা, ইকালাহ ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে এমন বৃদ্ধি পাওয়া যা পণ্য থেকে পৃথক– এমন বৃদ্ধি বিক্রয় প্রত্যাহারকে বাধা প্রদান করে। সুতরাং দাসীর সন্তানটি দাসীকে ফেরত দানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বিবেচিত হবে। যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী বিক্রয়চুক্তিটি বহাল থাকবে।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি। তবে যদি কোনো কারণে এটাকে বিক্রয়চুক্তি না বলা যায়, তাহলে তাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা হবে। আর যদি প্রত্যাহার চুক্তি না বলা যায়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাস ক্রয় করে সেটাকে কব্জা করল, তারপর কোনো কারণবশত তারা ইকালাহ করল, তাহলে এটা বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত হবে। যেন ক্রেতা যে দাসটি বিক্রেতা থেকে খরিদ করেছিল সেটাই আবার বিক্রেতার কাছে বিক্রি করছে। তবে যদি ক্রেতা পণ্যটি বুঝে নেওয়ার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেটাকে বিক্রয় বলা যাবে না। কারণ, বিক্রীত-পণ্য কব্জা করার আগে সেটাকে বিক্রি করা অবৈধ।

আর যদি কেউ এক হাজার টাকায় একটি ক্রীতদাস ক্রয় করে তারপর গোলামটিকে কব্জা করার পূর্বেই দশমন গমের বিনিময়ে ইকালাহ করলে সেটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, ক্রেতা কব্জা করা ছাড়াই গোলামটির ব্যাপারে ইকালাহ করেছেন। তদ্রূপ এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তিও সাব্যস্ত করা যাবে না। কেননা, ইকালাহ বলা হয় প্রথম মূল্যের সমপরিমাণ প্রদানের মাধ্যমে [প্রথম] বিক্রয় প্রত্যাহার করা। এখানে ইকালাহর মধ্যে উভয়ে দশমন গমকে মূল্য নির্ধারণ করেছে; কিন্তু তাদের নির্ধারণকৃত এ মূল্য প্রথম বিক্রেতার মূল্য থেকে ভিন্ন ধরনের। আর প্রথম মূল্যের বিপরীত দ্রব্য দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার করা যায় না। সুতরাং যখন বিক্রয় এবং বিক্রয় প্রত্যাহার কোনোটাই বলা যাচ্ছে না, তখন ইকালাহই বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, যখন ইকালাহ বাতিল হয়ে গেল, তখন প্রথম বিক্রয়চুক্তিটি বহাল থাকবে।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার। তবে যদি কোনো কারণে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি বিবেচনা করা হবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন– এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করেছে, তারপর দাসীটি কব্জা করে তার আয়ত্তে আনল। তারপর আবার এক হাজার টাকার বিনিময়ে ইকালাহ করল, তাহলে এটা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে। আর যদি ইকালাহ করার পূর্বে দাসীটি সন্তান জন্ম দেয়, তাহলে এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত করা যাবে না। তখন এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে এবং বলা হবে ক্রেতা দাসী ও তার সন্তান এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছে।

আর যদি কেউ এক হাজার টাকার বিনিময়ে একটি দাসী ক্রয় করে সেটাকে কব্জা না করেই দশ মন গমের বিনিময়ে ইকালাহ করে, তাহলে তার এ ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তিও হবে না এবং নতুন বিক্রয়ও হবে না। বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হবে না তার কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা হয় প্রথম মূল্যের বিনিময়ে। প্রথম মূল্যের বিপরীত ধরনের বস্তুর বিনিময়ে নয়। অথচ এখানে প্রথম মূল্যের বিপরীত ধরনের বস্তু দ্বারা ইকালাহ করা হচ্ছে। অতএব, এটা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি হবে না। এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত না করার কারণ হলো, কব্জা করার পূর্বে পণ্য বিক্রি করা অবৈধ, আর এখানে দাসী [বিক্রীত-পণ্য] কব্জার পূর্বেই ইকালাহ [বিক্রি] করা হচ্ছে। মোটকথা, যখন বিক্রয় প্রত্যাহার বা বিক্রয় কোনোটাই সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তখন এটা বাতিল হয়ে যাবে। আর ইকালাহ বাতিল হওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রথম বিক্রয়চুক্তি বহাল থাকা।

নিম্নে ইমামদের মতের স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হচ্ছে–

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : ইকালাহ (اِقَالَةٌ) -এর আভিধানিক অর্থ– বিক্রয় প্রত্যাহার করা, রহিত করা ও দূর করা। যেমন–দোয়ার মধ্যে বলা হয় اَقِلْنِىْ عَثَرَاتِىْ 'আমার বিচ্যুতিগুলো দূর করে দাও, আমাকে ক্ষমা করে দাও।' ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী কোনো শব্দকে হাকীকী [প্রকৃত] অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হলে মাজাযী [রূপক] অর্থে গ্রহণ করা হয় না। আর এজন্য اِقَالَةٌ শব্দটিকে প্রকৃতার্থে গ্রহণ করতঃ বলা হয়েছে যে, ইকালাহ অর্থ বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা। তবে যখন প্রকৃত অর্থ 'প্রত্যাহার করা' গ্রহণ করা সম্ভব না হবে, তখন তার রূপক অর্থ বা সম্ভাব্য অন্য অর্থ তথা বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা হবে। সম্ভাব্য অর্থ যে 'বিক্রয়' তার প্রমাণ হলো, এটা ক্রেতা ও বিক্রেতা ছাড়া অন্য সবার কাছে বিক্রয়চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তির অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হলে এটাকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে দুজনের মালামাল বিনিময় হচ্ছে ইকালাহ। কারণ, ইকালার মধ্যে ক্রেতা পণ্য ও বিক্রেতা মূল্য প্রদান করে থাকে। আর এটাই তো বিক্রয়ের সংজ্ঞা। সুতরাং অর্থের বিচারে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তি। তাছাড়া ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন– যদি ক্রেতার হাতে বিক্রীত-পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইকালাহ বাতিল হয়ে যায়, যেমন বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রীত-পণ্য অর্পণ করার আগেই যদি পণ্যটি বিক্রেতার হাতে থাকাকালেই বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে ক্রেতা কব্জা করার পর যদি কোনো দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে ইকালাহ করার পর [প্রথম] বিক্রেতা দোষের কারণে পণ্যটি ক্রেতার কাছে ফেরত দিতে পারবে, যেমন বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতা দোষের কারণে পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে। তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর যেমন শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয় তেমনি ইকালাহ করার দ্বারা শফীর শুফআর হক প্রমাণিত হয়। মোটকথা, যখন ইকালাহ শব্দটির মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান এবং বিক্রয়ের বিধিবিধান ইকালাহের জন্য প্রমাণিত হয়, তখন ইকালাহ করার অর্থ আসলে বিক্রি করা। আর এজন্যই ইকালাহকে বিক্রয়চুক্তি বলা হয়েছে। তবে যখন ইকালাহকে বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার কথাকে অনর্থক হওয়া থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ইকালাহকে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করার অর্থে গ্রহণ করা হবে।

وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ اللَّفْظَ يُنْبِئُ عَنِ الْفَسْخِ وَالرَّفْعِ كَمَا قُلْنَا ، وَالْاَصْلُ اِعْمَالُ الْاَلْفَاظِ فِىْ مُقْتَضَيَاتِهَا الْحَقِيْقِيَّةِ، وَلَا يَحْتَمِلُ اِبْتِدَاءَ الْعَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ، لِاَنَّهُ ضِدُّهُ، وَاللَّفْظُ لَا يَحْتَمِلُ ضِدَّهُ، فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ، وَكَوْنُهُ بَيْعًا فِىْ حَقِّ الثَّالِثِ اَمْرٌ ضَرُوْرِىٌّ، لِاَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ مِثْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمِلْكُ، لَا مُقْتَضَى الصِّيْغَةِ، اِذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلٰى غَيْرِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, [ইকালাহ] শব্দটিতে প্রত্যাহার ও রহিত করার অর্থ রয়েছে যেমনটা আমরা বললাম। আর মূলনীতি হলো, শব্দকে তার প্রকৃত চাহিদানুযায়ী প্রয়োগ করা। প্রাথমিক অবস্থায় ইকালাহ শব্দের মধ্যে বিক্রয়চুক্তির অর্থের সম্ভাবনা নেই যে, প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে সে অর্থ নেওয়া যাবে। কেননা, প্রত্যাহার বিক্রয়চুক্তির বিপরীত। কখনো শব্দ তার বিপরীত অর্থ ধারণ করে না, ফলে ইকালাহ বাতিল হওয়াটাই নির্ধারিত হয়ে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়া তো অনিবার্য বিষয়। কেননা, এর দ্বারা বিক্রয়চুক্তির অনুরূপ হুকুম প্রমাণিত হয়। আর তা হলো মালিকানা। এটা শব্দের চাহিদা বা অর্থ নয়। কেননা, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের অন্য কারো উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّ اللَّفْظَ الخ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : اقالة শব্দের অর্থ–বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা, রহিত করা ও দূর করা। [যেমনটা ইতঃপূর্বে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।] আর ফিক্‌হশাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী শব্দকে তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করা হবে, প্রকৃত অর্থে ব্যবহার অসম্ভব হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর তা অসম্ভব হয়ে গেলে রূপক ও অন্যান্য সম্ভাব্য অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে [যদি সেটা সম্ভব হয়]। এ মূলনীতি অনুসারে ইকালাহ শব্দটির অর্থ হবে– বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করা এবং রহিত করা। তবে যখন এ অর্থ [রহিত করা] গ্রহণ অসম্ভব হয়ে যাবে, তখনও বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের সূচনা করার অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ, ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয়চুক্তির বিপরীতার্থক। কেননা, ইকালাহ করা হয় মালিকানা দূর করার জন্য, আর বিক্রয় করা হয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যেহেতু বিক্রয়ের অর্থ ইকালার অর্থের বিপরীত, তাই ইকালাহ দ্বারা বিক্রয় উদ্দেশ্য করা যাবে না। কারণ, কোনো শব্দ তার বিপরীতার্থ ধারণ করে না। সুতরাং যেহেতু ইকালাহ বিক্রয়ের অর্থ ধারণ করে না সেহেতু ইকালাহ শব্দ দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ সম্ভব না হলে বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। যখন বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ অসম্ভব তখন প্রত্যাহার করার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হলে ইকালাহ বাতিল হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না।

قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ بَيْعًا فِىْ حَقِّ الثَّالِثِ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ক্রেতা-বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় পক্ষের কাছে ইকালাহ হচ্ছে নতুন বিক্রয়। যদি ইকালার মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ নাই থাকে, তাহলে তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা বিক্রয় কি করে সাব্যস্ত হবে ? [যেমন শফীর কাছে এটা বিক্রয়।]

উত্তর : তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা অনিবার্যভাবে বিক্রয় সাব্যস্ত হয়েছে। এটা শব্দের সম্ভাব্য অর্থ হিসেবে হয়নি। এর ব্যাখ্যা হলো, বিক্রেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা প্রমাণ করা অর্থাৎ বিক্রীত পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিক্রয়চুক্তি করা হয়। তবে মালিকানা বিক্রয়ের দ্বারা দূর হওয়া অনিবার্য বিষয়। অর্থাৎ যখন পণ্যের উপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন পণ্য থেকে বিক্রেতার মালিকানা খতম হবে। এমনিভাবে যখন পণ্যের মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আবশ্যিকভাবে ক্রেতার মালিকানা দূরীভূত হবে।

মোটকথা, বিক্রয়ের উদ্দেশ্য মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা, আর এতে মালিকানা দূর হওয়া আবশ্যিক বিষয়। পক্ষান্তরে ইকালাহ -এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানা দূর করা ও বাতিল করা। অর্থাৎ বিক্রীত-পণ্য হতে ক্রেতার মালিকানা এবং পণ্যের মূল্য হতে বিক্রেতার মালিকানা দূর করা। আর এজন্যই ইকালাহকে শরিয়ত অনুমোদন করেছে। তবে অনিবার্যভাবে ইকালার মধ্যে মালিকানা নতুন করে প্রতিষ্ঠিতও হয়।

এর ব্যাখ্যা হলো, যখন ইকালার সাহায্যে বিক্রীত-পণ্য থেকে ক্রেতার মালিকানা দূর হবে, তখন অনিবার্যভাবে বিক্রীত-দ্রব্যের মালিকানা নতুনভাবে বিক্রেতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তদ্রূপ যখন বিক্রয়মূল্য থেকে বিক্রেতার মালিকানা দূর হবে, তখন আবশ্যিকভাবে এতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সারকথা, ইকালার মাধ্যমে বিক্রীত-পণ্যে বিক্রেতার মালিকানা এবং পণ্যের মূল্যে ক্রেতার মালিকানা অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইকালার চাহিদা ও দাবি মতে মালিকানা দূরীভূত হওয়ার বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা, ইকালাহ চুক্তিকারী ক্রেতা-বিক্রেতাদ্বয়ের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। যখন ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে ইকালার দাবির অনুসরণ করা হয়েছে, তখন তৃতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে ইকালার অনিবার্য ফলাফলটি অর্থাৎ মালিকানা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকটি লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের ভিন্ন ব্যক্তিদের উপর চুক্তি প্রত্যাহার করার বিষয়টি আরোপ করার অধিকার নেই। আর এটা জানা কথা যে, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিক্রয়চুক্তির হুকুম। সুতরাং চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এটা অনিবার্যভাবে বিক্রয়চুক্তি হবে।

অতএব, যেহেতু চুক্তির পক্ষদ্বয় কর্তৃক অন্যের উপর বিক্রীত-পণ্যটি প্রত্যাহার করার বিষয়টি চাপিয়ে দেওয়ার কর্তৃত্ব নেই, কারণ, অন্যদের ক্ষেত্রে 'বিক্রয় প্রত্যাহার' ক্ষতিকর– তাই অন্যদের ক্ষেত্রে এটা নতুন বিক্রয় হবে, যা অন্য [শফী]-এর জন্য সুখবর হবে। যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, অন্যদের ক্ষেত্রে বিক্রয় হওয়াটা অনিবার্য বিষয়, তাই এটা দ্বারা আপত্তি করা সমীচীন হবে না এবং প্রশ্নকারীর একথা বলাও ঠিক হবে না যে, যেহেতু তৃতীয় পক্ষের কাছে এটা বিক্রয়চুক্তি, সুতরাং ইকালাহ শব্দের মধ্যে বিক্রয়ের অর্থ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, "ইকালাহ শব্দের চাহিদা হচ্ছে বিক্রয়" প্রতিপক্ষের এ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, ইকালাহ শব্দের চাহিদা হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার। আর এটা সর্বসম্মত বিষয়। এখন যদি প্রতিপক্ষের আলিমগণ বলেন, এতে বিক্রয়ের অর্থ বিদ্যমান কিংবা এর চাহিদা হচ্ছে বিক্রয়, তাহলে হাকীকত [বিক্রয় প্রত্যাহার] এবং মাজায [বিক্রয়] একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে। আর শব্দের মধ্যে যুগপৎভাবে হাকীকত ও মাজায একত্রিত হতে পারে না।

সারকথা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ইকালাহ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের কাছে বিক্রয় প্রত্যাহার অন্যদের কাছে নতুন বিক্রয়। বিক্রয় প্রত্যাহার সাব্যস্ত না করা গেলে ইকালাহ বাতিল।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয়চুক্তি। যদি কোনো কারণবশত এটাকে বিক্রয়চুক্তি বলা সম্ভব না হয়– তাহলে যদি বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা সম্ভব হয়, তবে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইকালাহ বাতিল।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি। যদি কোনো কারণবশত ফসখ না হয়, তাহলে [সম্ভব হলে] নতুন বিক্রয়চুক্তি। আর তাও বলা সম্ভব না হলে ইকালাহ বাতিল।

إِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُولُ إِذَا شَرَطَ الْأَكْثَرَ فَالْإِقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِّيَادَةِ، إِذْ رَفْعُ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا مُحَالٌ، فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا فِي الْعَقْدِ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبٰوا، أَمَّا لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا فِي الرَّفْعِ، وَكَذَا إِذَا شَرَطَ الْأَقَلَّ لِمَا بَيَّنَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَحْدُثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ، فَحِينَئِذٍ جَازَتِ الْإِقَالَةُ بِالْأَقَلِّ، لِأَنَّ الْحَطَّ يُجْعَلُ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ، وَعِنْدَهُمَا فِي شَرْطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا، لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح)، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) جَعْلُهُ بَيْعًا مُمْكِنٌ، فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهٰذَا الْبَيْعَ، وَكَذَا فِي شَرْطِ الْأَقَلِّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح)، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) هُوَ فَسْخٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ سُكُوتٌ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ سَكَتَ عَنِ الْكُلِّ وَأَقَالَ يَكُونُ فَسْخًا، فَهٰذَا أَوْلٰى، بِخِلَافِ مَا إِذَا زَادَ، وَإِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ فَهُوَ فَسْخٌ بِالْأَقَلِّ لِمَا بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : যখন এটা [উপরিউক্ত মূলনীতি] সাব্যস্ত হলো, তখন আমরা বলব, যদি কেউ [প্রথম মূল্যের চেয়ে] বেশির শর্ত করে, তাহলে ইকালাহ প্রথম মূল্যের উপরই সংঘটিত হবে। কেননা, অতিরিক্ত মূল্যের উপর পূর্ববর্তী বিক্রয়কে প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। কারণ, যা সাব্যস্তই ছিল না তা রহিত করা অসম্ভব। সুতরাং [অতিরিক্ত মূল্যের] শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। [ইকালাহ বাতিল হবে না।] কেননা, ইকালাহ ফাসিদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। বিক্রয়চুক্তির বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, বিক্রয়চুক্তির মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা সম্ভব। ফলে সুদের উপস্থিতি ঘটবে। কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয় প্রত্যাহারে যোগ করা সম্ভব নয়। এমনিভাবে যদি [প্রথম মূল্যের চেয়ে] কম মূল্যের শর্তারোপ করে [তাহলে প্রথম মূল্যের উপর ইকালাহ হবে]। এর দলিল তাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। তবে যদি বিক্রীত-পণ্যের মাঝে কোনো দোষ জন্মায়, তখন কম মূল্যে বিক্রয় প্রত্যাহার বৈধ হয়ে যায়। কেননা, হ্রাসকৃত অংশ দোষের কারণে যে ঘাটতি হয়েছে তার বিপরীতে বিবেচনা করা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে অতিরিক্ত মূল্যের শর্তারোপের ক্ষেত্রে [ইকালাহটি] বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মূলত ইকালাই হলো বিক্রয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এটাকে বিক্রয় বিবেচনা করা সম্ভব। সুতরাং যখন সে মূল্য বাড়াল তখন এর দ্বারা সে বিক্রয়েরই ইচ্ছা করল। তদ্রূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কম মূল্যের শর্ত করা অবস্থায় একই কথা প্রযোজ্য। কেননা, তাঁর মতে বিক্রয় হলো ইকালার মূলার্থ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এমতাবস্থায় ইকালাহ প্রথম মূল্য দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি গণ্য হবে। কেননা, এতে প্রথম মূল্যের কিয়দংশের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। যদি কেউ সম্পূর্ণ মূল্যের ব্যাপারে নীরব থাকে এবং বিক্রয় প্রত্যাহার করে তবু বিক্রয় প্রত্যাহার হয়ে যাবে, তাহলে কিয়দংশ অনুল্লেখ থাকলে এটা আরো উত্তমভাবেই বিক্রয় প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের শর্তারোপ করার বিষয়টি ভিন্ন। আর যদি [ক্রেতা দখল করার

পর] বিক্রীত-পণ্যের মাঝে কোনো দোষ দেখা দেয়, তাহলে প্রত্যাহার-চুক্তি [প্রথম মূল্যের চেয়ে] হ্রাসকৃত মূল্যের উপর হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا ثَبَتَ هٰذَا نَقُوْلُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ইকালার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমামগণের যে মতবিরোধ বর্ণনা করেছেন সেই মতবিরোধের ফলাফল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন।

লেখক বলেন, যখন এ মূলনীতি স্থির হলো যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ইকালাহ হলো বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, আর যদি এটাকে প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। সে মতে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি ইকালার মধ্যে প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য প্রদানের শর্ত করা হয়– উদাহরণস্বরূপ প্রথম বিক্রয়ে মূল্য সাব্যস্ত হয়েছিল এক হাজার টাকা। বর্তমানে ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করছে পনের শত টাকায়। অর্থাৎ তাদের দুজনের একজন শর্তারোপ করল প্রথম মূল্যের চেয়ে পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত তাকে দিতে হবে আর অপরজন তা মেনে নিল। এমতাবস্থায় এক হাজার টাকার উপর ইকালাহ হয়ে যাবে। বাকি পাঁচশত টাকার উল্লেখ অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।

এর দলিল হলো, প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়। কারণ, বিক্রয় প্রত্যাহার বলা হয় প্রথম বিক্রয় যেভাবে সংঘটিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই সেটাকে প্রত্যাহার করা, প্রথম মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয় প্রত্যাহারের দাবি করলে সেটা বিক্রয় প্রত্যাহার হবে না। কেননা, এতে করে এমন বিষয় প্রত্যাহার করা আবশ্যক হয় যা মূলে ছিলই না। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে পনের শত টাকার উপর যদি প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে পাঁচশত টাকা প্রত্যাহার বা রহিত করা হচ্ছে অথচ এই পাঁচশত টাকা প্রথম বিক্রয়ে অবিদ্যমান। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, যা মূলে ছিল না তা প্রত্যাহার অসম্ভব। আর এজন্যই প্রথম মূল্যের চেয়ে বেশি শর্ত করা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। তবে এমন একটি বাতিল শর্তের কারণে ইকালাহ অবশ্য বাতিল হবে না। কারণ, ইকালাহ বা বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি ফাসিদ শর্তারোপ করার কারণে বাতিল হয় না। এখন প্রশ্ন হলো যে, ইকালাহ ফাসিদ শর্তের কারণে বিক্রয়চুক্তির মতো কেন বাতিল হয় না?

এর উত্তর হলো, অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত অনেকটা সুদের মতো। কেননা, এ অতিরিক্ত মূল্যের কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতা যে কোনো একজনের বিনিময়হীন লাভ হচ্ছে। আর বিনিময়হীন অতিরিক্ত মুনাফা হচ্ছে সুদ। সুতরাং অতিরিক্ত মূল্যের শর্ত সুদের মতো হলো। আর ইকালাহ অর্থগতভাবে বিক্রয়ের অনুরূপ। সুতরাং ইকালাহ-এর মধ্যে ফাসিদ শর্ত "সন্দেহের মাঝে সন্দেহ"-এর পর্যায়ভুক্ত। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, সুদ হওয়ার সন্দেহ শরিয়তের মধ্যে ধর্তব্য, তবে এর চেয়ে নিম্নস্তর তথা সন্দেহের মাঝে সন্দেহ ধর্তব্য নয়। আর এজন্য উক্ত শর্ত করা সত্ত্বেও ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে প্রত্যাহার-চুক্তির বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে।

বিক্রয়চুক্তি এর ব্যতিক্রম। কারণ, প্রত্যাহার-চুক্তিতে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা অসম্ভব। কিন্তু বিক্রয়ের মধ্যে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা অসম্ভব নয়। উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি একটি দিরহামকে দু-দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল, তাহলে অতিরিক্ত দিরহামের কারণে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এখানে এটা বলা যাবে না যে, এক দিরহামকে এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, আর অতিরিক্ত দিরহামটি বাতিল। কারণ, বিক্রয়ের মধ্যে অতিরিক্ত দিরহাম যোগ করা সম্ভব। যখন অতিরিক্ত দিরহাম যোগ করা সম্ভব, তখন সুদ নিশ্চিত হয়ে গেল। আর এটা স্বীকৃত মাসআলা যে, সুদের উপস্থিতির কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এজন্যই এখানে অতিরিক্ত দিরহামটি যুক্ত করার কারণে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইকালাহ-এর মাঝে অতিরিক্ত মূল্য যোগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইকালাহ হচ্ছে প্রত্যাহার-চুক্তি বা যা বিদ্যমান তাকে রহিত করা ও দূর করা। আর যে অতিরিক্ত মূল্য বিক্রয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না তা রহিত করা তো অসম্ভব। আর এজন্যই ইকালার মাঝে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, তবে ইকালাহ বাতিল হবে না।

মাসআলা : যদি কেউ ইকালার মধ্যে পূর্ব বিক্রয়ে ধার্য মূল্যের চেয়ে কমের শর্ত করে, উদাহরণস্বরূপ প্রথম মূল্য ছিল এক হাজার টাকা– ইকালাহ করার সময় বিক্রেতা বলল, আটশ টাকা দেব। এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের উপরই ইকালাহ হয়ে যাবে, আর শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। দলিল হলো, যে বিষয় প্রথম বিক্রয়ে [আটশ টাকা] ছিল না তা দূর করা অসম্ভব। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম বিক্রয় এক হাজার টাকায় সম্পাদিত হয়েছিল, এতে হ্রাসকৃত মূল্য তথা আটশ টাকা ছিল না, আর তাই ইকালাহ-এর মাধ্যমে এটাকে দূর করা অসম্ভব। অসম্ভব শর্তের কারণে শর্তটি বাতিল তবে ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

লেখক বলেন, বিক্রয়ের পর বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় যদি এতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যা বিক্রেতার কাছে থাকাকালীন সময়ে ছিল না এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইকালাহ করা বৈধ। কেননা, ইকালাহ-এর মধ্যে প্রথম মূল্য থেকে যতটুকু হ্রাস করা হবে উদাহরণস্বরূপ দু-শ টাকা, এই হ্রাসকৃত দু-শ টাকা বিক্রীত-পণ্যের সে অংশের বিপরীতে হবে যে অংশটি দোষ দেখা দেওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দোষের কারণে যতটা ক্ষতি হয়েছে তার বিপরীতে বিক্রেতা দু-শ টাকা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। আর এতে কোনো দোষ নেই, এটা শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাযহাবের সারকথা হলো, যদি কেউ এক হাজার টাকায় একটি দাস ক্রয় করে, তারপর এক হাজার টাকায় ইকালাহ করে, তাহলে ইকালাহ সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি পনের শত টাকায় ইকালাহ করে, তাহলে এক হাজার টাকার উপরই ইকালাহ হবে, অতিরিক্ত পাঁচশ টাকার শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি আটশ টাকার উপর ইকালাহ করে এবং বিক্রীত-পণ্যে কোনো দোষ না দেখা দেয়, তাহলে এক হাজার টাকার উপর ইকালাহ হবে। তবে যদি হ্রাস করার শর্ত করা হয় তা অগ্রাহ্য হবে। কিন্তু যদি বিক্রীত-পণ্য ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পর এতে কোনো দোষের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে হ্রাসকৃত মূল্যের উপর ইকালাহ হওয়াতে কোনো দোষ নেই, অর্থাৎ যদি আটশ টাকার উপর ইকালাহ করতে চায়, তাহলে ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত মাসআলায় অর্থাৎ কোনো বস্তু বিক্রয় হয়েছে এক হাজার টাকায়, কিন্তু ইকালার সময় পনের শত টাকার প্রস্তাব করা হলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এ ইকালাহ বিক্রয়চুক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং পনের শত টাকার উপরই দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পাদিত হবে। চুক্তিটি সম্পর্কে বলা হবে যে, ক্রেতা এক হাজার টাকায় গোলামটি ক্রয় করতঃ বিক্রেতার কাছে পরে পনের শত টাকা বিক্রি করেছে।

তাঁদের দলিল : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালার মূল অর্থ হলো বিক্রয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইকালাহকে যদিও মৌলিকভাবে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলেন, কিন্তু যেহেতু অতিরিক্ত মূল্যের অবস্থায় প্রত্যাহার অসম্ভব এবং ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব, তাই এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, [পূর্বে বলা হয়েছে যে,] ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে ইকালাহ হচ্ছে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, তবে যদি এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহারচুক্তি সাব্যস্ত না করা যায়, তাহলে এটাকে [বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব হলে] বিক্রয় সাব্যস্ত করা হবে। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম মূল্যের চেয়ে ইকালার মধ্যে অতিরিক্ত পাঁচশ টাকার শর্ত করার কারণে এটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি বলা অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয় ক্রেতা ও বিক্রেতার কথাকে অর্থহীন হওয়া থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ইকালাহকে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা হবে। তাঁর মতে ইকালার সম্ভাব্য এবং রূপক অর্থ হলো বিক্রয়। আর নিয়মানুযায়ী কোনো শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব হলে তার রূপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। সে মতে এখানে ইকালাহকে বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ ইকালাহ সম্পর্কে বলা হবে যে, এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথন বিক্রয় প্রত্যাহার সম্পর্কে নয়; বরং নতুন বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যও বিক্রয় প্রত্যাহার নয়।

আর যদি প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের শর্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতা বলল, আমি এক হাজার টাকার পরিবর্তে তোমাকে আটশ টাকা প্রদান করব, আর ক্রেতা সেটাই মেনে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ ইকালাহটিও বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কারণ, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালাহ মানেই বিক্রয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এমতাবস্থায় প্রথম মূল্যের উপরই বিক্রয় প্রত্যাহার হবে এবং বিক্রেতাকে প্রথম ধার্যকৃত এক হাজার টাকাই প্রদান করতে হবে। শর্তকৃত মূল্য হ্রাস করার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যখন বিক্রেতা শর্ত করল যে, আমি আটশ টাকা ফেরত দেব তখন যেন সে দু-শ টাকা অনুল্লেখ করল এবং দু-শ টাকার ব্যাপারে নীরব রইল। নিয়মানুযায়ী কেউ পুরো মূল্য উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকে ইকালাহ করলে ইকালাহ সংঘটিত হয়ে যায়। সুতরাং মূল মূল্যের কিয়দংশের ব্যাপারে চুপ থাকলে আরো উত্তমভাবে ইকালাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ইকালাহ করলে যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব, তাই ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে প্রথম মূল্যের বেশি মূল্যে যেহেতু বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই তখন ইকালাহ ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে।

লেখক বলেন, যদি ক্রেতার দখলে আসার পর বিক্রীত-পণ্যের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হয়, তাহলে প্রথম মূল্যের চেয়ে কমের উপরই বিক্রয় প্রত্যাহার হবে এবং শর্তকৃত আটশ টাকাই বিক্রেতার উপর ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। বিক্রেতার পূর্ণ মূল্য তথা এক হাজার টাকা প্রদান করতে হবে না। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

وَلَوْ اَقَالَ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ فَهُوَ فَسْخٌ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَيُجْعَلُ التَّسْمِيَةُ لَغْوًا، وَعِنْدَهُمَا بَيْعٌ لِمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ وَلَدَتِ الْمَبِيْعَةُ وَلَدًا ثُمَّ تَقَايَلَا فَالْاِقَالَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَهُ، لِاَنَّ الْوَلَدَ مَانِعٌ مِنَ الْفَسْخِ، وَعِنْدَهُمَا يَكُوْنُ بَيْعًا، وَالْاِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُوْلِ وَغَيْرِهِ فَسْخٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ)، وَكَذَا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) فِي الْمَنْقُوْلِ لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ، وَفِي الْعَقَارِ يَكُوْنُ بَيْعًا عِنْدَهُ لِاِمْكَانِ الْبَيْعِ، فَاِنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُ ـ

অনুবাদ : আর যদি প্রথম মূল্যের ভিন্নশ্রেণীভুক্ত কোনো বস্তুর মাধ্যমে ইকালাহ করে, তাহলে প্রথম মূল্যের দ্বারাই বিক্রয় প্রত্যাহার বিবেচিত হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে। আর ভিন্নশ্রেণীর মূল্যের উল্লেখটি অর্থহীন সাব্যস্ত করা হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা বিক্রয়চুক্তি হবে। এর দলিল আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি বিক্রীত দাসী সন্তান প্রসব করে তারপর উভয় পক্ষ ইকালাহ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ইকালাহ বাতিল হবে। কেননা. সন্তানের জন্ম বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক। সাহেবাইন (র.) -এর মতে এ ইকালাহ বিক্রয় বলে বিবেচিত হবে। স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার মালের ক্ষেত্রে কব্জার পূর্বে কৃত ইকালাহ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। অস্থাবর মালের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতও তাই। কেননা, এটাকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা অসম্ভব। আর ভূমির ক্ষেত্রে ইকালাহ তাঁর [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর] মতে বিক্রয়চুক্তি বলে গণ্য। কেননা, এটিকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব। কেননা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে কব্জা করার পূর্বে ভূমি বিক্রি করা বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَقَالَ بِغَيْرِ جِنْسِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে বিক্রয় প্রত্যাহার সংক্রান্ত [তিন ইমামের মতানুযায়ী] কতিপয় মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে–

প্রথম মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম মূল্যের ভিন্ন শ্রেণীর কোনো জিনিসের বিনিময়ে ইকালাহ করে, উদাহরণস্বরূপ প্রথম মূল্য ছিল দিরহাম বা টাকা, ইকালাহ করা হলো দিনার অথবা চাল দ্বারা। এমতাবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে তার উক্ত ইকালাহ প্রথম মূল্য তথা দিরহাম কিংবা টাকার দ্বারাই হবে। আর পরে ইকালার সময় যে মূল্য তথা দিনার কিংবা চাল উল্লেখ করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রেতার উপর পূর্ব পরিশোধিত মূল্য দিরহাম বা টাকা প্রদান করা আবশ্যক হবে। দিনার বা চাল প্রদান করা আবশ্যক হবে না। আর তার উক্ত ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে।

সাহেবাইন (র.) -এর মত এ ব্যাপারে ভিন্ন। তাঁরা বলেন, প্রথমোক্ত মূল্য ছাড়া অন্য যে কোনো মূল্যের উপর ইকালাহ করা হলে সেটা বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। তাদের কৃত এ ইকালাহ সম্পর্কে বলা হবে যে, ক্রেতা যে পণ্য দিরহাম বা টাকার বিনিময়ে বিক্রেতা থেকে ক্রয় করেছিল তাই আবার বিক্রেতার কাছে দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করেছে। তাঁদের উভয়ের দলিল পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ইকালার মূল অর্থই হলো বিক্রয়চুক্তি। তবে বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত না করা গেলে সেটা বিক্রয় প্রত্যাহার বিবেচিত হয়। সেমতে এটা বিক্রয়চুক্তি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এটা যদিও

বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি, কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় পূর্ব পরিশোধিত মূল্যের থেকে ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য দ্বারা ইকালাহ করার কারণে সেটাকে বিক্রয় প্রত্যাহার-চুক্তি সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তাই এটা বিক্রয়চুক্তি বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : হিদায়া প্রণেতা বলেন, যদি বিক্রীত দাসী ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর বাচ্চা প্রসব করে, এরপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে ইকালাহ করে, তাহলে উক্ত ইকালাহ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর মতে ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহারকে বলা হয়। আলোচ্য মাসআলায় কব্জা করার পর যে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে সন্তান জন্মানোর মাধ্যমে, সেটা বিক্রীত দাসী থেকে পৃথক, আর নিয়মানুযায়ী বিক্রীত-পণ্য থেকে পৃথক যে কোনো বৃদ্ধি বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক। যেহেতু সন্তান মা থেকে পৃথক, সুতরাং সন্তানসহ মাকে বিক্রয় প্রত্যাহারের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা অসম্ভব। আর এ কারণে ইকালাহ বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে এবং প্রথম বিক্রয়টি বহাল থাকবে, তবে যদি বিক্রীত দাসীটি ক্রেতার আয়ত্তে আসার পূর্বে সন্তান প্রসব করে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইকালাহ সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, পৃথকভাবে বৃদ্ধি যদি কব্জার পূর্বে ঘটে থাকে, তাহলে তা বিক্রয় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

আর যদি বিক্রীত-পণ্যের মাঝে এমন প্রবৃদ্ধি ঘটে যা বস্তু থেকে ভিন্ন নয়; বরং সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন দাসী বিক্রয় করার পর মোটা হয়ে গেল বা সুন্দরী হয়ে গেল, তাহলে তার এ বৃদ্ধি কব্জার পরে হোক কিংবা আগে হোক তা বিক্রয় প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। সাহেবাইন (র.) বলেন, ক্রেতা কব্জা করার পর যদি বিক্রীত দাসীটি সন্তান প্রসব করে তারপর তারা ইকালাহ করলে উক্ত ইকালাহ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তো এ কারণে যে, ইকালার মূল অর্থ তো বিক্রয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এখানে যেহেতু বিক্রীত-পণ্যের প্রবৃদ্ধি পৃথক জিনিস, তাই এখানে বিক্রি প্রত্যাহার করা সম্ভব নয়, তাই ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, এখানে ইকালাহকে বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মূলনীতিও এটাই যে, ইকালাহ বিক্রয় প্রত্যাহার গণ্য হবে। যদি বিক্রয় প্রত্যাহারের অর্থ গ্রহণ সম্ভব না হয়, তাহলে [সম্ভব হলে] বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় মাসআলা : اَلْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِى الْمَنْقُوْلِ থেকে শুরু হয়েছে। মাসআলাটির আলোচনার পূর্বে আমরা দুটি মূলনীতি উল্লেখ করতে চাই–

১. অস্থাবর সব বস্তু কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ।

২. স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা শায়খাইনের মতে জায়েজ, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে অবৈধ।

মাসআলা : যদি কেউ স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পদ কব্জা করার পূর্বেই ইকালাহ করতে চায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে এ ইকালাহটি বিক্রয় প্রত্যাহার বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, তাঁদের মতে ইকালার মূল অর্থ হচ্ছে বিক্রি প্রত্যাহার করা। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রীত সম্পদ অস্থাবর হলে ইকালাহ 'বিক্রয় প্রত্যাহার' বিবেচিত হবে। কেননা, তাঁর মতে ইকালার মূল অর্থ যদিও বিক্রয়, কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা অস্থাবর সম্পদকে কব্জা করার পূর্বেই ইকালাহ করে ফেলেছে। আর অস্থাবর মালামাল কব্জা করার পূর্বেই বিক্রি করা জায়েজ নয়। এ কারণে এখানে ইকালাহকে বিক্রি সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুযায়ী ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত না করা গেলে বিক্রয় প্রত্যাহার সাব্যস্ত করা হয়। এখানেও তাই ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর যদি বিক্রীত বস্তু স্থাবর হয় যেমন– জমিন, বড় গাছ ইত্যাদি তাহলে তাদের ইকালাহ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, স্থাবর সম্পত্তির ইকালাহকে বিক্রয় সাব্যস্ত করা সম্ভব। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পদ কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েজ। অতএব এখানে কব্জা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তির ইকালাহ করার কারণে ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

মাসআলা : যদি কেউ بَيْعِ صَرْفْ [মুদ্রা লেনদেন] করার পর সেটার ইকালাহ করতে চায়, তাহলে উভয় লেন-দেন মজলিসের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তো বটেই– অন্য ইমামদ্বয়ের মতেও।

قَالَ : وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ، وَهَلَاكُ الْمَبِيْعِ يَمْنَعُ عَنْهَا، لِأَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدْعِيْ قِيَامَهُ، وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمَبِيْعِ دُوْنَ الثَّمَنِ فَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيْعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِيْ لِقِيَامِ الْبَيْعِ فِيْهِ، وَإِنْ تَقَايَضَا تَجُوْزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِهِمَا، وَلَا تَبْطُلُ بِهَلَاكِ أَحَدِهِمَا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيْعٌ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [প্রথম বিক্রয়ের] মূল্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালাহ সহীহ হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না, তবে বিক্রীত-পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালাহকে বাধাগ্রস্ত করে। কেননা, বিক্রয়চুক্তির প্রত্যাহার বিক্রয়ের বিদ্যমানতা দাবি করে। আর তা বিক্রীত-পণ্যের দ্বারা বিদ্যমান থাকে– মূল্যের অস্তিত্ব দ্বারা নয়। যদি বিক্রীত-পণ্যের কিছু অংশ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্টাংশে ইকালাহ বৈধ হবে। কারণ, অবশিষ্টাংশে বিক্রয় বিদ্যমান আছে। যদি পরস্পর পণ্য আদান-প্রদানের বিক্রয় করে, তাহলে একটি বিনিময় বিনষ্ট হওয়ার পরও ইকালাহ বৈধ হবে এবং একটি বিনষ্ট হওয়ার কারণে ইকালাহ বাতিল হবে না। কেননা, দুটি বস্তুর প্রত্যেকটিইতো বিক্রীত-পণ্য। সুতরাং বিক্রয় তখন বহাল থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সঠিক বিষয় সম্পর্কে অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে ইকালাহ পরিচ্ছেদের সর্বশেষ মাসআলাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : যদি বিক্রয়চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে প্রদত্ত মূল্য [যে কোনো ধরনের মুদ্রা] বিক্রেতার কাছে বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বিক্রেতার হাতছাড়া হয়ে যায়, তারপর তারা দু-জনে ইকালাহ করতে চায়, তাহলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট কিংবা হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে ইকালাহ তথা বিক্রয় প্রত্যাহার শুদ্ধ হবে না। মোটকথা, মূল্য বিনষ্ট হয়ে যাওয়া ইকালার বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না। তবে বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট হওয়া বিক্রয় প্রত্যাহারকে বাধাগ্রস্ত করে। আমরা প্রথমে দু-মাসআলার পার্থক্য বর্ণনা করছি, তারপর দলিল বর্ণনা করব।

পার্থক্য এই যে, বিক্রীত-পণ্য প্রকৃতভাবে এবং বিধানগতভাবে মাল। কেননা, এটা একটা সুনির্দিষ্ট বস্তু, আর মূল্য মুদ্রা জাতীয় হলে তা প্রকৃতভাবে ও বিধানগতভবে দায়ন তথা পরিশোধযোগ্য বস্তু। এ হুকুম তখনই, যখন নগদ মূল্যের প্রতি ইশারা না করা হয়। আর যদি নগদ মূল্যের প্রতি ইশারা করা হয়, তখন এটা বিধানগতভাবে মাল, যদিও প্রকৃত অর্থে মাল নয়। আর এজন্যই তো দ্বিতীয় পক্ষ কবুল না করা সত্ত্বেও বারাআত শুদ্ধ হয়ে যায়। [কারণ, এটা প্রকৃতভাবে মাল নয়] অথচ অন্যের কবুল না পাওয়া গেলে আইন [নির্দিষ্ট বস্তু]-এর দান শুদ্ধ হয় না।

কারণ, দায়ন নির্দিষ্ট বস্তু [আইন] থেকে দুর্বল। আর এজন্যই যে ব্যক্তি শপথ করল যে, তার কাছে মাল নেই, অথচ অনেক পাওনা রয়েছে– তার শপথভঙ্গ হবে না। মোটকথা, উপরের আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূল্য [দায়ন] এবং বিক্রীত-পণ্য উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

বিক্রীত-পণ্য বিনষ্ট হলে ইকালাহ বাধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু মূল্য বিনষ্ট হলে ইকালাহ করাতে কোনো সমস্যা হয় না। এর দলিল হলো, ইকালাহ বলা হয় বিক্রয়চুক্তিকে প্রত্যাহার করা এবং দূর করাকে। আর অস্তিত্বহীন কোনো কিছুকে দূর করা অসম্ভব। আর

বিক্রয়চুক্তি বিক্রীত-পণ্যের সাহায্যে বিদ্যমান থাকে, মূল্যের সাথে বিদ্যমান থাকে না। কারণ, বিক্রয়চুক্তির মধ্যেই বিক্রীত-পণ্য আসল, আর মূল্য হচ্ছে গুণ বা ওয়াসফ। আর এজন্যই যদি মূল্য বিদ্যমান না থাকে কিংবা উল্লেখ নাও করে, তবু বিক্রয়চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যায় এবং বিক্রয় বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে বিক্রীত-পণ্য অবিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি থাকে না। বিক্রয় না থাকলে সেটাকে প্রত্যাহার করাও সম্ভব হবে না। যদি বিক্রয়ে মূল্য না থাকে এবং বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিক্রয় বিদ্যমান থাকে। বিক্রয় বিদ্যমান থাকলে সেটাকে প্রত্যাহার করাও সম্ভব। মোটকথা, উপরিউক্ত দলিলের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে, মূল্য অবিদ্যমান থাকলে বিক্রয় প্রত্যাহার জায়েজ হবে, কিন্তু পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয় প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে না।

মাসআলা : যদি বিক্রীত-পণ্যের একাংশ বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্টাংশের মাঝে ইকালাহ করা শুদ্ধ হবে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রয়ের পণ্য ছিল দশ মন গম, যা দ্বিতীয় পক্ষ বিশ টাকা হারে ক্রয় করেছিল। এরপর ক্রেতা দু-মন খরচ করে ফেলল। তারপর বিক্রেতার প্রস্তাবে উভয়ে আটমনের মাঝে ইকালাহ করার মনস্থ করলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হবে। কেননা, এক্ষেত্রে আটমনের মাঝে বিক্রয় এখনো বিদ্যমান। বিক্রয় বিদ্যমান থাকাতে ইকালাহ করা সম্ভব। এমতাবস্থায় ক্রেতা আটমন গম ফেরত দেবে আর বিক্রেতা মূল্য বাবদ একশত ষাট টাকা ফেরত দিলে ইকালাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

আর যদি বিক্রয়টি بَيْعِ مُقَايَضَةٌ হয়ে থাকে। অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ দশ মন চাল বারো মন গমের বিনিময়ে বিক্রি করা হলো, তারপর দশ মন চাল কিংবা বারো মন গম বিনষ্ট হয়ে গেল, তারপর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা ইকালাহ করার ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, "পণ্যের বিনিময়ে পণ্য" এ জাতীয় বিক্রয়ে উভয় বিনিময় বিক্রীত-পণ্য হয়ে থাকে, আবার উভয় বিনিময় মূল্য হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় যে পণ্যটি বিনষ্ট হয়েছে সেটাকে মূল্য নির্ধারণ করা হবে, আর যেটা বিদ্যমান আছে সেটাকে পণ্য ধরা হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বিক্রীত-পণ্য বিদ্যমান থাকলে বিক্রয়চুক্তি বিদ্যমান থাকে। বিক্রয় বিদ্যমান থাকলে ইকালাহ করা শুদ্ধ ও বৈধ হয়। আর এ কারণেই আলোচ্য মাসআলায় ইকালাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি উভয় বিনিময় বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় নিঃশেষ হয়ে যাবে, ফলে ইকালাহ করার সুযোগ থাকবে না। তদ্রূপ যদি একটি পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর ইকালাহ করে তারপর পরস্পর হস্তান্তরের পূর্বেই আরেকটি পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও ইকালাহ বাতিল হবে।

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

قَالَ : اَلْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ، وَالتَّوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ، وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ لِاِسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ اِلٰى هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْبَيْعِ، لِاَنَّ الْغَبِيَّ الَّذِيْ لَا يَهْتَدِيْ فِي التِّجَارَةِ يَحْتَاجُ اِلٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ فِعْلَ الذَّكِيِّ الْمُهْتَدِيْ، وَيَطِيْبُ نَفْسَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرٰى وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِمَا، وَلِهٰذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْاَمَانَةِ وَالْاِحْتِرَازِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَعَنْ شُبْهَتِهَا، وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ الْهِجْرَةَ اِبْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) بَعِيْرَيْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلِّنِيْ اَحَدَهُمَا، فَقَالَ هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَلَا ـ

পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরাবাহা বলা হয় প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে সেটিকে অতিরিক্ত মুনাফাসহ প্রথম মূল্যের উপর হস্তান্তর করা। তাওলিয়া বলা হয়, প্রথম চুক্তির মাধ্যমে মালিকানায় অর্জিত বস্তুকে প্রথম মূল্যে বিনা লাভে হস্তান্তর করা। এ দুটি বিক্রয়ই জায়েজ হওয়ার শর্তাবলি পাওয়া যাওয়ার কারণে বৈধ। এ জাতীয় বিক্রয়ের প্রয়োজনও রয়েছে। কেননা, বেচা-কেনা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয় এমন নির্বোধ ব্যক্তি বুদ্ধিমান চৌকস ব্যক্তির কাজের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন বোধ করে। আর বিক্রেতা যে মূল্যে খরিদ করেছে সে মূল্যে অথবা কিছু মুনাফা নিয়ে বিক্রয় করে নিজে সান্ত্বনা লাভ করে। আর তাই উভয় প্রকারের বিক্রয় বৈধ হওয়ার দাবি রাখে। এ কারণেই দু বিক্রয়ের ভিত্তি হচ্ছে আমানতের উপর এবং খিয়ানত ও তার সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকার উপর। বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) দুটি উট কিনলেন। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, একটি উট আমাকে কেনা দামে [তাওলিয়া রূপে] দিয়ে দাও। তিনি বললেন, আপনি বিনামূল্যে তা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিনামূল্যে হলে নেব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : ইতঃপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিক্রেয়পণ্যের [مَبِيْع -এর] ভিত্তিতে নানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা হয়েছে। চলমান পরিচ্ছেদে বিক্রয় মূল্যের [ثَمَن-এর] সাথে সম্পৃক্ত কয়েকটি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করা হবে। আমরা দেখি অনেকে তাদের পণ্য জমিনে কিংবা কারখানায় উৎপাদন করে সেটাকে বাজারজাত করেন, সেটার মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে মালিক তার খরচ, বাজারে এর চাহিদা, তার মুনাফা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখেন, যেহেতু এ মালিক

পণ্যটি কারো কাছ থেকে ক্রয় করেনি তাই তার পূর্ব মূল্য বিবেচনা করার প্রশ্ন এখানে নেই। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী এমন রয়েছেন, যারা অন্যদের থেকে পণ্য কিনে সেটাকে বাজারজাত করেন অনেকে আবার পাইকারি খরিদ করে খুচরা বিক্রি করেন অনেকে একস্থান থেকে পণ্য কিনে অন্যস্থানে, অন্যদেশে বিক্রি করেন। দ্বিতীয় প্রকারের বিক্রেতাদের পণ্য বিক্রয়ের সময় প্রথম মূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় থাকতে হয়। প্রথম মূল্যের বিবেচনায় বিক্রয় চার প্রকার−

১. بَيْعِ مُرَابَحَةْ - প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে বস্তুর মালিকানা অর্জিত হয়েছে সেটাকে প্রথম মূল্যের উপর অতিরিক্ত মুনাফাসহ বিক্রি করা।

২. بَيْعِ تَوْلِيَةْ - প্রথম মূল্যের সমমূল্যে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত বস্তু বিক্রি করা।

৩. بَيْعِ وَضِيْعَةْ - প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত বস্তুকে প্রথম মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা।

৪. প্রথম মূল্যের উল্লেখ না করে দরদাম করে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা।

উল্লেখ্য যে, মানুষ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কারবার করলেও কখনো পরিস্থিতির কারণে তাদের ক্রয়মূল্যের সমমূল্যে এমনকি কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি একটি দ্রব্য দশ টাকায় কিনেছেন বারো টাকায় বিক্রির জন্য। কিন্তু আপনার কেনার পর দাম পড়ে যাওয়ার কারণে সেটাকে দশ টাকায় বিক্রি করতে হতে পারে। আবার অনেক সময় আট টাকায়ও বিক্রি করতে হতে পারে। আর তাই তাওলিয়া ও ওযিয়া বিক্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। মোটকথা, এ চার প্রকার বিক্রয়মূল্যের সাথে সম্পর্কিত।

পূর্বাপরের পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) ইতঃপূর্বে যেসব ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন এর সবই বিক্রেয়পণ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আলোচ্য পরিচ্ছেদ (بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ) থেকে শুরু করে পরবর্তী পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদগুলো (اَلرِّبَا وَالصَّرْفِ وَالْبَيْعُ بِالنَّسِيْئَةِ) বিক্রয়মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। উল্লেখ্য যে, বিক্রয়গুলোতে বিক্রয়পণ্য প্রধান ও আসল, তাই এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে। আর বিক্রেয়মূল্য অপ্রধান হওয়ার কারণে এর সাথে সম্পৃক্ত আলোচনা পরে আনা হয়েছে। তা ছাড়া এ পরিচ্ছেদে আলোচিত চারটি বিক্রয় শরিয়ত অনুমোদিত, আর এর পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বিক্রয় অবৈধ ও নাজায়েজ, তাই এ পরিচ্ছেদের আলোচনা আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ : اَلْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়ের সংজ্ঞা প্রদান করতঃ সেগুলোর বৈধতার দলিল দেওয়া হয়েছে।

بَيْعِ مُرَابَحَةْ-এর সংজ্ঞা : نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ

অর্থাৎ 'ক্রেতা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে মালের মালিক হয়েছে তা প্রথম মূল্যের কিছু অতিরিক্ত লাভসহ বিক্রি করা।' যেমন− কোনো ব্যক্তি একটি দাসী দু-হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করল। অন্য এক ব্যক্তি দাসীটি তার কাছ থেকে ক্রয় করতে চাইলে সে বলল, কিছু লাভ দিলে আমি বিক্রি করে দেব। তখন দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কথায় বিশ্বাস করে দু-হাজার টাকার সাথে একশত টাকা অতিরিক্ত প্রদান করে দাসীটি নিয়ে নিল, তাহলে এটা মুরাবাহা বিক্রয় হলো।

بَيْعِ تَوْلِيَةْ-এর সংজ্ঞা : ইমাম কুদূরী (র.) -এর ভাষায় تَوْلِيَةْ বলা হয়−

نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ .

অর্থাৎ 'প্রথম চুক্তির মাধ্যমে যে মালের মালিকানা লাভ হয়েছে, সে মাল প্রথম মূল্যেই বিনা লাভে বিক্রি করে দেওয়া।' যেমন− এক হাজার টাকায় একটি ঘোড়া ক্রয় করে এক হাজার টাকায় সেটা বিক্রি করা। আল্লামা ইবনুল হুমাম মুরাবাহার সংজ্ঞার উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব দিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন : যদি কেউ দিরহামের বিনিময়ে দিনার ক্রয় করে, তারপর উক্ত দিনারকে মুরাবাহার মাধ্যমে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা তার জন্য বৈধ হবে না। অথচ এর মধ্যে মুরাবাহার সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তর : সংজ্ঞায় বর্ণিত প্রথম চুক্তি দ্বারা যে মালের মালিকানা অর্জিত হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন বস্তু, যা সুনির্দিষ্ট বা যাকে নির্দিষ্ট করা হয় এমনভাবে যাতে বিক্রীত-পণ্য চিহ্নিত হয়ে যায়। অথচ আপত্তি করা হয়েছে যে মাসআলার দ্বারা তাতে মুদ্রা বিনিময় করা হয়েছে। যেহেতু দিনার বা মুদ্রা নির্দিষ্ট করা যায় না, তাই এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অপহরণ করা হয়েছে এমন গোলাম যদি অপহরণকারীর কাছ থেকে পলায়ন করে, অতঃপর বিচারক অপহরণকারীর উপর গোলামের বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক করে এবং অপহরণকারী তা পরিশোধ করে দেয়, তারপর সেই পালিয়ে যাওয়া দাসটি ফিরে আসে, তাহলে অপরহণকারী দাসটিকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবেন। এ মাসআলায় প্রথম কোনো বিক্রয়চুক্তি না হওয়া এবং প্রথম মূল্য না থাকা সত্ত্বেও মুরাবাহা বিক্রি বৈধ করা হয়েছে। অথচ مُرَابَحَة -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মাল প্রথম মূল্যের সাথে কিছু লাভসহ বিক্রি করা। এমনিভাবে কেউ যদি দান, উত্তরাধিকার ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করে তারপর তার মূল্য নির্ধারণ করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করে, তাহলে তা জায়েজ হবে– অথচ এগুলোর মধ্যেও তো কিতাবে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুপস্থিত?

উত্তর : অপহরণ আর্থিক লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত। এতে যেহেতু বিচারক কর্তৃক বাজারমূল্য অপহরণকারীর উপর আরোপ করা হয়, তাই এটা ধার্যমূল্যের মতোই। অথবা বলা যায় অপহরণে প্রাথমিক অবস্থায় এটা চুক্তি না হলেও পরবর্তীতে মূল্য নির্ধারণ করার কারণে এটা চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। আর সংজ্ঞায় বর্ণিত চুক্তি দ্বারা প্রাথমিক অবস্থার চুক্তি এবং পরবর্তী অবস্থার চুক্তি উভয়ই শামিল হবে। দান, উত্তরাধিকার ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে যে আপত্তি করা হয়েছে এর জবাব কিতাবে পরবর্তী বয়ান করা হবে। এর একটা জবাব হলো, সংজ্ঞায় বর্ণিত ثَمَن [ধার্যমূল্য] দ্বারা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে মুরাবাহার মধ্যে প্রথম মূল্যের দ্বারা দ্বিতীয় চুক্তি করা হয় বলে ثَمَن শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ যে কোনো মাধ্যমে অর্জিত বস্তুকে তার প্রকৃত মূল্যের সাথে অতিরিক্ত লাভে বিক্রি করা। এ অর্থ করা হলে দান ইত্যাদির মাধ্যমে আরোপিত প্রশ্নটি থাকবে না।

লেখক বলেন, উভয় প্রকার [মুরাবাহ ও তাওলিয়া] বিক্রি বৈধ। কারণ, বিক্রয় বৈধতার জন্য যে সব শর্তাবলি প্রয়োজন হয় সবই এতে বিদ্যমান। যেমন– বিক্রেয়পণ্য নির্দিষ্ট, মূল্য জানা আছে, কোনো ফাসিদ শর্ত নেই ইত্যাদি। তাছাড়া লোকজন এ ধরনের বিক্রয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ হতে আজ অবধি অভ্যস্ত। লোকজনের অভ্যস্ত হওয়া একটা দলিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলামান যাকে উত্তম মনে করে আল্লাহর কাছে তা উত্তম। বৈধতার দ্বিতীয় দলিল হলো, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে বিদ্যমান। কেননা, অনেক নির্বোধ, বেচা-কেনা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বেচা-কেনা সম্পর্কে জানা শোনা আছে এমন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকদের দ্বারস্থ হতে হয়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে তাওলিয়া কিংবা মুরাবাহার ভিত্তিতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে আর নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, অভিজ্ঞ লোকটি যে দামে দ্রব্যটি কিনেছে আমি তো সেই মূল্যেই কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশি মূল্যে খরিদ করলাম তাই আমার ঠকা হয়নি এবং আমি ক্রয়ে প্রতারিত হয়নি। মোটকথা, যেহেতু এ জাতীয় বিক্রয়ে বৈধতার শর্তাবলি বিদ্যমান, লোকজন এতে অভ্যস্ত এবং প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে, তাই এর বৈধতার ব্যাপার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْاَمَانَةِ الخ : লেখক বলেন, যেহেতু সাধারণ লোকজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের উপর ভরসা করে, তাই মুরাবাহ ও তাওলিয়ার ভিত্তি হচ্ছে আমানতদারী ও খিয়ানত না করার উপর। অর্থাৎ যে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রয় করবে সে বিশ্বস্ত হতে হবে এবং সে খিয়ানত কিংবা খিয়ানতের সদৃশ কাজ থেকে বেঁচে থাকবে।

তাওলিয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে লেখক হাদীসের দলিল পেশ করেন। হাদীস–

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ الْهِجْرَةَ اِبْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعِيْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلِّنِيْ اَحَدَهُمَا فَقَالَ هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَلَا .

হিদায়া গ্রন্থকার (র.)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি গরীব। আল্লামা যায়লায়ী (র.) হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, هٰذَا الْحَدِيْثُ غَرِيْبٌ হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, লেখকের বর্ণিত হাদীসটি আমি কোথাও পাইনি।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি দুর্বল হলেও তাওলিয়া প্রমাণের জন্য সহীহ হাদীস রয়েছে। যেমন–

اَخْرَجَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلتَّوْلِيَةُ وَالْاِقَالَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাওলিয়া, ইকালাহ ও শিরকাত একই পর্যায়ের, অর্থাৎ জায়েজ। হাদীসটি মুরসাল বটে। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মুরসাল হাদীসশাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য দলিল।

দ্বিতীয় দলিল হলো–

اَخْبَرَنَا اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثًا مُسْتَفِيْضًا بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ اِلَّا اَنْ يُشْرِكَ فِيْهِ اَوْ يُوَلِّيَهُ اَوْ يُقِيْلَهُ .

এ হাদীস দ্বারাও তাওলিয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

লেখক হযরত আবূ বকর (রা.) -এর যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হাদীসে নিম্নোক্ত কথাগুলো রয়েছে–

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ بِالثَّمَنِ قَالَ ﷺ قَدْ اَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ .

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে– وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ قَدِ اشْتَرَاهَا

তাবাকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে রয়েছে– بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَعَمِ بَنِىْ قُشَيْرٍ فَاَخَذَ اِحْدَاهُمَا وَهِىَ الْقَصْوَاءُ .

উপরিউক্ত হাদীসগুলো দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা.) -এর সাথে যে তাওলিয়া করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং হিদায়া গ্রন্থকার (র.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার অর্থ ও মতলব প্রমাণিত, যদিও হাদীসটি শাব্দিকভাবে গরীব।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বহুবার বলেছেন, আবূ বকরের মাল দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি, তিনি আরও বলেছেন যে, যাদের মালামাল দ্বারা আমি উপকৃত হয়েছি তাদের সকলের বদলা দিয়েছি, তবে আবূ বকর (রা.) -এর অনুগ্রহ এখনও পরিশোধ করতে সক্ষম হইনি। হাদীস দুটি দ্বারা এটা মনে হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে দিরহামের মূল্যে উটটি কেন কিনতে চাইলেন ? এর উত্তর হলো, হিজরত একটি বিশেষ ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল। ইবাদতের মধ্যে শরিক নেওয়া অনুচিত। যেমন– আমরা দেখতে পাই অজু ইত্যাদির মধ্যে অন্যের সাহায্য নেওয়া মাকরূহ। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনামূল্যে উট গ্রহণ করে উপকৃত হতে চাননি।

قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُوْنَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ لَوْ مَلَكَهُ مَلَكَهُ بِالْقِيْمَةِ، وَهِيَ مَجْهُوْلَةٌ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِمَّنْ يَمْلِكُ ذٰلِكَ الْبَدَلَ وَقَدْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دَرَاهِمَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَكِيْلِ مَوْصُوْفٍ جَازَ، لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ، وَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دَهْ يَازْدَهْ لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাদৃশ্য আছে এমন বিনিময় মূল্য ছাড়া মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ নয়। কেননা, যদি এর কোনো সদৃশবস্তু না থাকে, তাহলে যদি [মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মাধ্যমে কেউ কোনো জিনিসের] মালিক হতে চায় তবে সে বাজারমূল্যে মালিক হবে। অথচ বাজারমূল্য অজ্ঞাত। যদি ক্রেতা [প্রথম চুক্তি দ্বারা মালিক হয়েছে] এমন বস্তুকে মুরাবাহার ভিত্তিতে এমন লোকের কাছে বিক্রি করে যে সেই বিনিময়মূল্যের মালিক, এমতাবস্থায় যদি সে বস্তুটি এক দিরহাম অথবা পাত্র দিয়ে মাপা যায় এমন নির্দিষ্ট বস্তুর মুনাফাতে বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, সে [দ্বিতীয় ক্রেতা] তার উপর [মূল্যরূপে] যা প্রদান করা আবশ্যক তা দিতে সক্ষম। আর যদি দশে কিনে এগারতে বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে না। কারণ, যেহেতু বিনিময়মূল্য সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাই সে মূল মূল্য এবং এর অংশবিশেষকে বাজারমূল্যের মাধ্যমে [যেন] বিক্রি করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ الخ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে প্রচলিত দ্রব্যাদি দু ধরনের–

১. ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ অর্থাৎ এমন দ্রব্যাদি যার সাদৃশ্য আছে, যেমন পাত্র দিয়ে কিংবা ওজন দিয়ে পরিমাপ করা যায় যে সব বস্তু যেমন– গম, যব, স্বর্ণ ইত্যাদি।
২. ذَوَاتُ الْقِيَمِ এমন বস্তুসমূহ যার সাদৃশ্য নেই; বরং বাজারমূল্য দ্বারা এর সাদৃশ্য নির্ণয় করা হয়। যেমন– কাপড়, জন্তু-ক্রীতদাস ইত্যাদি।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরাবাহা ও তাওলিয়া তখনই জায়েজ হবে, যখন এর মূল্য ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ থেকে হবে। যদি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার প্রথম মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ জাতীয় বস্তু হয়, তাহলে মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ হবে না। মাসআলার দলিল ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, তাওলিয়া ও মুরাবাহার ভিত্তি খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার উপর। মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য যদি ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ হয়, তাহলে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ দশ হাজার টাকায় একটি দাস ক্রয় করে অন্যের কাছে দশ হাজার কিংবা এগার হাজার টাকায় বিক্রি করে তাওলিয়া বা মুরাবাহার ভিত্তিতে, তাহলে এতে খিয়ানত বা খিয়ানতের সন্দেহ থাকতে পারে না। আর খিয়ানত বা এর সন্দেহ না থাকার কারণ হলো, এর মূল্য টাকা বা মুদ্রা, যা ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ-এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে যদি মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে এতে যদিও খিয়ানত হবে না, কিন্তু খিয়ানতের সন্দেহ ঠিকই থেকে যাবে। উদাহরণস্বরূপ যেমন– একটি দাস দুটি ঘোড়ার বিনিময়ে ক্রয় করল। তারপর সেই দাসটিকে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করল। এখন দ্বিতীয় ক্রেতা ঘোড়ার মূল্য অনুমান করে পরিশোধ করবে, কারণ সে ঘোড়া দুটিকে মূল্যরূপে দিতে পারবে না। এমনকি সে ঘোড়া দুটির অনুরূপ ঘোড়াও দিতে পারবে না। সরাসরি ঘোড়া দুটি দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঘোড়া দুটির মালিক সে নয়। বর্তমান মালিক হচ্ছে প্রথম বিক্রেতা। ঘোড়ার অনুরূপ বা সদৃশ কোনো কিছু দেওয়াও সম্ভব নয়, কারণ ঘোড়া হচ্ছে ذَوَاتُ الْقِيَمِ-এর অর্ন্তগত। এমতাবস্থায় ঘোড়ার বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। অথচ ঘোড়ার প্রকৃত মূল্য জানা নেই। কেননা, যখন কোনো দ্রব্যের বাজারমূল্য ধরা হয় তখন অনুমান করে মূল্য ধরা হয়। সুনিশ্চিতভাবে মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছু করা হলে এতে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। শতভাগ ভুলমুক্ত হওয়া যায় না। এর ফলে

যদিও ذَوَاتُ الْقِيَمِ -এর মধ্যে খিয়ানত হয়েছে প্রকাশ্যভাবে বলা যায় না, কিন্তু পরোক্ষভাবে এতে খিয়ানতের সন্দেহ ঠিকই রয়ে যায়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা ও তাওলিয়াতে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই না থাকতে হবে। যেহেতু মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ থেকে হলে খিয়ানতের সন্দেহ থাকে, তাই মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ জাতীয় দ্রব্য না হওয়া আবশ্যক। এজন্যই ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন, মূল্য ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ জাতীয় না হলে মুরাবাহা ও তাওলিয়া শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلُ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) এ বাক্য দ্বারা মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মূল্য ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ থেকে না হলে কি সমস্যা হবে তা বর্ণনা করেছেন। যা একটু আগে আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। এরপর ইমাম কুদূরী (র.) মূল্য ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো অবস্থায় যে মুরাবাহা/তাওলিয়া শুদ্ধ হয় তার বর্ণনা দেন। সেই সুরত হলো, এক ব্যক্তি একটি ক্রীতদাস কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর কাপড়টি বিক্রেতার থেকে অন্য এক ব্যক্তি কোনভাবে পেয়ে গেল এমতাবস্থায় ক্রীতদাসের ক্রেতা যদি বর্তমান কাপড়ের মালিকের কাছে ক্রীতদাসটি মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে।

মুরাবাহার সুরত এমন হবে যে, গোলামটি উক্ত কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করবে সেই সাথে নির্দিষ্ট লাভ নেবে। আর যদি শুধুমাত্র কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে– মুনাফা গ্রহণ না করে, তাহলে তাওলিয়া হবে। মোটকথা, যার কাছে তাওলিয়া/ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায় তার কাছে প্রথম মূল্য বিদ্যমান থাকলে মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ জাতীয় হলেও মুরাবাহা/ তাওলিয়া বৈধ। কেননা, এখানে দ্বিতীয় ক্রেতা সেই মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম, যা সে নিজের উপর আবশ্যক করেছে। অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়ে ক্রীতদাসের যে মূল্য [কাপড়] ছিল তা দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা [দ্বিতীয় বিক্রেতা]-কে দিতে সক্ষম। প্রথম মূল্য প্রদান করা হলে খিয়ানত/ খিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই হবে না। আর এজন্যই প্রথম মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ হওয়া সত্ত্বেও তাওলিয়া/মুরাবাহা বিক্রয় বৈধ।

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دَهْ يَازْدَهْ لَا يَجُوزُ الخ : এ মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলাটির সাথে সংশ্লিষ্ট। পূর্বের মাসআলাটিতে প্রথম মূল্য ذوات القيم জাতীয় ছিল, এ মাসআলাতেও প্রথম মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ -এর অন্তর্গত। পূর্বের মাসআলায় প্রথম মূল্যের উপর অতিরিক্ত লাভ নির্দিষ্ট ও প্রথম মূল্য থেকে ভিন্ন ছিল কিন্তু এখানে তা নয়।

মাসআলার স্বরূপ : এক ব্যক্তি ক্রীতদাস বিশেষ কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করল। এরপর বিক্রেতার হাত থেকে কাপড়টি [প্রথম মূল্যে] তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। তারপর প্রথম ক্রেতা ক্রীতদাসটিকে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করল। লাভ নির্ধারণ করল দশে এগারকে অথবা শতকরা ১০% -কে। দশে এগার বা শতকরা ১০% -এর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম মূল্য যদি দশ দিরহাম হয় তাহলে মুনাফা এক দিরহাম, যদি প্রথম মূল্য বিশ দিরহাম হয় তাহলে মুনাফা দুই দিরহাম, প্রথম মূল্য ত্রিশ দিরহাম হলে মুনাফা তিন দিরহাম। এভাবে প্রথম মূল্য একশত দিরহাম হলে মুনাফা দশ দিরহাম। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ প্রক্রিয়ায় মুনাফার শর্ত করা হলে মুরাবাহা বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

নাজায়েজের দলিল হলো, দশে এগার অথবা ১০% মুনাফার অর্থ হচ্ছে মুনাফা প্রথম মূল্যের শ্রেণীগত হতে হবে। কারণ, মুনাফা এখানে প্রথম মূল্যের দশের এক $\frac{১}{১০}$। কোনো বস্তুর $\frac{১}{১০}$ দশভাগের একভাগ সেই বস্তু থেকেই হবে। আলোচ্য মাসআলায় প্রথম মূল্য ذَوَاتُ الْقِيَمِ জাতীয়, ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ জাতীয় নয়। এখন প্রথম মূল্যের দশ ভাগের একভাগ $\frac{১}{১০}$ বের করতে হলে কাপড়ের বাজারমূল্য বের করতে হবে। অথচ কাপড়ের বাজারমূল্য অজ্ঞাত। এখন বাজারমূল্য অনুমানের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে বাজারমূল্য নির্ণয় করা হলে এতে খিয়ানত না হলেও খিয়ানতের সন্দেহ অবশ্যই হয়। অথচ ইতঃপূর্বে মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানত এবং খিয়ানতের সন্দেহ কোনোটাই না থাকতে হবে। আর খিয়ানত/ খিয়ানতের সন্দেহ থাকলে মুরাবাহা ও তাওলিয়া অবৈধ। সে মতে এখানে খিয়ানতের সন্দেহ থাকার কারণে মুরাবাহা বিক্রি অবৈধ।

উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় মুনাফা যেহেতু প্রথম মূল্য তথা (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) -এর বাজারমূল্য থেকে ধরা হচ্ছে, তাই লেখক বলেছেন– بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيْمَتِهِ

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল কাদীর-এ লিখেন যে, মুরাবাহার মধ্যে মূল্যরূপে যা সাব্যস্ত হয় বা ধার্য হয়, তাই رَأْسُ الْمَالِ বা প্রথম মূল্য। ক্রেতা মূল্যরূপে এর পরিবর্তে যা প্রদান করেছে তা বিবেচ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম মূল্য ধার্য হলো দশ দিরহাম। ক্রেতা দশ দিরহাম না দিয়ে এর পরিবর্তে এক দিনার অথবা এমন এক বস্ত্র দিল যার মূল্য দশ দিরহাম, অথবা দশ দিরহামের কম/ বেশি দিল, তাহলে প্রথম মূল্য বা رَأْسُ الْمَالِ হবে দশ দিরহাম– এক দিনার কিংবা কাপড় নয়।

وَيَجُوْزُ أَنْ يُضِيْفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالطَّرَّازِ وَالصَّبْغِ وَالْفَتْلِ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ، لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ بِرَأْسِ الْمَالِ فِيْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَزِيْدُ فِي الْمَبِيْعِ أَوْ فِيْ قِيْمَتِهِ يَلْحَقُ بِهِ، هٰذَا هُوَ الْأَصْلُ، وَمَا عَدَدْنَاهُ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ، لِأَنَّ الصَّبْغَ وَأَخَوَاتِهِ يَزِيْدُ فِي الْعَيْنِ، وَالْحَمْلُ يَزِيْدُ فِي الْقِيْمَةِ، إِذِ الْقِيْمَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَلَا يَقُوْلُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا كَيْلَا يَكُوْنَ كَاذِبًا، وَسُوْقُ الْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ، بِخِلَافِ أُجْرَةِ الرَّاعِيْ وَكِرَاءِ بَيْتِ الْحِفْظِ، لِأَنَّهُ لَا يَزِيْدُ فِي الْعَيْنِ وَالْمَعْنٰى، وَبِخِلَافِ أُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ، لِأَنَّ ثُبُوْتَ الزِّيَادَةِ لِمَعْنًى فِيْهِ، وَهُوَ حَذَاقَتُهُ.

অনুবাদ : মূল মূল্যের সাথে ধোবী, নকশাকারী, রঙ ও ঝালর লাগানোর মজুরি [পারিশ্রমিক], আর খাবার বহনের মজুরি যোগ করা জায়েজ। কেননা, মূল মূল্যের সাথে এসব মজুরি যোগ করা ব্যবসায়ীদের রীতিতে প্রচলিত। তাছাড়া এ কারণে যে, যা বিক্রীত দ্রব্যের অথবা তার মূল্যের মাঝে বৃদ্ধি ঘটায় তা মূল্যের সাথে যুক্ত হয়। এটাই নীতি। আর আমরা যা উল্লেখ করলাম এগুলো এই গুণসম্পন্ন। কেননা, রঙ এবং এ জাতীয় বিষয়গুলো [বিক্রীত পণ্যের] মূল সত্তাতে বৃদ্ধি ঘটায় আর পরিবহন মূল্য বৃদ্ধি করে। কেননা, স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর সে বলবে, আমার এত পড়তা পড়েছে। সে একথা বলবে না যে, আমি এত দ্বারা খরিদ করেছি। যাতে সে মিথ্যাবাদী না হয়। বকরির পাল হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া [-এর খরচ] পণ্য বহন করার [খরচের] সমতুল্য। তবে রাখালের মজুরি এবং পণ্য সংরক্ষণের গুদামের খরচ এর থেকে ভিন্ন। কেননা, এগুলো না পণ্যের সত্তার মাঝে বৃদ্ধি ঘটায়, না মূল্য বৃদ্ধি করে। আর গোলামের প্রশিক্ষণের মজুরিও এর ব্যতিক্রম। কেননা, তার মূল্য বৃদ্ধি পায় তারই অভ্যন্তরীণ গুণের কারণে। সে গুণটি হলো দক্ষতা ও পারদর্শিতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ أَنْ يُضِيْفَ إِلَى رَأْسِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তি করার পূর্বে প্রথম চুক্তির পর বিক্রেয়পণ্যের স্বার্থে যেসব খরচ করা হয় তা প্রথম মূল্যের সাথে যোগ করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

قَصَّارٌ শব্দের অর্থ– ধোবি, রজক। أُجْرَةُ الْقَصَّارِ দ্বারা উদ্দেশ্য ধোবির মজুরি অথবা ধোলাই খরচ।

طَرَّازٌ - নকশা ও কারুকাজকারী, বুটিক ও এমব্রয়ডারি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। اَلصَّبْغُ - রঙ করা, ডায়িং করা ইত্যাদি। اَلْفَتْلُ - রশি ইত্যাদি পেঁচানো, পাড়/ঝালর তৈরি করা। حَمْلُ الطَّعَامِ -খাদ্য জাতীয় বস্তু একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহন করা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুরাবাহা ও তাওলিয়া রূপে কোনো দ্রব্য বিক্রি করার সময় দ্রব্যের প্রথম মূল্যের সাথে ধোবির মজুরি বা ধোলাই খরচ যোগ করা বৈধ। যেমন– কোনো ব্যক্তি দশ পিস শাড়ি কিনল এক হাজার টাকায়, তারপর ধোলাই খরচ হলো

বিশ টাকা। এমতাবস্থায় ক্রেতা প্রতি পিস শাড়ি একশত দুই টাকা মূল্য ধরে কিছু মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এমনিভাবে কাপড়ে কারুকাজ করে, নকশা করে অথবা এমব্রয়ডারি করে তার মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যেতে পারে।

তদ্রূপ কেউ যদি সাদা কাপড় খরিদ করে লাল/কালো ইত্যাদি রঙ করে, তাহলে তার জন্য উক্ত রঙের দাম ও মজুরি যোগ করত মুরাবাহা ও তাওলিয়ারূপে বিক্রি করা বৈধ।

তদ্রূপ কাপড়ে ঝালর/ পাড় ও বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত লেস লাগিয়ে তার মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করে মুরাবাহা/ তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করা জায়েজ।

উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তি একটি শাড়ি অথবা চাদর একশত টাকায় কিনে বিশ টাকার ঝালর লাগাল, তারপর উক্ত চাদর/ শাড়িটির মূল্য একশত বিশ টাকা ধরে এর উপর কিছু মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া একশত বিশ টাকাতেই তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে।

তদ্রূপ কোনো ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য/ শষ্য ইত্যাদি ক্রয় করে বিক্রির জন্য ভিন্নস্থানে নিয়ে গেল। স্থানান্তর করতে তার যে পরিবহন খরচ ইত্যাদি হয়েছে মূল মূল্যের সাথে যোগ করে তার উপর মুরাবাহা/ তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে পারবে। যেমন– এক ব্যক্তি একশত টাকায় গাজীপুর থেকে দশটি কাঠাল ক্রয় করে বেচার জন্য ঢাকায় নিয়ে গেল। পরিবহন বাবদ তার খরচ হলো দশ টাকা। এখন সে প্রতি কাঠাল মূল মূল্য ১০+১ [পরিবহন খরচ] = ১১/= মোটমূল্য ধরে এর উপর কিছু মুনাফা গ্রহণ করে মুরাবাহা হিসেবে অথবা মুনাফা ছাড়া এগার টাকাতেই তাওলিয়া হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এরূপ অতিরিক্ত খরচ/ মজুরি যোগ করে বিক্রি জায়েজ।

প্রথম দলিল : ব্যবসায়ীরা তাদের সাধারণ নীতি অনুসারে এসব খরচকে মূল মূল্যের সাথে যোগ করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বিক্রয়পণ্যের দাম ধরেন। সাধারণ রেওয়াজ-রীতি শরিয়তের একটি দলিল। শরিয়তের পরিভাষায় একে تَعَامُلُ النَّاسِ ও عُرْف বলা হয়। সুতরাং عُرْف অনুসারে এসব খরচ / মজুরিকে মূল মূল্যের সাথে যোগ করা হবে।

দ্বিতীয় দলিল : ফিক্‌হশাস্ত্রের একটি মূলনীতি হলো, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে বস্তু মূল পণ্যের মাঝে সত্তাগতভাবে অথবা মূল্যের দিক থেকে বৃদ্ধি ঘটায় সেই বস্তুকে মূল মূল্যের সাথে সংযুক্ত করা বৈধ। আলোচ্য মাসআলায় যেসব বিষয়ের উল্লেখ করা হলো– এর সবই হয়তো পণ্যের মাঝে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে কিংবা মূল্যের ক্ষেত্রে দর বৃদ্ধি করছে। যেমন– রঙ করা, কারুকাজ, নকশা-ডিজাইন ও ঝালর কাপড়ের সত্তাকে বৃদ্ধি করছে। কাপড় ধোলাই করা ও আয়রণ করার দ্বারা এর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তদ্রূপ খাদ্যদ্রব্য, শষ্য ইত্যাদি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, স্থানের পরিবর্তনে পণ্যের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়।

উদাহরণস্বরূপ ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেশী মুরগির ডিমের হালি ৮/১০ টাকা, কিন্তু ঢাকাতে সেই একই ডিমের হালি ১৫/১৬ টাকা। লেখকের দলিল "স্থানের পরিবর্তনের কারণে মূল্যের পরিবর্তন হয়" অর্থাৎ মূল্য বাড়ে, এ কথার উপর আশরাফুল হিদায়ার লেখক আপত্তি তুলে বলেন, কখনো তো স্থান পরিবর্তন করার কারণে দাম কমে, অর্থাৎ এক জায়গার উৎপাদিত পণ্য সেখানে যে দাম রয়েছে অন্যত্র এর চেয়ে কম দাম হতে পারে। সুতরাং অন্যত্র পণ্য বহন করে নেওয়ার দ্বারা দাম তো কমও হতে পারে। অতএব এটা দলিল হিসেবে তেমন যুতসই নয়।

এর জবাবে বলা যায় যে, মানুষ মালামাল স্থানান্তর করে কম মূল্য পাওয়ার আশায় নয়; বরং বেশি মূল্য পাওয়ার আশায় এবং স্থানান্তরের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যদি কেউ মূল্য কম পায়, তাহলে বলতে হবে সে পরিস্থিতির শিকার কিংবা সে পলিসিগত ভুল করেছে। মূল্য বেশি না পেলে কোনো নির্বোধ ব্যবসায়ীও জেনেশুনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র মাল স্থানান্তর করবে না। সুতরাং এ মূলনীতিই ঠিক যে, ব্যবসায়ীদের মাল স্থানান্তরের দ্বারা এবং পরিবহন খরচ যুক্ত হওয়ার দ্বারা পণ্যের মূল্য বাড়ে। যে ক্ষেত্রে বাড়ে না, সেটা হচ্ছে নিছক দুর্ঘটনা। আর দুর্ঘটনা এবং বিপরীত পরিস্থিতির কারণে মূলনীতির পরিবর্তন হয় না এবং সেই মূলনীতি দলিলের অযোগ্যও হয় না।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার উপসংহার টানা হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, মূল মূল্যের সাথে ধোলাই খরচ, কারুকাজকারীর মজুরি ইত্যাদি যুক্ত করা জায়েজ। এখানে বলা হচ্ছে যে, যে ব্যবসায়ী উপরিউক্ত বিষয়গুলো মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করবে সে তার ক্রেতাকে প্রথম মূল্য বলার সময় বলবে, আমার এত পড়তা পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ সে কাপড় কিনেছিল ত্রিশ টাকায়, রঙ খরচ হয়েছে পাঁচ টাকা : ৩০ + ৫ = ৩৫ টাকা। সে তার ক্রেতাকে বলবে, কাপড়টিতে আমার ৩৫ টাকা পড়তা পড়েছে। তাহলে একথাটি সত্য হলো। কারণ, প্রকৃতই ৩৫ টাকা পড়তা পড়েছে, সে একথা বলবে না যে, আমি পঁয়ত্রিশ টাকায় কাপড় খরিদ করেছি। কারণ, এটা মিথ্যা হবে। কেননা, সে আদৌ পঁয়ত্রিশ টাকায় কাপড় কিনেনি। আর মিথ্যা বলা হারাম।

মাবসূত গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের একটি ভিন্ন মাসআলা বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য একশত টাকায় খরিদ করল, তারপর সে দ্রব্যটির গায়ে মূল্য লিখল একশত বিশ টাকা, অতঃপর সে গায়ের দামের উপর মুরাবাহা বিক্রি করল। উদাহরণস্বরূপ প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতাকে বলল, কাপড়ের গায়ে যে দাম লেখা আছে তার উপর দশ টাকা লাভে [১২০ + ১০] = ১৩০ টাকায় বিক্রি করব। এ ধরনের বিক্রি জায়েজ, তবে এ অবস্থায় বিক্রেতা একথা বলবে না যে, আমার পড়তা পড়েছে একশত ত্রিশ টাকা বা আমি একশত বিশ টাকায় খরিদ করেছি। কারণ, উভয় কথাই মিথ্যা।

মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার, দান-সদকা ও অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো পণ্যের মালিক হয়, তারপর এর মূল্য নির্ধারণ করে উক্ত মূল্যের উপর মুরাবাহা বিক্রি করতে চাইলে তা সে করতে পারে। আর এটা মুরাবাহার একটি বৈধ পদ্ধতি বলে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَسَوْقُ الْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الْحَمْلِ الخ : হিদায়া গ্রন্থকার (র.) বলেন, বকরি, [গরু, ভেড়া ইত্যাদি] স্থানান্তরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি খাদ্য বহন করার মতো, অর্থাৎ খাদ্য বহন করে অন্যস্থানে নিয়ে বিক্রির সময় মূল মূল্যের সাথে যেমনিভাবে বহন খরচ যোগ করা যায়, তেমনি করে গরু একস্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া বাবদ যে খরচ হয় তা মূল মূল্যের সাথে যোগ করে তার উপর মুনাফা নিয়ে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করা যায়।

তবে পশু চরানো বাবদ রাখালের মজুরি এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নেওয়া মালামাল রাখবার গুদামঘরের ভাড়া মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যাবে না। কেননা, রাখালের মজুরি ও গুদাম ঘরের ভাড়া পণ্যের সত্তাগত বা গুণগত পরিবর্তন সাধন করে না।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ أُجْرَةِ التَّعْلِيْمِ الخ : লেখক বলেন, দাস/দাসীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির শিক্ষাদানের মজুরি রাখালের মজুরির মতো। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মজুরি মূল মূল্যের সাথে যোগ করা যায় না। কেননা, শিক্ষাদানের কারণে যে দাস/দাসীর মূল্য বৃদ্ধি পায় তাতো দাস/দাসীর মাঝে বিদ্যমান দক্ষতা ও পারদর্শিতার গুণের কারণে। শুধু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে এখানে মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। তাই শিক্ষা দানের খরচ মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করা হবে না। মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা নেই, এজন্য তাদের মাঝে শিক্ষা কোনো কাজে আসে না।

বর্তমান যুগে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সমধিক। শিক্ষাহীন মূর্খ মানুষ ও শিক্ষিত মানুষের মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শ্রমিক প্রশিক্ষণহীন শ্রমিক থেকে তিনগুণ বেশি কাজ করে। তাছাড়া আমরা বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে রয়েছি। কারও যত মেধা ও দক্ষতা থাকুক না কেন প্রশিক্ষণ না থাকলে সে কোনো যন্ত্র চালাতে পারবে না। এসব বিবেচনা করে বর্তমান যুগে প্রশিক্ষণ খরচ মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করাই অধিক সমীচীন। তাছাড়া ফাতাওয়ার গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো সমাজে এরূপ প্রশিক্ষণের খরচ যোগ করার রীতি থাকে, তাহলে এতে প্রশিক্ষণ খরচ যোগ করাতে কোনো সমস্যা নেই। আজকাল তো পশুদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হচ্ছে। যেমন– কুকুরদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসামী ধরা, বোমার অনুসন্ধান চালান এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। তাই কেউ পশুদের ক্রয় করার পর যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে মুরাবাহা বা তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে এতে প্রশিক্ষণ খরচ যোগ করা যাওয়ার কথা।

فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ أَسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (رحـ) يَحُطُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يُخَيَّرُ فِيهِمَا. لِمُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّ الْاِعْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا. وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ تَرْوِيجٌ وَتَرْغِيبٌ، فَيَكُونُ وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَوَصْفِ السَّلَامَةِ، فَيَتَخَيَّرُ بِفَوَاتِهِ. وَلِأَبِي يُوسُفَ (رحـ) أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ كَوْنُهُ تَوْلِيَةً وَمُرَابَحَةً، وَلِهٰذَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَلَّيْتُكَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِعْتُكَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ مَعْلُومًا۔

অনুবাদ : যদি ক্রেতা মুরাবাহার ক্ষেত্রে বিক্রেতার কোনো খিয়ানতের ব্যাপারে অবগত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার ইচ্ছাধিকার [ইখতিয়ার] থাকবে। যদি সে ইচ্ছা করে পুরো মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে। আর যদি চায় তা ছেড়ে দিবে। আর যদি সে তাওলিয়ার ক্ষেত্রে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে খিয়ানত পরিমাণ অর্থ মূল্য থেকে কেটে রাখবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর অভিমত এই যে, মুরাবাহা ও তাওলিয়া উভয় ক্ষেত্রে মূল্য কম দিবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উভয়ের [মুরাবাহা ও তাওলিয়া] মাঝে তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হচ্ছে– সেই মূল্যই গ্রহণযোগ্য যা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত। আর মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ সে তো মাল চালু করা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এটা হচ্ছে একটি কাঙ্ক্ষিতগুণ। যেমন ত্রুটিমুক্ত হওয়া একটি গুণ। সুতরাং গুণটির অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতা ইখতিয়ার লাভ করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর দলিল হলো– এ জাতীয় বিক্রয়ে তাওলিয়া ও মুরাবাহা হওয়াটাই মূল। আর এজন্যই "আমি প্রথম মূল্যে তাওলিয়া করলাম" কিংবা "প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা [কিছু মুনাফা নিয়ে] বিক্রয় করলাম" বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়, যখন প্রথম মূল্য জ্ঞাত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা ও তাওলিয়া সম্পাদিত হওয়ার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে তাতে খিয়ানত হয়েছে বলে যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয় তাহলে এর সমাধান কি হবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি একটি বস্তু মুরাবাহারূপে অন্যের কাছে বিক্রয় করল। উদাহরণস্বরূপ একটি গরু এই বলে বিক্রয় করল যে, গরুটি আমি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করেছি, এখন আমি পাঁচ হাজারের উপর এক হাজার টাকা মুনাফাতে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করছি। ক্রেতা বিক্রেতার উক্ত কথার উপর গরুটি ক্রয় করল। কিন্তু পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে, বিক্রেতা গরুটি চার হাজার টাকায় ক্রয় করেছিল এবং আমার সাথে এক হাজার টাকা বাড়িয়ে বলে এক হাজার টাকা খিয়ানত করেছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, খিয়ানতের ব্যাপারটি কিভাবে জানা গেল বা প্রমাণিত হলো। এর জবাব হচ্ছে– খিয়ানত কয়েকভাবে প্রমাণিত হতে পারে–

১. বিক্রেতা বিক্রয়ের পর স্বেচ্ছায় স্বীকার করল যে, "আমি আসলে গরুটি চার হাজার টাকায় ক্রয় করেছিলাম"।

২. ক্রেতা বিক্রেতাকে চার হাজার টাকায় কিনতে দেখেছে এমন দর্শকদের থেকে জানতে পারল যে, বিক্রেতা গরুটি চার হাজার টাকায় কিনেছে। এরপর সে তাদের সাক্ষীরূপে পেশ করে বিষয়টি প্রমাণিত করল।

৩. ক্রেতা কোনো মাধ্যমে জানতে পারল যে, বিক্রেতা খিয়ানত করেছে। তারপর সে দাবি করল যে, বিক্রেতা খিয়ানত করেছে, কিন্তু ক্রেতা তার দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ [সাক্ষী] পেশ করতে ব্যর্থ হলো। তারপর বিক্রেতাকে বলা হলো, আপনি শপথ করে বলুন যে, আপনি খিয়ানত করেননি। কিন্তু বিক্রেতা শপথ করে বলল না। তখনও খিয়ানত প্রমাণিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, এই তিন পদ্ধতির যে কোনো এক পদ্ধতিতে খিয়ানত প্রমাণিত হতে পারে। যদি খিয়ানত প্রমাণিত হয় তাহলে কি বিধান হবে, এ ব্যাপারে আমাদের হানাফী মাযহাবের প্রধান তিন ইমাম তিনটি পৃথক মত পোষণ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়া বিক্রয়টি যদি মুরাবাহা হয় তাহলে ক্রেতার নিম্নের দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে–

১. বিক্রয় পণ্যের মুনাফাসহ যে মূল্য চাওয়া হয়েছে তা দিয়ে পণ্য নিবে।

২. বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল করে দিবে। উদাহরণস্বরূপ ছয় হাজার দিয়ে গরু নিবে অথবা গরু নিবেই না।

আর খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হওয়া বিক্রয়টি যদি তাওলিয়া হয় এবং খিয়ানত প্রমাণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতা তার দাবি অভিমতে পাঁচ হাজার টাকায় গরু কিনে পাঁচ হাজারেই বিক্রি করেছে। অতঃপর প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা আসলে চার হাজার টাকায় গরু কিনেছিল এবং এখানে বিক্রেতা এক হাজার টাকা খিয়ানত করেছে। এ মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে যদি ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করে থাকে তাহলে এক হাজার টাকা মূল্য কম দিবে। [৫০০০-১০০০ = ৪০০০] চার হাজার টাকা প্রদান করবে। আর যদি পুরোমূল্য [পাঁচ হাজার] পরিশোধ করে থাকে তাহলে বিক্রেতা থেকে এক হাজার টাকা ফেরত নিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : মুরাবাহা ও তাওলিয়া উভয় বিক্রির মধ্যে যদি খিয়ানত প্রমাণিত হয়, তাহলে খিয়ানত পরিমাণ অংশ মূল্য পরিশোধ না করে থাকলে কম দিবে। পরিশোধ করে ফেললে ফেরত নিয়ে নিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এমনও একটি অভিমত রয়েছে। এবং বলা হয়ে থাকে এটাই তার সর্বশেষ অভিমত। ইমাম আহমদ ও ইবনে আবূ লায়লার অভিমতও তাই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উভয়টির মধ্যে যদি খিয়ানত সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। হয়তো উল্লিখিত পুরো মূল্য দিয়ে পণ্য গ্রহণ করবে অথবা বিক্রয় বাতিল করে দিবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এরূপ একটি অভিমত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, চুক্তির মধ্যে যে মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই গ্রহণযোগ্য এবং মূল বিষয়। উল্লিখিত মূল্যটি জ্ঞাত। আর মূল্য জ্ঞাত হওয়া বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক। যেহেতু মূল্য জ্ঞাত হওয়া যায় উল্লেখ করার দ্বারা তাই উল্লিখিত মূল্যই গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য। অতএব দ্বিতীয় চুক্তিটি ঐ মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত হবে যা উল্লেখ করার দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে যে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বক্তব্য হলো– মুরাবাহা ও তাওলিয়ার উল্লেখ আগ্রহ ও আর্কষণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে করা হয়। সুতরাং এগুলো বিশেষ গুণ বিবেচিত হবে। যেমন বিক্রয় পণ্য ত্রুটিমুক্ত হওয়া একটা গুণবিশেষ। ত্রুটিমুক্ত হওয়া একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী গুণ। এ জাতীয় গুণ বিক্রয় পণ্যের মধ্যে না পাওয়া গেলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার প্রমাণিত হয়, সে ইচ্ছা করলে বিক্রয় বহাল রাখতে পারে, আবার বিক্রয় চুক্তি বাতিলও করতে পারে। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত গুণটি না পেলে মূল্য থেকে কোনো অংশ এর পরিবর্তে কাটা হবে না। ক্রেতা পুরো মূল্য প্রদান করে পণ্যটি গ্রহণ করতে হবে। এটি خِيَارُ عَيْبٍ -এর মতো خِيَارُ عَيْبٍ -এর মধ্যে ক্রেতার এ ধরনের ইখতিয়ার অর্জিত হয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি দোষমুক্তরূপে কোনো পণ্য ক্রয় করে, তারপর তাতে দোষ পায় তাহলে তার এই ইখতিয়ার অর্জিত হয় যে, সে ইচ্ছা করলে পণ্যটি নির্ধারিত পুরো মূল্য প্রদান করে গ্রহণ করবে অথবা

পণ্যটি নিবে না। মোটকথা, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ক্রেতা তাওলিয়া/ মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হলে তার পুরো মূল্য দিয়ে নেওয়ার কিংবা না নেওয়ার ইখতিয়ার অর্জিত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল : মুরাবাহা ও তাওলিয়া উল্লেখ করে বিক্রয় করা হলে এতে তাওলিয়া বা মুরাবাহারূপে বিক্রয় সংঘটিত হয়। এখানে মূল্য উল্লেখ করার বিষয়টি মুখ্য বা ধর্তব্য নয়। যেহেতু এই চুক্তিটি তাওলিয়া/ মুরাবাহা চুক্তি, তাই وَلَّيْتُكَ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ -এর দ্বারা তাওলিয়া ও بِعْتُكَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْاَوَّلِ বলার দ্বারা বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে; যদি মূল্য জানা থাকে। সুতরাং মূল্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আবশ্যকভাবে দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় চুক্তিটির ভিত্তি হবে প্রথম চুক্তি। মূল্যের বর্ধিতাংশ বা খিয়ানতকৃত অংশ যেহেতু প্রথম চুক্তির মাঝে অবিদ্যমান তাই দ্বিতীয় চুক্তির মাঝে এটাকে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে সংঘটিত করার জন্য প্রথম চুক্তির বর্ধিত মূল্যকে কর্তন করা আবশ্যক। তবে কর্তন করার ক্ষেত্রে তাওলিয়া ও মুরাবাহার মাঝে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য থেকে কাটা যাবে। যেমন প্রথম চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল চার হাজারের উপর। কিন্তু বিক্রেতা দাবি করে পাঁচ হাজার; পরবর্তীতে যখন খিয়ানত সম্পর্কে জানা যাবে তখন উক্ত এক হাজার টাকা মূল মূল্য পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। এবং ক্রেতা-বিক্রেতাকে চার হাজার টাকা অর্পণ করবে। যদি ক্রেতা পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করে থাকে তাহলে বিক্রেতা থেকে এক হাজার ফেরত নিবে।

পক্ষান্তরে মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হলে খিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য এবং লভ্যাংশ উভয় থেকে কাটা যাবে। উদাহরণস্বরূপ মুরাবাহা চুক্তির মাঝে খিয়ানত হয়েছে এক হাজার টাকা। চার হাজার টাকার গরু পাঁচ হাজার বলে বিক্রি করেছে। এবং পাঁচ হাজারের উপর লাভ নিয়েছে এক হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতি হাজারে লাভ নিয়েছে ২০০ দু'শত টাকা। [২০০×৫ =১০০০]। সুতরাং এখন খিয়ানতকৃত অংশ এক হাজার কাটা হবে মূল মূল্য [৫০০০-১০০০= ৪০০০] থেকে। আর লভ্যাংশ থেকে পাঁচ ভাগের একভাগ কমাবে [১০০০-$\frac{১}{৫}$ =৮০০]। এখন দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে প্রদান করবে মূল মূল্যরূপে চার হাজার আর লভ্যাংশরূপে আটশ টাকা। সর্বমোট [৪০০০+৮০০ = ৪৮০০] চার হাজার আটশত টাকা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) খিয়ানতের ক্ষেত্রে তাওলিয়া ও মুরাবাহা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন। [অথচ ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (র.) উভয়টির ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি অবলম্বন করেছেন] তাওলিয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বক্তব্য অনেকটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতো। তাওলিয়ার মূল্য হচ্ছে প্রথম চুক্তির মূল্য। সুতরাং যদি খিয়ানতকৃত [বর্ধিত] অংশ হ্রাস না করা হয় তাহলে এ চুক্তিটি তাওলিয়া হবে না। কেননা, তাওলিয়া চুক্তি প্রথম মূল্যের বিনিময়ে হয়ে থাকে। অথচ এখানে তাওলিয়া চুক্তিটি প্রথম মূল্যের উপর হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ প্রথম চুক্তি হয়েছিল চার হাজারের উপর অথচ এখানে তাওলিয়া চুক্তি করা হচ্ছে পাঁচ হাজারের উপর। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তি থেকে যদি এক হাজার টাকা না কমানো হয় তাহলে এই চুক্তিটি প্রথম চুক্তির বিনিময়ের উপর হলো না। যখন এই চুক্তি প্রথম চুক্তির বিনিময়ে না হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন এটাকে তাওলিয়া চুক্তি নামকরণ করা সম্ভব নয়; বরং এটা মুরাবাহা চুক্তিতে পরিণত হবে। একটি চুক্তিকে অন্য চুক্তিতে রূপান্তরিত করা বৈধ নয়। অতএব চুক্তিটিকে তাওলিয়ারূপে বহাল রাখার জন্য বর্ধিত মূল্য বা খিয়ানতকৃত অংশ কর্তন করতে হবে, এছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থা এখানে নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মুরাবাহা বিক্রয়ের বিষয়টি সে রকম নয়। মুরাবাহা বিক্রয়ের মধ্যে যদি খিয়ানত প্রমাণিত হয় আর তা বাতিল না করা হয় তাহলেও সেটি মুরাবাহা চুক্তি বলেই গণ্য হবে। তবে পার্থক্য এটুকু যে, খিয়ানতের সময় লাভ বেশি হবে, আর খিয়ানত না থাকলে লাভ কম হবে। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মনে করেছিল যে, সে লাভ নিচ্ছে এক হাজার টাকা বা তাকে এক হাজার টাকা লাভ দিতে হচ্ছে, কিন্তু খিয়ানত প্রকাশের পর দেখা গেল বিক্রেতা বলে কয়ে এক হাজার এবং প্রতারণার মাধ্যমে এক হাজার, মোট দুই হাজার টাকা লাভ নিচ্ছে।

ক্রেতা যেহেতু এক হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভের ব্যাপারে প্রতারিত হয়েছে তাই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। কেননা, এরূপ বিক্রয়ে সে সম্মত ছিল না। যেহেতু এরূপ বিক্রয়ে সে সম্মত নয় তাই এই বিক্রয় বহাল রাখা/না রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা (র.) মতে মুরাবাহার মধ্যে খিয়ানত হলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার বলবৎ হবে। ইচ্ছা করলে বিক্রেতার দাবিকৃত মূল্যে ক্রয় করবে, অন্যথা বিক্রয় বাতিল করবে।

فَلَابُدَّ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَ ذٰلِكَ بِالْحَطِّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحَطُّ فِى التَّوْلِيَةِ قَدْرَ الْخِيَانَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِى الْمُرَابَحَةِ مِنْهُ وَمِنَ الرِّبْحِ، وَ لِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ لَوْلَمْ يُحَطَّ فِى التَّوْلِيَةِ لَا تَبْقَى تَوْلِيَةً، لِأَنَّهُ يَزِيْدُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، فَيَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ، فَتَعَيَّنَ الْحَطُّ، وَفِى الْمُرَابَحَةِ لَوْلَمْ يُحَطَّ تَبْقَى مُرَابَحَةً، وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبْحُ فَلَا يَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ، فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيْرِ، فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيْهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ يَلْزَمُهُ جَمِيْعُ الثَّمَنِ فِى الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ، لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّهُ مُطَالَبَةٌ بِتَسْلِيْمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ.

অনুবাদ : সুতরাং প্রথম চুক্তির উপর দ্বিতীয় চুক্তির নির্ভরতা আবশ্যক। আর তা [বর্ধিত অংশ] বাদ দেওয়ার দ্বারা সম্ভব। তবে তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ বাদ দিবে মূল মূল্য থেকে, আর মুরাবাহার মধ্যে মূল মূল্য ও লভ্যাংশ থেকে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো– যদি তাওলিয়ার মধ্যে খিয়ানতকৃত অংশ বাদ না দেওয়া হয় তাহলে তাওলিয়া থাকবে না। কেননা, এতে [বর্ধিতাংশ বাদ না দেওয়াতে] প্রথম মূল্যে বর্ধিত হয়ে যায়। তখন চুক্তিটি বদলে যাবে। তাই বাদ দেওয়াই একমাত্র উপায়। পক্ষান্তরে মুরাবাহাতে বর্ধিতাংশ বাদ না দেওয়া হলেও মুরাবাহা বহাল থাকে। যদিও মুনাফাতে কমবেশি হয়, কিন্তু চুক্তি পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি এখানে সম্ভব। আর যদি পণ্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে সেটি হালাক হয়ে যায় অথবা এতে এমন ত্রুটি দেখা দেয় যা প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে জাহের বর্ণনানুসারে পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যক। কেননা, এটা তো একটি নিছক ইখতিয়ার, যার বিনিময়ে মূল্য আসে না। যেমন দেখার ইচ্ছাধিকার ও শর্তারোপের ইচ্ছাধিকার অর্জিত হয়। তবে দোষজনিত ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে বাদপড়া/ ক্ষয়কৃত অংশ অর্পণের দাবি রয়েছে। সুতরাং তা প্রদানে অপারগ হলে সেই পরিমাণ মূল্য কাটা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيْهِ الخ : হিদায়ার লেখক আল্লামা বুরহান উদ্দিন বলেন, খিয়ানত প্রমাণিত হয়েছে এমন মুরাবাহার মধ্যে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার পাওয়ার পর তা প্রয়োগ করার পূর্বেই যদি পণ্যটি হালাক হয়ে যায় কিংবা এতে এমন ত্রুটি সৃষ্টি হয় যার কারণে পণ্যটি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে খিয়ানত কৃত অংশ মূল মূল্য এবং লভ্যাংশ থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পূর্ণ মূল্য [বিক্রেতার দাবি অনুসারে] প্রদান করা আবশ্যক হবে।

মাসআলাটির উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি চার হাজার টাকায় একটি গরু ক্রয় করে ক্রেতাকে বলল, আমি পাঁচ হাজার টাকায় উক্ত গরুটি ক্রয় করেছি। [অর্থাৎ সে দাম বলার সময় এক হাজার টাকা খিয়ানত করল] এখন আমি গরুটি এক হাজার টাকা

লাভে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করব। এ কথার উপর ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা জানতে পারল যে, বিক্রেতা তার সাথে এক হাজার টাকার খিয়ানত করেছে এবং খিয়ানতটি যে কোনোভাবে প্রমাণিতও হলো। কিন্তু খিয়ানত প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রেতার কাছে গরুটি মারা গেল। অথবা ক্রেতার হাতছাড়া হয়ে গেল কিংবা গরুটির মধ্যে এমন দোষ ধরা পড়ল [যেমন- একটি পা ভেঙ্গে গেল] যার কারণে ফেরত প্রদান করা অসম্ভব হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে খিয়ানতকৃত অংশ মূল মূল্য ও লভ্যাংশ থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মূল মূল্য [পাঁচ হাজার] থেকে এক হাজার কমিয়ে [চার হাজার] দেওয়া হবে এবং এর লভ্যাংশ দুশ টাকা পুরো লভ্যাংশ থেকে কেটে দেওয়া হবে। সুতরাং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা [বিক্রেতা] কে চার হাজার আটশ টাকা প্রদান করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আজম (র.) ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুসারে পুরো মূল্যে ছয় হাজার টাকা প্রদান করা দ্বিতীয় ক্রেতার উপর আবশ্যক হবে। তারফাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এরূপ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, খিয়ানত প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের মতে পণ্য ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার ছিল, এই ইখতিয়ারের বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ ছিল না। অতঃপর যখন পণ্যের মধ্যে দোষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে পণ্য ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল তখন তার হাসিলকৃত ইখতিয়ারও বাতিল হয়ে গেল। আর ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, উক্ত স্বাধীনতার বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ নেই, তাই মূল্যের কিয়দাংশ কমানোরও সুযোগ নেই। আর এজন্য পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ দোষ সৃষ্টি হওয়ার পর মূল চুক্তিতে ছয় হাজারের উপর কথা হলে ছয় হাজার টাকাই প্রদান করতে হবে। خِيَارُ شَرْط ও خِيَارُ رُؤْيَةٌ -এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ইচ্ছাধিকারদ্বয়ের বিনিময়ে যেমন মূল্যের কোনো অংশ থাকে না, তদ্রূপভাবে আমাদের আলোচ্য ইচ্ছাধিকারের বিনিময়ে মূল্যের কোনো অংশ থাকবে না।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি خِيَارُ شَرْط -এর উপর কোনো দ্রব্য ক্রয় করে কিংবা না দেখে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে [যার দ্বারা خِيَارُ رُؤْيَةٌ লাভ হয়] তারপর দ্রব্যটি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার উপর পুরো মূল্য প্রদান করা আবশ্যক। উক্ত ইচ্ছাধিকারদ্বয়ের কারণে মূল্য কম দেওয়ার কোনো সুযোগ সে লাভ করবে না। এরূপভাবে আলোচ্য মাসআলাতে ইচ্ছাধিকার থাকা অবস্থায় ক্রেতার হাতে পণ্য হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে পুরোমূল্যই দিতে হবে। ইচ্ছাধিকার লাভ করার কারণে মূল্যের কোনো অংশ কমানো হবে না।

خِيَارُ عَيْب -এর বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন। দোষ জনিত কারণে ক্রেতার যে অধিকার হাসিল হয়। তারপর পণ্য ফেরত দেওয়ার পূর্বে যদি পণ্য হালাক হয়ে যায় তাহলেও ক্রেতার পূর্ণমূল্য প্রদান করতে হবে না। তখন ত্রুটির বিপরীতে মূল্যের একটা অংশ অবশ্যই থাকবে এবং সেটা ক্রেতার দায়িত্ব থেকে বাদ পড়বে। উদাহরণ স্বরূপ একটি পণ্যের মূল্য ধার্য হয়েছিল পাঁচশত টাকা। তারপর পণ্যটির মধ্যে একটি দোষ পরিলক্ষিত হলো, যার কারণে তার দাম এখন চারশত টাকা। এমতাবস্থায় পণ্য হালাক হলো। তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য বাবদ চারশত টাকা দিবে, পাঁচশত টাকা নয়। কেননা, দোষের কারণে পণ্যের একটা অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে অংশ বিনষ্ট হয়েছে তার মূল্যও মূল মূল্য থেকে বাদ পড়বে। মাসআলার সুরত এই যে, ক্রেতা বিক্রেতার কাছে যে অংশটি বিনষ্ট হয়েছে সে অংশটি চাইবে, অথচ বিক্রেতা সেটা দিতে অক্ষম, অন্যদিকে ক্রেতা পণ্যটি হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে ফেরত দিতেও অক্ষম। এমতাবস্থায় মূল্যের ঐ অংশ যা পণ্যের বিনষ্ট/খোয়া যাওয়া অংশের বিপরীতে রয়েছে তা বিক্রেতার পাওনা রইল না। তাই ক্রেতা একশত টাকা পরিমাণ কম করে অবশিষ্ট মূল্য [চারশত টাকা] প্রদান করবে।

قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ : লেখক رِوَايَاتٌ ظَاهِرَةٌ বলার দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর نَادِرُ الرِّوَايَاتِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সেই রিওয়ায়েতের সারমর্ম হচ্ছে- দোষ প্রকাশ পাওয়ার পর পণ্য হালাক হয়ে গেলে বাজার মূল্যের উপর বিক্রয় প্রত্যাহার/রহিত হবে, যদি বাজারমূল্য ধার্যমূল্যের থেকে কম থাকে, যাতে যথাসম্ভব ক্রেতার ক্ষতি দূর করা যায়।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا فَبَاعَهٗ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ بَاعَهٗ مُرَابَحَةً طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ كَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ، فَإِنْ كَانَ اِسْتَغْرَقَ الثَّمَنَ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ. وَقَالَا : يَبِيْعُهٗ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْاَخِيْرِ، صُوْرَتُهٗ اِذَا اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، وَبَاعَهٗ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَإِنَّهٗ يَبِيْعُهٗ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ، وَيَقُوْلُ قَامَ عَلَىَّ بِخَمْسَةٍ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهٗ بِعِشْرِيْنَ مُرَابَحَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ لَا يَبِيْعُهٗ مُرَابَحَةً اَصْلًا، وَعِنْدَهُمَا يَبِيْعُهٗ مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشَرَةِ فِى الْفَصْلَيْنِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ কাপড় ক্রয় করে [প্রথম মূল্যের উপর] লাভে বিক্রয় করে। তারপর আবার কাপড়টি ক্রয় করে। এমতাবস্থায় যদি সে [পুনরায়] মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে ইতিপূর্বে [দ্বিতীয় ক্রয়ের পূর্বে] যা মুনাফা হয়েছিল তা দ্বিতীয় ক্রয়মূল্য থেকে বাদ দিবে। তবে যদি পূর্বের মুনাফা দ্বিতীয় মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। সাহেবাইন (র.) বলেন, সে দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে। মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে পনের দিরহামে [মুরাবাহা হিসেবে] বিক্রি করল। তারপর আবার কাপড়টি দশ দিরহামে কিনে নিল। এখন সে কাপড়টির পাঁচ দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করবে। এবং বলবে আমার পাঁচ দিরহাম পড়তায় পড়েছে। আর যদি সে দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে বিশ দিরহামে বিক্রি করে মুবারাহা হিসেবে, তারপর আবার দশ দিরহামে কাপড় কিনে নেয় তাহলে সে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে উভয় অবস্থায় দশ দিরহাম উভয় মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহা হিসেবে] বিক্রি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ তাঁর আল-জামিউস সাগীরে উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি মত বিরোধপূর্ণ। মাসআলাটি এই : এক ব্যক্তি একটি কাপড় ক্রয় করে সেটাকে লাভে বিক্রি করল। তারপর সে দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে পুনরায় ক্রয় করে নিল। দ্বিতীয় ক্রয়ের, যদি দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে কি হুকুম ? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো প্রথম বিক্রয়ে যে মুনাফা হয়েছিল তা দ্বিতীয় মূল্য থেকে কমিয়ে দিতে হবে। যদি প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা এই পরিমাণ হয় যে, দ্বিতীয় মূল্যকে ধরে ফেলেছে তাহলে মুরাবাহা হিসেবে দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর সঙ্গে ইমাম আহমদ (র.) ঐকমত্য পোষণ করেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.)-এর অভিমত হলো, দ্বিতীয় মূল্য বা সর্বশেষ মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রয় করতে পারবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমতও তাই।

মাসআলার উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি দশ টাকার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনল, তারপর সে কাপড়টি অন্য ব্যক্তির কাছে দশ টাকার উপর পাঁচ টাকা মুনাফা নিয়ে পনের টাকায় বিক্রি করল। বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ করল আর ক্রেতা পণ্য গ্রহণ করে নিল। তারপর পুনরায় প্রথম ক্রেতা [বিক্রেতা] দ্বিতীয় ক্রেতার থেকে দশ টাকায় কাপড়টি কিনে নিল। এখন যদি পুনরায় মুরাবাহার ভিত্তিতে পণ্যটি বিক্রয় করতে চায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা পাঁচ টাকা দ্বিতীয় ক্রয়মূল্য থেকে কমিয়ে দেওয়া হবে [১০ − ৫ = ৫] এবং এখন মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চাইলে পাঁচ টাকার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করবে। আর বিক্রি করার সময় সে বলবে এই কাপড়টি কিনতে পাঁচ টাকা পড়েছে এবং এই পরিমাণ মুনাফা [২ টাকা + ৫ টাকা] [৫ + ৭] নিয়ে আমি [সাত টাকায়] বিক্রি করব। তবে বিক্রেতা একথা বলবে না যে, আমি পাঁচ টাকায় ক্রয় করেছি। কেননা এটা তো মিথ্যা বলা হবে।

মাসআলার দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো, এক ব্যক্তি একশত টাকায় একটি কাপড় ক্রয় করে দুইশত টাকায় [একশত টাকা মুনাফা নিয়ে] বিক্রি করল। তারপর আবার কাপড়টি একশত টাকায় ক্রয় করে নিল। এরপর যদি উক্ত ব্যক্তি কাপড়টি মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে চায় তাহলে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত। বরং উক্ত ব্যক্তি এ টাকাকে مُسَاوَمَةً [দামদরের ভিত্তিতে] বিক্রি করবে। কেননা, যদি প্রথম বিক্রয়ের মুনাফা দ্বিতীয় মূল্য থেকে কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কোনো মূল্যই থাকে না। [১০০ − ১০০ = ০]। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতে উভয় অবস্থায় [মুনাফা দ্বিতীয় মূল্যের সমান হোক কিংবা কম হোক] দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ।

لَهُمَا اَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِى عَقْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْاَحْكَامِ عَنِ الْاَوَّلِ، فَيَجُوْزُ بِنَاءُ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ، كَمَا اِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ وَلِاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) اَنَّ شُبْهَةَ حُصُوْلِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ الثَّانِىْ ثَابِتَةٌ، لِاَنَّهُ يَتَاَكَّدُ بِهِ بَعْدَ مَا كَانَ عَلٰى شَرَفِ السُّقُوْطِ بِالظُّهُوْرِ عَلٰى عَيْبٍ، وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيْقَةِ فِىْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ اِحْتِيَاطًا، وَلِهٰذَا لَمْ تَجُزِ الْمُرَابَحَةُ فِيْمَا اُخِذَ بِالصُّلْحِ لِشُبْهَةِ الْحَطِيْطَةِ، فَيَصِيْرُ كَاَنَّهُ اشْتَرٰى خَمْسَةً وَثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، فَيُطْرَحُ خَمْسَةٌ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ، لِاَنَّ التَّاَكُّدَ حَصَلَ بِغَيْرِهٖ .

অনুবাদ : তাঁদের দলিল হলো, দ্বিতীয় চুক্তিটি একটি নতুন চুক্তি এবং প্রথম চুক্তির বিধি বিধান থেকে সম্পর্কহীন একটি চুক্তি। সুতরাং এর উপর মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তি রাখা সম্ভব। যেমন যদি তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যবর্তী হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল এই যে, দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা মুনাফা অর্জনের সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, [প্রথম বিক্রয়ের দ্বারা যে মুনাফা অর্জিত হয়েছিল] তা দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা পাকাপোক্ত হয়েছে। অথচ [বিক্রীত পণ্যে] ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে উক্ত মুনাফা হাত ছাড়া হওয়ার প্রান্তে এসে গিয়েছিল। মুরাবাহা চুক্তির মধ্যে সর্তকতামূলকভাবে মুনাফার সন্দেহকে প্রকৃত সন্দেহের স্থানে রাখা হয়েছে, আর এজন্যই তো আপোষের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তাতে ভিত্তি রেখে মুরাবাহা চুক্তি করা যায় না। কেননা, এতে মূল্য কম ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এটা যেন এমন হলো যে, সে পাঁচ দিরহামের একটি কাপড় দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। অতঃপর পাঁচ দিরহাম কমিয়ে দেওয়া হলো। তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, এখানে মুনাফার নিশ্চয়তা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে হাসিল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَهُمَا اَنَّ الْعَقْدَ الخ : **সাহেবাইন (র.)-এর দলিল :** দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তির বিধানাবলি থেকে বিচ্ছিন্ন ও একটি স্বতন্ত্র চুক্তি। যেহেতু দ্বিতীয় ক্রয় চুক্তিটি প্রথম বিক্রয় চুক্তির বিধি-বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চুক্তি, তাই দ্বিতীয় চুক্তির উপর মুরাবাহা চুক্তির ভিত্তি রাখাতে কোনো সমস্যা নেই। দ্বিতীয় চুক্তির সাথে প্রথম চুক্তির যে কোনো সর্ম্পক নেই, তার উদাহরণ যেমন– প্রথম চুক্তির মধ্যে خِيَارْ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে সেই خِيَارْ থাকবে না। এমনিভাবে দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে خِيَارْ থাকলে সেই প্রথম চুক্তির মধ্যে স্থানান্তরিত হবে না। সুতরাং প্রথম চুক্তি মুরাবাহা ছিল কিংবা ওযীয়াহ ছিল তাতে কিছু আসে যায় না। এ জন্যই তো যদি মূলে পণ্যটি দানের মাধ্যমে পেয়ে থাকে কিংবা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে লাভ করে থাকে তারপর সেটাকে বিক্রি করে, তারপর আবার ক্রয় করে তবু তার জন্য ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। এখানেও পূর্বে একধরনের চুক্তি হয়েছিল তার প্রতি লক্ষ্য করা হচ্ছে না। যদি পূর্বের পণ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হতো তাহলে তো মুবারাহা চুক্তি বৈধ হতো না। পূর্বের চুক্তিসমূহ ধর্তব্যের মধ্যে না আনার কারণ এই যে, দ্বিতীয় ক্রয়ের মাধ্যমে বিক্রেতার প্রথম মালিকানা থেকে ভিন্ন একটি নতুন মালিকানা এসেছে। কেননা, মালিকানার সবব ভিন্ন হওয়া আর ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের মালিক হওয়া একই। এমনিভাবে যদি তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে আসে তাহলেও দ্বিতীয় ক্রয়ের মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে আসার ব্যাখ্যা এই যে, রাশেদ একটি কাপড় একশত টাকায় খরিদ করে মুরাবাহার ভিত্তিতে দু'শ টাকায় সেটা নাঈমের কাছে বিক্রি করল। তারপর নাঈম দু'শ টাকায় খালেদের কাছে কাপড়টি বিক্রি করল। এরপর প্রথম বিক্রেতা রাশেদ পুনরায় খালেদের কাছ থেকে কাপড়টি ক্রয় করে একশত টাকায়। এখন রাশেদ যদি অন্য

ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় ক্রয়ের মূল্য একশত টাকাকে মূল্য ধরে এর উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করে তাহলে সকলের ঐকমত্যে এই প্রক্রিয়ায় মুরাবাহা বিক্রি বৈধ। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা গ্রহণ করে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ দ্বিতীয় চুক্তিটি প্রথম চুক্তি থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটি স্বতন্ত্র চুক্তি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : যে মুনাফা প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল তা দ্বিতীয় চুক্তির মাঝেও বিদ্যমান। কেননা, দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে প্রথম চুক্তির মুনাফাটি নিশ্চিত ও স্থিতিশীল হয়েছে। দ্বিতীয় চুক্তি করার আগ পর্যন্ত মুনাফা অর্জনের বিষয়টি সুনিশ্চিত ছিল না। সেই মুনাফা না থাকারও একটি সম্ভাবনা ছিল।

এর ব্যাখ্যা এই যে, এক ব্যক্তি দশ টাকা লাভে একটি কাপড় বিক্রি করল। কাপড়টির ক্রয় মূল্য ছিল একশত টাকা। সে বিক্রয় করল একশত দশ টাকায়। তারপর আবার যার কাছে বিক্রি করেছিল তার থেকে একশত টাকায় ক্রয় করে নিল, পুনরায় একশত টাকায় ক্রয় করার কারণে তার দশ টাকা মুনাফা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলো। কেননা, যদি দ্বিতীয় ক্রয় না করত, আর ইতিমধ্যে কাপড়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিত, তাহলে ক্রেতা কাপড় ফেরত দিয়ে তার প্রদত্ত একশত দশ টাকা ফেরত নিয়ে নিত তাহলে তো বিক্রেতার মুনাফা থাকত না।

মোটকথা, যেহেতু দ্বিতীয় [ক্রয়] চুক্তি দ্বারা প্রথম চুক্তির লাভটি নিশ্চিত হয়েছে তাই দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারাও সন্দেহপূর্ণভাবে লাভ প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা সন্দেহপূর্ণভাবে মুনাফা দশ টাকা অর্জিত হয়েছে তাই যেন দ্বিতীয় চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা [প্রথম বিক্রেতা] দশ টাকার বিনিময়ে একটি কাপড় ও পাঁচ টাকা ক্রয় করল। সুতরাং ক্রয়কৃত পাঁচ টাকা মূল্যরূপে প্রদত্ত দশ টাকার অর্ধেকের তথা পাঁচ টাকার বিনিময়ে হবে এবং পাঁচের সাথে পাঁচ কাটাকাটি হয়ে যাবে। আর ক্রয়কৃত কাপড়টির মূল্য পড়বে মাত্র পাঁচ টাকা। যেহেতু কাপড়ের মূল্য পাঁচ টাকা পড়েছে তাই এই পাঁচ টাকাকে মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিবে, যাতে খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বাঁচা যায়। আর এটা আমরা পূর্বে বলেছি যে, মুরাবাহার ক্ষেত্রে খিয়ানতের সন্দেহ প্রকৃত খিয়ানতের মতো। তাই খিয়ানতের সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক হবে যেমন খিয়ানতের থেকে বাঁচা জরুরি।

قَوْلُهُ وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيْقَةِ فِىْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ الخ : এইমাত্র যা বলা হলো– খিয়ানতের সন্দেহ প্রকৃত হাকীকতের মতো। তাই তা থেকেও বাঁচতে হবে, সে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে লেখকের এই ইবারত দ্বারা। লেখক তার এই বক্তব্যকে প্রমাণের জন্য আরেকটি মাসআলাকে উপস্থাপন করেছেন। মাসআলাটি এই যে, আপোষরফার মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তার [আপোষ রফার মূল্যের] উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি তথা مُرَابَحَةٌ করা বৈধ নয়।

আপোষ ও সমঝোতার মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর দাবি করল যে, আমি তার কাছে এক হাজার টাকা পাব। অতঃপর সে ঋণগ্রহীতার সাথে এক থান কাপড়/ একজন গোলাম [এক হাজার টাকার পরিবর্তে] প্রদান করবে এই শর্তে সন্ধি বা আপোষ করল। এখন ঋণদাতা কাপড়/ গোলামের মূল্য এক হাজার ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করতে পারবে না। কারণ আপোষ ও সমঝোতা সাধারণত উদারতা ও হ্রাসমূল্যের উপর হয়ে থাকে। অর্থাৎ সন্ধির ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পাওয়া যায়। প্রকৃতভাবে হ্রাসমূল্য প্রমাণিত হলে মুরাবাহা চুক্তি করা বৈধ হয় না। সুতরাং হ্রাস মূল্যের সম্ভাবনা থাকা অবস্থায়ও এর উপর মুরাবাহা চুক্তি বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا اِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ الخ : এ বাক্য দ্বারা লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উপর আরোপিত সাহেবাইন (র.) -এর আপত্তির উত্তর দিচ্ছেন। সাহেবাইন (র.) -এর একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে যদি ক্রেতা পণ্যটি পুনরায় গ্রহণ করে তাহলে তো তার দ্বিতীয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] বিক্রি করা সবার ঐকমত্যে বৈধ। তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যম হওয়ার অর্থ হচ্ছে ক্রেতা যার কাছে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করেছে সে যদি অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তার কাছে থেকে পুনরায় ফিরে নেয় তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা যাবে। অতএব আমাদের আলোচ্য মাসআলাতেও দ্বিতীয় চুক্তির উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে। আপত্তির উত্তরে লেখক বলেন, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্তী হওয়ার বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যম হওয়ার অবস্থায় মুনাফা নিশ্চিত হয় তৃতীয় ব্যক্তির খরিদ করার কারণে। দ্বিতীয় চুক্তির কারণে তার মুনাফা নিশ্চিত হয়নি। অর্থাৎ তার মুনাফা নিশ্চিত হওয়ার পিছনে দ্বিতীয় চুক্তির কোনো দখল নেই। আর তাই খিয়ানতের কোনো সম্ভাবনা রইল না। যেহেতু খিয়ানতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাই দ্বিতীয় চুক্তির মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা অবৈধ নয়।

قَالَ : وَاِذَا اشْتَرٰى الْعَبْدُ الْمَاذُوْنُ لَهُ فِى التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِرَقَبَتِهِ، فَبَاعَهُ مِنَ الْمَوْلٰى بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَاِنَّهُ يَبِيْعُهُ مُرَابَحَةً عَلٰى عَشَرَةٍ، وَكَذٰلِكَ اِنْ كَانَ الْمَوْلٰى اِشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ مِنَ الْعَبْدِ، لِاَنَّ فِىْ هٰذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ لِجَوَازِهِ مَعَ الْمُنَافِىْ، فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِىْ حُكْمِ الْمُرَابَحَةِ، وَبَقِىَ الْاِعْتِبَارُ لِلْاَوَّلِ، فَيَصِيْرُ كَاَنَّ الْعَبْدَ اِشْتَرَاهُ لِلْمَوْلٰى بِعَشَرَةٍ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ، وَكَاَنَّهُ يَبِيْعُهُ لِلْمَوْلٰى فِى الْفَصْلِ الثَّانِىْ، فَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ الْاَوَّلُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত দাস যদি দশ টাকায় একটি কাপড় খরিদ করে এমতাবস্থায় যে, তার কাঁধে তার মূল্য সমপরিমাণ ঋণ রয়েছে, অতঃপর সে তার মুনিবের কাছে কাপড়টি পনের টাকায় বিক্রি করে দেয় তাহলে মুনিব উক্ত কাপড় দশ টাকা মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে তদ্রূপ মুনিব যদি কাপড় কিনে [ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত] দাসের কাছে বিক্রি করে [পনের টাকায় তাহলে দাস দশ টাকার উপর মুনাফা নিয়ে কাপড়টি অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে।] কেননা [দাস ও তার মুনিবের মাঝে সম্পাদিত] এই চুক্তিটিতে অবৈধতার বৈধ না হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। কারণ, বৈধতার বিপরীত বিষয় থাকা সত্ত্বেও চুক্তিটিকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন বিবেচনা করা হবে। আর প্রথম চুক্তিটিকে গ্রহণ করা হবে। অতএব প্রথম অবস্থায় যেন ক্রীতদাস তার মুনিবের জন্য দশ টাকায় কাপড় ক্রয় করল এবং দ্বিতীয় অবস্থায় যেন সে মুনিবের জন্য বিক্রি করল। অতএব প্রথম মূল্যটিই [উভয় অবস্থায়] বিবেচ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَاِذَا اشْتَرٰى الْعَبْدُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলা ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীরে বর্ণনা করেছেন। মাসআলাটির স্বরূপ : এক ব্যক্তি তার গোলামকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামটি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করল। কাপড় ক্রয়ের সময় গোলাম ঋণে জর্জরিত ছিল। আর তার ঋণের পরিমাণ এত যে, গোলামের মূল্যকে তা ধরে ফেলেছে। অর্থাৎ গোলামের মূল্য এবং ঋণ সমান সমান।

নিহায়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মূল্য পরিমাণ ঋণ থাকার শর্ত করা হয়েছে, নতুবা যদি গোলামের সেই পরিমাণ ঋণ না থাকে তাহলে মুনিবের কাছে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা, এ জাতীয় বিক্রি নতুন কোনো কিছু আবশ্যক করে না, যা বিক্রয়ের পূর্বে ছিল না।

মোটকথা, ঋণগ্রস্ত অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে তারপর সেটা মুনিবের কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে মুনিবের জন্য দশ দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ। পনের দিরহামের উপর নয়। তদ্রূপ যদি মুনিব একটি কাপড় দশ দিরহামে ক্রয় করে উপরিউক্ত গোলামের কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে গোলাম দশ দিরহাম মূল মূল্য ধরে তার উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু তার কেনা মূল্য পনের দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে না। উভয় মাসআলার দলিল হচ্ছে– উভয় অবস্থায় বিক্রয় শুদ্ধ না হওয়ার একটি সন্দেহ রয়েছে, যদিও প্রকৃতার্থে বিক্রয়টি বৈধ।

নাজায়েজের সন্দেহের কারণ হচ্ছে– বিক্রয়টি বৈধ করা হয়েছে তার বিপরীত বিষয়ের সাথে সহাবস্থান করা সত্ত্বেও। বিপরীত বিষয় হলো গোলাম তার মুনিবের মালিকানাধীন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত পাওনাদারগণ তাদের পাওনা বাবদ গোলাম না নিবে ততক্ষণ এটি মুনিবের মালিকানাধীন। তাছাড়া মুনিব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করে ফেললেও সে মুনিবের মালিকানাধীন গণ্য হবে। যেহেতু অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামটি মুনিবের মালিকানাধীন আছে, তাই এই বিক্রিটি এমন হলো যে, কোনো ব্যক্তি তার নিজের কাছেই যেন নিজে কিছু বিক্রি করেছে। অথবা মুনিব তার মালিকানাধীন বস্তু পুনরায় খরিদ করেছে। আর বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। এতো গেল অবৈধ হওয়ার সন্দেহ।

কিন্তু প্রকৃতার্থে বৈধ হওয়ার দলিল হলো, যখন গোলাম তার মূল্য পরিমাণ ঋণে জর্জরিত তখন গোলাম তো পাওনাদারদের অধিকারে চলে গেছে। ফলে মুনিবেরও অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মধ্যে মালিকানার সম্পর্ক রইল না; বরং গোলাম অপরিচিত ব্যক্তির পর্যায়ে হয়ে গেল। অপরিচিত দুই ব্যক্তির মাঝে বেচা-কেনা যেমন বৈধ তেমনি উপরিউক্ত মুনিব ও তার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মাঝে বিক্রি বৈধ হবে। সুতরাং গোলাম ও তার মুনিবের মাঝে বৈধ পন্থায় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

মোটকথা, মুনিব ও ঋণে জর্জরিত গোলামের মাঝে যদিও প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় বৈধ তবু এতে অবৈধ হওয়ার সন্দেহ বিদ্যমান। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা বিক্রির মাঝে সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি এজন্য মুনিব ও তার গোলামের মাঝে অনুষ্ঠিত ক্রয়-বিক্রয়কে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হয়েছে এবং প্রথম বিক্রয়টিকেই বিবেচনায় রাখা হয়েছে। সুতরাং এটা যেন এমন হলো যে, [প্রথম অবস্থায়] গোলাম তার মুনিবের জন্য দশ দিরহামের কাপড়টি ক্রয় করল এবং [দ্বিতীয় অবস্থায়] গোলাম কাপড়টি যেন তার মুনিবের জন্য বিক্রি করল। যেহেতু এ দ্বিতীয় বিক্রয়টি অগ্রহণযোগ্য এবং প্রথম বিক্রয়টি ধর্তব্য, তাই মুনাফা নেওয়ার ভিত্তি প্রথম চুক্তির মূল্যই হবে এবং দ্বিতীয় বিক্রয়ের উল্লিখিত মূল্য মুরাবাহার ভিত্তি হতে পারবে না।

আমাদের আলোচ্য প্রথম চুক্তির মধ্যে মূল্য দশ দিরহাম [আর দ্বিতীয় চুক্তির মূল্য পনের দিরহাম] তাই দশ দিরহামই হবে মুরাবাহা/ মুনাফা নেওয়ার ভিত্তি।

মুরাবাহা চুক্তি হলো সম্পূর্ণরূপে আমানতদারীর একটি চুক্তি। এতে বিক্রেতার উপর ক্রেতার অগাধ বিশ্বাস থাকে যে, বিক্রেতা কোনো ধরনের ছল-ছাতুরী, প্রতারণা ও ধোঁকা দিবে না। তাই শরিয়ত এ বিক্রয়টিকে খিয়ানত এবং খিয়ানতের সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখার আদেশ জারি করেছে। খিয়ানতের সন্দেহ হতে পারে এমন সম্ভাবনাকেও এতে মেনে নেওয়া হয়নি। অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম ও মোকাতাব এবং তাদের মুনিবের মাঝে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এ সন্দেহ থাকা অমূলক নয় যে, মুনিব তার গোলাম থেকে বেশি দামে কিনেছে কিংবা বেশি দামে বিক্রি করেছে। আর এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার পিতা/ মাতা/ পুত্র থেকে কোনো কিছু ক্রয় করে কিংবা এরা তার কাছে কোনো কিছু বিক্রয় করে তাহলে তাদের কেউই ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে না। তবে যদি বিক্রেতার পড়তা মূল্যে বিক্রয় করে তাহলে তা বৈধ। কারণ, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য ধরা/ছাড়াতে শিথিলতা পাওয়া যায়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের জন্য কিছু উদারতা প্রদর্শন করবে। তবে উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.) দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন, যেহেতু উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মালিকানা ভিন্ন এবং হকও পৃথক, তাই তাদের ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে [মুরাবাহার ভিত্তিতে] ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

قَالَ : وَاِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِالنِّصْفِ، فَاشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ، وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَاِنَّهُ يَبِيْعُهُ مُرَابَحَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ وَنِصْفٍ، لِاَنَّ هٰذَا الْبَيْعَ وَاِنْ قُضِىَ بِجَوَازِهٖ عِنْدَنَا عِنْدَ عَدَمِ الرِّبْحِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) اَنَّهُ اِشْتَرٰى مَالَهُ بِمَالِهٖ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِسْتِفَادَةِ وِلَايَةِ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ مَقْصُوْدٌ، وَالْاِنْعِقَادُ يَتَّبِعُ الْفَائِدَةَ، فَفِيْهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ، اَلَا تَرٰى اَنَّهُ وَكِيْلٌ عَنْهُ فِى الْبَيْعِ الْاَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ، فَاعْتُبِرَ الْبَيْعُ الثَّانِىْ عَدَمًا فِىْ حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামেউস সগীর গ্রন্থে বলেন, যদি মুযারিবের কাছে দশ দিরহাম সমান সমান মুনাফার ভিত্তিতে থাকে, অতঃপর দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে সে রাব্বুল মাল [বিনিয়োগ কারী] এর কাছে পনের দিরহামে বিক্রি করে তাহলে সে সাড়ে বার দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করবে। কেননা, এ বিক্রয়ে মুনাফা অবিদ্যমান থাকাকালে আমাদের মতে ইমাম যুফার (র.) -এর বিরোধিতা সত্ত্বেও- যদিও বৈধ, তবু এতে বিনিয়োগকারী নিজ মালকে নিজ মালের বিনিময়ে খরিদ করছে। কেননা, বিনিয়োগকারী উক্ত ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবহারের অধিকার অর্জন করছে। আর এটাই [ক্রয়ের দ্বারা] উদ্দেশ্য। চুক্তি সম্পাদন ফায়েদার অনুবর্তী হয়। তবে এতে অবৈধতার সন্দেহ বিদ্যমান। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুযারিব মূলধনদাতার পক্ষে এক ধরনের উকিল। সুতরাং অর্ধেক মুনাফার ক্ষেত্রে বিক্রয়টিকে অস্তিত্বহীন ধরা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَاِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ الخ : مُضَارِبْ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে অন্যের মূলধন নিয়ে নিজে পরিশ্রম করে ব্যবসা করে। رَبُّ الْمَالِ হলো অর্থ বিনিয়োগকারী বা মূলধনদাতা। মুযারিব ও মূলধনদাতা এভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, আমাদের শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করে যা লাভ আসবে তা আমরা সমান সমান হারে বণ্টন করে নিব/ কম-বেশ করে নিব। বলা বাহুল্য যে, তাদের পরস্পর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে এবং একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে সংঘটিত ক্রয়-বিক্রয় দুই অপরিচিত ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের মতো হবে না। এ বিষয়টি মনে রাখার পর ইবারতের মাসআলার আলোচনায় আসা যাক।

আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, এক ব্যক্তি [খালেদ] অন্য ব্যক্তি [রাশেদ] কে মুযারাবার ভিত্তিতে দশ দিরহাম দিল। এই শর্তে যে, লাভ দু'জনের মাঝে সমান হারে বণ্টন হবে। অতঃপর রাশেদ দশ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে মূলধনদাতার কাছে পনের দিরহামে সেটা বিক্রি করে দিল। মূলধনদাতা যদি উক্ত কাপড়টি মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে চায় তাহলে সে তার ক্রয়মূল্য [পনের দিরহামের পরিবর্তে] সাড়ে বার দিরহাম ধরে তার উপর মুনাফা নিবে। অবশ্য মূলধনদাতা কাপড় বিক্রয়ের সময় তার ক্রেতাকে বলবে এটা সাড়ে বার দিরহামে আমার পড়তা পড়েছে এবং এত দিরহাম লাভে সেটা বিক্রি করব। কারণ, মুরাবাহা বিক্রির মধ্যে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ উভয় থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

পুঁজি বিনিয়োগকারী কাপড়টি যদি পনের দিরহাম মূল্য ধরে তার উপর লাভ নেয় তাহলে তাতে খিয়ানতের সন্দেহ পাওয়া যায়। খিয়ানতের সন্দেহ পাওয়া যাওয়ার ব্যাখ্যার পূর্বে মুযারিব ও মূলধনদাতার পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত মাসআলা জেনে নেওয়া আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, মুযারাবার মাল ক্রয়-বিক্রয়ে যদি মুনাফা থাকে তাহলে উক্ত মাল মুযারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর কাছে, আর পুঁজি বিনিয়োগকারী মুযারিবের কাছে বিক্রি করতে পারে। এ মাসআলায় সব ইমাম একমত। পক্ষান্তরে যদি মাল ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো মুনাফা না থাকে তাহলে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো বিক্রয় বৈধ। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে অবৈধ।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল : مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ -কে বিক্রয় বলা হয়। বিক্রয়ের এ সংজ্ঞা তখনই পাওয়া যাবে যখন দু'জন ব্যক্তি পরস্পরের মালের বিনিময় করে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি নিজ মাল নিজ মালের বিনিময়ে বদল করে তখন সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটাকে বিক্রয় বলা যাবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলায় নিজ মাল নিজ মালের বিনিময়ে গ্রহণ করা হচ্ছে। কারণ, যখন মুযারিব দশ দিরহামে কাপড় ক্রয় করে পুঁজি বিনিয়োগকারীর কাছে তা বিক্রি করছে তখন তো পুঁজি বিনিয়োগকারী নিজের মালের বিনিময়ে নিজের মাল খরিদ করছে। কেননা যে কাপড়টি খরিদ করছে তা যেমন তার মাল, তেমনি কাপড়ের বিনিময়ে যে দিরহাম প্রদান করছে তাও তারই মাল। সুতরাং এখানে মুযারিব ও পুঁজি বিনিয়োগকারীর মধ্যে মূলত কোনো বিক্রয় সংঘটিত হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সাধারণভাবে কোনো উপকার লাভ করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উপকার পাওয়া গেলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ সাব্যস্ত হবে। আলোচ্য বিক্রয়ে এমনই ফায়েদা বিদ্যমান। তা এভাবে যে, পুঁজি বিনিয়োগকারী যখন তার মালামাল মুযারিবের হাতে তুলে দিল, তখন থেকে সে উক্ত মালে হস্তক্ষেপ করার অধিকার হারাল। অতঃপর যখন সে পুনরায় ক্রয়ের মাধ্যমে মাল হস্তগত করল তার হস্তক্ষেপের অধিকার ফিরে আসল। এজন্যই তো যদি মূলধনদাতার দাসী মুযারাবার মালে পরিণত হয় তাহলে তার জন্য উক্ত দাসী ব্যবহার করার অধিকার আর থাকে না। পক্ষান্তরে মুযারিব বিনিয়োগকারী মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। এমন কি তাতে মূলধনদাতা বাধা দেওয়ার ও অধিকার রাখে না। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূলধনদাতা বিক্রয়ের দ্বারা হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করে, আর বিক্রয়ের মূল উদ্দেশ্য তো হস্তক্ষেপের অধিকার। যেহেতু এ বিক্রয় এমন গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাকে শামিল করে তাই এ বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হবে। বিক্রয় বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে, তাই এ বিক্রয়ে নাজায়েজের সন্দেহ বিদ্যমান। এ ছাড়া আরেকটি কারণে নাজায়েজের সন্দেহ আছে, তা এই যে, মুযারাবা চুক্তির মাঝে মুযারিব পুঁজি বিনিয়োগকারীর পক্ষে এক প্রকার উকিল তথা ভারপ্রাপ্ত সহকারী হয়। মুযারিব তার জন্য যেমন কাজ করে তেমনি পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য কাজ করে। আর এজন্যেই মুনাফা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হয়। তবে অন্য উকিলের মতো পুরোপুরি উকিল নয়, কারণ অন্য উকিল তো কেবল তার মক্কেলের জন্য কাজ করে এবং মুনাফা কেবল মক্কেলেই লাভ করে। যেহেতু মুযারিব এক প্রকার উকিল তাই তার মক্কেলের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ না হওয়াই উচিত। তবে পুরোপুরি উকিল না হওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

মোটকথা, মুযারিব ও মূলধনদাতার মাঝে যদিও বিক্রয় জায়েজ তবু এতে নাজায়েজের সন্দেহ বিদ্যমান। আর উক্ত সন্দেহের কারণে দ্বিতীয় বিক্রয় তথা মূলধনদাতা কাপড়টি যখন পনের দিরহামে ক্রয় করল তার মূল মুনাফার [পাঁচ দিরহামের] অর্ধেক তথা আড়াই দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয় অসংঘটিত বিবেচিত হবে। কেননা, এই আড়াই দিরহাম মূলধনদাতার পাওনা। খিয়ানতের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে উক্ত আড়াই দিরহাম মূল্য কমিয়ে দিবে। অবশিষ্ট সাড়ে বার দিরহাম তথা মূলধন দশ দিরহাম ও মুযারিবের মুনাফা আড়াই দিরহামে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই তাই মূলধনদাতা সাড়ে বার দিরহামের উপর মুনাফা নিয়ে মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। তবে বিক্রির সময় সে এ কথা বলবে না যে, আমি সাড়ে বার দিরহামে ক্রয় করেছি। কেননা, এটা মিথ্যা। সে বলবে, আমার সাড়ে বার দিরহাম পড়তায় পড়েছে।

মাসআলা : যদি মুযারিব ও মূলধনদাতা কোনো পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর তারা উভয়ে সেটাকে ভাগ করে নেয় তারপর তাদের যে কেউ মূল্যের অংশের ভিত্তিতে তার অংশ মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায় তাহলে তা তখনই বৈধ হবে যখন তারা পণ্যটি সমান ভাগে ভাগ করে এবং উভয় অংশ সম্পূর্ণ সমান ভাগে বণ্টিত হয়। যদি সে পণ্যটি সমান ভাগে ভাগ না করা যায় তাহলে নিজ অংশ মুরাবাহারূপে বিক্রি করা যাবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَاعْوَرَّتْ اَوْ وَطِيَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ يَبِيْعُهَا مُرَابَحَةً وَلَايُبَيِّنُ، لِاَنَّهُ لَمْ يَحْتَبِسْ عِنْدَهُ شَئٌ يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ، لِاَنَّ الْاَوْصَافَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ، لِهٰذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ لَا يَسْقُطُ شَئٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ، وَالْمَسْاَلَةُ فِيْمَا اِذَا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْئُ، وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ اَنَّهُ لَا يَبِيْعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ كَمَا اِذَا احْتَبَسَ بِفِعْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসীটি কানা হয়ে যায় কিংবা দাসীটি অকুমারী অবস্থায় তার সাথে সহবাস করে তাহলে এ দোষ বর্ণনা না করেই সে মুরাবাহা হিসেবে তা বিক্রি করতে পারবে। কেননা, ক্রেতার কাছে এমন কিছু রয়ে যায়নি যার বিনিময়ে মূল্য আসতে পারে। কারণ, গুণাবলি হলো বস্তুর অনুবর্তী বিষয়। এগুলোর বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয় না। এজন্যই যদি বস্তু অর্পণ করার পূর্বেই গুণাবলি তিরোহিত হয় তাহলে মূল্যের কোনো অংশ কাটা যায় না। এমনিভাবে সঙ্গম সুবিধার বিপরীতেও মূল্য আসে না. মাসআলাটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সহবাস মহিলার কোনো ত্রুটি না ঘটায়। প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণিত একটি অভিমত হলো বর্ণনা না করে বিক্রি করবে না। যেমন ক্রেতার কোনো কাজের দ্বারা যদি কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমতও তাই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মূল মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

সূরতে মাসআলা : কেউ একটি দাসী ক্রয় করল, তারপর ঘটনাচক্রে দাসীটির একচোখ নষ্ট হয়ে গেল কিংবা চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল অথবা কেউ অকুমারী একটি দাসী ক্রয় করল, তারপর সে দাসীর সাথে সঙ্গম করল এবং সঙ্গমে দাসীটি ত্রুটিযুক্ত হলো না। উল্লেখ্য যে, অকুমারী দাসীর সাথে সঙ্গম করলে তার মাঝে কোনো নতুন ত্রুটি জন্মায় না। অবশ্য কুমারীর সাথে সঙ্গম করা হলে সেটা ত্রুটি যুক্ত হয়ে যায়। উভয় অবস্থায় ক্রেতা দাসীটি প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা দিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা না করে বিক্রি করতে পারবে। অর্থাৎ এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, দাসীটি পূর্বে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় আমি কিনেছিলাম, তারপর ত্রুটিযুক্ত হয়েছে ইত্যাদি। তদ্রূপ ক্রেতা কোনো কাপড় অথবা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করল, তারপর তাতে ত্রুটি দেখা গেল- তাহলেও সে কোনো কিছু বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

মাসআলার দলিল : ক্রেতার কাছে পণ্যের/দাসীর কোনো অংশ রয়ে যায়নি কিংবা ক্রেতার তার কর্মের দ্বারা কোনো অংশ রেখে দেয়নি যার পরিবর্তে মূল্যের একটা অংশ প্রদান করতে হবে। বাকি রইল পণ্য/দাসী ত্রুটিমুক্ত হওয়া তো একটি আকর্ষণীয় গুণ। গুণ সত্তার অনুবর্তী বিষয়। সত্তার বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়, কিন্তু গুণের বিপরীতে মূল্য আসে না। আলোচ্য মাসআলায় দাসী যেহেতু বিদ্যমান রয়েছে, তাই গুণের অনুপস্থিতির কারণে মূল্যের কোনো অংশ বাদ যাবে না। যেহেতু মূল্যের কোনো অংশ কাটা যাচ্ছে না তাই ক্রেতা পুরো মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে লেখক অন্য একটি মাসআলা দ্বারা বিষয়টি সমর্থনপুষ্ট করেন। মাসআলাটি এই : যদি ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিক্রেতা পণ্য ক্রেতার হাতে অর্পণ করার পূর্বে পণ্যের কোনো গুণ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার মূল্যের কোনো অংশ কমানো হয় না। এরপর লেখক বলেন, সঙ্গমের সুবিধা ভোগ যেহেতু কোনো মাল নয়, তাই এর বিনিময়ে কোনো মূল্য আবশ্যক হবে না। সুতরাং ক্রেতা যদি অকুমারী দাসীর সাথে সঙ্গম করে এবং সঙ্গম করার দ্বারা দাসীর মধ্যে দোষ সৃষ্টি না হয় তাহলে ক্রেতা দাসীটিকে পূর্ণ মূল্যের উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে পারে। এবং দাসী সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই যে, দাসীর সাথে ক্রয়ের পর আমি সঙ্গম করেছি। পক্ষান্তরে যদি সঙ্গমের দ্বারা দাসী ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়- যেমন দাসী আগে কুমারী ছিল, পরে সঙ্গমের ফলে তার কুমারিত্ব চলে গেছে, এমতাবস্থায় দাসী সম্বন্ধে বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কেননা কুমারিত্বের পর্দা দূর করার কারণে ক্রেতা যেন দাসীর একটা অংশ নিজের কাছে রেখে দিল। আর এটা স্বাভাবিক কথা যে, পণ্যের একাংশ ক্রেতার কাছে রেখে দিলে তার পরিবর্তে মূল্যের একাংশ অবশ্যই কমানো হবে। মূল্যের একাংশ কমানোর অর্থই হলো পূর্ণ মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করার সুযোগ না থাকা। সুতরাং মূল্যের একাংশ কমে যাওয়ার কারণে পূর্ণ মূল্যের উপর [বর্ণনা করা ব্যতীত] মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الخ : লেখক এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি মত উল্লেখ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, যদি দাসী কেনার পর সেটা কোনো কারণে কানা হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা এর পূর্বাপরের অবস্থা বর্ণনা না করে প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা চুক্তি করতে পারবে না। ক্রেতা বলবে, আমি দাসীটিকে ত্রুটিমুক্ত ক্রয় করেছিলাম, তারপর আমার কাছে আসার পর এর একচোখ দৃষ্টিহীন হয়েছে। এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ মাসআলাটিকে আরেকটি ঐকমত্যের মাসআলা দ্বারা শক্তিশালী করেন। আর তা এই যে, ক্রেতা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা তার কোনো কাজের দ্বারা দাসীর কোনো অংশ নষ্ট করে দেয় তাহলে তা বর্ণনা করা সকলের মতেই আবশ্যক। এ মাসআলাটির আলোচনা সামনের ইবারতে আসছে।

অতএব উক্ত মাসআলাতেও দাসীর ত্রুটি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া ক্রেতার জন্য আবশ্যক হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সাথে ইমাম শাফিয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.) ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম শাফিয়ী (র.) অবশ্য নীতিগত কারণেই একমত পোষণ করেন। কারণ, তাঁর মতে গুণের বিপরীতে মূল্যের অংশ থাকে। সুতরাং গুণের অনুপস্থিতিতে মূল্য কমানো হবে। চাই সে গুণ প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হোক কিংবা ক্রেতার কর্মের দ্বারা নষ্ট হোক।

আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এজন্য বর্ণনা করা জরুরি যে, যদি দ্বিতীয় ক্রেতা অবগত হয় যে, প্রথম ক্রেতা বিক্রীত-পণ্যটিকে ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় খরিদ করেছিল এবং উল্লিখিত মূল্যেই ক্রয় করেছিল তাহলে প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে বিক্রি করা প্রথম ক্রেতার জন্য বৈধ নয়। অতএব এখানেও ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করার জন্য উক্ত বিষয় বর্ণনা করা জরুরি।

فَأَمَّا إِذَا فَقَأَ عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَأَهَا أَجْنَبِيٌّ فَأَخَذَ أَرْشَهَا لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتّٰى يُبَيِّنَ، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ، فَيُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ بِكْرٌ، لِأَنَّ الْعُذْرَةَ جُزْءٌ مِنَ الْعَيْنِ يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ، وَقَدْ حَبَسَهَا وَلَوِ اشْتَرٰى ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَارٍ أَوْ حَرْقُ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَلَوْ تَكَسَّرَ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ لَا يَبِيعُهُ حَتّٰى يُبَيِّنَ، وَالْمَعْنٰى مَا بَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : তবে যদি ক্রেতা স্বয়ং দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয় অথবা অন্য ব্যক্তি তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তারপর সে জরিমানা আদায় করে তাহলে বর্ণনা করার পূর্বে মুরাবাহা রূপে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, নষ্ট করার কারণে গুণ উদ্দিষ্ট বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং এর বিপরীতে মূল্য আসবে। তদ্রূপ যদি কুমারী দাসীর সাথে সঙ্গম করে। কেননা, কুমারিত্ব মূলের অংশ, যার বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়। আর ক্রেতা এ অংশটি রুখে দিয়েছে। যদি কেউ কাপড় খরিদ করে অতঃপর তা ইঁদুরে কর্তন কিংবা আগুনের পোড়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কোনো বর্ণনা ছাড়াই প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহারূপে বিক্রি করতে পারবে, আর যদি সেটা খুলতে কিংবা ভাঁজ করতে গিয়ে ফেটে বা ছিঁড়ে যায় তাহলে বর্ণনা না করে বিক্রি করতে পারবে না– মাসআলার কারণ ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَأَمَّا إِذَا فَقَأَ عَيْنَهَا الخ : লেখক উপরিউক্ত ইবারতে পূর্বের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, ক্রয়কৃত পণ্যের মাঝে যদি ক্রেতার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে এটা বর্ণনা করার পূর্বে প্রথম মূল্যের উপর মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করতে পারবে না।

প্রথম মাসআলা : যদি ক্রেতা দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয়/উপড়ে ফেলে অথবা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি দাসীর চোখ ফুঁড়ে দেয় তারপর ক্রেতা উক্ত দোষী ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে তাহলে উক্ত দাসীকে মুরাবাহারূপে [প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে] বিক্রি করার জন্য শর্ত হলো– এ কথা বলে দেওয়া যে, আমি দাসীটি ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় খরিদ করেছিলাম, তারপর সেটাকে কানা করে দিয়েছি ইত্যাদি। এর দলিল হচ্ছে– চোখ নষ্ট করে দেওয়ার কারণে দৃষ্টিশক্তির যা গুণ ছিল তা মূলে এবং উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। আর যেসব গুণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সেগুলোর বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়। ফলে মাসআলা এমন হয়ে গেল যেন, ক্রেতা দাসীর চোখ ফুঁড়ে দাসীর একটি অঙ্গ বিশেষ নিজের কাছে রেখে দিল। যদি দাসীর চোখ তৃতীয় পক্ষের কেউ ফুঁড়ে থাকে এবং এরপর ক্রেতা তার জরিমানা উসুল করে থাকে তাহলে যেন সে দাসীর একাংশ নিজের কাছে রেখে দিল। কারণ, কোনো জিনিসের বদল রাখা সেই বস্তু রাখারই নামান্তর। সুতরাং যদি ক্রেতা দাসীর চোখ কানা করে দেয় কিংবা দাসীর চোখ তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কানা করে দেয় তাহলে উক্ত ঘটনা বর্ণনা না করে দাসীর প্রথম মূল্যের উপর মুনাফা নিয়ে দাসীকে বিক্রি করতে পারবে না।

দ্বিতীয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি কুমারী দাসী ক্রয় করে এবং তার সাথে সঙ্গম করে তার কুমারিত্ব নষ্ট করে তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার কাছে তা বর্ণনা না করে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ দাসীর [নারীর] কুমারিত্বের পর্দা এমন একটি দেহাংশ, যার পরিবর্তে মূল্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অথচ ক্রেতা দাসীর কুমারিত্ব নষ্ট করার দ্বারা তার সেই

অংশকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, তাই মুরাবাহারূপে বিক্রি করার সময় একথা বলে দেওয়া আবশ্যক যে, আমি দাসীটি কুমারী অবস্থায় এত টাকায় ক্রয় করেছিলাম, পরে আমার দ্বারা তার কুমারিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, কারও চোখ যদি এমনিতেই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর বর্ণনা করার আবশ্যকতা নেই।

তৃতীয় মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কাপড় কিনে ঘরে রাখে, অতঃপর কাপড়টি ইঁদুরে কাটে কিংবা এর একাংশ আগুনে জ্বলে যায় তাহলে মুরাবাহারূপে বিক্রি করার জন্য ইঁদুর কাটার কিংবা আগুনে জ্বলার কথা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কাপড় ত্রুটিমুক্ত থাকা হচ্ছে একটি গুণ। এর বিপরীতে মূল্যের কোনো অংশ বিনিময় রূপে আসে না। তাই এর বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ মাসআলা : পক্ষান্তরে [৪র্থ মাসআলা] যদি কাপড় খোলার কিংবা ভাঁজ করার সময় কাপড় ফেটে যায়/ ভেঙ্গে যায়– উল্লেখ্য যে, মসলিন, রেশম ও সিল্ক ইত্যাদি জাতীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, অসতর্কভাবে খোলার সময় কিংবা ভাঁজ করার সময় এসব কাপড় ফেটে যায়। মোটকথা, যদি এভাবে ফেটে কিংবা ভেঙ্গে যায়– তাহলে মুরাবাহা বিক্রির সময় এর বর্ণনা প্রদান করা আবশ্যক। এর দলিল ইতিপূর্বে এমনই এক মাসআলায় বলা হয়েছে যে, পণ্যের গুণাবলির বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয় না। তবে যদি গুণাবলি মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর বিপরীতে মূল্য আসে। আলোচ্য মাসআলাতে ক্রেতার খোলা এবং ভাঁজ করার কারণে কাপড়ের ত্রুটিহীন হওয়ার গুণটি নষ্ট হয়ে গেছে। আর নষ্ট করার কারণে কাপড়ের ত্রুটিমুক্ত হওয়ার গুণটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। যেহেতু নিখুঁত হওয়ার গুণটি উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে তাই এর বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হবে। আর এজন্য ক্রেতার পক্ষে উক্ত ত্রুটিমুক্ত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা ছাড়া মুরাবাহারূপে বিক্রি করা বৈধ হবে না।

وَالْمَعْنٰى مَا بَيَّنَّاهُ দ্বারা উদ্দেশ্য দু'টি–

১. গুণের বিনিময়ে কোনো মূল্য আসে না

২. গুণ উদ্দেশ্য হলে তার বিনিময়ে মূল্য আসে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى غُلَامًا بِاَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِيْئَةً فَبَاعَهٗ بِرِبْحِ مِائَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِىْ فَاِنْ شَاءَ رَدَّهٗ وَاِنْ شَاءَ قَبِلَ. لِاَنَّ لِلْاَجَلِ شِبْهًا بِالْمَبِيْعِ، اَلَا يَرٰى اَنَّهٗ يُزَادُ فِى الثَّمَنِ لِاَجْلِ الْاَجَلِ، وَالشُّبْهَةُ فِىْ هٰذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيْقَةِ، فَصَارَ كَاَنَّهٗ اشْتَرٰى شَيْاَيْنِ وَبَاعَ اَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً بِثَمَنِهِمَا، وَالْاِقْدَامُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ يُوْجِبُ السَّلَامَةَ عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ الْخِيَانَةِ، فَاِذَا ظَهَرَتْ يُخَيَّرُ، كَمَا فِى الْعَيْبِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে দাস ক্রয় করে একশত দিরহাম মুনাফা নিয়ে কোনো কিছু বর্ণনা না করে বিক্রি করে দেয়, তাহলে [দ্বিতীয়] ক্রেতা যখন [বাকিতে ক্রয় করার বিষয়টি] জানতে পারবে তখন তার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যদি সে ইচ্ছা করে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে অথবা যদি ইচ্ছা করে বিক্রয় গ্রহণ করতে পারে। কেননা, মেয়াদের সাথে বিক্রয় পণ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, মেয়াদের কারণে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। আর মুরাবাহার মধ্যে সন্দেহকে প্রকৃত অবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলে এটা এমন হলো যে, এক ব্যক্তি দু'টি বস্তু ক্রয় করেছে, তারপর দুটোর একটাকে উভয়ের মূল্যে মুরাবাহারূপে বিক্রি করল। মুরাবাহা চুক্তি করার জন্য অগ্রসর হওয়া এ জাতীয় খিয়ানত থেকে মুক্ত হওয়াকে আবশ্যক করে। সুতরাং যখন খিয়ানত পরিলক্ষিত হবে ক্রেতাকে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে, যেমন দোষ পাওয়া গেলে ইচ্ছাধিকার লাভ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى غُلَامًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে মুরাবাহা চুক্তি সংক্রান্ত আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থের একটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এক ব্যক্তি বাকিতে একটি গোলাম এক হাজার টাকায় ক্রয় করল। তারপর গোলামটিকে একশত টাকা লাভে নগদে বিক্রি করে দিল। সে এখানে মুরাবাহা হিসেবে প্রথম মূল্যের উপর একশত টাকা মুনাফা নিল। কিন্তু তার ক্রেতাকে একথা জানাল না যে, সে গোলামটি বাকিতে কিনেছিল।

উল্লেখ্য যে, বাকি ও নগদ ক্রয় সমমানের নয়, সাধারণভাবে মানুষ নগদ বিক্রয়ের চেয়ে বাকি বিক্রয়ে লাভ বেশি করে। কারণ, নগদ বিক্রয়ে বিক্রেতার পুঁজি সাথে উঠে আসে। পক্ষান্তরে বাকি বিক্রয়ে তার পুঁজি ক্রেতার হাতে অনেক দিন পড়ে থাকে। দেখা যায় যে, যদি কোনো বিক্রেতা বাকিতে একটি পণ্য এক হাজার টাকায় বিক্রি করে তাহলে নগদে সেই একই পণ্য আটশত টাকায় বিক্রি করে। নগদ ও বাকির এই পার্থক্যের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা "প্রথম মূল্য বাকি ছিল" একথা না জানার কারণে এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হলো, তাই ক্রেতা বিষয়টি জানার পর ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। সে মুরাবাহা বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করতে পারে অথবা এগার শত টাকায় বিক্রয় বহাল রাখতে পারে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) একই মত পোষণ করেন।

উপরে বর্ণিত প্রতারণার শিকার হওয়ার বিষয়টি ছাড়া লেখক আরেকটি দলিল পেশ করেন। সেই দলিলের সারকথা হলো, বিক্রয়ের মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বিক্রীত পণ্যের অনুরূপ একটি বিষয়। পণ্যের জন্য মানুষ যেমন মূল্য প্রদান করে, তেমনি

মেয়াদের কারণে মূল্য প্রদান করে অর্থাৎ মূল্য বাড়িয়ে দেয়। যেমন কোনো একটি পণ্য নগদ পাঁচশত টাকায় ক্রয় করা যায় সেই পণ্যটি বাকিতে কিনতে গেলে ছয়শত টাকা প্রদান করতে হয়। সুতরাং এতে দেখা যাচ্ছে মেয়াদের কারণে পণ্যটির মূল্য একশত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব মেয়াদের আলাদা একটি মূল্য থাকা প্রমাণিত হলো, যখন মেয়াদের স্বতন্ত্র মূল্য প্রমাণিত হলো তখন মেয়াদ পণ্যের অনুরূপ বিষয়ে পরিণত হলো। মুরাবাহা চুক্তিতে সন্দেহপূর্ণ বিষয়কে প্রকৃত বিষয়ের স্থানে রাখা হয়। এখানে মেয়াদ সন্দেহযুক্ত পণ্যে পরিণত হয়েছে, এজন্য এটাকে প্রকৃত পণ্য হিসেবে ধরা হবে। লেখক বলেন, যেন বিক্রয়টি এমন হলো যে, প্রথম ক্রেতা এক হাজার টাকার বিনিময়ে দু'টি জিনিস ক্রয় করল। একটি হলো ক্রীতদাস অন্যটি হলো মেয়াদ। তারপর দু'টির একটি অর্থাৎ শুধু ক্রীতদাস বিক্রি করে দিল দু'টির দামে [এক হাজার টাকায়], সেই সাথে একশত টাকা মুনাফাও গ্রহণ করল। যেহেতু প্রথম ক্রেতা দু'টি জিনিস কিনেছিল, আর বিক্রি করেছে দু'টির একটি, দু'টির দামে, তাই সে দ্বিতীয় ক্রেতার সাথে খিয়ানত করল। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা চুক্তির মাঝে খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ উভয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। এ মাসআলাতে মুরাবাহা চুক্তির দাবি হচ্ছে, এ জাতীয় খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা। কিন্তু প্রথম ক্রেতা যখন গোলামকে মুরাবাহারূপে বিক্রি করল, অথচ মেয়াদ সম্পর্কে কিছুই বলল না, তারপর ক্রেতা পরে যখন জানতে পারল যে, বিক্রেতা বাকিতে ক্রয় করেছে তখন সে তার এ বিক্রয় রাখা না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সে ইচ্ছা করলে এগার শত টাকার বিনিময়ে গোলাম কিনে নিতে পারে কিংবা বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে।

এটা خِيَارِ عَيْب-এর মতো। ক্রয়কৃত পণ্যে দোষ পরিলক্ষিত হলে যেমন ক্রেতা ইখতিয়ার লাভ করে তেমনি আলোচ্য মাসআলায় খিয়ানত প্রকাশ পেলে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে।

وَاِنِ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِاَلْفٍ وَمِائَةٍ لِاَنَّ الْاَجَلَ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ قَالَ : فَاِنْ كَانَ وَلَّاهُ اِيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَدَّهُ اِنْ شَاءَ، لِاَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوْلِيَةِ مِثْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ، لِاَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الثَّمَنِ الْاَوَّلِ، وَاِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِاَلْفٍ حَالَةٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَعَنْ اَبِي يُوْسُفَ (رح) اَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيْمَةَ، وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ، وَهُوَ نَظِيْرُ مَا اِذَا اسْتَوْفَى الزُّيُوْفَ مَكَانَ الْجِيَادِ، وَعَلِمَ بَعْدَ الْاِنْفَاقِ، وَسَيَأْتِيْكَ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَقِيْلَ يُقَوَّمُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَبِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْاَجَلُ مَشْرُوْطًا فِي الْعَقْدِ، وَلٰكِنَّهُ مُنَجَّمٌ مُعْتَادٌ قِيْلَ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِهِ، لِاَنَّ الْمَعْرُوْفَ كَالْمَشْرُوْطِ، وَقِيْلَ يَبِيْعُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ، لِاَنَّ الثَّمَنَ حَالٌّ .

অনুবাদ : যদি ক্রেতা পণ্যটি বিনষ্ট করে ফেলে, তারপর খিয়ানত সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তার এগারশত দিরহাম প্রদান করা আবশ্যক হবে। কেননা, মেয়াদের পরিবর্তে কোনো মূল্য আবশ্যক হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি সে দাসটিকে তাওলিয়ারূপে বিক্রি করে, অথচ মেয়াদের কথা বর্ণনা করেনি তাহলে ইচ্ছা করলে বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কেননা, তাওলিয়ার খিয়ানত মুরাবাহার খিয়ানতের মতো। কারণ, এতেও ভিত্তি রাখা হয়েছে প্রথম মূল্যের উপর। যদি ক্রয়কৃত পণ্য বিনষ্ট করে ফেলে, তারপর সে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে তাকে এক হাজার টাকা প্রদান করতে হবে। এর দলিল আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা বাজার মূল্য প্রদান করে তার প্রদত্ত পূর্ণ ধার্যমূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। এটা ঐ মাসআলার অনুরূপ যে, এক ব্যক্তি [ঋণ বাবদ] উত্তম মুদ্রার পরিবর্তে অচল মুদ্রা গ্রহণ করল এবং মুদ্রা খরচ করার পর বিষয়টি জানতে পারল। ইনশাআল্লাহ তোমার সামনে এ মাসআলাটি আসবে। কেউ কেউ বলেন, পণ্যটির নগদ ও বাকি উভয় মূল্য নির্ধারণ করবে। এরপর এ দু'মূল্যের মাঝে যত টাকার পার্থক্য সেটা ফেরত নিবে। আর যদি মেয়াদ শর্তকৃত না হয়, বরং প্রচলন মুতাবিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে কারও কারও মতে এটা বর্ণনা করা আবশ্যক। অন্যরা বলেন, বর্ণনা না করেই বিক্রি করে ফেলবে। কেননা মূল্য তো নগদে প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ الخ : ইবারতের প্রথম মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট। মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি এক হাজার টাকায় একটি ক্রীতদাস বাকিতে ক্রয় করে অন্য ব্যক্তির কাছে এগারশত টাকায় মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করল, অথচ বিক্রেতা ক্রেতাকে একথা জানাল না যে, সে বাকিতে এক হাজারের বিনিময়ে দাসটি ক্রয় করেছিল, ইতোমধ্যে দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামটি হালাক করে দিল। হালাক করা কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন সে বিক্রয় করে ফেলল,

অথবা আজাদ করে দিল কিংবা হত্যা করল ইত্যাদি। হালাক করার পর দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে পারল যে, প্রথম ক্রেতা দাসটি বাকিতে কিনেছিল। অথচ তার কাছে বিক্রয় করেছে নগদে এবং বাকি মূল্যের উপর লাভ নিয়ে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতাকে এগারো শত টাকায় গোলাম নিতে হবে। কেননা, প্রকৃত পক্ষে মেয়াদের বিপরীতে মূল্য আসে না। মেয়াদের বিপরীতে টাকা আবশ্যক হয় সন্দেহের ভিত্তিতে। এখানে খিয়ানতের একটি সন্দেহ অবশ্যই থেকে যাচ্ছে, আর এই সন্দেহের কারণে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সেই ইচ্ছাধিকার বলে ক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে। তবে বিক্রয় প্রত্যাহার করার জন্য শর্ত হচ্ছে বিক্রীত পণ্য অবশ্যই বর্তমান থাকতে হবে। যদি কোনো কারণে বিক্রীত পণ্য না থাকে তাহলে মুরাবাহা বিক্রি প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং তখন মেয়াদের কারণে মূল্যের কোনো অংশ বাতিল করতে পারবে না। বরং পূর্ণমূল্য প্রদান করতে হবে। মোটকথা, পণ্য বিনষ্ট/হাতছাড়া হয়ে গেলে ধার্যকৃত মূল্যের উপর ক্রেতাকে পণ্য নিতে হবে।

এতো গেল মুরাবাহা চুক্তির মাঝে যদি কোনো খিয়ানত পাওয়া যায় সে সংক্রান্ত আলোচনা। আর যদি তাওলিয়া চুক্তির মাঝে খিয়ানত পাওয়া যায় তাহলে কি হুকুম ? এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বাকিতে গোলাম কিনে সেই মূল্যে নগদে বিক্রি করে আর ক্রেতাকে এ সম্পর্কে কিছুই না জানায়, তারপর ক্রেতা জানতে পারে যে, বিক্রেতা পণ্যটি বাকিতে কিনেছিল, তাহলে [দ্বিতীয়] ক্রেতা এই অধিকার লাভ করবে যে, ইচ্ছা করলে সে তাওলিয়া বিক্রয়টি প্রত্যাহার করতে পারে এবং তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নিতে পারে। ক্রেতার এই অধিকার লাভ করার কারণ হচ্ছে মুরাবাহা চুক্তির মতো তাওলিয়া চুক্তিতেও খিয়ানত ও খিয়ানতের সন্দেহ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা, তাওলিয়া চুক্তির মূল/ ভিত্তি হচ্ছে প্রথম মূল্য। এর কমও নয় আবার বেশিও নয়। এখানে মূল্য হচ্ছে এক হাজার, তার চেয়ে কম/বেশি নয়। তাই এক হাজার থেকে কমানো সম্ভব নয়। তবে প্রথম ক্রেতা যেহেতু পণ্য/গোলাম বাকিতে কিনেছিল তাই সে নগদের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করেছিল। আর এটা দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে পারেনি। যদি জানত হয়তো বা পণ্য/ গোলামটি প্রথম মূল্যের উপর খরিদ করত না, তাই যখন সে জানতে পারল প্রথম ক্রেতা বাকিতে খরিদ করেছে তখন তার পণ্য রাখা/ না রাখার ব্যাপারে ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। এ সবই পণ্য হালাক হওয়ার পূর্বের কথা।

পক্ষান্তরে যদি পণ্য / গোলাম দ্বিতীয় ক্রেতার হাতছাড়া হয়ে যায়, তারপর সে জানতে পারে যে, প্রথম ক্রেতা পণ্যটি বাকিতে খরিদ করেছিল, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উল্লিখিত মূল্যেই পণ্য/দাসটি ক্রয় করা আবশ্যক হবে। বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার লাভ হবে না। কারণ, বিক্রয় প্রত্যাহার [বিক্রীত পণ্য/ দাস হাতছাড়া হওয়ার কারণে] অসম্ভব। তাছাড়া [দ্বিতীয় দলিল এই যে,] ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, মেয়াদের বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে কোনো মূল্য আবশ্যক হয় না। তাই পুরো মূল্য প্রদান করতে হবে। মূল্য থেকে কোনো অংশ কমানো হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি অভিমত বর্ণিত আছে যে, বিক্রীত-পণ্য হালাক হওয়ার পর ক্রেতা যদি খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে সে বিক্রীত পণ্যের বাজারমূল্য ফেরত দিবে এবং এর ধার্যকৃত মূল্য (ثَمَنْ) বিক্রেতা থেকে ফেরত নিবে। আর এ বিধান তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সে এটা করতে পারে। কারণ সাধারণত ক্রয়মূল্য বাজার মূল্য থেকে বেশি হয়ে থাকে। ক্রয়মূল্য ফেরত নেওয়ার দ্বারা তার সামান্য মুনাফা হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন বাজার মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে বেশি অথবা ক্রয়মূল্যও বাজারমূল্য সমান সমান। এ অবস্থায় বাজার মূল্য প্রদান করার অর্থ হচ্ছে এই যে, পণ্যটিকেই ফেরত দেওয়া। কারণ, যে কোনো বস্তুর বাজারমূল্য-যেন সেই বস্তু। অথবা বলা যায় যে কোনো বস্তুর বাজারমূল্য প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু বস্তু হালাক হয়ে গেছে তাই বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর বাজারমূল্য ফেরত দিবে এবং প্রদানকৃত ক্রয় মূল্য ফেরত নিবে।

এ মাসআলার নজির এই যে, এক ব্যক্তি [খালেদ] রাশেদের কাছে দশ দিরহাম ঋণ হিসেবে পায়। ঋণদাতা সচল দিরহাম প্রদান করেছিল। পরে ঋণদাতা রাশেদের কাছ থেকে সচল দিরহামের পরিবর্তে খাদযুক্ত দিরহাম আদায় করে নিল এবং তা খরচ করে ফেলল। অতঃপর সে জানতে পারল যে, সে খাদযুক্ত দিরহাম আদায় করেছিল। এমতাবস্থায় ঋণদাতা খাদযুক্ত দিরহাম প্রদান করবে এবং তার প্রদত্ত উত্তম দিরহাম ফিরিয়ে নিবে। লেখক বলেন, এ মাসআলা সামনে [কিতাবুস সারফ-এর পূর্বে مَسَائِل مَنْثُورَة -এর মধ্যে] আসবে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ يَقُوْمُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَبِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ الخ : লেখক কতিপয় আলেমের অভিমত উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে এ ইবারতটুকু এনেছেন. قِيْلَ -এর প্রবক্তা হচ্ছেন ফকীহ আবূ জা'ফর আল হিনদাওয়ানী। তিনি বলেন, এ মাসআলায় নগদ মূল্যও বাকি মূল্যের মাঝে তুলনা করে দেখবে কত দিরহাম/টাকার পার্থক্য। এ দু'য়ের মাঝে যে পরিমাণ টাকার পার্থক্য সেটুকু দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে ফেরত নিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম ক্রেতা দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাকিতে একটি দাস ক্রয় করল। অথচ দাসটির নগদ মূল্য বাজারে আছে আট হাজার টাকা। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে দশ হাজার টাকার উপর তাওলিয়া করে দাসটি কিনে নেওয়ার পরে জানতে পারল যে, প্রথম ক্রেতা বাকিতে [দশ হাজার টাকায়] ক্রীতদাসটি কিনেছিল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা থেকে দু'হাজার টাকা ফেরত নিবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ফকীহ আবূ জা'ফর (র.)-এর এ মতটি তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতা থেকে মেয়াদের শর্তে গোলামটি কিনে থাকে।

পক্ষান্তরে যদি সমাজের প্রচলন এমন থাকে যে, দশ হাজার টাকায় মেয়াদের কোনো শর্ত ছাড়াই গোলাম ক্রয় করা সত্ত্বেও লোকেরা [এ জাতীয় ক্রয়ে] মূল্য কিস্তিতে আদায় করে তাহলে ক্রেতা যখন এ গোলামটিকে মুরাবাহা কিংবা তাওলিয়ারূপে নগদে বিক্রি করতে ইচ্ছা করবে তখন তার ক্রেতাকে তার কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার ঘটনা বলে নিবে। আর বলে নেওয়া তার উপর ওয়াজিব। কারণ, শরিয়তের একটি নিয়ম এই যে, اَلْمَعْرُوْفُ كَالْمَشْرُوْطِ অর্থাৎ যে বিষয় সমাজে প্রচলিত তা শর্ত করার মতোই। সুতরাং যেন কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্ত করা হয়েছে। আর নিয়মানুযায়ী শর্তকৃত বিষয় বর্ণনা করা আবশ্যক। তবে কতিপয় লোক বলেছেন, এভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক নয়। কারণ চুক্তির মধ্যে যেহেতু মেয়াদের উল্লেখ নেই তাই প্রথম চুক্তির মূল্যও নগদে পরিশোধ করা হবে এটাই স্বাভাবিক। যখন প্রথম চুক্তি নগদে সম্পন্ন হয়েছে তখন নগদে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই।

বাকি রইল কিস্তিতে পরিশোধ সেতো পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রচলন অনুসারে হয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রির ক্ষেত্রেও প্রচলন হিসেবে এর প্রয়োগ সম্ভব।

قَالَ : وَمَنْ وَلّٰى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِىْ بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، فَاِنْ اَعْلَمَهُ الْبَائِعُ فِى الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِاَنَّ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّرْ، فَاِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِى الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، وَصَارَ كَتَاخِيْرِ الْقَبُوْلِ اِلٰى اٰخِرِ الْمَجْلِسِ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يُقْبَلُ الْاِصْلَاحُ وَنَظِيْرُهُ بَيْعُ الشَّىْءِ بِرَقْمِهِ اِذَا اَعْلَمَ فِى الْمَجْلِسِ يَتَخَيَّرُ لِاَنَّ الرِّضَاءَ لَمْ يَتِمَّ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَيَتَخَيَّرُ كَمَا فِىْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ কোনো দ্রব্য কারো কাছে "তার যা পড়তায় পড়েছে" এর বিনিময়ে তাওলিয়ারূপে বিক্রয় করে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার কত পড়তায় পড়েছে তা না জানে, তাহলে মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হবে। যদি বিক্রেতা [চুক্তি অনুষ্ঠানের] মজলিসে তা জানিয়ে দেয় তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যদি সে চায় তাহলে তা রাখবে নতুবা সে বিক্রয় বাদ দিবে। কেননা, ফাসাদ তখনও স্থিত হয়নি। সুতরাং যখন মজলিসে এ ব্যাপারে জানা গেল তখন সেটা চুক্তি শুরুতে জানার মতোই হলো এবং মজলিসের শেষাংশে সম্মতি প্রদানের মতোই হলো। পক্ষান্তরে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ফাসাদ স্থিত হয়ে গেছে। সুতরাং [তখন] সংশোধনের সুযোগ নেই। এর দৃষ্টান্ত হলো, গায়ের দামে পণ্য বিক্রি [বৈধ], যদি মজলিসে গায়ের দাম জানা সম্ভব হয়, আর ক্রেতার ইচ্ছাধিকার এ কারণে লাভ হবে যে, মূল্য জানার পূর্বে তার সম্মতি পরিপূর্ণ ছিল না। সুতরাং [না দেখা বস্তু] দেখার পর ইচ্ছাধিকার লাভ করার ন্যায় এখানেও ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ وَلّٰى رَجُلًا شَيْئًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতের মাসআলাটির মূল ইবারত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আল জামিউস সাগীর থেকে চয়ন করা হয়েছে। মাসআলাটির স্বরূপ এই যে, কোনো ব্যক্তি একটি দ্রব্য ক্রয় করে সেটাকে অন্য এক ব্যক্তির কাছে এই বলে তাওলিয়ারূপে বিক্রি করল যে, এই দ্রব্যটি আমার যা পড়তায় পড়েছে সেই মূল্যে আমি বিক্রি করলাম। অথচ বিক্রেতার কত পড়তায় পড়েছে তা ক্রেতার জানা নেই তাহলে ক্রেতার কাছে মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, সর্বসম্মত নিয়মানুযায়ী মূল্য অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়। সেই নিয়মানুযায়ী আলোচ্য বিক্রয়টিও ফাসিদ হয়ে যাবে।

তবে আলোচ্য মাসআলাটিও সহীহ হয়ে যেতে পারে, যদি বিক্রেতা তার কত পড়তায় পড়েছে একথাটি মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বেই ক্রেতাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রথমে মূল্য অজ্ঞাত থাকার পর মজলিস শুরু হওয়ার পূর্বে ক্রেতা মূল্যের পরিমাণ জানতে পারলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। সে ইচ্ছা করলে উক্ত পণ্য নিতে পারে আবার নাও নিতে পারে। এ অবস্থায় বিক্রি বৈধ হওয়ার দলিল এই যে, বিক্রয়ের মজলিস পরিবর্তন না হওয়ার কারণে ফাসাদ এখন সুদৃঢ় হয়নি। মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানা আর মজলিসের প্রথমভাগে জানা একই কথা। কারণ মজলিসের পুরো সময় একটি সময় হিসেবে ধর্তব্য বা বলা যায় মজলিসের পুরো সময় একত্রে একটি ইউনিট। এর শুরু, মধ্য এবং শেষভাগ সব একই হুকুম

রাখে। সুতরাং মজলিস এর প্রথমভাগে মূল্যের পরিমাণ জানলে যেমন বিক্রয় বৈধ হয় তেমনি বিক্রয়ের মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানলেও বিক্রয় বৈধ হয়ে যাবে। মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ প্রকাশ করার উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি বিক্রয় চুক্তির উদ্দেশ্যে بِعْتُ বলল, প্রতি উত্তরে ক্রেতা মজলিসের শেষভাগে বলল اِشْتَرَيْتُ তাহলে এর মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ মাসআলা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত বিক্রয় কবুল করার সুযোগ আছে। যেহেতু মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত কবুল করার সুযোগ আছে তেমনি মূল্যের পরিমাণ জানার সুযোগ মজলিসের শেষাংশ পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। হাঁ, তবে মজলিস শেষ হওয়ার পর মূল্য সম্পর্কে অবগত হলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। কেননা, মজলিস শেষ হওয়ার দ্বারা ফাসাদ সুদৃঢ় হয়ে গেছে। যে ফাসাদ সুদৃঢ় হয়ে যায় তাকে কোনোভাবে সংশোধন করা যায় না। অতএব বিক্রয়ের মজলিস পরিবর্তন হওয়ার পর মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হলে বিক্রয় বৈধ হবে না।

লেখক এ মাসআলার স্বপক্ষে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর তা এই যে, এক ব্যক্তি গায়ের দামে একটি কাপড় বিক্রি করল। অর্থাৎ বিক্রেতা বলল, কাপড়ের গায়ে যে দাম লেখা আছে সেই মূল্যে আমি কাপড়টি বিক্রি করলাম। তাহলে ক্রেতার কাছে কাপড়ের দাম অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয়টি ফাসিদ হবে। কারণ মূল্য অজ্ঞাত থাকলে বিক্রয় ফাসিদ হয়। তবে যদি বিক্রেতা মজলিসের মধ্যে ক্রেতাকে কাপড়ের গায়ের দাম জানিয়ে দেয় তাহলে বিক্রয় সম্পন্ন ও বৈধ হয়ে যাবে। তবে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করবে। কেননা মূল্য জানার পূর্বে তার সন্তুষ্টি অপরিপূর্ণ ছিল। ক্রেতার অসন্তুষ্টি অবস্থায় বিক্রয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ক্রেতা পণ্য নেওয়ার/ না নেওয়ার ইচ্ছাধিকার থাকে। এ কারণে ক্রেতা এ বিক্রয় মূল্য জানার পর ইখতিয়ার লাভ করবে। লেখক বলেন, এই ইখতিয়ার অনেকটা خِيَار رُؤْيَة -এর মতো, خِيَار رُؤْيَة -এর মধ্যে ক্রেতার অদেখা বস্তু কেনার পর যেমন দেখার পর ইখতিয়ার লাভ হয় তেমনি আলোচ্য মাসআলা তথা بَيْعٌ بِالرَّقْمِ-এর মধ্যেও ইখতিয়ার অর্জিত হবে।

এখানে একটি আপত্তি হতে পারে যে, আলোচ্য মাসআলাতে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার না পাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কারণ ইতিপূর্বে দলিল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মজলিসের শেষভাগে যা হয় তা প্রথমে হওয়ার মতোই। যদি তাই হয় তাহলে মজলিসের প্রথমে মূল্য জানলে তো কোনো ইখতিয়ার লাভ হয় না তাহলে শেষে জানলে ইখতিয়ার কেন হবে? এর উত্তর এই যে, মজলিসের শেষভাগে মূল্যের পরিমাণ জানার পর কোনো সম্মতি পাওয়া যায়নি যেমন মজলিসের শুরুতে সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। তাই ইখতিয়ার প্রদানের মাধ্যমে তার সম্মতি জানার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

فَصْلٌ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ، لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَالَمْ يُقْبَضْ، وَلِاَنَّ فِيْهِ غَرَرَ اِنْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْهَلَاكِ.

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ. যদি কোনো ব্যক্তি অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে সেটাকে কজা [আয়ত্ত] করার পূর্বে বিক্রি করা তার জন্য বৈধ নয়। কেননা, রাসূল ﷺ কজার বাইরের বস্তু বিক্রিকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণেও [বৈধ নয় যে] এতে বস্তু হালাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় চুক্তিটি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا الخ : প্রথমত অবগত হওয়া আবশ্যক যে, এ অনুচ্ছেদের মাসআলাগুলো মুরাবাহা ও তাওলিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে মুরাবাহা ও তাওলিয়ার আলোচনায় এ বিষয়গুলো আনার যুক্তি কোথায় ? এর উত্তরে ভাষ্যগ্রন্থ "ইনায়া" তে বলা হয়েছে যে, মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মধ্যে যেমন সাধারণ বিক্রির চেয়ে অতিরিক্ত শর্ত বিদ্যমান থাকে, তেমনি এ মাসআলাগুলোতেও অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে।

বর্ণিত মাসআলাটি এই যে, যদি কেউ অস্থাবর ও স্থানান্তরযোগ্য কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে তা কজা করার পূর্বে অন্যত্র বিক্রি করা বৈধ নয়। লেখক বিক্রি করার উল্লেখ করেছেন যাতে মাসআলাটি হানাফী মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হয়। কারণ বিক্রয় ছাড়া অন্যান্য লেনদেন যেমন হেবা সদকা ইত্যাদির ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। এখন মাসআলাটির শিরোনাম এই যে, কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, অবশ্য ইমাম মালিক (র.)-এর এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, খাদ্য জাতীয় দ্রব্য ব্যতীত আর সবই কজা করার পূর্বে বিক্রি করা যায়। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এবং ইবনে ওমর (র.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنِ اشْتَرٰى اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ.

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস–

رَوٰى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَفِيْ لَفْظٍ حَتّٰى يَقْبِضَهُ.

হাদীস দু'টির বক্তব্য সুস্পষ্ট। আর তা হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য কজা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। হাদীসের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যকে খাস করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

আমাদের দলিল এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের শেষাংশে তার ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। তিনি বলেন - وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ অর্থাৎ– আমি [ইবনে আব্বাস] মনে করি অন্যান্য সব বস্তু খাদ্যদ্রব্যের মতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই বক্তব্য সীহাহ সিত্তার ছয়টি কিতাবেই সহীহ সনদে বিদ্যমান। নিয়মানুযায়ী কোনো হাদীসের রাবীর মাযহাব যদি হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে সেই হাদীস দলিলযোগ্য থাকে না। অতএব হাদীসের طَعَامٌ [খাদ্যদ্রব্য] সম্পর্কে বলা হবে যে, শব্দটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, তাখসীসের উদ্দেশ্যে শব্দটি আনা হয়নি।

এছাড়া হযরত হাকীম ইবনে হিযাম ও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর একটি হাদীস আমাদের দলিল। প্রথম হাদীস–

اَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ الْكُبْرٰى عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ اَبْتَاعُ هٰذِهِ الْبُيُوْعَ وَاَبِيْعُهَا فَمَا يَحِلُّ لِيْ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ قَالَ لَا تَبِيْعَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَقْبِضَهُ.

অর্থ– হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) বলেন, আমি [রাসূল কে] বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি বিভিন্ন কেনা-বেচা করি, এগুলোর কোনটি আমার জন্য বৈধ, আর কোনোটি অবৈধ। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কোনো কিছু কব্জা না করে বিক্রি করো না।

এ হাদীসে সব জিনিসকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

অপর হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِبْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوْقِ فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ فَاَعْطَانِيْ فِيْهِ رِبْحًا حَسَنًا فَاَرَدْتُ اَنْ اَضْرِبَ عَلٰى يَدِهٖ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ بِذِرَاعِيْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتّٰى تَحُوْزَهُ اِلٰى رَحْلِكَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ اِلٰى رِحَالِهِمْ.

অর্থ– হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি একদা বাজারে কিছু তেল কিনলাম। যখন আমি বিক্রয় সম্পন্ন করলাম আমার সাথে এক লোক সাক্ষাত করে ভাল মুনাফা দিয়ে আমার তেল নিতে চাইল। তার কথায় যখন আমি রাজি হলাম এবং তেল তাকে প্রদান করার ইচ্ছা করলাম। ঠিক তখন পিছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহুকে ধরে ফেলল। আমি তাকিয়ে দেখি, লোকটি যায়েদ ইবনে সাবিত। তিনি বললেন, যেখানে ক্রয় করেছে সেখানেই বিক্রি কর না, তোমার ঘরে নেওয়ার পূর্বে। কেননা, রাসূল ﷺ ক্রয়ের স্থানে পণ্য বিক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করেছেন যে পর্যন্ত না পণ্যকে ব্যবসায়ীরা তাদের সংরক্ষণের স্থানে না পৌছায়।

এ হাদীসটি দ্বারা দু'টি নিয়ম প্রমাণিত হয়–

১. যে কোনো দ্রব্য ক্রয়ের পর কব্জা না করে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২. দ্রব্যটি স্থানান্তরযোগ্য হলে সংরক্ষিত স্থানে এটাকে সংরক্ষণ ও কব্জা করে রাখতে হবে।

মোটকথা, উভয় হাদীস দ্বারা কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। যৌক্তিক দলিল এই যে, ক্রয়কৃত পণ্য কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা হলে চুক্তি বাতিল হওয়ার ধোকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এর ব্যাখ্যা এই যে, রাশেদ একটি গোলাম ক্রয় করল, তারপর গোলাম কব্জা করার পূর্বে সেটা খালেদের কাছে বিক্রি করে দিল। পরে দেখা গেল যে, গোলামটি প্রথম বিক্রেতা থেকে কব্জা করার পূর্বে প্রথম বিক্রেতার হাতেই হালাক হয়ে গেছে। ফলে [খালেদ ও রাশেদের মাঝে সংঘটিত] দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, প্রথম বিক্রেতা ও রাশেদের মাঝে সংঘটিত বিক্রয় পণ্য হালাক হয়ে যাওয়ার কারণে প্রথম বিক্রি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রয়টি প্রতারণা বলে সাব্যস্ত হলো। যেহেতু দ্বিতীয় বিক্রয়ের মাঝে প্রতারণার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে কব্জা না করার কারণে, তাই কব্জা করার পূর্বে কোনো কিছু বিক্রয় করা বৈধ হবে না। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রতারণামূলক যে কোনো লেন-দেন নিষিদ্ধ।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَاَبِي يُوْسُفَ (رحـ)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) لَا يَجُوزُ رُجُوْعًا اِلَى اِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ وَاِعْتِبَارًا بِالْمَنْقُوْلِ، وَصَارَ كَالْاِجَارَةِ، وَلَهُمَا اَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَلَا غَرَرَ فِيْهِ، لِاَنَّ الْهَلَاكَ فِي الْعِقَارِ نَادِرٌ، بِخِلَافِ الْمَنْقُوْلِ، وَالْغَرَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَرَرُ اِنْفِسَاخِ الْعَقْدِ، وَالْحَدِيْثُ مَعْلُوْلٌ بِهِ عَمَلًا بِدَلَائِلِ الْجَوَازِ، وَالْاِجَارَةُ قِيْلَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ فِي الْاِجَارَةِ الْمَنَافِعُ، وَهَلَاكُهَا غَيْرُ نَادِرٍ -

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কব্জা করার পূর্বে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা বৈধ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হাদীসটিকে নিঃশর্ত ধরে এবং অস্থাবর সম্পদের উপর কিয়াস করে বলেন, বৈধ হবে না। আর এটা ইজারাচুক্তির মতো হলো। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, বিক্রয়চুক্তির রুক্ন যোগ্য ব্যক্তির থেকে প্রকাশ পেয়েছে, আর তা যথাপাত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর এতে [চুক্তি বাতিল হওয়ার] কোনো ঝুঁকি নেই। কেননা, স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা বিরল। অস্থাবর সম্পত্তি এমন নয়। আর [হাদীসে] যে ঝুঁকি নিষিদ্ধ হয়েছে তা হলো চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি। [চুক্তির বৈধতার] দলিলসমূহের উপর আমল করার ভিত্তিতে হাদীসটি চুক্তি বাতিল হওয়ার ঝুঁকি থাকার কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ইজারা কারও কারও মতে এরূপই বিরোধপূর্ণ। আর যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, ইজারা ঐকমত্যের মাসআলা, তবে [এর জবাব হলো,] ইজারায় চুক্তিকৃত বিষয় হলো সুবিধাভোগ। আর তা বিনষ্ট হওয়া বিরল নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে স্থাবর সম্পদ কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধসহ আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো, স্থাবর ও অস্থানান্তরযোগ্য সম্পত্তি কব্জা না করেই বিক্রি করা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মত হলো, স্থাবর সম্পত্তিও অন্যান্য সম্পদের মতো কব্জা না করে বিক্রি করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল–

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, হাদীসের শব্দ মুতলাক এবং শর্তহীন। যেমন– হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে– لَا تَبِيْعَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَقْبِضَهُ এখানে شَيْئًا [যে কোনো জিনিস] কথাটি মুতলাক। এর মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সবই শামিল। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তিকে হাদীসের মুতলাক বক্তব্য থেকে পৃথক করা অনুচিত।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) অস্থাবর সম্পদের উপর স্থাবর সম্পত্তিকে কিয়াস করেন। অস্থাবর সম্পদ যেমন কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, তেমনি স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়। কারণ, বিক্রি অবৈধ হওয়ার ইল্লত উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। লেখক বলেন, স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি ইজারা প্রদানের মতো হয়ে গেছে। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে যেমন ইজারা দেওয়া যায় না, তেমনি তা কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা যায় না। তাছাড়া মালিকানা লাভের সবব এখানে বিক্রয়। বিক্রয় পরিপূর্ণ হয় কব্জা দ্বারা। অতএব মালিকানা পরিপূর্ণ হবে কব্জা দ্বারা। মালিকানার পূর্ণতা বিক্রয়ের জন্য আবশ্যক। অতএব বিক্রয়ের পূর্বে কব্জা করা জরুরি।

শায়খাইনের দলিল–

১. শায়খাইনের প্রথম দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস– نَهٰى عَنْ بَيْعِ السِّلَعِ حَتّٰى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلٰى رِحَالِهِمْ -এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, স্থানান্তরযোগ্য মালামাল কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ– যে কোনো সম্পদ কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ নয়।

২. أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهٖ فِيْ مَحَلِّهٖ - লেখক বলেন, শায়খাইন (র.)-এর আকলী বা যৌক্তিক দলিল হলো, বিক্রয়ের রুকন তথা ইজাব কবুল প্রকাশ পেয়েছে বিক্রয় করার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে এবং তা প্রয়োগ হয়েছে যথাস্থানে। অর্থাৎ যেহেতু ইজাবকারী ও কবুলকারী যোগ্য ব্যক্তি এবং পণ্য বিক্রয়েরও উপযুক্ত, সুতরাং বিক্রয় সংঘটনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। বাকি রইল পণ্য বিনষ্ট হওয়ার কারণে দ্বিতীয় ক্রেতার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা– এতো দূর হলো না। এ ব্যাপারে শায়খাইন (র.)-এর জবাব হলো, এ সম্ভাবনা স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে খুবই কম। কারণ, স্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিরল হওয়ার কারণে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও বিরল। আর দলিলের ক্ষেত্রে বিরল বিষয়কে বিবেচনায় রাখা হয় না। অতএব স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার বিষয় প্রায় না থাকার কারণে স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করাতে কোনো সমস্যা নেই।

কতিপয় মাশায়েখ বলেন, যেসব স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে বিনষ্ট হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে যেমন নদী কিংবা সাগরের কাছের জমি– সেগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত মত নয়। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অস্থাবর সম্পদের মতোই। ইমাম মাহবুবী (র.) এ মতই বর্ণনা করেছেন এবং 'ইখতিয়ার' গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।–[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ وَالْغَرَرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَرَرُ انْفِسَاخٍ الخ : লেখক এ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি আরোপিত হয়েছিল শায়খাইনের মাযহাবের উপর। প্রশ্নটি হলো, কব্জার পূর্বে অস্থানান্তরযোগ্য ও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করলে তাতেও প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা এভাবে যে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকার দাবি করে যদি সম্পত্তি নিয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতার ক্রয়কৃত জমিন তার অধীন থাকবে না। আর তখন [দ্বিতীয়] ক্রেতা প্রতারিত হবে। এর উত্তর হলো, হাদীসের মধ্যে যে প্রতারণার নিষেধ করা হয়েছে সেটা প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়া সংক্রান্ত আশঙ্কা। যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি, জমিজমা কব্জা করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই এগুলোর মধ্যে প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন কেউ কেউ করে থাকেন। প্রশ্নটি হলো, একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বস্তু জিম্মায় আসেনি তার দ্বারা মুনাফা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। জমিন বা স্থাবর সম্পত্তি কব্জা না করে যদি মুনাফায় বিক্রি করা হয়, তাহলে তো হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

দ্বিতীয়ত অপর একটি হাদীসে এসেছে যে, نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কব্জা না করে কোনো দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।' এ দুটি হাদীস দ্বারা কব্জার পূর্বে যে কোনো জিনিস বিক্রি করা এবং এর দ্বারা মুনাফা নেওয়ার নিষিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এমতাবস্থায় শায়খাইন (র.) কিভাবে হাদীসদ্বয়ের বিপক্ষে অবস্থান নিলেন? এর উত্তর হলো, কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থানান্তরযোগ্য উভয় প্রকার পণ্য কব্জার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে– أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও বৈধ করেছেন। হাদীস–

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشَوِّبُوْا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! শয়তানও পাপ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় আগমন করে, সুতরাং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে দান-সদকা কর, যাতে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায়।' এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি লোকজন বেচা-কেনা করে আসছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে সংঘটিত সে সব বেচা-কেনা করার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি; বরং বেচা-কেনাকে সমর্থন করেছেন। আর রাসূলের পর অদ্যাবধি এর প্রচলন রয়েছে। অতএব এর উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে। উপরিউক্ত তিন দলিলের আলোকে বলা যায় যে, স্থানান্তরযোগ্য কিংবা অস্থানান্তরযোগ্য উভয় প্রকারের পণ্য কব্জা করার পূর্বে ও পরে বিক্রি করা বৈধ।

কিন্তু আয়াতের অপরাংশ حَرَّمَ الرِّبَا -এর দ্বারা বিশেষ কয়েক প্রকার [যেমন– জিনস ও পরিমাণ এক হওয়ার পর কমবেশি বিক্রয় করা ইত্যাদি] নিষেধ করা হয়েছে। ফলে আয়াতের বিক্রয়ের হুকুম ও হাদীসসমূহ عَامٌ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ হয়ে গেছে।

উসূলুল ফিক্‌হের নিয়মানুযায়ী عَامٌ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ -কে خَبَرِ وَاحِدٌ দ্বারা খাস করা যায়। সে নিয়মানুসারে نَهْى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ও رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ -কে বৈধতার দলিলসমূহ থেকে খাস করা হয়েছে। ফলে এখন বিক্রয়ের বিধান হচ্ছে কব্জা করার পূর্বে কোনো দ্রব্য বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে শেষোক্ত হাদীসটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসটি সেসব বস্তু সম্পর্কে প্রযোজ্য, যেগুলো সহজে বিনষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে প্রথম চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এবং দ্বিতীয় ক্রেতা প্রতারিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রতারণা করা শরিয়তে নিষিদ্ধ। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস, نَهْى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ আর এ প্রতারণার সম্ভাবনা বেশি হচ্ছে স্থানান্তরযোগ্য ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। যেমনটা ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। আর এজন্যই স্থানান্তরযোগ্য মালামাল কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। যেহেতু স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে প্রতারিত হওয়ার এরূপ সম্ভাবনা নেই, তাই স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ قِيْلَ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ : লেখক এখান থেকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিয়াস করেছিলেন বিক্রয়কে ইজারার উপর। অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে যেমন ইজারা দেওয়া যায় না, তেমনি স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা যাবে না। তাঁর কিয়াসের জবাব দু-ভাবে প্রদান করা হয়েছে। প্রথমোক্ত বলা হয়েছে যে, 'ইজারা' কোনো সর্বসম্মত মাসআলা নয়, যার দ্বারা স্বীয় বক্তব্যের শক্তি যোগানো যাবে; বরং এতে বিক্রয়ের অনুরূপ মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি জায়গা/ বাড়ি খরিদ করে কব্জা করার পূর্বেই ভাড়া দিতে চায়, তাহলে সেখানেও শায়খাইনের মতে তা বৈধ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা অবৈধ।

কিন্তু উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, "ফাতওয়া জাহিরিয়্যাহ" গ্রন্থে সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, কব্জার পূর্বে ইজারা প্রদান করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ, এতে কারো দ্বিমত নেই। [ইজারার] সুবিধাভোগ স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্যের মতো। স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্য যেমনটা কব্জার পূর্বে বিক্রি করা বা ইজারা দেওয়া যায় না, সুবিধাভোগও ঠিকই তাই। আল-কাফী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এ মাসআলার উপরই ফতোয়া।

দ্বিতীয় জবাব লেখক এভাবে প্রদান করছেন যে, وَلَوْ سُلِّمَ অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ইজারার মাসআলাটি ঐকমত্যের [আসলেও তাই- ইতঃপূর্বে আমরা যা আলোচনা করলাম] তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব এই হবে যে, ইজারা হচ্ছে সুবিধাভোগের মালিক হওয়া। অর্থাৎ ইজারার মধ্যে চুক্তিকৃত বিষয়টি হচ্ছে 'সুবিধাভোগ'। আর সুবিধাভোগ বিনষ্ট বা হালাক হওয়া বিরল নয়; বরং এটা অস্থাবর সম্পত্তির মতো। অস্থাবর সম্পত্তি যেমন দ্রুত হালাক হয় তেমনি সুবিধাভোগ দ্রুত হালাক হয়। তাই এটার উপর স্থাবর সম্পত্তির কিয়াস করা সঠিক নয়। কারণ, স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিনাশ হয় না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى مَكِيْلًا مُكَايَلَةً اَوْ مَوْزُوْنًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ اَوِ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً اَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِىْ مِنْهُ اَنْ يَبِيْعَهُ وَلَا اَنْ يَاْكُلَهُ حَتّٰى يُعِيْدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ، لِاَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِىَ فِيْهِ صَاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِىْ، وَلِاَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَزِيْدَ عَلَى الْمَشْرُوْطِ، وَ ذٰلِكَ لِلْبَائِعِ وَالتَّصَرُّفُ فِىْ مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ، فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا اِذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً، لِاَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ পাত্রের সাহায্যে পরিমাপিত বস্তু পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে অথবা ওজনে [বাটখারা ইত্যাদি]-এর মাধ্যমে পরিমাপিত বস্তু ওজন করে ক্রয় করে, তারপর নিজে পুনরায় পাত্র অথবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য সে দ্রব্যকে পুনরায় পাত্রের মাধ্যমে কিংবা ওজনের মাধ্যমে পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করা অথবা তা খাওয়া বৈধ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য জাতীয় দ্রব্য বিক্রেতার পরিমাপ এবং ক্রেতার পরিমাপ–দু-বার পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাছাড়া যা শর্ত করা হয়েছে তার থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অতিরিক্ত অংশটুকু বিক্রেতার হক। আর অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম হওয়ার কারণে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে অনুমানের ভিত্তিতে যা বিক্রি করেছে তার হুকুম ভিন্ন। কেননা, এর অতিরিক্ত অংশ [যদি হয়ে থাকে] ক্রেতার হক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى مَكِيْلًا مُكَايَلَةً الخ : যেসব দ্রব্যাদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় সেগুলোকে كَيْلِىْ বলা হয়। আবার কিছু কিছু দ্রব্য বাটখারা ইত্যাদি দ্বারা ওজন দিয়ে বিক্রি করা হয় সেগুলোকে وَزْنِىْ বলা হয়। আর যেসব দ্রব্যাদি গণনা করে বিক্রি করা হয় সেগুলোকে বলা হয় عَدَدِىْ।

আলোচ্য মাসআলাটির স্বরূপ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু যেমন– গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে খরিদ করে। যেমন– ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমি এ গমগুলো একশত দিরহামের বিনিময়ে কিনতে প্রস্তুত আছি এই শর্তে যে, এগুলো আমি মেপে বুঝে নেব।

অথবা যদি কোনো ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু যথা– স্বর্ণ, রুপা ইত্যাদি ওজন করে নেওয়ার শর্তে ক্রয় করে। যেমন– ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, আমি দশ হাজার টাকার বিনিময়ে এই স্বর্ণ ক্রয় করছি এই শর্তে যে, আমি এটা ওজন করে বুঝে নেব। মোটকথা, ক্রেতা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য অনুমান করে ক্রয় না করে; বরং পাত্র দ্বারা মেপে কিংবা ওজন করার শর্তে এবং নিজে সেটা মেপে বুঝে নিল এবং পণ্য নিজে কব্জা করল অর্থাৎ নিজ আয়ত্তে নিয়ে নিল।

উল্লেখ্য যে, মাসআলাটিতে ক্রয় সূত্রে মালিক হয়েছে একথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আলোচ্য মাসআলার মধ্যে "ক্রয়" কথাটি শর্তরূপে আনা হয়েছে। কেননা, যদি কেউ ক্রয় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যেমন– দান, অসিয়ত ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মালিক হয়, তাহলে উক্ত মালিকের জন্য কব্জা করার পূর্বে এবং মাপা ও ওজন করার পূর্বে সেই দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। মোটকথা, উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মালে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না যে পর্যন্ত না সে পুনরায় সেই মাল পাত্র দ্বারা কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ করে নেয়। সুতরাং দ্বিতীয় ক্রেতা নিজে মেপে নেওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে বা খেতে পারবে না। সারকথা হচ্ছে, প্রথম ক্রেতা যেমন নিজে প্রথমে মেপে নিয়েছে তদ্রূপ দ্বিতীয় ক্রেতাকেও নিজ উদ্যোগে মেপে নিতে হবে। অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)। মাসআলাটির দলিল হলো হাদীসে রাসূল ﷺ।

হাদীসটি এই- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِيْ হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তবে হযরত জাবির (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসে صَاعَانِ -এর স্থলে الصَّاعَانِ রয়েছে। ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাছাড়া হাদীসটি হযরত আবূ যুবায়ের ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)ও রেওয়ায়েত করেন। মুহাদ্দিস বাযযার হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। সেই রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত অংশ এটুকু রয়েছে- فَيَكُوْنُ لِصَاحِبِهِ فِيْهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ হাদীসের অর্থ- রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তাতে দুটি পরিমাপ হয়। বিক্রেতার একটি পরিমাপ, আর ক্রেতার একটি পরিমাপ। হাদীসে উল্লিখিত بَائِعٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথম ক্রেতা, আর مُشْتَرِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ক্রেতা। صَاعُ الْبَائِعِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিক্রেতা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য যে পরিমাপ করে। আর صَاعُ الْمُشْتَرِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিক্রয়ের পূর্বে নিজের জন্য যে পরিমাপ করে। দ্বিতীয় ক্রেতা যখন নিজে পরিমাপ করে নেয়, তখন তার জন্য অন্যের কাছে বিক্রি করা বৈধ হয়ে যায় এবং তখন সে ইচ্ছা করলে খাদ্যদ্রব্য খেতেও পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে, একটি বিক্রয়ের জন্য দু-বার পরিমাপ করা দরকার। একবার বিক্রেতা মেপে দেবে, আরেকবার ক্রেতা মেপে নেবে। কেননা, এ ব্যাপারে সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, একটি বিক্রয়ে দু-বার পরিমাপ করা জরুরি নয়।

দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতার পরিমাপ করা হলো পরিপূর্ণভাবে কব্জা করা। আর পরিপূর্ণ কব্জা করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক। ক্রেতার পরিমাপ করার দ্বারা পরিপূর্ণ কব্জা এভাবে হয় যে, ক্রেতা যখন মেপে নেয় তখন তার হক বিক্রেতার হক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কেননা, হতে পারে দ্রব্য যে পরিমাণ শর্ত করা হয়েছিল তার চেয়ে কম হয়েছে, তাহলে তো তার হক বিক্রেতার কাছে রয়ে গেল। আর যদি বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতার হক তার কাছে চলে আসল। ক্রেতার হক বিক্রেতার কাছে থাকা কিংবা এর উল্টো হওয়া কোনোটাই উচিত নয়। আর তাই ক্রেতার পরিমাপ করা জরুরি, যাতে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা থেকে বাঁচা যায়। কারণ, অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

উপরিউক্ত দলিলের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা অর্থাৎ বিক্রেতার পরিমাপের উপর পূর্ণ ভরসা না করে মালে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে নিজে পুনরায় পরিমাপ করে নেবে। তবে যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু অথবা ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু অনুমান করে ক্রয় করে, তাহলে উক্ত বস্তুর মাঝে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো পরিমাপ করা আবশ্যক নয়; বরং সে পরিমাপ করা ছাড়াই যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে। কেননা, এখানে বিক্রীত-পণ্য হচ্ছে ইশারাকৃত খাদ্যদ্রব্য। এ কারণে ক্রেতার মালিকানার সাথে বিক্রেতার মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য যে, অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি সুরত হতে পারে-

১. কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র অনুমান করে এক স্তূপ গম ক্রয় করল, তারপর অনুমান করে সেটা বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতার পরিমাপ করা যেমন জরুরি নয়, তেমনি দ্বিতীয় ক্রেতার পরিমাপ করাও জরুরি নয়। কেননা, এ অবস্থায় গমের স্তূপে কি পরিমাণ গম আছে তা নির্ধারণ করা আবশ্যক নয়; বরং স্তূপের মধ্যে যতটুকু গম আছে সবটাই বিক্রীত-পণ্য।

২. কোনো ব্যক্তি ওজন করে কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে কিছু গম ক্রয় করল, তারপর সে গম বিক্রি করল। ক্রেতা উক্ত গম মেপে কব্জা করল। তারপর ক্রেতা অনুমান করে বিক্রি করল। যেমন- ক্রেতা বলল, এসব গম আমি একশত টাকায় বিক্রি করলাম। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা এ গমগুলো যা [উদাহরণস্বরূপ] দশ মন ভেবে বিক্রি করা হচ্ছে, সেগুলো যদি পরিমাণে দশ মনের বেশিও হয়, তবু দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা বৈধ হবে। কারণ, এখানে দশ মন হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে না; বরং এখানে স্তূপীকৃত গম বিক্রি করা হচ্ছে। চাই সেটা দশ মন অথবা তার চেয়ে বেশি-কম যাই হোক না কেন। মোটকথা, উল্লিখিত দু-অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা তার ক্রয়কৃত পণ্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনো পরিমাপ করার মুখাপেক্ষী নয়।

যেসব দ্রব্য গণনা করে বিক্রি করা হয়, এবং গণিত দ্রব্যগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোও পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের হুকুমে হবে। অর্থাৎ এসব দ্রব্য কেউ গণনা করে বিক্রি করলে দ্বিতীয় ক্রেতা উক্ত দ্রব্যগুলোতে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে অবশ্যই পুনরায় গণনা করে নেবে। কেননা, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মধ্যে যে কারণে ইল্লতের ভিত্তি হতে দ্বিতীয়বার গণনা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে সেই একই ইল্লত গণনানির্ভর বস্তুসমূহের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান। সেই ইল্লত হলো, সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং একজনের মালিকানার সাথে অন্যের মালিকানা মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা দূর করা। কেননা, গোনা দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অংশ বিক্রেতার মালিকানাধীন। তবে এ ব্যাপারে সাহেবাইন (র.) -এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের মতে পুনরায় গণনা করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ।

وَبِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الثَّوْبَ مُذَارَعَةً، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ، إِذِ الذَّرْعُ وَصْفٌ فِي الثَّوْبِ، بِخِلَافِ الْقَدْرِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكَيْلِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّهُ ﷺ لَيْسَ صَاعُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ، وَهُوَ الشَّرْطُ، وَلَا بِكَيْلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّ الْكَيْلَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيْمِ، لِأَنَّ بِهِ يَصِيْرُ الْمَبِيْعُ مَعْلُوْمًا، وَلَا تَسْلِيْمَ إِلَّا بِحَضْرَتِهِ، وَلَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِيْ فَقَدْ قِيْلَ لَا يُكْتَفٰى بِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ، فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ صَاعَيْنِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُكْتَفٰى بِهِ، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ صَارَ مَعْلُوْمًا بِكَيْلٍ وَاحِدٍ، وَتَحَقَّقَ مَعْنَى التَّسْلِيْمِ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيْثِ اجْتِمَاعُ الصَّفْقَتَيْنِ عَلٰى مَا نُبَيِّنُ فِيْ بَابِ السَّلَمِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَلَوِ اشْتَرَى الْمَعْدُوْدَ عَدًّا فَهُوَ كَالْمَذْرُوْعِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ الرِّبٰوا، وَكَالْمَوْزُوْنِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، لِأَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشْرُوْطِ .

অনুবাদ : এরূপভাবে যদি কাপড় গজ হিসেবে বিক্রি করে তার হুকুমও ব্যতিক্রম। কেননা, এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত অংশও তার [ক্রেতার] হক। কেননা, কাপড় পরিমাপের ক্ষেত্রে যিরা' [গজ] হচ্ছে একটি গুণবিশেষ। পাত্র ও ওজনের পরিমাপ এর ব্যতিক্রম [এগুলো সত্তাগত বিষয়]। বিক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতার পাত্র পরিমাপের কোনো গুরুত্ব নেই, যদিও সেটা ক্রেতার উপস্থিতিতে হয়ে থাকে। কেননা, সেটা প্রকৃত বিক্রেতা ও ক্রেতার পরিমাপ নয়। [তারা তখনো ক্রেতা-বিক্রেতা হয়নি] অথচ এটাই শর্ত। তদ্রূপ ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিক্রেতার বিক্রয় পরবর্তী পাত্র পরিমাপও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, পাত্র পরিমাপ করা পণ্য অর্পণ করার অংশবিশেষ। কেননা, এর দ্বারা পণ্যটি পরিজ্ঞাত হয়। আর ক্রেতার উপস্থিতি ছাড়া পণ্য অর্পণ সম্ভব নয়। যদি বিক্রেতা বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে পাত্র দ্বারা মেপে দেয়, তাহলে কারো কারো মতে হাদীসের জাহেরী অর্থানুযায়ী এটা যথেষ্ট হবে না। কেননা, হাদীসে দু-বার পরিমাপ করার কথা বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে এতটুকুতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, পণ্য একটি পরিমাপ দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়ে গেছে এবং অর্পণ করার অর্থও পাওয়া গেছে। আর বর্ণিত হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে দুই চুক্তির একত্রিকরণ, যা আমরা 'বায় সলম'-এর অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব। আর যদি গণনা করে বিক্রি করা হয় এমন দ্রব্যাদি গণে ক্রয় করে, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা গজ দ্বারা পরিমাপ করা বস্তুর মতো। কেননা, এসব বস্তু সুদের তালিকাভুক্ত মাল নয়। অথবা এটা ওজনকৃত বস্তুর মতো ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মতানুসারে। কেননা, শর্তকৃত বস্তুর চেয়ে অতিরিক্ত জিনিস তার জন্য বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ الثَّوْبَ الخ : লেখক বলেন, কাপড় যদি গজ হিসেবে ক্রয় করে, তাহলে তার জন্য হস্তক্ষেপ করার পূর্বে পুনরায় গজ দিয়ে পরিমাপ করা আবশ্যক নয়। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো, হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে ذِرَاعٌ [গজ বা কাপড়ের পরিমাপ] হলো وَصْف বা কাপড়ে জন্য গুণবিশেষ। এর বিপরীতে মূল্য আসে না। এজন্য যদি পরবর্তী মাপে গজ বেশিও হয়, তাহলে তা বিক্রেতার হবে না; বরং ক্রেতার হবে। আর তা ক্রেতার জন্য অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হয় না। অথচ এ কারণে দ্বিতীয় পরিমাপ আবশ্যক ছিল।

পক্ষান্তরে যদি পরবর্তী মাপে গজ কম হয়, তাহলে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার লাভ হবে। যখন দ্বিতীয় ক্রেতা না মেপেই বিক্রি করে দিল, তখন সে তার ইচ্ছাধিকারকে নিজ হাতে বাতিল করল। আর ক্রেতার তা করার অধিকার অবশ্যই আছে। মোটকথা, কাপড় পরিমাপক-গজ ইত্যাদি হচ্ছে وَصْف, যা মূল্যের অনুবর্তী বিষয়। তাই এর কমবেশি ক্রেতার হক। পক্ষান্তরে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যাদির মধ্যে كَيْل ও وَزْن হচ্ছে আসল, যার বিপরীতে মূল্য আবশ্যক হয়। এজন্য كَيْلِيْ ও وَزْنِيْ পণ্যের মধ্যে যদি শর্তকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা ক্রেতার প্রাপ্য হবে না; বরং অতিরিক্ত অংশ বিক্রেতার অধিকারভুক্ত বলে সাব্যস্ত হবে। এজন্য এ অবস্থায় যদি ক্রেতাকে তার ক্রয়কৃত মালের মধ্যে পরিমাপ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। অথচ অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এজন্য كَيْلِيْ ও وَزْنِيْ পণ্যের মধ্যে প্রথমে পরিমাপ করা আবশ্যক।

তবে উল্লিখিত কাপড়ের মাসআলার ব্যতিক্রম তখন হবে, যখন কেউ কাপড়ের থান এ শর্তে বিক্রি করে যে, প্রতি গজ [উদাহরণস্বরূপ] দশ টাকা, অর্থাৎ প্রত্যেক গজের পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এবং বলে– এখানে দশ গজ রয়েছে, যার মূল্য হচ্ছে একশত টাকা। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য উক্ত কাপড় পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ, প্রত্যেক গজের স্বতন্ত্রভাবে মূল্য উল্লেখ করার কারণে গজ আসলে পরিণত হয়েছে, অনুবর্তী রয়ে যায়নি। এতদসংক্রান্ত আলোচনা كِتَابُ الْبُيُوْعِ -এর প্রথম দিকে করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবে আসে যে, যদি কেউ পাত্র দ্বারা পরিমাপ কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপ হিসেবে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, তারপর সেটাকে পুনরায় না মেপে বিক্রি করে দেয় কিংবা খেয়ে ফেলে, তাহলে কি হুকুম ? এর উত্তরে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহের রেওয়ায়েত অনুসারে সেটা জায়েজ হবে না। কেননা, দ্বিতীয় বিক্রেতার মালিকানার সাথে প্রথম বিক্রতার মালিকানা মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বিক্রয়টি ফাসিদ বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দ্বিতীয় বিক্রয়কে ফাসিদ বলা হয়েছে।

আল-জামিউস সাগীর গ্রন্থে এটাও বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কোনো 'পাত্র দ্বারা পরিমাপিত' মাল পাত্র দ্বারা পরিমাপ না করে কব্জা করল, তারপর সেটাকে খেয়ে ফেলল, তাহলে তাকে একথা বলা হবে না যে, সে হারাম ভক্ষণ করেছে। কেননা, সেতো নিজ মাল খেয়েছে। তবে সে শরিয়তের নির্দেশ [পরিমাপ করা] অমান্য করার কারণে গুনাহগার অবশ্যই হবে। উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিক্রয়টি ফাসিদ হলেও তার দ্বারা মালিক হওয়া দ্রব্য খাওয়া হারাম নয়, তবে শরিয়তের নির্দেশ অমান্য করার কারণে ভিন্ন গুনাহ অবশ্যই হবে।

قَوْلُهُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِكَيْلِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ الخ : লেখক বলেন, দ্বিতীয় বিক্রয়ের পূর্বে যদি বিক্রেতা [নিজের জন্য] দ্বিতীয় ক্রেতার সামনে পণ্য পরিমাপ করে, তাহলে উক্ত পরিমাপ দ্বিতীয় ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা, এখানে হাদীসে বর্ণিত বিক্রেতার পরিমাপ ও ক্রেতার পরিমাপ পাওয়া যায়নি। হাদীসে বলা হয়েছে– نَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِىَ فِيْهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِىْ আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতার উল্লিখিত পরিমাপ বিক্রেতা হিসেবে পরিমাপ কিংবা ক্রেতা হিসেবে পরিমাপ হয়নি। কারণ, প্রকৃত অর্থে বিক্রেতা ও ক্রেতা বিবেচিত হয় বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর; বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার আগে নয়। এখানে তো বিক্রয় সংঘটিত হয়নি– তার আগেই পরিমাপ করা হয়েছে। যেহেতু বিক্রয় সংঘটিত

হয়নি, তাই তারা মূলত ক্রেতা-বিক্রেতাই হয়নি। অতএব তাদের পরিমাপ ক্রেতার পরিমাপ ও বিক্রেতার পরিমাপ সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এ পরিমাপ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিমাপই গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَلَا بِكَيْلِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِيْ الخ : লেখক বলেন, দ্বিতীয় বিক্রয়ের পর ক্রেতার অনুপস্থিতিতে যদি পণ্য পরিমাপ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, বিক্রয়ের পরবর্তী পরিমাপ করা হয় ক্রেতার হাতে পণ্য অর্পণ করার উদ্দেশ্যে। যেহেতু ক্রেতা অনুপস্থিত, তাই তার কাছে অর্পণ করা সম্ভব নয়। অথচ এ পরিমাপ করার নির্দেশ শরিয়ত এজন্যই দিয়েছে যে, বিক্রেতা যেন নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য অর্পণ করতে পারে। লেখক বলেন, যদি কেউ বিক্রয়ের পর ক্রেতার উপস্থিতিতে একবার পরিমাপ করে, তাহলে তার একবারের পরিমাপ কতিপয় আলিমের মতে যথেষ্ট হবে না; বরং ক্রেতার পরিমাপ করে নিতে হবে। কেননা, হাদীসের জাহেরী অর্থ (حَتّٰى يَجْرِىَ فِيْهِ صَاعَانِ) দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, একবার বিক্রেতা পরিমাপ করবে, তারপর ক্রেতা পরিমাপ করবে। তবে লেখক বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো, উল্লিখিত অবস্থায় একবার পরিমাপ করার দ্বারা যথেষ্ট হবে। কেননা, একবার পরিমাপ করার দ্বারা বিক্রীত-পণ্য পরিজ্ঞাত হয়ে যায় এবং পণ্য অর্পণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিক্রীত-পণ্য নির্ধারিত পরিমাণ হতে বৃদ্ধির [দ্বারা অন্যের মালে হস্তক্ষেপের] সম্ভাবনাও রহিত হয়ে যায়। যেহেতু দু-বার পরিমাপ করার নির্দেশ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কারণে দেওয়া হয়েছিল, আর আলোচ্য মাসআলায় উপরিউক্ত বিষয়গুলো আসছে না, তাই দু-বার পরিমাপ করার প্রয়োজন নেই। তবে হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র কি হবে ? এর উত্তর হলো, যখন দুটি চুক্তি একত্রিত হবে, যেমন– "বায় সলম" অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মুসলাম ইলাইহি [সালামের বিক্রেতা] এক ব্যক্তি থেকে রাব্বুস সালামের জন্য গম খরিদ করল। তারপর রাব্বুস সালামকে তা কব্জা করার নির্দেশ দিল এ অবস্থায় দু-বার পরিমাপ করা আবশ্যক। এক পরিমাপ হচ্ছে মুসলাম ইলাইহির আর অন্য পরিমাপ হচ্ছে রাব্বুস সালামের, অর্থাৎ রাব্বুস সালাম প্রথমে মুসলাম ইলাইহির জন্য পরিমাপ করবে, তারপর নিজের জন্য পরিমাপ করবে।

তবে যদি ক্রেতার অনুপস্থিতিতে পরিমাপ করে, তাহলে একবার পরিমাপ করা যথেষ্ট হবে না। কারণ, পরিমাপ করার দ্বারা অর্পণ করার পরিস্থিতি ক্রেতার অনুপস্থিতির কারণে সম্ভব নয়। আর তখনই ক্রেতার মালের সাথে বিক্রেতার মালের মিশ্রিত থাকার একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهُ وَلَوِ اشْتَرَى الْمَعْدُوْدَ عَدًّا فَهُوَ الخ : লেখক বলেন, যদি কেউ গণনা-নির্ভর কোনো বস্তু গণনা করে ক্রয় করে, যেমন– কেউ বলল, আমি একশত ডিম তিনশত টাকায় খরিদ করছি।

লেখক বলেন, উক্ত مَعْدُوْد দ্রব্যাদি সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَذْرُوْع-এর মতো, অর্থাৎ কাপড়ের ক্ষেত্রে গজ কমবেশি হলে যে হুকুম হয় এখানেও গণনায় কমবেশি হলে একই হুকুম হবে। অর্থাৎ যদি কেউ উদাহরণস্বরূপ ডিম গণনা করার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে উক্ত ডিমে হস্তক্ষেপ করার জন্য ক্রেতার পুনরায় গণনা করা আবশ্যক নয়। ক্রেতা এক্ষেত্রে পুনরায় গণনা না করে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে– এতে কোনো সমস্যা নেই।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, مَذْرُوْع দ্রব্যাদির মতো এগুলোও সুদের তালিকাভুক্ত মাল নয়। এজন্যই তাঁদের মতে এক ডিম দু ডিমের পরিবর্তে বিক্রি করা বৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গণনা-নির্ভর বস্তুসমূহ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের মতো, [যা ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি]। পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যাদিতে যেমন নির্ধারিত শর্তকৃত পরিমাপের বেশি বিক্রেতার হক এবং তা ক্রেতার জন্য বৈধ নয়– ঠিক তদ্রূপ গণনা-নির্ভর দ্রব্যাদিও শর্তকৃত পরিমাণের বেশিটুকু ক্রেতার হক নয়; বরং বিক্রেতার হক। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি তিনশত টাকার বিনিময়ে একশত ডিম কিনল, গণনা করার পর দেখা গেল ডিম একশ-এর চেয়ে বেশি, এমতাবস্থায় বেশি ডিমগুলো বিক্রেতার হক বলে সাব্যস্ত হবে এবং এগুলো ফেরত দিতে হবে। আর যেহেতু গণনা-নির্ভর দ্রব্যাদি ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর হুকুম রাখে, তাই এগুলো বিক্রির পূর্বে গণনা করতে হবে। গণনা না করে বিক্রি কোনোভাবে বৈধ হবে না। আর যদি বিক্রয়ের পর অর্পণ করার পূর্বে পরিমাণের চেয়ে ডিম বেশি পায়, তাহলে বিক্রেতা তা ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে না। আর যদি পরিমাণে কম পায়, তাহলে ক্রেতা বাকিটুকু বিক্রেতা থেকে ফেরত নেবে।

قَالَ : وَالتَّصَرُّفُ فِى الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ لِقِيَامِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَيْسَ فِيْهِ غَرَرُ الْاِنْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا بِالتَّعْيِيْنِ بِخِلَافِ الْمَبِيْعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কব্জা করার পূর্বে মূল্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। কেননা, হস্তক্ষেপ করার অনুমতি প্রদানকারী তথা মালিকানা এখানে বিদ্যমান এবং এতে মূল্য বিনষ্ট হয়ে বিক্রয় বাতিল হওয়ার মতো প্রতারণাও নেই। কারণ, মূল্য নির্ধারিত করলে নির্ধারিত হয় না। কিন্তু বিক্রেয়পণ্য এর বিপরীত। [এটা নির্ধারিত হয়েই থাকে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَالتَّصَرُّفُ فِى الثَّمَنِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোনো দ্রব্য বিক্রয়ের পর তার মূল্য কব্জা করার পূর্বে বিক্রেতা যদি মূল্যের মধ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়, যেমন– সে তা বিক্রি করল, দান করল অথবা অসিয়ত করল ইত্যাদি, তাহলে তা করা বৈধ। চাই সে মূল্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না এ জাতীয় হোক [যেমন– স্বর্ণ, রুপা, মুদ্রা ইত্যাদি] কিংবা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এ জাতীয় হোক [যেমন– চাল, গম, কাপড় ইত্যাদি]। তবে বায় সরফ ও বায় সলমের মূল্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এর উদাহরণ হলো, খালেদ একটি গরু দশ হাজার টাকার বিনিময়ে অথবা বিশ মন চাউলের বিনিময়ে বিক্রি করল, তারপর গরু সে ক্রেতার হাতে অর্পণ করে দিল, কিন্তু মূল্য বাবদ দশ হাজার টাকা কিংবা বিশ মন চাল কব্জা করার পূর্বেই যদি তা কারো কাছে বিক্রি করে কিংবা দান করে অথবা এতে অন্য কোনো হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তার এরূপ হস্তক্ষেপ করার দলিল হচ্ছে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা। উল্লেখ্য যে, বিক্রেয়পণ্য কব্জা করার পূর্বে তাতে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হওয়া যদিও যুক্তি অনুযায়ী উচিত, কিন্তু ভিন্ন একটি কারণে শরিয়ত তার অনুমোদন দেয়নি। আর তা হচ্ছে উদ্ভূত কারণে পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর এতে পরবর্তীতে যার সাথে চুক্তি করেছে সে প্রতারিত হয়। কিন্তু মূল্যের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। কারণ, মূল্য যদি মুদ্রা জাতীয় হয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার অনুরূপ মুদ্রা প্রদান করা আবশ্যক হবে। আর যদি তা নির্ধারিত পণ্য হয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই পণ্যের পরিবর্তে কীমত [বাজারমূল্য] প্রদান করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই বিক্রয় রহিত হয় না এবং অন্য কেউ এতে প্রতারিত হয় না।

মোটকথা, যেহেতু মূল্যের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি প্রদানকারী নিরঙ্কুশ মালিকানা বিদ্যমান ও হস্তক্ষেপে বাধাপ্রদানকারী বাতিল হওয়ার ধোঁকাও নেই, তখন বিক্রেতার মূল্যে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ঋণ মূল্যের মতো, যেমন– মোহর, ভাড়া, ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা ইত্যাদির মধ্যেও কব্জা করার পূর্বে হস্তক্ষেপ করা বৈধ। এসব বৈধ হওয়ার দলিল ইতঃপূর্বে মূল্যের ক্ষেত্রে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই।

তাছাড়া হাদীসের মাধ্যমে উক্ত মাসআলার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীস–

وَهُوَ مَا فِى سُنَنِ الْاَرْبَعَةِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْاِبِلَ بِالْبَقِيْعِ فَاَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَاٰخُذُ الدَّرَاهِمَ وَاَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ الدَّنَانِيْرَ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ فَاَخَذْتُ

بِثَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ فَإِنَّ هٰذَا بَيْعُ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِالنَّقْدِ الْمُخَالِفِ لَهُ .

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি বাকী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম– দিনারে বিক্রি করতাম আর তদস্থলে দিরহাম নিতাম, কখনও দিরহামে বিক্রি করতাম আর তদস্থলে দিনার নিতাম। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমতাবস্থায় আসলাম যে, তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। আমি তাঁর কাপড় ধরে তাঁকে আমার উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে যদি একটির পরিবর্তে অন্য একটি গ্রহণ কর, তাহলে সেটা বিক্রয় সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটা তো মালিকানাধীন মূল্য কব্জার পূর্বে ভিন্ন মূল্য (ثَمَنْ) দ্বারা গ্রহণ করা হচ্ছে।

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মূল্য (ثَمَنْ) কব্জা করার পূর্বে তাতে تَصَرُّفْ করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর এরূপ হস্তক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মাঝে مَوْقُوْف ও مَرْفُوْع হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ হাদীসটি মারফূ'রূপে, আবার কেউ মাওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উভয় বর্ণনার বিরোধ নিরসন করতে গিয়ে বলেন, মারফূ'রূপে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, হাদীস মারফূ' ও মাওকূফ হওয়ার ব্যাপারে تَعَارُضْ [অসঙ্গতি] হলে মারফূ' হাদীসই গ্রহণযোগ্য। কেননা, এটা زِيَادَةٌ বা অতিরিক্ত। আর হাদীসশাস্ত্রের নীতি হচ্ছে زِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُوْلَةٌ [নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য]। তাছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.) -এর মতো একনিষ্ঠ রাসূলের সুন্নতের অনুসারীর ক্ষেত্রে এ কথা অকল্পনীয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত উক্ত ঝুঁকিপূর্ণ মাসআলা না জেনে আমল করবেন।

قَالَ : وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِيْ أَنْ يَزِيْدَ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيْدَ لِلْمُشْتَرِيْ فِي الْمَبِيْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطَّ عَنِ الثَّمَنِ، وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ. فَالزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (رح) لَا يَصِحَّانِ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْاِلْتِحَاقِ، بَلْ عَلٰى اِعْتِبَارِ اِبْتِدَاءِ الصِّلَةِ. لَهُمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيْحُ الزِّيَادَةِ ثَمَنًا، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ مِلْكُهُ عِوَضَ مِلْكِهِ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، وَكَذٰلِكَ الْحَطُّ، لِأَنَّ كُلَّ الثَّمَنِ صَارَ مُقَابِلًا بِكُلِّ الْمَبِيْعِ، فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ فَصَارَ بِرًّا مُبْتَدِأً. وَلَنَا أَنَّهُمَا بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ يُغَيِّرَانِ الْعَقْدَ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوْعٍ إِلٰى وَصْفٍ مَشْرُوْعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ رَابِحًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ عَدْلًا، وَلَهُمَا وِلَايَةُ الرَّفْعِ فَأَوْلٰى أَنْ يَكُوْنَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَّغْيِيْرِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিক্রেতার জন্য [বিক্রয়ের পর] মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া ক্রেতার পক্ষে বৈধ এবং বিক্রেতা ক্রেতার উদ্দেশ্যে বিক্রেয়পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া বৈধ। তদ্রূপ মূল্য কমিয়ে দেওয়াও জায়েজ। সম্পূর্ণ পরিমাণের সাথে [উভয়ের] হক যুক্ত হবে। আমাদের মতে বৃদ্ধি এবং ঘাটতি উভয়টি মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট করা হিসেবে উক্ত কমবেশি করা বৈধ নয়; বরং স্বতন্ত্র দানরূপে বিবেচনা করলে বৈধ হবে। তাঁদের দলিল হলো, [পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা] অতিরিক্ত অংশকে মূল্য হিসেবে শুদ্ধকরণ সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে ক্রেতার মালিকানা তার মালিকানার বিনিময় সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। হ্রাস করার ক্ষেত্রটিও অনুরূপ। কেননা, পুরো মূল্য পুরো পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব মূল্যের কিয়দংশকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এটা একটা নতুন দান বিবেচিত হবে। আমাদের দলিল হলো, তারা [বিক্রেতা ও ক্রেতা] হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে চুক্তিকে একটি শরিয়তসম্মত অবস্থা থেকে অন্য শরিয়তসম্মত অবস্থাতে রূপান্তর করছে। সে অবস্থা হচ্ছে লাভজনক হওয়া অথবা লোকসানপূর্ণ হওয়া কিংবা ইনসাফপূর্ণ হওয়া। আর তাদের বিক্রয় রহিত করার ক্ষমতা রয়েছে সুতরাং তাদের চুক্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِيْ أَنْ يَزِيْدَ الخ : উপরিউক্ত দীর্ঘ ইবারতে লেখক একটি মূল্যের উপর ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর উক্ত মূল্যতে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর পণ্যের মধ্যে বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন। উক্ত মাসআলা সংক্রান্ত মূল ইবারত ইমাম কুদূরী (র.)-এর আল-মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

মাসআলার স্বরূপ : যদি ক্রেতা [ক্রয়ের পর] বিক্রেতার অনুকূলে মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তা করা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ–

১. এক ব্যক্তি দশ মন চাল পাঁচ হাজার টাকায় খরিদ করল, তারপর সে [পণ্য দেখে খুশি হয়ে] বিক্রেতাকে আরও একশত টাকা বাড়িয়ে দিল, তাহলে এটা বৈধ।

২. তদ্রূপ বিক্রেতা যদি পাঁচ মনের সাথে আরও দশ সের বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তা বৈধ।

৩. এমনিভাবে বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে আপনি একশত টাকা কম দিতে পারেন, তাহলেও তা বৈধ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিক্রয়-পরবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে ক্রেতা-বিক্রেতা হক কিভাবে যুক্ত হবে? এর উত্তর হচ্ছে, হ্রাস-বৃদ্ধি ও আসল অবস্থা এ সবের সাথেই উভয়ের হক যুক্ত হবে, অর্থাৎ যদি মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে বর্ধিত মূল্যই বিক্রেতার হক। অতএব যদি বিক্রেতা মূল মূল্য ও বর্ধিত মূল্য আদায় করার আগ পর্যন্ত বিক্রীত-পণ্য তার কাছে আটকে রাখতে চায়, তাহলে তার তা করার অধিকার রয়েছে। তদ্রূপ ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত মূল মূল্য ও বর্ধিত মূল্য পরিশোধ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার ক্রয়কৃত পণ্য চেয়ে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে না। আর যদি বিক্রেতা বিক্রীত-পণ্য বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেয়, তাহলে ক্রেতা বর্ধিত পণ্য না পাওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য আটকে রাখতে পারে। যদি বিক্রেতা মূল্য কমিয়ে দেয়, তাহলে ক্রেতা অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করার পর পুরো ক্রয়কৃত পণ্য পাওয়ার অধিকার লাভ করবে– এর পূর্বে নয়।

তাদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো, যদি পণ্যের কোনো مُسْتَحِقٌ [দাবিদার] পাওয়া যায়– যে বলে পণ্যটি বিক্রেতার নয়– আমার, অতঃপর তার সে দাবি প্রমাণিত হয়। তারপর ক্রেতা পণ্য ফেরত দেওয়ার পর ক্রেতা যদি বর্ধিত মূল্য দিয়ে থাকে, তাহলে বিক্রেতা থেকে বর্ধিত মূল্যই [মূল মূল্যসহ] ফেরত নেবে। আর যদি মূল্য হ্রাস করা হয়ে থাকে, তাহলে সে হ্রাসকৃত তথা অবশিষ্ট মূল্যই ফেরত নেবে।

আমাদের মাযহাব : বিক্রয়ের পর মূল্য বৃদ্ধি করা কিংবা হ্রাস করা উভয় মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, পরবর্তীতে করা হ্রাস-বৃদ্ধি মূল চুক্তির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির মতোই। অর্থাৎ যেন ক্রেতা-বিক্রেতা মূল চুক্তির মধ্যেই হ্রাস বৃদ্ধি করল।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : বিক্রয় পরবর্তী মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষ থেকে নতুন ও স্বতন্ত্র দান বিবেচিত হবে। তাঁদের মতে এটা বিক্রয়চুক্তির পর বিক্রয়চুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অনুগ্রহ ও আন্তরিকতার নিদর্শন। মূল্য বৃদ্ধি করার অবস্থায় এটা ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে দান করা হলো, দান শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু কব্জা করা শর্ত, তাই এখানে কব্জা করতে হবে। আর বিক্রেয়পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অবস্থায় বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রেতাকে দান করা হলো কিংবা উপহার দেওয়া হলো, তদ্রূপ আর যেসব অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয় এর কোনোটাই মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না; বরং সব অবস্থাতে এটা একটা স্বতন্ত্র দানরূপেই বিবেচিত হবে– মূল চুক্তির সাথে কিছুতেই যুক্ত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল : তাঁরা বলেন, প্রথমে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে যখন বিক্রয়পণ্য ক্রেতার অধিকারে চলে গেল, তখন ক্রেতা তার মালিক হয়ে গেল। তারপর ক্রেতা যদি অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে এবং সেটাকে প্রথম চুক্তির সাথে যুক্ত করতে চায়, তাহলে তার বর্ধিত মূল্য সেই পণ্যের বিনিময়ে হবে যেই পণ্যের সে মালিক হয়েছে। আর বর্ধিত মূল্যরূপে যা দিচ্ছে সেটাও তার মালিকানা। অতএব সে তার মালিকানাধীন বস্তু অপর মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে প্রদান করল, অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তু অন্য মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময় হওয়া বৈধ নয়। এর উদাহরণ হলো, খালেদ রাশেদ থেকে একটি গরু পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করল। ফলে গরুটি পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে খালেদের মালিকানায় পরিণত হলো। এখন যদি খালেদ একশত টাকা অতিরিক্ত রাশেদকে দেয় এবং সেটাকে মূল মূল্যের সাথে যুক্ত করা হয়, তাহলে খালেদ তার মালিকানাধীন বস্তু [টাকা] তারই আরেক মালিকানাধীন বস্তু [সদ্য ক্রয়কৃত গরু]-এর বিনিময়ে প্রদান করল। অথচ এমন হওয়া অর্থাৎ একই ব্যক্তির একটি মালিকানাধীন বস্তু অন্য মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে হওয়া বৈধ নয়। আর এজন্য বর্ধিত মূল্য মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ হবে না।

দ্বিতীয় সুরত অর্থাৎ যদি বিক্রেতা চুক্তির পরে পণ্য বাড়িয়ে দেয়, তাহলেও বিক্রেতার মালিকানা বস্তু [অতিরিক্ত পণ্য] তারই অন্য মালিকানা বস্তু [সদ্য মালিক হওয়া বিক্রয়মূল্য] -এর বিনিময়ে হচ্ছে। আর এক ব্যক্তির একটি মালিকানাধীন বস্তু অন্য বস্তুর বিনিময়ে হওয়া যে অবৈধ ইতঃপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

আর তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ যদি বিক্রেতা চুক্তিতে উল্লিখিত মূল্য ক্রেতার জন্য কমিয়ে দেয়, তাহলেও তা বৈধ হবে না। কারণ, ইতঃপূর্বে সমগ্র মূল্যকে সমগ্র পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন– উপরিউক্ত উদাহরণে গরুর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। এখন যদি একশত টাকা মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয় এবং উক্ত হ্রাসকৃত মূল্য মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে পণ্যের একাংশ মূল্যবিহীন অবস্থায় বিরাজ করবে অর্থাৎ যেটুকু মূল্য কমানো হলো এর বিপরীতে পণ্যের যে অংশ

ছিল তা এখন মূল্যহীন হয়ে গেল। আর পুরো বিক্রেয়পণ্যের একাংশ মূল্যবিহীন থাকা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কারণ পণ্যের কোনো অংশই মূল্যবিহীন থাকে না। সুতরাং যেহেতু বিক্রয়সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্যের একাংশ কমানোর দ্বারা অবৈধতার মুখোমুখি হতে হয়, তাই মূল্যের একাংশ কমানো এবং তা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ হবে না।

যদি কেউ বলে, মূল্য হ্রাস করার পর অবশিষ্ট যে মূল্য রয়েছে যদি সেটাকে পুরো পণ্যের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তো উপরিউক্ত সমস্যা উপস্থাপিত হবে না। এর উত্তর হচ্ছে, মূল্য হ্রাস করার পর অবশিষ্ট মূল্য [উদাহরণস্বরূপ ৪৯০০ টাকা] কে পুরো পণ্য [গরু] এর বিনিময় সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না। কারণ, এখানে এমন কোনো নতুন চুক্তি পাওয়া যায়নি যার মাধ্যমে ৪৯০০ -কে গরুর মূল্য সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং প্রথম চুক্তিতে উল্লিখিত পাঁচ হাজার গরুর মূল্য বিবেচিত হবে। উপরিউক্ত দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অতিরিক্ত মূল্য বা হ্রাসকৃত মূল্য কোনোটাকেই মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং পরবর্তীতে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করা কিংবা পরবর্তীতে মূল্য হ্রাস করা অথবা বিক্রেয়পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া সবই স্বতন্ত্র দান এবং নতুনভাবে করা অনুগ্রহ বিবেচিত হবে। হানাফী মাযহাবের অন্যান্য [প্রধান] ইমামগণ তাঁদের মাযহাবের সপক্ষে দলিল প্রদান করেন যা লেখক এভাবে বর্ণনা করেন– وَلَنَا اَنَّهُمَا بِالْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ يُغَيِّرَانِ الْعَقْدَ الخ

আমাদের দলিল : বিক্রয়চুক্তি সাধারণভাবে তিন ধরনের হয়ে থাকে–

১. رَابِحْ - লাভজনক, ২. خَاسِرْ - লোকসানপূর্ণ ও ৩. عَادِلْ - ইনসাফপূর্ণ।

এ তিন প্রকার বিক্রি বৈধ ও শরিয়তসম্মত। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনের কারো যখন বিক্রয়চুক্তি দ্বারা ক্ষতি না হয় এবং বাজার অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন বিক্রয়টিকে عَادِلْ বা ইনসাফপূর্ণ বলা হয়। আর যদি বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কোনো একজন [ক্রেতা/ বিক্রেতা] -এর ক্ষতি বা লোকসান হয়, তাহলে তাকে خَاسِرْ বলা হয়। অর্থাৎ যার লোকসান হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করে বিক্রয়টিকে خَاسِرْ বলা হয়, আর যার লাভ হয় তার প্রতি লক্ষ্য করে বিক্রয়টিকে رَابِحْ বলা হয়। একই বিক্রি একজনের জন্য লাভজনক এবং অন্যজনের জন্য তা লোকসানপূর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে বিক্রেতার জন্য সেটি লাভজনক বিক্রয়ে রূপান্তরিত হয়। আর যদি পূর্বে বিক্রয়টি বিক্রেতার জন্য লোকসানপূর্ণ থাকে, তাহলে মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা বিক্রয়টি লাভজনকে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে যদি একটি লাভজনক বিক্রয়ের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে [বিক্রেতার জন্য] সেটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে পরিণত হয় আর একই অবস্থায় একটি ইনসাফপূর্ণ বিক্রয় লোকসানপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত হয়। [অথচ এটাই ক্রেতার জন্য লাভজনক চুক্তি সাব্যস্ত হয়।] অনুরূপভাবে যদি বিক্রয়চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্য বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয়টি লোকসানপূর্ণ অবস্থা থেকে ইনসাফপূর্ণ অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। তদ্রূপ ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়টি লাভজনক বিক্রয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সারকথা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে মূল্যের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করে কিংবা পণ্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে এর বিক্রয় একটি বৈধ অবস্থা থেকে অন্য বৈধ অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমন– তারা লাভজনক বিক্রয়কে, ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত করে কিংবা লোকসানপূর্ণ বিক্রয়কে লাভজনক/ ইনসাফপূর্ণ বিক্রয়ে রূপান্তরিত করে। আর ক্রেতা ও বিক্রেতা সমন্বিতভাবে বিক্রয় প্রত্যাহার করতে পারে, তাদের সেই অধিকার রয়েছে। যাদের বিক্রয় প্রত্যাহার করার অধিকার রয়েছে তাদের বিক্রয়ের গুণগত অবস্থা পরিবর্তন করার অধিকার উত্তম রূপে থাকবে বৈকি। কারণ, কোনো বিষয়ের গুণগত পরিবর্তন সত্তাগত পরিবর্তন থেকে সহজ। ক্রেতা-বিক্রেতার সত্তাগত পরিবর্তনের অধিকার যেহেতু রয়েছে, অতএব তাদের গুণগত পরিবর্তন করার অধিকার অবশ্যই থাকবে।

মূল্য হ্রাস করা যে বৈধ তার সমর্থন মোহরের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। মোহরের পরিমাণ হ্রাস করার বৈধতা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ অর্থাৎ 'মোহর নির্ধারণ করার পর তোমরা হ্রাস-বৃদ্ধি করার ব্যাপারে পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে যা করতে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।' [২৪. সূরা নিসা] এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মোহর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা বৈধ। যেহেতু হ্রাস-বৃদ্ধি বৈধতা পেল, তাহলে অবশ্যই তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা যে পরিবর্তন হয়েছে সেই পরিবর্তিত অবস্থার সাথেই চুক্তি সম্পাদন হয়েছে বলা হবে। কারণ, পরিবর্তন হচ্ছে গুণগত বিষয়। আর গুণ কোনো সত্তাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

وَصَارَ كَمَا إِذَا أَسْقَطَا الْخِيَارَ أَوْ شَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، ثُمَّ إِذَا صَحَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، لِأَنَّ وَصْفَ الشَّيْءِ يَقُوْمُ بِهِ لَا بِنَفْسِهِ، بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ، لِأَنَّهُ تَبْدِيْلٌ لِأَصْلِهِ، لَا تَغْيِيْرٌ لِوَصْفِهِ، فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ، وَعَلَى اِعْتِبَارِ الْاِلْتِحَاقِ لَا تَكُوْنُ الزِّيَادَةُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ، وَيَظْهَرُ حُكْمُ الْاِلْتِحَاقِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ، حَتَّى يَجُوْزَ عَلَى الْكُلِّ فِي الزِّيَادَةِ وَيُبَاشِرَ عَلَى الْبَاقِيْ فِي الْحَطِّ، وَفِي الشُّفْعَةِ، حَتَّى يَأْخُذَ بِمَا بَقِيَ فِي الْحَطِّ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيْعِ اَنْ يَاْخُذَ بِدُوْنِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ الثَّابِتِ فَلَا يَمْلِكَانِهِ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيْعِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ الْمَبِيْعَ لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالَةٍ يَصِحُّ الْاِعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَالشَّيْءُ يَثْبُتُ ثُمَّ يَسْتَنِدُ، بِخِلَافِ الْحَطِّ، لِأَنَّهُ بِحَالٍ يُمْكِنُ إِخْرَاجُ الْبَدَلِ عَمَّا يُقَابِلُهُ، فَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ إِسْتِنَادًا ـ

অনুবাদ : তাই এটি এমন হলো যেমন তারা চুক্তির পর ইচ্ছাধিকার বাতিল করল কিংবা ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত করল। যেহেতু এরূপ করা বৈধ, অতএব তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কেননা, কোনো জিনিসের গুণ তার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে, স্বয়ং অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। পুরো মূল্যকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এতে তো মূল চুক্তিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তার গুণবিশেষকে নয়। সুতরাং তা চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে না। মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করার দিক থেকে বর্ধিত অংশ নিজ মালিকানার বিনিময় হচ্ছে না। পরবর্তী হ্রাস-বৃদ্ধির হুকুম তাওলিয়া ও মুরাবাহার ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। আর তাই বর্ধিত করা অবস্থায় পুরো মূল্যের উপর মুরাবাহা ও তাওলিয়া করা বৈধ হবে। আর হ্রাস করা অবস্থায় অবশিষ্ট মূল্যের উপর মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তি করবে। শুফআর ক্ষেত্রেও তাই। হ্রাস করার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত অবশিষ্ট মূল্যে শুফআ দাবি করতে পারে। আর [মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে] শুফআর দাবিদার অতিরিক্ত মূল্য ছাড়াই শুফআ গ্রহণ করতে পারে। কেননা, বর্ধিত মূল্যের ক্ষেত্রে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করা আবশ্যক হয়। অথচ বিক্রেতা ও ক্রেতার তা বাতিল করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর [মাসআলা হলো,] জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিক্রেয়পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর তার মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ নয়। কেননা, বিক্রেয়পণ্য তো এমন অবস্থাতে নেই যার বিনিময় সাব্যস্ত হতে পারে। অথচ [নিয়ম হলো,] কোনো বিষয় প্রথমে সাব্যস্ত হয়, তারপর সেটা অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। তবে হ্রাস করার অবস্থা তার বিপরীত। কেননা, সেটা এমন অবস্থাতে রয়েছে যে, তার বদল সরিয়ে দেওয়া যায়। অতএব তা মূল চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا أَسْقَطَا الْخِيَارَ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতামতের পক্ষে একটি সমর্থন পেশ করেছেন। লেখক বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার কোনো একজনের অথবা উভয়ের ইচ্ছাধিকার (خِيَار شَرْط) থাকে, তারপর তারা সেই ইচ্ছাধিকারকে বাতিল করে অথবা বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর নতুনভাবে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় অকার্যকর চুক্তি কার্যকর করে আর দ্বিতীয় অবস্থায় কার্যকর বিক্রয়টিকে অনিশ্চিত করে দেয়, তাহলে সবার মতে এটা করা বৈধ হবে। যেভাবে উক্ত পরিবর্তন শরিয়ত বৈধ মনে করে, তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়ের রূপান্তর বৈধ হবে। কেননা, [পূর্বে যা বলা হয়েছে] মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করা মূল্যের একটি গুণ (وَصْف), আর

কোনো বিষয়ের গুণ সে বিষয়ের আশ্রয়ে টিকে থাকে, স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে তা টিকে থাকতে পারে না। এজন্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি মূল্যের সাথে অবস্থান করবে, স্বতন্ত্র বা পৃথকভাবে টিকে থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَطِّ الْكُلِّ الخ : লেখক এ ইবারতের মাধ্যমে আমাদের মাযহাবের উপর আরোপিত একটি আপত্তির জবাব দিচ্ছেন। আপত্তিটি হচ্ছে, যদি আংশিক মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ হয়, তাহলে তো এর উপর কিয়াস করে পুরো মূল্য বাদ দেওয়া বৈধ হবে। এর উত্তরে লেখক كُلّ [সমগ্র] এবং بَعْض [আংশিক] মূল্যের হ্রাস করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তার প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যমে উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বলেন, بِخِلَافِ الْكُلِّ সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ নয়। কেননা, সমগ্র মূল্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে একটি মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়- গুণগত পরিবর্তন হয় না। সমগ্র মূল্য বাদ দিলে ক্রয়কৃত চুক্তিটি বদলে যায়। কারণ, সমগ্র মূল্য বাদ দিলে মূল্য না থাকাতে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, মূল্যবিহীন বিক্রয়চুক্তি হতে পারে না। অথচ এটা [চুক্তি বাতিল হওয়া] তাদের উদ্দেশ্য নয়। অথবা এটা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে উপঢৌকন প্রদান বা দান সাব্যস্ত হবে। এটাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তারা তো পরস্পরে ব্যবহার উদ্দেশ্যে লেনদেন করেছিল। সুতরাং সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বা মাফ করা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হলো, সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা অবস্থায় যেহেতু চুক্তির গুণগত নয় বরং মূলগত পরিবর্তন হয়ে যায়, বিনিময় চুক্তির পরিবর্তে দানে পরিণত হয়, তাই এটাকে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা যায় না। কেননা, তখন তো চুক্তিই বহাল থাকে না। চুক্তি থাকলে তো তার সাথে অন্য কিছু যুক্ত করা যেত। এজন্য সমগ্র মূল্য প্রত্যাহার করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি মূল্যের একাংশ হ্রাস করা হয় তাহলে চুক্তি বহাল থাকে, শুধুমাত্র চুক্তির গুণগত পরিবর্তন হয়, তাই তখন হ্রাসকৃত মূল্যকে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা যাবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى اعْتِبَارِ الْإِلْتِحَاقِ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে লেখক ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর পক্ষ থেকে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। তাঁরা বলেছিলেন, মূল্য বৃদ্ধি করা অবস্থায় ক্রেতার মালিকানা বস্তু ক্রেতার মালিকানা বস্তুর বিনিময় হয়ে যায়। এর জবাবে লেখক বলেন, বর্ধিত মূল্যকে যখন মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন তা ক্রেতার মালিকানা বস্তুর বিনিময় হয় না। কেননা, যখন পরে মূল্য বৃদ্ধি করা হলো এবং তা চুক্তির সাথে যুক্ত করা হলো তখন এটা যেন প্রথম চুক্তির মাঝে বিদ্যমান ছিল এমন হয়ে গেল।

উদাহরণস্বরূপ একটি টেবিল কেনা হলো পাঁচশত টাকার বিনিময়ে, তারপর ক্রেতা পাঁচশত টাকার সাথে আরো পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধি করে দিল। এখন যখন পঞ্চাশ টাকা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা হলো তো এটা এমন হলো যে, যেন প্রথম চুক্তি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়েছিল। যেহেতু প্রথম চুক্তিটি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হয়েছে ধরা হলো, তাই বর্ধিত মূল্য ক্রেতার মালিকানার বিনিময়ে হলো না, বরং বর্ধিত মূল্য মূল মূল্যের ন্যায় বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুর বিনিময়ে হলো। যেমন- আলোচ্য উদাহরণে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা [ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু] টেবিল [বিক্রেতার মালিকানাধীন বস্তু] -এর বিনিময় সাব্যস্ত হবে।

এরপর লেখক আলোচ্য মাসআলার ফলাফল প্রকাশিত হয় এমন কয়েকটি মাসআলার ব্যাপারে আলোকপাত করেন। সুতরাং লেখক বলেন, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত মূল্য মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হওয়ার বিধান মুরাবাহা ও তাওলিয়া চুক্তির মাঝে প্রকাশিত হবে। যেমন- মূল্য বৃদ্ধি করার অবস্থায় মুরাবাহা ও তাওলিয়ার প্রথম মূল্য ধরা হবে মূল মূল্য এবং বর্ধিত মূল্য উভয়কে। যেমন- এক ব্যক্তি একটি টেবিল ক্রয় করল পাঁচশত টাকায়, তারপর সে বিক্রেতাকে মূল্য বাবদ আরো অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করল। এরপর যদি ক্রেতা টেবিলটি মুরাবাহা/ তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে টেবিলের মূল্য ধরবে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা। তাওলিয়া হলে সে টেবিলটি পাঁচশত পঞ্চাশ টাকাতেই বিক্রি করবে। আর যদি মুনাফা নিয়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে পাঁচশত পঞ্চাশের উপর মুনাফা নেবে।

আর মূল্য হ্রাস করা অবস্থায় হ্রাসকৃত মূল্যের উপর সে মুরাবাহা ও তাওলিয়া বিক্রয়চুক্তি করবে। যেমন- কোনো ব্যক্তি পাঁচশত টাকায় একটি টেবিল ক্রয় করল, তারপর বিক্রেতা টেবিলটির মূল্য পঞ্চাশ টাকা কম নিল, অর্থাৎ সাড়ে চারশত টাকা নিল। তারপর ক্রেতা যদি টেবিলটি মুরাবাহা/ তাওলিয়ারূপে বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে সাড়ে চারশত টাকা প্রথম মূল্য ধরে বিক্রি করবে

লেখক বলেন, পরবর্তী মূল্য ও হ্রাস-বৃদ্ধির হুকুম শুফআর ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হবে। যদি ক্রয়ের পর মূল্য হ্রাস করা হয়, তাহলে শফী' হ্রাসকৃত মূল্যেই জমিন নেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- এক ব্যক্তি তিন লক্ষ টাকায় তিন কাঠা জমিন ক্রয় করল, এরপর বিক্রেতা ক্রেতাকে পঁচিশ হাজার টাকা ছাড় দিল অর্থাৎ বিক্রেতা জমিন বাবদ দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা নিল। তারপর পার্শ্ববর্তী জমিদার শুফআ দাবি করে জমিন নিতে চাইল, তাহলে সে অবশিষ্ট মূল্য তথা দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার বিনিময়েই জমিন নেবে।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِدُوْنِ الزِّيَادَةِ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে লেখক মুরাবাহা ও তাওলিয়ার মাসআলা যে শুফআর মাসআলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম তা উল্লেখ করেছেন। ব্যতিক্রমটা এখানে যে, যদি বিক্রয়ের পর ক্রেতা জমিন বাবদ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করে, তাহলে শফী' জমিন নিলে সেই বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে বাধ্য নয়; বরং শফী' নির্ধারিত মূল্যেই জমিন নিতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ তিন লক্ষ টাকায় জমিন কেনার পর বিক্রেতাকে পঁচিশ হাজার টাকা বেশি দিল। এখন উক্ত জমিনে যদি কেউ শুফআ দাবি করে নিতে চায়, তাহলে সে তিন লক্ষ টাকাতেই নেবে। বর্ধিত মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা তাকে প্রদান করতে হবে না। কারণ, শফীর হক [প্রাপ্ত অধিকার] প্রথম চুক্তির সাথেই যুক্ত হয়ে গেছে। যেমন– তিন লক্ষ টাকায় প্রথম চুক্তি যখন হলো শফীর অধিকার উক্ত তিন লাখ টাকার সাথেই সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। এরপর বর্ধিত মূল্য প্রদান করা হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা। এখন যদি উক্ত পঁচিশ হাজার টাকা শফীর উপর আরোপ করা হয়, তাহলে তার প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করা আবশ্যক হয়। তাছাড়া এর দ্বারা শফী' আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষে অন্যের অধিকার বাতিল করার কোনোই অধিকার নেই এজন্য আলোচ্য মাসআলায় বর্ধিত মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্ষেত্রে যদিও মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, কিন্তু শফী'-এর ক্ষেত্রে তা হবে না। কেননা, বর্ধিত মূল্য যুক্ত করলে শফী' ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيْعِ الخ : লেখক বলেন, উপরিউক্ত বিধান বিক্রেয়পণ্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রেয়পণ্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জাহের রেওয়ায়েত মতে মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার দুই অবস্থা–

১. প্রকৃতভাবে বিনষ্ট হওয়া। যেমন– মৃত্যুবরণ করা অথবা পণ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া।

২. হুকুমের দিক থেকে বিনষ্ট হওয়া। যেমন– গোলামকে ক্রেতা আজাদ করে দিল/মুদাব্বার বানিয়ে দিল/ মোকাতাব বানিয়ে দিল ইত্যাদি। কিংবা পণ্য বিনষ্ট হলো বিক্রয়/ দান/ ভাড়া প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে। উভয় বিনষ্টের অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না। কারণ, বৃদ্ধি যার উপর করবে সেই ক্ষেত্রই তো এখন নেই। যেমন– মোহরের মধ্যে বৃদ্ধি করার জন্য শর্ত হলো বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকা। যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় অথবা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে মোহরের পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় না।

তবে যদি বকরি ক্রয় করে আর সেই বকরিকে জবাই করে ফেলে তারপর ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহলে তা বৈধ। এমনিভাবে যদি কেউ পণ্য ক্রয় করে ভাড়া দিয়ে দেয় কিংবা বন্ধক রাখে, তাহলেও তাতে বৃদ্ধি করা বৈধ। অদ্রূপ কেউ যদি কাপড় সেলাই করে/ লোহা কিনে তা তরবারি বানিয়ে ফেলে/ ক্রয়কৃত গোলামের হাত কেটে ফেলে উক্ত সব অবস্থায় মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ। এরপর লেখক বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য বৃদ্ধি করার যে অবৈধতার কারণ বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, لِأَنَّ الْمَبِيْعَ لَمْ يَبْقَ عَلَى حَالَةٍ يَصِحُّ الْإِعْتِيَاضُ عَنْهُ অর্থাৎ 'কেননা, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর বিক্রয় এমন অবস্থাতে থাকে না যে, তার বিনিময় গ্রহণ করা যেতে পারে।' কারণ, বিদ্যমান-স্বমূর্তিতে অবস্থানকারী দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা যায়। অস্তিত্বহীন বা অবর্তমান দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা যায় না। এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো, প্রথমে কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করবে তারপর তার দিকে অন্য কিছুকে সম্পর্কিত করা হয়। আলোচ্য মাসআলায় পণ্য নেই এজন্য মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না, যেহেতু মূল্য বৃদ্ধিই বৈধ নয় তাই মূল্য বৃদ্ধি করে সেটাকে মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা যাবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَطِّ، لِأَنَّهُ بِحَالٍ يُمْكِنُ الخ : লেখক বলেন, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য হ্রাস করা বৈধ এবং তা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত করা যায়। কেননা, মূল্য হ্রাস করার অর্থ হচ্ছে মূল্য বাদ দেওয়া। আর কোনো কিছু বাদ দেওয়ার জন্য তার বিনিময়ের উপস্থিতি আবশ্যক নয়। কারণ, হ্রাসকরণ তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়ে থাকে। আর কার্যকর হওয়ায় তা মূল চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, মূল্য হ্রাসের সুরতে অবশ্য মূল্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর মূল্য সবসময় বহাল থাকে তাই হ্রাসকরণ শুদ্ধ হবে। যেমন– এর নজির দেখতে পাই পণ্যের মাঝে দোষ পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ক্রয়কৃত পণ্যে দোষ থাকার কথা যদি ক্রেতা জানতে পারে আর ততদিনে পণ্য বিনষ্ট হয়ে থাকে, তবু পণ্যের দোষের কারণে মূল্য হ্রাস করা যায়। এ ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধিত থাকলে ক্রেতা মূল্যের দোষজনিত ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। সারকথা হচ্ছে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর এ মাসআলাতে দোষের কারণে মূল্য হ্রাস করা যেহেতু বৈধ হচ্ছে, সুতরাং আমাদের মাসআলাতেও তা করা বৈধ হবে। প্রকাশ থাকে যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য বৃদ্ধি করা অবৈধ হওয়ার বিষয়টি জাহের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়। তবে এ ব্যাপারে নাওয়াদির রেওয়ায়েত ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্য বিনষ্ট হওয়ার পর মূল্য হ্রাস করা যেমন বৈধ, তেমনি মূল্য বৃদ্ধি করাও বৈধ।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ أَجَلًا مَعْلُوْمًا صَارَ مُؤَجَّلًا، لِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ تَيْسِيْرًا عَلٰى مَنْ عَلَيْهِ، أَلَا يَرٰى أَنَّهُ يَمْلِكُ إِبْرَاءَهُ مُطْلَقًا فَكَذَا مُوَقَّتًا، وَلَوْ أَجَّلَهُ إِلٰى أَجَلٍ مَجْهُوْلٍ إِنْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ مُتَفَاحِشَةً كَهُبُوْبِ الرِّيْحِ لَا يَجُوْزُ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কেউ নগদ মূল্যে কোনো কিছু বিক্রয় করে, তারপর সে [মূল্য পরিশোধের জন্য] নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে, তাহলে তা মেয়াদিতে পরিণত হবে। কেননা, ধার্য মূল্য (ثَمَنٌ) তার প্রাপ্য অধিকার, সুতরাং দেনাদারের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্যে সেটাকে বিলম্বিত করার এখতিয়ার তার রয়েছে। এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, বিক্রেতা দেনাদারকে তার দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারে, অনুরূপভাবে সে পাওনাকে মেয়াদিও করতে পারবে। আর যদি সে অনির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করে এবং সেই অনির্দিষ্টতা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত থাকে যেমন [বলা হয়–] মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত, তাহলে অবৈধ হবে। আর যদি মেয়াদ সামান্য অজ্ঞাত হয় যেমন– ফসল কাটার সময় ও ফসল মাড়ানোর সময়, তাহলে বৈধ হবে। কেননা, এ অজ্ঞতা তো কারো জামিন হওয়ার মতো, ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক বিক্রয়চুক্তিকে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত মাসআলা আলোচনা করেছেন।

সূরতে মাসআলা হলো, এক ব্যক্তি নগদানভাবে কোনো কিছু বিক্রি করল। অর্থাৎ নগদ চুক্তি করল, তারপর ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় দিল, যেমন বলল, রবিউল আউয়ালের পঁচিশ তারিখের ভিতর তুমি মূল্য পরিশোধ করবে। তাহলে উক্ত মেয়াদ দেওয়া অর্থাৎ নগদান চুক্তিটিকে বাকি চুক্তিতে রূপান্তরিত করা বৈধ। ইমাম মালিক (র.)-ও এরূপ মত প্রকাশ করেন।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা হলেও মূল্য বাকিতে রূপান্তরিত হবে না; বরং চুক্তিটি পূর্বাবস্থায় তথা নগদানরূপে বহাল থাকবে। তাঁদের মতে মেয়াদ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ মূল্য দাবি করতে পারবে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, ক্রয়মূল্য ক্রেতার দায়িত্বে ঋণ গণ্য হয়। ঋণকে قَرْض [ধার]-এর উপর কিয়াস করা হয়েছে। ধার যেমনভাবে মেয়াদি করলেও মেয়াদি হয় না, তদ্রূপ ক্রয়মূল্য ক্রেতা মেয়াদি করলেও মেয়াদি হবে না। করজদার যে কোনো মুহূর্তে তার ঋণগ্রহীতার কাছে পাওনা চাইতে পারবে।

আহনাফের দলিল সম্পর্কে লেখক বলেন, ক্রয়মূল্য হচ্ছে বিক্রেতার প্রাপ্য হক বা অধিকার। প্রত্যেক হকদার যেমন তার অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে তদ্রূপ বিক্রেতাও তার হকের ব্যাপারে এ ক্ষমতা অবশ্যই রাখে যে, সে তার অধিকার বিলম্বিত করে ক্রেতাকে কিছুটা সুবিধা দান করবে। যেমন এখানে মূল্য পরিশোধের সময় একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করার মাধ্যমে সুযোগ দান করেছে।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিল হলো, ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, সেই মেয়াদ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতার কাছে মূল্য চাওয়া থেকে ক্রেতাকে পরিত্রাণ দেওয়া। এখন সেই মেয়াদ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তার কাছে কোনো কিছু চাওয়া হবে না। ইতঃপূর্বে আমরা জেনেছি যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে সম্পূর্ণ মূল্য থেকে রেহাই দিতে পারে, তাহলে তো তার এ অধিকার নিশ্চয়ই আছে যে, সে ক্রেতাকে পাওনার তাগিদ করা থেকে মুক্ত রাখবে। অর্থাৎ যেহেতু বিক্রেতা ক্রেতাকে শরিয়তসম্মতভাবে মূল্য থেকে রেহাই দিতে পারবে, অতএব তাকে মূল্য পরিশোধের তাগিদ করা থেকে স্বাভাবিকভাবেই রেহাই দিতে পারবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَجَّلَهُ اِلٰى اَجَلٍ مَجْهُوْلٍ الخ : এরপর লেখক বলেন, যদি মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো অনির্ধারিত সময় দেয়, তাহলে আবার দু সুরত–

১. অনির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অর্থাৎ এতে অজ্ঞতার মাত্রা খুবই বেশি। যেমন বলল, মূল্য পরিশোধের সময় হচ্ছে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় অথবা বৃষ্টি বর্ষণের সময়।

২. অনির্দিষ্টতার মাত্রা কম, যেমন কেউ বলল, ফসল কাটার সময়/ফসল মাড়ানির সময় ইত্যাদি। লেখক বলেন, অজ্ঞতা যদি সামান্য তথা দ্বিতীয় পর্যায়ের হয়, তাহলেও মেয়াদি করা বৈধ। তবে যদি অজ্ঞতার মাত্রা বেশি হয় তথা প্রথম পর্যায়ের হয়, তাহলে অবৈধ হবে।

প্রথম সুরতে বিক্রেতা যে কোনো সময় মূল্য পরিশোধের দাবি করতে পারে, আর দ্বিতীয় সুরতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত মূল্য পরিশোধের দাবি করতে পারবে না। এর দলিল সম্পর্কে লেখক বলেন, لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ অর্থাৎ বিক্রয়ের পর মূল্য মেয়াদি করা কাফালাহ [জামিন হওয়া]-এর পর্যায়ভুক্ত। কাফালাহ সম্পর্কে ফাসিদ বিক্রয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কাফালাহ-এর মধ্যে সামান্য অজ্ঞতা ক্ষতিকর নয়, তদ্রূপ এখানেও সামান্য অজ্ঞতা ক্ষতির কারণ নয়। কাফালাহ মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞতা দ্বারা যেরূপ বাতিল হয়ে যায়, তেমনি মূল্য পরিশোধের মেয়াদ খুব বেশি অজ্ঞাত থাকলে মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে যদি কেউ বিক্রয়চুক্তির মধ্যে মেয়াদের শর্তারোপ করে, তাহলে সেই মেয়াদ স্বল্প অজ্ঞাত হোক কিংবা বেশি অজ্ঞাত হোক বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلاً لِمَا ذَكَرْنَا ، إِلَّا الْقَرْضَ فَإِنَّ تَأْجِيْلَهُ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَصِلَةٌ فِي الْإِبْتِدَاءِ حَتَّى يَصِحَّ بِلَفْظَةِ الْإِعَارَةِ وَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْوَصِيِّ وَ الصَّبِيِّ، وَمُعَاوَضَةٌ فِي الْإِنْتِهَاءِ فَعَلَى اِعْتِبَارِ الْإِبْتِدَاءِ لَا يَلْزَمُ التَّأْجِيْلُ فِيْهِ، كَمَا فِي الْإِعَارَةِ إِذْ لَا جَبْرَ فِي التَّبَرُّعِ، وَعَلَى اِعْتِبَارِ الْإِنْتِهَاءِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَسِيْئَةً، وَهُوَ رِبًوا ، وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصٰى أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فُلَانًا إِلٰى سَنَةٍ، حَيْثُ يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ مِنْ ثُلُثِهِ أَنْ يُقْرِضُوْهُ وَلَا يُطَالِبُوْهُ قَبْلَ الْمُدَّةِ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنٰى فَيَلْزَمُ حَقًّا لِلْمُوْصِيْ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রত্যেক নগদ পাওনাকে প্রাপক যদি মেয়াদি করে দেয়, তাহলে তা মেয়াদি হয়ে যাবে। এর দলিল [ইতঃপূর্বে] বর্ণনা করেছি। তবে ঋণ [ধার] এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে মেয়াদি করা বৈধ নয়। এর কারণ হলো, এটা সূচনালগ্নে আরিয়াত ও দান– এজন্যই তো আরিয়াত (اَلْإِعَارَةُ) শব্দ দ্বারা এটা সংঘটিত হয়ে যায়। যে দান করার অধিকার রাখে না সে ঋণ দান করতে পারে না। যেমন– অছি [উইলকারী] ও শিশু। আর ঋণ পরিণামে বিনিময়-চুক্তি। প্রথমাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে এতে মেয়াদ প্রদান সম্ভব নয় যেমন আরিয়াতের মাঝে। কারণ, দানের ক্ষেত্রে জবরদস্তি হয় না। আর পরিণাম বিচারেও তা বৈধ নয়। কারণ, এটা দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এটা রিবা [সুদযুক্ত বিক্রয়]। এর ব্যতিক্রম হলো, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অসিয়ত করে গেল যে, অমুক ব্যক্তিকে তার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম এক বছরের জন্য ধার দেবে, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের উপর তার মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধার দেওয়া আবশ্যক হবে এবং তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তার কাছে ধার [ফেরত] চাইবে না। কেননা, এটা দানের অসিয়ত, যা দাস-দাসীর খিদমত ও বাড়িতে বসবাস করার অসিয়তের মতো। সুতরাং এটা অসিয়তকারীর হক হিসেবে অবশ্যপালনীয় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إِذَا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে লেখক ধার প্রদানের পর সেটাকে মেয়াদি করা যাবে কিনা ? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমেই আমাদের دَيْن ও قَرْض -এর মাঝে কি পার্থক্য তা জেনে নেওয়া উচিত :

دَيْن -এর সংজ্ঞা হলো, مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ অর্থাৎ কারো জিম্মায় যে আর্থিক দায় রয়েছে তাকেই দায়ন বলা হয়। চাই সে দায় কোনো চুক্তির কারণে হোক কিংবা কারো কোনো জিনিস বিনষ্ট করার দ্বারা হোক।

আর قَرْض বলা হয় দ্রব্য বা অর্থকে যা মানুষ তার নিজ মাল-সম্পদ থেকে অন্যের উপকারের জন্য প্রদান করে। তবে কর্জ গ্রহণকারীর জিম্মায় যা থাকে তাকে দায়ন বলা হয়। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কর্জ ছাড়া অন্য যত প্রকার ঋণ রয়েছে তা যদি নগদ প্রাপ্য হয়, তাহলে ঋণদাতা ইচ্ছা করলে সেটাকে মেয়াদি করতে পারে। এর দলিল ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, দায়ন-ঋণ হচ্ছে প্রাপকের হক। আর প্রত্যেক হকদার তার হকের মধ্যে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে। হকদার তার প্রাপ্য হক ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিতে পারে। সুতরাং ঋণগ্রহীতার উপকারার্থে সে তার নগদ প্রাপ্যকে বাকিতে ও মেয়াদে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ সে তার নগদ পাওনাকে বাকিতে রূপান্তর করতে পারে, সে অধিকার তার রয়েছে।

তবে قَرْض [ধার]-এর ব্যাপারটি এর ব্যতিক্রম। যদি ধারের ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনাকে মেয়াদি করতে চায়, তাহলে তা ঠিক হবে না এবং উক্ত মেয়াদ গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং কর্জদাতা তৎক্ষণাৎ তার ঋণ উসূলের দাবি করতে পারবে। যদি কেউ কর্জ দেওয়ার সময় নির্ধারণ করে, তাহলে তার কর্জ দান শুদ্ধ হবে, কিন্তু মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর মতে মেয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ হবে, কারণ গ্রহীতার জিম্মায় যখন চলে এসেছে তখন তা অন্যান্য ঋণের মতোই হয়ে গেছে। সুতরাং অন্যান্য ঋণ যেমন মেয়াদি করা যায় এটাও করা যাবে। যদি কর্জদাতা মৃত্যুবরণ করে তারপর উত্তরাধিকারীগণ কর্জকে মেয়াদি করে, তাহলে কাযীখানের সুস্পষ্ট বর্ণনানুযায়ী মেয়াদ শুদ্ধ হবে না যেমন কর্জদাতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়নি। সহীহ মতানুযায়ী কর্জ বিনষ্ট হওয়ার পূর্বের ও পরের কোনো অবস্থাতেই মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েজ নেই।
মেয়াদ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কর্জ বিনষ্ট হওয়া বা না হওয়া উভয়ই বরাবর। লেখক কর্জের মধ্যে মেয়াদ নির্ধারণ নাজায়েজ হওয়ার দলিল প্রদান করেন এভাবে যে, لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَصِلَةٌ فِي الْاِبْتِدَاءِ অর্থাৎ 'কর্জ সূচনাতে আরিয়ত ও দান।' এটা আরিয়ত– এর দলিল হলো, ঋণ-কর্জদাতা ব্যক্তি যদি أَقْرَضْتُكَ -এর স্থলে أَعَرْتُكَ বলে, তাহলে তার কর্জদান শুদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দলিল হলো, যে বা যারা দান করতে পারে না তাদের জন্য কর্জ দেওয়াও বৈধ নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হলো যে, কর্জ সূচনালগ্নে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত দান। কিন্তু সেই সাথে পরিণামে কর্জ হচ্ছে লেন-দেন বা বিনিময়। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় [কর্জ হচ্ছে] দান ও পরিণামে লেনদেন। কেননা, মানুষ কাউকে এজন্য ধার দেয় না যে, ধারগ্রহীতা পরে উক্ত ধার দেওয়া বস্তুটি কিংবা তার বদল অবশ্যই ফেরত দেবে। এজন্য কর্জ গ্রহণকারীর উপর সেই বস্তু প্রদান করা আবশ্যক নয় যা কর্জদাতার থেকে গ্রহণ করেছিল; বরং তার উপর আবশ্যক হচ্ছে সেই কর্জের বদল প্রদান করা, যেহেতু কর্জের বদল প্রদান করা আবশ্যক সেহেতু এটা নিঃসন্দেহে একটা লেন-দেন চুক্তি।
এখানে লক্ষণীয় ব্যাপর হলো, কর্জের মধ্যে ফিক্হবিদগণ উভয় অবস্থার প্রতি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিয়েছেন। সে মতে লেখক বলেন, যেহেতু সূচনাতে এটা দান, অতএব এতে কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা যাবে না। মেয়াদ নির্ধারণ করলেও এর কোনো গুরুত্ব থাকবে না এবং তা কার্যকর হবে না। কর্জ-এর উদাহরণ হচ্ছে আরিয়ত অর্থাৎ আরিয়ত যেমনটা মেয়াদি করতে চাইলে মেয়াদি করা যায় না তদ্রূপ কর্জ মেয়াদি করতে চাইলে মেয়াদি করা যাবে না। কর্জ ও আরিয়ত দেওয়ার পর যদি মেয়াদের আলোচনা করে তারপরও উভয় পাওনাদার তৎক্ষণাৎ তাদের পাওয়া চেয়ে নিতে পারবে। কারণ, আরিয়ত প্রদান হচ্ছে এক ধরনের দান, আর দানের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যদি মেয়াদ এতে নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলে এটা ধারদাতার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ ধারদাতা তার পাওনা নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে চাইতে পারবে না। আর এটা স্পষ্টত চাপ সৃষ্টি করা। মোটকথা, ধার বা কর্জ প্রদান যেহেতু এক ধরনের দান সেহেতু এটাকে মেয়াদ দ্বারা নির্ধারণ করা বৈধ হবে না। যেমন– আরিয়ত প্রদানের পর মেয়াদ দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় না।
এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দলিল– مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ অর্থাৎ 'উত্তম ও দানশীলদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।' যদি মেয়াদ দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলো। সুতরাং আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মেয়াদ আরোপের মাধ্যমে কর্জ চাওয়ার অধিকার বিলম্বিত করা যাবে না। লেখক তার দাবি প্রমাণে দ্বিতীয় দলিল দেন এভাবে যে, وَعَلَى اعْتِبَارِ الْاِنْتِهَاءِ لَا يَصِحُّ অর্থাৎ 'কর্জের পরিণাম বিচারেও মেয়াদ নির্ধারণ করা নাজায়েজ।' কেননা, মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে পরিণাম বিচারে কর্জ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَسِيْئَةً অর্থাৎ 'বাকিতে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি করা আবশ্যক হবে।' যা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। কারণ, এতে সুদ পাওয়া যায়।
তবে এখানে স্মরণীয় যে, কর্জ পরিণতি বিচারে একটি মুদ্রা বিনিময়ের লেনদেন বিবেচিত হয় আর তা এখানে উপস্থিত লেন-দেন হিসেবে হয়নি; বরং বাকিতে হয়েছে এজন্য এটাও সুদের কারণে অবৈধ হওয়াই সমীচীন ছিল, কিন্তু ইসলামি শরিয়তে কর্জ প্রদান পুণ্যের কাজ ও রাসূলের সুন্নত এবং এর শুদ্ধতা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। উপরিউক্ত কারণে আমরা কর্জের প্রাসঙ্গিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে বৈধ সাব্যস্ত করেছি এবং এর মধ্যে মেয়াদ সাব্যস্ত করাকে অবৈধ করেছি।
قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصٰى أَنْ يُقْرِضَ الخ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে লেখক একটি ব্যতিক্রমি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি হলো, এক ব্যক্তি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এ অসিয়ত করল যে, আমার সম্পদ থেকে দশ হাজার টাকা এক বছরের মেয়াদে খালিদকে প্রদান করবে, তাহলে এ কর্জ প্রদান শুদ্ধ হবে এবং এর মেয়াদও আবশ্যক হবে এবং উক্ত ব্যক্তির মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কর্জ প্রদান করা হবে এবং এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে সেই কর্জ পরিশোধের দাবিও করতে পারবে না। এ মাসআলা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কর্জকে মেয়াদ দ্বারা নির্ধারণ করা যায় এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই কর্জ চাওয়া যায় না। ব্যতিক্রমি মাসআলাটির কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, এটা তো একটা অনুগ্রহ সংক্রান্ত অসিয়ত। অসিয়ত ও সাধারণ অবস্থার মাঝে অনেক তফাৎ অসিয়তের এমন অনেক কিছুই বৈধ, যা সাধারণ অবস্থায় বৈধ নয়। যেমন– কর্জের অসিয়ত করলে এতে মেয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ অথচ সাধারণ কর্জের মধ্যে মেয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তদ্রূপ কেউ যদি অসিয়ত করে অমুক আমার ঘরে এক বছর থাকবে কিংবা আমার গোলামের এক বছর খিদমত পাবে, তাহলে উক্ত অসিয়ত কার্যকর হয়ে যায়। অথচ কেউ যদি তার ঘর অথবা গোলাম এক বছরের জন্য আরিয়ত [ধার] দেয়, তাহলে তা বৈধ নয়। এর কারণ হচ্ছে, অসিয়তের মধ্যে উদারতা বিদ্যমান। এতটা উদারতা অন্য কোথাও নেই। এমনই আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, যেমন কেউ তার বাগানের ফলগুলো অসিয়ত করে গেল, তাহলে ফল না থাকা সত্ত্বেও অসিয়ত কার্যকর হবে। অসিয়তের ক্ষেত্রে এসব বৈধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, অসিয়তকারীর উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানির দ্বার খুলে দেওয়া, যাতে অসিয়তকারী মৃত্যুর পর পুণ্য লাভে সক্ষম হয়। সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

بَابُ الرِّبٰوا

قَالَ : اَلرِّبٰوا مُحَرَّمٌ فِىْ كُلِّ مَكِيْلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ إِذَا بِيْعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً، فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ أَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ، قَالَ (رضـ) : وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ الْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا، وَعَدَّ الْأَشْيَاءَ السِّتَّةَ : اَلْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ عَلٰى هٰذَا الْمِثَالِ، وَيُرْوٰى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ "مِثْلُ"، وَبِالنَّصْبِ "مِثْلاً"، وَمَعْنَى الْأَوَّلِ بَيْعُ التَّمْرِ وَمَعْنَى الثَّانِىْ بِيْعُوْا التَّمْرَ ـ

পরিচ্ছেদ : 'রিবা' বা সুদ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পাত্র-পরিমাপিত ও ওজন-পরিমাপিত যে কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'রিবা' হারাম হবে যখন উক্ত দ্রব্য সমশ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং আমাদের নিকট 'রিবা' হওয়ার কারণ বা 'ইল্লাত' হলো, [উভয় দ্রব্য] পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং [উভয় দ্রব্য] একই শ্রেণী (جِنْس)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। গ্রন্থকার (র.) বলেন, [সংক্ষেপে] এভাবে বলা যেতে পারে যে, ['রিবা' হারাম হওয়ার কারণ বা 'ইল্লাত' হলো, উভয় দ্রব্যের] পরিমাপের মাধ্যম এবং শ্রেণী এক হওয়া। আর এভাবে বলাই অধিকতর সর্বাঙ্গীন। 'রিবা'-এর বিধানের ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো, প্রসিদ্ধ হাদীস। আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর এই বাণী– "গমের বিনিময়ে গম [বিক্রয়] সমানের বিনিময়ে সমান হতে হবে এবং হাতে হাতে আদান-প্রদান হতে হবে। আর অতিরিক্ত অংশ 'রিবা' হবে।" নবী করীম ﷺ [পূর্ণ হাদীসটিতে] ছয়টি দ্রব্য যথা– গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা, ও রূপাকে একই ধারায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি [مِثْلُ শব্দটি] দুভাবে বর্ণিত হয়েছে, ১. مِثْلُ শব্দটি رَفْع বা পেশযুক্ত হয়ে। ২. مِثْلاً বা نَصْب তথা যবরযুক্ত হয়ে। প্রথম রেওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থ হলো, খেজুর বিক্রয় হতে হবে সমান সমান পরিমাণের ভিত্তিতে। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থ হলো, তোমরা খেজুর বিক্রয় কর সমান সমান পরিমাণের ভিত্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : 'রিবা'-এর আভিধানিক অর্থ : رِبٰوا-এর আভিধানিক অর্থ হলো, اَلزِّيَادَةُ وَالْاِرْتِفَاعُ – বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া, উঁচু হওয়া। যেমন বলা হয়– هٰذَا يَرْبُوْ عَلٰى ذٰلِكَ "এটা ওটার চেয়ে বেশি বা অতিরিক্ত"। এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন– وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ "তোমরা মানুষের সম্পদের মাঝে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে রিবা প্রদান করে থাক তা আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃদ্ধি পায় না।" এজন্যই উঁচু

জায়গাকে رَبْوَةٌ বলা হয়। কেননা, তা অন্যান্য স্থান থেকে উঁচু বা উচ্চতার দিক থেকে অতিরিক্ত। উল্লেখ্য, رِبُوا শব্দটি কখনো অতিরিক্ত বস্তুটির (نَفْسُ الزَّائِدِ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا। আবার কখনও মাসদার অর্থাৎ বৃদ্ধি করা বা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

'রিবা'-এর পারিভাষিক অর্থ : هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِىْ عَنِ الْعِوَضِ الْمَشْرُوْطِ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِىْ مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ "সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের চুক্তির ক্ষেত্রে এমন অতিরিক্ত অংশকে 'রিবা' বলে, যা চুক্তিকারীদ্বয়ের কোনো এক পক্ষের জন্য শর্ত করা হয়েছে এবং সে অংশের বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে কিছুই দেওয়া হয় না।" এখানে অতিরিক্ত অংশ বলতে দৃশ্যত অতিরিক্ত এবং বিধানগত (حُكْمًا) অতিরিক্ত উভয়টাই উদ্দেশ্য, সুতরাং এক পরিমাণের দ্রব্য একটা নগদ আর একটা বাকি হলে তাও বিধানগতভাবে অতিরিক্ত হয়ে 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

দুররে মুখতার গ্রন্থে সংজ্ঞাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوْطٍ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِى الْمُعَاوَضَةِ .

'রিবা'-এর বিধান : 'রিবা' সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর 'রিবা' হারাম করে দিয়েছেন।" অন্য এক আয়াতে বলেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا "হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রিবা' [সুদ] ভক্ষণ কর না।"

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে 'রিবা' গ্রহণকারীদের পাঁচটি পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. اَلتَّخَبُّطُ 'অপ্রকৃতিস্থ ও অনুভূতিহারা হওয়া'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ "যারা 'রিবা' [সুদ] ভক্ষণ করে তারা [কিয়ামতের দিবসে] কেবল ঐ ব্যক্তির মতো হয়েই উঠবে যাকে শয়তান অপ্রকৃতিস্থ বা অনুভূতিহারা করে ফেলেছে।"

২. اَلْمَحْقُ 'নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا "আল্লাহ 'রিবা'কে নিশ্চিহ্ন করে দেন [অর্থাৎ তার বরকত ও কল্যাণ দূর করে দেন।]"

৩. اَلْحَرْبُ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ "যদি তোমরা 'রিবা' পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"

৪. اَلْكُفْرُ 'কুফরি কার্য হওয়া'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ "যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে যা 'রিবা' [সুদ] পাওনা হিসেবে বাকি রয়েছে তা পরিত্যাগ কর।" অর্থাৎ 'রিবা' হারাম করার পরও যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না করো, তাহলে [প্রকৃত] মু'মিন নও।

৫. اَلْخُلُوْدُ فِى النَّارِ 'চিরদিন জাহান্নামে থাকা'। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ "যারা পুনরায় 'রিবা'-এর দিকে ফিরে যাবে তারা জাহান্নামবাসী হবে, সেখানে তারা চিরদিন [কিংবা দীর্ঘ দিন] থাকবে।" এছাড়া হাদীসে নবী করীম ﷺ যারা 'রিবা' [সুদ] গ্রহণ করে কিংবা প্রদান করে বা 'রিবা'-এর চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে অথবা 'রিবা'-এর চুক্তির সাক্ষী থাকে তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে– لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُؤْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ "নবী করীম ﷺ 'রিবা' ভক্ষণকারী, তা প্রদানকারী, তার সাক্ষীদ্বয় এবং তা লিপিবদ্ধকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।"

পূর্ব পরিচ্ছেদের সাথে এ পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক :

'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের সাথে পূর্বের পরিচ্ছেদের ধারাবাহিকতার সম্পর্ক হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়ের শুরু হতে 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত পরিচ্ছেদগুলোতে মুসান্নিফ (র.) সে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের [সহীহ ও ফাসিদ সুরত সহকারে] আলোচনা করেছেন যা فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ "অতঃপর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।" আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ পরিচ্ছেদে ঐ সকল ক্রয়-বিক্রয়ের

আলোচনা শুরু করছেন যা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে নিষেধ করা হয়েছে– يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا "হে মু'মিনগণ! তোমরা 'রিবা' ভক্ষণ কর না।" আর নিষেধ সাধারণত আদেশের পরে হয়ে থাকে, তাই 'রিবা'-র আলোচনা পরে করেছেন।

এছাড়া 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের পূর্বের পরিচ্ছেদ 'মুরাবাহা' বিষয়ক (بَابُ الْمُرَابَحَةِ) -এর সাথে বিশেষ ধারাবাহিকতার সম্পর্ক হলো, 'রিবা' এবং 'মুরাবাহা'-এর উভয়ের মাঝে এক পক্ষে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু 'মুরাবাহা'-এর মাঝে যে অতিরিক্ত হয়ে থাকে তা হচ্ছে হালাল, আর 'রিবা'-এর মাঝে যে অতিরিক্ত হয়ে থাকে তা হয় হারাম। তাই মুরাবাহার মাসআলাসমূহ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তারপর 'রিবা'-এর আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, সকল বস্তুর ক্ষেত্রে হালাল হওয়া-ই হলো তার মূল অবস্থা, তাই হালালের মাসআলাগুলো আগে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ : اَلرِّبٰوا مُحَرَّمٌ فِيْ كُلِّ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্য পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং যে সকল দ্রব্য ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় এ দু ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উভয় দিকে একই শ্রেণীর দ্রব্য হয় যেমন [ধানের বিনিময়ে ধান কিংবা গমের বিনিময়ে গম] আর তা কমবেশি করে বিক্রয় করা হয়, তাহলে 'রিবা' [যার সংজ্ঞা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে] হারাম হবে। সারকথা হলো, 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য দুটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হবে–

১. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন হতে হবে, যা পাত্র দ্বারা মেপে পরিমাপ করা হয় অথবা ওজন মেপে পরিমাপ করা হয়।

২. উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হতে হবে।

قَوْلُهُ فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ الخ : সুতরাং আমাদের নিকট তথা হানাফীগণের নিকট 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো, উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং তাদের শ্রেণী এক হওয়া কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং তাদের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া। অর্থাৎ 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো দুটি গুণের সমষ্টি। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত না হয় কিংবা উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত না হয় যেমন তেলের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করল তাহলে 'রিবা' [এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া] হারাম হবে না। কেননা, তেল হলো পাত্র-পরিমাপিত আর স্বর্ণ হলো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। তদ্রূপ যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক না হয়, তাহলেও 'রিবা' হারাম হবে না। যেমন– গমের বিনিময়ে যব বিক্রয় করল।

উল্লেখ্য, উক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) وَالْعِلَّةُ না বলে فَالْعِلَّةُ বলেছেন [অর্থাৎ শুরুতে ف এনেছেন যার অর্থ 'সুতরাং'] এর কারণ হলো, কোনো বিধান যদি إِسْمٌ مُشْتَقٌّ বা গুণবাচক শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয় তাহলে তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, উক্ত إِسْمٌ مُشْتَقٌّ-এর مَأْخَذُ اِشْتِقَاقٍ বা তার মূল গুণটিই হলো এই বিধানের 'ইল্লাত' (عِلَّتٌ) বা কারণ। সুতরাং পূর্বের ইবারতে যখন 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধানটি 'একই শ্রেণীভুক্ত পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত' দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তখন তা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বিধানটির ইল্লাত (عِلَّتٌ) বা কারণ হলো, পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং তার সাথে শ্রেণী এক হওয়া। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) فَالْعِلَّةُ বলেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ أَشْمَلُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'রিবা'-এর 'ইল্লাত' اَلْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ وَالْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ না বলে তার পরিবর্তে এভাবেও বলা যায় 'রিবা'-এর 'ইল্লাত' হলো, اَلْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ "একই শ্রেণীভুক্ত হয়ে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া।" এভাবে বললে বাক্যটি সংক্ষেপও হয় এবং তা এক কথায় পূর্বের বাক্যের উভয় অংশকে শামিল করে। কেননা, পূর্বের বাক্যে দুটি অংশ ছিল–

১. পাত্র-পরিমাপিত হওয়া এবং শ্রেণী এক হওয়া।

২. অথবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া এবং শ্রেণী এক হওয়া। আর পরবর্তী বাক্যে একটি অংশ, কিন্তু তা উভয়টিকে শামিল করেছে।

তবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, যদিও পরবর্তী বাক্যটি (اَلْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ) সংক্ষেপ ও পূর্বের বাক্যের উভয়টাকে শামিল করে, কিন্তু তা এমন সুরতকেও শামিল করে যা 'রিবা' হারাম হওয়ার আওতাভুক্ত নয়, আর তা হলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এবং গজ-পরিমাপিত দ্রব্য। কেননা, اَلْقَدْرُ বা পরিমাপ মাধ্যম বা পরিমাপ পদ্ধতি এক হওয়া বলতে এ দুটিও শামিল হয়ে যায়। অথচ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এবং গজ-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'রিবা' হারাম নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ فِيْهِ الْحَدِيْثُ الْمَشْهُوْرُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) বা কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল দলিল হলো, নবী করীম ﷺ -এর প্রসিদ্ধ হাদীস- اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًوا "গমের বিনিময়ে গম [বিক্রয় কর] সমান সমান করে হাতে হাতে [নগদ] আর যা অতিরিক্ত হবে তা 'রিবা' হবে।" মুসান্নিফ (র.) হাদীসটির অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন, হাদীসটি ষোল জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে [এর সবগুলোই তিনি হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে 'বিনায়া'তে উল্লেখ করেছেন। কারো কারো মতে হাদীসটি مُتَوَاتِرْ 'মুতাওয়াতির'। তবে তা সঠিক নয়; বরং এটি সনদের দিক থেকে مَشْهُوْر 'মাশহুর' এবং উম্মত এটি সঠিক বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। হাদীসটি একাধিক সাহাবী থেকে বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে একজন সাহাবী থেকে হাদীসটি পূর্ণ আকারে অর্থসহ উল্লেখ করা হলো-

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে হাদীসটি মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ـ

"হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ [বিক্রয় কর] সমপরিমাণের ভিত্তিতে সমান সমান করে, [নগদ] হাতে হাতে। আর যদি এ সকল দ্রব্য উভয় দিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হয়, তাহলে হাতে হাতে [নগদ] হলে যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় কর।"

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে মুসলিম শরীফে ঠিক এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তবে শেষে একটু অংশ অতিরিক্ত রয়েছে তা হলো, فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبٰى "সুতরাং কেউ যদি বেশি প্রদান করে কিংবা বেশি গ্রহণ করে সে 'রিবা' প্রদান করল [বা 'রিবা' গ্রহণ করল]।

قَوْلُهُ وَعَدَّ الْاَشْيَاءَ السِّتَّةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, হাদীসের অংশ হিসেবে গমের কথা যেভাবে বর্ণনা করেছি, নবী করীম ﷺ ছয়টি দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক একইভাবে অর্থাৎ 'সমান সমান করে হাতে হাতে' এ শর্ত সহকারে। সে ছয়টি দ্রব্য হলো, গম, যব, খেজুর, লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্য।

قَوْلُهُ وَيُرْوٰى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ "مِثْلٌ" وَبِالنَّصَبِ "مِثْلاً" الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি اِعْرَابْ-এর দিক থেকে দুভাবে বর্ণিত হয়েছে-

১. উক্ত ছয়টি দ্রব্যের নামের উপর رَفْع এবং مِثْلٌ শব্দটিও পেশ সহকারে।
২. উক্ত ছয়টি দ্রব্যের নামের উপর نَصَبْ এবং مِثْلاً শব্দটিও নসব [যবর] সহকারে। [তবে অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থে নসব সহকারেই বর্ণিত হয়েছে।]

প্রথম সুরতে উহ্য ইবারত এভাবে ধরতে হবে بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ....مِثْلٌ بِمِثْلٍ। তারকীবের দিক থেকে بَيْعُ التَّمْرِ.... মুবতাদা [উদ্দেশ্য] হবে, আর مِثْلٌ بِمِثْلٍ তার খবর [বিধেয়] হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে উহ্য ইবারত এভাবে হবে بِيْعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ....مِثْلاً بِمِثْلٍ। তারকীবের দিক থেকে এ সুরতে اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ.... ছয়টি দ্রব্যের নাম 'মাফউল' হবে, আর مِثْلاً بِمِثْلٍ হবে بِيْعُوا ফে'লের মাফউল থেকে حَالْ, উভয় সুরতের অর্থের পার্থক্য উপরের অনুবাদে স্পষ্ট।

وَالْحُكْمُ مَعْلُوْلٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِسِيْنَ، لٰكِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) اَلطُّعْمُ فِى الْمَطْعُومَاتِ، وَالثَّمَنِيَّةُ فِى الْاَثْمَانِ، وَالْجِنْسِيَّةُ شَرْطٌ، وَالْمُسَاوَاةُ مُخْلِصٌ، وَالْاَصْلُ هُوَ الْحُرْمَةُ عِنْدَهُ، لِاَنَّهُ نَصَّ عَلٰى شَرْطَيْنِ : اَلتَّقَابُضُ وَالْمُمَاثَلَةُ، وَكُلُّ ذٰلِكَ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ وَالْخَطَرِ كَاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِى النِّكَاحِ، فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُنَاسِبُ اِظْهَارَ الْخَطَرِ وَالْعِزَّةِ، وَهُوَ الطُّعْمُ لِبَقَاءِ الْاِنْسَانِ بِهٖ، وَالثَّمَنِيَّةُ لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ الَّتِىْ هِىَ مَنَاطُ الْمَصَالِحِ بِهَا، وَلَا اَثَرَ لِلْجِنْسِيَّةِ فِىْ ذٰلِكَ، فَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا، وَالْحُكْمُ قَدْ يَدُوْرُ مَعَ الشَّرْطِ -

---

অনুবাদ : সকল কিয়াসকারী [মুজতাহিদ]-গণের নিকট উক্ত হাদীসের বিধান [তথা 'রিবা' হারাম হওয়া] 'ইল্লাত'-নির্ভর। তবে আমাদের নিকট কারণ বা 'ইল্লাত' তা-ই, যা আমরা [একটু পূর্বে] উল্লেখ করেছি। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'ইল্লাত' হলো, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে খাদ্যযোগ্যতা, আর মূল্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্যযোগ্যতা। আর উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত স্বরূপ। আর হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী হলো উভয় দ্রব্য সমান সমান হওয়া। তাঁর মতে ['রিবা'-এর মালের মধ্যে] মূল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। কেননা, নবী করীম ﷺ দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন, উভয় পক্ষের নগদ হস্তগত করা, আর উভয় পক্ষে সমান সমান হওয়া। আর [দুটি শর্তের] প্রত্যেকটিই দ্রব্যগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন– বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী শর্ত হওয়া [স্ত্রীর সম্ভোগ-অঙ্গের বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে]। সুতরাং 'রিবা'-এর বিধানের ক্ষেত্রে এমন 'ইল্লাত' নির্ধারণ করতে হবে, যা গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের উপযোগী হয়। সুতরাং তা হলো খাদ্যযোগ্যতা, কেননা খাদ্যের মাধ্যমেই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা হয়। আর [মূল্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে সে 'ইল্লাত' হলো,] মূল্যযোগ্যতা। কেননা, মূল্যযোগ্যতার মাধ্যমেই মাল সম্পদরূপে টিকে থাকে, আর সেই সম্পদের উপরই মানুষের যাবতীয় বৈষয়িক কল্যাণ নির্ভর করে। পক্ষান্তরে গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো প্রভাব নেই। তাই আমরা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে ['রিবা' হারাম হওয়ার জন্য] শর্তরূপে গ্রহণ করেছি। আর বিধান কোনো কোনো ক্ষেত্রে শর্তের সাথেই আবর্তনশীল হয় [অর্থাৎ শর্ত বিদ্যমান থাকলে বিধান সাব্যস্ত হয়, আর শর্ত বিদ্যমান না থাকলে বিধান সাব্যস্ত হয় না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحُكْمُ مَعْلُوْلٌ بِاِجْمَاعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সকল মুজতাহিদ 'কিয়াস'-এর ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত করেন তাদের সকলের ঐকমত্যে উক্ত হাদীসের বিধান তথা 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধানটি مَعْلُوْلٌ বা 'ইল্লাতযুক্ত'। অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যেগুলোতে যে কারণে 'রিবা' হারাম হয়েছে তা নির্ধারণ করে অন্যান্য দ্রব্যর মাঝেও সে কারণ পাওয়া গেলে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধান সাব্যস্ত করা যাবে। পক্ষান্তরে যারা 'কিয়াস' -এর ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না তথা আহলে জাহের এবং ওসমান বাত্তী (র.)-এর মতে 'রিবা' হারাম হওয়ার বিধান কেবল হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে– অন্যান্য দ্রব্যে 'রিবা' হারাম হবে না।

প্রসিদ্ধ চার ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-সহ সকল মুজতাহিদ ইমামগণের মতে বিধানটি 'ইল্লাতযুক্ত'। তবে 'ইল্লাত' কি তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আমরা হানীফীগণের মতে এক্ষেত্রে 'ইল্লাত' হলো তা-ই, যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ উভয় দ্রব্য একই শ্রেণী (جِنْس) -এর হওয়া এবং উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্য ছাড়াও যেখানে এ 'ইল্লাত' বিদ্যমান থাকবে সেখানে 'রিবা' হারাম হবে। যেমন– লোহার বিনিময়ে লোহা বিক্রয় করল, তাহলে এক পক্ষে বেশি হলে তা 'রিবা' হয়ে হারাম হবে। কেননা, তা একই শ্রেণীর দ্রব্য এবং উভয় দিকের দ্রব্যই ওজন-পরিমাপিত।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) اَلطُّعْمُ فِى الْمَطْعُوْمَاتِ الخ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত দ্রব্যগুলোতে 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য ছয়টি দ্রব্যের মধ্য থেকে চারটি তথা খাদ্যদ্রব্য গম, যব, খেজুর, ও লবণের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হলো, খাদ্যযোগ্য হওয়া। আর অপর দুটি তথা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' হলো, মুদ্রা হওয়া। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এমন সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'রিবা' হারাম হবে, যার মাঝে খাদ্যযোগ্যতা কিংবা মুদ্রাযোগ্যতা বিদ্যমান আছে। আর একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়া 'ইল্লাত' নয়, তবে এটি 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে 'রিবা'-এর দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো, হারাম হওয়া। সুতরাং হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী শর্ত যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া না যাবে ততক্ষণ তা মূল অবস্থা তথা হারাম হওয়ার উপরই থাকবে। আর হারাম হওয়া থেকে রক্ষাকারী হলো উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই তাঁর মতে এক মুঠো গমের বিনিময়ে দুই মুঠো গম বিক্রয় করা 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। কিন্তু আমাদের মতে তা হারাম নয়। কেননা, তা শরয়ী পরিমাপের আওতায় পড়ে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ نَصَّ عَلٰى شَرْطَيْنِ اَلتَّقَابُضُ وَالتَّمَاثُلُ الخ : খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হওয়ার স্বপেক্ষ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, 'রিবা' সংক্রান্ত পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি শর্তের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, উভয় দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয়ের নগদ [মজলিসেই] হস্তগত করা, এটি يَدًا بِيَدٍ "হাতে হাতে" শব্দ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আর অপরটি হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য পরিমাণে সমান সমান হওয়া [এটি مِثْلًا بِمِثْلٍ "সমান সমান করে" শব্দ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে।] আর উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরূপ দুটি শর্ত আরোপ করা এ কথা প্রকাশ করে যে, দ্রব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। কেননা গুরুত্বহীন দ্রব্য হলে এরূপ শর্ত আরোপ করা হতো না। যেমন– বিবাহের ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে শর্ত করা হয়েছে যে, বিবাহের আকদের সময় সাক্ষী থাকতে হবে অন্যথা বিবাহ হবে না। বিবাহের ক্ষেত্রে এ শর্ত স্ত্রীর সম্ভোগ-অঙ্গের গুরুত্ব প্রকাশ করে। সুতরাং 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে উক্ত শর্তদ্বয় যখন দ্রব্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রকাশ করে তখন বিধানের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' এমন বিষয়কে নির্ধারণ করা আবশ্যক, যার কারণে দ্রব্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আর তা খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়ার মধ্যে বিদ্যমান আছে। কেননা, খাদ্যের মাধ্যমেই মানুষ জীবন ধারণ করে, খাদ্য না পেলে মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। অতএব তা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। এরূপভাবে মুদ্রা হওয়ার মাধ্যমে বস্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়। কেননা, মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং তার চাহিদা মিটানোর জন্য যে সকল বস্তু প্রয়োজন তা সে মুদ্রার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। কাজেই তা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সুতরাং খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য 'ইল্লাত' হবে। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে جِنْسِيَّةٌ বা একই শ্রেণীর হওয়ার কোনো ভূমিকা নেই। এরূপভাবে قَدْر বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ারও এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা নেই। কাজেই তা 'ইল্লাত' বা কারণ হতে পারে না। তবে নবী করীম ﷺ যেহেতু 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য একই শ্রেণী হওয়াকে ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাই আমরা একই শ্রেণীর হওয়াকে 'রিবা' হারাম হওয়ার জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং 'ইল্লাত' বিদ্যমান হওয়ার পর যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে 'রিবা' হারাম হবে, অন্যথা হারাম হবে না। কেননা, বিধান কখনও শর্তের সাথেই আবর্তিত হয় অর্থাৎ 'ইল্লাত' পাওয়ার পরও শর্ত পাওয়া না গেলে বিধান সাব্যস্ত হয় না, আর পাওয়া গেলে সাব্যস্ত হয়। যেমন– رَجْم বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা বিধানটির 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হলো ব্যভিচার করা, আর তার শর্ত হলো, বিবাহিত হওয়া। সুতরাং ব্যভিচার করা সত্ত্বেও বিবাহিত না হলে তার উপর رَجْم -এর বিধান কার্যকর হয় না।

وَلَنَا اَنَّهُ اَوْجَبَ الْمُمَاثَلَةَ شَرْطًا فِى الْبَيْعِ، وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ بِسَوْقِهِ تَحْقِيْقًا لِمَعْنَى الْبَيْعِ، إِذْ هُوَ يُنْبِئُ عَنِ التَّقَابُلِ، وَ ذٰلِكَ بِالتَّمَاثُلِ، أَوْ صِيَانَةً لِاَمْوَالِ النَّاسِ عَنِ التَّوٰى، أَوْ تَتْمِيْمًا لِلْفَائِدَةِ بِاتِّصَالِ التَّسْلِيْمِ بِهِ، ثُمَّ يَلْزَمُ عِنْدَ فَوْتِهِ حُرْمَةُ الرِّبٰوا، وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِاعْتِبَارِ الصُّوْرَةِ وَالْمَعْنٰى، وَالْمِعْيَارُ يُسَوِّى الذَّاتَ، وَالْجِنْسِيَّةُ تُسَوِّى الْمَعْنٰى، فَيَظْهَرُ الْفَضْلُ عَلٰى ذٰلِكَ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبٰوا، لِأَنَّ الرِّبٰوا هُوَ الْفَضْلُ الْمُسْتَحَقُّ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِى الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِىْ عَنْ عِوَضٍ شُرِطَ فِيْهِ.

অনুবাদ : আর আমাদের দলিল হচ্ছে– উক্ত হাদীসে [উল্লিখিত দ্রব্যগুলো] ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমান হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আর এটাই হাদীসটির বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য। [সমান হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে,] যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত হয়। কেননা, ক্রয়-বিক্রয় (اَلْبَيْعُ) পরস্পরে বিনিময় করার অর্থ বহন করে। আর এ অর্থ উভয় দিকে সমান হওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে। অথবা যাতে মানুষের সম্পদ বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। অথবা যাতে উভয় পক্ষের দ্রব্যের সাথে [নগদ] হস্তান্তর যুক্ত হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা বা উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয়। [অর্থাৎ হাদীসে উভয় পক্ষের সমতা রক্ষা করার জন্য উভয় দ্রব্য নগদ আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমতা পূর্ণভাবে অর্জিত হয়। কেননা, এক পক্ষের দ্রব্য যদি বাকি হয় আর অন্য পক্ষের দ্রব্য নগদ হয়, তাহলে পূর্ণ সমতা হলো না। আর এজন্য এ সমতার শর্ত করা হয়েছে, যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায়। কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে তা কাজে লাগানো। আর এটা দ্রব্যটি হস্তগত করার উপর নির্ভর করে। কাজেই ক্রয়-বিক্রয়ের এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে অর্জন করার জন্যই হাদীসে উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।] আর উক্ত [সমতার] শর্ত না পাওয়া গেলে [হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী] অনিবার্যভাবে 'রিবা' হারাম হবে। আর দুটি বস্তুর মাঝে সমতা সাব্যস্ত হয় দৃশ্যগত দিক থেকে এবং গুণগত দিক থেকে। আর পরিমাপ দুটি দ্রব্যের মাঝে সত্তাগত দিক থেকে সমতা দান করে এবং একই শ্রেণীর হওয়া দুটি দ্রব্যের মাঝে গুণগত দিক থেকে সমতা দান করে। সমতা নির্ণয়ের এ দু ভিত্তিতেই এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া প্রকাশ পাবে এবং তখন 'রিবা' সাব্যস্ত হবে। কেননা, 'রিবা' [সুদ] বলা হয় এমন বিনিময়বিহীন অতিরিক্ত অংশকে, যা বিনিময়চুক্তিতে শর্তের ভিত্তিতে চুক্তিকারীদ্বয়ের একজন প্রাপ্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّهُ اَوْجَبَ الْمُمَاثَلَةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের নিকট 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' যে "উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়া এবং উভয় দ্রব্য পরিমাপের মাধ্যম এক হওয়া তথা পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া" এর স্বপক্ষে দলিল হলো, উপরিউক্ত হাদীসে উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ -এর উক্ত হাদীস বলার মূল উদ্দেশ্যও তাই। তিনটি কারণে সমান সমান করে বিক্রয় করাকে শর্ত করা হয়েছে–

১. بَيْعٌ বা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃত অর্থ বাস্তবায়িত করার জন্য। কেননা, সমান সমান করে বিক্রয় করলেই ক্রয়-বিক্রয়ের সঠিক অর্থ বাস্তবায়িত হয়। কেননা, بَيْعٌ -এর অর্থ হলো, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ "পরস্পরে সম্পদের পরিবর্তে সম্পদ বিনিময় করা।" সুতরাং যদি একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও এক পক্ষে দ্রব্য বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত দ্রব্যটুকুর বিনিময়ে অপর পক্ষ থেকে সম্পদ বিনিময় করা হলো না। ফলে ক্রয়-বিক্রয় (اَلْبَيْعُ)-এর প্রকৃত অর্থ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলো না।

২. মানুষের সম্পদ গচ্ছা যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা, যদি এক পক্ষে দ্রব্য বেশি হয় আর তার বিপরীতে অপর পক্ষ থেকে দ্রব্য না থাকে, তাহলে অতিরিক্ত অংশটুকু তার মালিকের গচ্ছা গেল বা নষ্ট হলো। কেননা, সে অংশটুকুর বিনিময়ে সে কিছুই পেল না।

৩. মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত তৃতীয় কারণটি ভাষ্যকারগণ দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

ক. ক্রয়-বিক্রয়ের ফায়দা বা উদ্দেশ্য হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের প্রত্যেকের অপর দ্রব্য মালিকানা অর্জিত হওয়া এবং তা হস্তগত করার পর তা কাজে লাগানোর অধিকার অর্জিত হওয়া। আর এই ফায়দা উভয় পক্ষে পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার জন্যই শরিয়ত উভয় দ্রব্যে সমতা রক্ষা করার শর্ত আরোপ করেছে। কেননা, যদি এক পক্ষে কম হয়, তাহলে তা হস্তগতকারীর ক্ষেত্রে ফায়দা কম বা অপূর্ণ হবে।

খ. উক্ত হাদীসে যে উভয় দ্রব্য সমান সমান করার শর্ত করা হয়েছে তা পূর্ণ হয় উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করার মাধ্যমে। কেননা, বাকির তুলনায় নগদ হস্তগত করা অধিক লাভের বিষয়। তাই উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করা শর্ত করা হয়েছে, যাতে ক্রয়-বিক্রয়ের যে ফায়দা-অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং তাতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করার অধিকার অর্জিত হওয়া- তা পূর্ণরূপে অর্জিত হয়।

সুতরাং যেহেতু উক্ত দ্রব্যগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য উভয় দিকে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে সেহেতু এক দিকে যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা 'রিবা' হবে। নবী করীম ﷺ ও তা وَالْفَضْلُ رِبًوا বাক্যে 'রিবা' বলে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ بِاعْتِبَارِ الصُّوْرَةِ وَالْمَعْنٰى الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিলের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখ করেছেন। উপরে এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, উভয় দ্রব্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে। আর দুটি দ্রব্যের মাঝে সমতা হয় দুই দিক থেকে–

ক. সুরত বা বাহ্যিক দিক থেকে।

খ. مَعْنٰى বা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে। আর সুরত বা বাহ্যিক দিক থেকে সমতা নির্ধারণ হয় قَدْر বা পরিমাপের মাধ্যমে। আর مَعْنٰى বা আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমতা নির্ধারিত হয় جِنْسِيَّةٌ বা দুটি দ্রব্য একই শ্রেণীর হওয়ার মাধ্যমে। কেননা– আভ্যন্তরীণ বিষয়ের পার্থক্যের কারণেই শ্রেণী ভিন্ন ধরা হয়ে থাকে। [যেমন– একটি সত্যিকার কলা আরেকটি মাটির তৈরি কলা। দুটি একই রকম দেখালেও আভ্যন্তরীণ কারণে উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।] অতএব যদি এক 'পাত্র' গমের বিনিময়ে এক 'পাত্র' গম বিক্রয় করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বাহ্যিক দিক থেকে এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমতা বিদ্যমান হবে।

মোটকথা, উক্ত হাদীসে উভয় দিকে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে। আর সমতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা হলো দুটি বিষয়ের, ১. قَدْر বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া। ২. جِنْسِيَّةٌ বা একই শ্রেণীর হওয়া। তাই এ দুটিকেই 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। একই শ্রেণীর দ্রব্য না হলে 'রিবা' সাব্যস্ত হয় না। কারণ হলো, 'রিবা' হলো এক পক্ষে অতিরিক্ত অংশের নাম। সুতরাং যদি দুই দিকে দুই শ্রেণীর দ্রব্য হয়, তাহলে এক দিকের কতটুকু দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দিকের কতটুকু দ্রব্য সমান ধরা হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে উভয় দ্রব্য তারতম্যপূর্ণ।

সুতরাং যখন শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ এক হওয়ার মাধ্যমে সমতা সাব্যস্ত হবে তখন অতিরিক্ত হওয়াও এরই মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে। ফলে তখন 'রিবা' সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ শ্রেণী ও পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া সত্ত্বেও যদি এক পক্ষে অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা 'রিবা' হবে। কেননা, 'রিবা' বলা হয় এমন অতিরিক্ত অংশকে যা বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে এক পক্ষ লাভ করে, অথচ তার বিনিময় অপর পক্ষে কিছুই নেই।

وَلَا يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ، لِاَنَّهُ لَا يُعَدُّ تَفَاوُتًا عُرْفًا، أَوْ لِأَنَّ فِيْ اِعْتِبَارِهِ سَدَّ بَابِ الْبِيَاعَاتِ، أَوْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ. وَالطُّعْمُ وَالثَّمَنِيَّةُ مِنْ أَعْظَمِ وُجُوْهِ الْمَنَافِعِ، وَالسَّبِيْلُ فِيْ مِثْلِهَا الْاِطْلَاقُ بِاَبْلَغِ الْوُجُوْهِ لِشِدَّةِ الْاِحْتِيَاجِ اِلَيْهَا دُوْنَ التَّضْيِيْقِ فِيْهِ، فَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا ذَكَرَهُ.

অনুবাদ : গুণ তথা দ্রব্য ভালো-মন্দ হওয়া [সমতা হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে] ধর্তব্য নয়। কেননা, লোক-প্রচলনে এটাকে তারতম্য বলে গণ্য করা হয় না। অথবা এজন্য যে, এটাকে ধর্তব্য বলে গণ্য করা হলে ক্রয়-বিক্রয়ের পথই বন্ধ হয়ে যাবে। অথবা নবী করীম ﷺ -এর এ বাণীর কারণে- جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ "তার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান।" পক্ষান্তরে খাদ্যযোগ্যতা এবং মূল্যযোগ্যতা হচ্ছে দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়ার অন্যতম প্রধান দিক। আর এগুলোর প্রতি মানুষের প্রয়োজন তীব্র হওয়ার কারণে এ ধরনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদারতা দেখানো; সংকীর্ণ করে দেওয়া নয়। [অথচ হাদীসে শর্ত আরোপের মাধ্যমে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।] কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা বিবেচ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যখন হাদীসে সমতা রক্ষা করা শর্ত করা হয়েছে তখন দ্রব্যের গুণাগুণের বিষয়টি সমতার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না কেন? অর্থাৎ সমতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উভয় দ্রব্য একই মানের তথা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট মানের হওয়া শর্ত হয় না কেন? বরং এক কেজি নিকৃষ্ট গমের বিনিময়ে এক কেজি উৎকৃষ্ট গমের মাঝে ['রিবা'-এর ক্ষেত্রে] সমতা রয়েছে বলে ধরা হয়।

মুসান্নিফ (র.) এর জবাবে বলেন- দ্রব্যের গুণাগুণের তারতম্যের বিষয়টি ধর্তব্য হয় না এর কারণ তিনটি-

১. লোক-প্রচলনে গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য হয় না, তাই শরিয়তেও এটি ধর্তব্য হবে না। তবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন- وَفِيْهِ نَظَرٌ অর্থাৎ মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত এ কারণটি যথার্থ হয়নি। কেননা, লোক-প্রচলনে গুণাগুণের তারতম্য সামান্য হলে তা ধর্তব্য হয় না, কিন্তু অধিক হলে তা ধর্তব্য হয়। তাই মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত দ্বিতীয় কারণটিই হলো যথার্থ কারণ।

২. গুণাগুণের তারতম্য যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে এ সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পথ একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে তো উক্ত দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে সমতাকে শর্ত করা হয়েছে। অতএব যদি উভয় দিকের দ্রব্যের মাঝে গুণাগুণের তারতম্যের কারণে তাতে সমতা ধরা না হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় একেবারেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, সম্পূর্ণরূপে গুণাগুণের দিক থেকে উভয় দিকের দ্রব্য এক হওয়া প্রায় অসম্ভব। আর যদি এক হয়েও যায় তখন তা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো স্বার্থকতা অর্জিত হয় না। সুতরাং এ সকল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ শরিয়ত তা ক্রয়-বিক্রয়ের পথ খোলা রেখেছে। অতএব বুঝা গেল গুণাগুণের তারতম্য সমতার ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।

৩. অথবা, নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত বাণীর কারণে গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য নয়। নবী করীম ﷺ বলেছেন- جَيِّدُهَا وَرَدِيُّهَا سَوَاءٌ "এ সকল দ্রব্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়টাই সমান।" তবে হাদীসটি সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, এর সনদ আমি খুঁজে পাইনি। তদ্রূপ আল্লামা আইনী (র.)-ও বলেছেন, হাদীসটি غَرِيْبٌ। তবে হাদীসটির মর্মার্থ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র.)-এর جَنِيْبٌ [উৎকৃষ্ট খেজুর] -এর বিনিময়ে جَمْعٌ [নিকৃষ্ট খেজুর] বিক্রয় সংক্রান্ত একটি হাদীস থেকে উদ্ধার হয়। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, এছাড়া এর উপর ইজমাও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالطُّعْمُ وَالثَّمَنِيَّةُ مِنْ اَعْظَمِ وُجُوْهِ الْمَنَافِعِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) যে খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রা হওয়াকে 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' নির্ধারণ করেছেন তা সঠিক না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, খাদ্যযোগ্য হওয়া এবং মুদ্রাযোগ্য হওয়া 'রিবা'-এর 'ইল্লাত' হতে পারে না। কেননা, সম্পদ দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানোর অন্যতম দিক হচ্ছে তা খাদ্য হওয়া বা মুদ্রা হওয়া। কাজেই এরূপ দ্রব্যের প্রতি মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। আর যে সকল বস্তুর প্রতি মানুষের প্রয়োজন তীব্র সে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে তা ব্যাপক করে দেওয়া; তা সংকীর্ণ করে দেওয়া নয়। এ কারণেই তো পানি ও বাতাসকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। অথচ হাদীসে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল এ সকল দ্রব্যে 'রিবা' হারাম হওয়ার কারণ- খাদ্য হওয়া এবং মুদ্রা হওয়া নয়। অন্যথায় এ 'ইল্লাত' আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতির বিপরীত দাবি করে (يُوْجِبُ فَسَادَ الْوَضْعِ)। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) যে যুক্তি উল্লেখ করেছেন তা ধর্তব্য হবে না।

إِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ إِذَا بِيْعَ الْمَكِيْلُ أَوِ الْمَوْزُوْنُ بِجِنْسِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ الْبَيْعُ فِيْهِ لِوُجُوْدِ شَرْطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ فِى الْمِعْيَارِ، أَلَا تَرٰى إِلٰى مَا يُرْوٰى مَكَانَ قَوْلِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، كَيْلًا بِكَيْلٍ وَفِى الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَإِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ لِتَحَقُّقِ الرِّبٰوا، وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيْهِ الرِّبٰوا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لِإِهْدَارِ التَّفَاوُتِ فِى الْوَصْفِ.

অনুবাদ : যখন উল্লিখিত বিষয়গুলো সাব্যস্ত হলো তখন আমরা বলব যে, যদি পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য এরূপ একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, জায়েজ হওয়ার শর্ত বিদ্যমান পাওয়া যাচ্ছে। সে শর্ত হচ্ছে পরিমাপের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া। তুমি কি ভেবে দেখছ না? [যে, এ কারণেই তো] কোনো কোনো বর্ণনায় مِثْلًا بِمِثْلٍ -এর পরিবর্তে كَيْلًا بِكَيْلٍ [এক 'পাত্র'-এর বিনিময়ে এক 'পাত্র'] রয়েছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে وَزْنًا بِوَزْنٍ [সমপরিমাণ ওজনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজনের দ্রব্য।] আর যদি এক পক্ষের দ্রব্য অপর পক্ষের দ্রব্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' সাব্যস্ত হচ্ছে। যে সকল দ্রব্যে 'রিবা' সাব্যস্ত হয় সে সকল দ্রব্য থেকে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য নিকৃষ্ট মানের দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় জায়েজ হবে না, যদি তা সমান সমান করে বিক্রয় করা না হয়। কেননা, গুণাগুণের তারতম্য ধর্তব্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যখন আমাদের পূর্বের দলিল দ্বারা এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো উভয় দ্রব্যের পরিমাপ মাধ্যম এবং শ্রেণী এক হওয়া, তখন -এর উপর ভিত্তি করে মাসআলা হলো, যদি কেউ পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে। যেমন– গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করল অথবা যদি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে। যেমন– স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করল সে ক্ষেত্রে যদি সমান সমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করে, তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, এরূপ একই শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য যা শর্ত তা বিদ্যমান আছে। আর সে শর্ত হলো, পরিমাপের ক্ষেত্রে উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। কেননা, নবী করীম ﷺ 'রিবা' সংক্রান্ত উল্লিখিত হাদীসে যে مِثْلًا بِمِثْلٍ বলেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিমাপের দিক থেকে সমান সমান করে বিক্রয় করা। এ কারণেই উক্ত হাদীসটির কোনো কোনো রেওয়ায়েতে مِثْلًا بِمِثْلٍ -এর স্থলে كَيْلًا بِكَيْلٍ "এক পাত্রের বিনিময়ে এক পাত্র করে" আর স্বর্ণের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে مِثْلًا بِمِثْلٍ -এর স্থলে وَزْنًا بِوَزْنٍ "নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজনের বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজনের ভিত্তিতে" শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, হাদীসে উল্লিখিত مِثْلًا بِمِثْلٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পরিমাপের ক্ষেত্রে সমান সমান করে বিক্রয় করা। অতএব আলোচ্য সূরতে যখন এ শর্ত বিদ্যমান রয়েছে তখন ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ لِتَحَقُّقِ الرِّبٰوا الخ : আর যদি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে পরিমাপের দিক থেকে কমবেশি করে, তাহলে জায়েজ হবে না। অতিরিক্ত অংশ 'রিবা' [সুদ] হওয়ার কারণে তা হারাম হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيْهِ الرِّبٰوا الخ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে গুণাগুণের দিক থেকে উভয় দিকের দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য থাকলে তা ধর্তব্য হবে না। কাজেই একই শ্রেণীর দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি এক দিকের দ্রব্য উৎকৃষ্ট মানের হয় আর অপর দিকের দ্রব্য নিকৃষ্ট মানের হয় তবু কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না; বরং পরিমাপের দিক থেকে সমতা রক্ষা করা আবশ্যক হবে।

وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ وَالتُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ، لِاَنَّ الْمُسَاوَاةَ بِالْمِعْيَارِ، وَلَمْ يُوْجَدْ، فَلَمْ يَتَحَقَّقِ الْفَضْلُ، وَلِهٰذَا كَانَ مَضْمُوْنًا بِالْقِيْمَةِ عِنْدَ الْاِتْلَافِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) اَلْعِلَّةُ هِيَ الطَّعْمُ، وَلَا مُخَلِّصَ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ، فَيَحْرُمُ، وَمَا دُوْنَ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ الْحَفْنَةِ، لِاَنَّهُ لَا تَقْدِيْرَ فِى الشَّرْعِ بِمَا دُوْنَهُ وَلَوْ تَبَايَعَا مَكِيْلًا اَوْ مَوْزُوْنًا غَيْرَ مَطْعُوْمٍ بِجِنْسِهٖ مُتَفَاضِلًا كَالْجَصِّ وَالْحَدِيْدِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَنَا لِوُجُوْدِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ، وَعِنْدَهُ يَجُوْزُ لِعَدَمِ الطُّعْمِ وَالثَّمَنِيَّةِ ـ

অনুবাদ : আর দুই মুঠো দ্রব্যের বিনিময়ে এক মুঠো দ্রব্য এবং দুটি আপেলের বিনিময়ে একটি আপেল বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, সমতা নির্ধারণ করা হয় পরিমাপের মাধ্যম [পাত্রমাপ এবং ওজন] দ্বারা । আর তা এখানে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং [এক পক্ষে] অতিরিক্ত হওয়া সাব্যস্ত হবে না। এ কারণেই তো এরূপ দ্রব্য নষ্ট করে ফেলার ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয় মূল্যের দ্বারা [তদ্রূপ দ্রব্য দ্বারা নয়]। আর [উপরিউক্ত সুরতে] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রয় হারাম হবে। কেননা, তাঁর মতে ['রিবা' হারাম হওয়ার] 'ইল্লাত' হলো খাদ্যযোগ্যতা, [তা বিদ্যমান আছে] আর হারাম থেকে রক্ষাকারী হলো সমতা [অথচ তা বিদ্যমান নেই]। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। আর অর্ধ সা' [প্রায় পৌনে দু সের]-এর কম হলে তা এক মুঠোর বিধানেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, শরিয়তে অর্ধ সা'-এর কম [খাদ্য] দ্রব্য পরিমাপ করা হয় না। আর যদি খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করে, যেমন– চুনা ও লোহা, তাহলে আমাদের নিকট তা জায়েজ হবে না। কেননা, পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া এবং শ্রেণী এক হওয়া [যা রিবা হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ] এখানে বিদ্যমান আছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। কেননা, খাদ্যযোগ্যতা বা মূল্যযোগ্যতা [যা তাঁর মতে 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত'] বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ الخ : حَفْنَةٌ অর্থ–এক মুঠো। আর কারো কারো মতে দু হাতে যতটুকু শস্য ধারণ করা যায় ততটুকু পরিমাণকে حَفْنَةٌ বলা হয়। কেউ যদি দু মুঠো খাদ্যশস্যের বিনিময়ে এক মুঠো খাদ্যশস্য বিক্রয় করে কিংবা দুটি আপেলের বিনিময়ে একটি আপেল বিক্রয় করে, এরূপভাবে দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম বিক্রয় করে, তাহলে আমাদের মতে তা জায়েজ হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। তাঁর মতে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মতে 'রিবা' বা সুদ হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ হলো, اَلطُّعْمُ "খাদ্যযোগ্যতা" বা اَلثَّمَنِيَّةُ "মূল্যযোগ্যতা"। আর উক্ত দ্রব্যদ্বয়ে অর্থাৎ খাদ্যশস্য ও আপেলের মাঝে "খাদ্যযোগ্যতা" বিদ্যমান। আর তাঁর মতে 'রিবা'-এর দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে আসল অবস্থা হলো হারাম হওয়া। আর 'রিবা' থেকে রক্ষাকারী হলো, উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সমতা সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হবে। আর আলোচ্য সুরতে যেহেতু সমতা সাব্যস্ত হচ্ছে না তাই তা হারাম হবে।

আর আমাদের মতে জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্যের মাঝে সমতা নির্ধারণ করা হয় পরিমাপের মাধ্যমে। আর পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' [প্রায় পৌনে দু সের]-এর কম পরিমাণ দ্রব্যের জন্য শরিয়তে কোনো পরিমাপ মাধ্যম নেই। কাজেই অর্ধ সা'-এর কম দ্রব্য শরিয়তে পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়। আর আপেল ডিম বা আখরোট ইত্যাদি দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য নয়, তাই তা-ও শরয়ী পরিমাপ তথা পাত্র বা ওজন-এর আওতাভুক্ত নয়। আর শরয়ী পরিমাপের আওতাভুক্ত না হলে অতিরিক্ত হওয়াও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয় পরিমাপের মাধ্যমে। আর যখন অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হবে না তখন 'রিবা' বা সুদও সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তা জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) আলোচ্য মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, শরিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে [যেমন– কাফফারাসমূহ, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি] অর্ধ সা-এর কম নির্ধারণ না করায় এটা আবশ্যক নয় যে, এর কম পরিমাণের ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়া স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা ধর্তব্য হবে না। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াল্লা (اَلْمُعَلّٰى) ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন– رَوَى الْمُعَلّٰى عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرَةَ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ فِي الْكَثِيْرِ فَالْقَلِيْلُ مِنْهُ حَرَامٌ "ইমাম মুহাম্মদ (র.) দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর বিক্রয় অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন– যে সকল দ্রব্য বেশি হলে 'রিবা' [সুদ] হারাম হয় তা কম হলেও তাতে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে।"

মোটকথা, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) মুতূন-এর রেওয়ায়েতের বিপরীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং দলিলের দিক থেকে সঠিক মনে করেছেন।

[ফাতহুল কাদীর, ফতোয়ায়ে শামী-মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ. ৪০৯।]

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا كَانَ مَضْمُوْنًا بِالْقِيْمَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু এক বা দু মুঠো শষ্য শরয়ী পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়, এ কারণেই কেউ যদি কারো এক মুঠো বা দু মুঠো খাদ্যশষ্য নষ্ট করে ফেলে, তাহলে তার জরিমানা মূল্যের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়; এরূপ এক বা দু মুঠো খাদ্যশষ্য দ্বারা নয়। অথচ পাত্র-পরিমাপিত ও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য জরিমানা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বিধান হলো, তদ্রূপ সমপরিমাণ দ্রব্য দ্বারা তা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এক/ দু মুঠো শষ্য পরিমাপের আওতাভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ وَمَا دُوْنَ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ الْحَفْنَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্ধ সা' [পৌনে দু কেজির] চেয়ে যদি কম দ্রব্য হয়, তাহলে তা বিধানগত দিক থেকে এক মুঠোর মতোই। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 'রিবা' [সুদ] হারাম হবে না। কেননা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্ধ ছা' -এর কম পরিমাণকে শরিয়ত কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেনি। সুতরাং অর্ধ সা'-ই হবে শরিয়তে সর্বনিম্ন পরিমাপ।

তবে যদি কোনো এক দিকে অর্ধ সা' বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে। সুতরাং এক মুঠো শষ্যের বিনিময়ে যদি একই শ্রেণীর শষ্য অর্ধ সা' বা তার চেয়ে বেশি বিক্রয় করে, তাহলে তা হারাম হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَبَايَعَا مَكِيْلًا اَوْ مَوْزُوْنًا غَيْرَ مَطْعُوْمٍ الخ : খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্য যদি ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হয় এবং তা একই শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা আমাদের মতে জায়েজ হবে না। সে ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেমন– এক 'কফীয' চুনের বিনিময়ে দু 'কফীয' চুন বিক্রয় করল বা এক মণ লোহার বিনিময়ে দুই মণ লোহা বিক্রয় করল, তবে তা আমাদের মতে জায়েজ হবে না। কারণ, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' এখানে বিদ্যমান আছে। আর তা হলো উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া এবং উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া অর্থাৎ পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং 'ইল্লাত' যখন বিদ্যমান রয়েছে তখন কমবেশি করা 'রিবা' বা সুদ হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, তাঁর মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো, খাদ্যযোগ্যতা কিংবা মুদ্রাযোগ্যতা। আর এই 'ইল্লাত' উক্ত দ্রব্য [চুন, লোহা]-এর মাঝে বিদ্যমান নেই। কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে না।

قَالَ : وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُوْمُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمُحَرِّمَةِ، وَالْأَصْلُ فِيْهِ الْإِبَاحَةُ، وَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ، وَإِذَا وُجِدَ اَحَدُهُمَا وَعَدَمَ الْاٰخَرُ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاَ ، مِثْلُ اَنْ يُسْلِمَ هَرَوِيًّا فِيْ هَرَوِيِّ اَوْ حِنْطَةً فِيْ شَعِيْرٍ فَحُرْمَةُ رِبَوا الْفَضْلِ بِالْوَصْفَيْنِ وَحُرْمَةُ النَّسَا بِاَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি উক্ত দুটি গুণ তথা উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং তার সাথে যুক্ত গুণ [অর্থাৎ পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া] এর উভয়টি অবিদ্যমান থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা এবং বাকি বিক্রয় করা উভয়টিই জায়েজ হবে। কেননা, 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বিদ্যমান নেই। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়াই হলো মূল অবস্থা। আর যদি উক্ত উভয় গুণ [অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া] বিদ্যমান থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা এবং বাকি বিক্রয় করা উভয়টাই হারাম হবে। কেননা, ['রিবা' হারাম হওয়ার] 'ইল্লাত' বিদ্যমান আছে। আর যদি উক্ত দুটি গুণ [অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া]-এর মধ্য থেকে যে কোনো একটি গুণ বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা হালাল হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। যেমন– 'বায় সলম' [যা বাকি হয়ে থাকে] -এর ভিত্তিতে একটি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে একটি হারাবী কাপড় বিক্রয় করল কিংবা 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে গমের বিনিময়ে যব বিক্রয় করল। সারকথা, ['ইল্লাত'-এর] উভয় গুণ থাকার দ্বারা কোনো পক্ষে বেশি হওয়া হারাম হয়, আর যে কোনো একটি গুণ বিদ্যমান থাকার দ্বারা বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَإِذَا عَدَمَ الْوَصْفَانِ الخ : পূর্বে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, আমাদের মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' হলো দুটি বিষয়–

১. উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া।

২. উভয় দ্রব্যের পরিমাপ মাধ্যম (قَدْر) এক হওয়া অর্থাৎ উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হওয়া। [পূর্ণরূপে 'রিবা'ভুক্ত মাল সাব্যস্ত হয় যদি উল্লিখিত উভয় গুণ অর্থাৎ "উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া" বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যদি একটি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা এক দিক থেকে 'রিবা'ভুক্ত মাল বলে সাব্যস্ত হবে।]

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি দুটি 'ইল্লাত'(عِلَّت)-এর কোনোটিই বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণীও এক না হয় এবং উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যমও এক না হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে এবং বাকি বিক্রয় করাও জায়েজ হবে। যেমন– দিরহামের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা কিংবা কাপড়ের বিনিময়ে গম বিক্রয় করা। এ ক্ষেত্রে কমবেশি ও বাকি উভয়টাই জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّت) বিদ্যমান নেই। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো জায়েজ হওয়া। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ "আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দিয়েছেন।" সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّت) বা কারণ উপস্থিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল বা বৈধ থাকবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ الخ : আর যদি 'ইল্লাত'(عِلَّتْ)-এর উভয় গুণ থাকে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হয় এবং তাদের পরিমাপ-মাধ্যমও এক হয়, [অর্থাৎ উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হয়] তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হবে এবং বাকি বিক্রয় করাও হারাম হবে। কারণ, 'রিবা' বা [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কোনো এক পক্ষে অতিরিক্ত হলে তা হারাম হবে। আর সমান সমান হলেও বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হলো, বাকির তুলনায় নগদ দ্রব্যের মূল্যমান বেশি হয়ে থাকে ফলে উভয় দিকে সমতা বজায় রইল না। সুতরাং 'রিবা' বা [সুদ] এর আওতাভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا وُجِدَ اَحَدُهُمَا وَعُدِمَ الْاٰخَرُ الخ : আর যদি 'ইল্লাত' (عِلَّتْ)-এর উভয় গুণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকে আর অপরটি না থাকে, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হয় কিন্তু পরিমাপ এক না হয় যেমন 'হারাবী' কাপড়ের বিনিময়ে 'হারাবী' কাপড় বিক্রয়। এক্ষেত্রে উভয়ের শ্রেণী এক কিন্তু পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْر) এক নয়। কেননা, পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পরিমাপ-মাধ্যম বা قَدْر এক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পাত্র-পরিমাপিত হওয়া কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া। সুতরাং উভয় দ্রব্য গজ পরিমাপিত বা গণনা-নির্ভর হলে তা 'রিবা'র 'ইল্লাত'(عِلَّتْ)-এর আওতাভুক্ত হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কিন্তু বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। অতএব 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে কেউ যদি 'হারাবী' কাপড়ের বিনিময়ে 'হারাবী' কাপড় বিক্রয় করে, তবে তা জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে যব ক্রয়ের জন্য গম দাদনরূপে [অগ্রিম] প্রদান করে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা, এটা বাকি বিক্রয়। এ ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ মাধ্যম এক। কেননা, যব এবং গম পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য। কিন্তু উভয়ের শ্রেণী এক নয়, যব এক শ্রেণীর দ্রব্য আর গম আরেক শ্রেণীর দ্রব্য। সুতরাং 'রিবা' বা [সুদ] হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' (عِلَّتْ)-এর এক গুণ বিদ্যমান। অতএব কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

فَحُرْمَةُ رِبَوا الْفَضْلِ بِالْوَصْفَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, সারকথা হলো, কমবেশি করে বিক্রয় করা অর্থাৎ এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়ার মাধ্যমে 'রিবা' (সুদ) হারাম হয় 'ইল্লাত' (عِلَّتْ)-এর উভয় গুণ তথা শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম (قَدْر) এক হওয়া বিদ্যমান থাকলে। আর বাকি বিক্রয় হারাম হয় যদি 'ইল্লাত' (عِلَّتْ)-এর উভয় গুণের একটি বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে।

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْجِنْسُ بِانْفِرَادِهِ لَا يُحَرِّمُ النَّسَأَ، لِأَنَّ بِالنَّقْدِيَّةِ وَعَدَمِهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا شُبْهَةُ الْفَضْلِ وَحَقِيقَةُ الْفَضْلِ غَيْرُ مَانِعٍ فِيهِ، حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالْاِثْنَيْنِ فَالشُّبْهَةُ أَوْلَى، وَلَنَا أَنَّهُ مَالُ الرِّبٰوا مِنْ وَجْهٍ نَظَرًا اِلَى الْقَدْرِ أَوِ الْجِنْسِ، وَالنَّقْدِيَّةُ أَوْجَبَتْ فَضْلًا فِى الْمَالِيَّةِ، فَتَحَقَّقَ شُبْهَةُ الرِّبٰوا، وَهِيَ مَانِعَةٌ كَالْحَقِيقَةِ.

অনুবাদ : আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার দ্বারা বাকি বিক্রয় করা হারাম হয় না। কেননা, একদিকে দ্রব্যটি নগদ হওয়া এবং অপরদিকে দ্রব্যটি বাকি হওয়া–এটা কেবল [পরোক্ষগত] অতিরিক্ততার সন্দেহ সাব্যস্ত করে [প্রকৃত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে না।] আর [শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার সুরতে] এক পক্ষে প্রকৃত অতিরিক্ত হলে তা-ও [বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য] প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং অতিরিক্ততার সন্দেহ তো আরো যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রতিবন্ধক হবে না। আর আমাদের দলিল হলো, [উক্ত সুরতে উভয় পক্ষের] দ্রব্য একদিক থেকে 'রিবা'ভুক্ত মাল, এ বিবেচনায় যে, উভয়ের শ্রেণী এক কিংবা উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম এক। আর নগদ লাভ করা মূল্যের দিক থেকে অতিরিক্ততা সাব্যস্ত করে। সুতরাং তাতে 'রিবা'-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হলো। আর প্রকৃত 'রিবা' [অতিরিক্ততা] ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। তদ্রূপ 'রিবা'-এর [অতিরিক্ততার] সন্দেহও ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) اَلْجِنْسُ بِانْفِرَادِهِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উভয় দ্রব্যের মাঝে যদি খাদ্যযোগ্যতা বা মুদ্রাযোগ্যতা [যা তাঁর মতে 'রিবা' বা সুদ হারাম হওয়ার 'ইল্লাত'] বিদ্যমান না থাকে, তাহলে শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হবে না [এবং কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হবে না]।

উল্লেখ্য, আল্লামা আইনী (র.) এবং হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল-ইনায়াহ -এর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত উল্লেখ করতে গিয়ে শুধু جِنْس "শ্রেণী এক হওয়া"-এর বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অথচ قَدْر বা পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার বিষয়েও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত একই রূপ। অর্থাৎ শুধু উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হবে না। যেমনিভাবে শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম হয় না। অথচ মুসান্নিফ (র.) শুধু শ্রেণী এক হওয়ার ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে এর জবাব এই হতে পারে যে, মুসান্নিফ (র.) পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার সুরতের কথা উল্লেখ করেননি তার কারণ হলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার সুরতে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়। কেননা, তাঁর মতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য তদ্রূপ যবের বিনিময়ে গম বাকি বিক্রয় করা জায়েজ নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) বা কারণ ভিন্ন। তা হলো 'বায় সরফ' [মুদ্রাদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়] এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক। পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া এর কারণ নয়।

قَوْلُهُ لِأَنَّ بِالنَّقْدِيَّةِ وَعَدَمِهَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا شُبْهَةُ الْفَضْلِ الخ : শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হওয়ার কারণে বাকি বিক্রয় হারাম না হওয়ার স্বপক্ষে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এক পক্ষের দ্রব্য নগদ হওয়া এবং আরেক পক্ষের দ্রব্য

বাকি হওয়ার দ্বারা কেবল এক দিকে অতিরিক্ত হওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হয় যেহেতু নগদ দ্রব্যটি মূল্যমানের দিক থেকে বাকি দ্রব্যের চেয়ে অধিক বৈশিষ্টপূর্ণ, কিন্তু প্রকৃত বা দৃশ্যত অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয় না। অতএব শুধু উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়ার সুরতে সকলের ঐকমত্যে তখন নগদ কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ, যেমন একটি কাপড়ের বিনিময়ে দুটি কাপড় কিংবা একটি গোলামের বিনিময়ে দুটি গোলাম নগদ বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ। অথচ এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে প্রকৃত বা দৃশ্যত অতিরিক্ত রয়েছে। সুতরাং বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শুধু [মূল্যমানের দিক থেকে] অতিরিক্ততার সন্দেহের কারণে হারাম না হওয়ার বিষয়টি তো আরো যুক্তিসঙ্গত হবে। কেননা, সেখানে প্রকৃত অতিরিক্ততা হচ্ছে না; বরং অতিরিক্ততার সন্দেহ থাকছে। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) শুধু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে আকলী দলিল উল্লেখ করেছেন, নকলী দলিল উল্লেখ করেননি; তাঁর স্বপক্ষে নকলী দলিলও রয়েছে–

১. আবূ দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাকী ও দারাকুতনীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَّزَ جَيْشًا فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَشْتَرِىَ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ ـ
'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছিলেন তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন [বাকিতে] দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট নগদ ক্রয় করি।' এ হাদীস দ্বারা একই শ্রেণীর পশু বাকি বিক্রয় করার বৈধতা সুস্পষ্ট।

২. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ بَاعَ بَعِيْرًا بِاَرْبَعَةٍ اِلٰى اَجَلٍ "তিনি চারটি বাকি উটের বিনিময়ে একটি নগদ উট বিক্রয় করেছেন।" হাদীসটি মুসনাদে শাফেয়ী ও বায়হাকীতে সহীহ সনদে [মাওকূফ রূপে] বর্ণিত হয়েছে।

৩. এরূপভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে বায়হাকী শরীফে مُرْسَلْ সনদে একটি مَوْقُوْف হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ– عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ بَاعَ بَعِيْرًا يُقَالُ لَهُ عُصَيْفِيْرًا بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا اِلٰى اَجَلٍ

قَوْلُهُ وَلَنَا اَنَّهُ مَالُ الرِّبٰوا مِنْ وَجْهٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত মাসআলায় আমাদের দলিল হলো, যখন উভয় দ্রব্যের শুধু শ্রেণী (جِنْس) এক হয়; পরিমাপ মাধ্যম এক না হয় কিংবা শুধু পরিমাপ মাধ্যম এক হয় কিন্তু শ্রেণী (جِنْس) এক না হয় তখন তা এক দিক থেকে 'রিবা'-এর মাল বলে গণ্য হবে। যেহেতু 'রিবা'-এর মাল হওয়ার জন্য যে দুটি গুণ তথা শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া আবশ্যক তার একটি বিদ্যমান রয়েছে। আর এক পক্ষের দ্রব্য বাকি হলে আরেক পক্ষের দ্রব্য নগদ হলে নগদ দ্রব্যে মূল্যমানের দিক থেকে অতিরিক্ততা সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই নগদ দ্রব্য বাকির তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে এক দিকে 'রিবা' বা অতিরিক্ততার সন্দেহ বিদ্যমান হলো। আর 'রিবা' [সুদ] -এর ক্ষেত্রে যেমনিভাবে প্রকৃত অতিরিক্ততা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে তেমনি অতিরিক্ততার সন্দেহও ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে। এ কারণেই 'রিবা'র [সুদের] আওতাভুক্ত মালের ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নয়, যদিও উভয় দিকে সমান সমান হওয়ার ধারণা করে বিক্রয় করে থাকে। কেননা, অতিরিক্ততার সন্দেহ বিদ্যমান। আর আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান রয়েছে তাই তা شُبْهَةُ الْحُكْمِ الْعِلَّةِ গণ্য হবে। সুতরাং شُبْهَةُ الْعِلَّةِ বা 'ইল্লাত'-এর সন্দেহ شُبْهَةُ الْحُكْمِ অর্থাৎ বিধানের সন্দেহ তথা অতিরিক্ততার সন্দেহকে সাব্যস্ত করবে। ফলে তা হারাম হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দলিলটি সম্ভবত যথার্থ নয়। কেননা, দলিলটির সারকথা হচ্ছে شُبْهَةُ الرِّبٰوا বিধানের ক্ষেত্রে حَقِيْقَةُ الرِّبٰوا -এর মতোই। অর্থাৎ প্রকৃতভাবে অতিরিক্ত হলে যেরূপ হারাম হবে তদ্রূপ অতিরিক্ততার সন্দেহ হলে তা-ও হারাম হবে। এ কথার দাবি অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলায় 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান হলে বাকি বিক্রয় যেরূপ হারাম হয়, তদ্রূপ কমবেশি করে বিক্রয় করাও হারাম হওয়ার কথা। অথচ এ সুরতে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

আর যদি এ কথা বলা হয় যে, যেহেতু 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকার কারণে এটি شُبْهَةُ الْعِلَّةِ হয়েছে, তাই এটি কেবল شُبْهَةُ الرِّبٰوا তথা বাকি বিক্রয়কেই হারাম করবে, حَقِيْقَةُ الرِّبٰوا তথা প্রকৃত অতিরিক্ততাকে হারাম করবে না। তথা কারণ, এখানে حَقِيْقَةُ الْعِلَّةِ অর্থাৎ প্রকৃত 'ইল্লাত' বিদ্যমান নেই। তাহলে বিষয় আরো অবোধগম্য হবে। কেননা, বিষয়টি বরং বিপরীত হওয়ার কথা। অর্থাৎ এরূপ হওয়ার কথা ছিল যে, شُبْهَةُ الْعِلَّةِ প্রকৃত অতিরিক্ততা বা حَقِيْقَةُ الرِّبٰوا -কে হারাম করবে, কিন্তু شُبْهَةُ الرِّبٰوا তথা বাকি বিক্রয়কে হারাম করবে না। কেননা, প্রকৃত অতিরিক্ততা হারাম করার জন্য যা 'ইল্লাত' (عِلَّتْ) হবে অতিরিক্ততার সন্দেহ তথা شُبْهَةُ الرِّبٰوا -কে হারাম করার জন্য তার চেয়ে অসম্পূর্ণ বিষয় 'ইল্লাত' হতে পারে না।

দলিলটির যে দুর্বলতার কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তার প্রতি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)ও ইঙ্গিত করেছেন। এজন্যই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এক্ষেত্রে আসল দলিল হলো–

১. পূর্ববর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীস যার শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন– فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَّكُوْنَ يَدًا بِيَدٍ "যদি এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় কর, তবে হাতে হাতে [নগদ] হতে হবে।" [হাদীসটি বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।] এ হাদীসে উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে উভয় দ্রব্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তা বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার দলিল।

২. আবূ দাউদ শরীফে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন– وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ وَأَمَّا النَّسِيْئَةُ فَلَا "যবের বিনিময়ে গম বিক্রয়ে যদি যব বেশি হয় তবে হাতে হাতে হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বাকি বিক্রয় করা যাবে না।"

৩. আবূ দাউদ শরীফে হযরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

عَنْ سَمُرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً .

"নবী করীম ﷺ প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

উল্লিখিত হাদীসসমূহে 'রিবা' বা সুদ-এর 'ইল্লাত'-এর দুটি গুণের একটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবী করীম ﷺ বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দুটি গুণের একটি তথা শ্রেণী এক হওয়া বা পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার 'ইল্লাত' বা কারণ।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্বপক্ষে পূর্বে যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের পক্ষ হতে তার জবাব হলো–

১. এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের উল্লিখিত তিনটি হাদীস এবং তাঁর উল্লেখকৃত হাদীসের মাঝে تَعَارُضْ [পরস্পর বিরোধ] পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই এর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে এভাবে যে, তাঁর স্বপক্ষে উল্লিখিত হাদীসগুলো 'রিবা' বা সুদ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা সম্পর্কিত।

২. অথবা, যদি تَرْجِيْح বা অগ্রাধিকার দেওয়ার পথ অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমাদের স্বপক্ষের হাদীসগুলো অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, তা مُحَرِّمْ বা হারাম হওয়া প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে তাঁর স্বপক্ষের হাদীসগুলো مُبِيْح বা বৈধ হওয়া প্রমাণ করে। আর এরূপ হলে যা হারাম হওয়া প্রমাণ করে তা অগ্রাধিকার পায়।

إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ النُّقُوْدَ فِى الزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ يَجُوْزُ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ، لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّفِقَانِ فِىْ صِفَةِ الْوَزْنِ، فَإِنَّ الزَّعْفَرَانَ يُوْزَنُ بِالْأَمْنَاءِ، وَهُوَ مُثْمَنٌ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَالنُّقُوْدُ تُوْزَنُ بِالسَّنْجَاتِ، وَهُوَ ثَمَنٌ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَلَوْ بَاعَ بِالنُّقُوْدِ مُوَازَنَةً وَقَبَضَهَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيْهَا قَبْلَ الْوَزْنِ، وَفِى الزَّعْفَرَانِ وَأَشْبَاهِهِ لَا يَجُوْزُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْهِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَحُكْمًا لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْقَدْرُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَنْزِلُ الشُّبْهَةُ فِيْهِ إِلَى شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ، وَهِىَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ.

অনুবাদ : তবে কেউ যদি জাফরান বা এ জাতীয় দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [যা বাকি হয়ে থাকে] ক্রয়ের জন্য মুদ্রাদ্রব্য নগদ প্রদান করে, তাহলে [বাকি হওয়া সত্ত্বেও] তা জায়েজ হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত। কারণ, এ দুই দ্রব্য [জাফরান ও মুদ্রাদ্রব্য] পরিমাণের ধরনের দিক থেকে এক নয়। কেননা, জাফরান ওজন করা হয় গ্রাম বা তোলা হিসেবে এবং জাফরান হলো মূল্যায়িত দ্রব্য বা বিক্রেয়দ্রব্য যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মূল্যদ্রব্য [দিরহাম-দীনার] পরিমাপ করা হয় তুলাদণ্ড দ্বারা এবং তা হলো স্বয়ং মূল্য, যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। [তাছাড়া বিধানের দিক থেকে পার্থক্য হলো,] যদি কেউ ওজনের ভিত্তিতে মুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বিক্রয় করে এবং উভয়ে অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নেয়, তাহলে মুদ্রা হস্তগতকারী তা পরিমাপ করে দেখার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করতে পরবে [অর্থাৎ তা খরচ করতে বা কাজে লাগাতে পারবে]। পক্ষান্তরে জাফরান বা তদ্রূপ দ্রব্য হস্তগতকারী [ক্রেতা] তা পরিমাপ করে দেখার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করতে পারবে না [অর্থাৎ তা খরচ করতে বা কাজে লাগাতে পারবে না]। সুতরাং যখন উক্ত দ্রব্যদ্বয় [জাফরান ও মুদ্রাদ্রব্য]-এর পরিমাপের ক্ষেত্রে দৃশ্যগত দিক থেকে, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এবং বিধানগত দিক থেকে উভয় দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান, তখন পূর্ণরূপে উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম (اَلْقَدْرُ) এক হলো না। ফলে 'ইল্লাত'-এর একটি দিক বিদ্যমান থাকার কারণে, তাতে যে 'রিবা-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হয়েছিল তা [আরো এক স্তর নেমে] সন্দেহের সন্দেহ বলে সাব্যস্ত হবে। আর [হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে 'রিবা-এর সন্দেহ ধর্তব্য হয়, কিন্তু] সন্দেহের সন্দেহ ধর্তব্য হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ النُّقُوْدَ فِى الزَّعْفَرَانِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি সাম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে বলা হয়েছে যে, যদি 'ইল্লাত' -এর দুটি গুণের একটি গুণ বিদ্যমান থাকে আর অপরটি বিদ্যমান না থাকে অর্থাৎ যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হয় কিংবা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْر) এক হয়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে। সুতরাং এ নীতি অনুসারে স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বা যে কোনো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য যেমন-লোহা, পিতল, তুলা ইত্যাদি 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা [যা বাকি হয়ে থাকে] হারাম হওয়ার কথা, কেননা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য আর জাফরান, লোহা, পিতল বা তুলা ইত্যাদিও হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক, অতএব তা 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [বাকিতে] বিক্রয় করা হারাম হবে। অথচ তা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাবে যা উল্লেখ করেছেন তার সারকথা হলো, স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা এবং উক্ত দ্রব্যগুলো যদিও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, কিন্তু তাদের পরিমাপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা, জাফরান পরিমাপ করা হয় 'মন' হিসেবে [এখানে মন বলতে সেকালের মন যা একটি ক্ষুদ্র পরিমাপ, বর্তমানে বলা যেতে পারে তোলা বা গ্রাম

হিসেবে]। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মাপা হয় 'মিছকাল' [একটি পরিমাপের নাম] বা পরিমাপের জন্য নির্ধারিত দিরহাম দ্বারা। সুতরাং পরিমাপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা এবং জাফরানও অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর এটা হলো এগুলোর মাঝে বাহ্যিক পার্থক্য। এছাড়াও আরো দুটি পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো, আভ্যন্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে আর দ্বিতীয়টি হলো, বিধানগত দিক থেকে।

আভ্যন্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে পার্থক্য হলো, জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হচ্ছে বিক্রেয়দ্রব্য এবং তা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে মুদ্রাদ্রব্য এবং তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট বলে গণ্য হয় না। কাজেই উভয়ের মাঝে আভ্যন্তরীণ বা গুণগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে।

আর পরিমাপের ক্ষেত্রে বিধানগত দিক থেকে পার্থক্য হলো, কেউ যদি স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে তা দ্বারা জাফরান বা অন্য কোনো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য ক্রয় করে, যেমন ক্রেতা বলল, আমি দুই কেজি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিশ তোলা জাফরান ক্রয় করলাম, তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি ক্রেতা জাফরান বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে দুই কেজি রৌপ্যমুদ্রা মেপে রাখে অতঃপর তা বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে, তবে বিক্রেতা তা পুনরায় না মেপেই খরচ করতে পারবে বা যে কোনো কাজে লাগাতে পারবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি জাফরান ক্রেতার অনুপস্থিতিতে মেপে রাখে অতঃপর তা ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করে, তাহলে ক্রেতা তা পুনরায় না মাপার পূর্বে খরচ করতে পারবে না বা তা কোনো কাজে লাগাতে পারবে না। কাজেই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যের মাঝে বিধানগত দিক থেকেও পার্থক্য হলো।

قَوْلُهُ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْهِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَحُكْمًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু "স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা" এবং "অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য" এ উভয়ের মাঝে পরিমাপের ক্ষেত্রে তিন দিক থেকে তথা বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ বা গুণগত এবং বিধানগত দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে সেহেতু একথা বলা যেতে পারে যে, উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম (قَدْر) পূর্ণরূপে এক হয়নি, যদিও উভয় ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। ফলে উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার ক্ষেত্রে "সন্দেহ"(شُبْهَةٌ) সৃষ্টি হয়েছে। যখন এতটুকু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তখন আমরা বলব, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম বা শ্রেণী এক হওয়ার সুরতে বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হলো, বাকি বিক্রয় করলে তাতে প্রকৃত 'রিবা' [অতিরিক্ততা] সাব্যস্ত হয় না; বরং 'রিবা' বা অতিরিক্ততার "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) সাব্যস্ত হয়। আর সেই "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ)-এর কারণে তা বাকি বিক্রয় হারাম। কিন্তু আলোচ্য সুরতে যেহেতু উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়ার ক্ষেত্রেও "সন্দেহ"(شُبْهَةٌ) সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু 'রিবা' বা অতিরিক্ততার সন্দেহ আরেক স্তর নিম্নে নেমে "সন্দেহের সন্দেহ" বলে গণ্য হবে। আর 'রিবা' বা সুদ-এর ক্ষেত্রে "সন্দেহ" (شُبْهَةٌ) ধর্তব্য হয়, কিন্তু "সন্দেহের সন্দেহ" ধর্তব্য হয় না। সুতরাং স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [যা বাকি হয়ে থাকে] ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন যে, উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জাফরান বা অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে [বাকিতে] বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার যে দলিল বা কারণ উল্লেখ করেছেন তা দুর্বল। কারণ, উল্লিখিত পার্থক্য তিনটির মধ্য থেকে দ্বিতীয়টি তথা "নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট গণ্য হওয়া না হওয়া"-এর বিষয়টির সাথে পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আর প্রথম পার্থক্যটি তথা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ পদ্ধতির যে পার্থক্যের কথা উল্লিখ করা হয়েছে তাও যথার্থ নয়, কেননা যে বাটখারা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মাপা হয় তা দ্বারা জাফরান, মেশক বা এ জাতীয় দ্রব্যও মাপা হয়। আর তৃতীয় পার্থক্যটি তথা বিধানগত পার্থক্যটির কারণে এ কথা বলা যথার্থ হবে না যে, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা আর জাফরান বা এ জাতীয় দ্রব্যের মূল পরিমাপ-মাধ্যম-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে সঠিক দলিল হিসেবে এটাই বলা হবে যে, উভয় দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) এক হলে বাকি বিক্রয় হারাম হবে পূর্বে উল্লেখকৃত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসের কারণে। হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসের শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন– فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ يَدًا بِيَدٍ " যদি এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হয় তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় কর, তবে হাতে হাতে [নগদ] হতে হবে।" আর পরিমাপ মাধ্যম এক হলে বাকি বিক্রয় হারাম হওয়ার কথা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও তার সাথে مُلْحَقٌ বা যুক্ত হবে। আর পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময় অন্যান্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিষয়টি "ইজমা" (اِجْمَاعٌ)-এর কারণে مُسْتَثْنٰى বা ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে। আর এই ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ এই যে, এটা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বায় সলম'-এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সাধারণত 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে দ্রব্যের ক্রয় স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়েই হয়ে থাকে।

قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ فِيْهِ كَيْلًا فَهُوَ مَكِيْلٌ أَبَدًا وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيْهِ، مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ، وَكُلُّ مَا نَصَّ عَلٰى تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ فِيْهِ وَزْنًا فَهُوَ مَوْزُوْنٌ أَبَدًا، وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيْهِ، مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوٰى مِنَ الْعُرْفِ، وَالْأَقْوٰى لَا يُتْرَكُ بِالْأَدْنٰى .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করে বিক্রয় হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে; যদিও জনগণ তাতে পাত্র-পরিমাপ পরিত্যাগ করে। যেমন– গম, যব, খেজুর এবং লবণ। আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে তিনি ওজনের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যদিও জনগণ তাতে ওজনের ভিত্তিতে পরিমাপ করা পরিত্যাগ করে। যেমন– স্বর্ণ ও রৌপ্য। কেননা, শরিয়তের স্পষ্ট বাণী লোক-প্রচলনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, আর অধিকতর শক্তিশালী বিষয়কে তার চেয়ে দুর্বল বিষয়ের কারণে পরিত্যাগ করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : এখানে বলা হয়েছে যে, মাসআলা হলো, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যেমন– গম, যব, খেজুর এবং লবণ। এ চারটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে। কেননা, এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লিখিত হাদীসে এ চারটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে كَيْلًا بِكَيْلٍ এক 'কাইল' [পাত্র] -এর বিনিময়ে এক 'কাইল' উল্লেখ করেছেন। এগুলোর ক্ষেত্রে যদি পরবর্তী যুগে সমাজে পাত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করার প্রচলন নাও থাকে তবু এগুলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলেই গণ্য হবে। সুতরাং এগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [যদি একই শ্রেণীর দ্রব্য হয়, তবে] পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে উভয় দিকে সমান সমান করা আবশ্যক হবে। ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করা যথেষ্ট হবে না।

আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ ওজনের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বকালের জন্যই ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। যেমন– স্বর্ণ ও রৌপ্য এ দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসে وَزْنًا بِوَزْنٍ "নির্দিষ্ট ওজন পরিমাপের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ" উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জনসমাজে যদি এগুলো ওজনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন নাও থাকে তবু এগুলো ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। অতএব [একই শ্রেণীর হলে] পাত্র দ্বারা মেপে উভয় দিকে সমান সমান করা যথেষ্ট হবে না; বরং ওজনের দিক থেকে সমান সমান করা আবশ্যক হবে।

মাসআলাটি উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হলো অর্থাৎ "যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন" সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে এটাই এ মাসআলার সঠিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যে সে সকল দ্রব্য নবী করীম ﷺ -এর যুগে পাত্র- পরিমাপিত দ্রব্য ছিল তা সর্বকালের জন্যই পাত্র-পরিমাপিত থাকবে; বরং যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ কমবেশি করে বিক্রয় করা

নিষেধ করেছেন "পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে" সে সকল দ্রব্য সর্বকালের জন্য পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হবে। 'মতন' -এর ইবারত থেকে এ মর্মটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহ যেমন ফতোওয়ায়ে শামী ও অন্যান্য গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) মাসআলাটির যে দলিল বর্ণনা করেছেন তাও এর প্রমাণ বহন করে। কিন্তু হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল্লামা আইনী (র.)-এর আল-বিনায়াহ-তে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

وَحَاصِلُهُ اَنَّ مَا كَانَ مَكِيْلًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُغَيَّرُ اَبَدًا عَنْ ذٰلِكَ .

"যে সকল দ্রব্য নবী করীম ﷺ-এর যুগে পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে প্রচলিত ছিল তা সর্বদাই পাত্র-পরিমাপিত বলে গণ্য হবে, কখনও তা পরিবর্তন হবে না।" হিদায়ার উর্দূ ব্যাখ্যাগ্রন্থ اَشْرَفُ الْهِدَايَةِ-য়ও এ ব্যাখ্যাটিই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি সঠিক বলে মনে হয় না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ لِاَنَّ النَّصَّ اَقْوٰى مِنَ الْعُرْفِ الخ : মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত মাসআলার দলিল বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম ﷺ যা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো نَصّ বা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" আর জনগণ যা প্রচলন করে তা হলো عُرْف 'লোক-প্রচলন'। আর نَصّ তথা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" عُرْف [জন-প্রচলন] -এর তুলনায় শক্তিশালী দলিল। আর শক্তিশালী দলিল দুর্বল দলিলের কারণে পরিহার করা যায় না। সুতরাং নবী করীম ﷺ যা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করছেন তা লোক-প্রচলনের কারণে পরিবর্তিত হবে না।

عُرْف "লোক-প্রচলন" -এর তুলানায় نَصّ বা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" শক্তিশালী হওয়ার কারণ হলো–

১. "লোক-প্রচলন" নাজায়েজ বা অন্যায় বিষয়ের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন– আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর যুগে ঈদের রাতে কবরস্থানে মোমবাতি ও চেরাগ নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পক্ষান্তরে نَصّ তথা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" প্রমাণিত হওয়ার পর তা অন্যায়মূলক বা নাজায়েজমূলক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

২. শরিয়তে "লোক-প্রচলন" শুধু তাদের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য হয়, যাদের সমাজে তা প্রচলিত হয়েছে এবং তা গ্রহণ করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে نَصّ তথা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" সকলের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে গণ্য এবং প্রযোজ্য। সুতরাং তা অধিক শক্তিশালী।

৩. "লোক-প্রচলন" শরিয়তে দলিল হিসেবে গণ্য হয়েছে نَصّ তথা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" -এর কারণে। সুতরাং যখন نَصّ তথা "শরিয়তের স্পষ্ট বাণী" বিদ্যমান থাকবে, তখন "লোক-প্রচলন" ধর্তব্য হবে না বা দলিল হিসেবে গণ্য হবে না।

وَمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى عَادَاتِ النَّاسِ، لِأَنَّهَا دَالَّةٌ، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ عَلٰى خِلَافِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّصَّ عَلٰى ذٰلِكَ لِمَكَانِ الْعَادَةِ، فَكَانَتْ هِيَ الْمَنْظُوْرُ إِلَيْهَا، وَقَدْ تَبَدَّلَتْ، فَعَلٰى هٰذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَةَ بِجِنْسِهَا مُتَسَاوِيًا وَزْنًا أَوِ الذَّهَبَ بِجِنْسِهِ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا لَا يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا، وَإِنْ تَعَارَفُوْا ذٰلِكَ لِتَوَهُّمِ الْفَضْلِ عَلٰى مَا هُوَ الْمِعْيَارُ فِيْهِ، كَمَا إِذَا بَاعَ مُجَازَفَةً، إِلَّا أَنَّهُ يَجُوْزُ الْإِسْلَامُ فِي الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا وَزْنًا لِوُجُوْدِ الْإِسْلَامِ فِيْ مَعْلُوْمٍ -

অনুবাদ : আর যে সকল দ্রব্য সম্পর্কে নবী করীম ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি, সে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা, লোক-প্রচলন জায়েজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে [অপর একটি রেওয়ায়াতে] বর্ণিত হয়েছে যে, শরিয়তে স্পষ্টভাবে যা [পাত্র-পরিমাপিত বা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে] উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীতেও লোক-প্রচলন ধর্তব্য হবে। কেননা, শরিয়তের বাণীতে, সেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে [তখনকার] লোক-প্রচলনের কারণেই। কাজেই লোক-প্রচলনই হলো মূল লক্ষণীয় বিষয়। আর তখনকার প্রচলন পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে গেছে [তাই পরিবর্তিত প্রচলনই ধর্তব্য হবে]। এই মতবিরোধের উপর ভিত্তি করে [বিধান হলো,] যদি কেউ গমের বিনিময়ে গম ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না– যদিও জনগণ এভাবে পরিমাপ করে বিক্রয়ের প্রচলন করে থাকে। কেননা, এ ক্ষেত্রে শরিয়তের যেটা পরিমাপ-মাধ্যম তার ভিত্তিতে এক পক্ষে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন উক্ত দ্রব্যদ্বয় অনুমানের মাধ্যমে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে [একই কারণে নাজায়েজ হয়]। তবে গম বা গম জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ওজনের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ হবে। কেননা, [ওজন উল্লেখের মাধ্যমে] সুনির্দিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করা হয়েছে, [আর সুনির্দিষ্ট হওয়াই হলো, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত, তা যেভাবেই হোক না কেন]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ ওজন-পরিমাপিত হওয়া কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি, সে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে, অর্থাৎ লোক-প্রচলনে যদি তা ওজনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে, আর যদি লোক-প্রচলনে তা পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে তা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য করা হবে। কেননা, যে সকল ক্ষেত্রে نَصٌّ বা শরিয়তের বাণী বিদ্যমান নেই সে সকল ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন (عُرْف)-ই প্রচলিত বিষয়ের বৈধতার প্রমাণ বহন করে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– " مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ " "মুসলমানগণ যা ভাল মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভাল।" [উল্লেখ্য, হাদীসটি ব্যাখ্যাকারগণ مَرْفُوْع হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তবে এটি مَرْفُوْع হাদীস নয়; বরং হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত مَوْقُوْف হাদীস। দ্র. اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ। হাদীস নং ৯৫৯] এছাড়া নবী করীম ﷺ বলেছেন– " لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلٰى ضَلَالَةٍ " "আমার উম্মত কোনো ভ্রান্ত বিষয়ের উপর একমত হবে না।"

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি অপ্রসিদ্ধ (غَيْر مَشْهُور) রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মতে সর্বাবস্থাতেই লোক-প্রচলন ধর্তব্য হবে, অর্থাৎ শরিয়তে ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হলেও লোক-প্রচলন যদি তার বিপরীত হয় তবে লোক-প্রচলনই ধর্তব্য হবে। কেননা, হাদীসে যে সকল দ্রব্যকে ওজন-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নবী করীম ﷺ-এর যুগের লোক-প্রচলনের কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ যে সকল দ্রব্যকে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তাও সে যুগের লোক-প্রচলনের কারণেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মূল বিষয় ছিল লোক-প্রচলন। অতএব লোক-প্রচলন যদি পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবর্তিত লোক-প্রচলনই ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের জবাব দেওয়া হয় যে, যেখানে نَصّ বা শরিয়তের স্পষ্ট বাণী বিদ্যমান থাকে সেখানে عُرْف বা লোক-প্রচলন ধর্তব্য হয় না, যার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও যেহেতু نَصّ বিদ্যমান আছে সেহেতু عُرْف বা লোক-প্রচলন ধর্তব্য হবে না। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ জবাব ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলের বিপরীতে যথার্থ নয়। কেননা, তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এ ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন نَصّ-এর বিপরীত হচ্ছে না; বরং نَصّ-এর অনুকূলেই হচ্ছে। কেননা, نَصّ-এ উক্ত দ্রব্যসমূহকে ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখই করা হয়েছে লোক-প্রচলন (عُرْف)-এর কারণে। কাজেই نَصّ-এর ক্ষেত্রেও মূল বিষয় ছিল লোক-প্রচলন। উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত অপ্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতটির দলিলকে তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ فَعَلَى هٰذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَةَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মতবিরোধের ভিত্তিতে নিম্নের মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে طَرَفَيْن তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মাসআলা হলো, কেউ গমের বিনিময়ে গম ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করল অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করল, তাহলে লোক-সমাজে এভাবে প্রচলন থাকলেও [অর্থাৎ গম ওজনের ভিত্তিতে আর স্বর্ণ পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন থাকলেও] طَرَفَيْن তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে না। কেননা, نَصّ বা শরিয়তের বাণীতে গমকে পাত্র-পরিমাপিত আর স্বর্ণকে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং গমকে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে, আর স্বর্ণকে ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করা অপরিহার্য হবে। আর আলোচ্য সুরতে এর বিপরীত মাধ্যমে সমান সমান করা হয়েছে। ফলে শরিয়তের নির্ধারিত পরিমাপ পদ্ধতিতে তাতে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, উভয় পক্ষের গম ওজনে সমান সমান হওয়া সত্ত্বেও পাত্রের মাপে কমবেশি হতে পারে, যেহেতু গম শুকনা হলে তার ওজন কম হয় আর তাজা হলে ওজন বেশি হয়। আর এই কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা বা সন্দেহ থাকার কারণে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে প্রকৃত কমবেশি হওয়ার কারণে যেরূপ ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়, তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সন্দেহের কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। যেমন 'রিবা' বা সুদের আওতাভুক্ত দ্রব্যসমূহ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করলে তা হারাম হয়, কেননা, তাতে কমবেশি হওয়ার সন্দেহ থাকে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত উক্ত রেওয়ায়েত অনুসারে উক্ত সুরতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, তাঁর মতে লোক-সমাজে যে পদ্ধতিতে পরিমাপ করে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন হবে সেই পদ্ধতিতেই সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যক হবে। আর উক্ত সুরতে সে অনুযায়ী বিক্রয় করা হয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِسْلَامُ فِي الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا وَزْنًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) طَرَفَيْن তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে পূর্বের মাসআলার ব্যতিক্রম বিধান উল্লেখ করছেন। অর্থাৎ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যে সকল দ্রব্য নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা সর্বদা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে" এর দাবি অনুযায়ী কেউ যদি ওজনের ভিত্তিতে গম 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় করে, তাহলে তা নাজায়েজ হওয়ার কথা। কেননা, গম নবী করীম ﷺ পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে ওজনের ভিত্তিতে গম বিক্রয় করা طَرَفَيْن-এর মতেও জায়েজ। এর কারণ হলো, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য সমান সমান হওয়ার কোনো শর্ত নেই, বরং এ ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো, দ্রব্যটি এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে বিবাদের সম্ভাবনা না থাকে। আর ওজনের ভিত্তিতে গম বিক্রয় করলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে গমের বিনিময়ে গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমতা বিধান অপরিহার্য। আর এ সমতা শরয়ী পরিমাপ তথা পাত্র-পরিমাপের মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّطْلِ فَهُوَ وَزْنِيٌّ، مَعْنَاهُ مَا يُبَاعُ بِالْاَوَاقِيْ، لِأَنَّهَا قُدِّرَتْ بِطَرِيْقِ الْوَزْنِ، حَتّٰى يُحْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزْنًا ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْمَكَائِيْلِ، وَإِذَا كَانَ مَوْزُوْنًا فَلَوْ بِيْعَ بِمِكْيَالٍ لَا يُعْرَفُ وَزْنُهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوْزُ لِتَوَهُّمِ الْفَضْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যে সকল দ্রব্যের পরিমাপ 'রিতল' (رطل)-এর সাথে সম্পৃক্ত তা ওজন-পরিমাপিত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যা 'উকিয়্যা' পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কেননা, এ পাত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ওজনের ভিত্তিতে। এজন্যই এর মাধ্যমে মেপে যা বিক্রয় করা হয় তা হিসাব করা হয় ওজনের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে পরিমাপের অন্যান্য পাত্রের বিষয় এর বিপরীত [অর্থাৎ তা দ্বারা মাপা দ্রব্য ওজনের ভিত্তিতে হিসাব করা হয় না]। আর যখন 'রিতল' (رطل)-এর সাথে সম্পৃক্ত দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত বলে গণ্য হলো, সুতরাং এরূপ দ্রব্য যদি এমন এক পাত্র দ্বারা বিক্রয় করে যার [অন্তস্থিত দ্রব্যের] ওজন জানা নেই অনুরূপ এক পাত্র পরিমাণ দ্রব্যের বিনিময়ে তাহলে তা জায়েজ হবে না। কেননা, ওজনের দিক থেকে উভয় দ্রব্যের কোনো এক দিকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে [কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তা জায়েজ হয় না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّطْلِ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) যে সকল দ্রব্য লোক-প্রচলনে رطل [রিতল] হিসেবে বিক্রয় করা হয় [যেমন– তেল] তা কি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে নাকি পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে– তা বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, رطل [রিতল] মূলত ওজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি পরিমাণের নাম, কিন্তু পরিমাপের সুবিধার্থে তা সাধারণত নির্দিষ্ট পাত্রের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। ফলে ধারণা হতে পারে যে, এটা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য, তাই ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, رطل হিসেবে বিক্রয় প্রচলিত দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। আর رطل [রিতল] হলো তুলনামূলক একটি বড় পরিমাণের নাম যার একক হলো أوقية বহুবচনে أواقي অর্থাৎ কোনো অঞ্চলে ১২ أوقية [উকিয়্যা]-এ এক رطل হতো, আর কোনো অঞ্চলে ২০ أوقية-এ এক رطل হতো। সুতরাং أوقية হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তাও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য বলে গণ্য হবে। কেননা, رطل এবং أوقية হিসেবে বিক্রীত দ্রব্য নির্দিষ্ট পাত্রের মাধ্যমে মেপে দেওয়ার প্রচলন থাকলেও উভয়টির পরিমাণ মূলত নির্ধারণ করা হয়েছে ওজন হিসেবে। অবশ্য এর পরিমাণ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর যুগে ইস্কান্দারিয়ায় এক رطل হতো তিনশত বার দিরহাম ওজন সমপরিমাণ, মিশরে ছিল একশত চুয়াল্লিশ দিরহাম সমপরিমাণ, আর ইরাকে ছিল একশত আঠাশ দিরহাম সমপরিমাণ। আর ইরাকের প্রচলিত এ رطل-এর কথাই হযরত আবূ উবায়দাহ উল্লেখ করেছেন এবং ফকীহগণও এ ইরাকী رطل-এর হিসেবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। আর ইস্কান্দারিয়ায় এক رطل হলো ১২ أوقية-এ। আর অনেক অঞ্চলে হতো বিশ أوقية-এ, আর নবী করীম ﷺ-এর যুগে এক أوقية হতো চল্লিশ দিরহামে। সারকথা স্থান ও কালভেদে এর পরিমাণ বিভিন্ন রকমের হয়েছে। তবে পরিমাণটি ছিল ওজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে كَيْل হিসেবে বা صَاع কিংবা مُدّ হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ مَوْزُوْنًا فَلَوْ بِيْعَ بِمِكْيَالٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, رطل বা أوقية হিসেবে যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তা যেহেতু ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য সেহেতু কেউ যদি সে সকল দ্রব্য এভাবে বিক্রয় করে যে, নির্দিষ্ট একটি পাত্র পরিমাণ দ্রব্য অনুরূপ এক পাত্র দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করল, কিন্তু উক্ত পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যের ওজন কতটুকু তা জানা নেই, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, উক্ত দ্রব্য হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত, সুতরাং তা ওজন হিসেবেই সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যক হবে। অতএব যখন উক্ত পাত্রের দ্রব্যের ওজন জানা নেই তখন যে কোনো এক পক্ষে ওজনের দিক থেকে কম বা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। যেমন– 'রিবা'-এর দ্রব্যসমূহ কেউ যদি অনুমানের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করে, তাহলে তা হারাম হয়। কেননা, শরয়ী পরিমাপের মাধ্যমে তা সমান সমান করা অপরিহার্য।

قَالَ : وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَا وَقَعَ عَلٰى جِنْسِ الْاَثْمَانِ يُعْتَبَرُ فِيْهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِى الْمَجْلِسِ، لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءً وَهَاءً مَعْنَاهُ يَدًا بِيَدٍ وَسَنُبَيِّنُ الْفِقْهَ فِى الصَّرْفِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বায় সরফ'-এর চুক্তি তথা যে চুক্তিতে উভয় পক্ষে মুদ্রা-দ্রব্য থাকে, তাতে চুক্তির মজলিসেই উভয় বিনিময়দ্রব্য উভয়ের হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءً وَهَاءً "রূপার বিনিময়ে রূপার বিক্রয় [এভাবে হবে যে, একজন বলবে] এই নাও [অপর জন বলবে] এই নাও।" এর অর্থ হলো, হাতে হাতে আদান প্রদান করবে। এ শর্ত আরোপের তাৎপর্য আমরা –ইনশাআল্লাহ– 'সরফ' -এর অধ্যায়ে আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هَاءً وَهَاءً – শব্দ দুটি مَبْنِى بَرْ فَتْحَه অর্থাৎ সর্বাবস্থায় হামযার উপর যবর হবে। এর অর্থ হচ্ছে– خُذْ [এই নাও] । সুতরাং এখানে অর্থ হলো, ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে বলবে 'এই নাও' অর্থাৎ হাতে হাতে আদান প্রদান করবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উভয় দিকে মুদ্রা-দ্রব্য হয় [অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়, কেননা স্বর্ণ ও রৌপ্য সৃষ্টিগত দিক থেকেই মুদ্রাদ্রব্য বলে গণ্য] তাহলে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ' বলা হয়। 'বায় সরফ'-এর দুটি সুরত হতে পারে–

১. উভয় দিকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য।

২. এক দিকে স্বর্ণ আর অপর দিকে রৌপ্য।

প্রথম সুরতে উভয় দিকে সমান সমান হওয়া এবং মজলিসে উভয়ের হস্তগত করা এ দুটি বিষয়ই শর্ত। আর দ্বিতীয় সুরতে কেবল মজলিসে উভয়ের হস্তগত করা শর্ত, কিন্তু সমান সমান হওয়া শর্ত নয়। [উল্লেখ্য, এখানে মজলিসে হস্তগত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা। সুতরাং যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তি সম্পাদনের পর উভয়ে মজলিস ছেড়ে একত্রে কয়েক মাইল হাঁটতে থাকে অবশেষে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ে অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নেয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে।]

قَوْلُهٗ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করছেন যে, এ ক্ষেত্রে দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী– اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ هَاءً وَهَاءً "রূপার বিনিময়ে রূপার বিক্রয় [এভাবে হবে যে, একজন বলবে] এই নাও [অপর জন বলবে] এই নাও।"

উল্লেখ্য, এটি হাদীসের একটি অংশ। হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবায় হযরত ওমর (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" ـ

আর বুখারী ও মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ الخ ـ

قَوْلُهٗ وَسَنُبَيِّنُ الْفِقْهَ فِى الصَّرْفِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার কারণ ও হিকমত আমরা 'বায় সরফ' -এর অধ্যায়ে উল্লেখ করব। [মূল গ্রন্থের ৮৯ নং পৃষ্ঠার শুরুতে 'বায় সরফ' -এর অধ্যায়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মুসান্নিফ (র.) এ আলোচনা করেছেন।]

قَالَ : وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبٰوا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُضُ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (رح) فِي بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ "يَدًا بِيَدٍ" ، وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ فِي الْمَجْلِسِ يَتَعَاقَبُ الْقَبْضُ، وَلِلنَّقْدِ مَزِيَّةٌ فَيَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ الرِّبٰوا . وَلَنَا أَنَّهُ مَبِيعٌ مُتَعَيِّنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَالثَّوْبِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْفَائِدَةَ الْمَطْلُوبَةَ إِنَّمَا هُوَ التَّمَكُّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ، وَيَتَرَتَّبُ ذٰلِكَ عَلَى التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الصَّرْفِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ، وَمَعْنٰى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "يَدًا بِيَدٍ" عَيْنًا بِعَيْنٍ كَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ (رض) وَتَعَاقُبُ الْقَبْضِ لَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتًا فِي الْمَالِ عُرْفًا بِخِلَافِ النَّقْدِ وَالْمُؤَجَّلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য যে সকল দ্রব্য 'রিবা'ভুক্ত সেগুলো ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [চুক্তির মজলিসে কেবল] দ্রব্যটি নির্দিষ্ট করা আবশ্যক ; উভয় পক্ষের হস্তগত করা আবশ্যক নয়। কিন্তু খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয়ে উক্ত বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে [তাঁর মতে সে ক্ষেত্রে মজলিসেই তা উভয়ের হস্তগত করা আবশ্যক]। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, [পূর্বে উল্লিখিত 'রিবা' সম্পর্কিত] প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর এই বাণী– يَدًا بِيَدٍ "হাতে হাতে" [অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য তোমরা বিক্রয় করে তা নগদ হাতে হাতে আদান প্রদান কর]। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, যদি চুক্তির মজলিসেই উভয়ে হস্তগত না করে তাহলে উভয়ের কব্জা [হস্তগত করা] আগে পিছে হবে, আর নগদ বা আগে হস্তগত করার মাঝে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বা লাভ রয়েছে। ফলে 'রিবা' [বা এক পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া]-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। [আর 'রিবা'-এর সন্দেহ সাব্যস্ত হলে তা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়।] আর আমাদের দলিল হলো, এটা [অর্থাৎ মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য] হচ্ছে এমন বিক্রীত-দ্রব্য যা নির্দিষ্ট, কাজেই তা মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হবে না। যেমন কাপড় [এর ক্ষেত্রে ঐকমত্যে মজলিসে হস্তগত করা শর্ত নয়]। এর কারণ হচ্ছে এই যে, [ক্রয়-বিক্রয়ের] উদ্দিষ্ট ফায়দা বা লাভ হচ্ছে দ্রব্যটি কাজে লাগানোর সক্ষমতা অর্জন করা। আর তা নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় [তাই কব্জা করা শর্ত থাকবে না]। পক্ষান্তরে 'বায় সরফ' [যাতে উভয় পক্ষে মুদ্রা-দ্রব্য হয়] এর বিষয় ভিন্ন। কেননা, তাতে [মজলিসেই] কব্জা করা এজন্য আবশ্যক, যাতে দ্রব্যদ্বয় নির্দিষ্ট হয়ে যায় [কেননা, মুদ্রা-দ্রব্য কব্জা করার পূর্বে নির্দিষ্ট হয় না]। আর নবী করীম ﷺ-এর বাণী– يَدًا بِيَدٍ "হাতে হাতে"-এর অর্থ হলো, "নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু"। যেমন–হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর 'কব্জা আগে পিছে হওয়া' লোক-প্রচলনে সম্পদের মাঝে [মূল্যের দিক থেকে] তারতম্য সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হয় না। পক্ষান্তরে নগদ এবং বাকি বিক্রয়ের বিষয় ভিন্ন [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে নগদ ও বাকির কারণে সম্পদের মূল্যের তারতম্য হয় বলে লোক-প্রচলনে বিবেচনা করা হয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيْهِ الخ : মাসআলা হলো, মুদ্রাদ্রব্য তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দ্রব্য 'রিবা'ভুক্ত [যেমন– ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য] তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়; বরং কেবল তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে চাই উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হোক [যেমন– গমের বিনিময়ে গম] কিংবা উভয় দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হোক [যেমন– গমের বিনিময়ে যব] উভয় সুরতেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়; বরং মজলিসে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।

এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে যদি উভয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্য হয়, তাহলে মজলিসেই তা হস্তগত করা আবশ্যক হবে। সুতরাং যদি উভয়ে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْحَدِيْثِ الْمَعْرُوْفِ "يَدًا بِيَدٍ" : মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর স্বপক্ষে দুটি দলিল উল্লেখ করেছেন, প্রথমটি নকলী আর দ্বিতীয়টি আকলী। তাঁর নকলী দলিল হলো, 'রিবা' সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস [হাদীসটি এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হাদীসটি হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত ও হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে]। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন– يَدًا بِيَدٍ "হাতে হাতে" অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যগুলো [স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, লবণ, খেজুর] সমান সমান করে এবং "হাতে হাতে" বিক্রয় করতে হবে। আর এখানে يَدًا بِيَدٍ "হাতে হাতে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নগদ হস্তগত করা। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, 'রিবা'ভুক্ত সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক, চাই তা স্বর্ণ-রৌপ্য হোক বা অন্য দ্রব্য হোক। [উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্বর্ণ-রৌপ্য ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য 'রিবা'ভুক্ত নয়, তাই সেগুলো তাঁর মতে মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়।]

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْبِضْ فِى الْمَجْلِسِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিল হলো, যদি উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা না হয় তাহলে এক পক্ষের দ্রব্য আগে হস্তগত করা হবে আর আরেক পক্ষের দ্রব্য পরে হস্তগত করা হবে। আর যা আগে হস্তগত করা হবে তার মূল্যমান অপরটির চেয়ে বেশি হবে [এ কারণেই তো নগদ দ্রব্যের মূল্য বেশি হয় আর বাকি দ্রব্যের মূল্য কম হয়]। ফলে 'রিবা' বা অতিরিক্ততার সন্দেহ সাব্যস্ত হবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত অতিরিক্ততার কারণে যেরূপ ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয় তদ্রূপ 'অতিরিক্ততার সন্দেহের' কারণেও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়। সুতরাং খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ مَبِيْعٌ مُتَعَيِّنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ الخ : আমাদের দলিল হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যে সকল দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হয় না। এর কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিকারীদ্বয়ের যে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তা হলো, ক্রয়কৃত দ্রব্যে ক্রেতার হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করা। আর এ উদ্দেশ্য দ্রব্যটি নির্দিষ্ট হওয়ার দ্বারাই অর্জিত হয়। নির্দিষ্ট হলেই দ্রব্যটিতে তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য তা মজলিসে হস্তগত করার আবশ্যকতা নেই। যেমন– কাপড়ের বিনিময়ে কাপড় কিংবা দাসের বিনিময়ে দাস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক নয়। কারণ, তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে 'বায় সরফ' তথা মুদ্রাদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক। কেননা, মুদ্রাদ্রব্য [স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা] নির্দিষ্ট করা হলেও তা হস্তগত করার পূর্বে নির্দিষ্ট হয় না। তাই নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য তা হস্তগত করা অপরিহার্য। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য তা মজলিসেই হস্তগত করা আবশ্যক হবে, অন্যথায় চুক্তির উদ্দেশ্য [হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করা] অর্জিত হবে না।

হানাফীদের উপর একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে হানাফী ওলামাগণের উপর একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো– যদি একটি স্বর্ণের পেয়ালার বিনিময়ে একটি স্বর্ণের পেয়ালা বিক্রয় করা হয়, তাহলে হানাফীগণের মতেও উভয় পেয়ালা বিক্রয়-মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক। অথচ স্বর্ণের পেয়ালা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, অতএব তা উপরিউক্ত কারণ [ইল্লাত] অনুযায়ী মজলিসে হস্তগত করা শর্ত না হওয়ার কথা। এ প্রশ্নের উত্তর হলো, স্বর্ণের পেয়ালা [বা মুদ্রা ছাড়া স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা তৈরি অন্যান্য দ্রব্য] যদিও নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় তথাপিও স্বর্ণ ও রৌপ্য যেহেতু সৃষ্টিগত দিক থেকেই মুদ্রা হিসেবে গণ্য, তাই তা নির্দিষ্ট হলেও অনির্দিষ্ট থাকার একটা সন্দেহ (شُبْهَة) থেকে যায় [কেননা, মুদ্রদ্রব্য অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে]। তাই স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বদা মজলিসে হস্তগত করা শর্ত করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "يَدًا بِيَدٍ" الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত নকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে– উক্ত হাদীসে উল্লিখিত يَدًا بِيَدٍ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَيْنًا بِعَيْنٍ "নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু"। অর্থাৎ রিবার আওতাভুক্ত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করা সহীহ হওয়ার জন্য উভয় দ্রব্য নির্দিষ্ট হতে হবে। আর উক্ত হাদীসে يَدًا بِيَدٍ দ্বারা যে عَيْنًا بِعَيْنٍ উদ্দেশ্য এর প্রমাণ হলো হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে يَدًا بِيَدٍ -এর পরিবর্তে عَيْنًا بِعَيْنٍ রয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبٰى .

আর عَيْنًا بِعَيْنٍ -এর কেবল একটিই অর্থ হতে পারে তা হলো 'নির্দিষ্টের বিনিময়ে নির্দিষ্ট বস্তু'। পক্ষান্তরে يدا بيد -এর দুটি অর্থ হতে পারে তা হলো–

ক. হাতে হাতে হস্তগত করা। কেননা, হাত হচ্ছে হস্তগত করার মাধ্যম।

খ. উভয়ে তাদের দ্রব্যদ্বয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কেননা, নির্দিষ্ট করা সাধারণত হাত দ্বারাই হয়ে থাকে।

অতএব এখানে يَدًا بِيَدٍ-এর দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করতে হবে যাতে উভয় হাদীসের অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়; নতুবা عَيْنًا بِعَيْنٍ -এর অর্থ পরিহার করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, 'রিবা'ভুক্ত দ্রব্যসমূহের ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে নির্দিষ্ট করা শর্ত; হস্তগত করা শর্ত নয়।

قَوْلُهُ وَتَعَاقُبُ الْقَبْضِ لَا يُعْتَبَرُ تَفَاوُتًا فِى الْمَالِ عُرْفًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত আকলী দলিলের জবাব দিয়েছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, যদি উভয় দ্রব্যের কোনোটি বাকি না হয় [উল্লেখ্য, বাকির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা অনির্দিষ্ট থাকে এবং পরিশোধের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। আর যা মজলিসে নির্দিষ্ট করা হয় এবং পরে হস্তগত করা হয় তা বাকি বলে গণ্য নয়।] বরং উভয় দ্রব্যই মজলিসে নির্দিষ্ট করা হয় অতঃপর একটি মজলিসে হস্তগত করা হয় আর অপরটি মজলিসের পরে হস্তগত করা হয়, তাহলে লোক-প্রচলনে এই আগে পরে হস্তগত করার কারণে দ্রব্যের মূল্যের মাঝে তারতম্য ধরা হয় না। অর্থাৎ এরূপ বিবেচিত হয় না যে, যে দ্রব্যটি মজলিসে হস্তগত করা হয়েছে তার মূল্য বেশি হবে, আর যে দ্রব্য পরে হস্তগত করা হয়েছে তার মূল্য কম হবে; বরং মূল্যের দিক থেকে এ ক্ষেত্রে সমানই গণ্য করা হয়। সুতরাং যখন লোক-প্রচলনে এ ক্ষেত্রে মূল্যের মাঝে কমবেশি হয় না তখন রিবা [সুদ]-এর সন্দেহও সাব্যস্ত হবে না। কাজেই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে যদি উভয় দ্রব্যের একটি নগদ হয় আর অপরটি বাকি হয় [অর্থাৎ নির্দিষ্ট করা না হয় এবং তা পরিশোধের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়] তাহলে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। কেননা, নগদ ও বাকির কারণে লোক-প্রচলনে দ্রব্যের মূল্য কমবেশি হয়ে থাকে, তাই সেখানে রিবা বা সুদের সন্দেহ (شُبْهَة) সাব্যস্ত হয়।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، وَالتَّمْرَةِ بِالتَّمْرَتَيْنِ، وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ، لِانْعِدَامِ الْمِعْيَارِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبٰوا، وَالشَّافِعِيُّ (رح) يُخَالِفُنَا فِيهِ لِوُجُوْدِ الطُّعْمِ عَلٰى مَا مَرَّ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম, দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর এবং দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এগুলো [শরিয়তের] পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন, [তাঁর মতে জায়েজ হবে না]। কেননা, [তাঁর মতে, 'রিবা'-এর 'ইল্লাত'] খাদ্যযোগ্যতা বিদ্যমান আছে, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ الخ : আমাদের মতে দুটি ডিমের বিনিময়ে একটি ডিম, দুটি খেজুরের বিনিময়ে একটি খেজুর, দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রয় করা জায়েজ আছে। তবে শর্ত হলো, উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করতে হবে। কোনো এক পক্ষের দ্রব্য যদি বাকি হয় তাহলে জায়েজ হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উল্লিখিত সবকয়টি সুরতেই ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে রিবা [সুদ] হারাম হওয়ার ইল্লাত হলো 'খাদ্যদ্রব্য হওয়া'। সুতরাং যদি উভয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্য হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে। আর উল্লিখিত সুরতগুলোতে উভয় দ্রব্য খাদ্যদ্রব্য, অতএব কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে।

আর আমাদের দলিল হলো, আমাদের মতে 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার ইল্লাত [কারণ] হলো, اَلْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ অর্থাৎ "উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া" [পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া বলতে কেবল উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমাপিত হওয়া উদ্দেশ্য। উভয় দ্রব্য গণনা-প্রচলিত হলে এর আওতাভুক্ত হবে না।] সুতরাং উল্লিখিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ডিম এবং আখরোট হচ্ছে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই তাতে قَدْر তথা 'পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া' পাওয়া যায়নি। আর খেজুর যদিও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য কিন্তু অর্ধ সা' نِصْفُ الصَّاعِ [প্রায় পৌনে দুই কেজি] পরিমাণের চেয়ে কম দ্রব্য হলে তা শরিয়তে পরিমাপ মাধ্যমের আওতাভুক্ত বলে গণ্য হয় না। সুতরাং একটি বা দুটি খেজুর পরিমাপ মাধ্যমের আওতাভুক্ত নয়। কাজেই তাতেও قَدْر বিদ্যমান নেই। অতএব ইল্লাত বিদ্যমান না থাকার কারণে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কিন্তু যেহেতু সব কয়টি সুরতেই উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক, আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হয়– পরিমাপ মাধ্যম এক না হয়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম [এর দলিল বিস্তারিতভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে]। সুতরাং উক্ত সুরতগুলোতে বাকি বিক্রয় করা হারাম হবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) وَأَبِي يُوسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةَ ثَبَتَتْ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، وَإِذَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا لَا تَتَعَيَّنُ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، وَكَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَهُمَا أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي حَقِّهِمَا تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَتَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، وَإِذَا بَطَلَتِ الثَّمَنِيَّةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَلَا يَعُودُ وَزْنِيًّا لِبَقَاءِ الْاِصْطِلَاحِ عَلَى الْعَدِّ إِذْ فِي نَقْضِهِ فِي حَقِّ الْعَدِّ فَسَادُ الْعَقْدِ فَصَارَ كَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ، بِخِلَافِ النُّقُودِ، لِأَنَّهَا لِلثَّمَنِيَّةِ خِلْقَةً، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا، لِأَنَّهُ كَالِئٌ، بِالْكَالِئِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ، لِأَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট দুটি পয়সার বিনিময়ে [নির্দিষ্ট] একটি পয়সা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা, সমাজের সকল মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে তা মূল্য-দ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তাদের দুজনের প্রয়োগের কারণে মূল্যদ্রব্য হওয়া বাতিল হবে না। আর যখন তা মূল্য-দ্রব্য হিসেবে বহাল থাকল তখন [নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও] তা নির্দিষ্ট হবে না। কাজেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় [বিধানের ক্ষেত্রে] দুটি অনির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে বিক্রয় করার মতো হলো। আর দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের মতো হলো [যা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ]। আর শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, পয়সা [যা সোনা-রূপা ব্যতীত অন্য ধাতু দ্বারা তৈরি তা সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রা-দ্রব্য নয়, কাজেই তা] চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের ব্যবহারের মাধ্যমেই। কেননা, তাদের উপর অন্যদের কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং তাদের প্রয়োগের মাধ্যমে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন [তাদের ক্ষেত্রে] মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া বাতিল হয়ে গেল তখন নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে [মুদ্রা-দ্রব্য হওয়া বাতিল হওয়ার কারণে] তা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যে ফিরে যাবে না। কারণ, গণনার ব্যাপারে তাদের সমঝোতা বহাল রয়েছে। কেননা, গণনার ব্যাপারে তাদের সমঝোতা ভঙ্গ করা হলে চুক্তিটি ফাসেদ হয়ে যাবে [অথচ তারা চুক্তি সহীহভাবে সম্পন্ন করতে চাচ্ছে]। কাজেই তাদের এ বিক্রয় 'দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোটের মতো' হলো [আর তা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ]। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা হচ্ছে 'দাইন' [অনির্দিষ্ট বস্তু]-এর বিনিময়ে 'দাইন' [অনির্দিষ্ট বস্তু] বিক্রয় করা। আর হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। এরূপভাবে [পয়সার বিনিময়ে পয়সা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] যে কোনো এক দিকের পয়সা যদি অনির্দিষ্ট থাকে, তবে সে সুরতের বিষয়টিও ভিন্ন [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। কেননা, শুধু উভয় দ্রব্যের একই শ্রেণীর হওয়া বাকি বিক্রয়কে হারাম করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْفَلْسُ : এর অর্থ হলো, এমন প্রচলিত মুদ্রা যা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি। এর বহুবচন হচ্ছে- فُلُوْسٌ এবং اَفْلُسٌ।

উল্লিখিত ইবারতে এরূপ ধাতবমুদ্রা অনুরূপ ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে কিনা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করার মোট চারটি সুরত হতে পারে–

১. একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।
২. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৩. একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।
৪. একটি নির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা অনুরূপ দুটি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা।

উক্ত চারটি সুরতের মধ্যে প্রথমোক্ত ৩ টি সুরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ। আর চতুর্থ সুরতে শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় একটি অভিমত। মুসান্নিফ (র.) উক্ত চতুর্থ সুরত নিয়েই আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ধাতবমুদ্রা মুদ্রারূপে পরিগণিত হয়েছে সর্বসাধারণের প্রচলনের মাধ্যমে। সুতরাং যদি চুক্তিকারীদ্বয় তথা ক্রেতা ও বিক্রেতা তা মুদ্রারূপে পরিগণিত না করে সাধারণ পণ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে চায় তাহলে তা সাধারণ পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না; বরং মুদ্রা হিসেবেই বহাল থাকবে। [এখানে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সুরতে চুক্তিকারীদ্বয় তাদের ধাতবমুদ্রা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে তা সাধারণ পণ্য হিসেবে পণ্য করতে চাচ্ছে বলে বিবেচিত হচ্ছে। কেননা, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুদ্রদ্রব্য সর্বদা জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়; তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। বরং এরূপ যে কোনো মুদ্রা দ্বারা তা পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু ধাতবমুদ্রা যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রদ্রব্য বলে গণ্য নয়, তাই শায়খাইন (র.) বলেন, নির্দিষ্ট করার দ্বারা তা পুনরায় সাধারণ পণ্যে পরিগণিত হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যেহেতু উক্ত ধাতবমুদ্রা সর্বসাধারণের প্রচলনের কারণে মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে সেহেতু তা শুধু চুক্তিকারীদ্বয়ের নির্দিষ্ট করার কারণে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য যেহেতু সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রদ্রব্য বলে গণ্য, তাই স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও তা সাধারণ পণ্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা মুদ্রা বলেই বিবেচিত হবে এবং তা অনির্দিষ্টই থেকে যাবে, আর এ ক্ষেত্রে কারো দ্বিমত নেই। সুতরাং [ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন,] যখন উক্ত ধাতবমুদ্রা মুদ্রারূপেই বহাল থাকল তখন তা নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে না। সুতরাং চতুর্থ সুরতটিও অন্যান্য ৩টি সুরতের ন্যায় হলো, [অর্থাৎ অন্যান্য ৩টি সুরতে যে-কোনো এক পক্ষের কিংবা উভয় পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকার কারণে শায়খাইন (র.)-এর মতেও ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েজ। অতএব, আলোচ্য সুরতেও একই কারণে নাজায়েজ হবে]।

قَوْلُهُ وَكَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আলোচ্য চতুর্থ সুরতটি দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের মতোই হলো [অর্থাৎ দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয় করা শায়খাইন (র.)-এর মতেও কোনো সুরতে বিক্রয় করা জায়েজ নয়, চাই তা নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক। সুতরাং ধাতবমুদ্রার ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে না]।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا اَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِيْ حَقِّهِمَا تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِهِمَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শায়খাইন (র.)-এর দলিল উল্লেখ করেছেন। তাঁদের দলিল হলো, ধাতবমুদ্রা যদিও সর্বসাধারণের প্রচলনের কারণে মুদ্রা বলে গণ্য হয়েছে, কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হয়েছে তাদের উভয়ের প্রচলনের কারণে। কেননা, তাদের উভয়ের উপর অন্যান্য জনগণের কোনো কর্তৃত্ব নেই। [অর্থাৎ চুক্তিকারীদ্বয় উক্ত প্রচলনের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সাথে শরিক ছিল এবং তারা এটাকে মুদ্রা বলে গণ্য করে নিয়েছে বিধায় মুদ্রা হয়েছে। তারা যদি মুদ্রা হিসেবে গণ্য না করে, তাহলে অন্যান্য জনগণের প্রচলনের কারণে তাদের ক্ষেত্রে এটা মুদ্রা হওয়া অপরিহার্য হবে না। কেননা, অন্যান্য জনগণের কোনো কর্তৃত্ব তাদের উভয়ের উপর নেই।] আর যখন চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হয়েছে তাদের প্রচলন মেনে নেওয়ার কারণে তখন তারা ইচ্ছা করলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য না করে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য করার অধিকার তাদের থাকবে। অতএব, আলোচ্য সুরাতে চুক্তিকারীদ্বয় যখন ধাতবমুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করে বিক্রয় করছে তখন বুঝা গেল যে, তারা এগুলো মুদ্রা হিসেবে না রেখে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করছে। আর সাধারণ দ্রব্য নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর যেহেতু ধাতবমুদ্রাগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য,

তাই সেগুলো 'রিবা'-এর ইল্লাত قَدْر তথা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ার আওতাভুক্ত হচ্ছে না [কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, قَدْر বা পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে উভয় দ্রব্য পাত্র-পরিমাপিত কিংবা ওজন-পরিমপিত হওয়া। আর এখানে তা হচ্ছে না]। আর যখন রিবা বা সুদ হারাম হওয়ার ইল্লাত [কারণ] বিদ্যমান নেই, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَلَا يَعُوْدُ وَزْنِيًّا لِبَقَاءِ الْاِصْطِلَاحِ عَلَى الْعَدِّ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শায়খাইন (র.)-এর দলিলের উপর উত্থাপিত হতে পারে এরূপ একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ধাতবমুদ্রা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হয়েছে তা মুদ্রারূপে গণ্য হওয়ার পর। মুদ্রা হওয়ার পূর্বে তা ছিল ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। সুতরাং শায়খাইন (র.)-এর মতানুযায়ী যখন তা চুক্তিকারীদ্বয়ের নির্দিষ্ট করার কারণে মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে গেছে তখন তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়াও বাতিল হয়ে গেছে এবং তার পূর্বের অবস্থা তথা ওজন-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। আর যখন উভয় পণ্য ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং তাদের শ্রেণীও এক তখন তা 'রিবা' [সুদের] ইল্লাতের আওতাভুক্ত হয়েছে। কাজেই তা কমবেশি করে দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা হারাম হওয়ার কথা। তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতানুসারে তা কীভাবে জায়েজ হলো?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, ধাতবমুদ্রার মাঝে দুটি বিষয় ছিল– ১. তা মুদ্রা হওয়া। ২. তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়া। আর চুক্তিকারীদ্বয়ও সর্বসাধারণের ন্যায় উভয় বিষয়টি মেনে নিয়েছিল। অতঃপর ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তারা যখন মুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করেছে তখন সেগুলোর মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়েছে, কিন্তু সেগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়ার বিষয়টি বাতিল হয়নি; কেননা, চুক্তিকারীদ্বয় সেগুলোকে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেই বহাল রাখতে চাচ্ছে। কারণ, তারা চাচ্ছে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হোক, আর তা অর্জিত হবে যদি সেগুলো গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবে বহাল থাকে। নতুবা বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে, যা তাদের কাম্য নয়। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয়টি দুটি আখরোটের বিনিময়ে একটি আখরোট বিক্রয়ের মতোই হলো [অর্থাৎ আখরোট গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হওয়ার কারণে দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা যেমন সকলের মতে জায়েজ, তদ্রূপ আলোচ্য সুরতে ধাতবমুদ্রাও দুটির বিনিময়ে একটি বিক্রয় করা জায়েজ হবে]।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ النُّقُوْدِ لِاَنَّهَا لِلثَّمَنِيَّةِ خِلْقَةً : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য চতুর্থ সুরতটিকে ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে "দুটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয়ের" মাসআলার সাথে কিয়াস করেছেন তার জবাব দিচ্ছেন। জবাব হলো, ধাতবমুদ্রার বিষয়টি রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে কিয়াস করা সঠিক হবে না। কারণ, স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রা সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রা বলে গণ্য, ফলে চুক্তিকারীদ্বয় তা [নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে] মুদ্রা হওয়া বাতিল করতে চাইলেও তা বাতিল হবে না; বরং তা মুদ্রা হিসেবে বহাল থাকবে এবং অনির্দিষ্টই থেকে যাবে। সুতরাং তা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য চতুর্থ সুরতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) যে প্রথম সুরত তথা "দুটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে একটি অনির্দিষ্ট ধাতবমুদ্রা" বিক্রয়ের উপর কিয়াস করেছেন [যা শায়খাইন (র.)-এর মতেও নাজায়েজ] তার জবাব দিচ্ছেন। জবাব হলো, যদি উভয় পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তখন বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হচ্ছে তা بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ অর্থাৎ "যা অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয় এরূপ বস্তুর বিনিময় তদ্রূপ অনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয় করা"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর নবী করীম ﷺ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [উল্লেখ্য, হাদীসটি দারাকুতনী, মুসনাদে হাকিম, মুসনাদে বায্যার, মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ গ্রন্থসমূহে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– " نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُبَاعَ كَالِئٌ بِكَالِئٍ " হাদীসটির সনদ দুর্বল, তবে হাদীসটির মর্মার্থ অর্থাৎ "দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রি করা" নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা সকল ইমামগণের ঐকমত্য রয়েছে।]

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا اِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ الخ : এখানেও মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন যে, আলোচ্য চতুর্থ সুরতকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুরত [তথা এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা যদি অনির্দিষ্ট থাকে সে সুরত]-এর সাথে কিয়াস করাও সঠিক হবে না। কেননা, যদি এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, যদি কোনো এক পক্ষের ধাতবমুদ্রা অনির্দিষ্ট থাকে তাহলে তা বাকি বলে গণ্য হবে, আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি 'রিবা' হারাম হওয়ার 'ইল্লাত'-এর দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি পাওয়া যায়, তাহলে বাকি বিক্রয় করা হারাম হয়। আর এখানে একটি বিষয় পাওয়া গেছে, তা হলো উভয় দ্রব্যের শ্রেণী এক হওয়া। পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য চতুর্থ সুরতে যেহেতু উভয় দিকের মুদ্রা নির্দিষ্ট, তাই তা বাকি হচ্ছে না। সুতরাং তা জায়েজ।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلَا بِالسَّوِيقِ، لِأَنَّ الْمُجَانَسَةَ بَاقِيَةٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَجْزَاءِ الْحِنْطَةِ، وَالْمِعْيَارُ فِيهِمَا الْكَيْلُ، لٰكِنَّ الْكَيْلَ غَيْرُ مُسَوٍّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحِنْطَةِ لِاكْتِنَازِهِمَا فِيهِ وَتَخَلْخُلِ حَبَّاتِ الْحِنْطَةِ فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ كَيْلًا بِكَيْلٍ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর আটার বিনিময়ে কিংবা ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, আটা এবং ছাতু গমেরই গুঁড়ো অংশ, তাই এক দিক থেকে গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার গুণ বিদ্যমান রয়েছে [যা 'রিবা' হারাম হওয়ার একটি 'ইল্লাত'] আর উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম হচ্ছে পাত্র। কিন্তু পাত্র-পরিমাপ ছাতু কিংবা আটা আর গমের মাঝে সমতা নির্ধারণ করতে পারে না। কেননা, আটা কিংবা ছাতু পাত্রের মাঝে ভরাট হয়ে থাকে আর গমের দানা ফাঁক ফাঁক হয়ে থাকে। কাজেই এক 'কাইল' পরিমাণের বিনিময়ে এক 'কাইল' পরিমাণ বিক্রয় করা সত্ত্বেও [সমান সমান সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে] তা জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الخ :

মাসআলা : আমাদের মতে আটার বিমিময়ে গম বিক্রয় করা কিংবা গমের তৈরি ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রয় করা জায়েজ নয়। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও প্রসিদ্ধতম অভিমত এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত দুটি অভিমতের একটি অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধতম অভিমত হলো, উভয় সুরতেই বিক্রয় জায়েজ হবে।

ইমাম মালিক (র.)-এর দলিল হলো, গমের আটা এবং গমের ছাতু প্রকৃতপক্ষে গমই, শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, গমের অংশসমূকে বিভাজিত করা হলে তাকে আটা আর ভাজার পর বিভাজিত করা হলে তাকে ছাতু বলে, আর তার অংশসমূহ একত্রিত থাকা অবস্থায় তাকে গম বলে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন খুব ছোট ছোট গমের বিনিময়ে বড় আকারের গম বিক্রয় করা হচ্ছে। আর ছোট গমের বিনিময়ে বড় আকারের গম বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ। অতএব, এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে।

আমাদের দলিল হলো, গম এবং গমের আটা বা ছাতু এ উভয়ের মাঝে "একই শ্রেণীর হওয়া"-এর বিষয়টি এক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে আবার এক হিসেবে বিদ্যমান নেই। বিদ্যমান আছে এ হিসেবে যে, গমকে ভাঙ্গানো দ্বারা বা পেষার দ্বারা তার কেবল অংশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর কোনো জিনিসের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হওয়া বা একত্রিত হওয়ার দ্বারা ঐ জিনিসের جِنْس বা শ্রেণী পরিবর্তিত হয় না বা তা অন্য বস্তুতে পরিণত হয় না; বরং তা পূর্বের বস্তু হিসেবেই বহাল থাকে।

সুতরাং ভাঙ্গানোর পূর্বে তা যে দ্রব্য ছিল সেই দ্রব্যই রয়েছে। আর এক হিসেবে উভয়ের মাঝে مُجَانَسَتْ বা একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান নেই। তার কারণ হলো, দুটি দ্রব্যের মাঝে যদি নাম, সুরত ও গুণাগুণ এ তিনটি দিক থেকে পার্থক্য পাওয়া যায়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে উক্ত তিন দিক থেকেই পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এক হিসেবে উভয়ের শ্রেণী এক। সারকথা, গম এবং তার আটা বা ছাতুর মাঝে একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি অবশিষ্ট থাকা বা না থাকার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং পূর্বে যেহেতু উভয়টি একই শ্রেণীর ছিল, তাই তাদের একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি অবশিষ্ট আছে বলে গণ্য হবে। কেননা, যা বিদ্যমান ছিল বলে নিশ্চিত জানা আছে তা পরবর্তী সন্দেহের কারণে দূর হয় না; যতক্ষণ না দূরীভূত হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। অতএব যেহেতু গম এবং তার আটা বা ছাতুর মাঝে مُجَانَسَتْ [একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি] বিদ্যমান আছে, আর তাদের উভয়ের পরিমাপ মাধ্যমও এক, তাই 'রিবা'র 'ইল্লাত' পাওয়া গেছে। সুতরাং সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। কিন্তু গম, আটা এবং ছাতু এই তিনটিরই পরিমাপ-মাধ্যম হচ্ছে পাত্র [অর্থাৎ এগুলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য], অথচ পাত্র দ্বারা গম এবং আটা বা ছাতুর মাঝে সমান সমান করা সম্ভব নয়। কেননা, আটা বা ছাতু পাত্রের মাঝে ভর্তি করলে তাতে ফাঁকা থাকে না, পক্ষান্তরে গম পাত্রের মাঝে ভর্তি করলে তার দানাসমূহের মাঝে ফাঁকা থাকে। ফলে উভয়ের মাঝে এভাবে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। আর সমতা বিধান করা ব্যতীত বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কোনো সুরত নেই। সুতরাং গমের বিনিময়ে ছাতু বা আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا كَيْلًا لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ، وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَسَاوِيًا، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالْمَقْلِيَّةِ، وَلَا بَيْعُ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ، فَكَذَا بَيْعُ أَجْزَائِهِمَا لِقِيَامِ الْمُجَانَسَةِ مِنْ وَجْهٍ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ، قُلْنَا : مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّغَذِّي يَشْمَلُهُمَا، وَلَا يُبَالِي بِفَوَاتِ الْبَعْضِ كَالْمَقْلِيَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالْعِلْكَةِ بِالْمُسَوَّسَةِ.

অনুবাদ : আর আটার বিনিময়ে আটা পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, [সমান সমান হওয়ার] শর্ত বিদ্যমান আছে। আর ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কমবেশি করেও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করেও জায়েজ নয়। কেননা, ভাজা গমের বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা এবং [কাঁচা] গমের বিনিময়ে ছাতু বিক্রয় করা জায়েজ নয়। সুতরাং এ উভয়ের [ভাজা গম ও কাঁচা গমের] অংশও [একটি অপরটির বিনিময়ে] বিক্রয় করা জায়েজ হবে না । কারণ, এক দিক থেকে উভয়ের মাঝে একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার গুণ বহাল আছে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। কেননা, আটা ও ছাতুর শ্রেণী (جِنْس) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, উভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। [আটার উদ্দেশ্য হয় রুটি তৈরি করা, আর ছাতুর উদ্দেশ্য হয় ঘি বা পানি মিশিয়ে সরাসরি খেয়ে ফেলা। আর উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার মাধ্যমে শ্রেণীর ভিন্নতা প্রকাশ পায়।] [সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাবে] আমরা বলব, বৃহত্তর উদ্দেশ্য হলো খাদ্যরূপে গ্রহণ করা, আর এ উদ্দেশ্য উভয়ের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। [সুতরাং উভয়ের শ্রেণী একই হবে।] আর আংশিক উদ্দেশ্য বিদ্যমান না থাকা ধর্তব্য হবে না। যেমন— ভাজা গম এবং অভাজা গম এরূপভাবে উৎকৃষ্ট গম এবং পোকায় খাওয়া গম [এগুলো প্রত্যেকটি অপরটির সাথে একই শ্রেণীর দ্রব্য বলে গণ্য হয়, অথচ এর একটিতে যে উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তা অপরটিতে পূর্ণরূপে হয় না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ الخ : আমাদের মতে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে সমান সমান করে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। ইমাম আহমাদ (র.)-এর অভিমতও তাই। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা সমান সমান করে বিক্রয় করা হলেও আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, আটা পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হলে উভয় দিকে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কেননা, পাত্রে পূর্ণ করার সময় চাপের তারতম্যের কারণে একবার বেশি ধারণ করে আবার আরেকবার কম ধারণ করে, তাই উভয় দিকে পূর্ণরূপে সমান সমান করা সম্ভব হয় না কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কমবেশি হলে যেরূপ বিক্রয় হারাম হয় তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা (شُبْهَةُ الرِّبَا) -এর কারণেও বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই পাত্রের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

আর আমাদের দলিল হলো, পাত্র দ্বারা আটা পরিমাপ করা হলে উভয় দিকে সমান সমান করা সম্ভব হয়। আর যে সামান্য কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা ধর্তব্য হবে না। কেননা, এতটুকু কমবেশির সম্ভাবনা গমের বিনিময়ে গম বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও থাকে। কারণ, গমও চাপের তারতম্যের কারণে একবার কম আবার আরেকবার বেশি ধারণ হতে পারে। অথচ সেক্ষেত্রে

সকলের ঐকমত্যে এ সম্ভাবনা ধর্তব্য নয়; কাজেই আটার ক্ষেত্রেও ধর্তব্য হবে না। [উল্লেখ্য, ফতোয়ার গ্রন্থ ذَخِيْرَة-এ ইমাম ফাযলী (র.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে আটা বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পাত্রে উভয় পক্ষের আটা ভালভাবে চেপে পূর্ণ করতে হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন যে, অভিমতটি যথার্থ।]

قَوْلُهُ وَبَيْعُ الدَّقِيْقِ بِالسَّوِيْقِ لَا يَجُوْزُ الخ : ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সমান সমান করেও জায়েজ নয়, আর কমবেশি করেও জায়েজ নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সমান সমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে এবং কমবেশি করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, গমের ছাতু এবং গমের আটা যদিও উভয়ের মূল এক ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেকটির শ্রেণী ভিন্ন হয়ে গেছে। কেননা, আটা এবং ছাতু দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। যেমন– আটা দ্বারা রুটি তৈরি করা হয়, কিন্তু ছাতু দ্বারা তা তৈরি হয় না। আর ছাতু পানিতে মিশিয়ে কিংবা ঘি বা চিনি দ্বারা মাখিয়ে খাওয়া হয়, কিন্তু আটা এভাবে খাওয়া হয় না। আর উদ্দেশ্য ভিন্ন হলে শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর যখন আটা এবং ছাতুর শ্রেণী ভিন্ন বলে সাব্যস্ত হলো তখন এগুলোর একটির বিনিময়ে অপরটি সমান সমান করে অথবা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الدَّقِيْقِ بِالْمَقْلِيَّةِ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে দুভাবে দলিল পেশ করা হয়।

১. ভাজা গমের বিনিময়ে আটা বিক্রয় করা অথবা [অভাজা] গমের বিনিময়ে ছাতু বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ। আর এ নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, ভাজা গম এবং আটার মাঝে তদ্রূপ অভাজা গম এবং ছাতুর মাঝে مُجَانَسَة বা শ্রেণী এক হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, তাই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। আর পাত্রের মাধ্যমে উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব নয়, তাই বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সুরতও অর্থাৎ ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রয় করাও নাজায়েজ হবে। কেননা, আটা হচ্ছে কেবল গমের গুড়া, তাতে অন্য কোনো পরিবর্তন হয়নি, আর ছাতু হচ্ছে ভাজা গমের গুড়া তাতেও অন্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর কোনো বস্তুর অংশসমূহকে বিক্ষিপ্ত কিংবা একত্রিত করার দ্বারা তার শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও আটা ও ছাতুর মাঝে এক হিসেবে مُجَانَسَة [একই শ্রেণীর হওয়ার বিষয়টি] বিদ্যমান আছে। সুতরাং সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য হবে। কিন্তু আটা বা ছাতু পাত্র দ্বারা মেপে সমান সমান করা সম্ভব হয় না; বরং কমবেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকে [কারণ একই পাত্রে ছাতুর তুলনায় আটা অধিক পরিমাণ ধারণ করানো যায়]। অতএব কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, ভাজা গমের বিনিময়ে স্বাভাবিক গম বিক্রয় করা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ। এ ক্ষেত্রেও কারণ তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। [অর্থাৎ উভয়ের মাঝে مُجَانَسَة বিদ্যমান আছে, কিন্তু পাত্রের দ্বারা উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কেননা, ভাজা গমের তুলনায় স্বাভাবিক গম পাত্রের মাঝে অধিক ধারণ করানো সম্ভব হয়।] সুতরাং ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে। কেননা, আটা হচ্ছে স্বাভাবিক গমের বিক্ষিপ্ত অংশ আর ছাতু হচ্ছে ভাজা গমের বিক্ষিপ্ত অংশ। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বস্তুর অংশসমূহকে বিক্ষিপ্ত কিংবা একত্রিত করার দ্বারা তার শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। কাজেই এক হিসেবে مُجَانَسَة বিদ্যমান আছে। অতএব, একই কারণে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় নাজায়েজ হবে। [উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর স্বপক্ষে কেবল প্রথম দলিলটিই উল্লেখ করেছেন।]

قَوْلُهُ قُلْنَا : مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَهُوَ التَّغَذِّيْ يَشْمُلُهُمَا الخ : সাহেবাইন (র.)-এর উল্লেখকৃত দলিলের জবাব হলো, আটা এবং ছাতুর মৌলিক উদ্দেশ্য এক, আর তা হলো খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। কাজেই উভয়ের শ্রেণী (جِنْس) একই হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র কিছু উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য ধর্তব্য হবে না। যেমন– ভাজা গম এবং অভাজা গম সাহেবাইন (র.)-এর মতেও একই শ্রেণীভুক্ত, অথচ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা, অভাজা গম পিষে বা ভাঙ্গিয়ে রুটি বানানো হয়, কিন্তু ভাজা গম দ্বারা তা হয় না, আবার অভাজা গম বপন করে গম উৎপন্ন করা হয়, কিন্তু ভাজা গম দ্বারা তা হয় না। এরূপভাবে ভাল গম এবং পোকায় খাওয়া গম সাহেবাইন (র.)-এর মতেও একই শ্রেণীভুক্ত, অথচ এ দুটিও তাদের মৌলিক উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এক, কিন্তু ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বুঝা গেল মৌলিক উদ্দেশ্য তথা খাদ্যরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক হলেই একই শ্রেণীভুক্ত বলে গণ্য হবে। অতএব, আটা ও ছাতু একই শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ উভয়ের মাঝে مُجَانَسَة বিদ্যমান আছে।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : اِذَا بَاعَهُ بِلَحْمٍ مِنْ جِنْسِهٖ لَا يَجُوْزُ، اِلَّا اِذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمُفْرَزُ اَكْثَرَ لِيَكُوْنَ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيْهِ مِنَ اللَّحْمِ، وَالْبَاقِىْ بِمُقَابَلَةِ السِّقْطِ، اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ يَتَحَقَّقُ الرِّبٰوا مِنْ حَيْثُ زِيَادَةِ السِّقْطِ وَمِنْ حَيْثُ زِيَادَةِ اللَّحْمِ فَصَارَ كَالْخَلِّ بِالسِّمْسِمِ، وَلَهُمَا اَنَّهٗ بَاعَ الْمَوْزُوْنَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُوْنٍ، لِاَنَّ الْحَيَوَانَ لَا يُوْزَنُ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ثِقْلِهٖ بِالْوَزْنِ، لِاَنَّهٗ يُخَفِّفُ نَفْسَهٗ مَرَّةً وَيُثْقِلُ اُخْرٰى، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْاَلَةِ، لِاَنَّ الْوَزْنَ فِى الْحَالِ يُعَرِّفُ قَدْرَ الدُّهْنِ، اِذَا مُيِّزَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الثَّجِيْرِ، وَيُوْزَنُ الثَّجِيْرُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশুকে যদি একই শ্রেণীর পশুর গোশতের বিনিময়ে বিক্রয় করে তাহলে জায়েজ হবে না, তবে যদি কাটা গোশত [জীবিত পশুটির গায়ে যতটুকু গোশত আছে তার চেয়ে] বেশি হয় তাহলে জায়েজ হবে। যাতে জীবিত পশুর গায়ে যতটুকু গোশত আছে তার বিনিময়ে কর্তিত গোশত থেকে ততটুকু ধরা যায়, আর কর্তিত গোশতের বাকিটুকু পশুর গায়ে যে [গোশত ছাড়া] অন্যান্য অংশ রয়েছে [যেমন– চামড়া, ভুঁড়ি, খুরা ইত্যাদি] তার বিনিময়ে ধরা যায়। কেননা, যদি এরূপ [কর্তিত গোশত বেশি] না হয়, তাহলে হয়তো পশুর অন্যান্য অংশ বেশি হওয়ার দিক থেকে নতুবা পশুর গোশত [কর্তিত গোশতের চেয়ে] বেশি হওয়ার দিক থেকে 'রিবা' সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব, এটা তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতো হলো। আর শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, এখানে বিক্রেতা ওজন-পরিমাপিত নয় এমন বস্তুর বিনিময়ে ওজন-পরিমাপিত বস্তু বিক্রয় করেছে। কেননা, পশু সাধারণত ওজন করে পরিমাপ করা হয় না, আর মাপের মাধ্যমে পশুর ওজন জানা সম্ভবও হয় না। কারণ, পশু কখনও নিজেকে হালকা করে ফেলে, আবার কখনও নিজেকে ভারী করে ফেলে। পক্ষান্তরে সরিষা ও তেলের মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, তৎক্ষণাৎ [চুক্তির সময়] সরিষা পরিমাপ করা-ই [তার ভিতরে নিহিত] তেলের পরিমাণ জানিয়ে দেবে যখন তার তেল ও খৈল আলাদা করা হবে এবং শুধু খৈল মেপে দেখা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ الخ : **জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের অভিমত :** জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত হলো, যে প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় করা হবে গোশত যদি একই শ্রেণীর প্রাণীর হয়ে থাকে [যেমন– বকরির বিনিময়ে বকরির গোশত কিংবা গরুর বিনিময়ে গরুর গোশত] তাহলে কোনো সুরতেই তা জায়েজ হবে না। আর যদি উক্ত গোশত অন্য শ্রেণীর

প্রাণীর হয়ে থাকে [যেমন– জীবিত বকরির বিনিময়ে গরুর গোশত কিংবা জীবিত গরুর বিনিময়ে বকরির গোশত] তাহলে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে, আর ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এ ক্ষেত্রে দুটি অভিমত বর্ণিত আছে তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, জায়েজ হবে না।

আমাদের ইমামগণের অভিমত : প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের কয়েকটি সুরত হতে পারে।

১. এক শ্রেণীর প্রাণীর গোশত অন্য শ্রেণীর জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন– গরুর গোশত জীবিত বকরির বিনিময়ে বিক্রয় করা]। এ সুরতে আমাদের ইমামগণের সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে, চাই যে কোনো পক্ষে গোশত কম হোক বা বেশি হোক।

২. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণীর প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন– বকরির গোশত বকরির বিনিময়ে বিক্রয় করা] কিন্তু প্রাণীটি জবাইকৃত এবং চামড়া, খুর, ভুঁড়ি ইত্যাদি তার থেকে পৃথক করা হয়েছে। এ সুরতে যদি জবাইকৃত আস্ত প্রাণীটির ওজন অপর দিকের গোশতের সমান হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে, নতুবা জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়টা এখন ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য এবং উভয়ের শ্রেণী এক, তাই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য।

৩. এ সুরতটি দ্বিতীয় সুরতের অনুরূপ, তবে জবাইকৃত প্রাণীটির চামড়া, খুর, ভুঁড়ি ইত্যাদি (سَقَطْ) তার থেকে পৃথক করা হয়নি। এ সুরতে সকলের ঐকমত্যে যদি জবাইকৃত প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের তুলনায় অপর পক্ষের গোশত পরিমাণে বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে নতুবা জায়েজ হবে না।

৪. কোনো প্রাণীর গোশত একই শ্রেণীর জীবিত প্রাণীর বিনিময়ে বিক্রয় করা [যেমন– জীবিত বকরির বিনিময়ে বকরির গোশত বিক্রয় করা কিংবা জীবিত গরুর বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করা] এ সুরতটির বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। শায়খাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে গোশত কম হোক বা বেশি হোক উভয় অবস্থায়ই বিক্রয় জায়েজ হবে। তবে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে কব্জা বা গ্রহণ করতে হবে কিংবা নির্দিষ্ট করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ সুরতে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে তার তুলনায় অপর পক্ষের কাটা গোশত পরিমাণে বেশি হতে হবে। আর যদি সমান সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য ইবারাতে শুধু এ চতুর্থ সুরতটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيَكُوْنَ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيْهِ مِنَ اللَّحْمِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যদি প্রাণীটির মাঝে যে পরিমাণ গোশত আছে যদি তার চেয়ে অপর পক্ষের কাটা গোশতের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে জায়েজ হবে। তার কারণ হলো, জীবিত প্রাণীটির মাঝে গোশতও আছে এবং অন্যান্য দ্রব্য যেমন– চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদিও আছে। কাজেই প্রাণীটির মাঝে যতটুকু গোশত আছে তার বিনিময়ে সমপরিমাণ অপর পক্ষের কাটা গোশত থেকে ধরা হবে। আর কাটা গোশতের মাঝে যতটুকু বেশি আছে তা উক্ত চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদির বিনিময়ে ধরা হবে, এভাবে ধরা হলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না, ফলে বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে যদি কাটা গোশতের পরিমাণ প্রাণীর মাঝে বিদ্যমান গোশতের সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে কাটা গোশতের সমপরিমাণ প্রাণীটির গোশত বিনিময়ে ধরার পর প্রাণীটির মাঝে যে অতিরিক্ত জিনিসগুলো রয়েছে [চামড়া, ভুঁড়ি, খুর ইত্যাদি] অথবা তার সাথে কিছু গোশত অতিরিক্ত সাব্যস্ত হচ্ছে। আর এটা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে। তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْخَلِّ بِالسِّمْسِمِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের এ সুরতটি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতোই হলো। অর্থাৎ যদি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয় করা হয়, তাহলে শায়খাইন (র.)-এর মতেও তা জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তিলের মধ্যে যে পরিমাণ তেল বিদ্যমান আছে তার চেয়ে অপর পক্ষের তেল বেশি হতে হবে। যাতে উভয় দিকের তেল সমান সমান ধরা যায়, আর অতিরিক্ত তেলটুকু তিলের মাঝে বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে ধরা যায়। ফলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই আমাদের আলোচ্য প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের মাসআলাটিও একই হবে।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا اَنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُوْنَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُوْنٍ الخ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য সুরতে জীবিত প্রাণীটির গোশত এবং কাটা যদি একই শ্রেণী (جِنْس) -এর ধরা হয় তবুও উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম (قَدْر) এক নয়। কেননা, গোশত পরিমাপ করা হয় ওজন মেপে, পক্ষান্তরে প্রাণী ওজন মেপে পরিমাপ করা হয় না। আর ওজন মেপে তার সঠিক পরিমাণ জানাও সম্ভব হয় না। কেননা, প্রাণী কখনও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেকে ভারী করে ফেলে আবার কখনও শক্তি প্রয়োগ না করার মাধ্যমে নিজেকে হালকা করে ফেলে। তাই তার সঠিক ওজন মাপার মাধ্যমে জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং যখন উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক নয় তখন 'রিবা' [সুদ] হারাম হওয়ার عِلَّت [কারণ] -এর দুটি বিষয় جِنْسٌ مَعَ الْقَدْرِ [শ্রেণী এক হওয়া এবং পরিমাপ মাধ্যম এক হওয়া]-এর একটি পাওয়া গেছে, আর একটি পাওয়া যায়নি। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইল্লাতের একটি বিষয় পাওয়া গেলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ, তবে বাকি বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং আলোচ্য সুরতে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হবে, বাকি বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দাবি অনুসারে জীবিত প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশতের শ্রেণী এক মেনে নিয়ে জবাব দিয়েছেন। অন্যথায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জীবিত প্রাণীর গোশত এবং কাটা গোশতের শ্রেণী ভিন্ন এবং উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যমও ভিন্ন। তবে শ্রেণী ও পরিমাপ মাধ্যম উভয়টা ভিন্ন হলে বাকি বিক্রয়ও জায়েজ হওয়ার কথা; কিন্তু আলোচ্য সুরতে বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়– তার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য বাকি হলে বিক্রয়টি 'বায় সলম'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর গোশত কিংবা প্রাণীর মাঝে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লেখকৃত কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের বিষয়টি তিলের বিনিময়ে তিলের তেল বিক্রয়ের মতো নয়। কারণ হলো, বিক্রয়ের সময় তিলের ওজন মাপা সম্ভব এবং তিলের ওজন মাপার মাধ্যমে তাতে কতটুকু তেল রয়েছে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে যখন তা ভাঙ্গিয়ে তার খৈল মেপে দেখা হবে। কাজেই উভয়টার পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে। আর উভয়ের শ্রেণী (جِنْس)ও এক। অতএব উভয় দিকের তেলের পরিমাণ সমান সমান হওয়া আবশ্যক। আর তিলের মাঝে বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে অপর পক্ষে কিছু অতিরিক্ত তেল থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে গোশত ও প্রাণীর বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা, প্রাণীটির ওজন মাপা সম্ভব নয় এবং সাধারণত তার ওজন মাপা হয় না। কাজেই উভয়ের পরিমাপ মাধ্যম এক বলে গণ্য হবে না।

এছাড়া শায়খাইন (র.)-এর মতে জীবিত প্রাণী ও কাটা গোশত একই শ্রেণীভুক্ত নয়। কারণ, একটি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ আর অপরটি হচ্ছে জীবিত প্রাণী। পক্ষান্তরে তিল এবং তিলের তেল একই শ্রেণীভুক্ত। কেননা, এ ক্ষেত্রে তেল হচ্ছে তিলের বিভক্ত অংশ। আর শুধু অংশ বিভক্ত হওয়ার দ্বারা শ্রেণী পরিবর্তন হয় না। আর গোশত শুধু বিভক্ত অংশই নয়; বরং তা প্রাণহীন জড়পদার্থে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রাণীর বিনিময়ে গোশত বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার উপর ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.) হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহের মাঝে কিছু রয়েছে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত, আর কিছু রয়েছে দুর্বল সনদে বর্ণিত। শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে একটি হচ্ছে মুয়াত্তা মালিক ও মারাসীলে আবূ দাউদ গ্রন্থে হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হাদীস– عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ " نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ " এ হাদীসটি মুরাসাল হলেও শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.)-এর মুরসাল হাদীস সকলের ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় আরেকটি হাদীস হযরত সামুরাহ (রা.) থেকে ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন– عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ " এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করার পর বলেছেন إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ [-এর সনদ সহীহ]।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে এর কোনো জবাব উল্লেখ করেননি।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح)، وَقَالَا : لَا يَجُوْزُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْهُ أَوَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ (ع) لَا إِذًا وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ رُطَبًا، أَوَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا : سَمَّاهُ تَمْرًا، وَبَيْعُ التَّمْرِ بِمِثْلِهِ جَائِزٌ، لِمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمْرًا جَازَ الْبَيْعُ بِأَوَّلِ الْحَدِيْثِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمْرٍ فَبِآخِرِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، وَمَدَارُ مَا رَوَيَاهُ عَلٰى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাকা তাজা খেজুর সমান সমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, জায়েজ হবে না। কেননা, নবী করীম (র.)-কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'যখন তাজা খেজুর শুকিয়ে যায় তখন কি তা [ওজনে] কমে যায় ?' বলা হলো, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, 'তাহলে না' [অর্থাৎ জায়েজ হবে না]। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, رُطَبٌ [তাজা খেজুর]-কে تَمْر [খেজুর বা শুকনো খেজুর] বলা হয়। কেননা, নবী করীম ﷺ -কে যখন رُطَبٌ [তাজা খেজুর] হাদিয়া দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, أَوَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا ؟ "খায়বারের সমস্ত تَمْر কি এরূপই হয়ে থাকে ?" নবী করীম ﷺ এখানে رُطَبٌ -কে تَمْر বলে উল্লেখ করেছেন। আর আমাদের পূর্বে বর্ণিত হাদীস (اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ)-এর কারণে تَمْر সমপরিমাণ تَمْر -এর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। তাছাড়া এ কারণে যে, যদি رُطَبٌ 'রুতাব খেজুর' تَمْر বলে গণ্য হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের প্রথমাংশের কারণে জায়েজ হবে। আর যদি তা (رُطَبٌ) تَمْر -এর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের শেষাংশের কারণে জায়েজ হবে। আর শেষাংশ হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণীর এই অংশ- إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ "যদি দ্রব্যদ্বয়ের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার।" আর সাহেবাইন (র.) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তার সনদের ভিত্তি হলো যায়েদ ইবনে আইয়্যাশের উপর, আর তিনি হাদীস সংকলকদের মতে [গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে] দুর্বল ব্যক্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوْزُ بَيْعُ الرُّطَبِ الخ : رُطَب বলা হয় পাকা তাজা খেজুরকে আর تَمْر বলা হয় পাকা শুকনো খেজুরকে।

শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে تَمْر [শুকনো খেজুর]-এর বিনিময়ে رُطَبٌ [তাজা খেজুর] সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। আর অন্যান্য সকল ইমামগণ তথা ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبٌ কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْهُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণের দলিল মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী শরীফে হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا جَفَّ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ .

"হযরত সা'আদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাজা খেজুর কি শুকনো হলে কমে যাবে? প্রশ্নকারী বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি এরূপ বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করলেন।" ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন– حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ "হাদীসটির সনদ হাসান, সহীহ"।

قَوْلُهُ وَلَهُ اَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে দুটি দলিল পেশ করেছেন। প্রথম দলিল হলো, নবী করীম ﷺ رُطَبٌ-কে تَمْرٌ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন رُطَبٌ [তাজা খেজুর] হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি বলেছেন– اَوَ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا "খায়বারের সমস্ত تَمْر কি এরূপই হয়ে থাকে?" এ হাদীসে নবী করীম ﷺ رُطَبٌ-কে تَمْرٌ বলে উল্লেখ করেছেন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, تَمْر বলা হয় সাধারণ খেজুরকে। কাজেই رُطَبٌ-ও تَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যখন رُطَبٌ [তাজা খেজুর] تَمْر [বা সাধারণ খেজুর]-এর অন্তর্ভুক্ত তখন একটির বিনিময়ে অপরটি সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.)-এর হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন– "اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ" "তমর খেজুরের বিনিময়ে তমর খেজুর বিক্রয় করতে হবে সমান সমান করে"।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম এবং আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উল্লিখিত দলিলটি তখনই সঠিক হতো যদি উক্ত হাদীসটির রেওয়ায়েতে এ কথা থাকতো যে, নবী করীম ﷺ-এর সামনে যে খেজুর দেওয়া হয়েছিল তা رُطَبٌ ছিল। অথচ উক্ত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রাহ ও হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে উল্লেখ আছে যে, উক্ত খেজুর ছিল تَمْر বা শুকনো খেজুর। হাদীসটি নিম্নরূপ–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اَخَا بَنِيْ عَدِى الْاَنْصَارِيْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلٰى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا ؟ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আদী আল-আনসারীর এক ব্যক্তিকে কর উসুলকারী রূপে খায়বারে প্রেরণ করলেন। সে উৎকৃষ্টমানের শুকনো খেজুর নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সকল খেজুর কি এরূপই হয়ে থাকে? উত্তরে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! না; বরং আমরা নিকৃষ্টমানের দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে এরূপ এক সা' খেজুর পরিবর্তন করে আনি। ......।"

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمْرًا جَازَ الْبَيْعُ بِاَوَّلِ الْحَدِيْثِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে দ্বিতীয় দলিল হলো, رُطَبٌ খেজুর হয় تَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত হবে নতুবা تَمْر-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ উভয়ের শ্রেণী (جِنْس) হয় এক ধরা হবে অথবা ভিন্ন ধরা হবে, এছাড়া আর কোনো সুরত হতে পারে না। যদি উভয়ের শ্রেণী এক ধরা হয়, তাহলে এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত 'রিবা' সংক্রান্ত মূল হাদীস اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ....الخ -এর প্রথমাংশের কারণে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ সাব্যস্ত হবে। কেননা, প্রথমাংশে বলা হয়েছে تَمْر-এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় করতে হবে সমান সমান করে।

আর যদি উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হয়, তাহলে উক্ত হাদীসের শেষাংশের কারণে যে কোনোভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, শেষাংশে বলা হয়েছে– " وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ " "আর যদি উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হয়, তখন তোমরা যেভাবে ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার"।

উল্লেখ্য, এ দলিলটি মুসান্নিফ (র.) এখানে যেভাবে উল্লেখ করেছেন ঠিক সেভাবে মাবসূত গ্রন্থে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। মাবসূতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন বাগদাদে আগমন করলেন, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁকে رُطَبْ-এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয়ের উক্ত মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেন, رُطَبْ যদি تَمْر -এর শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ -এর কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর رُطَبْ যদি تَمْر -এর শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ -এর কারণে বিক্রয় জায়েজ হবে। তখন প্রশ্নকারীরা رُطَبْ -এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় নিষেধ সংক্রান্ত পূর্বোক্ত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাদীসটি পেশ করে বললেন যে, নবী করীম ﷺ তো رُطَبْ -এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, হাদীসটির সনদের মূল বর্ণনাকারী হচ্ছেন যায়েদ ইবনে আইয়্যাশ, আর তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা হচ্ছে আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিষেধ সংক্রান্ত হাদীসটি সনদের দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। আর رُطَبْ এবং تَمْر-কে তিনি একই শ্রেণীর গণ্য করেছেন। আর উভয় দ্রব্য একই শ্রেণীর হলে যে সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য সেক্ষেত্রে তিনি বিক্রয়ের সময় সমান সমান করা সম্ভব হলেই যথেষ্ট মনে করেন। সুতরাং পরবর্তীতে যদি এক পক্ষের দ্রব্য শুকিয়ে কমে যায় তা তাঁর মতে ধর্তব্য হবে না। অতএব, رُطَبْ এবং تَمْر যেহেতু বিক্রয়ের সময় সমান সমান করা সম্ভব, তাই তার বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে ভাজা গম এবং অভাজা গম একই শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও একটির বিনিময়ে অপরটি বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, বিক্রয়ের সময়ই এদের উভয়কে সমান সমান করা সম্ভব হয় না। কারণ, এদের একটি পাত্রে বেশি ভর্তি করা যায় আর অপরটি কম ভর্তি করা যায়।

قَوْلُهُ وَمَدَارُ مَا رَوَاهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন ও জমহুরের পক্ষ থেকে উল্লিখিত হাদীসের জবাব দিচ্ছেন যে, উক্ত হাদীসটির مَدَارْ বা সনদের মূল বর্ণনাকারী হচ্ছেন যায়েদ ইবনে আইয়্যাশ। আর যায়েদ ইবনে আইয়্যাশ হাদীসবিশারদগণের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী, কাজেই তার বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম, আল্লামা যায়লায়ী, আল্লামা আয়নী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে যায়েদ ইবনে আইয়্যাশ হাদীসবিশারদগণের মতে দুর্বল কিংবা মজহুল বর্ণনাকারী নন, বরং তার হাদীস গ্রহণযোগ্য। কাজেই যদি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আলোচ্য মাসআলায় জমহুরের দলিলই বেশি শক্তিশালী হবে। –[অনুবাদক]

তবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে উক্ত হাদীসের জবাব দেওয়া হয় যে, নবী করীম ﷺ যে, رُطَبْ-এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন তা বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে উক্ত হাদীসটি يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ -এর বর্ণনায় এভাবে আছে– "نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ نَسِيْئَةً" "নবী করীম ﷺ رُطَبْ-এর বিনিময়ে تَمْر বাকিতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"। হাদীসটি এভাবে আবূ দাউদ, মুসতাদরাকে হাকিম, তাহাবী ও দারাকুতনীতে বর্ণিত হয়েছে। আর উক্ত يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, কাজেই তার বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হবে। তবে উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে শুধু বাকির ক্ষেত্রে ধরলে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ اِذَا جَفَّ "রুতাব শুকিয়ে গেলে কি কমে যাবে?" -এর কোনো ফায়দা বা অর্থ থাকে না। কেননা, শুকনোর পরে যদি না কমে তাহলেও বাকি বিক্রয় হারাম।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيْبِ، يَعْنِيْ عَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ، وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ، وَقِيْلَ : لَا يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ اِعْتِبَارًا بِالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ يَجُوْزُ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا عِنْدَنَا، لِاَنَّهُ بَيْعُ التَّمْرِ، بِالتَّمْرِ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে কিসমিসের বিনিময়ে আঙ্গুর [বিক্রয় করার বিধানও একই]। অর্থাৎ এটাও এরূপ মতবিরোধপূর্ণ। আর [উভয় পক্ষে] কারণ তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর কেউ কেউ কাঁচা গমের বিনিময়ে ভাজা গম [বিক্রয়ের বিধান]-এর উপর কিয়াস করে বলেছেন যে, এটা সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ। আর তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা আমাদের মতে জায়েজ হবে। [ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না।] কেননা, এটা খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذٰلِكَ الْعِنَبُ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি মাসাআলা বর্ণনা করা হয়েছে–

১. بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ – কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা। উল্লেখ্য, কিসমিস হলো শুকনো আঙ্গুর।

২. بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ – তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা।

৩. بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ اَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِمِثْلِهَا – তাজা বা ভেজা গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

৪. بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ اَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِالْيَابِسَةِ – শুকনো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

৫. بَيْعُ التَّمْرِ اَوِ الزَّبِيْبِ الْمُنْقَعِ بِالْمُنْقَعِ مِنْهُمَا – ভেজানো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ভেজানো শুকনো খেজুর বিক্রয় করা কিংবা ভেজানো কিসমিসের বিনিময়ে ভেজানো কিসমিস বিক্রয় করা।

ইমামগণের মতভেদ :

প্রথম মাসআলা : তথা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইমাম কুদূরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেরূপ মতবিরোধ এ ক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ মতবিরোধ। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পাত্রের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ, আর সাহেবাইন (র.) মতে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয় এবং সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ مَا بَيَّنَّاهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দলিল তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণিত تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয়ের মাসআলায় উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, কিসমিস এবং আঙ্গুরের শ্রেণী (جِنْس) এক। কাজেই সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, 'রিবা' সংক্রান্ত মূল হাদীস اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ -এর কারণে। আর যদি উভয়ের শ্রেণী এক ধরা না হয়, তাহলে তো কমবেশি করেও বিক্রয় করা জায়েজ হবে উক্ত হাদীসের শেষাংশ فَاِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ-এর কারণে। আর সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, তাজা আঙ্গুর যেহেতু শুকানোর পর কমে যাবে তাই পূর্বের تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয় নাজায়েজ হওয়া সংক্রান্ত যায়েদ ইবনে আইয়্যাশের হাদীসের কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। হাদীসটির শেষাংশ হলো– اَيَنْقُصُ اِذَا جَفَّ فَقِيْلَ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا اِذًا " যখন রুতাব শুকিয়ে যাবে তখন কি তা কমে যাবে? উত্তরে বলা হলো, হ্যাঁ। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।"

قَوْلُهُ وَقِيْلَ لَا يَجُوْزُ بِالْإِتِّفَاقِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কারো কারো মতে এ মাসআলাটি অর্থাৎ কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা আমাদের ইমামগণের ঐকমত্যে নাজায়েজ। [অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)ও এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর সাথে একমত।]

আর এ নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো, তাজা গমের বিনিময়ে তাজা গম বিক্রয়ের মাসআলার উপর কিয়াস। অর্থাৎ তাজা গমের বিনিময়ে তাজা গম বিক্রয় করা যেরূপ সকলের ঐকমত্যে নাজায়েজ [এ মাসআলা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে] তদ্রূপ শুকনো আঙ্গুর তথা কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা নাজায়েজ হবে।

অবশ্য এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় (بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ) এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় (بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ) এ দু মাসআলার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা আবশ্যক। কেননা, উভয়টি একই রকম হওয়া সত্ত্বেও এ রেওয়ায়েতটি অনুসারে কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয় করা নাজায়েজ, আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা জায়েজ। পার্থক্যটি হলো, تَمْر শব্দটি رُطَبٌ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তাই এদের উভয়ের পার্থক্য ধর্তব্য হবে না, সুতরাং উভয় দিকে সমান সমান হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে زَبِيْب শব্দটি عِنَبٌ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, কাজেই এদের উভয়ের তারতম্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং উভয় দিকে সমতা না পাওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, কিসমিসের বিনিময়ে তাজা আঙ্গুর বিক্রয়ের মাসআলায় আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লিখিত দুটি রেওয়ায়েত ছাড়া আরো দুটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।—[ফাতহুল কাদীর]

দ্বিতীয় মাসআলা :

قَوْلُهُ وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ يَجُوْزُ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলা তথা তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের সকলের ঐকমত্য হলো যে, পাত্রের মাধ্যমে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কমবেশি করেও বিক্রয় জায়েজ নয় এবং সমান সমান করেও বিক্রয় করা জায়েজ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, رُطَبٌ [তাজা খেজুর] সমান সমান করে বিক্রয় করা হলেও শুকানোর পর তা সমান সমান নাও থাকতে পারে। কেননা, খেজুর কোনোটি বেশি শুকায় আবার কোনোটি কম শুকায়। কাজেই বিক্রয়ের সময় সমান সমান থাকা যথেষ্ট হবে না; বরং শুকানোর পর উভয় দিকের খেজুর সমান থাকা আবশ্যক। আর এক্ষেত্রে শুকানোর পর যেহেতু সমান সমান থাকবে কিনা তা জানা যাচ্ছে না, তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না। সুতরাং এ সুরতটিও তাজা গমের বিনিময়ে অতাজা গম বিক্রয়ের মতোই হলো যা হানাফীগণের মতেও নাজায়েজ।

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.) তাজা খেজুরের ন্যায় অন্যান্য যে সকল ফল শুকানোর পর কমে যায়, সে সকল ফলের ক্ষেত্রেও একই অভিমত পোষণ করেন।

আমাদের দলিল হলো, رُطَبٌ-কে تَمْر ও বলা হয়, আর تَمْر -এর বিনিময়ে تَمْر বিক্রয় করা জায়েজ হওয়া اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

وَكَذَا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ اَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِمِثْلِهَا اَوْ بِالْيَابِسَةِ اَوِ التَّمْرِ اَوِ الزَّبِيْبِ الْمُنْقَعِ بِالْمُنْقَعِ مِنْهُمَا مُتَمَاثِلًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا يَجُوْزُ جَمِيْعُ ذٰلِكَ، لِاَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِىْ اَعْدَلِ الْاَحْوَالِ، وَهُوَ الْمَالُ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) يَعْتَبِرُ فِى الْحَالِ، وَكَذَا اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) عَمَلًا بِاِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، اِلَّا اَنَّهُ تَرَكَ هٰذَا الْاَصْلَ فِىْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، لِمَا رَوَيْنَاهُ لَهُمَا، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ (رح) بَيْنَ هٰذِهِ الْفُصُوْلِ وَبَيْنَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ اَنَّ التَّفَاوُتَ فِيْهَا يَظْهَرُ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَلَيْنِ عَلَى الْاِسْمِ الَّذِىْ عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَفِى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ اَحَدِهِمَا عَلٰى ذٰلِكَ، فَيَكُوْنُ تَفَاوُتًا فِىْ عَيْنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ بَعْدَ زَوَالِ ذٰلِكَ الْاِسْمِ، فَلَمْ يَكُنْ تَفَاوُتًا فِى الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْتَبَرُ ـ

অনুবাদ : এরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তাজা গম বা ভেজা গম তদ্রূপ গমের বিনময়ে বা শুকনো গমের বিনময়ে বিক্রয় করা কিংবা পানিতে ভেজানো খেজুর বা কিসমিস তদ্রূপ খেজুর বা কিসমিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এগুলো সবই নাজায়েজ। কেননা, তিনি [উক্ত দ্রব্যগুলোর] সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থায় উভয় দিকে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন। আর সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থা হলো, পরিশেষের অবস্থা [অর্থাৎ শুকনো অবস্থা]। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বর্তমান অবস্থায় [সমান সমান হওয়ার বিষয়] বিবেচনা করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-ও তাই বিবেচনা করেন। [তাঁরা এ বিবেচনা করেন 'রিবা' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ] শর্তমুক্ত হাদীসের উপর আমল করার ভিত্তিতে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বিবেচনার এ নীতিটি تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয়ের মাসআলায় পরিহার করেছেন সেই হাদীসটির কারণে যা আমরা [উক্ত মাসআলায়] সাহেবাইন (র.)-এর স্বপক্ষে বর্ণনা করেছি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী এখানে উল্লিখিত সুরতগুলো এবং তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়ের সুরতের মাঝে পার্থক্য হলো, এখানে উল্লিখিত সুরতগুলোতে চুক্তির সময় উভয় দিকের দ্রব্যদ্বয়ের যে নাম ছিল সে নাম বহাল থাকা অবস্থায়-ই [শুকানোর পর] উভয় দ্রব্যের মাঝে তারতম্য প্রকাশ পায়। [তদ্রূপ] تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দিকের দ্রব্য (تَمْر) তার নামের উপর বহাল থাকা অবস্থায়ই [উভয় দ্রব্যের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে]। সুতরাং এ সকল সুরতে যে দ্রব্যের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে হুবহু সেই দ্রব্যেই তারতম্য প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে رُطَبْ [তাজা খেজুর]-এর বিনিময়ে رُطَبْ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তারতম্য প্রকাশ পায় ঐ নাম (رُطَبْ) বিলুপ্ত হওয়ার পর। কাজেই যে দ্রব্যের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে হুবহু তাতে তারতম্য প্রকাশ পায়নি। সুতরাং সে তারতম্য ধর্তব্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ أَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِمِثْلِهَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসআলা বর্ণনা করছেন।

তৃতীয় মাসআলা : بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ أَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِمِثْلِهَا – তাজা বা ভেজানো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

চতুর্থ মাসআলা : بَيْعُ الْحِنْطَةِ الرَّطْبَةِ أَوِ الْمَبْلُوْلَةِ بِالْيَابِسَةِ – শুকনো গমের বিনিময়ে তাজা বা ভেজা গম বিক্রয় করা।

পঞ্চম মাসআলা : بَيْعُ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيْبِ الْمُنْقَعِ بِالْمُنْقَعِ مِنْهُمَا – ভেজানো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে অভেজানো শুকনো খেজুর বিক্রয় করা কিংবা ভেজানো কিসমিসের বিনিময়ে অভেজানো কিসমিস বিক্রয় করা।

এ তিনটি সুরতেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পাত্র দ্বারা মেপে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে নাজায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের অনুরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, তিনি উভয় দিকে একই শ্রেণীর দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য মনে করেন দ্রব্যটির সর্বাধিক স্বাভাবিক অবস্থায় (فِيْ أَعْدَلِ الْأَحْوَالِ)। আর তা হলো, দ্রব্যটি শুকানোর পরের অবস্থা। কেননা, নবী করীম ﷺ তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, আর এ নিষেধের কারণ ছিল তাজা খেজুর শুকানোর পর কমে যাওয়া। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুকানোর পর সমান সমান হওয়া আবশ্যক। কাজেই বিক্রয়ের সময় যদি দ্রব্যটি শুকনো অবস্থায় না থাকে তাহলে পাত্র মেপে সমান সমান করা হলেও তা যথেষ্ট হবে না; বরং শুকানোর পর সমান সমান হওয়া অপরিহার্য। আর শুকানোর পর উভয় দিকের দ্রব্য সমান সমান হবে কিনা তা যেহেতু জানা সম্ভব হয় না, তাই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يَعْتَبِرُ فِى الْحَالِ الخ : আর ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সমান সমান হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য মনে করেন বিক্রয়ের সময়। কেননা, 'রিবা' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীস– اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ الخ -এ সমান সমান করে বিক্রয়ের কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিক্রয়ের সময় সমান সমান থাকলেই যথেষ্ট হবে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ هٰذَا الْأَصْلَ فِىْ بَيْعِ الرُّطَبِ الخ : তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَب বিক্রয়ের মাসআলায় এ নীতিটি পরিহার করেছেন। অর্থাৎ تَمْر -এর বিনিময়ে رُطَب বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের সময় সমান সমান হলেও তিনি নাজায়েজ বলেন, অথচ তাঁর মতে বিক্রয়ের সময় সমান সমান হলে জায়েজ হওয়ার কথা। এর কারণ হলো, تَمْر-এর বিনিময়ে رُطَب বিক্রয় যেহেতু হযরত সা'আদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে [যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] তাই কিয়াসের পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের কারণে নাজায়েজ হয়েছে। আর আলোচ্য মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু হাদীস বিদ্যমান নেই, তাই কিয়াসের দাবি অনুসারে বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَ وَجْهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ (رحـ) بَيْنَ هٰذِهِ الْفُصُوْلِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তো ফল শুকানোর পর সমান সমান হওয়া আবশ্যক; বিক্রয়ের সময় সমান সমান হওয়া যথেষ্ট নয়। আর এ কারণেই আলোচ্য তিনটি মাসআলায় তাঁর মতে বিক্রয় জায়েজ নয়। কিন্তু তিনি بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ "তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়" জায়েজ বলেছেন, অথচ رُطَب বা তাজা খেজুর শুকানোর পর উভয় পক্ষের খেজুর সমান সমান

না থাকতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিনি বিক্রয়ের সময় সমান সমান হওয়াকেই যথেষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। এ পার্থক্যের কারণ কি? মুসান্নিফ (র.) এর পার্থক্য বর্ণনা করছেন যে, আলোচ্য তিনটি সুরতে দ্রব্যগুলো শুকানোর পর যখন তাতে তারতম্য সৃষ্টি হয় তখনও দ্রব্যগুলোর সেই নামই বহাল থাকে যে নাম বিক্রয়ের সময় ছিল। যেমন– গম তাজা অবস্থায় কিংবা ভেজা অবস্থায়ও এর নাম গম আবার শুকানোর পরও এর নাম গমই থাকে, এরূপভাবে تَمْر [শুকনো খেজুর] এবং কিসমিস ভেজানো অবস্থায়ও এদের নাম যা থাকে শুকানোর পরও তাই থাকে।

অতএব, এ সকল দ্রব্য শুকানোর পর যখন তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন ধরা হবে যে, যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছিল ঠিক সেই দ্রব্যের মাঝে তারতম্য পাওয়া গেছে। ফলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। এরূপভাবে بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ। "শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়" -এর ক্ষেত্রেও তাজা খেজুর শুকানোর পর যখন তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন رُطَبْ -এর নাম পরিবর্তন হয়ে تَمْر হয়ে যাবে, কিন্তু অপর পক্ষের যে تَمْر ছিল তার নাম বহালই থাকবে। তাই এ ক্ষেত্রেও এক পক্ষের নাম বহাল থাকার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

পক্ষান্তরে بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ "তাজা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয়" -এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এ ক্ষেত্রে যখন শুকানোর পর তারতম্য সৃষ্টি হবে তখন উভয় পক্ষের দ্রব্যের নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা, رُطَبْ শুকানোর পর তার নাম تَمْر হয়ে যাবে। ফলে এরূপ ধরা হবে যে, যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছিল ঠিক সেই দ্রব্যের মাঝে তারতম্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং তা 'রিবা' হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে।

وَلَوْ بَاعَ الْبُسْرَ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا لَا يَجُوْزُ، لِأَنَّ الْبُسْرَ تَمْرٌ، بِخِلَافِ الْكُفُرَّى، حَيْثُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِمَا شَاءَ مِنَ التَّمْرِ، إِثْنَانِ بِوَاحِدٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ، فَإِنَّ هٰذَا الْإِسْمَ لَهُ مِنْ أَوَّلِ مَا تَنْعَقِدُ صُوْرَتُهُ لَا قَبْلَهُ وَالْكُفُرَّى عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ حَتّٰى لَوْ بَاعَ التَّمْرَ بِهِ نَسِيْئَةً لَا يَجُوْزُ لِلْجَهَالَةِ.

অনুবাদ : আর যদি تَمْرٌ-এর বিনিময়ে بُسْرٌ [আধা পাকা কাঁচা খেজুর] কমবেশি করে বিক্রয় করে ,তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, بُسْرٌ-ও تَمْرٌ-এর অন্তর্ভুক্ত [কেননা, আকার ধারণ করার পর থেকে খেজুর تَمْرٌ বলে গণ্য হয়]। পক্ষান্তরে খেজুরের কুঁড়ির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা যতটুকু ইচ্ছা تَمْرٌ-এর বিনিময়ে [যতটুকু ইচ্ছা] কুঁড়ি বিক্রয় করতে পারবে, যেমন– একটির বিনিময়ে দুটি। কারণ, খেজুরের কুঁড়ি تَمْرٌ বা খেজুরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এ নামটি [অর্থাৎ تَمْرٌ নামটি] খেজুরের আকার ধারণ করার পর থেকে বলা হয়, আকার ধারণের পূর্বে এ নাম বলা হয় না। আর খেজুরের কুঁড়ি তারতম্যপূর্ণ গণনা-নির্ভর দ্রব্য। কাজেই কুঁড়ির বিনিময়ে যদি تَمْرٌ [খেজুর] বাকিতে বিক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, দ্রব্যটিতে অস্পষ্টতা রয়েছে [যা বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْبُسْرَ بِالتَّمْرِ الخ : মাসআলা হলো, تَمْرٌ [শুকনো খেজুর]-এর বিনিময়ে بُسْرٌ [আধা পাকা কাঁচা খেজুর] কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, আকার ধারণ করার পর থেকে সব ধরনের খেজুরই تَمْرٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং بُسْرٌ বা আধা পাকা কাঁচা খেজুরও تَمْرٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উভয়ের শ্রেণী এক, তাই কমবেশি করলে 'রিবা' বা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। তবে [পাত্রের ভিত্তিতে] সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكُفُرَّى، حَيْثُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ الخ : পক্ষান্তরে تَمْرٌ -এর বিনিময়ে খেজুরের কুঁড়ি [যা ফেটে গিয়ে প্রথম খেজুরের আকার ধারণ করে] সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ এবং কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ। সুতরাং একটি تَمْرٌ-এর বিনিময়ে দুটি কুঁড়ি বিক্রয় করা কিংবা দুটি تَمْرٌ -এর বিনিময়ে একটি কুঁড়ি বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, খেজুরের কুঁড়ি (اَلْكُفُرَّى) বলা হয় খেজুরের আকার ধারণ করার পূর্বে, কাজেই তা تَمْرٌ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং উভয়ের শ্রেণী (جِنْس) ভিন্ন। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

قَوْلُهُ وَالْكُفُرَّى عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি কুঁড়ি এবং تَمْرٌ -এর শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে তো কুঁড়িকে 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে تَمْرٌ -এর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা, এরূপভাবে কুঁড়ির বিনিময়ে বাকিতে تَمْرٌ ক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা। [কেননা, শ্রেণী এক হলে একটির বিনিময়ে অপরটি বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়, কিন্তু শ্রেণী ভিন্ন হলে বাকি বিক্রয় জায়েজ হয়।] অথচ এ দু সুরতের কোনোটিই জায়েজ নয়, তার কারণ কি?

জবাবের সারকথা হচ্ছে, খেজুরের কুঁড়ি হলো গণনা-প্রচলিত তারতম্যপূর্ণ দ্রব্য। অর্থাৎ এগুলো প্রচলনে গণনার ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় এবং এগুলো ছোট বড় হয়ে থাকে। আর তারতম্যপূর্ণ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য 'বায় সলম' -এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা কিংবা তা দ্বারা বাকিতে অন্য কোনো দ্রব্য ক্রয় করা জায়েজ নয়। কারণ হলো, তারতম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তা সমর্পণের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। গ্রহীতা বড়গুলো দাবি করবে আর অর্পণকারী ছোটগুলো দিতে চাইবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ، حَتّٰى يَكُوْنَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ اَكْثَرَ مِمَّا فِى الزَّيْتُوْنِ وَالسِّمْسِمِ، فَيَكُوْنُ الدُّهْنُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالثَّجِيْرِ، لِاَنَّ عِنْدَ ذٰلِكَ يَعْرِىْ عَنِ الرِّبٰوا، اِذْ مَا فِيْهِ مِنَ الدُّهْنِ مَوْزُوْنٌ، وَهٰذَا لِاَنَّ مَا فِيْهِ لَوْ كَانَ اَكْثَرَ اَوْ مُسَاوِيًا لَهُ فَالثَّجِيْرُ وَبَعْضُ الدُّهْنِ اَوِ الثَّجِيْرُ وَحْدَهُ فَضْلٌ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ مَا فِيْهِ لَا يَجُوْزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبٰوا، وَالشُّبْهَةُ فِيْهِ كَالْحَقِيْقَةِ، وَالْجَوْزُ بِدُهْنِهِ وَاللَّبَنُ بِسَمْنِهِ وَالْعِنَبُ بِعَصِيْرِهِ وَالتَّمْرُ بِدِبْسِهِ عَلٰى هٰذَا الْاِعْتِبَارِ، وَاخْتَلَفُوْا فِى الْقُطْنِ بِغَزْلِهِ، وَالْكِرْبَاسُ بِالْقُطْنِ يَجُوْزُ كَيْفَ مَا كَانَ بِالْاِجْمَاعِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যায়তুন ফলকে যায়তুন তেলের বিনিময়ে এবং সরিষাকে সরিষার তেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না, যদি উক্ত যায়তুন তেল এবং সরিষার তেল [বিক্রীত] যায়তুন ফল এবং সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি না হয়। [বেশি হলে জায়েজ হবে।] কেননা, তখন [সরিষা বা যায়তুনের ভিতরে বিদ্যমান] তেলের বিনিময়ে সমপরিমাণ তেল ধরা হবে, আর বেশিটুকু ধরা হবে খৈলের বিনিময়ে। কেননা, তখন চুক্তিটি 'রিবা' [সুদ] থেকে মুক্ত হবে। কেননা, [যায়তুন ও সরিষার মধ্যে] যে তেল রয়েছে তাও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। আর [জায়েজ হওয়ার জন্য বিক্রীত] তেল বেশি হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যদি যায়তুন এবং সরিষার মধ্যে বিদ্যমান তেল অপর পক্ষের তেলের চেয়ে বেশি হয় কিংবা তার সমান হয়, তাহলে [এক পক্ষে] খৈল ও কিছু তেল অথবা শুধু খৈল অতিরিক্ত হলো [যা 'রিবা' বা সুদ হবে]। আর যদি যায়তুন বা সরিষার মাঝে কি পরিমাণ তেল আছে তা জানা না যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' [সুদ] হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'রিবা' বা সুদের ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর সন্দেহও প্রকৃত 'রিবা'-এর ন্যায় [ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে]। আর আখরোট ফল তার তেলের বিনিময়ে, দুধ তার ঘিয়ের বিনিময়ে, আঙ্গুর তার রসের বিনিময়ে এবং খেজুর তার সিরার বিনিময়ের বিধানও উক্ত বিধানের মতোই। আর তুলাকে তার সুতার বিনিময়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আর তুলার বিনিময়ে [তুলার তৈরি] সুতি কাপড় সর্বসম্মতিক্রমে যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় করা জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُوْنِ الخ :

اَلزَّيْتُوْنُ অর্থ– যায়তুন ফল যা থেকে যায়তুনের তেল তৈরি হয়। اَلزَّيْتُ অর্থ– যায়তুনের তেল। اَلسِّمْسِمُ অর্থ– সরিষা اَلشَّيْرَجُ অর্থ– সরিষার তেল। اَلثَّجِيْرُ অর্থ– খৈল।

মাসআলা : যদি যায়তুনের তেলের বিনিময়ে যায়তুন ফল বিক্রয় করা হয়, কিংবা সরিষার তেলের বিনিময়ে সরিষা বিক্রয় করা হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উক্ত যায়তুনের ফলের মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে অপর পক্ষের তেল তার চেয়ে বেশি হতে হবে। এরূপভাবে এক পক্ষের সরিষার মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে অপর

পক্ষের ভাঙ্গানো তেল তার চেয়ে বেশি হতে হবে। কারণ, এভাবে হলে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, যায়তুনের কিংবা সরিষার মাঝে যতটুকু তেল বিদ্যমান আছে, অপর পক্ষের ভাঙ্গানো তেল থেকে সমপরিমাণ তার বিনিময়ে ধরা হবে, আর অবশিষ্ট ভাঙ্গানো তেলটুকু যায়তুন বা সরিষার মাঝে বিদ্যমান খৈলের বিনিময়ে ধরা হবে। আর খৈল এবং তেল যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তাই সমান সমান হওয়ার আবশ্যকতা নেই। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে।

আর ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুনের মাঝে কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি না হয়; বরং তার চেয়ে কম হয় কিংবা সমান সমান হয়, তাহলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। কেননা, ভাঙ্গানো তেলও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, আর যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলও ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই কোনো এক পক্ষে বেশি সাব্যস্ত হলে তা 'রিবা' [সুদ] হবে। আর এ ক্ষেত্রে এক পক্ষে বেশি সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের সমান হয়, তাহলে খৈলটুকু বেশি হচ্ছে, যার বিনিময়ে ভাঙ্গানো তেলের দিকে কিছুই থাকছে না। আর ভাঙ্গানো তেল যদি যায়তুন কিংবা সরিষার মাঝে বিদ্যমান তেলের চেয়ে কম হয়, তাহলে যায়তুন বা সরিষার দিকে খৈলটুকু তো বেশি হবেই তার সাথে বিদ্যমান তেলও বেশি হবে। সুতরাং 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। কাজেই এ দুটি সূরতে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارُ مَا فِيْهِ لَا يَجُوْزُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আর যদি উপরিউক্ত সূরতে বিষয়টি এমন হয় যে, যায়তুনের মাঝে কিংবা সরিষার মাঝে কতটুকু তেল আছে তা জানা যাচ্ছে না, তাহলে উক্ত সূরতে অর্থাৎ যায়তুনের বিনিময়ে যায়তুনের তেল বিক্রয় করা কিংবা সরিষার বিনিময়ে সরিষার তেল বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, তখন 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে কার্যত কমবেশি হলে যেরূপ বিক্রয় হারাম হয় তদ্রূপ কমবেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই এ সূরতে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَالْجَوْزُ بِدُهْنِهِ وَاللَّبَنُ بِسَمْنِهِ وَالْعِنَبُ بِعَصِيْرِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত মাসআলার অনুরূপ নিয়মে আখরোটের তেলের বিনিময়ে আখরোট, ঘিয়ের বিনিময়ে দুধ, আঙ্গুরের রসের বিনিময়ে আঙ্গুর এবং খেজুরের শিরার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় করা জায়েজ কিংবা নাজায়েজ হবে। অর্থাৎ যদি ভাঙ্গানো তেল যদি অপর পক্ষের আখরোটের মধ্যে বিদ্যমান তেলের চেয়ে বেশি হয়, ঘি যদি দুধের মাঝে বিদ্যমান ঘিয়ের চেয়ে বেশি হয়, আঙ্গুরের রস যদি আঙ্গুরের মধ্যে বিদ্যমান রসের চেয়ে বেশি হয় এবং খেজুরের শিরা যদি অপর পক্ষের খেজুরের মাঝে বিদ্যমান শিরার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর যদি সমান হয় কিংবা কম হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْقُطْنِ بِغَزْلِهِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তুলাকে তুলার সুতার বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমাদের ফিকহবিদগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। তাদের দলিল হলো, তুলা এবং সুতার শ্রেণী এক এবং উভয়টি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই ওজনের ভিত্তিতে সমান সমান করে বিক্রয় করলে জায়েজ হবে। আর কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে সমান সমান করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। কারণ, তুলাকে সুতা বানানো হলে তার মাঝে ওজনের দিক থেকে কিছু ঘাটতি হয়। অর্থাৎ যদি এক কেজি তুলা দ্বারা সুতা বানানো হয়, তাহলে তার ওজন এক কেজি হয় না; বরং কম হয়। তবে কতটুকু কম হবে তা নিশ্চিত জানা সম্ভব নয়। সুতরাং বিক্রয়ের সময় উভয়ের ওজন সমান করা হলেও পরিণতির দিক থেকে উভয় সমান হচ্ছে না। অতএব বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْكِرْبَاسُ بِالْقُطْنِ يَجُوْزُ كَيْفَ مَا كَانَ بِالْإِجْمَاعِ : তুলার বিনিময়ে সুতার তৈরি কাপড় যে কোনো ভাবে অর্থাৎ কমবেশি করে কিংবা সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ আছে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কেননা, কাপড় তৈরি হওয়ার পর তার শ্রেণী এবং তুলার শ্রেণী ভিন্ন হয়ে গেছে, যেহেতু উভয়ের গুণাগুণ এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন। আর যখন শ্রেণী ভিন্ন, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، وَمُرَادُهُ لَحْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيْسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَا الْمَعْزُ مَعَ الضَّأْنِ، وَكَذَا الْعِرَابُ مَعَ الْبَخَاتِيِّ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোশত একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর গোশত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, উটের গোশত, গরুর গোশত এবং ছাগলের গোশত। পক্ষান্তরে গরু এবং মহিষ একই শ্রেণী (جِنْس) -এর অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ছাগল এবং ভেড়া একই শ্রেণী (جِنْس) -এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপভাবে আরবীয় উট এবং 'বখতী' উট একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الخ :

মাসআলা : গোশত যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী হয়, তাহলে এক প্রাণীর গোশত অন্য প্রাণীর গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। যেমন– গরুর গোশতের বিনিময়ে উটের গোশত, ছাগলের গোশতের বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করা। কেননা, গরু, উট এবং ছাগলের শ্রেণী (جِنْس) যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ এদের গোশতের শ্রেণীও ভিন্ন। আর পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে কম-বেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। [পক্ষান্তরে যদি উভয় দিকে একই শ্রেণীর গোশত হয় যেমন গরুর গোশতের বিনিময়ে গরুর গোশত বিক্রয় করল, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। সমান সমান করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।]

মুসান্নিফ (র.) বলেন, গরু এবং মহিষের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। কাজেই গরুর গোশতের বিনিময়ে মহিষের গোশত কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। এরূপভাবে ছাগল এবং ভেড়ার শ্রেণী এক বলে গণ্য, আর আরবীয় উট এবং বখতী উট [যা আরবীয় উট এবং অনারবী উটের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে] -এর শ্রেণীও এক বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রাণীর নেসাব পূর্ণ না হলে যে প্রাণীর দ্বারা নেসাব পূর্ণ করা হয় এদের উভয়ের শ্রেণী এক বলে গণ্য। যেমন– গরুর নেসাব পূর্ণ না হলে মালিকের মহিষ থাকলে তা দ্বারা গরুর নেসাব পূর্ণ করা হয়। পক্ষান্তরে বকরির নেসাব পূর্ণ না হলে মালিকের গরু থাকলে তা দ্বারা বকরির নেসাব পূর্ণ করা হয় না। কেননা, উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।

উল্লেখ্য, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে সকল গোশত তিন শ্রেণী (جِنْس) -এর মাঝে সীমাবদ্ধ–

১. সকল পাখির গোশত।

২. সকল পশুর গোশত, চাই তা গবাদি পশু হোক কিংবা বন্য পশু হোক সবই একই শ্রেণীভুক্ত।

৩. সামুদ্রিক সকল প্রাণীর গোশত।

قَالَ : وَكَذٰلِكَ اَلْبَانُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ (رح) لَا يَجُوْزُ، لِاَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لِاِتِّحَادِ الْمَقْصُوْدِ، وَلَنَا اَنَّ الْاُصُوْلَ مُخْتَلِفَةٌ حَتّٰى لَا يُكَمَّلُ نِصَابُ اَحَدِهِمَا بِالْاٰخَرِ فِي الزَّكٰوةِ، فَكَذَا اَجْزَاءُهَا اِذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গরুর দুধ এবং বকরির দুধও এরূপ [অর্থাৎ একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।] ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জায়েজ হবে না। কেননা, উভয়ের দুধ একই শ্রেণী (جِنْس) -এর বলে গণ্য। কারণ, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সকল দুধ একই। আর আমাদের দলিল হলো, উক্ত দুধের উৎস প্রাণীগুলোর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই জাকাতের ক্ষেত্রে একটির নেসাবের অপূর্ণতা অপরটি দ্বারা পূর্ণ করা হয় না। সুতরাং এগুলোর অংশ [তথা দুধ] -এর শ্রেণীও ভিন্ন হবে, যতক্ষণ না তা কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ وَكَذٰلِكَ اَلْبَانُ الْبَقَرِ الخ :

মাসআলা : গাভীর দুধ, বকরির দুধ এবং উটনীর দুধের শ্রেণীও ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য। কাজেই এদের একটির দুধ অপরটির দুধের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, তাঁর মতে এ সকল প্রাণীর দুধের শ্রেণী এক, এরূপভাবে এদের গোশতের শ্রেণীও এক। কাজেই এদের একটির দুধ অপরটির দুধের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এদের একটির গোশত অপরটির গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ হবে না।

তাঁর দলিল হলো, সকল প্রাণীর দুধের উদ্দেশ্য এক, আর তা হলো, [একই পদ্ধতিতে] খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। এরূপভাবে এদের গোশতের উদ্দেশ্যও এক, কেননা তারও উদ্দেশ্য হচ্ছে [একই পদ্ধতিতে] খাদ্যরূপে গ্রহণ করা। আর দুটি দ্রব্যের উদ্দেশ্য এক হলে তাদের শ্রেণী এক বলে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য, এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত নয়; বরং তাঁর বিশুদ্ধতম অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ। আমদের দলিল হলো, গোশত বা দুধ হচ্ছে প্রাণীর অংশবিশেষ (اَجْزَاءٌ)। আর দুধ বা গোশতসমূহের মূল তথা গরু, উট ও বকরির শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই যাকাত উসুল করার ক্ষেত্রে একটির নেসাব পূর্ণ না হলে অন্যটি দ্বারা তা পূর্ণ করা হয় না। অর্থাৎ গরুর নেসাব পূর্ণ না হলে তা উট দ্বারা কিংবা বকরি দ্বারা পূর্ণ করা হয় না। আর মূলসমূহের শ্রেণী ভিন্ন হলে তাদের অংশসমূহের শ্রেণীও ভিন্ন হয়। কাজেই এগুলোর দুধ এবং গোশতের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রেণী ভিন্ন হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

قَوْلُهٗ اِذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে উটনী, গাভী ও বকরির দুধের শ্রেণী তখনই ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে যখন দুধ কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত না হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তিত দ্রব্যটি একই হয়, তখন তার শ্রেণী একই বলে গণ্য হবে। যেমন– উটের দুধ দ্বারা তৈরি পনির এবং গরুর দুধ দ্বারা তৈরি পনির, এদের উভয়ের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে এদের মূলের শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না, বরং উভয়ের উদ্দেশ্য এক হওয়ার কারণে শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে।

قَالَ : وَكَذَا خَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ، لِلْاِخْتِلَافِ بَيْنَ اَصْلَيْهِمَا، فَكَذَا بَيْنَ مَائَيْهِمَا، وَلِهٰذَا كَانَ عَصِيْرَاهُمَا جِنْسَيْنِ، وَشَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوْفُ الْغَنَمِ جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকা [কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ]। কেননা, উভয়ের মূলের শ্রেণী (جِنْس) ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাদের [মিশ্রিত] পানিরও শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হবে। এ কারণেই [সকলের ঐকমত্যে] উভয়ের 'রস'-এর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হয়। আর ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোম দুই শ্রেণীর বলে গণ্য হবে। কেননা, উদ্দেশ্যগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَا خَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الخ : اَلدَّقَلُ অর্থ– নিম্নমানের খেজুর [সাধারণত এর দ্বারাই সিরকা বানানো হয়]। خَلٌّ অর্থ– সিরকা।

মাসআলা : আঙ্গুরের সিরকার বিনিময়ে খেজুরের সিরকা কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, উভয় সিরকার মূল তথা খেজুর এবং আঙ্গুরের শ্রেণী ভিন্ন। সুতরাং তাদের [মিশ্রিত] পানি তথা সিরকার শ্রেণীও ভিন্ন হবে। আর এ কারণেই আঙ্গুর নির্গত রস এবং খেজুর নির্গত রসের শ্রেণী সকলের ঐকমত্যে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব যখন আঙ্গুরের সিরকা এবং খেজুরের সিরকার শ্রেণী ভিন্ন তখন একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَشَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوْفُ الْغَنَمِ جِنْسَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোমের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদিও ছাগল এবং ভেড়ার শ্রেণী এক বলে গণ্য এবং উভয়ের গোশত এবং দুধের শ্রেণীও এক বলে গণ্য [যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে] কিন্তু এদের উভয়ের লোম বা পশমের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মূলের শ্রেণী এক হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কারণ, ছাগলের পশম এবং ভেড়ার লোম দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, যথা ভেড়ার লোম দ্বারা শাল এবং মূল্যবান কাপড় তৈরি হয় আর ছাগলের পশম দ্বারা কম্বল এবং রশি তৈরি হয়। কাজেই উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হবে। আর যখন উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য তখন এদের একটির বিনিময়ে অন্যটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভেড়া এবং ছাগলের শ্রেণী এক হওয়া সত্ত্বেও এদের পশম ও লোমের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গণ্য করা হয়েছে। আর গরুর দুধ, উটের দুধ ও বকরির দুধের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হয়েছে, অথচ এগুলোর উদ্দেশ্য এক। আবার একই পশুর দুধ দ্বারা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি দুই ধরনের দ্রব্য তৈরি করা হয়, তাহলে উভয়টাকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গণ্য করা হয়, যেমন– গাভীর দুধ দ্বারা তৈরি পনির এবং মিষ্টি। এই পার্থক্যের কারণ ইনায়াহ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মূল (اَصْل) যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হয় তখন তাদের অংশসমূহের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হবে চাই তাদের উদ্দেশ্য এক হোক না কেন। যেমন– গরুর দুধ এবং উটের দুধ। আর মূল যদি এক শ্রেণীর হয় এবং তাদের অংশসমূহের উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ধরা হবে, যেমন– ভেড়ার লোম এবং ছাগলের পশম। আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং পরিবর্তিত দ্রব্যের উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তাহলে একই শ্রেণীর ধরা হবে– চাই তাদের মূল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হোক না কেন, যেমন– গরুর দুধের পনির এবং উটের দুধের পনির, এদের শ্রেণী এক ধরা হবে– আর যদি পরিবর্তিত দ্রব্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তাদের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ধরা হবে– চাই তাদের মূল এক হোক না কেন, যেমন– গরুর দুধের পনির এবং গরুর দুধের দধি।

قَالَ : وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ بِالْأَلْيَةِ أَوْ بِاللَّحْمِ، لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ الصُّوَرِ وَالْمَعَانِيْ وَالْمَنَافِعِ اخْتِلَافًا فَاحِشًا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে নিতম্বের গোশত কিংবা সাধারণ গোশতের বিনিময়ে উদরের চর্বি [কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ]। কেননা, দৃশ্যগত, গুণগত ও উপকারিতার দিক থেকে এগুলোর মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকায় এগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ الخ : شَحْمٌ অর্থ– চর্বি। أَلْيَةٌ অর্থ– দুম্বার নিতম্বের গোশত।

মাসআলা : সাধারণ গোশতের বিনিময়ে কিংবা দুম্বার নিতম্বের গোশতের বিনিময়ে তার পেটের চর্বি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। [এরূপভাবে দুম্বার সাধারণ গোশতের বিনিময়ে তার নিতম্বের গোশত কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ]। কেননা, এগুলো [একই পশুর হওয়া সত্ত্বেও] ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু বলে গণ্য। কারণ, এগুলোর পরস্পরের মাঝে দৃশ্যগত (صُوْرَةٌ), বস্তুগত (مَعْنَى) এবং উপকারিতার (مَنْفَعَةٌ) দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। দৃশ্যগত যে পার্থক্য রয়েছে তাতো স্পষ্ট। আর বস্তুগত পার্থক্যর কারণ হলো, এগুলোর প্রত্যেকটির মূলবস্তু ভিন্ন ভিন্ন, এ কারণেই একটির নাম চর্বি (شَحْمٌ) আরেকটির নাম নিতম্বের গোশত (أَلْيَةٌ) আর অপরটির নাম গোশত। আর উপকারিতার দিক থেকে ভিন্ন হওয়ার প্রমাণ হলো, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এগুলোর প্রত্যেকটির উপকারিতা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এ তিনও দিক থেকে এগুলোর মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় এগুলোর শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন ধরা হবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত দ্রব্যগুলোর কোনোটিই অপরটির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো ওজন-প্রচলিত দ্রব্য। সুতরাং 'রিবা' হারাম হওয়ার ইল্লাতের একটি বিষয় তথা উভয় দ্রব্যের পরিমাপ-মাধ্যম এক হওয়া বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, বাকি বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, পেটের চর্বি ব্যতীত অন্যান্য চর্বি [যেমন– পাঁজরের চর্বি] গোশতের সংশ্লিষ্ট ধরা হবে, কাজেই তার শ্রেণী এবং গোশতের শ্রেণী এক বলে গণ্য হবে। অতএব, তা গোশতের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আর মাথা, খুরা ও চামড়া এগুলো একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এগুলোর শ্রেণী ভিন্ন।

قَالَ : وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَالدَّقِيْقِ مُتَفَاضِلًا. لِاَنَّ الْخُبْزَ صَارَ عَدَدِيًّا اَوْ مَوْزُوْنًا، فَخَرَجَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ مَكِيْلًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَالْحِنْطَةُ مَكِيْلَةٌ، وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيْهِ، وَالْفَتْوٰى عَلَى الْاَوَّلِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَا نَقْدَيْنِ، فَإِنْ كَانَتِ الْحِنْطَةُ نَسِيْئَةً جَازَ اَيْضًا، وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَسِيْئَةً يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى، وَكَذَا السَّلَمُ فِى الْخُبْزِ جَائِزٌ فِى الصَّحِيْحِ، وَلَا خَيْرَ فِىْ اِسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًا اَوْ وَزْنًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِالْخَبْزِ وَالْخَبَّازِ وَالتَّنُّوْرِ وَالتَّقَدُّمِ وَالتَّاَخُّرِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) يَجُوْزُ بِهِمَا لِلتَّعَامُلِ، وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) يَجُوْزُ وَزْنًا، وَلَا يَجُوْزُ عَدَدًا لِلتَّفَاوُتِ فِىْ اٰحَادِهٖ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গম এবং আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, রুটি গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে কিংবা ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তা সর্বদিক থেকেই পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যের আওতা-বহির্ভূত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে গম [এবং আটা] হলো পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। তবে ফতোয়া প্রথমোক্ত অভিমতটির উপর। আর এ বৈধতার বিধান হলো, যদি উভয় দ্রব্য নগদ হয়। তদ্রূপ যদি গম [বা আটা] বাকি হয় [আর রুটি নগদ হয়] তাহলেও জায়েজ হবে। আর যদি রুটি বাকি হয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে এবং তাঁর মতের উপরই ফতোয়া। এরূপভাবে বিশুদ্ধ মতে রুটির ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গণনার ভিত্তিতে কিংবা ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়ার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ জায়েজ নয়]। কেননা, বেলার কারণে, রুটি তৈরিকারীর কারণে, তন্দুরের কারণে এবং আগে বা পরে [তন্দুর থেকে] উঠানোর কারণে তাতে তারতম্য হয়ে থাকে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে লোক-প্রচলনের কারণে গণনার ভিত্তিতে এবং ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ওজনের ভিত্তিতে তা জায়েজ হবে, কিন্তু গণনার ভিত্তিতে তা জায়েজ হবে না। কেননা, রুটির মাঝে পারস্পরিক তারতম্য হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْخُبْزِ الخ : উপরিউক্ত ইবারতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে–

১. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা, উভয়টি নগদ হস্তান্তর করে।

২. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, রুটি নগদ আর আটা বা গম বাকি।

৩. আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, আটা বা গম নগদ আর রুটি বাকি।

৪. গণনার ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া।

৫. ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া।

মাসআলা : আমাদের তিন ইমামের মতে যদি উভয় দ্রব্য নগদ হয়, তবে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُبْزَ صَارَ عَدَدِيًّا أَوْ مَوْزُوْنًا الخ : উল্লিখিত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উভয় দ্রব্য নগদ হলে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার দলিল পেশ করেছেন। জায়েজ হওয়ার দলিল হলো, গম এবং আটা হচ্ছে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য পক্ষান্তরে রুটি গণনা-প্রচলিত দ্রব্য কিংবা কোনো কোনো অঞ্চলে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই রুটির পরিমাপ মাধ্যম এবং আটা বা গমের পরিমাপ মাধ্যম ভিন্ন। কাজেই একটির বিনিময়ে অপরটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে শুধু উভয়ের পরিমাপ-মাধ্যম ভিন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ উভয়ের শ্রেণীও ভিন্ন। কেননা, আটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (بِالصَّنْعَةِ) পরিবর্তিত হয়ে রুটিতে পরিণত হয়েছে। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন বলে গণ্য হয়। কাজেই রুটি এবং আটা বা গমের শ্রেণী ভিন্ন এবং পরিমাপ-মাধ্যমও ভিন্ন। সুতরাং কোনো অঞ্চলে যদি রুটি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য হয় এবং আটাও ওজন-প্রচলিত দ্রব্য হয়, তবু ওজনের ভিত্তিতে আটার বিনিময়ে রুটি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, উভয়ের শ্রেণী ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِيْهِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে 'নাওয়াদের' [ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ ব্যতীত অন্য গ্রন্থ]-এ বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর মতে আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না; সমান সমান করেও নয় এবং কমবেশি করেও নয়। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (র.) -এর অভিমতও তাই। এ মতটির দলিল হলো, রুটি এবং আটা বা গমের মূল যেহেতু এক, সেহেতু উভয়ের মাঝে একই শ্রেণী হওয়ার বিষয়টি (مُجَانَسَتْ) এক হিসেবে বিদ্যমান আছে। কাজেই সমান সমান করে বিক্রয় করা অপরিহার্য। কিন্তু আটা বা গমের মাঝে এবং রুটির মাঝে সমান সমান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে না। তবে এ মতটির উপর ফতোয়া নয়, ফতোয়া প্রথম মতটির উপর।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتِ الْحِنْطَةُ نَسِيْئَةً جَازَ أَيْضًا : **এখান থেকে** মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয় মাসআলা তথা আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, রুটি নগদ আর আটা বা গম বাকি। [উল্লেখ্য, এ সুরতটি প্রকৃতপক্ষে 'বায় সলম' -এর অন্তর্ভুক্ত।] এ সুরতে আমাদের ইমামগণের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রুটি এবং গম বা আটার শ্রেণীও ভিন্ন এবং পরিমাপ-মাধ্যমও ভিন্ন। কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করাও জায়েজ এবং বাকি বিক্রয় করাও জায়েজ। আর এ ক্ষেত্রে বাকি দ্রব্য যেহেতু আটা বা গম, আর আটা বা গম হচ্ছে পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য যা বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কাজেই তা হস্তান্তরের সময় বিবাদের সম্ভাবনা নেই। অতএব, বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْخُبْزُ نَسِيْئَةً يَجُوْزُ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তৃতীয় মাসআলার বর্ণনা প্রদান করেছেন। তৃতীয় মাসআলা তথা আটা বা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রয় করা এভাবে যে, আটা বা গম, নগদ আর রুটি বাকি। উল্লেখ্য, এ সুরতটিও 'বায় সলম' -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মুদ্রা-দ্রব্য ছাড়া অন্য দ্রব্য বাকি হতে পারে কেবল 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে। অতএব, এ সুরতটি হলো এরূপ যে, আটা বা গম মূলধন (رَأْسُ الْمَالِ) হিসেবে নগদ প্রদান করা হলো আর দাদন-দ্রব্য (مُسْلَمٌ فِيْهِ) হিসেবে রুটি নির্ধারণ করা হলো যা নির্দিষ্ট সময়ে হস্তান্তর করা হবে। এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, রুটির মাঝে অনেক তারতম্য হয়ে থাকে এবং তা বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর যে দ্রব্য বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, তা হস্তান্তরের সময় বিবাদের সম্ভাবনা থাকে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রুটি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। [আর যদি কোনো অঞ্চলে গণনা-প্রচলিত হয় সেখানেও উক্ত সুরতে ওজনের ভিত্তিতে হস্তান্তরের

শর্তে বিক্রয় জায়েজ হবে।] আর ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করা জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া। অর্থাৎ মাশায়েখগণ মানুষের প্রয়োজনের কারণে এ মতটির উপরই ফতোয়া দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَكَذَا السَّلَمُ فِى الْخُبْزِ جَائِزٌ فِى الصَّحِيْحِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী [অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত অনুযায়ী যার উপর ফতোয়া] 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতেও রুটি বিক্রয় করা জায়েজ। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর এ ইবারতটুকু উল্লেখ করার দ্বারা বিশেষ কোনো ফায়দা অর্জিত হয়নি। কারণ, আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, পূর্বের সুরতটিই প্রকৃতপক্ষে 'বায় সলম'-এর সুরত। কাজেই এর পূর্বের ইবারত এবং এ ইবারতের সুরত একটিই, তা হলো 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে রুটি বিক্রয় করা। তবে আগের ইবারতটি ছিল শুধু আটা বা গমের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, আর এ ইবারতটি হচ্ছে যে কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে যেমন মুদ্রার বিনিময়ে। -[হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-ইনায়াহ]

قَوْلُهُ وَلَا خَيْرَ فِى اِسْتِقْرَاضِهِ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا الخ : চতুর্থ ও পঞ্চম মাসআলা তথা গণনার ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ধার বা ঋণ নেওয়া এবং ওজনের ভিত্তিতে পরিশোধের শর্তে রুটি ঋণ নেওয়া। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দুটি সুরতের কোনো সুরতেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ নয়। তাঁর দলিল হলো, রুটি কয়েক কারণে তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। যথা–

ক. বানানোর তারতম্যের কারণে। যেমন– কোনো রুটি পাতলা হয় আবার কোনোটি পুরু হয়। এরূপভাবে কোনোটি ছোট হয় আবার কোনোটি বড় হয়।

খ. রুটি তৈরিকারীর কারণে তারতম্য হয়। যদি তৈরিকারী দক্ষ হয় তাহলে তার রুটি উৎকৃষ্ট হয়, আর যদি দক্ষ না হয় তাহলে তার রুটি তুলনামূলক নিকৃষ্ট হয়।

গ. তন্দুরের কারণেও তারতম্য হয়ে থাকে। তন্দুর যদি নতুন হয় তাহলে রুটি ভাল হয়, আর যদি পুরাতন হয়, তাহলে রুটি তুলনামূলক খারাপ হয়।

ঘ. তৈরির ক্ষেত্রে আগে পরে হওয়ার কারণেও ভালমন্দ হয়ে থাকে। যেমন– তন্দুর গরম করার পর প্রথম দিকের রুটি খারাপ হয়ে থাকে এবং পরের দিকের রুটি ভাল হয়ে থাকে। অতএব, যখন রুটির মাঝে উল্লিখিত দিকগুলো থেকে তারতম্য হয়ে থাকে তা ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু বলে গণ্য হবে না। আর ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু না হলে তা ঋণরূপে নেওয়া জায়েজ হয় না। কেননা, সে ক্ষেত্রে যে বস্তু ঋণ নিবে তদ্রূপ বস্তু পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। কাজেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না, চাই ওজনের ভিত্তিতে নেওয়া হোক কিংবা গণনার ভিত্তিতে নেওয়া হোক।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উভয় সুরতেই রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতেও নেওয়া জায়েজ হবে এবং গণনার ভিত্তিতেও নেওয়া জায়েজ হবে। কেননা, জনগণের মাঝে প্রতিবেশিদের নিকট হতে রুটি ঋণ গ্রহণ করার প্রচলন (تَعَامُلٌ) রয়েছে এবং এর প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এটা ওজনের ভিত্তিতেও হয়ে থাকে এবং গণনার ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। আর জন-প্রচলন (تَعَامُلُ النَّاسِ)-এর কারণে কিয়াস পরিহার করা হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি অনুসারে জায়েজ না [হও]য়ার কথা সত্ত্বেও জন-প্রচলনের কারণে জায়েজ হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কেবল পঞ্চম সুরতে অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতে রুটি ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। চতুর্থ সুরতে তথা গণনার ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে রুটি ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই ওজনের ভিত্তিতে হলে তা ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু বলে গণ্য হবে। অতএব, ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে গণনার ভিত্তিতে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, রুটি ছোট বড় এবং পাতলা ও মোটা হওয়ার দিক থেকে তারতম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কাজেই তা গণনার ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।–[রদ্দুল মুহতার, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ: ৪২১]

قَالَ : وَلَا رِبْوا بَيْنَ الْمَوْلٰى وَعَبْدِهٖ، لِاَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِىْ يَدِهٖ مِلْكٌ لِمَوْلَاهُ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبْوا ، وَهٰذَا اِذَا كَانَ مَاذُوْنًا لَهٗ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ، لِاَنَّ مَا فِىْ يَدِهٖ لَيْسَ مِلْكَ الْمَوْلٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ بِهٖ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ كَالْاَجْنَبِىِّ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبْوا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهٖ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মনিব ও তার গোলামের মাঝে কোনো 'রিবা' [সুদ] হয় না। কেননা, গোলাম এবং তার হস্তগত সবই তার মনিবের মালিকানাধীন। সুতরাং 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে না। এ বিধান হলো যদি গোলাম ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং তার উপর ঋণ না থাকে। কিন্তু যদি তার উপর ঋণ থাকে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে [কমবেশি করে বিক্রয় করা] জায়েজ হবে না। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [এ সুরতে] গোলামের হস্তগত সম্পদ মনিবের মালিকানাধীন নয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার হস্তগত সম্পদের সাথে যেহেতু পাওনাদারদের হক সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে সেহেতু গোলাম মনিবের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের মাঝে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে মনিব ও তার 'মুকাতাব' [যার সাথে অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব-মুক্তির চুক্তি হয়েছে] -এর মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَلَا رِبْوا بَيْنَ الْمَوْلٰى الخ : মাসআলা হলো, গোলাম যদি তার মনিবের পক্ষ থেকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয় এবং তার উপর এতটুকু পরিমাণ ঋণ না থাকে যা তার [গোলামের] মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে এমতাবস্থায় যদি উক্ত গোলাম তার মনিবের সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর [সুদী] লেনদেন করে, তবে তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে না। যেমন– মনিব তার উক্ত গোলামের নিকট হতে এক মণ গমের বিনিময়ে দুই মণ গম ক্রয় করল, তাহলে এটা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে না। কেননা, গোলাম এবং তার হাতে যে সম্পদ রয়েছে সবই তার মনিবের মালিকানাধীন বস্তু। কাজেই মনিব এবং তার উক্ত গোলামের মাঝে প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ই হচ্ছে না [বরং যেন মনিব তার কিছু সম্পদ পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য সম্পদ রাখল]। আর যখন তাদের মাঝে প্রকৃতপক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ই সংঘটিত হচ্ছে না তখন 'রিবা' বা সুদও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সুদ বলা হয় বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে এক পক্ষের অতিরিক্ত বস্তুকে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوْزُ بِالْاِتِّفَاقِ الخ : আর যদি উক্ত গোলামের উপর অন্যদের এই পরিমাণ ঋণ পাওনা থাকে যে তা উক্ত গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি, আর এমতাবস্থায় সে তার মনিবের সাথে 'রিবা'-এর [সুদী] লেনদেন করে তাহলে তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে এবং নাজায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এবং সাহেবাইন (র.) একমত, তবে রিবা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'রিবা' বলে গণ্য হওয়ার কারণ হলো, তাঁর মতে যখন ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের উপর তার মূল্য সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি অন্যদের ঋণ পাওনা সাব্যস্ত হয় তখন মনিব গোলামের হস্তস্থিত সম্পদের মালিক থাকে না। কাজেই এমতাবস্থায় উক্ত লেনদেনের মাধ্যমে নিজের সম্পদ গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে না; বরং অন্যের সম্পদ 'রিবা'-এর চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করেছে বলে গণ্য হবে। অতএব, তা 'রিবা' বা সুদ বলে গণ্য হবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদিও উল্লিখিত অবস্থায় মনিবই গোলামের হস্তস্থিত সম্পদের মালিক থাকে, কিন্তু যেহেতু সে সম্পদের সাথে পাওনাদারদের অধিকার জড়িত হয়ে গেছে সেহেতু গোলাম এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তি (اَجْنَبِيْ) বলে বিবেচিত হবে। অতএব, ভিন্ন ব্যক্তির সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে যেরূপ সুদ সাব্যস্ত হয়, এ ক্ষেত্রে সেরূপ 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে মনিব এবং তার মুকাতাব [অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার চুক্তিকৃত গোলাম]-এর মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হয়। কেননা, মুকাতাবও তার চুক্তির কারণে তার উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির মতোই। তাই তার মাঝে এবং তার মনিবের মাঝে সুদ সাব্যস্ত হয়।

উল্লেখ্য, মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গোলামের উপর অন্যদের ঋণ পাওনা থাকার সুরতেও গোলাম এবং তার মনিবের মাঝে 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। তবে মনিব যা অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে অন্যদের পাওনা থাকার কারণে। যেমনিভাবে মনিব যদি উক্ত অবস্থায় গোলামের হস্তস্থিত সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি ছাড়া এমনিতেই গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হয়। তদ্রূপ সুদী লেনদেনের মাধ্যমে যা সে অতিরিক্ত গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে।

উল্লেখ্য, গোলাম এবং মনিবের মাঝে যেরূপ রিবা বা সুদ সাব্যস্ত হয় না, তদ্রূপ মনিব এবং তার أُمُّ وَلَدْ এবং مُدَبَّرْ-এর মাঝেও 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না।

قَالَ : وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ (رح). لَهُمَا الْاِعْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِبُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِي دَارِهِمْ، فَبِأَيِّ طَرِيْقٍ اَخَذَهُ الْمُسْلِمُ اَخَذَ مَالًا مُبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ غَدْرٌ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ، لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْاَمَانِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দারুল হরব বা কাফির রাষ্ট্রে মুসলমান এবং হরবী [সেখানকার কাফির বাসিন্দা] -এর মাঝেও 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না। [এ ক্ষেত্রে] ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের দলিল হলো, তাদের দেশ থেকে ভিসা গ্রহণ করে আমাদের দেশে আগত ব্যক্তির উপর কিয়াস [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে যেমন আগত ব্যক্তি ও মুসলিম বাসিন্দার মাঝে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয় তদ্রূপ আলোচ্য ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হবে]। আমাদের দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- "দারুল হারব বা কাফির শত্রু রাষ্ট্রে মুসলিম ও 'হারবী' [কাফির বাসিন্দা]-এর মাঝে কোনো 'রিবা' বা সুদ নেই"। তাছাড়া এ কারণে যে, দারুল হরবে বিদ্যমান অবস্থায় তাদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ। সুতরাং মুসলমান যে-কোনো উপায়ে তা হস্তগত করলে সে বৈধ সম্পদ হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে, যদি তা হস্তগত করায় বিশ্বাসঘাতকতা না থাকে। পক্ষান্তরে ভিসা গ্রহণ করে আগত ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ভিসার কারণে তার সম্পদ [আমাদের দেশে থাকা অবস্থায়] হস্তগত করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ الخ : মাসআলা হলো, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দারুল হরব তথা কাফির রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় কাফির বাসিন্দার সাথে ভিসা নিয়ে কাফির রাষ্ট্রে গমনকারী মুসলমানের কোনো 'রিবা' বা সুদ সাব্যস্ত হবে না, অর্থাৎ সুদী লেনদেন করা জায়েজ হবে, এ ক্ষেত্রে 'রিবা' বা সুদ হারাম হবে না। এরূপভাবে দারুল হরবের যে বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে চলে আসেনি তার সাথেও ভিসা নিয়ে গমনকারী মুসলিমের সুদী লেনদেন করা জায়েজ হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে উক্ত সুরতেও রিবা বা সুদ সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ সুদী লেনদেন করা হারাম হবে। কাজেই এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لَهُمَا الْاِعْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا : ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী [এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক] (র.)-এর দলিল হলো কিয়াস, আর তা হলো, যদি কোনো কাফির বাসিন্দা মুসলিম রাষ্ট্রে ভিসা গ্রহণ করে আগমন করে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় তার সাথে মুসলামনদের সুদী লেনদেন করা সকলের ঐকমত্যে হারাম। সুতরাং -এর উপর কিয়াস অনুসারে কোনো মুসলিম যদি ভিসা গ্রহণ করে কাফির রাষ্ট্রে গমন করে, তাহলে সেখানেও তার কাফিরদের সাথে সুদী লেনদেন করা হারাম হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) এখানে কেবল জমহুরের কিয়াসের দলিল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মূল দলিল হলো, যে সকল 'নস' [আয়াত বা হাদীস] -এ 'রিবা' বা সুদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা مُطْلَقٌ অর্থাৎ তাতে সুদ হারাম হওয়ার জন্য কোনো স্থান বা রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং তা শর্তবিহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং 'রিবা' হারাম হওয়ার বিষয়টি কোনো স্থান বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাস বা নির্দিষ্ট করা যাবে না; বরং তা مُطْلَقٌ বা শর্তমুক্তই রাখতে হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِبُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের [অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর] দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী – لَا رِبُوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ "দারুল হারব বা কাফির শত্রু রাষ্ট্রে মুসলিম ও 'হারবী' [কাফির বাসিন্দা]-এর মাঝে কোনো 'রিবা' বা সুদ নেই"। উল্লেখ্য, এ হাদীসটি দুর্বল। ইবনে হুমাম (র.) এবং আল্লামা যায়লায়ী (র.) বলেছেন, হাদীসটি غَرِيْبٌ। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন لَمْ أَجِدْهُ "হাদীসটি আমি পাইনি"। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.) হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ إِنَّمَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) هٰذَا لِأَنَّ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ حَدَّثَنَا عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا رِبَا بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ أَظُنُّهُ قَالَ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا حُجَّةَ فِيْهِ.

অর্থাৎ "ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এজন্য উক্ত অভিমত পোষণ করেছেন যে, কোনো কোনো শায়খ আমাদের কাছে মাকহুল থেকে [মুরসালরূপে] হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "সুদ সাব্যস্ত হবে না হরবী বাসিন্দাদের মাঝে" [বর্ণনকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ শব্দও বলেছেন যে,] "আর মুসলমানদের মাঝে"। ইমাম বায়হাকী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে এভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, হাদীসটি মুরসাল এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তি অজ্ঞাত বা مَجْهُوْلٌ। কাজেই এটি দলিল হিসেবে খুবই দুর্বল।

মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে একটি নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) আরেকটি নকলী দলিল উল্লেখ করেছেন। তা হলো, হযরত আবূ বকর (রা.) হিজরতের পূর্বে যখন সূরা 'রূম' অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার কাফিরদের সাথে রোমবাসীদের পুনরায় বিজয় লাভ করার বিষয়ে বাজি ধরেছিলেন এবং পরবর্তীতে ৭ম হিজরিতে যখন রোমবাসী পারস্যের উপর বিজয় লাভ করে তখন তিনি তার বাজির সম্পদ কাফিরদের নিকট হতে গ্রহণ করেন এবং নবী করীম ﷺ তা গ্রহণে অনুমতি দান করেন। আর মক্কা তখন ছিল দারুল হরব বা কাফির রাষ্ট্র। এ মর্মের হাদীস তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এবং নাইয়্যার ইবনে মুকাররাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন– হাদীসটি সহীহ, হাসান ও গরীব।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ فِيْ دَارِهِمْ، فَبِأَيِّ طَرِيْقٍ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর আকলী দলিল হলো, [এটি প্রকৃতপক্ষে জমহূরের নকলী দলিলের জবাব] দারুল হরবে থাকা অবস্থায় সেখানকার বাসিন্দাদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য হস্তগত করা বৈধ (مُبَاحُ الْأَصْلِ)। কাজেই মুসলামান যে কোনো পন্থায়ই তা হস্তগত করুক তা তার জন্য জায়েজ হবে, তবে শর্ত হলো বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। কেননা, বিশ্বাসঘাতকতা কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। অতএব, কোনো মুসলমান যদি দারুল হরবে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করে, তাহলে সে চুরি বা ডাকাতির বা জোরপূর্বক কোনো হরবী বাসিন্দার সম্পদ হস্তগত করতে পারবে না। কেননা, তাতে ভিসার মাধ্যমে সে যে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। নতুবা তার জন্য জায়েজ হতো। যেমন– কেউ যদি ভিসা ছাড়া দারুল হরবে প্রবেশ করে জোরপূর্বক তাদের সম্পদ নিয়ে আসে তা জায়েজ হয়। কিন্তু গমনকারী মুসলমান যদি সুদী লেনদেনের মাধ্যমে তাদের সম্পদ হস্তগত করে, তাহলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। কেননা, যে সম্পদ তার জন্য [জোরপূর্বক] হস্তগত করা বৈধ ছিল তা সে গ্রহণ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসঘাতকতাও ছিল না। কেননা, সে অপর পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তা গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ مَحْظُوْرًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) জমহূরের কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, তাদের কিয়াস সঠিক হয়নি। কেননা, দারুল হরবে থাকা অবস্থায় হরবীদের সম্পদ হলো مُبَاحُ الْأَصْلِ বা "মুসলমানদের জন্য বৈধ সম্পদ" তাই তা সুদী লেনদেনের মাধ্যমে গ্রহণ করলেও ধরা হবে যে, সে তার জন্য যে সম্পদ এমনিতেই গ্রহণ করা বৈধ ছিল তা সে গ্রহণ করেছে, কাজেই সুদ হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে কোনো হরবী বাসিন্দা ভিসা গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে আসলে তার সম্পদ মুসলমানদের জন্য হস্তগত করা বৈধ (مُبَاحُ الْأَصْلِ) থাকে না। কেননা, ভিসার মাধ্যমে তার জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। কাজেই সুদী লেনদেনের মাধ্যমে তা গ্রহণ করলে বৈধ সম্পদ গ্রহণ করেছে বলে ধরা হবে না; বরং নিষিদ্ধ সম্পদ (مَالٌ مَحْظُوْرٌ) চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করেছে। অতএব তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

بَابُ الْحُقُوْقِ

وَمَنِ اشْتَرٰى مَنْزِلًا فَوْقَهٗ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْاَعْلٰى، اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِيَهٗ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهٗ اَوْ بِمَرَافِقِهٖ اَوْ بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ هُوَ فِيْهِ اَوْ مِنْهُ، وَمَنِ اشْتَرٰى بَيْتًا فَوْقَهٗ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهٗ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْاَعْلٰى، وَمَنِ اشْتَرٰى دَارًا بِحُدُوْدِهَا فَلَهُ الْعِلْوُ وَالْكَنِيْفُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْبَيْتِ وَالدَّارِ، فَاسْمُ الدَّارِ يَنْتَظِمُ الْعِلْوَ، لِاَنَّهٗ اِسْمٌ لِمَا اُدِيْرَ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ، وَالْعِلْوُ مِنْ تَوَابِعِ الْاَصْلِ وَاَجْزَائِهٖ، فَيَدْخُلُ فِيْهِ، وَالْبَيْتُ اِسْمٌ لِمَا يُبَاتُ فِيْهِ وَالْعِلْوُ مِثْلُهٗ وَالشَّيْءُ لَا يَكُوْنُ تَبْعًا لِمِثْلِهٖ فَلَا يَدْخُلُ فِيْهِ، اِلَّا بِالتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ، وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ، لِاَنَّهٗ يَتَاَتّٰى فِيْهِ مَرَافِقُ السُّكْنٰى مَعَ ضَرْبِ قُصُوْرٍ، اِذْ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَنْزِلُ الدَّوَابِّ، فَلِشِبْهِهٖ بِالدَّارِ يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِيْهِ تَبْعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِعِ، وَلِشِبْهِهٖ بِالْبَيْتِ لَا يَدْخُلُ فِيْهِ بِدُوْنِهٖ.

পরিচ্ছেদ : অধিকার

অনুবাদ : কেউ যদি এমন একটি বাসভবন (مَنْزِلٌ) ক্রয় করে, যার উপরে একটি তলা রয়েছে, তাহলে উপরের তলা তার মালিকানাভুক্ত হবে না। অবশ্য যদি সে ভবনটি তার সকল অধিকারসহ কিংবা তার সকল সুবিধাদিসহ কিংবা কমবেশি যা কিছু তাতে রয়েছে বা তা থেকে লাভ করা যায় তা-সহ ক্রয় করে, তাহলে সে উপরের তলারও মালিক হবে। আর কেউ যদি একটি ঘর (بَيْتٌ) তার সকল অধিকারসহ ক্রয় করে, তাহলে উপরের তলা তার ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর কেউ যদি চতুর্দিকের সীমানাসহ কোনো বাড়ি ক্রয় করে, তাহলে উপরের তলা এবং শৌচাগার তার মালিকানাভুক্ত হবে। [ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে] مَنْزِلٌ , بَيْتٌ এবং دَارٌ -এর আলোচনা একত্রে করেছেন। دَارٌ [বাড়ি] শব্দটি উপরের তলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, دار বলা হয় "চতুঃসীমা বেষ্টিত ভিটি" -কে; আর উপরের তলা হচ্ছে মূল ভিটির অনুবর্তী এবং তার অংশভুক্ত জিনিস। সুতরাং উপরের তলা دَارٌ [বাড়ি]-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর بَيْتٌ [ঘর] বলা হয় "যেখানে রাত্রি যাপন করা হয়" এমন স্থানকে। আর উপরের তলা এর সমকক্ষ। আর কোনো জিনিস তার সমকক্ষ জিনিসের অনুবর্তী হয় না। কাজেই স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া উপরের তলা ঘরের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর مَنْزِلٌ [বাসভবন] دَارٌ এবং بَيْتٌ -এর মাঝামাঝি জিনিসকে বুঝায়। কেননা, তাতে বসবাসের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থাকে। তবে কিছুটা অপূর্ণতা থাকে, কারণ তাতে পশু রাখার ঘর থাকে না। সুতরাং دَارٌ -এর সাথে তার সাদৃশ্য থাকার কারণে [مَنْزِلٌ ক্রয়কালে] অনুবর্তী সুযোগ-সুবিধাসহ উল্লেখ করলে উপরের তলা অনুবর্তী জিনিসরূপে مَنْزِلٌ বা বাসভবনের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার بَيْتٌ -এর সাথে তার সাদৃশ্য থাকার কারণে [ক্রয়কালে] অনুবর্তী সুযোগ-সুবিধাসহ কথাটি উল্লেখ না করলে উপরের তলা তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : حُقُوقٌ শব্দটি حَقٌّ -এর বহুবচন। حَقٌّ বলা হয়- مَا يَسْتَحِقُّ الرَّجُلُ অর্থাৎ "কোনো ব্যক্তি যার প্রাপক বা হকদার হয়"। এ পরিচ্ছেদে حُقُوقٌ দ্বারা ঐ সকল বস্তু উদ্দেশ্য যা ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রয়দ্রব্যের সাথে উল্লেখ না করা হলেও অনুগামী বস্তু হিসেবে ক্রেতার প্রাপ্য বলে সাব্যস্ত হয়।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ পরিচ্ছেদটি "ক্রয়-বিক্রয়ের অধ্যায়" (كِتَابُ الْبُيُوْعِ) -এর শেষে "ইচ্ছাধিকারের পরিচ্ছেদ" (بَابُ الْخِيَارِ) -এর পূর্বে আলোচনা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল; কিন্তু মুসান্নিফ (র.) তাঁর হিদায়া গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'জামিউস সগীর' গ্রন্থ অনুসারে বিন্যাস করেছেন। তাই 'জামিউস সগীর' গ্রন্থে যেহেতু এ পরিচ্ছেদটি 'রিবার পরিচ্ছেদের' পরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু মুসান্নিফ (র.)-ও 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের পরে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, এ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বস্তুসমূহ হচ্ছে মূল বিক্রীত বস্তুর অনুগামী বস্তু (تَوَابِعْ), আর অনুগামী বস্তু মূল বস্তুর পরে হয়ে থাকে, তাই মুসান্নিফ (র.) বিক্রয় সংক্রান্ত মূল মাসআলাসমূহ আলোচনার পরে এ পরিচ্ছেদের মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন।

কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা : بَيْتٌ – বলা হয় চতুর্দিকে দেওয়াল, ছাদ ও দরজাবিশিষ্ট কামরাকে যেখানে রাত্রি যাপন করা যায়। আমাদের পরিভাষায় একে কামরা বা রুম বলা হয়।

مَنْزِلْ হলো بَيْتٌ -এর চেয়ে বড়, অর্থাৎ যার মাঝে কয়েকটি কামরা থাকে, রান্নাঘর ও বাথরুম থাকে, কিন্তু তাতে আঙ্গিনা থাকে না।

আর دَارٌ হলো مَنْزِلٌ -এর চেয়ে বড়। অর্থাৎ যার একাধিক কামরা, গোসলখানা, পাকঘর ও আঙ্গিনা থাকে এবং তা চতুর্দিকের সীমানাযুক্ত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য এ ব্যাখ্যা তৎকালীন আরববাসী এবং কুফাবাসীদের প্রচলন অনুসারে। বর্তমানে এগুলোর নাম ও ব্যাখ্যা ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى مَنْزِلًا الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লিখিত ইবারতে তিনটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কোনো ব্যক্তি এমন একটি منزل [ঘর] ক্রয় করে যার উপরে একটি তলা রয়েছে, তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে না। তবে ক্রয়কালে যদি এভাবে উল্লেখ করে থাকে যে, আমি مَنْزِلْ [ঘর] টি তার সকল অধিকারসহ কিংবা তার সকল সুযোগ-সুবিধাসহ ক্রয় করলাম, অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমবেশি যা কিছু রয়েছে তা-সহ ক্রয় করলাম, তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে। অর্থাৎ এভাবে উল্লেখ করার কারণে উপরের তলা নিচের তলার অনুগামী হিসেবে ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

২. কেউ যদি এমন একটি بَيْتٌ [কামরা] ক্রয় করে যার উপরে আরেকটি কামরা রয়েছে, তাহলে ক্রেতা উপরের কামরাটির মালিক হবে না। এমনকি যদি সে ক্রয়কালে এভাবে বলে থাকে যে, আমি কামরাটির সকল সুযোগ-সুবিধাসহ কিংবা সকল অধিকারসহ অথবা এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমবেশি যা কিছু রয়েছে সবসহ ক্রয় করলাম তবুও উপরের কামরাটি ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। [তবে যদি স্পষ্টরূপে বলে যে, আমি নিচের কামরাটি এবং এর উপরের কামরাটি ক্রয় করলাম, তাহলে সে উপরের কামরার মালিক হবে।]

৩. কেউ যদি কোনো دَارٌ [বাড়ি] তার চতুঃসীমাসহ ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা উপরের তলার মালিক হবে, তদ্রূপ শৌচাগারেরও মালিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাড়ি বলার কারণে উপরের তলা এমনিতেই ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; অতিরিক্ত কোনো শর্ত উল্লেখ করতে হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এখানে دَارٌ – مَنْزِلٌ এবং بَيْتٌ এ তিনটির আলোচনা করেছেন। دار বা বাড়ি বলা হয়, চতুঃসীমা নির্ধারিত এমন ভিটিকে, যাতে একাধিক কামরা, উপরের তলা, আস্তাবল এবং উন্মুক্ত আঙ্গিনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতএব যেহেতু উপরের তলা বাড়ির একটি অংশ বা অনুগামী বস্তু সেহেতু তা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখ না করা হলেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আর بَيْتٌ বলা হয় ছাদবিশিষ্ট একক কামরাকে, যার মাঝে রাত্রি যাপন করা যায়। এর বিধান হলো, ক্রয়কালে স্পষ্টরূপে উপরের তলার কথা উল্লেখ না করা হলে উপরের তলা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, উপরের তলার কামরা নিচের তলার কামরার সমমানের বস্তু। কারণ, সেটিও ছাদবিশিষ্ট একক কামরা। আর সমমানের বস্তু একটি অপরটির অনুগামী (تَابِعٌ) হয় না।

আর مَنْزِلٌ হচ্ছে دَارٌ এবং بَيْتٌ -এর মাঝামাঝি। কেননা, مَنْزِلٌ বলা হয় যা দুই বা ততোধিক কামরাবিশিষ্ট যেখানে দিবসে বাসস্থান এবং রাত্রে অবস্থান করা হয় (يَنْزِلُ فِيْهَا لَيْلًا وَنَهَارًا) এবং যার রান্নাঘর ও শৌচাগার রয়েছে। এতে পরিবার নিয়ে বসবাস করা সম্ভব হয়, কিন্তু কিছুটা অপূর্ণতা থেকে যায়, কারণ এতে উন্মুক্ত আঙ্গিনা ও পশু রাখার আস্তাবল থাকে না। এর বিধান হলো, যদি কোনো শর্ত উল্লেখ না করে তাহলে উপরের তলা ক্রেতার মালিকানাধীন হবে না। আর যদি অনুগামী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করে। যেমন– আমি এর সকল সুযোগ-সুবিধা কিংবা সকল অধিকারসহ ক্রয় করলাম অথবা এর যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তুসহ ক্রয় করলাম, তাহলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতা উপরের তলারও মালিক হয়ে যাবে। কেননা, مَنْزِلٌ হচ্ছে دَارٌ এবং بَيْتٌ -এর মাঝামাঝি। তাই একদিক থেকে এটা بَيْتٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আবার আরেক দিক থেকে دَارٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই بَيْتٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ না করলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর دَارٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ উল্লেখ করলে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ، لِاَنَّ كُلَّ مَسْكَنٍ يُسَمّٰى بِالْفَارِسِيَّةِ خَانَهْ، وَلَا يَخْلُوْ عَنْ عِلْوٍ، وَكَمَا يَدْخُلُ الْعِلْوُ فِيْ اِسْمِ الدَّارِ يَدْخُلُ الْكَنِيْفُ، لِاَنَّهٗ مِنْ تَوَابِعِهٖ، وَلَا يَدْخُلُ الظُّلَّةُ اِلَّا بِذِكْرِ مَا ذَكَرْنَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّهٗ مَبْنِيٌّ عَلٰى هَوَاءِ الطَّرِيْقِ فَاَخَذَ حُكْمَهٗ، وَعِنْدَهُمَا اِنْ كَانَ مُفْتَحُهٗ فِي الدَّارِ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا لِاَنَّهٗ مِنْ تَوَابِعِهٖ فَشَابَهَ الْكَنِيْفَ ـ

অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের [বুখারার] প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে উল্লিখিত সকল সূরতেই উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, যে কোনো বাসস্থানকে ফারসিতে خَانَهْ বলা হয়, আর خَانَهْ উপরের তলাবিহীন হয় না। আর دَارٌ [বাড়ি] শব্দের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে তেমনিভাবে শৌচাগারও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, শৌচাগারও دَارٌ [বাড়ি]-এর অনুবর্তী জিনিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর [دَارٌ "বাড়ি" বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ظُلَّةٌ [বাড়ির প্রবেশমুখস্থ রাস্তার উপরের ছাউনিবিশিষ্ট বারান্দা] অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদি আমাদের পূর্বোল্লিখিত শর্তগুলো উল্লেখ না করে। কেননা, তা রাস্তার উপরে শূন্যে তৈরি। সুতরাং তা রাস্তার বিধানই গ্রহণ করবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি তার প্রবেশপথ বাড়ির ভিতরে হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বোল্লিখিত কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তা دَارٌ বা বাড়ির অনুবর্তী জিনিস, সুতরাং তা শৌচাগারের মতোই হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ فِيْ عُرْفِنَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ পার্থক্যগুলো হচ্ছে কুফাবাসীদের পরিভাষা অনুসারে। পক্ষান্তরে আমাদের [অর্থাৎ বুখারা ও সমরকান্দবাসীদের] পরিভাষা অনুসারে সর্বাবস্থায়ই উপরের তলা বিক্রয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, যে কোনো আবাসস্থলকে ফারসি ভাষায় خَانَهْ [ঘর] বলে। আর خَانَهْ সাধারণত উপরের তলা ছাড়া হয় না। কাজেই যে শব্দ উল্লেখ করেই তা বিক্রয় করুক না কেন উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, دَارٌ [বাড়ি] বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই উপরের তলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তদ্রূপ শৌচাগারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা, শৌচাগারও دَارٌ-এর অনুগামী বস্তু, কাজেই অনুগামী (تَابِعٌ) হিসেবে তা دَارٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আর ظُلَّةٌ বলা হয় এমন চালা বা ছাউনিকে যা বাড়ি থেকে শুরু করে মূল রাস্তা পর্যন্ত নির্মিত হয়ে থাকে। [আর কারো কারো মতে ظُلَّةٌ হলো এমন ছাউনি যা দুটি বাড়ির মধ্যবর্তীতে নির্মিত হয়।] এর বিধান হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি কোনো শর্ত উল্লেখ না করে, তাহলে এটি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহের কোনো একটি উল্লেখ করে, [যেমন– আমি এর সকল সুযোগ-সুবিধা কিংবা সকল অধিকারসহ ক্রয় করলাম অথবা এর যাবতীয় সংশ্লিষ্ট বস্তুসহ ক্রয় করলাম] তাহলে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা ক্রেতার মালিকানাধীন হবে। কেননা, উক্ত ظُلَّةٌ বা ছাউনি নির্মিত হয় [মূল রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছার] ছোট রাস্তার উপর। কাজেই এর বিধানও তাই হবে যা এ ছোট রাস্তার বিধান। আর উক্ত ছোট রাস্তার বিধান হলো উল্লিখিত শর্তসমূহ উল্লেখ করা ছাড়া তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। অতএব, ظُلَّةٌ -ও শর্ত উল্লেখ করা ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি উক্ত ظُلَّةٌ বা ছাউনির প্রবেশমুখ বাড়ির অংশের উপর হয়, তাহলে কোনো শর্ত উল্লেখ ছাড়াই তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তখন এটিও বাড়ির অনুগামী বস্তু বলে গণ্য। অতএব, শৌচাগারের ন্যায় কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى بَيْتًا فِىْ دَارٍ اَوْ مَنْزِلًا اَوْ مَسْكَنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الطَّرِيْقُ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ اَوْ بِمَرَافِقِهِ اَوْ بِكُلِّ قَلِيْلٍ وَكَثِيْرٍ، وَكَذَا الشِّرْبُ وَالْمَسِيْلُ، لِاَنَّهُ خَارِجُ الْحُدُوْدِ، اِلَّا اَنَّهُ مِنَ التَّوَابِعِ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، بِخِلَافِ الْاِجَارَةِ لِاَنَّهَا تُعْقَدُ لِلْاِنْتِفَاعِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ اِلَّا بِهِ، اِذَا الْمُسْتَاْجِرُ لَا يَشْتَرِى الطَّرِيْقَ عَادَةً وَلَا يَسْتَاْجِرُهُ فَيَدْخُلُ تَحْصِيْلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطْلُوْبَةِ مِنْهُ. اَمَّا الْاِنْتِفَاعُ بِالْمَبِيْعِ مُمْكِنٌ بِدُوْنِهِ، لِاَنَّ الْمُشْتَرِىَ عَادَةً يَشْتَرِيْهِ، وَقَدْ يَتَّجِرُ فِيْهِ فَيَبِيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَحَصَلَتِ الْفَائِدَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি কোনো বাড়ির একটি ঘর বা একটি বাসভবন কিংবা একটি বাসস্থান ক্রয় করে, তাহলে রাস্তা তার মালিকানাভুক্ত হবে না। অবশ্য যদি সে তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অধিকারসহ কিংবা সুযোগ-সুবিধাসহ অথবা তার কমবেশি যা কিছু রয়েছে তা সহ ক্রয় করে, তাহলে অন্তর্ভুক্ত হবে। পানির হিসসা এবং পানির নালার বিষয়টিও এরূপ। কেননা, এগুলো বিক্রীত জিনিসের চতুঃসীমার বহির্ভূত। তবে এগুলো যেহেতু তার অনুবর্তী জিনিস তাই অনুবর্তী জিনিসের কথা উল্লেখ করলে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে ইজারার বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ ইজারার ক্ষেত্রে উল্লেখ ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হবে]। কেননা, ইজারার চুক্তি সম্পাদন করা হয় উপকার লাভ করার জন্য। আর উক্ত জিনিসগুলো ছাড়া [শুধু ঘর বা ভবন দ্বারা] উপকার লাভ করা যায় না। কেননা, ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তি সাধারণত আলাদাভাবে রাস্তা ক্রয় করে না বা তা ভাড়ায় গ্রহণ করে না। সুতরাং ইজারার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন হওয়ার জন্য উক্ত জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে [ক্রয়ের ক্ষেত্রে] উক্ত জিনিসগুলো ছাড়াও বিক্রীত [ঘর বা ভবন] দ্বারা উপকার লাভ করা সম্ভব। কেননা, ক্রয়কারী সাধারণত তা আলাদাভাবে ক্রয় করে, আবার কখনও সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে, তখন সে রাস্তা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই তা বিক্রয় করতে পারে। ফলে তার ফায়দা অর্জিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى بَيْتًا فِىْ دَارٍ الخ : মাসআলা হলো, যদি কেউ কোনো একটি বাড়ির একটি কামরা বা একটি ঘর বা আবাসগৃহ ক্রয় করে, তাহলে ক্রেতা এগুলোর সংশ্লিষ্ট রাস্তার মালিক হবে না। তবে ক্রেতা যদি ক্রয়কালে পূর্বে উল্লিখিত শর্তসমূহের কোনো একটি উল্লেখ করে [যেমন– আমি এর সকল অধিকারসহ কিংবা সকল সুযোগ-সুবিধাসহ অথবা এর সংশ্লিষ্ট সবকিছুসহ ক্রয় করলাম] তাহলে ক্রেতা রাস্তার মালিক হবে।

এরূপভাবে জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে পানির হিসসা [পানি নেওয়ার অধিকার] এবং পানির নালারও একই বিধান অর্থাৎ কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে জমির ক্রেতা পানির হিসসা এবং পানির নালার মালিক হবে না, আর উপরিউক্ত কোনো শর্ত উল্লেখ করলে মালিক হবে।

দলিল হলো, উপরিউক্ত তিনটি বস্তু– রাস্তা, পানির হিসসা ও পানির নালা– এক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয়কৃত বস্তু [কামরা, ঘর, আবাসগৃহ কিংবা জমি]-এর সীমানার বহির্ভূত জিনিস। কাজেই অনুগামী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে তা অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে উক্ত তিনটি জিনিসই অনুগামী বস্তু, অর্থাৎ রাস্তা ঘর এবং কামরার জন্য অনুবর্তী (تَابِع), আর পানির হিসসা এবং পানির নালা জমির জন্য অনুবর্তী। কেননা, রাস্তা ছাড়া শুধু ঘর বা কামরা দ্বারা, এরূপভাবে পানি বা পানির নালা ব্যতীত জমি দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনুবর্তী বস্তু অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করার কারণে তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلْإِنْتِفَاعِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে ইজারা বা ভাড়ায় গ্রহণের ক্ষেত্রে এর বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বাড়ির একটি কামরা বা একটি ঘর (مَنْزِل) ভাড়ায় গ্রহণ করে, তাহলে পূর্বোক্ত কোনো শর্ত উল্লেখ করা ছাড়াই ভাড়ায় গ্রহণকারী রাস্তা ব্যবহারের অধিকার লাভ করবে। তদ্রূপ কেউ জমি ভাড়া নিলে সে কোনো শর্ত উল্লেখ ছাড়াই পানির হিসসা এবং পানির নালা ব্যবহার করার অধিকার লাভ করবে। এক্ষেত্রে অনুগামী বস্তু (تَوَابِع) অন্তর্ভুক্তকারী কোনো শর্ত উল্লেখ করা আবশ্যক হবে না।

ক্রয় এবং ভাড়ায় গ্রহণ করার মাঝে বিধানের এ পার্থক্যের কারণ হলো, ইজারা বা ভাড়ার চুক্তির উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে বস্তুটি থেকে উপকার অর্জন করা। এ কারণেই যে সকল জিনিস দ্বারা এখনই উপকার অর্জন করা সম্ভব নয় সে সকল জিনিস ভাড়ায় নেওয়ার চুক্তি সঠিক হয় না। অতএব, যখন ইজারার উদ্দেশ্যই হচ্ছে উপকার অর্জন করা, আর রাস্তা ব্যতীত ঘর বা কামরা দ্বারা এবং পানি ও পানির নালা ব্যতীত জমি দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়; [আর সাধারণত ভাড়ায় গ্রহণকারী রাস্তা বা পানির নালা আলাদাভাবে ক্রয় করে না কিংবা আলাদাভাবে ভাড়াও নেয় না] তাই ইজারার মাধ্যমে উপকার অর্জন করার জন্য ঘর ও কামরার ইজারার ক্ষেত্রে রাস্তা এবং জমি ইজারার ক্ষেত্রে পানির হিসসা এবং পানির নালা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাস্তা, পানির হিসসা ও পানির নালা অন্তর্ভুক্ত হওয়া ছাড়াও ক্রেতার উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে কেননা, ক্রেতা সাধারণত রাস্তা বা পানির নালা আলাদাভাবে ক্রয় করে আবার কখনো সে কেবল অন্যের কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যেই ক্রয় করে। কাজেই রাস্তা, পানির হিসসা এবং পানির নালা অন্তর্ভুক্ত না হলেও তার ক্রয়ের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। সুতরাং কোনো শর্ত উল্লেখ না করলে এগুলো তার ক্রয়কৃত জিনিসটির অন্তর্ভুক্ত হবে না।

بَابُ الْاِسْتِحْقَاقِ

وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بِبَيِّنَةٍ فَاِنَّهُ يَاْخُذُهَا وَ وَلَدَهَا، وَاِنْ اَقَرَّ بِهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَتْبَعْهَا وَلَدُهَا، وَ وَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فَاِنَّهَا كَاِسْمِهَا مُبَيِّنَةٌ، فَيَظْهَرُ بِهَا مِلْكُهُ مِنَ الْاَصْلِ، وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلاً بِهَا، فَيَكُوْنَ لَهُ اَمَّا الْاِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِى الْمُخْبَرِ بِهِ ضَرُوْرَةَ صِحَّةِ الْاِخْبَارِ، وَقَدْ اِنْدَفَعَتْ بِاِثْبَاتِهِ بَعْدَ الْاِنْفِصَالِ، فَلَا يَكُوْنُ الْوَلَدُ لَهُ، ثُمَّ قِيْلَ يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِىْ الْقَضَاءِ بِالْاُمِّ تَبَعًا، وَقِيْلَ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ بِالْوَلَدِ، وَاِلَيْهِ تُشِيْرُ الْمَسَائِلُ، فَاِنَّ الْقَاضِىَ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالزَّوَائِدِ، قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) لَا تَدْخُلُ الزَّوَائِدُ فِى الْحُكْمِ، وَكَذَا الْوَلَدُ اِذَا كَانَ فِىْ يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِالْاُمِّ تَبَعًا .

পরিচ্ছেদ : অধিকার দাবি করা

অনুবাদ : কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে, অতঃপর দাসী তার কাছে থাকাবস্থায় সন্তান প্রসব করে; তারপর কোনো ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে উক্ত দাসীর মালিকানা দাবি করে, তাহলে সে দাসীটি তার সন্তানসহ পাবে। আর যদি ক্রেতা কোনো ব্যক্তির অনুকূলে দাসীটির মালিকানা স্বীকার করে, তাহলে সন্তানটি দাসীর অনুবর্তী হবে না। উভয় সুরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ হলো, بَيِّنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ] হচ্ছে সর্বব্যাপী প্রমাণ। কেননা, بَيِّنَةٌ শব্দের অর্থ প্রকাশকারী। সুতরাং بَيِّنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ] দ্বারা মূল থেকেই দাবিদারের মালিকানা প্রকাশ পাবে। আর সন্তানটি দাসীর সাথে যুক্ত ছিল। কাজেই সেও তার হবে। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি হচ্ছে, সীমিত পরিধির প্রমাণ, যা বর্ণিত জিনিসের মাঝে [স্বীকার করার মুহূর্তে] মালিকানা সাব্যস্ত করে স্বীকারকারীর বর্ণনা সঠিক বলে গ্রহণ করার অপরিহার্য তাগিদে। আর এ অপরিহার্য তাগিদ সন্তান [দাসী থেকে প্রসবের মাধ্যমে] বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মালিকানা সাব্যস্ত করার দ্বারাই পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং সন্তান লোকটির মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অতঃপর কেউ কেউ বলেন, আদালতে মাতার সম্পর্কে রায় হলেই সন্তান মাতার অনুবর্তী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর কারো কারো মতে সন্তান সম্পর্কেও আদালতের রায় আবশ্যক হবে। [মাবসূতে বর্ণিত] মাসআলাসমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, বিচারক যদি মূল থেকে সৃষ্ট অতিরিক্ত জিনিসসমূহ সম্পর্কে না জানে [এবং মূল সম্পর্কে কারো অনুকূলে রায় প্রদান করে] তাহলে সৃষ্ট অতিরিক্ত জিনিসসমূহ রায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তদ্রূপ সন্তান যদি অন্য কারো দখলে থাকে, তাহলে মাতার সম্পর্কে রায় প্রদান করা হলে সন্তান অনুবর্তী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : إِسْتِحْقَاقٌ -এর অর্থ হলো طَلَبُ الْحَقِّ "অধিকার দাবি করা"। এ পরিচ্ছেদে বিক্রয়ের পর বিক্রীত দ্রব্যে অন্য কোনো ব্যক্তির মালিকানা দাবি করা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ পরিচ্ছেদটি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল পরিচ্ছেদ আলোচনা করার পরে উল্লেখ করা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল কেননা, বিক্রীত-দ্রব্যে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাহ্যিকভাবে বিক্রয় সহীহ হওয়ার পর তা আবার সহীহ না হওয়ার প্রকাশ পাওয়া। কাজেই তা বাহ্যিকভাবে সহীহ হওয়ার সকল সুরত বর্ণিত হওয়ার পরেই উল্লেখ করা অধিক যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু যেহেতু এর পূর্বের পরিচ্ছেদ بَابُ الْحُقُوقِ-এর সাথে এ পরিচ্ছেদের শব্দের দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে, তাই মুসান্নিফ (র.) এ পরিচ্ছেদকে بَابُ الْحُقُوقِ -এর পরে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ الخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করে আর ক্রয়ের পরে সে ক্রেতার নিকট কোনো সন্তান প্রসব করে, তারপর অন্য কোনো ব্যক্তি এসে দাসীটির মালিকানা দাবি করে, তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি মালিকানার দাবিদার ব্যক্তি সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার দাবি সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে সে দাসীটির সাথে তার সন্তানটিরও অধিকারী হবে। আর যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ না করে থাকে; বরং কেবল ক্রেতা এই বলে স্বীকারোক্তি করে যে, হ্যাঁ, দাসীটির প্রকৃত মালিক সে, তাহলে মালিকানার দাবিদার ব্যক্তি কেবল দাসীটির অধিকারী হবে; তার সন্তানটির অধিকারী হবে না।

قَوْلُهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ اَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ الخ : সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং শুধু স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিধানগত এ পার্থক্যের কারণ হলো, সাক্ষ্য-প্রমাণ হচ্ছে একটি সর্বব্যাপী দলিল, অর্থাৎ এটি কেবল যার বিপক্ষে ফয়সালা হয় তার উপরই কার্যকরী হয় না; বরং সংশ্লিষ্ট সকলের উপর কার্যকরী হয়। কেননা, بَيِّنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ]-এর শব্দের অর্থ যেমন প্রকাশকারী তেমনি কার্যত এটি পূর্ব থেকে বিদ্যমান থাকা বিষয়কে প্রকাশ করে। কারণ, সাক্ষীগণ যখন সাক্ষ্য প্রদান করে তখন এরূপ হওয়া সম্ভব নয় যে, তারা তাদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক মালিকানা সাব্যস্ত করছে ; বরং এরূপ হবে যে, পূর্বে যে মালিকানা ছিল তা প্রকাশ করছে। [এ কারণেই যদি কোনো একটি বস্তু একজনের কাছ থেকে কেউ ক্রয় করে তারপর সে আবার আরেকজনের নিকট বিক্রি করে এবং এভাবে কয়েকজন পর্যন্ত বস্তুটি বিক্রি হয়, অতঃপর সর্বশেষ ক্রেতার বিপক্ষে বিচারক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফয়সালা করে যে, প্রথম বিক্রেতা বস্তুটির মালিক ছিল না বরং অন্য এক ব্যক্তি বস্তুটির মালিক, তাহলে সর্বশেষ ক্রেতা যেরূপ তার কাছে বিক্রয়কারীর নিকট হতে মূল্য ফেরত নিবে তদ্রূপ তার পূর্বের ক্রেতাগণও নিজ নিজ বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি এ ফয়সালা সর্বশেষ ক্রেতার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ক্রেতা তার নিকট বিক্রয়কারীর কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না।] সারকথা হচ্ছে- যেহেতু بَيِّنَةٌ [সাক্ষ্য-প্রমাণ] দাবিকৃত জিনিসের উপর পূর্ব থেকে বিদ্যমান মালিকানা সাব্যস্ত বা প্রকাশ করে, আর পূর্বে সন্তানটি দাসীটির সাথে [তার গর্ভে] সম্পৃক্ত ছিল সেহেতু সন্তানটিও দাবিদার ব্যক্তির সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, গর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় যদি দাসীর মালিকানা কারো পক্ষে সাব্যস্ত হয় তাহলে সন্তানটিও তার বলে সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ اَمَّا الْاِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ الخ : পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি (اِقْرَارٌ) হচ্ছে সীমিত পরিধির দলিল। অর্থাৎ এর কার্যকারিতা কেবল স্বীকারকারীর উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যদের উপর তা কার্যকরী হয় না। কেননা, কোনো ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে [সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া] শুধু তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কারো বিপক্ষে কোনো ফয়সালা কার্যকর করবে বা চাপিয়ে দিবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কেবল স্বীকারকারী ব্যক্তির কথা সঠিক সাব্যস্ত করার প্রয়োজনের তাকিদে স্বীকারকৃত জিনিসের মাঝে অন্যের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। আর তার কথা সঠিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মালিকানা ছিল বলে ফয়সালার আবশ্যকতা নেই; বরং বর্তমানে দাবিদার ব্যক্তি দাসীটির মালিক এতটুকু সাব্যস্ত করলেই স্বীকারকারীর

স্বীকারোক্তি সঠিক সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর বর্তমানে যেহেতু সন্তানটি দাসীটি থেকে পৃথক, তাই দাসীর উপর দাবিদারের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা সন্তানটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ قِيلَ يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِى الْقَضَاءِ بِالْأُمِّ تَبَعًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথম সুরতে অর্থাৎ দাবিদার ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দাসীটির মালিকানা সাব্যস্ত করে, তাহলে দাবিদার ব্যক্তি সন্তানটির হকদার হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি সন্তানটি সম্পর্কে বিচারকের ফয়সালায় উল্লেখ থাকতে হবে নাকি কেবল মাতা সম্পর্কে ফয়সালা হলেই দাবিদার সন্তানটি নিতে পারবে ? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের দুটি অভিমত রয়েছে। কারো কারো মতে সন্তান সম্পর্কে বিচারকের ফয়সালায় উল্লেখের আবশ্যকতা নেই; বরং মাতা সম্পর্কে রায় হলেই দাবিদার সন্তানসহ গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার মাতার উপর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারাই সন্তানের উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে, কাজেই রায়ের ক্ষেত্রেও মাতা সম্পর্কে রায়ের মাধ্যমেই সন্তানের ব্যাপারে রায় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর কারো কারো মতে সন্তানের ব্যাপারে বিচারকের ফয়সালা আবশ্যক হবে। বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত দাবিদার সন্তান নিতে পারবে না। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ মতটিই হানাফী মাযহাবের সঠিক অভিমত।

قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ تُشِيْرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِىَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলা দ্বারা দ্বিতীয় মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি বিচারক زَوَائِدْ [মূল জিনিস থেকে সৃষ্ট জিনিসসমূহ যেমন– গরুর বাচ্চা, দাসীর সন্তান ইত্যাদি] সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে এবং মূল জিনিসটি সম্পর্কে কারো পক্ষে ফয়সালা করে, তাহলে زَوَائِدْ [সৃষ্ট জিনিসসমূহ] ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ যার পক্ষে ফয়সালা হয়েছে সে এগুলোর অধিকারী হবে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, زوائد [সৃষ্ট জিনিসসমূহ] সম্পর্কে স্পষ্ট বা পৃথক ফয়সালা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِىْ يَدِ غَيْرِهِ الخ : এরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, যদি সন্তান কোনো অনুপস্থিত (غَائِبْ) ব্যক্তির হাতে থাকে আর মাতা [দাসী] উপস্থিত ব্যক্তির হাতে থাকে, আর এমতাবস্থায় যদি বিচারক মাতা সম্পর্কে কারো পক্ষে ফয়সালা করে, তাহলে সন্তান মাতার অনুবর্তী (تَابِعْ) হিসেবে ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য, যদিও অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে তার অনুপস্থিতিতে ফয়সালা কার্যকর হয় না, কিন্তু অনুপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষের ফয়সালাটি যদি উপস্থিত ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়সালার ضِمْن -এ [অনুগামী হিসেবে] হয়, তাহলে কার্যকর হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে যেহেতু সন্তানটি তার মাতার ফয়সালার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, তাই বুঝা গেল যে, আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও সন্তানটি তার মাতার ফয়সালায় অন্তর্ভুক্ত হবে না; তার জন্য বিচারকের স্পষ্ট ফয়সালা আবশ্যক হবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاِذَا هُوَ حُرٌّ، وَقَدْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِىْ : اِشْتَرِنِىْ، فَاِنِّىْ عَبْدٌ لَهٗ، فَاِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا اَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوْفَةً لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْئٌ، وَاِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَدْرِىْ اَيْنَ هُوَ رَجَعَ الْمُشْتَرِىْ عَلَى الْعَبْدِ، وَ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ، وَاِنْ ارْتَهَنَ عَبْدًا مُقِرًّا بِالْعُبُوْدِيَّةِ فَوَجَدَهٗ حُرًّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ، وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اَنَّهٗ لَا يَرْجِعُ فِيْهِمَا، لِاَنَّ الرُّجُوْعَ بِالْمُعَاوَضَةِ اَوْ بِالْكَفَالَةِ، وَالْمَوْجُوْدُ لَيْسَ اِلَّا الْاَخْبَارُ كَاذِبًا، فَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ الْاَجْنَبِىُّ ذٰلِكَ اَوْ قَالَ الْعَبْدُ اِرْتَهِنِّىْ فَاِنِّىْ عَبْدٌ، وَهِىَ الْمَسْاَلَةُ الثَّانِيَةُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে, অতঃপর দেখা গেল যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি; অথচ গোলাম ক্রেতাকে বলেছিল যে, আপনি আমাকে ক্রয় করুন, আমি তার গোলাম, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি উপস্থিত থাকে কিংবা জ্ঞাত স্থানে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উক্ত গোলামের উপর কোনো জারিমানা আরোপিত হবে না। আর যদি বিক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকে তাহলে ক্রেতা উক্ত গোলামের নিকট হতে মূল্য ফেরত নেবে, আর গোলাম সে মূল্য বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত নেবে। আর নিজে দাস বলে স্বীকারকারী কোনো গোলামকে কেউ যদি বন্ধকরূপে গ্রহণ করে, আর পরে দেখে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি, তাহলে কোনো সুরতেই সে গোলাম [স্বীকারকারী ব্যক্তি]-এর কাছ থেকে অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, ক্রয় এবং বন্ধক গ্রহণ এ উভয়ের কোনো সুরতেই সে গোলামের নিকট হতে অর্থ ফেরত পাবে না। কেননা, মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ হয় কেবল পারস্পরিক বিনিময় গ্রহণ কিংবা দায়ভার গ্রহণের ক্ষেত্রে। আর এখানে আছে শুধু মিথ্যা সংবাদ প্রদান। কাজেই [প্রথম মাসআলার] বিষয়টি যেন এমন হলো যে, কোনো তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত কথা বলল কিংবা 'গোলাম' বলল যে, আমি গোলাম, আমাকে বন্ধকরূপে গ্রহণ করুন, আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় মাসআলা [যেখানে সকলের মতেই গোলামের নিকট হতে মূল্য ফেরত নিতে পারবে না]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا الخ : উপরিউক্ত ইবারতে দুটি মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল [যে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি] ক্রয়কালে [কথিত] গোলামটি ক্রেতাকে বলল যে, আপনি আমাকে ক্রয় করুন, আমি গোলাম। পরবর্তীতে [সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে] জানা গেল যে, ক্রয়কৃত ব্যক্তি গোলাম নয়; বরং সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা নিকটেই অবস্থানরত থাকে কিংবা দূরে এমন স্থানে অবস্থানরত থাকে যার ঠিকানা জানা আছে, তাহলে ক্রয়কৃত ব্যক্তিটির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হবে না; বরং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার পরিশোধকৃত মূল্য ফেরত নিবে। আর যদি বিক্রেতা এমন স্থানে অবস্থানরত থাকে যার ঠিকানা জানা নেই, তাহলে ক্রেতা [গোলাম হিসেবে] ক্রয়কৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পরিশোধকৃত মূল্য আদায় করে নিবে। আর সে ব্যক্তি বিক্রেতাকে খুঁজে তার থেকে সমপরিমাণ মূল্য ফেরত নিবে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণের বিনিময়ে একটি গোলাম [যে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি] বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করল, আর বন্ধক হিসেবে গ্রহণকালে [কথিত] গোলামটি বলল, আমাকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করুন, আমি একজন গোলাম। পরবর্তীতে [সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে] জানা গেল যে, বন্ধককৃত ব্যক্তি গোলাম নয়; বরং সে একজন স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, কোনো অবস্থায়ই বন্ধকগ্রহণকারী বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিটির কাছ থেকে কোনো জরিমানা আদায় করতে পারবে না। চাই বন্ধকদাতা নিকটেই অবস্থানকারী হোক কিংবা অজ্ঞাত স্থানে অবস্থানকারী হোক।

قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِمَا : মাসআলা দুটিতে উপরে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত জাহির রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ)। অর্থাৎ জাহির রেওয়ায়েত অনুসারে তিন ইমামের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। পক্ষান্তরে জাহিরী রেওয়ায়েত ব্যতীত ভিন্ন একটি বর্ণনা অনুসারে উপরিউক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতে দ্বিতীয় মাসআলার ন্যায় প্রথম মাসআলায়ও ক্রেতা [গোলাম হিসেবে] ক্রয়কৃত ব্যক্তির নিকট হতে কোনো অবস্থায় পরিশোধকৃত মূল্য আদায় করতে পারবে না। অর্থাৎ তাঁর মতে বন্ধক গ্রহণ এবং ক্রয় উভয় ক্ষেত্রে একই বিধান।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالْمُعَاوَضَةِ أَوْ بِالْكَفَالَةِ الخ : এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, মূল্য ফেরত গ্রহণ করার অধিকার সাব্যস্ত হতে পারে দুটি কারণে−

১. বিনিময়চুক্তির কারণে।

২. জিম্মাদার হওয়া বা দায়ভার গ্রহণ করার কারণে। আর উপরিউক্ত প্রথম মাসআলা তথা ক্রয়ের মাসআলায় ক্রয়কৃত [কথিত] গোলাম ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে এ দুটি কারণের কোনোটিই পাওয়া যায়নি। 'বিনিময়চুক্তি' পাওয়া যায়নি তার কারণ হচ্ছে সে ক্রেতার সাথে চুক্তিটি করেনি এবং কোনো কিছু গ্রহণও করেনি। আর 'দায়ভার গ্রহণ' পাওয়া যায়নি, তার কারণ হচ্ছে সে ক্রেতার নিকট এ মর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করেনি যে, ক্রয়কৃত জিনিস সঠিক না হলে সে মূল্য ফেরত দিবে; বরং ক্রয়কৃত ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে কেবল মিথ্যা বক্তব্য পাওয়া গেছে। সুতরাং যেহেতু তার পক্ষ থেকে বিনিময়চুক্তি বা দায়ভার গ্রহণ এ দুটির কোনোটিই পাওয়া যায়নি সেহেতু তার নিকট হতে মূল্য ফেরত গ্রহণ করার অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْأَجْنَبِيُّ ذٰلِكَ أَوْ قَالَ الْعَبْدُ ارْتَهِنِّي الخ : ইমাম ইউসুফ (র.)-এর পক্ষ থেকে কিয়াস হিসেবে দুটি মাসআলা পেশ করা হয়−

১. আলোচ্য ক্রয়ের মাসআলাটিতে যদি ক্রয়কৃত ব্যক্তিটি উক্ত কথা না বলত বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি ক্রেতাকে বলত যে, "আপনি একে ক্রয় করুন, এ একজন গোলাম।" তাহলে সকলের মতেই উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির মিথ্যা বক্তব্যের কারণে তার উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হতো না। কাজেই ক্রয়কৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তির মিথ্যা কথার কারণেও তার উপর জরিমানা সাব্যস্ত হবে না।

২. উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় মাসআলাটি তথা বন্ধক গ্রহণ করার মাসআলা। অর্থাৎ বন্ধক গ্রহণ করার সুরতে যেমন সকলের ঐকমত্যে বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তির মিথ্যা বক্তব্যের কারণে তার উপর জরিমানা সাব্যস্ত হয় না, তদ্রূপ প্রথম সুরত তথা ক্রয় করার মাসআলায়ও তার উপর জরিমানা বা মূল্য ফেরত দেওয়ার বিধান সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ তিনটি মাসআলায়ই উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেবল মিথ্যা বক্তব্য পাওয়া গেছে, কাজেই তিন মাসআলার বিধানও একই হবে।

وَلَهُمَا اَنَّ الْمُشْتَرِىَ شَرَعَ فِى الشِّرَاءِ مُعْتَمِدًا عَلٰى اَمْرِهٖ وَاِقْرَارِهٖ اَنِّىْ عَبْدٌ، اِذِ الْقَوْلُ لَهٗ فِى الْحُرِّيَّةِ، فَيُجْعَلُ الْعَبْدُ بِالْاَمْرِ بِالشِّرَاءِ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ لَهٗ عِنْدَ تَعَذُّرِ رُجُوْعِهٖ عَلَى الْبَائِعِ دَفْعًا لِلْغُرُوْرِ وَالضَّرَرِ، وَلَا تَعَذُّرَ اِلَّا فِيْمَا لَا يُعْرَفُ مَكَانُهٗ، وَالْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَاَمْكَنَ اَنْ يُجْعَلَ الْاَمْرُ بِهٖ ضَامِنًا لِلسَّلَامَةِ كَمَا هُوَ مُوْجَبُهٗ بِخِلَافِ الرَّهْنِ لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ وَثِيْقَةٌ لِاِسْتِيْفَاءِ عَيْنِ حَقِّهٖ حَتّٰى يَجُوْزَ الرَّهْنُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ، وَالْمُسْلَمُ فِيْهِ مَعَ حُرْمَةِ الْاِسْتِبْدَالِ، فَلَا يُجْعَلُ الْاَمْرُ بِهٖ ضَمَانًا لِلسَّلَامَةِ، وَبِخِلَافِ الْاَجْنَبِىِّ، لِاَنَّهٗ لَا يُعْبَاُ بِقَوْلِهٖ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْغُرُوْرُ، وَنَظِيْرُ مَسْاَلَتِنَا قَوْلُ الْمَوْلٰى : بَايِعُوْا عَبْدِىْ هٰذَا، فَاِنِّىْ قَدْ اَذِنْتُ لَهٗ، ثُمَّ ظَهَرَ الْاِسْتِحْقَاقُ يَرْجِعُوْنَ عَلَيْهِ بِقِيْمَتِهٖ ـ

অনুবাদ : আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, ক্রেতা গোলামের নির্দেশ এবং তার "আমি গোলাম" এ স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করেই ক্রয় করতে উদ্যোগী হয়েছে। কেননা, স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য ফেরত নেওয়া সম্ভব না হওয়ার সুরতে ক্রয় করতে নির্দেশ দেওয়ার কারণে [কথিত] গোলামকেই মূল্যের জামিন বলে সাব্যস্ত করা হবে, যাতে ধোঁকা ও ক্ষতির প্রতিকার হয়ে যায়। আর বিক্রেতার অবস্থানস্থল অজ্ঞাত থাকার সুরত ব্যতীত [অন্য সুরতে বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া] অসম্ভব নয়। আর ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে পারস্পরিক বিনিময়চুক্তি। সুতরাং ক্রয়ের আদেশদাতাকে বিক্রয়-দ্রব্যের সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণকারী সাব্যস্ত করা হবে, আর বিক্রয়-দ্রব্য সঠিক হওয়া হচ্ছে বিক্রয়চুক্তির দাবি। পক্ষান্তরে বন্ধক-চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা পারস্পরিক বিনিময়চুক্তি নয়; বরং তা হচ্ছে বন্ধকগ্রহণকারীর মূল প্রাপ্য উসুল করার নিশ্চয়তার একটি মাধ্যম। এ কারণেই 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে বিনিময় দ্রব্যের বিপরীতে এবং 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' তথা দাদনকৃত দ্রব্যের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েজ। অথচ এ দুটি ক্ষেত্রে মূল প্রাপ্যের পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ করা হারাম। সুতরাং বন্ধক গ্রহণের আদেশকে বন্ধকী বস্তুটি সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। অনুরূপভাবে তৃতীয় ব্যক্তির আদেশ বা বক্তব্যের বিষয়টিও ভিন্ন। [গোলাম বা স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে] তার কথা ধর্তব্যই নয়। কাজেই [তার কথার কারণে] ধোঁকা সাব্যস্ত হবে না। আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির নজির এই যে, মনিব [বাজারে] ঘোষণা করে দিল যে, তোমরা আমার এ গোলামের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করতে পার। কেননা, আমি তাকে [ব্যবসা করার] অনুমতি দিয়েছি। অতঃপর গোলামটির অধিকার প্রকাশ পেল [অর্থাৎ দেখা গেল যে, সে গোলাম নয়; বরং স্বাধীন ব্যক্তি]। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ীগণ উক্ত কথিত গোলামের বাজারমূল্য ফেরত নিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُمَا اَنَّ الْمُشْتَرِىْ شَرَعَ فِى الشِّرَاءِ الخ : আর জাহির রেওয়ায়েত ব্যতীত ভিন্ন রেওয়ায়েতটি অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, প্রথম মাসআলায় ক্রেতা ক্রয় করতে উদ্যোগী হয়েছে [কথিত] গোলামটির "আমাকে ক্রয় করুন" এ নির্দেশ এবং "আমি গোলাম" তার স্বীকারোক্তির উপর ভরসা করে। কেননা, গোলাম হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য। কাজেই উক্ত ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ক্রয়কৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছে। আর যে সকল বিনিময়চুক্তিতে বিনিময়-দ্রব্য সঠিক থাকা চুক্তির দাবি সে সকল চুক্তিতে প্রতারণা করা প্রতারকের জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হয়। আর বিক্রয় হচ্ছে এরূপ একটি বিনিময়চুক্তি। কাজেই বিক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা সম্ভব না হওয়ার সুরতে ক্রয়কৃত ব্যক্তিকেই মূল্য ফেরত দেওয়ার জন্য জামিন বা জিম্মাদার সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকেও ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয়েছে। অবশ্য বিক্রেতার অবস্থানের ঠিকানা জানা থাকার সুরতে যেহেতু বিক্রেতার কাছ থেকেই জরিমানা আদায় করা সম্ভব, তাই এ সুরতে ক্রয়কৃত ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে না।

قَوْلُهُ وَالْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَاَمْكَنَ اَنْ يُجْعَلَ الْاٰمِرُ بِهٖ ضَامِنًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। প্রথমে বন্ধকের মাসআলার সাথে কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, ক্রয়ের মাসআলা এবং বন্ধক রাখার মাসআলা এক নয়; উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই বন্ধকের মাসআলার সাথে ক্রয়ের মাসআলাটির কিয়াস সঠিক হবে না। পার্থক্য হলো এই যে, ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে একটি বিনিময়চুক্তি এবং এ চুক্তির দাবি হচ্ছে উভয় দিকের বিনিময়-দ্রব্য সঠিক থাকা। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিনিময়চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত ব্যক্তির নির্দেশটি বিক্রেয়-দ্রব্য সঠিক হওয়ার দায়ভার গ্রহণ বলে বিবেচিত হবে। তাই বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় সম্ভব না হওয়ার সুরতে তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে।

পক্ষান্তরে বন্ধক রাখা ও গ্রহণ করা কোনো বিনিময়চুক্তি নয়। কেননা, প্রাপ্য ঋণের বিনিময় হিসেবে বন্ধক গ্রহণ করা হয় না; বরং প্রাপ্য ঋণ উসুল করার নিশ্চয়তার জন্য বন্ধক গ্রহণ করা হয়। এ কারণেই [অর্থাৎ বন্ধক যে বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা হয় না, এ কারণেই] 'বায় সরফ' [মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয়] -এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের মুদ্রা হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে বন্ধক গ্রহণ করা জায়েজ। এরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত দ্রব্য] হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে কোনো কিছু বন্ধক রাখা জায়েজ। অথচ যদি বন্ধক নেওয়া বস্তুটি এ দুটি সুরতে বিনিময় হিসেবে গণ্য হতো, তাহলে জায়েজ হতো না। কেননা, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দিকের মুদ্রা হস্তগত করার পূর্বে তার স্থলে বিনিময় হিসেবে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত দ্রব্য] হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

মোটকথা, বন্ধক গ্রহণ কোনো বিনিময়চুক্তি নয়। কাজেই তাতে প্রতারণা জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত ব্যক্তির "আমাকে বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করুন" এ নির্দেশটি বন্ধককৃত জিনিসটি সঠিক থাকার দায়ভার গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। বিনিময়চুক্তি না হলে যে প্রতারণা জরিমানার কারণ হয় না, এ কারণে কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে রাস্তা নিরাপদ কিনা জিজ্ঞাসা করে আর সে উত্তরে বলে যে, আপনি এ রাস্তা দিয়ে যান এটি নিরাপদ। অতঃপর সে ঐ রাস্তা দিয়ে যায় এবং ডাকাতদের কবলে পড়ে, তাহলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটি কোনো বিনিময়চুক্তি ছিল না। এরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, এ খাবার আপনি খেয়ে নিন এতে বিষ নেই। অতঃপর

তা খেয়ে লোকটি মারা যায়, তাহলে নির্দেশদাতার উপর কিসাস সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এটি বিনিময়চুক্তি নয়। কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্রয়ের মাসআলা এবং বন্ধকের মাসআলা এক নয়। কাজেই কিয়াস সঠিক হয়নি।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ. لِأَنَّهُ لَا يُعْبَأُ بِقَوْلِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর কিয়াস হিসেবে উল্লিখিত প্রথম মাসআলার জবাব দিচ্ছেন। তাঁর কিয়াস ছিল যে, ক্রয়ের মাসআলায় যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ক্রেতাকে বলে যে, একে ক্রয় করুন এ একজন গোলাম, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ ক্রয়কৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিও যদি বলে "আমাকে ক্রয় করুন, আমি গোলাম" তাহলে তার উপরও জরিমানা হবে না। জবাবের সারকথা হলো, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির নির্দেশ এবং ক্রয়কৃত ব্যক্তির নির্দেশ ও স্বীকারোক্তির বিষয়টি এক নয়। কেননা, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কথা ধর্তব্য নয়, কারণ বিক্রয়চুক্তির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আর যেহেতু তার কথা ধর্তব্য নয়, সেহেতু তার নির্দেশ ও মিথ্যা বক্তব্যটি প্রতারণা বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে ক্রয়কৃত ব্যক্তিটির কথা ধর্তব্য ছিল। কেননা, গোলাম হওয়া বা স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য। সুতরাং কিয়াস সঠিক হয়নি।

قَوْلُهُ وَنَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا قَوْلُ الْمَوْلٰى : بَايِعُوْا عَبْدِيْ هٰذَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের আলোচ্য মাসআলাটির একটি নজির হচ্ছে এই মাসআলা যে, কোনো মনিব বাজারে ঘোষণা করে দিল যে, আমার এ গোলামটির সাথে আপনারা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। কেননা, আমি তাকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছি। অতঃপর লোকজন গোলামটির সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছে এবং গোলামটির নিকট লোকজনের পাওনা রয়েছে এমতাবস্থায় [সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা] প্রমাণিত হলো যে, সে প্রকৃতপক্ষে গোলাম নয়, বরং স্বাধীন ব্যক্তি। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, পাওনাদারগণ উক্ত ঘোষণাকারী মনিবের নিকট হতে তাদের পাওনা আদায় করে নিবে, তবে এই পাওনার পরিমাণ যদি কথিত গোলামটি প্রকৃতপক্ষে গোলাম হলে যা মূল্য হতো তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ঘোষণাকারী মনিব শুধু তার মূল্য সমপরিমাণ পাওনা পরিশোধ করবে; অবশিষ্ট পাওনার জিম্মাদার মনিব হবে না।

এ ক্ষেত্রে [কথিত] মনিবের উপর জরিমানা সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, লোকজন তার ঘোষণার কারণে প্রতারিত হয়েছে। কেননা, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার পর যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত হয় তখন হয় মনিব তা পরিশোধ করবে নতুবা গোলামকে বিক্রয় করে তা পরিশোধ করা হয়। অতএব, এভাবে পরিশোধ হবে এই ভরসা করে উক্ত [কথিত] গোলামটির সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছে। আর এ ক্ষেত্রে ঘোষণাকারী মনিব তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নয়। কেননা, গোলামের ক্ষেত্রে তার মনিবের ঘোষণা ধর্তব্য হয়।

ثُمَّ فِيْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ضَرْبُ إِشْكَالٍ عَلَى قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ)، لِأَنَّ الدَّعْوٰى شَرْطٌ فِيْ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدَّعْوٰى، وَقِيْلَ إِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِيْ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ فَالدَّعْوٰى فِيْهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ لِتَضَمُّنِهٖ تَحْرِيْمَ فَرْجِ الْأُمِّ، وَقِيْلَ هُوَ شَرْطٌ لٰكِنَّ التَّنَاقُضَ غَيْرُ مَانِعٍ لِخَفَاءِ الْعُلُوْقِ، وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي الْإِعْتَاقِ فَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ لِإِسْتِبْدَادِ الْمَوْلٰى بِهٖ، فَصَارَ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ قَبْلَ الْخُلْعِ، وَالْمُكَاتَبِ يُقِيْمُهَا عَلَى الْإِعْتَاقِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ.

অনুবাদ : তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ['মতন'-এর মূল আলোচ্য] মাসআলাটির সুরত গঠনে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। কেননা, তাঁর মতে গোলামের 'স্বাধীন ব্যক্তি' বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। আর বক্তব্যের মাঝে স্ববিরোধিতা দাবিকে নষ্ট করে দেয়। [উক্ত জটিলতা নিরসনে] কেউ কেউ বলেছেন, যদি মাসআলাটির সুরত গঠন জন্মগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [গোলামের পক্ষ থেকে] দাবি উত্থাপন শর্ত নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তির জন্মগত স্বাধীন হওয়া তার মাতার লজ্জাস্থান হারাম হওয়ার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এ ক্ষেত্রেও গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন শর্ত, তবে তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতা [তার দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে] প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, গর্ভ সঞ্চারের বিষয়টি গোপনীয় বিষয়। আর যদি মাসআলাটির সুরত গঠন আজাদ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে বক্তব্যের স্ববিরোধিতা [দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে] প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, আজাদ করার ক্ষেত্রে মনিব একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী [তাই হতে পারে যে, আজাদ করার বিষয়টি গোলাম আগে জানত না]। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোলাম এমন খুলাপ্রাপ্ত [অর্থের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে তালাক গ্রহণকারিণী] স্ত্রীর মতোই হলো, যে খুলা -এর পূর্বে স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল বলে সাক্ষ্য পেশ করেছে। আর ঐ 'মুকাতাব'-এর মতো হলো, যে 'কিতাবাত'-এর চুক্তির পূর্বে তার মনিব তাকে আজাদ করেছিল বলে সাক্ষ্য পেশ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ فِيْ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ضَرْبُ إِشْكَالٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে কথিত গোলামকে ক্রয় করা এবং বন্ধক রাখা সংক্রান্ত মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে মাসআলাটির সুরত [বাস্তবায়িত] হওয়ার ক্ষেত্রে 'জটিলতা' রয়েছে। জটিলতাটি বুঝার পূর্বে দুটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো গোলাম আজাদ বলে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। অর্থাৎ সে যদি প্রথমে দাবি উত্থাপন করে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি, তাহলে তার দাবির পক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে দাবি উত্থাপন না করে; বরং সাক্ষীগণ স্বেচ্ছায় তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়।

২. কারো দাবির মাঝে যদি স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) পাওয়া যায়, তাহলে তার দাবি বাতিল বলে গণ্য হয়।

এখন উক্ত মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে জটিলতার ব্যাখ্যা হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে উপরে বর্ণিত মাসআলার সুরত হতে পারে না। কেননা, ক্রয়কৃত কিংবা বন্ধককৃত [কথিত গোলাম] ব্যক্তিটি যখন ক্রয়কালে কিংবা বন্ধক গ্রহণকালে বলেছে যে, "আমি গোলাম" তখন পরবর্তীতে তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করতে হবে। আর যখন সে দাবি উত্থাপন করবে, তখন তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাবে। কেননা, সে চুক্তির সময় স্পষ্টভাবে বলেছে যে, সে গোলাম, আর এখন বলছে যে, সে স্বাধীন। আর দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে দাবি বাতিল বলে গণ্য হয়। কাজেই স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার সুযোগ না থাকার কথা। অথচ মাসআলাটির সুরত ছিল এরূপ যে, ক্রয়কৃত ব্যক্তি চুক্তিকালে বলেছে, সে গোলাম আর পরে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সে স্বাধীন ব্যক্তি।

অবশ্য সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে কোনো জটিলতা নেই। কেননা, তাঁদের মতে স্বাধীন সাব্যস্ত হওয়ার জন্য গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়। কাজেই দাবির মাঝে স্ববিরোধিতার প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِىْ حُرِّيَّةِ الْاَصْلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) ফুকাহায়ে কেরামগণ -এর পক্ষ থেকে এ জটিলতার জবাব বর্ণনা করছেন। জবাব হলো, যদি মাসআলাটির সুরত উক্ত ব্যক্তির জন্মগত স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, অর্থাৎ ক্রয়কৃত ব্যক্তি জন্মগত স্বাধীন হওয়া দাবি করে, তাহলে কোনো কোনো ফকীহ এর জবাব এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও দাবি উত্থাপন করা শর্ত নয়; বরং তাঁর মতে দাবি উত্থাপন করা কেবল আজাদ করার মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য শর্ত।

জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন শর্ত না হওয়ার কারণ হলো, যখন কোনো ব্যক্তি জন্মগত স্বাধীন হয় তখন তার মা কারো দাসী হতে পারে না। আর তার মা যদি কারো দাসী না হয়, তাহলে তার লজ্জাস্থান [সতীত্ব] ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে যে তাকে তার দাসী বলে দাবি করবে। আর লজ্জাস্থান হারাম হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর হক [কোনো মানুষের হক নয়]। আর حُقُوقُ اللّٰهِ বা আল্লাহর হক সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন করার প্রয়োজন হয় না; বরং স্বেচ্ছায় সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সুতরাং জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার মাঝে যেহেতু একটি আল্লাহর হক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাই জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্য দাবি উত্থাপন করা শর্ত থাকবে না। আর যখন দাবি উত্থাপন করা শর্ত থাকবে না, তখন ক্রয়কৃত উক্ত ব্যক্তির দাবি উত্থাপন করা ছাড়াই তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হতে পারবে।

আর কোনো কোনো ফিকহবিদ উল্লেখ করেছেন যে, জন্মগত স্বাধীন সাব্যস্ত করার জন্যও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে [কথিত] গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন করা শর্ত। তবে এ ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা দাবিকে বাতিল করবে না। এর কারণ হলো, যে সকল বিষয় সাধারণত সহজে জানা যায় না (كُلُّ مَا كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى الْخَفَاءِ) সে সকল ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়। আর [কথিত] গোলামের জন্মগত স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি এরূপই একটি বিষয়। কেননা, জন্মগত স্বাধীন হওয়া নির্ভর করে গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় তার মা স্বাধীন থাকার উপর। আর গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার বিষয়টি একটি গোপন বিষয়। সুতরাং হতে পারে গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় তার মা স্বাধীন ছিল কিনা তা তার জানা ছিল না, তাই সে নিজেকে গোলাম বলে স্বীকার করেছে, কিন্তু পরে জানতে পেরেছে যে, তার মা গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার সময় স্বাধীন ছিল, তাই সে আবার নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করছে। অতএব, তার দাবির ক্ষেত্রে উক্ত স্ববিরোধিতা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হবে। কাজেই তার দাবি বাতিল হবে না। আর যখন তার দাবি গৃহীত হবে তখন সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব, মাসআলাটিতে গঠনগত জটিলতা থাকল না।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِى الْإِعْتَاقِ الخ : জটিলতা নিরসনে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা ছিল মাসআলাটির গঠন [তথা গোলামটির দাবি] যদি জন্মগত স্বাধীন হওয়া সংক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে। আর যদি মাসআলাটির গঠন [তথা গোলামটির দাবি] আজাদ করার মাধ্যমে স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত জটিলতার নিরসন হলো, সকল ফুকাহায়ে কেরামের মতেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে [কথিত] গোলামের পক্ষ থেকে দাবি উত্থাপন শর্ত। তবে তার দাবির মাঝে উক্ত স্ববিরোধিতা দাবিকে

বাতিল করবে না, বরং তা ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে। কেননা, গোলামকে আজাদ করার ক্ষেত্রে মনিব একচ্ছত্র অধিকার রাখে। সে যখন ইচ্ছা কাউকে না জানিয়ে আজাদ করে দিতে পারে। কাজেই হতে পারে যে, মনিব তাকে পূর্বেই আজাদ করে দিয়েছিল কিন্তু গোলামের তা জানা ছিল না, তাই বিক্রয়ের সময় সে নিজেকে গোলাম বলে স্বীকার করেছে। পরবর্তীতে সে জানতে পারল যে বিক্রয়ের পূর্বে মনিব তাকে আজাদ করে দিয়েছিল, তা-ই আবার সে নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করছে। অতএব, তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হবে এবং দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, যে সকল বিষয় সাধারণত সহজে জানা যায় না (كُلُّ مَا كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى الْخَفَاءِ) সে সকল ক্ষেত্রে দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلٰثِ الخ : মুসান্নিফ (র.) উপরিউক্ত মাসআলার দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। দৃষ্টান্ত দুটি দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) থাকা সত্ত্বেও দাবি গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, বিষয়টি এমন, যা জানা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই স্ববিরোধিতা ক্ষমাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত হলো, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হতে خُلْع গ্রহণ করল [অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি গ্রহণ করল]। এরপর সে দাবি করল যে, خُلْع গ্রহণ করার পূর্বেই স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল এবং সে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে তার দাবি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়। অথচ তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) পাওয়া গেছে। কেননা, তিন তালাক দেওয়ার পর خُلْع করার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কাজেই যখন স্ত্রী خُلْع গ্রহণ করেছে তখন যেন সে এ কথাই স্বীকার করেছে যে, স্বামী তাকে তখন পর্যন্ত তিন তালাক দেয়নি। এ স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) থাকা সত্ত্বেও তার দাবি গ্রহণ করা হয়, তার কারণ হলো, তালাক দেওয়ার বিষয়টি স্বামীর একচ্ছত্র অধিকার। কাজেই হতে পারে যে, স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়েছিল কিন্তু সে তা জানত না, তাই সে خُلْع গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে সে জানতে পেরেছে যে, স্বামী তাকে পূর্বেই তিন তালাক দিয়েছিল। তাই সে দাবি করেছে এবং সাক্ষ্য পেশ করেছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো, কোনো মুকাতাব [মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তিকারী গোলাম] তার মনিবের সাথে 'কিতাবাত' অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে আজাদ হওয়ার চুক্তি করার পর বিচারকের কাছে দাবি উত্থাপন করল যে, মনিব তাকে উক্ত চুক্তি করার পূর্বেই আজাদ করে দিয়েছিল এবং এই মর্মে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার দাবি এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রেও তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, পূর্বেই আজাদ করে দিয়ে থাকলে তার 'কিতাবাত'-এর চুক্তির তো প্রয়োজন ছিল না। এ স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) সত্ত্বেও তার দাবি গৃহীত হওয়ার কারণ হলো, আজাদ করার বিষয়টি মনিবের একচ্ছত্র অধিকার, কাজেই তা গোলামের জানা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে যে, সে চুক্তির সময় আজাদ করার বিষয়টি জানতে পারেনি, কিন্তু পরে সে তা জানতে পেরেছে।

সারকথা 'মতন'-এর আমাদের আলোচ্য মাসআলাটিও ঠিক এ দুটি দৃষ্টান্তের মতোই হলো। কাজেই [কথিত] উক্ত গোলামের দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُضْ) থাকা সত্ত্বেও তার দাবি গৃহীত হবে এবং তার স্বাধীন হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই মাসআলার গঠনগত জটিলতা থাকল না।

قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى حَقًّا فِىْ دَارٍ. مَعْنَاهُ حَقًّا مَجْهُوْلاً فَصَالَحَهُ الَّذِىْ فِىْ يَدِهٖ عَلٰى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّارُ اِلَّا ذِرَاعًا مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ، لِاَنَّ لِلْمُدَّعِىْ اَنْ يَقُوْلَ دَعْوَاىَ فِىْ هٰذَا الْبَاقِىْ وَاِنِ ادَّعَاهَا كُلَّهَا فَصَالَحَهُ عَلٰى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا شَيْءٌ رَجَعَ بِحِسَابِهٖ، لِاَنَّ التَّوْفِيْقَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَوَجَبَ الرُّجُوْعُ بِبَدَلِهٖ عِنْدَ فَوَاتِ سَلَامَةِ الْمُبْدَلِ، وَ دَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلٰى اَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُوْلِ عَلٰى مَعْلُوْمٍ جَائِزٌ، لِاَنَّ الْجَهَالَةَ فِيْمَا يَسْقُطُ لَا تُفْضِىْ اِلَى الْمُنَازَعَةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [অন্যের দখলে থাকা] কোনো বাড়ির অংশ দাবি করে অর্থাৎ কোনো অনির্দিষ্ট অংশ, অতঃপর বাড়িটি যার দখলে রয়েছে সে একশত দিরহামের বিনিময়ে তার সাথে সমঝোতা করে নেয়, তারপর এক হাত পরিমাণ জায়গা ছাড়া সম্পূর্ণ বাড়িটির হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে বিবাদী বাদীর নিকট হতে [সমঝোতার জন্য প্রদত্ত] কোনো অর্থ ফেরত নিতে পারবে না। কেননা, বাদী এ ক্ষেত্রে বলতে পারে যে, আমার দাবি এ অবশিষ্ট [এক হাত পরিমাণ] -এর ক্ষেত্রেই ছিল। আর যদি বাদী পুরো বাড়িটির দাবি করে থাকে আর যার দখলে আছে সে একশত দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করে থাকে, অতঃপর ঐ বাড়ির কোনো অংশের হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে বিবাদী সেই অংশের হিসাব অনুসারে সমঝোতার অর্থ ফেরত আনতে পারবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে [বাদীর দাবির] সঙ্গতি সাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বিনিময়কৃত বস্তু সঠিক না থাকার অবস্থায় বিনিময়রূপে প্রদত্ত বস্তু ফেরত পাওয়া আবশ্যিক বলে সাব্যস্ত হবে। আর আলোচ্য মাসআলাটি একথা প্রমাণ করে যে, অনির্দিষ্ট জিনিসের ব্যাপারে নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে সমঝোতা করা জায়েজ আছে। কেননা, যে বস্তু অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে তাতে অস্পষ্টতা থাকা বিবাদ সৃষ্টি করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ ادَّعٰى حَقًّا فِىْ دَارٍ الخ : মাসআলা হলো, কোনো একটি বাড়ি এক ব্যক্তির দখলে আছে, এমতাবস্থায় অপর এক ব্যক্তি উক্ত বাড়িটির একটি অনির্দিষ্ট অংশ দাবি করল, অর্থাৎ বলল যে, আমি এ বাড়িটির একটি অংশের মালিক। কিন্তু কোন অংশের বা তার পরিমাণ কতটুকু তা নির্দিষ্ট করে বলেনি। অতঃপর যার দখলে বাড়িটি রয়েছে সে দাবিদার ব্যক্তির সাথে একশত রৌপ্যমুদ্রা [বা টাকা]-এর বিনিময়ে আপোষ করে নিল। এরপর যদি এমন হয় যে, অপর এক ব্যক্তি উক্ত বাড়িটির একহাত পরিমাণ জায়গা বাদে সম্পূর্ণ বাড়িটির মালিকানা প্রমাণিত করে তা নিয়ে নিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যার দখলে বাড়িটি ছিল সে প্রথম দাবিদার ব্যক্তিকে যে একশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল তা থেকে কিছুই ফেরত পাবে না। কারণ হলো, প্রথম দাবিদার ব্যক্তি তার দাবিকৃত অংশের পরিমাণ কতটুকু বা তা কোন অংশ তা বলেনি, কাজেই তার এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, যে এক হাত পরিমাণ জায়গা আপনার দখলে এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেই একহাত পরিমাণই আমার দাবি ছিল।

قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَاهَا كُلَّهَا الخ : এখানে পূর্বের মাসআলাটির আরেকটি সুরত বর্ণনা করা হয়েছে। সুরতটি হলো, যদি প্রথম দাবিদার কোনো অনির্দিষ্ট অংশের দাবি না করে; বরং সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবি করে, আর এমতাবস্থায় যার দখলে আছে সে একশত রৌপ্যমুদ্রা [বা টাকা]-এর বিনিময়ে সমঝোতা ও আপোষ করে নেয়, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এসে বাড়িটির কোনো একটি অংশের মালিকানা প্রমাণিত করে তা নিয়ে নেয়, তাহলে বিধান হলো, যার হাতে বাড়িটি রয়েছে সে প্রথম দাবিদার ব্যক্তিকে দেওয়া একশত রৌপ্যমুদ্রা থেকে বাড়ির যতটুকু অংশ অপর এক ব্যক্তি নিয়ে গেছে তার সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত পাবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দাবিদার ব্যক্তি যদি বাড়িটির অর্ধেক নিয়ে থাকে, তাহলে প্রদত্ত একশত রৌপ্যমুদ্রার অর্ধেক ফেরত পাবে। আর এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত পাবে। কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রথম দাবিদার ব্যক্তি যে, সম্পূর্ণ বাড়িটির দাবি করেছিল তা সঠিক ধরে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর যার দখলে বাড়িটি রয়েছে সে একশত রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিল সম্পূর্ণ বাড়িটির বিনিময়ে আপোষ করার জন্য। কাজেই যতটুকু অংশ দ্বিতীয় দাবিদার ব্যক্তি নিয়ে গেছে ততটুকু টাকা বা রৌপ্যমুদ্রা সে ফেরত পাবে। কেননা, مُبْدَلٌ مِنْهُ বা বিনিময়কৃত বস্তু সঠিক না হলে বিনিময় হিসেবে প্রদত্ত বস্তু ফেরত দেওয়া আবশ্যিক হয়।

قَوْلُهُ وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটি থেকে একটি বিষয় বুঝা গেল, তা হচ্ছে–অনির্দিষ্ট কোনো অংশের কেউ দাবি করলে, সেই অনির্দিষ্ট অংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু দিয়ে সমঝোতা ও আপোষ করা জায়েজ আছে। এর কারণ হলো, যে বস্তু অধিকার থেকে বেরিয়ে যাবে তাতে অস্পষ্টতা থাকা বা তা অনির্দিষ্ট হওয়া বিবাদ সৃষ্টি করে না। কাজেই জায়েজ না হওয়ার কারণ বা عِلَّتْ এখানে বিদ্যমান নেই।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, মাসআলাটি থেকে আরেকটি বিষয়ও বুঝা যায়, তা হচ্ছে– সমঝোতা ও আপোষ সহীহ হওয়ার জন্য দাবি সহীহ হওয়া শর্ত নয়। কেননা, উপরিউক্ত মাসআলাটিতে দাবি সহীহ হয়নি, কারণ দাবিকৃত বস্তু অনির্দিষ্ট হলে দাবি সহীহ হয় না। এ কারণে কেউ যদি অনির্দিষ্ট কোনো অংশের দাবি করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দাবি সহীহ না হওয়া সত্ত্বেও সমঝোতা ও আপোষ সহীহ হয়েছে।

فَصْلٌ : فِيْ بَيْعِ الْفُضُوْلِيْ

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهٖ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَنْعَقِدُ، لِاَنَّهٗ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ وَلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ، لِاَنَّهَا بِالْمِلْكِ اَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَقَدْ فَقَدَا، وَلَا اِنْعِقَادَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَلَنَا اَنَّهٗ تَصَرُّفُ تَمْلِيْكٍ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ اَهْلِهٖ فِيْ مَحَلِّهٖ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهٖ، إِذْ لَا ضَرَرَ فِيْهِ لِلْمَالِكِ مَعَ تَخْيِيْرِهٖ، بَلْ فِيْهِ نَفْعُهٗ حَيْثُ يَكْفِيْ مُؤْنَةَ طَلَبِ الْمُشْتَرِيْ وَقَرَارِ الثَّمَنِ وَغَيْرِهٖ، وَفِيْهِ نَفْعُ الْعَاقِدِ لِصَوْنِ كَلَامِهٖ عَنِ الْإِلْغَاءِ، وَفِيْهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِيْ فَثَبَتَتِ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَحْصِيْلًا لِهٰذِهِ الْوُجُوْهِ، كَيْفَ وَإِنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ دَلَالَةً، لِاَنَّ الْعَاقِلَ يَأْذَنُ فِي التَّصَرُّفِ النَّافِعِ -

অনুচ্ছেদ : নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়

অনুবাদ : কেউ যদি অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করে, তাহলে মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রয়কে অনুমোদন করবে, কিংবা ইচ্ছা করলে সে বিক্রয় রহিত করে দিবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি সংঘটিতই হবে না। কেননা, চুক্তিটি শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব থেকে সম্পাদিত হয়নি। শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব অর্জিত হয় মালিকানার দ্বারা কিংবা মালিকের অনুমতির দ্বারা। আর এখানে দুটি বিষয়ই অবিদ্যমান। আর শরিয়তসম্মত ক্ষমতা ছাড়া চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দলিল হলো, বিক্রয় হচ্ছে মালিকানা প্রদানের একটি পদক্ষেপ, আর এ পদক্ষেপ মালিকানা প্রদানের উপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপযুক্ত পাত্রে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং সংঘটিত হয়েছে বলে মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা, মালিকের ইচ্ছাধিকার থাকার কারণে তার কোনো ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না; বরং তাতে তার উপকার সাধিত হচ্ছে। কেননা, সে ক্রেতা সন্ধান করা, মূল্য স্থির করা ও অন্যান্য ব্যাপারের কষ্ট থেকে বেঁচে যাচ্ছে। আর তাতে চুক্তিকারীরও উপকার রয়েছে, কেননা তার কথা বৃথা যাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আর তাতে ক্রেতারও উপকার রয়েছে। সুতরাং এ সকল উপকারগুলো রক্ষা করার জন্য শরিয়তসম্মত ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে। আর কেনইবা [চুক্তিটি সম্পাদিত হবে না]? অথচ পরোক্ষভাবে অনুমতি বিদ্যমান আছে। কেননা, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি উপকারী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েই থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : **فُضُوْلِيْ শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ** : এ শব্দটির শেষের ى অক্ষরটি فُضُوْلٌ -এর সাথে সম্পর্ক (نِسْبَة) বুঝাবার জন্য যুক্ত করা হয়েছে। আর فُضُوْلٌ শব্দটি فَضْلٌ -এর বহুবচন। فَضْلٌ -এর অর্থ হলো– অতিরিক্ত। আল-মুগরিব গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহুবচন তথা فُضُوْلٌ শব্দটি এমন অতিরিক্ত অর্থে সাধারণত ব্যবহৃত হয় যাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর فُضُوْلِيْ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে এমন কাজে লিপ্ত হয় যা তার জন্য অনর্থক (مَنْ يَشْتَغِلُ بِمَا لَا يَعْنِيْهِ) আর ফিকহের পরিভাষায় فُضُوْلِيْ বলা হয়–

১. مَنْ لَيْسَ بِأَصِيْلٍ وَلَا بِوَكِيْلٍ وَلَا بِوَصِيٍّ অর্থাৎ "যে [কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে] মূল ব্যক্তিও নয় কিংবা মূল ব্যক্তির প্রতিনিধি বা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিও নয়।"

২. আর কেউ কেউ বলেছেন– اَلْفُضُوْلِيُّ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيْ حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ شَرْعِيٍّ অর্থাৎ " فُضُوْلِيٌّ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে অন্যের অধিকারভুক্ত জিনিসের [বিষয়ের] মাঝে শরয়ী অনুমতি ব্যতিরেকে কার্য সম্পাদন করে।"

পরিচ্ছেদের সাথে অনুচ্ছেদের সম্পর্ক : পরিচ্ছেদের সাথে এ অনুচ্ছেদের সম্পর্ক স্পষ্ট। কেননা, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয় إِسْتِحْقَاقٌ বা অধিকার দাবিরই একটি সুরত। কারণ, إِسْتِحْقَاقٌ-এর ক্ষেত্রে মালিক এ কথাই দাবি করে যে, বস্তুটির মালিকানা আমার; তোমার কাছে যে জিনিসটি বিক্রয় করেছে সে আমার অনুমতি ছাড়াই বিক্রয় করেছে। আর بَيْعُ الْفُضُوْلِيِّ বা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ الخ :

মাসআলা : কেউ যদি অন্যের মালিকানাভুক্ত কোনো জিনিস মালিকের অনুমতি ছাড়া কারো কাছে বিক্রয় করে, তাহলে আমাদের মতে বিধান হলো, বিক্রয়চুক্তিটি সম্পাদিত হয়ে যাবে তবে তা কার্যকর হওয়া মালিকের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। মালিক ইচ্ছা করলে চুক্তিটি কার্যকর করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে চুক্তিটি রহিত করতে পারবে। ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত এবং এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের অভিমতের অনুরূপ।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত চুক্তিটি সম্পাদিতই হবে না। কাজেই মালিক পরে অনুমতি দিলেও তা কার্যকর হবে না। ইমাম আহমদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এরূপ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে فُضُوْلِيٌّ তথা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির যে কোনো চুক্তি সম্পাদন বাতিল বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিল পেশ করা হয়। মুসান্নিফ (র.) এখানে কেবল তাঁর আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। তাঁর আকলী দলিল হলো, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়চুক্তিটি শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব থেকে সম্পাদিত হয়নি। কেননা, শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব অর্জিত হয় দুভাবে–

১. বস্তুটির মালিক হওয়ার মাধ্যমে।

২. অথবা মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির মাধ্যমে।

আর আলোচ্য মাসআলায় নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيٌّ) ব্যক্তির এ দুটির কোনোটিই ছিল না। আর শরিয়তসম্মত ক্ষমতা অর্জিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে তা সম্পাদিত হয় না। যেমন– উড়ন্ত অবস্থায় কোনো পাখি বিক্রয় করা, পলায়নরত গোলামকে বিক্রয় করা, নাবালেগ ছেলের স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এর কোনোটিই সম্পাদিত হয় না। কেননা, শরিয়তসম্মত ক্ষমতা কিংবা কর্তৃত্ব অর্জিত নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো,

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

অর্থাৎ "নবী করীম ﷺ হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-কে বলেছেন, তোমার নিকট যা নেই তা তুমি বিক্রয় কর না।" এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে তোমার মালিকানায় যা নেই, তা তুমি বিক্রয় কর না। কাজেই এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, নিজের মালিকানাভুক্ত জিনিস ছাড়া অন্যের জিনিস বিক্রয় করা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ تَصَرُّفُ تَمْلِيْكٍ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষ থেকেও আকলী এবং নকলী উভয় প্রকার দলিল রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) শুধু আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের আকলী দলিল হলো, বিক্রয় হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানানোর একটি চুক্তি-কার্য সম্পাদন, আর আলোচ্য মাসআলায় এ কার্যটি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে যার মাঝে এ কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা বিদ্যমান আছে, আর চুক্তি-কার্যটি তার যথাযথ ক্ষেত্রে (مَحَلٌّ) -এ সংঘটিত হয়েছে, কাজেই কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা আবশ্যিক। দলিলটির মাঝে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর ব্যাখ্যা হলো, প্রথম কথা তথা বিক্রয় হচ্ছে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদের মালিক বানানোর একটি কার্য-সম্পাদন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর দ্বিতীয় কথা তথা কার্যটি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে, যার মাঝে এ কার্যসম্পাদনের যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। এর কারণ হলো, চুক্তি-কার্য সম্পাদনের যোগ্য হওয়া নির্ভর করে বালেগ হওয়া ও বিবেকসম্পন্ন হওয়ার উপর। আর আলোচ্য মাসআলায় এ দুটিই নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيٌّ) ব্যক্তির মাঝে রয়েছে। আর তৃতীয় কথা তথা চুক্তি-কার্যটি তার যথাযথ ক্ষেত্র (مَحَلٌّ)-এ সংঘটিত হয়েছে, এর

কারণ হলো, বিক্রয়ের ক্ষেত্র হচ্ছে– এরূপ বস্তু যার মূল্য রয়েছে। আর শেষোক্ত কথা তথা "কাজেই কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা আবশ্যিক"-এর কারণ হলো, যখন চুক্তিকারী যোগ্য হয় এবং চুক্তিটি যথাযথ ক্ষেত্রে সম্পাদিত হয় তখন কোনো প্রতিবন্ধক (مَانِعْ) না থাকলে তা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক হয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক নেই, কেননা, চুক্তিকারীদ্বয় এবং বস্তুটির মালিক– কারোরই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। মালিকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কারণ তার চুক্তি কার্যকর করা বা না করার ইচ্ছাধিকার রয়েছে। বরং এ ক্ষেত্রে তার উপকারই হচ্ছে যেহেতু তাকে ক্রেতা খুঁজতে হচ্ছে না, মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করতে হচ্ছে না। আর নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির ক্ষতি হচ্ছে না, তার কারণ চুক্তিটি সম্পাদিত হলে তার কথাটি বৃথা যাওয়া থেকে রক্ষা পেল। আর ক্রেতার যে ক্ষতি হচ্ছে না তাতো স্পষ্টই। কাজেই যখন কারোরই কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তখন কোনো প্রতিবন্ধক পাওয়া গেল না। অতএব চুক্তিটি [স্থগিত হিসেবে] সম্পাদিত হয়েছে বলে আবশ্যিকরূপে সাব্যস্ত হবে।

আমাদের নকলী দলিল : আমাদের নকলী দলিল হলো, তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত ওরওয়াহ আল-বারিকী (রা.)-এর হাদীস এবং তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস প্রথম হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيْ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا لِاَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدٰهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّيْنَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِكَ .

অর্থাৎ "হযরত ওরওয়াহ আল-বারিকী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরি ক্রয় করার জন্য আমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। স্বর্ণমুদ্রাটি দিয়ে দুটি বকরি ক্রয় করে একটি বকরি পুনরায় একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। অতঃপর একটি বকরি এবং স্বর্ণমুদ্রাটি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা বললাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার কাজ-কারবারে বরকত দান করুন।"

এ হাদীসে সাহাবী প্রথমে বকরি দুটি ক্রয় করার পর তা নবী করীম ﷺ -এর মালিকানাধীন হয়েছিল, অতঃপর মালিকের অনুমতি ছাড়াই সাহাবী তা থেকে একটি বিক্রয় করেছেন এবং নবী করীম ﷺ পরে অনুমতি প্রদান করেছেন।

আর হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-এর হাদীসটিও একই মর্মে তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। [বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল কাদীর, আল-বিনায়া, নাসবুর রায়া।]

قَوْلُهُ كَيْفَ وَاِنَّ الْاِذْنَ ثَابِتٌ دَلَالَةً الخ: মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে– ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বলেছেন, আলোচ্য সুরতে নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব নেই। কেননা, সে বস্তুটির মালিকও নয় এবং মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্তও নয়–এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে অনুমতি বিদ্যমান আছে। কারণ, উক্ত বিক্রয়চুক্তিতে মালিকের উপকার রয়েছে [তার কোনো ক্ষতি নেই]। আর বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের উপকারী জিনিসের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েই থাকে। কাজেই যখন মালিকের পক্ষ থেকে পরোক্ষভাবে অনুমতি রয়েছে তখন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির শরিয়তসম্মত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জিত আছে। সুতরাং তার চুক্তি-কার্যটি [স্থগিতরূপে] সম্পাদিত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিলের উত্তর : তাঁর উল্লেখকৃত হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.)-এর হাদীস– لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ -এর দুটি উত্তর রয়েছে–

১. এখানে বিক্রয় দ্বারা اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ বা পরিপূর্ণ বিক্রয় তথা কার্যকর বিক্রয় (اَلْبَيْعُ النَّافِذُ) উদ্দেশ্য। কেননা, সাধারণ বিক্রয় উল্লেখ করলে [اَلْفَرْدُ الْكَامِلُ হিসেবে] পরিপূর্ণ বিক্রয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর আমাদের আলোচ্য সুরতে বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে না; বরং তা স্থগিত (غَيْرُ النَّافِذِ) হচ্ছে। সুতরাং তা নিষেধের আওতায় পড়বে না।

২. দ্বিতীয় উত্তর হলো, উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, কোনো জিনিস তোমার কাছে না থাকলে তুমি তা বাজার থেকে ক্রয় করে দিবে এ ইচ্ছায় অগ্রিম বিক্রয় কর না। এর প্রমাণ হচ্ছে উক্ত হাদীসে হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) প্রথমে নবী করীম ﷺ -কে বলেছিলেন– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيْنِيْ فَيَطْلُبُ مِنِّيْ سِلْعَةً لَيْسَتْ عِنْدِيْ فَأَبِيْعُهَا مِنْهُ ثُمَّ أَدْخُلُ السُّوْقَ فَاشْتَرِيْهَا فَأُسَلِّمُهَا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

"হে আল্লাহর রাসূল! কোনো ব্যক্তি আমার নিকট এসে একটি দ্রব্য ক্রয় করতে চায় যা আমার কাছে নেই, তখন আমি তার কাছে [অগ্রিম] তা বিক্রয় করি, অতঃপর বাজারে গিয়ে তা ক্রয় করে তাকে হস্তান্তর করি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমার কাছে যা নেই, তা তুমি বিক্রয় কর না।"

قَالَ : وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ بَاقِيًا ، وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا . لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ، فَلَابُدَّ مِنْ قِيَامِهِ، وَ ذٰلِكَ بِقِيَامِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ، وَإِذَا اَجَازَ الْمَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَمْلُوْكًا لَهُ اَمَانَةً فِيْ يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلِلْفُضُوْلِيْ اَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ دَفْعًا لِلْحُقُوْقِ عَنْ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْفُضُوْلِيْ فِي النِّكَاحِ، لِأَنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ. هٰذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ عَرْضًا مُعَيَّنًا اِنَّمَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ، إِذَا كَانَ الْعَرْضُ بَاقِيًا اَيْضًا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মালিকের চুক্তিটি অনুমোদন করার অধিকার থাকবে যদি যে দ্রব্যের উপর চুক্তি হয়েছে তা বিদ্যমান থাকে এবং চুক্তিকারীদ্বয় তাদের [উপযুক্ততার] অবস্থায় বহাল থাকে। কেননা, অনুমোদন হচ্ছে চুক্তিটির মাঝে একটি হস্তক্ষেপ। অতএব, চুক্তিটি [হস্তক্ষেপকালে] বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তিকারীদ্বয় এবং চুক্তিকৃত দ্রব্য বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। আর মালিক যখন অনুমতি প্রদান করবে তখন বিক্রয়-মূল্য তার মালিকানাধীন হয়ে যাবে এবং তা তখন চুক্তিকারী তৃতীয় ব্যক্তিটির হাতে আমানতরূপে থাকবে, মালিকের প্রতিনিধি [ওয়াকিল] হিসেবে। কেননা, পরবর্তীতে যুক্ত অনুমোদন পূর্ববর্তী প্রতিনিধি নিয়োগের সমপর্যায়ভুক্ত। আর মালিকের অনুমোদন প্রদানের পূর্বে চুক্তিকারী তৃতীয় ব্যক্তির উক্ত চুক্তিটি রহিত করার অধিকার আছে, যাতে সে তার উপর আপতিত অধিকারসমূহ রোধ করতে পারে। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ তার রহিত করার অধিকার থাকবে না]। কেননা, বিবাহের ক্ষেত্রে সে শুধু বক্তব্য উচ্চারণকারী। [মালিকের অনুমতি প্রদানের] উল্লিখিত শর্ত হচ্ছে তখন, যখন বিক্রয়-মূল্য হবে মুদ্রাদ্রব্য [যা জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়]। আর যদি বিক্রয়-মূল্য নির্ধারিত কোনো পণ্যদ্রব্য হয়, তাহলে অনুমোদন প্রদান সঠিক হবে যদি সে দ্রব্যটিও [অনুমোদনকালে] বহাল থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ بَاقِيًا الخ : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যদি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি স্থগিত হিসেবে সম্পাদিত হবে এবং মালিকের বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর করা বা তা রহিত করার ইচ্ছাধিকার থাকবে। আলোচ্য ইবারতে বলা হচ্ছে যে, মালিক যদি উক্ত বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর করতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে শর্ত হলো, কার্যকর করার সময় বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে হবে এবং চুক্তিকারীদ্বয় অর্থাৎ ক্রেতা এবং নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তিটি চুক্তিসম্পাদনের যোগ্যতা সহকারে জীবিত থাকতে হবে। [উল্লেখ্য, চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য স্বয়ং মালিকের জীবিত থাকাও শর্ত। সুতরাং যদি মালিক মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিশগণ তা কার্যকর করতে পারবে না।]

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ الخ : উক্ত শর্তের দলিল হলো, কার্যকর করা বা অনুমতি প্রদান করা মূলত পূর্বের চুক্তির মাঝে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ। কেননা, অনুমতি দেওয়ার পূর্বে চুক্তিটি স্থগিত থাকে, আর অনুমতি দেওয়ার পর তা কার্যকর হয়। আর কোনো জিনিসের মাঝে পদক্ষেপ গ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করার জন্য ঐ জিনিসটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কাজেই মালিকের অনুমতি প্রদানের সময় বিক্রয়চুক্তিটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। আর বিক্রয়চুক্তি বিদ্যমান থাকে বিক্রীতবস্তু এবং চুক্তিকারীদ্বয় বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। অতএব অনুমতি প্রদানের সময় বিক্রীত-বস্তুটি এবং চুক্তিকারীদ্বয় বিদ্যমান থাকা শর্ত।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথকভাবেও দলিল বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে,

১. বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, মালিকের অনুমতির পূর্বে বস্তুটির মালিকানা ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয় না, বরং অনুমতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। আর কোনো বস্তু হালাক হয়ে গেলে তার মালিকানা স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়।

২. ক্রেতা বিদ্যমান থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তিটির অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আর মৃত্যুর পর কারো জিম্মায় কোনো কিছু ওয়াজিব সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

৩. বিক্রেতা তথা নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিটি জীবিত থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, অনুমতির মাধ্যমে তার উপর উক্ত চুক্তিটির সংশ্লিষ্ট কিছু অধিকার তার উপর বর্তায়। আর জীবিত না থাকলে কারো উপর কিছু বর্তায় না।

৪. মালিকের জীবিত থাকা শর্ত। তার কারণ হলো, চুক্তিটির অনুমতি সেই দিতে পারবে তার ওয়ারিশ দিতে পারবে না। কাজেই তার জীবিত থাকা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَإِذَا اَجَازَ الْمَالِكُ كَانَ الثَّمَنُ مَمْلُوكًا لَهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যখন মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করবে তখন [ক্রেতা বিক্রীত-বস্তুটির মালিক হয়ে যাবে এবং] মূল্য মালিকের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। নিঃসম্পর্ক (فُضُولِيْ) ব্যক্তিটির হাতে তখন মূল্য আমানাত হিসেবে গণ্য হবে। সে এ ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি (اَلْوَكِيْلُ) হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয়ের পর মালিকের বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করা বিধানগত দিক থেকে পূর্বে বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি বানানোর পর্যায় বলে গণ্য হয়। আর বিক্রয়ের জন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানো হলে সে যদি বস্তুটি বিক্রয় করে তার মূল্য হস্তগত করে, তাহলে তার কাছে তা আমানত হিসেবে থাকে। আর আমানতের বিধান হলো, তা হালাক হলে মালিকের পক্ষ থেকে হালাক হয়েছে বলে গণ্য হয়। আমানতদারের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সুরতে যদি নিঃসম্পর্ক (فُضُولِيْ) ব্যক্তির হাতে থাকাবস্থায় মূল্য হালাক হয়ে যায়, তাহলে তা মালিকের পক্ষ থেকে হালাক হবে। নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

قَوْلُهُ وَلِلْفُضُوْلِيِّ اَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْاِجَازَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মালিক বিক্রয়চুক্তিটিকে অনুমোদন দেওয়ার পূর্বে নিঃসম্পর্ক (فضولى) ব্যক্তিটি ইচ্ছা করলে চুক্তিটি বাতিল করে দিতে পারবে। কাজেই সে যদি মালিকের অনুমোদনের পূর্বে তা বাতিল করে দেয়, তাহলে মালিক পরে অনুমোদন করলে তা কার্যকর হবে না। নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিটির এই অধিকার থাকার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মালিকের অনুমোদনের পর সে মালিকের প্রতিনিধি (وَكِيْل) বলে গণ্য হয়। আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ যথা– বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতার পক্ষ থেকে হস্তান্তর দাবি করা, বিক্রীত-বস্তুতে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তা নিয়ে আদালতে মামলায় বিবাদী বানানো ইত্যাদি বিষয় প্রতিনিধির উপর বর্তায়। আর এ অধিকারগুলো তার উপর বর্তানো তার জন্য ক্ষতিকর। কাজেই ক্ষতিকর বিষয় তার উপর সাব্যস্ত হওয়ার আগে তা দূর করে দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো ক্ষতিকর বিষয় তার উপর সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সে তা দূর করার অধিকার রাখে।

পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে এ মাসআলার বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ কোনো নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তি যদি অনুমতি ছাড়া কারো বিবাহ-কার্য সম্পাদন করে, তাহলে যার অনুমোদনের উপর তা স্থগিত থাকবে সে অনুমোদন দেওয়ার আগে যদি আবার উক্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি তা বাতিল করার ইচ্ছা করে, তাহলে সে তা করতে পারবে না। এর কারণ হলো, বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ প্রতিনিধির উপর বর্তায় না; বরং সে কেবল বিবাহের বাক্যগুলো উচ্চারণকারী বা ব্যক্তকারী বলে গণ্য হয়। অতঃপর যখন যথাযথ কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করবে তখন বিবাহ সংশ্লিষ্ট সকল অধিকারসমূহ কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাবে; নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির উপর বর্তাবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। অতএব, তার বিবাহকার্যটি বাতিল করার অধিকার থাকবে না।

قَوْلُهُ هٰذَا اِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَاِنْ كَانَ عَرْضًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তিটি মালিক যদি অনুমোদন করতে চায় তাহলে শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তু এবং চুক্তিকারীদ্বয় বিদ্যমান থাকা–এটা হলো ঐ সুরতে যখন উক্ত বিক্রয়চুক্তিতে বস্তুটির মূল্য হিসেবে 'দাইন' তথা মুদ্রদ্রব্য [স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি] নির্ধারণ করা হবে। আর যদি মূল্য হিসেবে কোনো পণ্যদ্রব্য [মুদ্রদ্রব্য ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তু] নির্ধারণ করা হয়, তাহলে উপরিউক্ত শর্তের সাথে আরেকটি শর্ত যুক্ত হবে। তা হলো মূল্য হিসেবে নির্ধারিত উক্ত পণ্যদ্রব্যটিও বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় অনুমোদন কার্যকর হবে না।

ثُمَّ الْإِجَازَةُ إِجَازَةُ نَقْدٍ لَا إِجَازَةُ عَقْدٍ، حَتّٰى يَكُوْنَ الْعَرَضُ الثَّمَنُ مَمْلُوْكًا لِلْفُضُوْلِيِّ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الْمَبِيْعِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيْمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، لِأَنَّهُ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ، وَالشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَالِكُ لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لِأَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلٰى إِجَازَةِ الْمُوَرِّثِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَجُوْزُ بِإِجَازَةِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ فِيْ حَيَاتِهِ وَلَا يَعْلَمُ حَالَ الْمَبِيْعِ جَازَ الْبَيْعُ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) أَوَّلًا، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح)، وَقَالَ : لَا يَصِحُّ، حَتّٰى يُعْلَمَ قِيَامُهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِيْ شَرْطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ.

অনুবাদ : আর এ ক্ষেত্রে অনুমোদনটি হবে [মালিকের মাল থেকে] বস্তুটি নগদ প্রদানের অনুমতি; চুক্তিটি কার্যকর করার অনুমোদন নয় [বরং চুক্তিটি তৃতীয় ব্যক্তির নিজের জন্য পূর্বেই কার্যকর হয়ে রয়েছে]। অতএব মূল্যরূপে নির্ধারিত পণ্য বস্তুটি তৃতীয় ব্যক্তিটির মালিকানাভুক্ত হবে। আর তার উপর আবশ্যক হবে বিক্রীত-বস্তুটির অনুরূপ বস্তু মালিককে পরিশোধ করে দেওয়া, যদি বিক্রীতদ্রব্যটি এমন বস্তু হয় যার সদৃশ বস্তু আছে। আর যদি তার সদৃশ বস্তু না থাকে , তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, এটা [অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে কোনো কিছু বিক্রয় করা] এক হিসেবে [মূল্য-বস্তুটি] ক্রয় বলে গণ্য। আর ক্রয় কারো অনুমতির উপর নির্ভর থাকে না। আর মালিক যদি মারা যায়, তাহলে উভয় সুরতেই ওয়ারিশের অনুমোদনের দ্বারা চুক্তি কার্যকর হবে না। কেননা, চুক্তিটি মৃত ব্যক্তির নিজস্ব অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং অন্যের অনুমোদন দ্বারা তা বৈধ হবে না। আর মালিক যদি তার জীবদ্দশায় অনুমোদন দিয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রীত-বস্তুর অবস্থা জানা না যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পূর্ববর্তী অভিমত অনুযায়ী বিক্রয়চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। আর এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। কেননা, বিক্রীত-দ্রব্যটি বিদ্যমান থাকাই হচ্ছে তার মূল অবস্থা। পরবর্তীতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর পূর্বের অভিমত প্রত্যাহার করে বলেছেন যে, অনুমোদনের সময় বিক্রীত-দ্রব্যটি বহাল থাকার কথা জানা না যাওয়া পর্যন্ত বিক্রয়-চুক্তির অনুমোদন বৈধ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, অনুমোদন কার্যকরী হওয়ার শর্তের মাঝে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং সন্দেহ থাকা অবস্থায় অনুমোদন কার্যকর বলে সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِجَازَةُ إِجَازَةُ نَقْدٍ لَا إِجَازَةُ عَقْدٍ الخ : এ ইবারতটুকু বুঝার আগে দুটি বিষয় জানা থাকা আবশ্যক–

১. কোনো বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি তার মূল্য হিসেবে মুদ্রা নির্ধারণ না করে অন্য কোনো বস্তু (عَرْض) নির্ধারণ করা হয়, তাহলে এরূপ বিক্রয়কে بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ বলা হয়। আর بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ -এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্যই বিক্রীত-বস্তু (مَبِيْع) হিসেবে ধরা হয়। আর উভয় পক্ষকেই এক হিসেবে (مِنْ وَجْهٍ) ক্রেতা ধরা হয়।

২. আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের অনুমতি ছাড়া তার জন্য কোনো কিছু ক্রয় করে, তাহলে ক্রয়চুক্তিটি সে তার নিজের জন্য করেছে বলে গণ্য হয় এবং চুক্তিটি অপর ব্যক্তির অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকে না। অর্থাৎ ক্রয় কারো অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকে না।

এখন আমাদের আলোচ্য ইবারতের ব্যাখ্যা হলো, পূর্বে উল্লিখিত সুরতে অর্থাৎ যখন কোনো নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তি অন্যের কোনো বস্তু মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে এবং মূল্য হিসেবে মুদ্রা নির্ধারণ না করে অন্য কোনো বস্তু (عَرَض) নির্ধারণ করে, তখন এ বিক্রয়চুক্তিটি بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ। এ ক্ষেত্রে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিটি এক হিসেবে ক্রেতা এবং তার চুক্তিটি ক্রয় বলে গণ্য হবে। আর ক্রয় কারো অনুমোদনের উপর মওকুফ বা স্থগিত থাকে না। কাজেই চুক্তিটি সে নিজের জন্য করেছে বলে গণ্য হবে। অতএব, মূল্য হিসেবে যে বস্তুটি নির্ধারণ করা হয়েছে, এ নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তিটিই তার মালিক হবে।

সুতরাং এ সুরতে বিক্রীত-বস্তুটির মালিক যখন অনুমোদন প্রদান করবে তখন তার অনুমোদন-চুক্তিটি কার্যকর করার অনুমোদন বলে গণ্য হবে না; বরং অনুমোদনের অর্থ এরূপ হবে যে, মালিক নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার বস্তুটির বিনিময়ে যে অপর পক্ষের বস্তুটি ক্রয় করেছ, তা বাস্তবায়িত করার জন্য আমার বস্তুটি তুমি তাকে প্রদান কর, এটি তোমাকে আমি ঋণ হিসেবে দিলাম।

অতঃপর নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে, উক্ত বস্তুটি যদি এমন বস্তু হয় যার অনুরূপ বস্তু দেওয়া যায় [যেমন– ধান, গম ইত্যাদি] তাহলে সে মালিককে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দিয়ে দিবে। আর যদি বস্তুটি এমন হয়, যার অনুরূপ বস্তু দেওয়া যায় না [যেমন– পশু বা তারতম্যপূর্ণ বস্তু] তাহলে সে মালিককে বস্তুটির মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ الْمَالِكُ لَا يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মালিক নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির বিক্রয়-চুক্তি অনুমোদন করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে মালিকের ওয়ারিসের অনুমোদন দ্বারা চুক্তিটি কার্যকর হবে না। এ বিধান উভয় সুরতেই, অর্থাৎ মূল্য হিসেবে মুদ্রাদ্রব্য নির্ধারণ করার সুরতেও এবং মূল্য হিসেবে মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু নির্ধারণ করার সুরতেও। কোনো সুরতেই ওয়ারিসের অনুমোদন দ্বারা বিক্রয় কার্যকর হবে না। কারণ, বিক্রয়-চুক্তিটি স্বয়ং মূল মালিক তথা মৃত ব্যক্তির অনুমোদনের উপর মওকুফ বা স্থগিত ছিল, কাজেই অন্যের অনুমোদনের দ্বারা তা কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَجَازَ الْمَالِكُ فِيْ حَيَاتِهِ وَلَا يُعْلَمُ حَالُ الْمَبِيْعِ الخ : আর যদি এমন হয় যে, মালিক তার জীবদ্দশায় বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করে গেছে, কিন্তু একথা জানা যাচ্ছে না যে, তার অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান ছিল কিনা, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, চুক্তিটি কার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমতও তাই ছিল। পরবর্তীতে তিনি তাঁর এ অভিমত প্রত্যাহার করেছেন। এ অভিমতটির দলিল হলো, কোনো বিদ্যমান বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা (اَلْاَصْلُ) হলো, তা বিদ্যমান থাকা। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত তা হালাক হয়েছে বলে জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিদ্যমান আছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই মালিক অনুমোদন করার সময় বস্তুটি বিদ্যমান ছিল বলে ধরা হবে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) পরবর্তীতে তাঁর উপরিউক্ত প্রথম অভিমত প্রত্যাহার করে এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি কার্যকর হবে না, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, অনুমোদনকালে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল। কারণ, এখানে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার জন্য যে বিষয়টি শর্ত, তা পূরণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আর সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা থাকাবস্থায় কোনো বিষয় [নতুনভাবে] সাব্যস্ত করা যায় না। কাজেই সন্দেহ থাকার কারণে বিক্রয় কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

قَالَ : وَمَنْ غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ وَ اَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِيْ ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ اِسْتِحْسَانًا، وَهٰذَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) : لَا يَجُوْزُ، لِاَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُوْنِ الْمِلْكِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ، وَالْمَوْقُوْفُ لَا يُفِيْدُ الْمِلْكَ، وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْاٰخِرَةِ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ، وَالْمُصَحِّحُ لِلْاِعْتَاقِ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لِمَا رَوَيْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি [অন্যের] গোলাম আত্মসাৎ করে তা বিক্রয় করে ফেলে, অতঃপর ক্রেতা তাকে আজাদ করে দেয়, তারপর গোলামের [মূল] মালিক বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। এ বিধানটি হচ্ছে 'ইসতিহসান' বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আজাদ করা কার্যকর হবে না। কেননা, মালিকানা ব্যতীত আজাদ করার অধিকার নেই। নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান যে দাসের মালিক নয়, তা আজাদ করা কার্যকর হবে না"। আর স্থগিত বিক্রয়চুক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করে না। আর যদি পরবর্তীতে [অনুমোদন প্রদানের কারণে] মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তা সাব্যস্ত হবে [আত্মসাৎকারীর বিক্রয়ের উপর] ভিত্তিশীল হয়ে, আর অন্য কারণের উপর ভিত্তিশীল মালিকানা এক হিসেবে সাব্যস্ত, আর অন্য হিসেবে সাব্যস্ত নয়। অথচ আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মালিকানাই হচ্ছে আজাদ করাকে কার্যকরকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ غَصَبَ عَبْدًا الخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গোলাম আত্মসাৎ করে, অতঃপর তা কারো কাছে বিক্রয় করে ফেলে, তাহলে আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে যে ক্রয় করেছে, সে যদি গোলামটি আজাদ করে দেয়, তারপর গোলামের মূল মনিব আত্মসাৎকারীর বিক্রয়কে অনুমোদন করে তবে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি হলো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) "জামিউস সাগীর" গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই কোনো মতবিরোধ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। "জামিউস সাগীর" গ্রন্থ লেখার পর ইমাম মুহাম্মদ (র.) যখন গ্রন্থটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট পেশ করেন তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) গ্রন্থটির প্রশংসা করেন। কিন্তু কয়েকটি মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত নিয়ে তাঁদের উভয়ের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, তুমি যেভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত লিখেছ আমি তোমার নিকট সেভাবে বর্ণনা করিনি; বরং এর বিপরীত বর্ণনা করেছিলাম, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বরং আপনি আমার নিকট এরূপই বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আপনার স্মরণ নেই। আলোচ্য মাসআলাটিও তার একটি। এ মাসআলা সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছিলাম যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ সুরতে ক্রেতার আজাদ করা বাতিল হবে। জবাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, না, বরং আপনি বর্ণনা করেছিলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) মন্তব্য করেছেন যে, কাজেই "জামিউস সাগীরের" উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে এ কথা বলা সঠিক হবে না যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব হচ্ছে, ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হওয়া। কেননা, মূল বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে সঠিক নয় বলে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। কমপক্ষে এতটুকু বলতে হবে যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে দুই রকম বর্ণনা রয়েছে।

যা হোক মুসান্নিফ (র.) যেভাবে মতবিরোধ উল্লেখ করেছেন তাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কার্যকর হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি কিয়াসের অনুকূল। আর শায়খাইন (র.)-এর অভিমতটি اِسْتِحْسَانٌ তথা বাহ্যিক কিয়াস পরিহার করে নিগূঢ় কিয়াসের অনুকূল। উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُوْنِ الْمِلْكِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, মালিকানা ছাড়া আজাদ করা যায় না। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ "আদম সন্তান যার মালিক নয় তা সে আজাদ করতে পারবে না।" হাদীসটি তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তিরমিযী শরীফে হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ لِابْنِ اٰدَمَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهٗ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهٗ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ - هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

আর আলোচ্য মাসআলায় আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটির মালিক হয়নি। কেননা, তার ক্রয়চুক্তিটি মালিকের অনুমোদনের উপর স্থগিত ছিল। আর স্থগিত-চুক্তি মালিকানার ফায়দা দেয় না।

আর যদি আপনি বলেন যে, যখন মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করে তখন ক্রয়কারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এ মালিকানা অনুমোদনের সময় থেকে সাব্যস্ত হয় না বরং ক্রয়ের সময় থেকে মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার জবাব হলো, অনুমোদন যে ক্রয়ের কাল থেকে মালিকানা সাব্যস্ত করে তা করে بِطَرِيْقِ الْاِسْتِنَادِ অর্থাৎ বর্তমানের কোনো কার্য পূর্বের কোনো কারণ (سَبَبْ)-এর দিকে সম্পর্কিত (مَنْسُوْبْ) হয়ে বিধান সাব্যস্ত হওয়ার পন্থায়। আর এরূপ পন্থায় যে মালিকানা সাব্যস্ত হয় তা পরবর্তী কার্য তথা অনুমোদনের পূর্বের সময় পর্যন্ত অপূর্ণ (مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ) মালিকানা ছিল বলে সাব্যস্ত হয়। কাজেই আজাদ করার সময় তার মালিকানা ধরা হলেও তা হবে অপূর্ণ মালিকানা। অথচ আজাদ সহীহ হওয়ার জন্য পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীস (لَا عِتْقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ) -এ মালিকানার কথা শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শর্তহীন (مُطْلَقْ) ভাবে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়ে তা দ্বারা পূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য। আর আলোচ্য সুরতে কোনোভাবেই ক্রেতার আজাদ করার সময় পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে না। অতএব, তার আজাদ করা কার্যকর হবে না।

وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْغَاصِبُ، ثُمَّ يُؤَدِّى الضَّمَانَ، وَلَا أَنْ يُعْتِقَ الْمُشْتَرِى، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، ثُمَّ يُجِيزُ الْبَائِعُ ذٰلِكَ وَكَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرِى مِنَ الْغَاصِبِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ أَسْرَعُ نَفَاذًا. حَتّٰى نَفَذَ مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الضَّمَانَ وَكَذَا لَا يَصِحُّ إِعْتَاقُ الْمُشْتَرِى مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ. وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ مَوْضُوعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلٰى مَا مَرَّ، فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتَاقُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ، وَيَنْفُذُ بِنَفَاذِهِ.

অনুবাদ : আর এ কারণেই তো আত্মসাৎকারী গোলামকে আজাদ করলে এবং পরে জরিমানা পরিশোধ করলে তা কার্যকর বলে গণ্য হয় না। এরূপভাবে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকাবস্থায় ক্রেতা যদি আজাদ করে দেয় আর পরে বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয় না। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায় আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর [পুনরায়] বিক্রয় সঠিক হয় না। অথচ বিক্রয় হচ্ছে আজাদ করার চেয়ে দ্রুত কার্যকর। এজন্যই আত্মসাৎকারী বিক্রয় করার পর যদি ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় কার্যকর হয়ে যায়। এরূপভাবে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী আজাদ করার পর যদি আত্মসাৎকারী ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে [সকলের মতেই] ক্রেতার আজাদ করা কার্যকর হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, [আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর] মালিকানা [মালিকের অনুমোদনের উপর] স্থগিতরূপে সাব্যস্ত হয়েছে এমন একটি শর্তমুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে যা মালিকানা সৃষ্টির জন্যই শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। আর এতে কোনো পক্ষের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না; যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আজাদ করার বিষয়টি [অপেক্ষমাণ] মালিকানার উপর সম্পৃক্তরূপে স্থগিত থাকবে। আর মালিকানা কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে আজাদ করাও কার্যকর হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُعْتِقَ الْغَاصِبُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন, যেগুলোতে পূর্ণ মালিকানা না থাকার কারণে সকলের ঐকমত্যে আজাদ করা কিংবা বিক্রয় কার্যকর হয় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা শর্ত।

প্রথম উদাহরণ হলো : যদি কোনো আত্মসাৎকারী গোলাম আত্মসাৎ করে তা আজাদ করে দেয়, অতঃপর সে মালিককে তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার আজাদ করা কার্যকর হবে না। অথচ ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে আত্মসাতের সময় থেকেই তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। তা সত্ত্বেও আজাদ হয় না, তার কারণ হলো, উক্ত মালিকানা অপূর্ণ (ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ)।

قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يُعْتِقَ الْمُشْتَرِى، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ الخ: **দ্বিতীয় উদাহরণ হলো** : যদি কোনো গোলামের বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার خيار شرط [ভেবে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকে] আর এমতাবস্থায় ক্রেতা গোলামটি নিয়ে আজাদ করে দেয় অতঃপর বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার তুলে নিয়ে চুক্তিটি কার্যকর করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে ক্রেতার আজাদ করা কার্যকর হয় না। কেননা, আজাদ করার সময় ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ছিল না।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الْغَاصِبِ الخ : **তৃতীয় উদাহরণ হলো :**
আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ই যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি [আজাদ করার পরিবর্তে] বিক্রয় করে, আর পরে মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে দ্বিতীয় বিক্রয়টি [অর্থাৎ আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর বিক্রয়] কার্যকর হয় না। অথচ আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয়। সুতরাং যখন বিক্রয়ই সকলের মতে কার্যকর হয় না, তখন তার আজাদ করা [যা আমাদের আলোচ্য মাসআলা] অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে কার্যকর হবে না। আর আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় যে দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয় তার প্রমাণ হচ্ছে, যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি গোলামকে বিক্রয় করে ফেলে তারপর সে মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার বিক্রয় সকলের মতে কার্যকর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি গোলামকে আজাদ করে দেয় তারপর মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের মতে আজাদ করা কার্যকর হয় না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আজাদ করার তুলনায় বিক্রয় দ্রুত ও সহজে কার্যকর হয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَصِحُّ إِعْتَاقُ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الْغَاصِبِ الخ : **চতুর্থ উদাহরণ হলো :**
যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলমকে আজাদ করে দেয়, অতঃপর আত্মসাৎকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয় না। সুতরাং ক্ষতিপূরণের সুরতে যখন আজাদ করা কার্যকর হয় না তখন অনুমোদনের সুরতেও কার্যকর হবে না। কেননা, উভয় সুরতেই একই প্রকারের মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوْفًا بِتَصَرُّفٍ مُطْلَقٍ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) শায়খাইনের দলিল বর্ণনা করছেন। শায়খাইন (র.)-এর দলিল হলো, আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয় করার সময় থেকেই ক্রয়কারীর মালিকানা মওকুফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর আজাদ করা সেই মওকুফ মালিকানার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। অতঃপর যখন মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করবে তখন ক্রয়কারীর স্থগিত মালিকানা কার্যকর হবে এবং সে স্থগিত মালিকানার উপর নির্ভরশীল আজাদ করার বিষয়টিও কার্যকর হবে। আমরা এখানে যে বলেছি, "ক্রয় করার সময় থেকেই ক্রয়কারীর মালিকানা মওকুফ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে" এর কারণ হলো, বিক্রয়চুক্তি শরিয়তে নির্ধারণ করাই হয়েছে মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য। আর আলোচ্য সুরতে বিক্রয়চুক্তিটি হয়েছে কোনো পক্ষের ইচ্ছাধিকার (خِيَار شَرْط) থেকে মুক্ত রূপে। কাজেই তা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে। আর এ স্থগিত মালিকানা সাব্যস্ত করার মাঝে মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার কোনো ক্ষতি নেই। আর কোনো বিধানের দাবিকারী বিষয় (مُقْتَضِى) পাওয়া গেলে যদি কোনো বাধা না থাকে, তাহলে আবশ্যিকরূপে উক্ত বিধান সাব্যস্ত হয়।

কাজেই উক্ত বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। অবশ্য মালিকের অনুমতি না থাকার কারণে এ মালিকানা স্থগিত রয়েছে। আর আমরা যে বলেছি, আজাদ হওয়ার বিষয়টি সেই স্থগিত মালিকানার উপর নির্ভরশীল হয়ে স্থগিত থাকবে এবং মালিকানার বিষয়টি কার্যকর হওয়ার সময় তার উপর নির্ভরশীল আজাদ হওয়ার বিষয়টিও কার্যকর হবে। এটিও সম্ভব এবং শরিয়তে এর নজির রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এর স্বপক্ষে দুটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন– যা পরবর্তী ইবারতে আলোচিত হবে।

وَصَارَ كَإِعْتَاقِ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الرَّاهِنِ، وَكَإِعْتَاقِ الْوَارِثِ عَبْدًا مِنَ التَّرِكَةِ، وَهِيَ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُوْنِ يَصِحُّ وَيَنْفُذُ إِذَا قَضَى الدُّيُوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ، بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الْغَاصِبِ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ الْغَصْبَ غَيْرُ مَوْضُوْعٍ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ، وَقِرَانُ الشَّرْطِ بِهِ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَهُ فِيْ حَقِّ الْحُكْمِ أَصْلًا، وَبِخِلَافِ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الْغَاصِبِ إِذَا بَاعَ، لِأَنَّ بِالْإِجَازَةِ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ مِلْكٌ بَاتٌّ، فَإِذَا طَرَءَ عَلٰى مِلْكٍ مَوْقُوْفٍ لِغَيْرِهِ أَبْطَلَهُ وَأَمَّا إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ يَنْفُذُ إِعْتَاقُ الْمُشْتَرِيْ مِنْهُ، كَذَا ذَكَرَهُ هِلَالٌ (رح) وَهُوَ الْأَصَحُّ.

অনুবাদ : এ ক্ষেত্রে বিষয়টি বন্ধকদাতার নিকট হতে ক্রয়কারীর আজাদ করার মতো হলো। আর মৃত ব্যক্তির যে ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ঋণ দ্বারা আবদ্ধ তা থেকে ওয়ারিসের একটি গোলাম আজাদ করে ফেলার মতো হলো। এ বিক্রয় কার্যকর হয় যদি ওয়ারিশ আজাদ করার পর ঋণ পরিশোধ করে দেয়। পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারী নিজে আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আত্মসাৎ মালিকানা সৃষ্টি করার জন্য [শরিয়ত কর্তৃক] নির্ধারিত হয়নি। তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকার সুরতের বিয়ষটিও ভিন্ন। কেননা, তা নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ বিক্রয় নয়; বরং বিক্রয়চুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত যুক্ত হওয়া মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার পথে পূর্ণরূপেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এরূপভাবে আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর [পুনরায়] বিক্রয় করার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, [মালিকের] অনুমোদনের মাধ্যমে বিক্রেতার নিরঙ্কুশ মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। কাজেই এই নিরঙ্কুশ মালিকানা যখন স্থগিত মালিকানার উপর উদ্ভূত হবে তখন নিরঙ্কুশ মালিকানা [অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে] স্থগিত মালিকানা বাতিল করে দিবে। আর আত্মসাৎকারী যদি [মালিককে] ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়, তাহলে তার থেকে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। ফকীহ হিলাল (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন এবং এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَصَارَ كَإِعْتَاقِ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الرَّاهِنِ : প্রথম উদাহরণ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে তার নিকট একটি গোলাম বন্ধক রাখে, অতঃপর বন্ধকগ্রহণকারীর অনুমতি ছাড়াই যদি বন্ধকদাতা গোলামটি কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে এবং ক্রেতা গোলামটি আজাদ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে গোলামের আজাদ হওয়ার বিষয়টি বন্ধকগ্রহণকারীর অনুমোদন কিংবা তার ঋণ পরিশোধের উপর স্থগিত থাকবে। যদি বন্ধকগ্রহণকারী বিক্রয় অনুমোদন করে কিংবা বন্ধকদাতা তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে ক্রেতার পক্ষ থেকে গোলামকে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের আলোচ্য সুরতে মালিকের অনুমোদনের মাধ্যমে আজাদ করার বিষয়টি কার্যকর হবে। কেননা, উভয় সুরতেরই একই অবস্থা, তা হলো আজাদ করার বিষয়টি স্থগিত বিক্রয়চুক্তির উপর নির্ভরশীল হবে।

قَوْلُهُ وَكَإِعْتَاقِ الْوَارِثِ عَبْدًا مِنَ التَّرِكَةِ الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, যদি মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির মাঝে গোলাম থাকে এবং তার ত্যাজ্য সম্পত্তি সমপরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক তার নিকট মানুষের ঋণ পাওনা থাকে আর এমতাবস্থায় ওয়ারিশ উক্ত গোলামকে আজাদ করে দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে গোলামের আজাদ হওয়ার বিষয়টি স্থগিত থাকবে। যদি ওয়ারিশ মানুষের পাওনা ঋণসমূহ পরিশোধ করে দেয়, তাহলে তার আজাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও মালিক বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করলে আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হবে। কেননা, উভয় সুরতে আজাদ করার বিষয়টি মওকূফ মালিকানার উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الْغَاصِبِ بِنَفْسِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লেখকৃত উদাহরণগুলোর জবাব দিচ্ছেন।

প্রথম উদাহরণের জবাব হলো :

যদি আত্মসাৎকারী নিজে গোলামটি আজাদ করে দেয় অতঃপর মালিককে তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে তার আজাদ করা কার্যকর না হওয়ার কারণ হলো, আত্মসাৎ করা মূলত মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য শরিয়তে নির্ধারিত হয়নি, অর্থাৎ আত্মসাতের দ্বারা আত্মসাৎকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু যখন আত্মসাৎকারী ক্ষতিপূরণ আদায় করে তখন যাতে ক্ষতিপূরণ এবং আত্মসাৎকৃত গোলাম উভয়টি একই ব্যক্তি তথা মালিকের মালিকানায় একত্রিত না হয় সেজন্য গোলামের মাঝে আত্মসাৎকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয়। তবে এ মালিকানা আত্মসাৎ করার সময় থেকেই ধরা হয়। কিন্তু যেহেতু আত্মসাৎ করা মূলত মালিকানা সাব্যস্ত করার জন্য নির্ধারিত (وَضْع) করা হয়নি, তাই প্রয়োজনের কারণে শুধু মালিকানাই সাব্যস্ত হবে আর মালিকানার উপর যে আজাদ করা নির্ভরশীল ছিল তা কার্যকর হবে না। কেননা, প্রয়োজনের কারণে (ضَرُوْرَة) যা সাব্যস্ত করা হয় তা কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপরই সীমাবদ্ধ থাকে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ خِيَارٌ الخ : **দ্বিতীয় উদাহরণের জবাব হলো :**

বিক্রেতার خِيَار شَرْط বা ভেবে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকাবস্থায় ক্রেতা যদি গোলামকে আজাদ করে এবং পরে বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার তুলে নিয়ে বিক্রয় কার্যকর করে তাহলে ক্রেতার আজাদ করা কার্যকর হয় না, তার কারণ হলো, বিক্রয়টি প্রথমে بَيْع مُطْلَق বা শর্তমুক্ত বিক্রয় ছিল না বরং তা ইচ্ছাধিকারের শর্তযুক্ত ছিল। আর ইচ্ছাধিকারের শর্তযুক্ত হলে তা বিক্রয়ের বিধানগত ফলাফল তথা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত করাকে পূর্ণরূপে বিরত রাখে। অর্থাৎ তখন ক্রেতার কার্যকর মালিকানাও সাব্যস্ত হয় না এবং মওকূফ মালিকানাও সাব্যস্ত হয় না। কাজেই এমতাবস্থায় সে আজাদ করলে তা কার্যকর হবে না। কেননা, সে কোনো প্রকার মালিকানা ছাড়াই আজাদ করেছে।

قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ الْمُشْتَرِيْ مِنَ الْغَاصِبِ الخ : **তৃতীয় উদাহরণের জবাব হলো :**

আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি গোলাম বিক্রয় করে এবং পরে মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় অনুমোদন করে তাহলে ক্রয়কারীর বিক্রয় [অর্থাৎ দ্বিতীয় বিক্রয়] কার্যকর হয় না, তার কারণ হলো, যখন মালিক প্রথম বিক্রয় অনুমোদন করে তখন গোলামের মাঝে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তির নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর ক্রয়কারীর কাছ থেকে যে ব্যক্তি পুনরায় ক্রয় করেছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা ছিল মওকূফ। আর একই বস্তুর উপর এক সময় দুই ব্যক্তির মালিকানা হতে পারে না। তাই নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা মাওকূফ মালিকানাকে বাতিল করে দিবে। ফলে প্রথম ক্রয়কারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا إِذَا أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ الخ : **চতুর্থ উদাহরণের জবাব হলো :**

"যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলাম আজাদ করে দেয় অতঃপর আত্মসাৎকারী মালিককে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে যে সকলের ঐকমত্যে ক্রয়কারীর আজাদ করা কার্যকর হয় না", উল্লেখ করা হয়েছে এটি বিশুদ্ধ অভিমত নয়; বরং এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আজাদ করার বিষয়টি কার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর শাগরেদ ফকীহ হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া (র.) তাই বর্ণনা করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কাজেই এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনুকূলে নজির হিসেবে পেশ করা সঠিক হবে না।

قَالَ : فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ فَأَخَذَ اَرْشَهَا ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ فَالْاَرْشُ لِلْمُشْتَرِيْ، لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ عَلٰى مِلْكِهٖ، وَهٰذِهٖ حُجَّةٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ (رح) وَالْعُذْرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِيْ لِاِسْتِحْقَاقِ الْاَرْشِ، كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهٗ وَأَخَذَ الْاَرْشَ ثُمَّ رُدَّ فِي الرِّقِّ يَكُوْنُ الْاَرْشُ لِلْمَوْلٰى، وَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرٰى فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أُجِيْزَ الْبَيْعُ فَالْاَرْشُ لِلْمُشْتَرِيْ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلٰى مَا مَرَّ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلٰى نِصْفِ الثَّمَنِ، لِأَنَّهٗ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ ضِمَانِهٖ أَوْ فِيْهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি গোলামটির হস্ত কর্তন করা হয় আর ক্রয়কারী কর্তনকারীর কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ উসূল করে নেয় অতঃপর [মূল মালিক] বিক্রয়চুক্তিটি অনুমোদন করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ ক্রেতারই মালিকানাভুক্ত হবে। কেননা, [মালিকের অনুমোদনের মাধ্যমে] ক্রয়ের সময় থেকেই ক্রেতার মালিকানা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ক্রেতার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই গোলামটির হস্ত কর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিপক্ষে একটি প্রমাণ হলো। অবশ্য তাঁর পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, কোনো প্রকারের মালিকানা থাকলেই তা ক্ষতিপূরণের হকদার হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন– মুকাতাবের হাত যদি কর্তন করা হয়, আর মনিব যদি তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে অতঃপর [নির্ধারিত অংক পরিশোধ করতে না পারায়] মুকাতাব যদি পুনরায় দাসত্বে ফিরে যায়, তাহলে উক্ত ক্ষতিপূরণ মনিবেরই মালিকানাভুক্ত হয়। এরূপভাবে যদি বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার রয়েছে এরূপ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় ক্রয়কৃত গোলামের হস্ত কর্তন করা হয় অতঃপর বিক্রেতা চুক্তিটি কার্যকর করে, তাহলে [হস্ত কর্তনের] ক্ষতিপূরণ ক্রেতারই মালিকানাভুক্ত হয়। পক্ষান্তরে আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে [অর্থাৎ আজাদ করার জন্য যে কোনো প্রকারের মালিকানা যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ণ মালিকানা অপরিহার্য]। আর [কর্তনকারীর কাছ থেকে উসূলকৃত জরিমানা থেকে যে পরিমাণ টাকা গোলামটির] অর্ধেক মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত হবে তা ক্রেতা সদকা করে দিবে। কেননা, গোলামটি তার দায়ভুক্ত হয়নি কিংবা গোলামের মাঝে তার মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ الخ : মাসআলা হলো, যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে গোলামটি ক্রয় করার পর ক্রয়কারী তাকে আজাদ কিংবা বিক্রয় না করে আর এমতাবস্থায় কেউ গোলামটির হাত কেটে ফেলে এবং ক্রয়কারী যে হাত কেটেছে তার কাছ থেকে হাত কাটার জরিমানা উসূল করে, তারপর যদি গোলামটির মূল মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে হাত কাটার উসূলকৃত জরিমানা ক্রয়কারীরই মালিকানাভুক্ত হবে। কেননা, যখন মালিক বিক্রয় অনুমোদন করেছে তখন ক্রয়কারীর গোলামটির উপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে এবং এ মালিকানা ক্রয়ের সময় থেকে সাব্যস্ত হবে। কারণ, ক্রয়ই হচ্ছে তার মালিকানার سَبَبٌ বা কারণ। কাজেই গোলামটির হস্ত কর্তন ক্রেতার মালিকানায় থাকা অবস্থায়ই হয়েছে। অতএব, সে-ই উসূলকৃত ক্ষতিপূরণের মালিক হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذِهٖ حُجَّةٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ (رح) : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলায় ক্রেতার ক্ষতিপূরণের মালিক হওয়ার বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিপক্ষে একটি প্রমাণ। কেননা, তিনি পূর্বের মাসআলায় ক্রেতার আজাদ করাকে কার্যকর সাব্যস্ত করেননি। আর এ মাসআলায় তিনিও একমত যে, ক্রেতা ক্ষতিপূরণের মালিক হবে। অথচ পূর্বের মাসআলায় আজাদ করা হয়েছে স্থগিত মালিকানার অবস্থায় আর এ মাসআলায় হস্ত কর্তন করাও হয়েছে স্থগিত মালিকানার অবস্থায়। কাজেই বিধান উভয় সুরতের একই রূপ হওয়া আবশ্যক ছিল।

قَوْلُهُ وَالْعُذْرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِىْ لِاسْتِحْقَاقِ الْأَرْشِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষ থেকে এর জবাব হলো, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট, কিন্তু আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা প্রয়োজন। আর মালিকের অনুমোদনের পূর্বে ক্রেতার যে মওকূফ মালিকানা ছিল তা অপূর্ণ মালিকানা [যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি]। ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য যে অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট তার প্রমাণ হিসেবে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে দু'টি উপমা পেশ করেছেন–

قَوْلُهُ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الخ : প্রথম উপমা হলো, কেউ যদি 'মুকাতাব' [যে অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তি করেছে] -এর হাত কেটে ফেলে আর তার মনিব যে হাত কেটেছে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেয়, অতঃপর 'মুকাতাব' তার চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় পুনরায় গোলাম হিসেবেই থেকে যায়, তাহলে মনিবই উসুলকৃত ক্ষতিপূরণের মালিক হয়। এখানে মুকাতাব থাকা অবস্থায় মুকাতাবের উপর মনিবের পূর্ণ মালিকানা ছিল না। তা সত্ত্বেও মনিব ক্ষতিপূরণের মালিক হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرِىْ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ الخ : দ্বিতীয় উপমা হলো, যদি গোলামের বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেতার خِيَارِ شَرْط বা ভেবে দেখার ইচ্ছাধিকার থাকে আর এমতাবস্থায় ক্রেতা গোলামটিকে নিজের কাছে নিয়ে রাখে এবং তার কাছে থাকাবস্থায় কেউ গোলামটির হাত কেটে ফেলে তারপর বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার তুলে নিয়ে বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর করে দেয়, তাহলে ক্রেতাই হস্ত কর্তনের ক্ষতিপূরণের মালিক হয়। এ মাসআলায়ও হস্ত কর্তনের সময় ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা ছিল না; বরং বিক্রেতার কার্যকর করার কারণে পরে মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে যা পূর্বের বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত (مُسْتَنِدْ) হয়েছে। কাজেই হস্ত কর্তনের সময় ক্রেতার অপূর্ণ মালিকানা ছিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য অপূর্ণ মালিকানাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আজাদ করার জন্য পূর্ণ মালিকানা আবশ্যক, যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি।

قَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلٰى نِصْفِ الثَّمَنِ الخ : মাসআলা হলো, কর্তনকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ক্রয়কৃত গোলামের হস্ত কর্তনের যে ক্ষতিপূরণ উসুল করেছে সেই ক্ষতিপূরণ যদি যে মূল্য দিয়ে সে গোলামটি ক্রয় করেছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের টাকা তার উপর সদকা করা ওয়াজিব হবে।

কেননা, গোলামের হাত মূল্যমানের দিক থেকে গোলামের অর্ধেক হিসেবে গণ্য হয়। তাই কেউ তার কর্তন করলে কর্তনকালে গোলামটির যা বাজারমূল্য রয়েছে তার অর্ধেক ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হয়। আর ক্রেতার ক্রয়মূল্যের চেয়ে বাজারমূল্য বেশি হতে পারে, ফলে ক্ষতিপূরণের টাকা গোলামটির ক্রয়মূল্যের অর্ধেকের চেয়ে বেশি হবে। আর এ বেশিটুকু ক্রেতার লাভ হলো। কিন্তু আলোচ্য সুরতে ক্রেতার জন্য লাভ গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। তার কারণ হলো, হাত কর্তন যদি ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করার পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে গোলামটি তখন তার জিম্মাদারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর যে বস্তু কারো জিম্মাদারিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি তার লাভ গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ নয় (لَا يَجُوْزُ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)। আর যদি গোলামটি ক্রেতার হস্তগত করার পর তার হস্ত কর্তন করা হয়ে থাকে, তাহলে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, কর্তনকালে তার প্রকৃত পক্ষে মালিকানা ছিল না; বরং পরবর্তীতে মালিক বিক্রয় অনুমোদন করার ফলে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে পূর্বের ক্রয়ের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে (بِطَرِيْقِ الْإِسْتِنَادِ)। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ মালিকানা হলো অপূর্ণ মালিকনা (مِنْ وَجْهٍ دُوْنَ وَجْهٍ)। কাজেই তাতে মালিকানা না হওয়ার সন্দেহ রয়ে গেছে। আর সন্দেহযুক্ত মালিকানাধীন বস্তুর লাভ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অতএব, যখন উভয় অবস্থায়ই তার জন্য লাভ গ্রহণ করা জায়েজ নয়, তখন তার জন্য লাভের অংশটুকু সদকা করা ওয়াজিব হবে।

قَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِيْ مِنْ أٰخَرَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلٰى الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ الثَّانِيْ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِأَنَّ فِيْهِ غَرَرَ الْاِنْفِسَاخِ عَلٰى اِعْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، وَالْبَيْعُ يَفْسُدُ بِهِ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيْهِ الْغَرَرُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি পুনরায় গোলামটি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে ফেলে অতঃপর মনিব প্রথম বিক্রয়টি অনুমোদন করে, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয়টি কার্যকর হবে না। এর কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া এ কারণে যে, প্রথম বিক্রয়চুক্তি অনুমোদিত না হলে দ্বিতীয় চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এই ঝুঁকি রয়েছে। আর এরূপ ঝুঁকির কারণে বিক্রয়চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শায়খাইন (র.)-এর মতে [আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারীর] আজাদ করার বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ প্রথম বিক্রয় অনুমোদনের পর তা কার্যকর হয়ে যায়]। কেননা, বাতিল হওয়ার ঝুঁকি আজাদ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِيْ مِنْ أٰخَرَ الخ : মাসআলা হলো, যদি আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি আবার অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলে তারপর মূল মালিক আত্মসাৎকারীর বিক্রয় [অর্থাৎ প্রথম বিক্রয়] অনুমোদন করে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয় তথা প্রথম ক্রয়কারীর বিক্রয় কার্যকর হবে না। এর একটি কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মালিকের অনুমোদনের ফলে প্রথম ক্রেতার নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। আর ক্রয়কারীর কাছ থেকে যে পুনরায় ক্রয় করেছিল অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা ছিল মওকূফ। আর একই বস্তুর উপর এক সময় দুই ব্যক্তির মালিকানা হতে পারে না। তাই নিরঙ্কুশ ও কার্যকর মালিকানা মওকূফ মালিকানাকে বাতিল করে দিবে। ফলে প্রথম ক্রয়কারীর মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়কারীর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই দ্বিতীয় বিক্রয়টি বাতিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيْهِ غَرَرَ الْاِنْفِسَاخِ الخ : আরেকটি কারণ হলো, দ্বিতীয় বিক্রয় কার্যকর হওয়া নির্ভর করে মূল মালিকের প্রথম বিক্রয়টি অনুমোদনের উপর। আর প্রথম বিক্রয়টি মালিক আদৌ অনুমোদন করবে কিনা তা জানা নেই। ফলে দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে। আর ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ঝুঁকির সম্ভাবনার কারণে আজাদ করা বাতিল হয় না। তাই তাঁদের মতে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী যদি গোলামকে আজাদ করে দেয় তারপর যদি মালিক বিক্রয়টি অনুমোদন করে, তাহলে আজাদ করা কার্যকর হয়ে যায় [যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে]।

উল্লেখ্য, ঝুঁকির সম্ভাবনার কারণে যে আজাদ করা বাতিল হয় না কিন্তু বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় তার প্রমাণ হলো, যদি কেউ একটি গোলাম ক্রয় করে তা হস্তগত করার পূর্বেই আজাদ করে দেয়, তাহলে তার আজাদ করা কার্যকর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি গোলামটি হস্তগত করার পূর্বে অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য, এখানে একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। তা হলো, যদি বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হওয়া না হওয়ার ঝুঁকির কারণে বাতিল বলে গণ্য হয়, তাহলে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে প্রথম ক্রেতার ক্রয়ও বাতিল হওয়ার কথা। কেননা, হতে পারে যে, মালিক এ বিক্রয় অনুমোদন করবে না। কাজেই মালিকের অনুমোদনের পর তা কার্যকর না হওয়ার কথা। এরূপভাবে নিঃসম্পর্ক (فُضُوْلِيْ) ব্যক্তির বিক্রয়ও বাতিল হওয়ার কথা। কেননা, সেখানেও এ ঝুঁকি থাকে যে মালিক বিক্রয় অনুমোদন করবে না। অথচ এ উভয় সুরতে বিক্রয় বাতিল হয় না; বরং মালিক অনুমোদন করলে তা কার্যকর হয়।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির বিক্রয় এবং আত্মসাৎকারীর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে কার্যকর না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে যা বিক্রয় বাতিল হওয়া দাবি করে, কিন্তু অন্য দিকে তাতে মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতার উপকার রয়েছে [যা আমরা فَصْلٌ فِيْ بَيْعِ الْفُضُوْلِيْ -তে আলোচনা করেছি] এবং কারো কোনো ক্ষতির দিক নেই, যা চুক্তিটি জায়েজ হওয়ার দাবি করে। তাই উপকারের দিকে লক্ষ্য করে মওকূফ হিসেবে এদের বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আত্মসাৎকারীর নিকট হতে ক্রয়কারীর দ্বিতীয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই উপকার বিদ্যমান নেই। কেননা, ক্রয়কারী তখনও মালিকই হয়নি কাজেই তার নতুন ক্রেতা তালাশের প্রশ্ন আসবে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যখন জায়েজ হওয়ার দিক এবং নাজায়েজ হওয়ার দিক উভয়টিই বিদ্যমান তখন জায়েজ হওয়ার দিকটি কেন প্রাধান্য দেওয়া হলো? তার জবাব হচ্ছে, উপকারের দিক বিবেচনা না করে শুধু ঝুঁকির কারণে বিক্রয় বাতিল গণ্য করা সম্ভব নয়। কেননা, তাহলে কোনো বিক্রয়ই জায়েজ হবে না। কারণ, সকল বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এই ঝুঁকি থাকে যে, বিক্রয়ের পর হস্তান্তরের আগে বস্তুটি হালাক হয়ে যেতে পারে। কাজেই বুঝা গেল, যে ক্ষেত্রে উপকার বিদ্যমান নেই সে ক্ষেত্রে ঝুঁকির কারণে বিক্রয় বাতিল হয়। অন্যথায় উপকারের দিক বিবেচ্য হবে।

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ الْمُشْتَرِىْ فَمَاتَ فِىْ يَدِهٖ اَوْ قُتِلَ ثُمَّ اَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ. لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْإِجَازَةَ مِنْ شَرْطِهَا قِيَامُ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ، وَكَذَا بِالْقَتْلِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ إِيْجَابُ الْبَدْلِ لِلْمُشْتَرِىْ بِالْقَتْلِ حَتّٰى يُعَدَّ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْبَدْلِ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِىْ عِنْدَ الْقَتْلِ مِلْكًا يُقَابَلُ بِالْبَدْلِ فَيَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِىْ ثَابِتٌ فَأَمْكَنَ إِيْجَابُ الْبَدْلِ لَهٗ، فَيَكُوْنُ الْمَبِيْعُ قَائِمًا بِقِيَامِ خَلْفِهٖ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهٖ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ وَاَقَامَ الْمُشْتَرِىْ الْبَيِّنَةَ عَلٰى إِقْرَارِ الْبَائِعِ اَوْ رَبِّ الْعَبْدِ أَنَّهٗ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْبَيْعِ وَاَرَادَ رَدَّ الْبَيْعِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهٗ لِلتَّنَاقُضِ فِى الدَّعْوٰى، إِذِ الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهٖ، وَالْبَيِّنَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلٰى صِحَّةِ الدَّعْوٰى .

অনুবাদ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটিকে বিক্রয় না করে; বরং তার হাতে থাকাবস্থায় গোলামটি মারা যায় কিংবা নিহত হয় অতঃপর যদি মনিব বিক্রয়কে অনুমোদন করে, তাহলে অনুমোদনটি কার্যকর হবে না। কেননা, পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, [মালিকের] অনুমোদন কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অনুমোদনকালে বিক্রীত-বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে হবে। আর [আলোচ্য সুরতে] মৃত্যুর মাধ্যমে বিক্রীত গোলাম অবিদ্যমান হয়ে গেছে। এরূপভাবে হত্যার ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা, হত্যার কারণে ক্রেতার জন্য গোলামটির বিনিময় বস্তু সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়, এটা সম্ভব হলে না হয় বিনিময়বস্তু বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে গোলামটি বিদ্যমান আছে বলে বিবেচনা করা যেত। কারণ, হত্যার সময় ক্রেতার এমন মলিকানা ছিল না, যার ভিত্তিতে গোলামটির বিনিময়বস্তু তার জন্য সাব্যস্ত করা যায়। কাজেই [অনুমোদনকালে] গোলামটির অবিদ্যমানতা নিশ্চিত। পক্ষান্তরে [এ সুরতটি] বিশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হলে তার বিধান ভিন্ন। কেননা, [তখন হত্যার সময়] ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত রয়েছে। ফলে নিহত গোলামের বিনিময়বস্তু তার জন্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে। অতএব, স্থলাভিষিক্ত বস্তু [তথা বিনিময়বস্তু] বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে বিক্রীত গোলাম বিদ্যমান আছে বলে বিবেচিত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা বিক্রেতা কিংবা গোলামের মনিবের এই মর্মে স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামের মালিক বিক্রেতাকে বিক্রয়ের নির্দেশ দেয়নি আর ক্রেতা এভাবে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল করতে চায়, তাহলে ক্রেতার উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না। কেননা, তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেছে। কারণ, তার গোলামটি ক্রয়ের উদ্যোগই তার পক্ষ থেকে এই স্বীকারোক্তির সমতুল্য যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল। আর সাক্ষ্য-প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা দাবি সঠিক হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ الْمُشْتَرِيْ الخ : মাসআলা হলো, যদি কর্তনকারীর নিকট হতে ক্রয়কারী ব্যক্তি গোলামটি বিক্রয় না করে; বরং তার হাতে থাকা অবস্থায় গোলামটি মারা যায় কিংবা নিহত হয় তারপর যদি মূল মালিক বিক্রয় অনুমোদন করে, তাহলে মালিকের এ অনুমোদন কার্যকর হবে না।

এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মালিকের অনুমোদন কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হলো, অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তু [এখানে গোলামটি] বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় তার অনুমোদন কার্যকর হবে না। আর আলোচ্য মাসআলায় অনুমোদনের পূর্বেই গোলামটি মারা গেছে কিংবা নিহত হয়েছে। কাজেই মালিকের অনুমোদন কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ إِذْ لَا يُمْكِنُ إِيْجَابُ الْبَدَلِ لِلْمُشْتَرِيْ الخ : কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আলোচ্য মাসআলায় গোলামটি নিহত হওয়ার সুরতে মালিকের অনুমোদনের সময় যদিও বিক্রীত-বস্তু তথা গোলামটি বিদ্যমান নেই, কিন্তু গোলামটির হত্যার বিনিময়ে প্রাপ্ত 'দিয়াত' তো ক্রেতার পক্ষে সাব্যস্ত করে সেই 'দিয়াত'-কে গোলামটির স্থলাভিষিক্ত ধরে অনুমোদনের সময় গোলামটি বিদ্যমান বলে ধরা যেতে পারে। কেননা, কোনো কিছুর بَدَل বা বিনিময়বস্তু বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে আসল বস্তুটি বিদ্যমান ধরা যায়। যেমন সাধারণ বিক্রয় তথা (اَلْبَيْعُ الصَّحِيْحُ)-এর ক্ষেত্রে কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে অতঃপর তা হস্তগত করার পূর্বে কেউ তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যায় না, কিন্তু যদি গোলামটি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যায়। এর কারণ হলো, নিহত হওয়ার সুরতে গোলামটির বিনিময় তথা দিয়াত বিদ্যমান থাকে, তাই বিক্রীত-বস্তু বিদ্যমান আছে বলে গণ্য করা হয়। আর মৃত্যুর সুরতে যেহেতু তার কোনো বিনিময়বস্তুও বিদ্যমান থাকে না, তাই বিক্রয় রহিত হয়ে যায়। কাজেই আমাদের আলোচ্য সুরতে গোলামটির বিনিময়বস্তু 'দিয়াত' ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত করে মালিকের অনুমোদন কেন কার্যকর বলে গণ্য হবে না?

এর জবাব হলো, যখন গোলামটি হত্যা করা হয়েছে [অর্থাৎ মালিকের অনুমোদনের পূর্বে] তখন আত্মসাৎকারী থেকে ক্রয়কারীর এমন কোনো মালিকানা ছিল না যার ভিত্তিতে সে গোলামটির বিনিময় তথা 'দিয়াত'-এর মালিক হতে পারে। কেননা, তার মালিকানা ছিল মওকূফ মালিকানা, আর স্থগিত মালিকানার মাধ্যমে বিনিময়বস্তুর মালিক হতে পারে না। কাজেই মালিকের অনুমোদনের সময় বিক্রীত-বস্তু তথা গোলাম বা তার বিনিময়বস্তু কোনোটিই বিদ্যমান ছিল না, অতএব মালিকের অনুমোদন কার্যকর হবে না।

পক্ষান্তরে সাধারণ বিক্রয় তথা (اَلْبَيْعُ الصَّحِيْحُ)-এর ক্ষেত্রে ক্রয়ের পরই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। অতএব হত্যার সময় ক্রেতা গোলামটি হস্তগত না করলেও গোলামটির মাঝে তার পূর্ণ মালিকানা ছিল। সুতরাং গোলামটির "দিয়াত" তার জন্য সাব্যস্ত হবে। তাই বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল বা রহিত হবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ الخ : মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো গোলাম মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা গোলামটি এই বলে ফেরত দিতে চায় যে, তুমি গোলামটি মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করেছ আর বিক্রেতা তা অস্বীকার করে তখন ক্রেতা যদি বিচারকের কাছে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা ইতঃপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, সে গোলামটি মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করেছে কিংবা সে এই মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, গোলামটির মালিক ইতঃপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, সে বিক্রেতাকে গোলামটি বিক্রয় করার অনুমতি দেয়নি, তাহলে ক্রেতার এ সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না।

এর কারণ হলো, ক্রেতার দাবির মাঝে এ ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, ক্রেতার গোলামটি ক্রয় করার উদ্যোগ তার পক্ষ থেকে এ কথার প্রমাণ যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল। আর এখন সে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে এ কথার দাবি করছে যে, বিক্রয়চুক্তিটি সঠিক ছিল না। কাজেই তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা (تَنَاقُض) পাওয়া গেল। আর দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলে তা দাবিকে বাতিল করে দেয়। আর দাবি সঠিক না হলে সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না। কাজেই আলোচ্য সুরতে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে না।

وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْقَاضِيْ بَطَلَ الْبَيْعُ إِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِيْ ذٰلِكَ، لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ، فَلِلْمُشْتَرِيْ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلٰى ذٰلِكَ فَيَتَحَقَّقُ الْإِتِّفَاقُ بَيْنَهُمَا. فَلِهٰذَا شُرِطَ طَلَبُ الْمُشْتَرِيْ . قَالَ (رض) : وَ ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا صَدَّقَ مُدَّعِيَهِ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلٰى إِقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُسْتَحِقِّ تُقْبَلُ، وَفَرَّقُوْا أَنَّ الْعَبْدَ فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيْ يَدِ الْمُشْتَرِيْ وَفِيْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِيْ يَدِ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ، وَشَرْطُ الرُّجُوْعِ بِالثَّمَنِ أَنْ لَا يَكُوْنَ الْعَيْنُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِيْ.

অনুবাদ : আর বিক্রেতা যদি বিচারকের নিকট তা স্বীকার করে তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে; যদি ক্রেতা চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার আবেদন জানায়। কেননা, দাবির স্ববিরোধিতা স্বীকারোক্তি সঠিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। সুতরাং ক্রেতার অধিকার রয়েছে এ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে সহায়তা করা। তখন উভয়ের মাঝে ঐকমত্য সাব্যস্ত হবে। আর এ কারণেই ক্রেতার আবেদন জানানো শর্ত করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلزِّيَادَاتُ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতা যদি গোলামের মালিকানা দাবিকারীর দাবির সত্যায়ন করে অতঃপর এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা স্বীকার করেছিল "গোলামটি উক্ত দাবিকারীর মালিকানাভুক্ত" তাহলে ক্রেতার উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। ফিকহবিদগণ এ দু মাসআলার মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, এ মাসআলায় [অর্থাৎ মতনে বর্ণিত মাসআলায়, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার সময়] গোলামটি রয়েছে ক্রেতার দখলে। পক্ষান্তরে [زِيَادَاتْ -এর বর্ণিত] সেই মাসআলায় গোলামটি রয়েছে অন্যের দখলে অর্থাৎ মালিকানা দাবিকারীর দখলে। আর মূল্য ফেরত পাওয়ার জন্য শর্ত হলো দ্রব্যটি ক্রেতার জন্য নিরাপদ না থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِذٰلِكَ الخ : মাসআলা হলো, যদি বিক্রেতা নিজে বিচারকের নিকট স্বীকার করে যে, আমি গোলামটি মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করেছি আর ক্রেতাও যদি বিক্রয় বাতিল সাব্যস্ত করার বিচারকের নিকট দাবি জানায়, তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

এর কারণ হলো, বক্তব্যের মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেলেও স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হয়। এ কারণেই কেউ যদি কোনো একটি বিষয় প্রথমে অস্বীকার করে পরে আবার স্বীকার করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে যদিও বিক্রেতার প্রথম বিক্রয় করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বিক্রয়টি সঠিক আর পরের স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে যে, বিক্রয়টি সঠিক ছিল না, তবু তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে। কিন্তু স্বীকারোক্তি যেহেতু حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ অর্থাৎ সীমিত পরিসরের প্রমাণ, যা কেবল স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর উপরই প্রযোজ্য হয় অন্যের উপর প্রযোজ্য হয় না, তাই বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য বিক্রেতারও সম্মতি প্রয়োজন। অতএব, তার পক্ষ থেকে চুক্তিটি বাতিল করার দাবি জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার দাবিটি স্বতন্ত্র দাবি নয়; বরং বিক্রেতার স্বীকারোক্তির সমর্থন। কাজেই ক্রেতা এ সমর্থন করার অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَ ذُكِرَ فِى الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْمُشْتَرِى إِذَا صَدَّقَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত زِيَادَاتٌ গ্রন্থের একটি মাসআলা উল্লেখ করছেন। মাসআলাটি এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে– পূর্বে যে মাসআলাটি বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর লিখিত جَامِع صَغِيْر গ্রন্থের। আর পূর্বে উল্লেখিত جَامِع صَغِيْر-এর মাসআলা এবং زِيَادَاتٌ গ্রন্থে বর্ণিত মাসআলা দুটির মাঝে বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। তাই মুসান্নিফ (র.) 'যিয়াদাত'-এর মাসআলাটি উল্লেখ করে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

'যিয়াদাত'-এ বর্ণিত মাসআলাটি হলো, কোনো ব্যক্তি যদি একটি গোলাম ক্রয় করে অতঃপর ক্রেতার নিকট এক ব্যক্তি এসে দাবি করে যে, গোলামটি তার এবং ক্রেতা তার দাবির সত্যায়ন করে তারপর যদি ক্রেতা বিচারকের নিকট এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতাও ইতঃপূর্বে স্বীকার করেছিল যে, গোলামটি উক্ত ব্যক্তির, তাহলে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, তার ক্রয়ের উদ্যোগ তার পক্ষ থেকে এ কথার প্রমাণ ছিল যে, বিক্রয় সঠিক আর এখন তার দাবি হচ্ছে বিক্রয় সঠিক ছিল না। কাজেই তার দাবির মাঝে স্ববিরোধিতা পাওয়া গেছে। সুতরাং جَامِع صَغِيْر -এর মাসআলা ও زِيَادَاتٌ-এর মাসআলার মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা, جَامِع صَغِيْر -এর মাসআলায় দাবির মাঝে স্ববিরোধিতার কারণে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়নি, আর زِيَادَاتٌ-এর মাসআলায় স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, ফিকহবিদগণ এ দু মাসআলার মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, جَامِع صَغِيْر-এর মাসআলায় [যা মতনে উল্লেখ করা হয়েছে] ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সময় গোলামটি ক্রেতারই হাতে রয়েছে। সুতরাং বিক্রীত-বস্তু তথা গোলাম তার কাছে নিরাপদভাবে আছে, তাই সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করবে না। কেননা, মূল্য ফেরত পাওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তু ক্রেতার হাতে নিরাপদভাবে [অর্থাৎ অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হওয়া থেকে মুক্তভাবে] না থাকা।

আর زيادات -এর মাসআলায় ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করার সময় গোলামটি ক্রেতার হাতে নেই; বরং তা যে ব্যক্তি গোলামটি দাবি করেছে তার হাতে চলে গেছে। সুতরাং ক্রেতার মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে। কেননা, বিক্রীত-বস্তু ক্রেতার হাতে নিরাপদ [অন্যের অধিকারমুক্ত] ভাবে না থাকলে ক্রেতার মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে, যাতে সে মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دَارًا لِرَجُلٍ وَاَدْخَلَهَا الْمُشْتَرِى فِى بِنَائِهِ لَمْ يَضْمَنِ الْبَائِعُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ (رحـ)، وَهُوَ قَوْلُ اَبِى يُوْسُفَ (رحـ) اٰخِرًا، وَكَانَ يَقُوْلُ اَوَّلاً، يَضْمَنُ الْبَائِعُ: وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (رحـ)، وَهِىَ مَسْاَلَةُ غَصْبِ الْعَقَارِ، وَسَنُبَيِّنُهُ فِى الْغَصْبِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি অন্যের একটি বাড়ি [-এর ভিটি তার নির্দেশ ছাড়া] বিক্রয় করে আর ক্রেতা তা নির্মাণের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তাহলে বিক্রেতা ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এরও পরবর্তী অভিমত। প্রথমে তিনি বলতেন যে, বিক্রেতা ক্ষতিপূরণের জিম্মাদার হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও তাই। এটা স্থাবর সম্পত্তি 'গসব' বা আত্মসাতের মাসআলা। এ মাসআলা আমরা ইনশাআল্লাহ্ 'গসব' বা আত্মসাতের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। সঠিক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ دَارَ الرَّجُلِ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি অন্যের বাড়ির ভিটি তার অনুমতি ছাড়া বিক্রয় করে এবং ক্রেতা তা দখল করে নেয়। তারপর বিক্রেতা যদি স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, সে অন্যের বাড়ি আত্মসাৎ করে বিক্রয় করেছে, বাড়িটি তার নিজের নয়। আর ক্রেতা তার এ স্বীকারোক্তি অস্বীকার করে, আর বাড়িটির মালিকের সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পরবর্তীকালের অভিমত হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে মালিককে বিক্রেতার কোনো জরিমানা দিতে হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর প্রথম দিকের অভিমত হলো, মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে। [উল্লেখ্য, যদি মালিকের এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে যে, বাড়িটি তার তাহলে সকলের ঐকমত্যে মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে না, বরং সে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি নিয়ে নিবে। তদ্রূপ যদি ক্রেতা বিক্রেতার স্বীকারোক্তি মেনে নেয়, তাহলেও মালিককে বিক্রেতার জরিমানা দিতে হবে না; বরং সে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি নিয়ে নিবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে।]

قَوْلُهُ وَهِىَ مَسْاَلَةُ غَصْبِ الْعَقَارِ وَسَنُبَيِّنُهُ فِى الْغَصْبِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটি স্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা সংক্রান্ত মাসআলা। আমরা এ মাসআলাটি 'আত্মসাতের অধ্যায়ে' মতবিরোধ ও দলিল সহকারে বর্ণনা করব। উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) মাসআলাটি হিদায়া গ্রন্থের كِتَابُ الْغَصْبِ বা "আত্মসাতের অধ্যায়"-এর তৃতীয় পৃষ্ঠা তথা ৩৫৮ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। মূল মাসআলাটি তিনি মতবিরোধ ও দলিল সহকারে প্রথমে আলোচনা করেছেন, যার সারকথা হচ্ছে– ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তি কেউ আত্মসাৎ করলেও তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হয় না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে আত্মসাৎ বলে গণ্য হয়। অতএব, আমাদের এখানে আলোচ্য মাসআলায় শায়খাইন (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে যেহেতু আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে না, সেহেতু বিক্রেতাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিক্রেতা আত্মসাৎ করেছে বলে গণ্য হবে, কাজেই তাকে জরিমানা দিতে হবে।

بَابُ السَّلَمِ

اَلسَّلَمُ عَقْدٌ مَشْرُوْعٌ بِالْكِتَابِ، وَهُوَ اٰيَةُ الْمُدَايَنَةِ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) : اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَحَلَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ، وَاَنْزَلَ فِيْهَا اَطْوَلَ اٰيَةٍ فِيْ كِتَابِهِ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ (اَلْاٰيَةُ)، وَبِالسُّنَّةِ، وَهُوَ مَا رُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَ رَخَّصَ فِى السَّلَمِ، وَالْقِيَاسُ وَإِنْ يَّأْبَاهُ وَلٰكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ، وَ وَجْهُ الْقِيَاسِ اَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ، إِذِ الْمَبِيْعُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيْهِ .

পরিচ্ছেদ : বায় সলম

অনুবাদ : 'সলম' হলো এমন একটি ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি, যা কিতাবুল্লাহ দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত। আর তা হলো ঋণ দান সংক্রান্ত আয়াত। কেননা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদেয় হিসেবে 'সালাফ' [অগ্রিম মূল্য প্রদান] হালাল করেছেন এবং সে সম্পর্কে তাঁর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত নাজিল করেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পাঠ করলেন– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখ।' আর সুন্নাহ দ্বারাও 'বায় সলম' অনুমোদিত হয়েছে। আর তা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন দ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা [বিক্রয়কারী] ব্যক্তির নিকট নেই, তবে তিনি 'বায় সালাম'-এর অনুমতি দিয়েছেন। আর কিয়াস যদিও এর বৈধতা অস্বীকার করে, কিন্তু আমরা আমাদের বর্ণিত হাদীসের কারণে কিয়াস পরিহার করেছি। কিয়াস -এর বৈধতা অস্বীকার করার কারণ হলো, 'বায় সালাম' হচ্ছে অবিদ্যমান দ্রব্য বিক্রয় করা। কেননা, এখানে বিক্রয়দ্রব্য হচ্ছে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত-দ্রব্য] যা বিক্রেতার কাছে চুক্তিকালে বিদ্যমান নেই, [আর অবিদ্যমান দ্রব্য বিক্রয় করা বৈধ নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা : পূর্ব ও পরের পরিচ্ছেদের সাথে ধারবাহিকতার সম্পর্ক : মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে সে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন যার মাঝে দুই বিনিময়দ্রব্য [পণ্যদ্রব্য ও মূল্যদ্রব্য]-এর কোনোটিই মজলিসে হস্তগত করা শর্ত নয়। আর এ পরিচ্ছেদে এমন ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করেছেন, যার মাঝে দুই বিনিময়দ্রব্যের একটি মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। কেননা, 'বায় সলম'-এর মাঝে মূল্যদ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক। পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি এমন ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা করবেন যাতে উভয় বিনিময়দ্রব্যই মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। আর তা হলো 'বায় সরফ'।

'সলম'-এর আভিধানিক অর্থ ও নামকরণের কারণ : এ ক্ষেত্রে কয়েকটি অভিমত রয়েছে–

১. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, سَلَمٌ শব্দটি تَسْلِيْم ক্রিয়ামূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– হস্তান্তর করা, অর্পণ করা। যেহেতু 'বায় সলম'-এর মাঝে মূল্যদ্রব্য (رَأْسُ الْمَالِ) [মজলিসেই] অর্পণ করা অপরিহার্য, তাই এর নাম 'সলম' রাখা হয়েছে। তবে এ অর্থে 'বায় সরফ'-এর নাম 'সলম' হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল, কেননা, তাতে উভয় বিনিময়দ্রব্যই মজলিসে অর্পণ করা অপরিহার্য। তা সত্ত্বেও 'বায় সলম'-এর নাম 'সলম' হওয়ার কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে 'বায় সলম'-এর প্রচলনই অধিক ছিল, তাই 'সলম' নামটি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

২. আল্লামা কাকী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী উল্লেখ করেছেন, سَلَمٌ শব্দটি إِسْلَامٌ থেকে নেওয়া হয়েছে যা بَابُ إِفْعَالٌ-এর মাসদার। আর এখানে বাবে إِفْعَالٌ-এর হামযাহ سَلْبُ مَادَّةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে– 'নিরাপত্তা বিনষ্ট করা'। সুতরাং 'বায় সলম' এজন্য নামকরণ হয়েছে যে, দাদনদাতা [রাব্বুল মাল] ক্রয়কৃত দ্রব্য লাভ করার পূর্বেই মূলধন মুসলাম ইলাইহি-কে অর্পণ করে যেন মূলধনের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে। তবে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেছেন, এ অভিমতটি দুর্বল। কেননা, এটা তখন সঠিক হতো যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধন বিনষ্ট হতো। অথচ তা হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা বিক্রয়দ্রব্য হস্তান্তর করে থাকে।

৩. আল ঈযাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, سَلَمٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে إِسْتِعْجَالٌ তথা কোনো কিছু দ্রুত চাওয়া বা কোনো কাজ দ্রুত করা। سَلَفٌ শব্দের একই অর্থ। সুতরাং 'বায় সলম' -এর নাম 'সলম' এজন্য হয়েছে যে, 'বায় সলম' -এর মাঝে বিক্রীতদ্রব্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই মূল্যদ্রব্য [রা'সুল মাল] দ্রুত গ্রহণ করা হয়।

৪. কারো কারো মতে, যেহেতু 'সলম'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– দ্রুত কোনো কাজ করা বা দ্রুত কিছু চাওয়া, আর 'বায় সলম' বিক্রয়ের প্রকৃত সময় আসার পূর্বেই সম্পন্ন হয়, তাই একে 'সলম' নাম রাখা হয়েছে। কেননা, বিক্রয়ের প্রকৃত সময় হচ্ছে বিক্রেয়দ্রব্য বিক্রেতার মালিকানায় আসার পর। অথচ 'বায় সলম' সাধারণত যে বস্তু বিক্রেতার মালিকানায় নেই তাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

'বায় সলম'-এর পারিভাষিক অর্থ : 'বায় সলম'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ এর সংজ্ঞা করেছেন, أَخْذُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ অর্থাৎ, "বাকি কোনো জিনিসের বিনিময়ে নগদ কোনো জিনিস গ্রহণ করা।" কিন্তু সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। কেননা, এ সংজ্ঞাটি বাকি মূল্যে সাধারণ বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এর সঠিক সংজ্ঞা হলো, بَيْعُ آجِلٍ بِعَاجِلٍ অর্থাৎ, "নগদ কোনো জিনিসের বিনিময়ে বাকি কোনো জিনিস বিক্রয় করা।"

'বায় সলম'-এর রোকন, হুকুম ও শর্ত :

রোকন : 'বায় সলম'-এর রোকন হলো, প্রস্তাব দেওয়া [ইজাব] ও প্রস্তাব গ্রহণ করা [কবুল]। যেমন– এক পক্ষ বলল, তুমি [আগামী অমুক মাসের এত তারিখে] ৫ মণ ধান দেবে সেজন্য আমি তোমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করলাম। অপর পক্ষ বলল, আমি তা গ্রহণ করলাম।

হুকুম : 'বায় সলম'-এর হুকুম বা বিধানগত ফলাফল হলো, মূলধন বা 'রা'সুল মাল-এর' মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর মাঝে অনির্দিষ্টভাবে [দাইন হিসেবে] দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] -এর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। অর্থাৎ দাদনগ্রহীতার নিকট দাদনদাতার বিক্রয়দ্রব্যটি অনির্দিষ্টরূপে পাওনা থাকবে। যখন তা হস্তগত করবে তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

শর্ত : 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে, সেগুলো মতভেদসহ মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

এ পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা :

১. "رَبُّ السَّلَمِ" [রাব্বুস সলম]– যে ব্যক্তি 'বায় সলম'-এর মাঝে চুক্তির ক্ষেত্রে মূল্য [দাদন] প্রদান করে। আমরা 'রাব্বুস সলম'-এর অনুবাদ 'দাদন দাতা' করেছি।

২. "مُسْلَمٌ إِلَيْهِ" [মুসলাম ইলাইহি]–যে ব্যক্তি বিক্রয়-দ্রব্য প্রদানের বিনিময়ে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করে। আমরা 'মুসলমান ইলাইহি' -এর অনুবাদ 'দাদনগ্রহীতা' করেছি।

৩. "رَأْسُ الْمَالِ" [রা'সুল মাল]–প্রদেয় অগ্রিম মূল্য বা মূলধন। আমরা 'রা'সুল মাল'-এর অনুবাদ 'মূলধন' করেছি।

৪. "مُسْلَمٌ فِيْهِ" [মুসলাম ফীহ]–যে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করা হয়েছে বা দাদনদ্রব্য। আমরা 'মুসলাম ফীহ'-এর অনুবাদ 'দাদনদ্রব্য' করেছি।

উদাহরণস্বরূপ–যায়েদ আমরের সাথে এই মর্মে বিক্রয়চুক্তি করল যে, যায়েদ এখন এক হাজার টাকা প্রদান করবে, আর তার বিনিময়ে আমর আগামী ফাল্গুন মাসে দশ মণ ধান দেবে, তাহলে যায়েদ হলো 'রাব্বুস সলম' বা দাদনদাতা, আমর হলো 'মুসলাম ইলাইহি' বা দাদনগ্রহীতা, উক্ত এক হাজার টাকা হলো 'রা'সুল মাল' বা মূলধন, আর দশ মণ ধান হলো 'মুসলাম ফীহ' বা দাদনদ্রব্য।

৫. "دَيْنٌ" [দাইন]–অনির্দিষ্ট পাওনা বস্তু। অর্থাৎ দাইন বলা হয় এমন পাওনা বস্তুকে যা নির্দিষ্ট নয়, যেমন– কারো নিকট অন্য ব্যক্তির কোনো বিক্রীতদ্রব্যের মূল্য হিসেবে দশ টাকা পাওনা আছে। এ ক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট কোনো দশ টাকা প্রদান করা

আবশ্যক নয়; বরং যে কোনো দশ টাকা প্রদান করতে পারবে। সুতরাং উক্ত পাওনা দশ টাকা 'দাইন' বা অনির্দিষ্ট পাওনা বস্তু। পক্ষান্তরে কেউ যদি নির্দিষ্ট এক মণ ধান বিক্রয় করে, তাহলে তার ঐ নির্দিষ্ট ধানই হস্তান্তর করা আবশ্যক। এরূপ নির্দিষ্ট বস্তুকে "عَيْن" [আইন] বা নির্দিষ্ট বস্তু বলা হয়।

এখানে জানা আবশ্যক যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসলাম ফীহ' বা দাদনদ্রব্য সর্বদা 'দাইন' বা অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে; কিন্তু সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়দ্রব্য 'আইন' বা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَلسَّلَمُ عَقْدٌ مَشْرُوْعٌ الخ :

'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার দলিল : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর বৈধতা কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনের দলিল হলো ঋণ লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত (اٰيَةُ الْمُدَايَنَةِ)। আয়াতটি হলো, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ (الاية) অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা পরস্পরে ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে উক্ত আয়াতটি 'সলফে মযমূন' তথা 'বায় সলম' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা 'সলফে মযমূন' তথা 'বায় সলম' হালাল করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবের দীর্ঘতম আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতটি তিলওয়াত করেছেন।

আর হাদীসের দলিল হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এই হাদীস–

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَ رَخَّصَ فِى السَّلَمِ .

অর্থাৎ, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দ্রব্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যা বিক্রেতার নিকট বিদ্যমান নেই। তবে তিনি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন।"

মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা আইনী (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত হলো এটি স্বতন্ত্র একটি হাদীস নয়; বরং দুটি হাদীসের সমন্বিত রূপ বা মুরাক্কাব। প্রথম অংশ 'যা মানুষের নিকট নেই তা বিক্রয় নিষেধ' সম্পর্কিত হাদীসটি সুনানে আরবায়ায় উল্লিখিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন হাদীসটি হাসান, সহীহ। আর দ্বিতীয় অংশ তথা 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া' সম্পর্কিত হাদীসটি বুখারী মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সব ক'টি গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِى التَّمَرِ لِلسَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ .

অর্থাৎ, "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [মদীনায়] আগমন করলেন, তখন জনগণ খেজুরের ক্ষেত্রে এক বছর, দুই বছর বা তিন বছর মেয়াদে 'বায় সলম' করত। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাপে বা নির্দিষ্ট ওজনে, নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে।" এছাড়া বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে–

قَالَ : اِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ .

অর্থাৎ "তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর যুগে গম, যব, খেজুর ও কিসমিসের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতাম।"

মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দুটি দলিল কুরআন ও হাদীস ছাড়া শরিয়তের তৃতীয় দলিল তথা উম্মতের ইজমা দ্বারাও 'বায় সলম'-এর বৈধতা প্রমাণিত। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত সর্বদা 'বায় সলম'-এর বৈধতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ وَاِنْ كَانَ يَابَاهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, কিয়াসের দাবি হচ্ছে 'বায় সলম' বৈধ না হওয়া। কিন্তু আমরা আমাদের উল্লিখিত হাদীসের কারণে কিয়াস পরিহার করেছি। কেননা, হাদীস ও কিয়াসের মাঝে যদি বিরোধ হয়, তাহলে কিয়াস পরিহার করতে হয়। কিয়াস অনুসারে 'বায় সলম' বৈধ না হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে যে দ্রব্যটি বিক্রয় করা হচ্ছে সেটি এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি। আর অবিদ্যমান বস্তু বিক্রয় জায়েজ নয়; বরং বিদ্যমান বস্তুও যদি মালিকানাধীন কিংবা হস্তান্তর করা বিক্রেতার সামর্থ্যের বাইরে হয়, তাহলে তা বিক্রয় জায়েজ নয়।

قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْمَكِيْلَاتِ وَالْمَوْزُوْنَاتِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ، وَالْمُرَادُ بِالْمَوْزُوْنَاتِ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ، لِأَنَّهُمَا أَثْمَانٌ، وَالْمُسْلَمُ فِيْهِ لَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ مُثْمَنًا، فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيْهِمَا، ثُمَّ قِيْلَ يَكُوْنُ بَاطِلًا، وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ تَحْصِيْلًا لِمَقْصُوْدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ، وَالْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ لِلْمَعَانِىْ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ التَّصْحِيْحَ إِنَّمَا يَجِبُ فِىْ مَحَلٍّ أَوْجَبَا الْعَقْدَ فِيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত ও ওজন দ্বারা পরিমাপিত যাবতীয় বস্তুতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বায় সলম করে, তাহলে সে যেন নির্ধারিত পাত্র ও নির্ধারিত ওজন ধার্য করে নির্ধারিত মেয়াদে 'বায় সলম' করে।" ইমাম কুদূরী (র.)-এর ইবারতে ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দিরহাম–দিনার ছাড়া অন্যান্য ওজন পরিমাপিত দ্রব্যসমূহ। কেননা, এ দুটি হচ্ছে 'সামান' [মূল্যদ্রব্য], অথচ 'মুসলাম ফীহ' [দাদনদ্রব্য] পণ্যদ্রব্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। [কেউ করে ফেললে সে ক্ষেত্রে] কারো কারো মতে এ বিক্রয়চুক্তি বাতিল হবে। আর কারো কারো মতে চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব কার্যকর করার জন্য এটা বাকি মূল্যে বিক্রয়চুক্তিরূপে সম্পাদিত হবে। কেননা, চুক্তির ক্ষেত্রে শব্দ নয় মর্মই ধর্তব্য। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা, [যথাসম্ভব] কার্যকর করা সে ক্ষেত্রেই আবশ্যক হয় যে ক্ষেত্রে তারা চুক্তি সাব্যস্ত করেছে। আর এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। [কেননা, দিরহাম-দিনার কখনও পণ্যদ্রব্য সাব্যস্ত হয় না। এ দুটি সৃষ্টি হয়েছে মূল্যদ্রব্য হিসেবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْمَكِيْلَاتِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বায় সলম' ওজন দ্বারা পরিমাপিত এবং পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে জায়েজ হবে। অর্থাৎ এগুলো 'বায় সলম'-এ দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হতে পারবে। কেননা, পূর্বে উল্লিখিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ .

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্রের পরিমাপে বা নির্দিষ্ট ওজনে নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে।" এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পাত্র দ্বারা পরিমাপিত এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَوْزُوْنَاتِ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু বলে উদ্দেশ্য হলো স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু। কেননা, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা মূলত মূল্যদ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়, যা নির্দিষ্ট করলেও [আদায়ের ক্ষেত্রে] নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না। অথচ 'বায় সলম'-এ দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] পণ্যদ্রব্য হওয়া আবশ্যক, যা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ দুটিকে 'বায় সলম'-এ দাদনদ্রব্য সাব্যস্ত করলে তা সহীহ হবে না।

আলোচ্য মাসআলাটির দুটি সূরত হতে পারে–

১. দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং মূলধন [রা'সুল মাল] উভয়টিই স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি সকলের ঐকমত্যে, বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ে যদি পণ্য ও মূল্য উভয়টি স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা হয়, তাকে 'বায় সরফ' বলে, আর 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় জায়েজ নয়; বরং উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য।

২. স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রাকে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং গম বা ধান মূল্যদ্রব্য [রা'সুল মাল] সাব্যস্ত করে চুক্তি করা। যেমন বলল, আমি একশত স্বর্ণমুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে নগদ দশ মণ গমের বিনিময়ে ক্রয় করলাম। এ ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' সহীহ হবে না, তবে চুক্তিটি গম বা ধানকে পণ্যদ্রব্য ধরে বাকি মূল্যে বিক্রয়চুক্তি হিসেবে সম্পাদিত হবে কিনা? তা নিয়ে ফিক্‌হবিদগণের মতবিরোধ রয়েছে। হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মতে চুক্তিটি সম্পূর্ণ বাতিল বলেই গণ্য হবে। আর হযরত আবূ বকর আল আ'মাশ (র.)-এর মতে চুক্তিটি বাকি মূল্যে সাধারণ বিক্রয় হিসেবে সহীহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদিও 'বায় সলম' হিসেবে স্বর্ণমুদ্রাকে পণ্যদ্রব্য সাব্যস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু গমকে পণ্যদ্রব্য এবং স্বর্ণমুদ্রাকে মূল্যদ্রব্য ধরে বাকি বিক্রয়চুক্তি সাব্যস্ত করা সম্ভব এবং তাই সাব্যস্ত করা হবে। কারণ, এখানে চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, একজন এখন গম বা ধান হস্তগত করবে, আর অপরজন পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করবে এবং তাদের এ উদ্দেশ্য উল্লিখিত উপায়ে অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। আর চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিরকারীর উদ্দেশ্যই ধর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসান্নিফ (র.) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে আবান (র.)-এর মতটিই অধিক সঠিক। কারণ, কোনো চুক্তিকে সঠিক সাব্যস্ত করতে হলে তা এমন স্থলে রেখেই সঠিক সাব্যস্ত করা আবশ্যক যে স্থলে চুক্তিকারীদ্বয় তা সাব্যস্ত করেছে। আর এখানে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, চুক্তিকারীদ্বয় এখানে স্বর্ণমুদ্রাকে বিক্রয়দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে। অথচ স্বর্ণমুদ্রা কখনও বিক্রয়দ্রব্য হতে পারে না। কেননা, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা সৃষ্টিগতভাবেই মূল্যদ্রব্য, যা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রয়দ্রব্য এমন বস্তু হওয়া আবশ্যক যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে হযরত আবূ বকর আ'মাশ (র.)-এর মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) আল-'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে তা সমর্থন করছেন।

قَالَ : وَكَذَا فِى الْمَذْرُوْعَاتِ، لِاَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا بِذِكْرِ الذَّرْعِ وَالصِّفَةِ وَالصَّنْعَةِ، وَلَابُدَّ مِنْهَا لِتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ، فَيَتَحَقَّقُ شَرْطُ صِحَّةِ السَّلَمِ، وَكَذَا فِى الْمَعْدُوْدَاتِ الَّتِى لَا يَتَفَاوَتُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ، لِاَنَّ الْعَدَدِىَّ الْمُتَقَارِبَ مَعْلُوْمٌ مَضْبُوْطُ الْوَصْفِ مَقْدُوْرُ التَّسْلِيْمِ، فَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْهِ. وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ سَوَاءٌ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ عَلٰى اِهْدَارِ التَّفَاوُتِ، بِخِلَافِ الْبِطِّيْخِ وَالرُّمَّانِ، لِاَنَّهُ يَتَفَاوَتُ اٰحَادُهُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَبِتَفَاوُتِ الْاٰحَادِ فِى الْمَالِيَّةِ يُعْرَفُ الْعَدَدِىُّ الْمُتَفَاوِتُ. وَعَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِىْ بَيْضِ النَّعَامَةِ، لِاَنَّهُ يَتَفَاوَتُ اٰحَادُهُ فِى الْمَالِيَّةِ ثُمَّ كَمَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْهَا عَدَدًا يَجُوْزُ كَيْلًا، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا يَجُوْزُ كَيْلًا : لِاَنَّهُ عَدَدِىٌّ، وَلَيْسَ بِمَكِيْلٍ، وَعَنْهُ اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ عَدَدًا اَيْضًا لِلتَّفَاوُتِ، وَلَنَا اَنَّ الْمِقْدَارَ مَرَّةً يُعْرَفُ بِالْعَدَدِ وَتَارَةً بِالْكَيْلِ، وَاِنَّمَا صَارَ مَعْدُوْدًا بِالْاِصْطِلَاحِ فَيَصِيْرُ مَكِيْلًا بِاِصْطِلَاحِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, এ সকল বস্তুর গজের পরিমাণ গুণাগুণ ও শিল্পের ধরন উল্লেখের মাধ্যমে তার পরিচয় নির্ধারণ করা সম্ভব। আর এগুলো উল্লেখ করা অপরিহার্য যাতে অস্পষ্টতা দূর হয়ে 'বায় সলম' বৈধ হওয়ার শর্ত বাস্তবায়িত হয়। এরূপভাবে বেশি তারতম্যপূর্ণ নয় এমন গণনা-প্রচলিত বস্তুর মাঝেও 'বায় সলম' জায়েজ। যেমন– আখরোট ও ডিম। কেননা, প্রায় একই পরিমাপের গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহের পরিমাপ জ্ঞাত, তার গুণাগুণ নির্ধারণযোগ্য এবং তা সমর্পণ করা সম্ভব। সুতরাং তাতে 'বায় সলম' বৈধ হবে। এগুলোর মধ্য ছোট-বড় সমান। কেননা, লোক প্রচলনে এগুলোর পার্থক্য ধর্তব্য হয় না। পক্ষান্তরে তরমুজ ও আনারের হুকুম ভিন্ন [তাতে 'বায় সলম' বৈধ নয়]। কেননা, এর পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। আর পারস্পরিক মূল্যের তারতম্যের দ্বারাই গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহ তারতম্যপূর্ণ বলে বুঝা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, উটপাখির ডিমের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, মূল্যের ক্ষেত্রে এগুলোর এক একটির মাঝে পার্থক্য হয়। অতঃপর গণনা-প্রচলিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে যেমন 'বায় সলম' জায়েজ হবে, তেমনি পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও জায়েজ হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো গণনা-প্রচলিত বস্তু– পাত্র দ্বারা পরিমাপিত বস্তু নয়। তাঁর পক্ষ থেকে এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলোতে গণনার ভিত্তিতেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলোর পরস্পরের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। আমাদের দলিল হলো, পরিমাপ কখনও গণনা দ্বারা জানা যায়, আবার কখনও পাত্র দ্বারা জানা যায়। তবে জন-প্রচলনে এগুলো গণনা নির্ভর হয়েছে। সুতরাং তাদের দু জনের পরিভাষায় তা পাত্র পরিমাপিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا فِى الْمَذْرُوْعَاتِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যেরূপ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ, তদ্রূপ গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) এ বিধানের দলিল বর্ণনা করছেন যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এমনভাবে সুস্পষ্ট করে নির্ধারণ করা, যাতে বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। আর এটা গজ দ্বারা পরিমাপিত বস্তুর ক্ষেত্রেও সম্ভব। কেননা, কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিকে কত গজ হবে, কাপড়টি উৎকৃষ্টমানের হবে নাকি নিকৃষ্টমানের হবে এবং কোন শিল্পের হবে? এ তিনটি বিষয় উল্লেখ করলে কাপড়টি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজেই সহীহ হওয়ার শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এরূপভাবে যে সকল দ্রব্য গণনা করে বিক্রয় হয়, সেগুলো যদি মূল্যের দিক থেকে পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ না হয়। অর্থাৎ ছোট বড় হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝে কোনো তারতম্য না হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। যেমন– ডিম বা আখরোট [ফল]। কারণ, যে সকল গণনা-প্রচলিত দ্রব্য কাছাকাছি আকারের এবং তার মূল্যের মাঝে কোনো তারতম্য হয় না, সেগুলোর পরিমাণ ও গুণাগুণ সুস্পষ্ট করা সম্ভব এবং তা হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হবে না। আর এটাই হলো 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত। কাজেই শর্তের উপস্থিতির কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। এগুলোর ক্ষেত্রে ছোট বড় এক সমান বলেই গণ্য হবে। কেননা, জনগণ এগুলোর ছোট বড়-এর পার্থক্য ধর্তব্য মনে করে না। যেমন– মুরগির ডিম। কোনোটি একটু ছোট হয় আবার কোনোটি একটু বড় হয়, কিন্তু জনগণ উভয়টি একই মূল্যে ক্রয় করে। সুতরাং বুঝা যায় এগুলোর পার্থক্য ধর্তব্য নয়। মূল্যের ক্ষেত্রে সবই সমান।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে তরমুজ বা আনারে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, মূল্যের দিক থেকে এগুলো পার্থক্যপূর্ণ হয়। যদি ছোট হয় তাহলে মূল্যও কম হয়, আর যদি বড় হয় তাহলে মূল্যও বেশি হয়। কাজেই সুস্পষ্টরূপে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। সারকথা, গণনা-প্রচলিত দ্রব্য যদি মূল্যের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা পার্থক্যপূর্ণ দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর যদি মূল্যের দিক থেকে পার্থক্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তা পার্থক্যপূর্ণ দ্রব্য বলে গণ্য হবে না এবং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

উটপাখির ডিম সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ হলো, উটপাখির ডিম ছোট বড় হলে তার মূল্যও কমবেশি হয়। কাজেই পূর্ববর্ণিত মূলনীতি অনুসারে তা পার্থক্যপূর্ণ গণনা-প্রচলিত দ্রব্য। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ كَمَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْهَا عَدَدًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সকল গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ, তাতে যেরূপ গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা বৈধ তদ্রূপ তাতে পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও 'বায় সলম' করা বৈধ হবে। যেমন– কেউ যদি ডিম বা আখরোট [ফল] গণনার ভিত্তিতে বিক্রয় না করে এভাবে 'বায় সলম' করে যে, সে নির্দিষ্ট পাত্রের দশ পাত্র ডিম হস্তান্তর করবে, তাহলে এরূপ 'বায় সলম'ও জায়েজ হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন, এরূপ গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, এগুলো পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য নয়। কাজেই পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে তার 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। অপর একটি বর্ণনায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এরূপ দ্রব্যে অর্থাৎ যা কিছুটা ছোট-বড় হয় কিন্তু মূল্যের মাঝে তারতম্য হয় না, তাতে গণনার ভিত্তিতেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না এবং পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতেও জায়েজ হবে না। কারণ, তাতে তারতম্য রয়েছে। কাজেই তারতম্য কম হোক বা বেশি হোক তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল হলো, কোনো দ্রব্যের পরিমাণ কখনও গণনার দ্বারা নির্ণয় করা হয়, আবার কখনও পাত্র দ্বারা মেপে নির্ণয় করা হয়। আর গণনা-প্রচলিত দ্রব্যসমূহ গণনা-নির্ভর হয়েছে কেবল জন-প্রচলনের মাধ্যমে, শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণের মাধ্যমে নয়। কাজেই যখন চুক্তিকারীদ্বয় পাত্র-পরিমাপের ভিত্তিতে চুক্তি করবে, তখন গণনা-প্রচলিত দ্রব্যও তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে তাদের সমঝোতার কারণে পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য বলে বিবেচিত হবে।

وَكَذَا فِى الْفُلُوْسِ عَدَدًا ، وَقِيْلَ هٰذَا عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) لَا يَجُوْزُ ، لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ ، وَلَهُمَا أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِىْ حَقِّهِمَا بِاصْطِلَاحِهِمَا فَيَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا ، وَلَا تَعُوْدُ وَزْنِيًّا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ .

অনুবাদ : এরূপভাবে ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রেও গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো হচ্ছে মূল্যদ্রব্য [অথচ 'বায় সলম' জায়েজ হয় পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে]। শায়খাইনের দলিল হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে এগুলো মূল্যদ্রব্য হওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল তাদের পরিভাষার মাধ্যমে। সুতরাং তাদের পরিভাষার মাধ্যমে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। তবে মূল্যদ্রব্য হওয়া বাতিল হওয়ার ফলে তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তুতে ফিরে যাবে না। এর কারণ আমরা ইতোপূর্বে রিবা'-এর পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَا فِى الْفُلُوْسِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব-মুদ্রা গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে। অর্থাৎ ধাতব-মুদ্রাকে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ] সাব্যস্ত করা যাবে। স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিধান এবং ধাতব-মুদ্রার বিধান এ ক্ষেত্রে এক নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর জামিউস সাগীর গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই কোনো মতবিরোধের কথা উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুঝা যায়, ধাতব-মুদ্রা গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) ঐকমত্য রয়েছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিন্তু কোনো কোনো ফিকহবিদ উল্লেখ করেছেন যে, এটা কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ধাতব-মুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পক্ষে দলিল হলো, ধাতব-মুদ্রাও [স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার ন্যায়] মূল্যদ্রব্য (ثَمَنٌ) আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূল্যদ্রব্যসমূহ 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে বিক্রেয়দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হতে পারবে না। কাজেই ধাতব-মুদ্রা 'বায় সলম' হিসেবে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর পক্ষে দলিল হলো, প্রচলনের মাধ্যমে। কাজেই চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হবে যদি তারা মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত করে। সুতরাং যখন তারা এটাকে দাদনদ্রব্য তথা বিক্রেয়দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে তখন তাদের ক্ষেত্রে এটা মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে সাধারণ দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। ফলে অন্যান্য সাধারণ দ্রব্যের ন্যায় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَعُوْدُ وَزْنِيًّا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ধাতব-মুদ্রা মুদ্রা হিসেবে প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে তা পিতল বা অন্য কোনো ধাতব খণ্ড ছিল। আর তা ছিল ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য। কিন্তু যখন মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত হয়েছে তখন তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত মাসআলায় যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা হওয়া বাতিল হয়ে সাধারণ দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহলে তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য না হয়ে পুনরায় ওজন-প্রচলিত দ্রব্যে পরিণত হওয়া উচিত। কেননা, তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হয়েছিল মুদ্রা হওয়ার পরে। সুতরাং তা যদি মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত না হয়, তাহলে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেও সাব্যস্ত হবে না। আর গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবে যদি সাব্যস্ত না হয়, তাহলে তা গণনার ভিত্তিতে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কথা।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদন-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হওয়ার জন্য মুদ্রা না হওয়া শর্ত, কিন্তু গণনা-প্রচলিত দ্রব্য না হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন তা দাদন-দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে, তখন বুঝা যাচ্ছে যে তারা এর মুদ্রা হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে, কিন্তু এর গণনা-প্রচলিত হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে না। কাজেই তার মুদ্রা হওয়া বাতিল হবে, গণনা-নির্ভর হওয়া বাতিল হবে না। চুক্তিকারীদ্বয়ের বিমুখতা প্রকাশ না পাওয়ায় প্রচলনের কারণে তা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য হিসেবেই বহাল থেকে যাবে।

উপরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করা হলো, কোনো কোনো ফিক্‌হবিদ যে বলেছেন আলোচ্য মাসআলায় তাঁদের মতবিরোধ রয়েছে তার ভিত্তিতে। অন্যথায় জামিউস সাগীরের বর্ণনা মোতাবেক মাসআলাটি তাঁদের সর্বসম্মত অভিমত। এটাই জাহিরে রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ) এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। তবে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো, 'রিবা'র অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি ধাতব-মুদ্রার বিনিময়ে দুটি ধাতব-মুদ্রা বিক্রয় করা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ নয়। সেখানে মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল বর্ণনা করেছেন যে, যখন জন-প্রচলনে তা মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন চুক্তিকারীদ্বয়ের পরিভাষায় তা মুদ্রা হওয়া বাতিল হবে না। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, জাহিরে রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ) অনুসারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে কিভাবে তা মুদ্রা হওয়া বাতিল হবে। এ প্রশ্নের জবাব হলো, 'বায় সলম' এ বিক্রেয়দ্রব্য হওয়ার জন্য মুদ্রা না হওয়া শর্ত, কিন্তু সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেয়দ্রব্য হওয়ার জন্য মুদ্রা না হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন 'বায় সলম' করছে তখন বুঝা যাবে যে, তারা এর মুদ্রা হওয়ার ব্যাপারে বিমুখতা প্রকাশ করছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে তা বুঝা যাবে না। তাই 'বায় সলম'-এ মুদ্রা হওয়া বাতিল হবে, কিন্তু সাধারণ বিক্রয়ে বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ : অর্থাৎ মুদ্রা হওয়া বাতিল সাব্যস্ত হওয়ার মতবিরোধ এবং মুদ্রা সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও তা ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যে পরিণত না হওয়ার কারণ আমরা ইতোপূর্বে [রিবা'র অধ্যায়ে মূল গ্রন্থের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ -এর অধীনে] উল্লেখ করেছি।

وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْحَيَوَانِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجُوْزُ، لِأَنَّهُ يَصِيْرُ مَعْلُوْمًا بِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالسِّنِّ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَالتَّفَاوُتُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَسِيْرٌ، فَأَشْبَهَ الثِّيَابَ . وَلَنَا أَنَّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا ذُكِرَ يَبْقٰى فِيْهِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فِى الْمَالِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْمَعَانِى الْبَاطِنَةِ، فَيُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، بِخِلَافِ الثِّيَابِ، لِأَنَّهُ مَصْنُوْعٌ لِلْعِبَادِ، فَقَلَّمَا يَتَفَاوَتُ الثَّوْبَانِ إِذَا نُسِجَا عَلٰى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ السَّلَمِ فِى الْحَيَوَانِ، وَيَدْخُلُ فِيْهِ جَمِيْعُ أَجْنَاسِهِ حَتَّى الْعَصَافِيْرُ.

অনুবাদ : জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জায়েজ হবে। কেননা, জীব-জন্তুর শ্রেণী, বয়স, প্রকার ও গুণাগুণ উল্লেখ করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরপর যে পার্থক্য থাকে তা সামান্য। সুতরাং এগুলো কাপড়সামগ্রীর মতো [অতএব, কাপড়সামগ্রীতে যেমনিভাবে 'বায় সলম' জায়েজ, তেমনিভাবে এগুলোর ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে]। আমাদের দলিল হলো, উল্লিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করার পরও অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের কারণে এগুলোতে মূল্যের দিক থেকে অনেক পার্থক্য থেকে যায়। কাজেই তা বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। পক্ষান্তরে কাপড়সামগ্রীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা মানুষের তৈরি। সুতরাং দুটি কাপড় যদি একই পদ্ধতিতে বয়ন করা হয়, তাহলে তাতে খুব সামান্যই পার্থক্য থাকে। আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতে নিষেধ করেছেন। সকল প্রকার জীব-জন্তু এমনকি চড়ুইপাখিও তাঁর এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْحَيَوَانِ الخ জীব-জন্তু ও দাস-দাসী 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে জীব-জন্তু ও দাস-দাসীর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। আর হানাফী ইমামগণের মতে তা জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) [এবং ইমাম আহমাদ ও ইমাম মালেক (র.)]-এর পক্ষে আকলী ও নকলী উভয় প্রকারের দলিল পেশ করা হয়। মুসান্নিফ (র.) কেবল আকলী দলিল পেশ করেছেন। তা হলো, জীব-জন্তু ও দাস দাসীর শ্রেণী যেমন– উট বা গরু, তার বয়স যেমন– দ্বিবর্ষী উট বা পঞ্চবর্ষী উট, তার গুণাগুণ, যেমন– মোটাতাজা বা মাঝারি ধরনের বা শীর্ণকায় ও তার প্রকার যেমন– আরবীয় উট বা অনারবীয় উট ইত্যাদি উল্লেখ করলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এরপর যে তারতম্য থাকে তা খুবই সামান্য যা বিবাদের সৃষ্টি করে না। কাজেই 'বায় সলম'-এর শর্ত– দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-কে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি না করে– এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকার কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে এগুলো কাপড়ের অনুরূপ। কেননা, কাপড়ের গুণাগুণ, প্রকার ইত্যাদি উল্লেখ করার পরও তাতে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তা সত্ত্বেও কাপড়ে 'বায় সলম' সর্বসম্মতভাবে জায়েজ। কাজেই জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তা জায়েজ হবে।

তাঁদের নকলী দলিল হলো, আবূ দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْاِبِلُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّاْخُذَهُ عَلٰى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَاْخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ .

অর্থাৎ, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি সেনাদলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। তখন উটের ঘাটতি দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন যে, মানুষের কাছ থেকে যেন তিনি উট গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, জাকাতের উট আসলে তা থেকে তার বিনিময় পরিশোধ করা হবে। আর তিনি জাকাতের উট আসার সময়ের মেয়াদে দুটি উটের বিনিময়ে একটি উট গ্রহণ করতেন।" এ হাদীসে উল্লিখিত নগদ যে একটি উট গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে তা 'বায় সলম' হিসেবে মূলধন [রা'সুল মাল] আর পরবর্তীতে যে দুটি উট পরিশোধের কথা বলা হয়েছে তা দাদনকৃত-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। কাজেই হাদীসটিতে প্রাণীর ক্ষেত্রে 'বায় সলম'-এর বৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের পক্ষে মুসান্নিফ (র.) আকলী এবং নকলী উভয় প্রকার দলিল পেশ করেছেন। আকলী দলিল হলো, জীব-জন্তু ও দাস-দাসীর ক্ষেত্রে শ্রেণী, গুণাগুণ, বয়স ও প্রকার উল্লেখ করার পরও তাতে মূল্যের দিক থেকে অনেক তারতম্য থেকে যায়। আর এ তারতম্য হয় এগুলোর আভ্যন্তরীণ গুণাগুণের কারণে। কারণ, দেখা যায় দুটি দাস একই বয়সের ও একই দেশের হওয়া সত্ত্বেও তাদের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতার পার্থক্যের কারণে মূল্যের মাঝে অনেক ব্যবধান হয়। সুতরাং যখন মূল্যের দিক থেকে তারতম্য থেকে যাচ্ছে তখন হস্তান্তরের সময় তাতে বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

আর তাঁরা যে জীব-জন্তু ও দাস-দাসীকে কাপড়ের সাথে কিয়াস করেছেন তাঁদের এ কিয়াস যথার্থ নয়। কারণ, কাপড় হচ্ছে মানুষের তৈরি। আর এক শিল্পে তৈরি একই ধরনের দুটি কাপড়ের মাঝে খুব কমই তারতম্য থাকে এবং সে তারতম্যের কারণে মূল্যের মাঝে ব্যবধান হয় না, ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে প্রাণী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। একই বয়সের একই ধরনের দুটি পশু বা দুটি দাসের মাঝে মূল্যের দিক থেকে পার্থক্য হয়। কাজেই উক্ত কিয়াস সঠিক নয়।

আমাদের নকলী দলিল হলো, মুসতাদরাকে হাকিম ও সুনানে দারাকুতনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّلَفِ فِى الْحَيَوَانِ .

অর্থাৎ, "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতে নিষেধ করেছেন।" এছাড়া সহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে দারাকুতনী, মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও সুনানে বাযযার গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً .

অর্থাৎ "হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

তাঁদের বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো, হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটি সম্পর্কে হযরত ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান (র.) বলেছেন– ضَعِيْفٌ مُضْطَرِبُ الْاِسْنَادِ "হাদীসটি দুর্বল এবং এর সনদের মাঝে ইযতিরাব রয়েছে।" পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। ইমাম বাযযার (র.) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, لَيْسَ فِى الْبَابِ اَجَلُّ اِسْنَادًا مِنْ هٰذَا "প্রাণী বাকি বিক্রয় সংক্রান্ত হাদীসের মাঝে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী সনদের কোনো হাদীস নেই।" কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের বর্ণিত হাদীসটি রিবা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। রিবা সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।– [ফতহুল কাদীর ও আইনী]

قَالَ : وَلَا فِيْ أَطْرَافِهِ كَالرُّؤُوْسِ وَالْاَكَارِعِ لِلتَّفَاوُتِ فِيْهَا، إِذْ هُوَ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ لَا مُقَدَّرَ لَهَا، قَالَ : وَلَا فِي الْجُلُوْدِ عَدَدًا وَلَا فِي الْحَطَبِ حَزْمًا وَلَا فِي الرُّطَبَةِ جَرْزًا لِلتَّفَاوُتِ، إِلَّا إِذَا عُرِفَ ذٰلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ لَهُ طُوْلَ مَا يُشَدُّ بِهِ الْحُزْمَةُ أَنَّهُ شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ، إِذَا كَانَ عَلٰى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জীব-জন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না; যেমন এগুলোর মাথা ও পা। কেননা, এগুলোতেও পার্থক্য রয়েছে। কারণ, এগুলো তারতম্যপূর্ণ গণনা-নির্ভর বস্তু, যার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চামড়ার ক্ষেত্রে গণনার ভিত্তিতে এবং লাকড়ির ক্ষেত্রে আঁটির ভিত্তিতে এবং তাজা ঘাসের ক্ষেত্রেও আঁটির ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, এগুলোর মাঝেও তারতম্য রয়েছে। তবে যদি এগুলোর পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করা যায় যেমন 'মুসলাম ইলাইহি' [দাদনগ্রহীতা]-কে আঁটি বাঁধার রশির দৈর্ঘ্য বর্ণনা করে দেওয়া হলো যে, এক বিঘত বা এক হাত হতে হবে, তাহলে এগুলোতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে, যদি এমনভাবে হয় যাতে তারতম্যপূর্ণ না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا فِيْ أَطْرَافِهِ كَالرُّؤُوْسِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন– মাথা বা পা–এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলো বিক্রয় হয় গণনার ভিত্তিতে। আর এগুলোর মাঝে মূল্যের দিক থেকে অনেক তারতম্য হয়। ছোট হলে তার মূল্যও কম হয়, আর বড় হলে তার মূল্যও বেশি হয়। তার সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই গণনার ভিত্তিতে এগুলোতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর এগুলোতে ওজনের ভিত্তিতে যদি 'বায় সলম' করে, তবে এক রেওয়ায়েত অনুসারে তা জায়েজ হবে। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ রেওয়ায়েতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا فِي الْجُلُوْدِ عَدَدًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এরূপভাবে প্রাণীর চামড়ায়ও গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, চামড়ার মাঝে অনেক তারতম্য থাকে কোনোটি মোটা হয়, কোনোটি পাতলা হয়। আবার কোনোটি অধিক চর্বিযুক্ত হয় আর কোনোটি অল্প চর্বিযুক্ত হয়। আর এ তারতম্যের কারণে তার মূল্যের মাঝেও পার্থক্য হয়। কাজেই তা হস্তান্তরকালে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। অতএব, তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। তবে যদি এমন বিষয় উল্লেখ করে যাতে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে জায়েজ হবে। যেমন– সংখ্যার উল্লেখের সাথে এটাও উল্লেখ করল যে, চামড়ার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কতটুকু হবে, তা কতটুকু পুরু হবে।

قَوْلُهُ وَلَا فِي الْحَطَبِ حَزْمًا وَلَا فِي الرُّطَبَةِ جَرْزًا الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, লাকড়ি ও তাজা ঘাসের ক্ষেত্রে আঁটির ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ নয়। কেননা, আঁটি ছোট বড় হয় এবং আঁটি ছোট বা বড় হলে তার মূল্যের মাঝে ব্যবধান হয়। কাজেই হস্তান্তরের সময় তা বিবাদ সৃষ্টির কারণ হবে। কিন্তু যদি আঁটি কতটুকু এবং কিরূপ হবে তা এমনভাবে নির্দিষ্ট করে যে তাতে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে জায়েজ হবে। যেমন– বলে দিল যে, যে রশি বা ফিতা দ্বারা আঁটি বাঁধা হবে তা এক গজ লম্বা হবে কিংবা দুই গজ লম্বা হবে। আর লাকড়িগুলো এক হাত লম্বা হবে কিংবা দু হাত লম্বা হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ حَتّٰى يَكُوْنَ الْمُسْلَمُ فِيْهِ مَوْجُوْدًا مِنْ حِيْنِ الْعَقْدِ إِلٰى حِيْنِ الْمَحَلِّ، حَتّٰى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ مَوْجُوْدًا عِنْدَ الْمَحَلِّ اَوْ عَلَى الْعَكْسِ اَوْ مُنْقَطِعًا فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَجُوْزُ إِذَا كَانَ مَوْجُوْدًا وَقْتَ الْمَحَلِّ لِوُجُوْدِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيْمِ حَالَ وُجُوْبِهِ، وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا تُسْلِفُوْا فِي الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيْمِ بِالتَّحْصِيْلِ فَلَابُدَّ مِنْ اِسْتِمْرَارِ الْوُجُوْدِ فِيْ مُدَّةِ الْأَجَلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّحْصِيْلِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত যদি 'মুসলাম ফীহ' [বা দাদনকৃত দ্রব্য বাজারে] বিদ্যমান না থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। সুতরাং যদি চুক্তি সম্পাদনের সময় অবিদ্যমান থাকে আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে অথবা এর বিপরীত হয় অথবা উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে অবিদ্যমান থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, যখন তার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব হবে তখন সে হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে। আমাদের দলিল হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী– "যতক্ষণ পর্যন্ত ফলফলাদির উপযুক্ততা প্রকাশ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে 'বায় সলম' করো না।" তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ হলো, সংগ্রহ করার মাধ্যমে হস্তান্তর করার সক্ষমতা প্রকাশ পায়। সুতরাং মেয়াদের পূর্ণ সময়ে 'মুসলাম ফীহ' [দাদনকৃত-দ্রব্য]-এর বিদ্যমানতা অব্যাহত থাকা অপরিহার্য, যাতে [তার সুযোগ অনুসারে যে কোনো সময়] তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ حَتّٰى يَكُوْنَ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার শর্ত হলো, দাদনকৃত-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] চুক্তি করার সময় থেকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত [বাজারে] বিদ্যমান থাকতে হবে। অর্থাৎ দাদনকৃত-দ্রব্য চুক্তি করার সময়ও বাজারে বিদ্যমান থাকতে হবে, অতঃপর মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়ও তা বাজারে বিদ্যমান থাকতে হবে এবং মধ্যবর্তী সময়ও বিদ্যমান থাকতে হবে। সুতরাং যদি এমন হয় যে, চুক্তি করার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল না, অথবা মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু চুক্তির সময় বিদ্যমান ছিল না কিংবা চুক্তির সময় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মধ্যবর্তী সময় তা বাজারে পাওয়া যেত না, তাহলে উক্ত তিন সুরতেই 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শর্ত হলো, কেবল মেয়াদ পূর্তির সময় তা বাজারে বিদ্যমান থাকা। কাজেই যদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা চুক্তি করার সময় তা বাজারে বিদ্যমান না থাকে, তাহলেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে মুসান্নিফ (র.) শুধু আকলী দলিল পেশ করেছেন। দলিলটি হলো, দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকা শর্ত হয়েছে কেবল এজন্য যে, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] যাতে উক্ত দ্রব্য হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়। আর হস্তান্তর করা তার উপর ওয়াজিব হবে মেয়াদ পূর্তির সময়। কাজেই মেয়াদ পূর্তির সময় তা বিদ্যমান থাকলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতে আমাদের উল্লিখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন লোকদেরকে দেখতে পান তারা এক বছর, দু বছর ও তিন বছর মেয়াদের ভিত্তিতে ফলের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করছে। তখন তিনি তাদেরকে 'বায় সলম' -এর শর্ত জানিয়ে দিলেন। তিনি তাতে কেবল পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং শর্তসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে যা তিনি উল্লেখ করেননি তা শর্ত না হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

আমাদের পক্ষে মুসান্নিফ (র.) নকলী ও আকলী উভয় প্রকার দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল হলো, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস। হাদীসটির শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন– وَلَا تُسْلِمُوا فِىْ نَخْلٍ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ "তোমরা খেজুরের উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তাতে 'বায় সলম' কর না"। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু মেয়াদ পূর্তির সময় বিদ্যমান থাকা যথেষ্ট নয়; বরং চুক্তির সময়ই তা বিদ্যমান থাকতে হবে। তবে হাদীসটির সনদের মাঝে একজন অজ্ঞাত পরিচয় [মাজহুল] ব্যক্তি থাকায় হাদীসটি দুর্বল। শক্তিশালী হাদীস হলো, বুখারীতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَصْلُحَ .

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করতে বিষেধ করেছেন"। এ হাদীসটিতে 'বায় সলম' -এর কথা উল্লেখ না থাকলেও 'বায় সলম' উক্ত নিষেধের আওতাভুক্ত। এর প্রমাণ হলো, বুখারী হযরত শরীফে আবুল বুখতারী থেকে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ .

এ হাদীসটির সারমর্ম হচ্ছে, হযরত আবুল বুখতারী খেজুরের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তাঁরা উভয়ে বলেছেন, হুজুর ﷺ খেজুরের [খাওয়ার] উপযুক্ততা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো অগাধ ইলমের অধিকারী সাহাবীদ্বয়ও 'বায় সলম'-কে হুজুর ﷺ -এর উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত মনে করেছেন। সুতরাং দাদনকৃত -দ্রব্য জনসমাজে বিদ্যমান হওয়ার পূর্বে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না, এটা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আমাদের আকলী দলিল হলো, দাদনগ্রহীতা দাদনকৃত-দ্রব্য হস্তান্তর করতে সক্ষম হওয়ার জন্য তা অর্জন করা জরুরি। আর অর্জন করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। অতএব, চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত সর্বদা তা জনসমাজে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, যাতে সে অল্প অল্প করে একাধিক বারে তা সংগ্রহ করে নিতে পারে। কেননা– সর্বক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা মেয়াদ-পূর্তির সময় একবারে দাদনকৃত-দ্রব্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। যেমন– যে ব্যক্তি শুটকির ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করেছে সে অল্প অল্প করে মাছ ধরে কিংবা ক্রয় করে তা শুটকি করে সংগ্রহ করে রাখে। এরূপভাবে যে চামড়ার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করেছে সে মেয়াদের পূর্ণ সময়ে জবাইকৃত পশুর চামড়া সংগ্রহ করে রেখে তা হস্তান্তর করে। একদিনে সে সকল পশু জবাই করে না। সুতরাং মেয়াদের পূর্ণ সময়ে দাদনকৃত-দ্রব্য বিদ্যমান থাকার দ্বারা দাদনগ্রহীতার সক্ষমতা প্রকাশ নেবে। তাই পূর্ণ সময়ে তা বিদ্যমান থাকা 'বায় সলম'-এর জন্য শর্ত।

وَلَوْ اِنْقَطَعَ بَعْدَ الْمَحِلِّ فَرَبُّ السَّلَمِ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ فَسَخَ السَّلَمَ وَاِنْ شَاءَ اِنْتَظَرَ وُجُوْدَهُ ، لِاَنَّ السَّلَمَ قَدْ صَحَّ ، وَالْعَجْزُ الطَّارِئُ عَلٰى شَرَفِ الزَّوَالِ ، فَصَارَ كَاِبَاقِ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .

অনুবাদ : আর যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর অবিদ্যমান হয়, তাহলে 'রব্বুস সলম' [দাদনদাতা] -এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে সলমের চুক্তি প্রত্যাহার করবে আবার ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি বিদ্যমান হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। কেননা, 'সলম'-এর চুক্তি [শর্ত মোতাবেক হওয়ার কারণে] সঠিক হয়েছিল, আর উদ্ভূত অক্ষমতা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনার মুখে রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি অধিকারে নেওয়ার পূর্বে বিক্রীত গোলাম পালিয়ে যাওয়ার মতো হলো [অতএব, বিধানও একই রকম হবে, অর্থাৎ চুক্তি বহাল থাকবে কিন্তু ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اِنْقَطَعَ بَعْدَ الْمَحِلِّ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বাজারে বিদ্যমান থাকা। এখন বর্ণনা করা হচ্ছে, যদি এমন হয় যে, চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ আসা পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্য বাজারে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মেয়াদ পূর্তির পর হস্তান্তরের পূর্বে তা আর পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] -এর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেবে আবার ইচ্ছা করলে উক্ত দ্রব্য বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে না, দাদনদাতা চাইলে তা বহাল থাকবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.)-এর মতে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও তাই এবং ইমাম কারখী (র.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এরূপ। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, যেহেতু হস্তান্তর করার পূর্বে দাদনগ্রহীতা দ্রব্যটি হস্তান্তর করতে অপারগ হয়ে গেছে, সেহেতু চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমনিভাবে সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রীত-দ্রব্য বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি সকলের ঐকমত্যে বাতিল হয়ে যায়।

আমাদের দলিল হলো, মেয়াদ পর্যন্ত দাদনকৃত-দ্রব্যটি বিদ্যমান থাকার কারণে চুক্তিটি সহীহ হয়ে গেছে। আর এখন যে দাদনগ্রহীতা অপারগ হয়ে গেছে তার কারণটি চুক্তি সহীহ হওয়ার পর নব্য সৃষ্ট, যা পরে আবার দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা, পরে যখন তা পুনরায় বাজারে আসবে তখন তার অপারগতা দূর হয়ে যাবে। কাজেই চুক্তিটি বহাল থাকবে, বাতিল বলে গণ্য হবে না। যেমন– কেউ যদি গোলাম বিক্রয় করে অতঃপর হস্তান্তরের পূর্বেই গোলামটি পলায়ন করে, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় না; বরং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকে। ক্রেতা ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে গোলাম ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। সুতরাং এখানের বিধানও তদ্রূপ হবে। অর্থাৎ দাদনদাতা ইচ্ছা করলে 'বায় সলম'-এর চুক্তি বাতিল করবে আবার ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি পুনরায় বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলের জবাব হলো, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার বিষয় এবং 'বায় সলম' -এর অপারগতার বিষয়টি এক নয়। কারণ, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্যটি নির্দিষ্ট। কাজেই তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে চুক্তির ক্ষেত্র (مَحَلّ) অবশিষ্ট নেই, তাই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব। কাজেই সাময়িক অপারগতার কারণে চুক্তির ক্ষেত্র (مَحَلّ) বিনষ্ট হয়ে যায়নি। কাজেই চুক্তি বহাল থাকবে।

قَالَ : وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ وَزْنًا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا ، لِأَنَّهُ مَعْلُومُ الْقَدْرِ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ ، إِذْ هُوَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَدَدًا لِلتَّفَاوُتِ -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট প্রকারের ভিত্তিতে লবণমিশ্রিত [শুটকি] মাছে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং তার গুণাগুণ নির্ধারিত এবং তা সমর্পণ করাও ক্ষমতার আওতাভুক্ত। কেননা, তা [বাজার থেকে] অবিদ্যমান হয়ে যায় না। তবে এগুলোতে গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' বৈধ হবে না; কেননা, এগুলোর মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الخ : এখানে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, লবণমিশ্রিত শুকনো মাছ তথা শুটকি মাছের যদি প্রকার নির্দিষ্ট করা হয় [যেমন– চিংড়ি মাছের শুটকি বা পুঁটি মাছের শুটকি] এবং ওজনের ভিত্তিতে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, শুটকি মাছ এমন দ্রব্য যার পরিমাণ ও গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। আর তা হস্তান্তর করার সক্ষমতা অর্জন করাও সম্ভব। কেননা, শুটকি মাছ সারা বছরই বিদ্যমান থাকে। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে দ্রব্য এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব যে, তাতে অস্পষ্টতা থাকে না এবং বিবাদের সৃষ্টি না হয় ও হস্তান্তর করা সম্ভবপর হয়, তাতে 'বায় সলম' করা জায়েজ। সুতরাং শুটকি মাছে 'বায় সলম' করা জায়েজ হবে। কিন্তু গণনার ভিত্তিতে শুটকি মাছে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। যেমন কেউ বলল, অমুক প্রকারের মাছ থেকে একশত শুটকি মাছ দেব, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কারণ, মূল্যের দিক থেকে মাছের মাঝে অনেক তারতম্য হয়। যেমন– কোনো মাছ ছোট হয়, আবার কোনোটি বড় হয়। আর ছোট বড় হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, যে দ্রব্যের মাঝে তারতম্য থাকে এবং সেই তারতম্যের কারণে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে সে দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। অতএব, শুটকি মাছে গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

শব্দ-বিশ্লেষণ : اَلسَّمَكُ الْمَالِحُ – লবণ মিশ্রিত শুকানো মাছ তথা শুটকি মাছ। উল্লেখ্য যে, আল-মুগরিব অভিধানের লেখক বলেছেন, এ ক্ষেত্রে سَمَكٌ مَلِيحٌ বা سَمَكٌ مَمْلُوحٌ বলা হয়। পক্ষান্তরে سَمَكٌ مَالِحٌ শব্দটি সাহিত্যের বিচারে মানসম্পন্ন ভাষা নয়। কাজেই مَلِيحٌ বা مَمْلُوحٌ শব্দই অধিক বিশুদ্ধ। যদিও কবি 'রাজেয'-এর নিম্নোক্ত কবিতায় এ অর্থেই مَالِحٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে– بَصْرِيَّةٌ تَزَوَّجَتْ بَصْرِيًّا * يُطْعِمُهَا الْمَالِحَ وَالطَّرِيَّا
অর্থাৎ, "বসরার এক রমণী বসরার এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে, সে তাকে তাজা ও শুটকি মাছ খাওয়ায়"। কিন্তু এ ব্যবহারটি হচ্ছে বিরল, কাজেই তা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা চলবে না।

قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِى السَّلَمِ فِى السَّمَكِ الطَّرِيِّ إِلَّا فِى حِيْنِهِ وَزْنًا مَعْلُوْمًا وَضَرْبًا مَعْلُوْمًا ، لِأَنَّهُ يَنْقَطِعُ فِىْ زَمَانِ الشِّتَاءِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِىْ بَلَدٍ لَا يَنْقَطِعُ يَجُوْزُ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ وَزْنًا لَا عَدَدًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَعَنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ فِىْ لَحْمِ الْكِبَارِ مِنْهَا ، وَهِىَ الَّتِىْ تُقْطَعُ إِعْتِبَارًا بِالسَّلَمِ فِى اللَّحْمِ عِنْدَهُ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ তা জায়েজ নয়]। তবে যদি মাছ ধরার মৌসুমে হয়, ওজন নির্দিষ্ট হয় এবং প্রকার নির্দিষ্ট হয় [তাহলে জায়েজ হবে]। [প্রথম সুরতে জায়েজ না হওয়ার] কারণ হলো, তাজা মাছ শীত মৌসুমে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। সুতরাং কোনো অঞ্চলে যদি কোনো সময়ই তা দুষ্প্রাপ্য না হয়, সে অঞ্চলে সব সময় 'বায় সলম' জায়েজ হবে। তবে ওজনের ভিত্তিতে জায়েজ হবে; গণনা ভিত্তিতে নয়। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি [অর্থাৎ এগুলোর মাঝে মূল্যের দিক থেকে তারতম্য হয়]। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতানুসারে যে বড় মাছ কেটে বিক্রয় করা হয় তার মাংসের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। [এটা তিনি বলেন,] গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' -এর ব্যাপারে তাঁর অভিমতের উপর ভিত্তি করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِى السَّلَمِ فِى السَّمَكِ الخ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' কেবল তখনই জায়েজ হবে যদি তা মাছের মৌসুমে হয় এবং তার পরিমাণ ও প্রকার নির্ধারিত হয়, তবে এ বিধান এমন অঞ্চলের জন্য যেখানে সারা বছর বাজারে মাছ পাওয়া যায় না। হয়তো গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালে তা বাজারে একবারেই পাওয়া যায় না। এরূপ অঞ্চলে তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিটি মাছ বাজারে পাওয়া যাওয়ার মৌসুমে সম্পাদিত হতে হবে এবং তার মেয়াদও উক্ত মৌসুম শেষ হওয়ার পূর্বে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, দাদনকৃত-দ্রব্যটি চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে। সুতরাং যে সকল অঞ্চলে তাজা মাছ সারা বছরই বাজারে পাওয়া যায় সে সকল অঞ্চলে যে কোনো সময় যে কোনো মেয়াদে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাজা মাছের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে যদি তা ওজনের ভিত্তিতে হয়। আর যদি গণনার ভিত্তিতে হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। কেননা, মাছ ছোট বড় হয় এবং মূল্যের মাঝে তারতম্য হয়। ফলে হস্তান্তরের সময় তাতে বিবাদের সৃষ্টি হবে।

উল্লিখিত মাসআলায় ছোট মাছ এবং বড় মাছ [যা কেটে বিক্রয় করা হয়] উভয়ের বিধান একই অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রেই 'বায় সলম' জায়েজ। এটাই ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) থেকে বর্ণিত জাহিরে রেওয়ায়েত (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ)। পক্ষান্তরে 'নাওয়াদের'-এর এক রেওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বড় মাছ যা কেটে বিক্রয় করা হয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। এ মতটির কারণ হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পশুর গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, চর্বিযুক্ত হওয়া ও চর্বিহীন হওয়ার দিক থেকে গোশতের মাঝে অনেক তারতম্য হয়ে থাকে। ফলে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণটি কেটে বিক্রয়যোগ্য মাছের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কেননা, চর্বির দিক থেকে তার মাঝেও তারতম্য হয়। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও এরূপ একটি 'নাদির রেওয়ায়েত' রয়েছে, যদিও তাদের উভয়ের মতে পশুর গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের মতে পশুর গোশত ও মাছের 'গোশত'-এর মাঝে পার্থক্য হলো, পশুর গোশতের ক্ষেত্রে তা কোন্ অংশের হবে তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় [যেমন–রানের গোশত বা পাঁজরের গোশত], কিন্তু মাছের গোশতের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। কাজেই মাছের গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এটা হচ্ছে 'নাদির রেওয়ায়েত'। কিন্তু পূর্ববর্ণিত জাহিরে রেওয়ায়েতই অধিক বিশুদ্ধ।

قَالَ : وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَا : إِذَا وُصِفَ مِنَ اللَّحْمِ مَوْضَعًا مَعْلُوْمًا بِصِفَةٍ مَعْلُوْمَةٍ جَازَ، لِأَنَّهُ مَوْزُوْنٌ مَضْبُوْطُ الْوَصْفِ، وَلِهٰذَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ، وَيَجُوْزُ إِسْتِقْرَاضُهُ وَزْنًا، وَيَجْرِيْ فِيْهِ رِبَوا الْفَضْلِ، بِخِلَافِ لَحْمِ الطُّيُوْرِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَوْضَعٍ مِنْهُ . وَلَهُ أَنَّهُ مَجْهُوْلٌ لِلتَّفَاوُتِ فِيْ قِلَّةِ الْعَظْمِ وَكَثْرَتِهِ أَوْ فِيْ سِمَنِهِ وَهُزَالِهِ عَلٰى إِخْتِلَافِ فُصُوْلِ السَّنَةِ، وَهٰذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَفِيْ مَخْلُوْعِ الْعَظْمِ لَا يَجُوْزُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِيْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَالتَّضْمِيْنُ بِالْمِثْلِ مَمْنُوْعٌ، وَكَذَا الْإِسْتِقْرَاضُ، وَبَعْدَ التَّسْلِيْمِ فَالْمِثْلُ أَعْدَلُ مِنَ الْقِيْمَةِ، وَلِأَنَّ الْقَبْضَ يُعَايَنُ فَيُعْرَفُ مِثْلُ الْمَقْبُوْضِ بِهِ فِيْ وَقْتِهِ أَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يُكْتَفٰى بِهِ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। সাহেবাইন বলেন, যদি গোশত [পশুর] কোন্ অংশের হবে তা নির্ধারণ করা হয় এবং গোশতের গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে জায়েজ হবে। কেননা, এটা ওজন দ্বারা পরিমাপিত, এর গুণাগুণ সুনির্দিষ্ট। এ কারণেই তো গোশতের ক্ষেত্রে 'মিছল' বা অনুরূপ গোশত দ্বারা 'যিমান' [ক্ষতিপূরণ] পরিশোধ করতে হয়, ওজনের ভিত্তিতে তা ধার নেওয়া জায়েজ হয় এবং তাতে 'রিবা'-এর বিধান কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে পাখির গোশতের বিধান ভিন্ন [তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না]। কেননা, পাখির গোশতের ক্ষেত্রে বিশেষ অংশ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, গোশতে হাড় কমবেশি হওয়ার দিক থেকে অথবা বছরের মৌসুমের পরিবর্তনে মোটাতাজা ও শীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য থাকার ফলে তাতে অস্পষ্টতা থেকেই যায়। আর এ অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। আর হাড়মুক্ত গোশতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণে [অর্থাৎ মোটাতাজা ও শীর্ণ হওয়ার দিক থেকে তারতম্যের কারণে] জায়েজ হবে না। এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধতম অভিমত। [সাহেবাইন (র.)-এর দলিলের জবাব হলো,] 'মিছল' বা সদৃশ গোশত দ্বারা 'যিমান' [ক্ষতিপূরণ] শোধ করতে হবে' এটা আমরা মানি না। তদ্রূপ ধার নেওয়ার ব্যাপারেও একই কথা। আর যদি [উভয় ক্ষেত্রে আপনাদের উল্লিখিত অভিমত] মেনে নেওয়াও হয়, তবে [যিমান পরিশোধের ক্ষেত্রে 'মিছল' ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো, যিমান পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য, আর] 'মিছল' বা সদৃশ বস্তু হচ্ছে সমতার ক্ষেত্রে মূল্যের তুলনায় মূল বস্তুর অধিক নিকটবর্তী। [এ কারণেই যিমানের ক্ষেত্রে 'মিছল' ওয়াজিব। গোশত ওজন দ্বারা পরিমাপিত বস্তু হওয়ার কারণে নয়।] আর দ্বিতীয় কারণ [অর্থাৎ ওজনের ভিত্তিতে গোশত ধার নেওয়া জায়েজ হওয়ার কারণ] হলো, ধার নেওয়ার সময় দেখেশুনে হস্তগত করা হয়। ফলে হস্তগতকৃত বস্তুর সদৃশ বস্তু তখন নির্দিষ্টরূপে বুঝা যায়। কিন্তু শুধু বিবরণ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَاخَيْرَ فِى السَّلَمِ فِى اللَّحْمِ الخ : গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' -এর দুটি সুরত হতে পারে–

১. হাড়সহ গোশতে 'বায় সলম'।

২. হাড়বিহীন গোশতে 'বায় সলম'।

প্রথম সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ। আর হযরত ইবনে শুজা'(اِبْنُ شُجَاعٍ)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ নয়। মুসান্নিফ (র.) হযরত ইবনে শুজা'-এর রেওয়ায়েতটিকে অধিক বিশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদি গোশত পশুর কোন অংশের হবে এবং তার গুণাগুণ কিরূপ হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে [যেমন বলল, এক মন দু-বছর বয়সের খাসির রানের গোশত, যাতে চর্বি থাকবে], তাহলে উভয় সুরতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় ফতোয়া সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের উপর। –[ফাতাওয়ায়ে শামী, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৫৭।] ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ।

সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, গোশত ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কেননা, যদি গোশতের প্রকার, তা পশুর কোন অংশের হবে এবং তার গুণাগুণ কিরূপ হবে তা উল্লেখ করে, তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওজন-প্রচলিত দ্রব্য সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। সুতরাং গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষে তিনটি সমর্থন পেশ করছেন এ কথার উপর যে, গোশত ওজন-প্রচলিত দ্রব্য এবং তা বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব–

১. কেউ যদি অপর কোনো ব্যক্তির গোশত নষ্ট করে বা ভক্ষণ করে ফেলে, তাহলে তার জরিমানা [ওজন মেপে] তদ্রূপ গোশত দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। অথচ যদি তা ওজন-প্রচলিত দ্রব্য না হতো এবং তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব না হতো তাহলে তার মূল্য দ্বারা জরিমানা পরিশোধ করা আবশ্যক হতো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত সাদৃশ্যপূর্ণ (مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ) ওজন-নির্ভর দ্রব্য, আর এরূপ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, গোশত সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব।

২. ওজন মেপে গোশত কর্জ নেওয়া জায়েজ। অথচ গোশত যদি ওজন-প্রচলিত দ্রব্য না হতো এবং তা সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (مِنْ ذَوَاتِ الْاَمْثَالِ) না হতো তাহলে ওজন মেপে তা কর্জ নেওয়া জয়েজ হতো না।

৩. গোশতের বিনিময় গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি কমবেশি করা হয়, তাহলে তা 'রিবা'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোশত ওজন দ্বারা প্রচলিত দ্রব্য, অন্যথায় তাতে রিবা হারাম হতো না। কারণ, রিবা হারাম হওয়ার জন্য একই প্রকারের দ্রব্য (جِنْس) হওয়া এবং ওজন দ্বারা পরিমাপিত কিংবা পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এ তিনটি নজির দ্বারা বুঝা গেল যে, গোশত ওজন-প্রচলিত সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য। আর এরূপ হওয়া এ কথার আলামত বা প্রমাণ যে, তা বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَحْمِ الطُّيُوْرِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে পাখির গোশতের বিধান ভিন্ন। অর্থাৎ তাতে সাহেবাইন (র.)-এর মতেও 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, পশুর গোশতের ক্ষেত্রে গোশত পশুর কোন অংশের হবে তা উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব, কিন্তু পাখির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোট হওয়ার কারণে তার কোন অংশের গোশত হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাজেই তা অস্পষ্ট থেকে যাবে। সুতরাং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন, যে সকল পাখি শিকার করা হয় না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। আর যে সকল পাখি শিকার করা হয় কিংবা পোষ মানিয়ে লালন করা হয় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রেও পশুর গোশতের ন্যায় মতবিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ নয়;

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, সকলের মতেই জায়েজ। এ দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। কারণ পাখির গোশতে যে হাড় থাকে তা জনসমাজে ধর্তব্য বলে মনে করা হয় না।

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ مَجْهُوْلٌ لِلتَّفَاوُتِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' নাজায়েজ হওয়ার দলিল হলো, গোশতের মাঝে তারতম্য হয় দুটি কারণে

১. গোশতের মাঝে হাড় বেশি বা কম হওয়ার কারণে তাতে তারতম্য হয়। এ কারণেই দেখা যায় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে এ নিয়ে বির্তক হয়।
২. গোশত চর্বিযুক্ত হওয়া বা চর্বিহীন হওয়ার দিক থেকে তারতম্যপূর্ণ হয়। বছরের কোনো মৌসুমে পশুর গায়ে অধিক চর্বি থাকে আবার কোনো মৌসুমে কম চর্বি থাকে। কাজেই গোশতের ক্ষেত্রে উক্ত দুটি দিক থেকে অস্পষ্টতা থেকে যায় এবং তা বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় না। আর এ অস্পষ্টতা বিবাদের সৃষ্টি করবে। সুতরাং গোশতের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ مَخْلُوْعِ الْعَظْمِ الخ : গোশত বিক্রয়ের দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ হাড়হীন গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদিও হাড় কমবেশি হওয়ার দিক থেকে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়, কিন্তু চর্বির দিক থেকে তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইবনে শুজা' তাঁর থেকে এ অভিমতটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিই তাঁর থেকে বর্ণিত অধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

قَوْلُهُ وَالتَّضْمِيْنُ بِالْمِثْلِ مَمْنُوْعٌ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে সাহেবাইন (র.)-এর সমর্থনে উল্লিখিত নজিরসমূহের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হলো, সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে যে বলা হয়েছে "কেউ যদি অপরের গোশত নষ্ট করে, তাহলে তদ্রূপ গোশত দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়" এটা সঠিক নয়; বরং সে ক্ষেত্রেও মূল্য দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়। কেননা, اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ গ্রন্থের بَابُ الْاِسْتِحْقَاقِ-এ এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে "অনুরূপ গোশত দ্বারা তার জরিমানা পরিশোধ করতে হয়" তবু এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে না যে, গোশত ওজন-প্রচলিত এমন দ্রব্য যা গুণাগুণ উল্লেখের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যায়। তার কারণ হলো, যিমান বা জরিমানা পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা (اَلْمُعَادَلَةُ) অপরিহার্য বিষয়। আর গোশতের জরিমানা যদি গোশত দ্বারা পরিশোধ করা হয়, তাহলে সেটা সমতার দিক থেকে মূল্য পরিশোধের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়। কেননা, মূল্যের মাঝে সমতা হয় কেবল পরোক্ষভাবে (مَعْنًى فَقَطْ) আর এরূপ গোশতের মাঝে সমতা রক্ষা হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক থেকেই (صُوْرَةً وَمَعْنًى)। এ দিকটি বিবেচনা করে গোশতের জরিমানা গোশতের মাধ্যমে পরিশোধের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে গোশত নষ্ট করা হয়েছে তার মাঝে এবং পরিশোধকৃত গোশতের মাঝে তারতম্য নেই; বরং তারতম্য থাকা সত্ত্বেও উল্লিখিত কারণে এ বিধান হয়েছে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে যে উল্লেখ করা হয়েছে, "গোশত ওজন মেপে করজ গ্রহণ করা জায়েজ" এ কথাও সঠিক নয়। বরং এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ওজন মেপে কর্জ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। আর যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তা জায়েজ তাহলেও 'বায় সলম' এবং কর্জ গ্রহণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো, কর্জ গ্রহণ করার সময় গোশত কিরূপ ছিল, তাতে চর্বি কিরূপ ছিল ইত্যাদি উভয়ে স্বচক্ষে দেখে। ফলে তা পরিশোধের সময় অনুরূপ গোশত পরিশোধ করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তা চুক্তির সময় কেউ দেখছে না, তাই শুধু বর্ণনার দ্বারা তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'বায় সলম' জায়েজ হবে না কিন্তু কর্জ গ্রহণ জায়েজ হবে।

আর সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত "গোশতের বিনিময়ে গোশত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রিবা হারাম"-এর জবাব মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেননি। এর জবাব হলো, শরিয়ত রিবার দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের পার্থক্য বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই যদি এক দিকে পশুর রানের গোশত হয় আর অপর দিকে পাঁজরের গোশত হয়, তবু কমবেশি করে বিক্রয় হারাম। কাজেই তাদের উল্লিখিত নজির দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, গোশতের মাঝে তারতম্য বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব।

وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ اِلَّا مُؤَجَّلًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) يَجُوْزُ حَالًا لِاِطْلَاقِ الْحَدِيْثِ، وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ وَلَنَا قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ فِيْمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّهٗ شُرِعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِحَاجَةِ الْمَفَالِيْسِ، فَلَابُدَّ مِنَ الْاَجَلِ لِيَقْدِرَ عَلَى التَّحْصِيْلِ فِيْهِ فَيُسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّسْلِيْمِ لَمْ يُوْجَدِ الْمُرَخِّصُ فَبَقِيَ عَلَى النَّافِيْ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মেয়াদি না হলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, [মেয়াদি ছাড়া] তাৎক্ষণিকভাবেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, হাদীসে নিঃশর্তরূপে উল্লেখ হয়েছে "আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বায় সলম' করার অনুমতি দিয়েছেন।" আমাদের দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি "নির্ধারিত মেয়াদে"। আরেকটি কারণ হলো, দরিদ্রদের প্রয়োজন পূরণার্থে 'রুখসত' বা অবকাশ রূপে 'বায় সলম' [শরিয়তে] অনুমোদিত হয়েছে। সুতরাং তার জন্য একটি মেয়াদ থাকা আবশ্যক, যাতে ঐ মেয়াদে সে তা অর্জন করে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়। অতএব, যদি সে তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে উক্ত 'রুখসত' বা অবকাশের কারণ পাওয়া গেল না। সুতরাং তা ["তোমার অধিকারে যা নেই তা তুমি বিক্রয় করো না" এই] নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্তই থেকে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ اِلَّا مُؤَجَّلًا الخ : আমাদের মতে 'বায় সলম' যদি মেয়াদের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও আমাদের মতের অনুরূপ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মেয়াদের ভিত্তিতে না হলেও 'বায় সলম' জায়েজ। যেমন কেউ বলল, নগদ এ দশ দিরহামের বিনিময়ে এক মণ গমের জন্য আমি 'বায় সলম' করলাম। অপরজন তা কবুল করল এবং তারা কোনো মেয়াদ উল্লেখ করল না, তাহলে এভাবে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ। "হুজুর ﷺ 'বায় সলম'-এর অবকাশ দিয়েছেন"। এখানে হাদীসটি শর্তহীন (مُطْلَقٌ)। কাজেই মেয়াদের শর্ত আরোপ করা হাদীসটির উপর অতিরিক্ত সংযোজন (زِيَادَتٌ عَلَى النَّصِّ) বলে গণ্য হবে। আর তা জায়েজ নয়। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, সম্ভবত শাফেয়ীগণ এ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন না। কেননা, وَرَخَّصَ فِى السَّلَمِ। এ শব্দে হাদীসটি হাদীসগ্রন্থে প্রমাণিত নেই। অথচ শাফেয়ীগণ হচ্ছেন হাদীস বিশারদ। বরং তাঁদের দলিল হলো, যেহেতু মেয়াদ শর্ত হওয়ার কোনো দলিল নেই সেহেতু মেয়াদ 'বায় সলম'-এর জন্য শর্ত বলে সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের দলিল হলো, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হুজুর ﷺ-এর হাদীস–

مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فِىْ شَيْءٍ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"তোমাদের কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাণ পাত্র দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে।" এ হাদীসে হুজুর ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে হওয়া 'বায় সলম' -এর

জন্য শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। শাফেয়ীগণ এ হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, হাদীসটিতে মেয়াদের ভিত্তিতে হওয়াকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়নি; বরং এ হাদীসের অর্থ হলো, যদি কেউ মেয়াদের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করে, তাহলে সে যেন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে। আর যদি মেয়াদের ভিত্তিতে না করে, তাহলে মেয়াদ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কেননা, পূর্বের দুটি শর্ত (فِى كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ) ও (وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ) তদ্রূপ। কারণ, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে কিংবা ওজন দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে 'বায় সলম' হওয়া শর্ত নয়। অন্যথায় গণনার ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হতো না; বরং শর্ত হলো, পাত্র দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে হলে তা নির্দিষ্ট হতে হবে, আর ওজন দ্বারা পরিমাপের ভিত্তিতে হলে তাও নির্দিষ্ট হতে হবে। সুতরাং মেয়াদের ক্ষেত্রেও একই অর্থ হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِحَاجَةٍ الخ : আমাদের দ্বিতীয় দলিল হলো, সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, 'যা বিক্রেতার মালিকানায় নেই তা বিক্রয় জায়েজ নয়' এ সাধারণ (عَامٌ) বিধান থেকে 'বায় সলম' -কে ব্যতিক্রম করা হয়েছে ঐ সকল অভাবীদের সুবিধার্থে যাদের নগদ অর্থের প্রয়োজন এবং তারা এর বিনিময় পরিশোধে বর্তমানে সক্ষম নয়; কিন্তু পরবর্তীতে সক্ষম হবে। কাজেই মেয়াদের প্রয়োজন, যাতে সে এ মেয়াদে দাদনকৃত-দ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে যদি সে চুক্তির সময়ই তা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার কারণ পাওয়া যাবে না। সুতরাং তা নাজায়েজের অন্তর্ভুক্ত থেকে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তাহলে তো যে ব্যক্তির নিকট গম বিদ্যমান আছে সে যদি মেয়াদের ভিত্তিতে গমের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করে, তাহলে তা জায়েজ না হওয়ার কথা, অথচ তা আপনাদের মতেও জায়েজ। এর জবাব হলো, 'বায় সলম' -এ বিক্রেতা নগদ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং সে যখন গম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কম মূল্যে মেয়াদের ভিত্তিতে বিক্রয় করতে যাচ্ছে, তখন এ কথা ধরে নিতে হবে যে, বিদ্যমান গম তার প্রয়োজন নিবারণের জন্য আবশ্যক। কাজেই তা না থাকার পর্যায়ের। তাছাড়া প্রয়োজন হচ্ছে একটি আভ্যন্তরীণ বিষয়। কাজেই মেয়াদের ভিত্তিতে চুক্তি করাই প্রয়োজন থাকার আলামত হিসেবে গণ্য করা হবে। আর এ আলামতের উপরই বিধানটি নির্ভরশীল থাকবে। যেমন– নামাজের ক্ষেত্রে কসর (قَصْر) পড়ার কারণ হচ্ছে সফরের কষ্ট, কিন্তু এখন শুধু সফরের উপরই তা নির্ভরশীল।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْأَجَلُ أَدْنَاهُ شَهْرٌ، وَقِيلَ ثَلٰثَةُ أَيَّامٍ، وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْيَوْمِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্ধারিত মেয়াদ ছাড়া 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এর দলিল আমাদের বর্ণিত হাদীস। আরেকটি কারণ হলো, মেয়াদের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়, যেমন সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। মেয়াদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, এক মাস। কারো কারো মতে তিন দিন। আর কারো কারো মতে, অর্ধ দিনের চেয়ে অধিক। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ الخ : পূর্বে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে যে, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তা মেয়াদের ভিত্তিতে হতে হবে। আর এখানে ইমাম কুদূরী (র.) বলেন যে, সে মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হওয়াও অপরিহার্য। সুতরাং যদি কেউ এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ করে যে, যখন মানুষ ফসল কাটবে তখন হস্তান্তর করব, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এর দলিল হলো, আমাদের পূর্বে বর্ণিত হাদীস–

مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ـ

এ হাদীসে বলা হয়েছে, কেউ যদি 'বায় সলম' করে সে যেন নির্দিষ্ট মেয়াদে তা করে। কাজেই মেয়াদ নির্দিষ্ট করা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। দ্বিতীয় দলিল হলো, মেয়াদের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বিবাদের সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকলে বিক্রেতা চাইবে বিলম্বে হস্তান্তর করতে আর ক্রেতা চাইবে দ্রুত হস্তগত করতে। ফলে বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই মেয়াদ নির্দিষ্ট না করলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

এরপর মুসান্নিফ (র.) 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় কতটুকু হতে পারবে এর সম্পর্কে তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন–

১. সর্বনিম্ন সময় হলো, এক মাস।

২. কারো কারো মতে সর্বনিম্ন সময় হলো, তিন দিন।

৩. আর কেউ কেউ বলেন, মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় হলো, অর্ধেক দিনের চেয়ে অধিক সময়।

প্রথম অভিমতটির দলিল হলো, কেউ যদি শপথ করে যে সে তার ঋণ দ্রুত পরিশোধ করবে। অতঃপর যদি সে এক মাসের ভিতরে তা পরিশোধ করে, তাহলে তার শপথ রক্ষা করা হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এক মাসের কম হলো দ্রুত সময় (عَاجِلٌ) -এর অন্তর্ভুক্ত, আর এক মাস বা তার অধিক হলো বিলম্বিত সময় (آجِلٌ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এক মাস মেয়াদের সর্বনিম্ন সময় বলে সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় মতটির দলিল হলো, খিয়ারে শর্ত (خِيَارُ شَرْطٍ)-এর সময় যেহেতু তিন দিন, তাই 'বায় সলম' -এ তিন দিন সর্বনিম্ন সময় হবে। কিন্তু এ দলিলটি দুর্বল। কারণ, তিন দিন হলো খিয়ারে শর্তের সর্বোচ্চ সময়, অথচ আমাদের আলোচনা হচ্ছে সর্বনিম্ন সময় নির্ধারণ নিয়ে। কাজেই কিয়াসটি সঠিক হয়নি। আর তৃতীয় মতটির দলিল হলো, মজলিসে হস্তান্তর হলো নগদ আর মজলিসের পরে হলেই তা বিলম্ব। আর মজলিস সাধারণত অর্ধ দিনের চেয়ে বিলম্বিত হয় না। কাজেই অর্ধ দিনের বেশি হলেই তা মেয়াদ বলে গণ্য হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে প্রথম মতটিই [অর্থাৎ সর্বনিম্ন সময় হলো, এক মাস এ মতটিই] অধিক সঠিক। কেননা, এ মতটি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য, এ মতটির উপরই ফতোয়া।

– [ফতোয়ায়ে শামী-খণ্ড-৭, পৃ.-৪৬২ আল-বাহরুর রায়িক, ফতহুল কাদীর।]

وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ بِمِكْيَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مَعْنَاهُ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ فِيْهِ التَّسْلِيْمُ، فَرُبَّمَا يَضِيْعُ فَيُؤَدِّيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْقِصَاعِ مَثَلًا فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْكَبِسُ بِالْكَبْسِ كَالزَّنْبِيْلِ وَالْجِرَابِ لَا يَجُوْزُ لِلْمُنَازَعَةِ، إِلَّا فِيْ قِرَبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيْهِ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رح) .

অনুবাদ : নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির পাত্র দ্বারা অথবা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির হাতের মাপের ভিত্তিতে 'বায় সলম' করা জায়েজ নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, যদি তার পরিমাণ জানা না থাকে। কেননা, এ ক্ষেত্রে পণ্য বিলম্বে সমর্পণ করা হয়। কাজেই কখনও উক্ত পাত্র বা হাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে তখন বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে [ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের শুরুতে] আলোচনা করা হয়েছে। মাপপাত্র এমন হওয়া আবশ্যক, যা সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হয় না; যেমন– পেয়ালা। আর যদি মাপপাত্রটি এমন হয় যে, চাপ দিলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায়, যেমন– থলে ও ঝুড়ি, তাহলে তার দ্বারা 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, তা বিবাদ সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তবে পানির মশকের ক্ষেত্রে জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে লোক-প্রচলন রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ بِمِكْيَالِ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, যদি কেউ এভাবে 'বায় সলম' করে যে, অমুক ব্যক্তির পাত্রের মাপে পঞ্চাশ পাত্র গম দেব, আর সেই পাত্রে কতটুকু গম ধরে তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা নেই, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। এরূপভাবে যদি বলে যে, অমুক ব্যক্তির হাতের মাপের একশত হাত কাপড় দেব আর সেই ব্যক্তির হাত কতটুকু লম্বা তা জানা নেই, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য হস্তান্তর করা হয় নির্ধারিত মেয়াদের পর। আর এ দীর্ঘ সময়ে উক্ত ব্যক্তির পাত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে কিংবা চুরি হয়ে যেতে পারে। এরূপভাবে যার হাতে একশত হাত মাপার কথা বলা হয়েছে সে ব্যক্তি এই সময়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই এরূপ নির্দিষ্ট ব্যক্তির পাত্র দ্বারা কিংবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাত দ্বারা মাপার শর্তে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে যদি উক্ত পাত্রে কতটুকু গম ধরে তা জানা থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তখন বিবাদের সৃষ্টি হবে না। হাতের বিষয়টিও তদ্রূপ।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ : অর্থাৎ এ বিষয়টি ইতঃপূর্বে মূল কিতাব (كِتَابُ الْبُيُوْعِ)-এর ৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে মুসান্নিফ (র.) যা বলেছেন তার সারকথা হলো, নির্দিষ্ট পাত্র যার পরিমাণ জানা নেই অথবা নির্দিষ্ট পাথর যার ওজন জানা নেই তা দ্বারা [সাধারণ] ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা, সাধারণ বিক্রয়ে বিক্রয়দ্রব্য দ্রুত হস্তান্তর করা হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে উক্ত পাথর বা পাত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া বিরল, কিন্তু 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তা জায়েজ নয়। কারণ, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত-দ্রব্য দীর্ঘ সময় পরে হস্তান্তর করা হয়। আর এ দীর্ঘ সময়ে উক্ত পাত্র বা পাথর নষ্ট হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া বিরল নয়। কাজেই তাতে বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمِكْيَالُ الخ : অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা মেপে দেওয়ার শর্ত করা হবে তা এমন হওয়া অপরিহার্য যা চাপ প্রয়োগ করলে সম্প্রসারিত কিংবা সঙ্কুচিত হবে না। যেমন– লোহা, কাঠ বা পিতলের তৈরি পাত্র। এগুলো চাপ প্রয়োগ করলেও সম্প্রসারিত হবে না। আর যদি এরূপ পাত্র নির্ধারণ করা হয় যে তাতে চাপ প্রয়োগ করলে তা সম্প্রসারিত হয় আর চাপ প্রয়োগ না করলে সংকুচিত অবস্থায় থাকে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, তাতে বিবাদের সৃষ্টি হবে। ক্রেতা চাইবে চাপ প্রয়োগ করে মেপে নিতে আর বিক্রেতা চাইবে চাপ প্রয়োগ না করে মেপে দিতে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে পানির মশকের ক্ষেত্রে তা জায়েজ হবে। অর্থাৎ পানির মশক চামড়ার তৈরি হওয়ার কারণে তাতে চাপ প্রয়োগ করলে তা সম্প্রসারিত হয়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি পানি ক্রয়ের জন্য এরূপ মশক নির্ধারণ করে, তবে তা জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে জন-সমাজে সাধারণ প্রচলন রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ : وَلَا فِيْ طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا اَوْ ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا ، لِاَنَّهُ قَدْ يَعْتَرِيْهِ اٰفَةٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيْمِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللّٰهُ تَعَالَى الثَّمَرَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ، وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ إِلَى قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا قَالُوْا كَالْخُشْمَرَانِيِّ بِبُخَارَا وَالْبِسَاخِيِّ بِفَرْغَانَةَ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট গ্রামের খাদ্যের ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট গাছের খেজুরের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, তাতে কোনো প্রকার আপদ আসতে পারে। ফলে তা সমর্পণ করতে সক্ষম হবে না। এদিকেই ইঙ্গিত করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "বল তো! আল্লাহ তা'আলা যদি সে ফল নষ্ট করে দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের মাল হালাল করে নেবে?" তবে যদি কোনো অঞ্চলের উল্লেখ শুধু দ্রব্যটির গুণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে ফিক্হবিদগণের অভিমতে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, বুখারার খুশমুরান এলাকার গম কিংবা ফারাগানার বিসাখ এলাকার গম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا فِيْ طَعَامِ قَرْيَةٍ الخ : যদি নির্দিষ্ট গ্রামের ফসলের ক্ষেত্রে কিংবা নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল অথবা নির্দিষ্ট বাগানের ফলের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করে, তাহলে তা জায়েজ হবে না। কারণ, দুর্যোগের ফলে উক্ত নির্দিষ্ট গ্রামের ফসল বা নির্দিষ্ট বৃক্ষ ও নির্দিষ্ট বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে শর্ত অনুযায়ী দাদনকৃত-দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে না।

আর এ বিষয়টির দিকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন–

أَرَأَيْتَ لَوْ أَذْهَبَ اللّٰهُ تَعَالَى الثَّمَرَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ .

অর্থাৎ, "বল তো! আল্লাহ তা'আলা যদি সে ফল নষ্ট করে দেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের মাল হালাল করে নেবে?" কেননা, হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, যদি নির্ধারিত বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতা মূল্যের প্রাপক হবে না। কাজেই এরূপ চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং তা জায়েজ হবে না।

উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা যায়লায়ী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) আপত্তি তুলেছেন যে, হাদীসটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে দলিল পেশ করা যথার্থ হয়নি। কারণ, হাদীসটি হুজুর ﷺ বলেছেন সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তিনি এটি বলেছেন তার প্রমাণ নেই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেছেন, হাদীসটি 'বায় সলম'-এর সম্পর্কে বর্ণিত হোক কিংবা সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত হোক উভয় অবস্থায়ই এটি এ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে যে, নির্দিষ্ট বাগানের ফল- তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত হওয়ার পূর্বে– বিক্রয় করা কিংবা তাতে 'বায় সলম' করা জায়েজ নয়। কেননা, উভয় ক্ষেত্রে কারণ একই তা হলো ফল নষ্ট হয়ে চুক্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেখানে চুক্তি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে ক্ষেত্রে চুক্তি করা সহীহ নয়, যদি সম্ভাবনার দিকটি ক্ষীণ না হয়।

উল্লেখ্য মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ فَقُلْتُ لِاَنَسٍ وَمَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُ اَوْ تَصْفَرُّ اَرَأَيْتَكَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ .

আর মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ بِعْتَ مِنْ اَخِيْكَ ثَمَرًا فَاَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ اَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

এছাড়া 'বায় সলম' সম্পর্কেও উপরিউক্ত অর্থে একটি হাদীস সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; তবে হাদীসটির সনদে একজন মাজহুল রাবী থাকায় হাদীসটি দুর্বল।– [দ্রষ্টব্য : ফতহুল কাদীর]

যদি এমন বড় কোনো অঞ্চল বা দেশের ফসলের কথা উল্লেখ করে যার সম্পূর্ণ অঞ্চলের ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।–[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ النِّسْبَةُ اِلٰى قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ الخ : যদি কোনো গ্রাম বা অঞ্চলের ফসলের কথা উল্লেখ করা হয় সে অঞ্চলের ফসল নির্দিষ্ট করার জন্য নয়, বরং ফসলটি কেমন গুণাগুণের হবে তা নির্ধারণের জন্য, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। যেমন– নির্দিষ্ট একটি গ্রামের ফসলের কথা উল্লেখ করল, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের উদ্দেশ্য সে গ্রামে যে ধরনের ধান উৎপন্ন হয় সেই ধরনের ধান। মুসান্নিফ (র.) এখানে উদাহরণস্বরূপ বুখারার একটি অঞ্চল খুশমুরান এবং ফারাগানার একটি অঞ্চল বিসাখ-এর গমের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ, এ অঞ্চল দুটিতে উৎকৃষ্টমানের গম উৎপন্ন হতো। কাজেই উক্ত অঞ্চলের গম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে অঞ্চলে উৎপন্ন গমের মতো উৎকৃষ্টমানের গম। এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কারণ, উক্ত অঞ্চলের গম নষ্ট হলেও তদ্রূপ গম সংগ্রহ করে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

قَالَ : وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِطَ، جِنْسٌ مَعْلُوْمٌ، كَقَوْلِنَا حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيْرٌ، وَنَوْعٌ مَعْلُوْمٌ، كَقَوْلِنَا سَقِيَّةٌ أَوْ بَخْسِيَّةٌ، وَصِفَةٌ مَعْلُوْمَةٌ، كَقَوْلِنَا جَيِّدٌ أَوْ رَدِيٌّ، وَمِقْدَارٌ مَعْلُوْمٌ، كَقَوْلِنَا كَذَا كَيْلًا بِمِكْيَالٍ مَعْرُوْفٍ أَوْ كَذَا وَزْنًا، وَأَجَلٌ مَعْلُوْمٌ، وَالْاَصْلُ فِيْهِ مَا رَوَيْنَا، وَالْفِقْهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَّا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাতটি শর্ত না পাওয়া গেলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না– ১. নির্ধারিত 'নস' (جِنْس) বা শ্রেণী। যেমন– গম কিংবা যব। ২. নির্ধারিত প্রকার। যেমন– সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসল কিংবা বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদিত ফসল। ৩. নির্ধারিত গুণ। যেমন– উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। ৪. নির্ধারিত পরিমাণ। যেমন– প্রচলিত কোনো মাপ পাত্রের এত পাত্র কিংবা ওজন হিসেবে এত পরিমাণ। ৫. নির্ধারিত মেয়াদ। এ শর্তগুলোর মূল দলিল হলো, আমাদের বর্ণিত হাদীস এবং এগুলো শর্ত হওয়ার হিকমত তাই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَقْيَة -এর অর্থ হলো– এমন জমির ফসল যাতে সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয়েছে।

بَخْسِيَّة অর্থাৎ এমন জমির ফসল যাতে সেচের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয়নি, বরং কেবল বৃষ্টির পানিতেই তাতে ফসল হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ عِنْدَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) 'বায় সলম'-এর ঐ সকল শর্তসমূহ উল্লেখ করছেন, যা চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য। এরূপ শর্ত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাতটি আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে পাঁচটি। উল্লেখ্য 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য এ ছাড়া আরো শর্ত রয়েছে, তবে সেগুলো অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সেগুলো চুক্তির সময় উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। সেগুলো অত্র পরিচ্ছেদে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে কেবল এমন শর্তসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলো চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য। সাতটি শর্তের মধ্যে পাঁচটির ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) একমত। আর অবশিষ্ট দুটি কেবল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শর্ত, সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা শর্ত নয়।

যে পাঁচটি শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.) একমত সেগুলো হচ্ছে–

১. দ্রব্যের নির্দিষ্ট শ্রেণী (جِنْس) উল্লেখ করা। যেমন– ধান, গম, যব ইত্যাদি।

২. দ্রব্যের নির্দিষ্ট প্রকার (نَوْع) উল্লেখ করা। যেমন– সেঁচের মাধ্যমে উৎপন্ন গম বা শুধু বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন গম কিংবা ইরি ধান বা বোরো ধান।

৩. গুণাগুণ নির্ধারণ করা। যেমন– উৎকৃষ্টমানের গম বা নিম্নমানের গম।

৪. পরিমাণ নির্ধারণ করা। যেমন– দশ কেজি বা দশ লিটার কিংবা অমুক পাত্রের দশ পাত্র। উপরিউক্ত চারটি শর্ত দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এবং মূলধন [রা'সুল মাল] উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৫. মেয়াদ নির্ধারণ করা। যেমন বলল, আমি দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আগামী পাঁচ মাস পর হস্তান্তর করব, বা আগামী অমুক মাসের অমুক তারিখে তা হস্তান্তর করব।

উক্ত পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করার পর মুসান্নিফ (র.) এ শর্তগুলোর দলিল বর্ণনা করেছেন তা হলো পূর্বে উল্লিখিত হুজুর ﷺ-এর হাদীস– مَنْ اَسْلَمَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِمْ فِىْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ "তোমাদের কেউ যদি 'বায় সলম' করে, তাহলে সে যেন নির্দিষ্ট পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্যে এবং ওজন-পরিমাপিত দ্রব্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে।" এ হাদীসে দুটি শর্ত তথা পরিমাণ নির্ধারণ ও মেয়াদ নির্ধারণ-এর বিষয় স্পষ্টভাবে (نَصًّا) উল্লেখ আছে। আর অবশিষ্ট তিনটি শর্ত এ হাদীস থেকে বক্তব্যের উদ্দেশ্য বিচারের মাধ্যমে [دَلَالَةُ النَّصِّ হিসেবে] প্রমাণিত হয়। তা এভাবে যে, হাদীসটির দিকে লক্ষ্য করলে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উল্লিখিত দুটি শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চুক্তির বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট করা যাতে বিবাদের সম্ভবনা না থাকে। আর এভাবে সুনির্দিষ্ট করার জন্য অবশিষ্ট তিনটি শর্তও অপরিহার্য। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা উক্ত শর্ত তিনটিও প্রমাণিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَالْفِقْهُ فِيْهِ مَا بَيَّنَّا : "এগুলো শর্ত হওয়ার হিকমত তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।" মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা উল্লিখিত পাঁচটি শর্তের আকলী দলিলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব বিষয়ে অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে, আর যা বিবাদ সৃষ্টি করে তা চুক্তি সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলো শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلٰى مِقْدَارِهِ، كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ وَالْمَعْدُوْدِ، وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِيْ يُوْفِيْهِ فِيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَقَالَا : لَا يَحْتَاجُ إِلٰى تَسْمِيَةِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَا إِلٰى مَكَانِ التَّسْلِيْمِ، وَيُسَلِّمُهُ فِيْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ، وَلَهُمَا فِي الْأُوْلٰى أَنَّ الْمَقْصُوْدَ يَحْصُلُ بِالْإِشَارَةِ فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ، وَصَارَ كَالثَّوْبِ .

অনুবাদ : ৬. 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি এমন হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পর্কযুক্ত, তাহলে রা'সুল মালের পরিমাণ জানা। যেমন– পাত্র-পরিমাপিত বস্তু, ওজন-পরিমাপিত বস্তু অথবা গণনা প্রচলিত বস্তু। ৭. 'মুসলাম ফীহ' বা দাদনকৃত দ্রব্যটি যদি এমন হয় যে তা পরিবহন ও খরচ সাপেক্ষ, তাহলে যে স্থানে তা সমর্পণ করবে তা নির্ধারণ করা। সাহেবাইন (র.) বলেন, 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি [ইশারার মাধ্যমে] নির্ধারিত হয়, তাহলে তার পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এরূপভাবে সমর্পণের স্থান উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বরং তা চুক্তি সম্পাদনের স্থানে সমর্পণ করবে। সুতরাং এখানে দুটি মাসআলা [যাতে সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে]। প্রথম মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, এখানে যা [মূল] উদ্দেশ্য তা ইশারা দ্বারাই অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। [সুতরাং তার পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।] এটা [ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] মূল্য এবং [ইজারার ক্ষেত্রে] ভাড়ার ন্যায় হলো এবং ['রা'সুল মাল' হিসেবে ইশারাকৃত] কাপড়ের ন্যায় হলো। [অর্থাৎ এই তিনটির ক্ষেত্রে যেমন শুধু ইশারাই যথেষ্ট হয়, এখানেও তদ্রূপ ইশারাই যথেষ্ট হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) যে দুটি শর্তের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, তার আলোচনা করছেন। শর্ত দুটি বিস্তারিত উল্লেখের পূর্বে একটি ভূমিকা ভালভাবে বুঝতে হবে। তা হলো, বিক্রেয়-দ্রব্য বা মূল্য- দ্রব্য দু ধরনের বস্তু হতে পারে–

১. যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে। যথা– পাত্র-পরিমাপিত বস্তু, ওজন-পরিমাপিত বস্তু এবং গণনা-প্রচলিত বস্তু।
২. যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। যথা– এমন কাপড় যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না, বরং সম্পূর্ণ কাপড়টি একটি কাপড় হিসেবে বিক্রয় হয়। যেমন– শাড়ি কাপড়, চাদর ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের বস্তু যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে মূল্যের অংশসমূহ বিক্রীত-বস্তুর অংশসমূহের উপর বণ্টিত হয়। ফলে যদি দশ কেজি বলে বিক্রয় করার পর মেপে দেখা যায় যে, তা নয় কেজি তাহলে নয় কেজির মূল্য পাবে– এক কেজির মূল্য কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে তার মূল্যের অংশসমূহ বিক্রীত-বস্তুর অংশসমূহের উপর বণ্টিত হয় না। ফলে যদি ১২ হাত শাড়ি বলে বিক্রয় করার পর ১১ হাত দেখা যায়, তাহলে মূল্যের অংশ কর্তন করা হবে না। [অবশ্য ক্রেতার চুক্তিটি বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।]

উক্ত ভূমিকা উল্লেখের পর আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে বিরোধপূর্ণ শর্ত দুটি আলোচনা করছি। প্রথমটি হলো, যদি মূলধন [রা'সুল মাল] প্রথম প্রকারের বস্তু হয় তথা এমন বস্তু হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ মূলধন সম্মুখে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেও তার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে শুধু ইশারাই যথেষ্ট হবে তার পরিমাণ উল্লেখ করার আবশ্যকতা থাকবে না।

আর দ্বিতীয় শর্তটি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ, তাহলে তা কোন স্থানে হস্তান্তর করবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করতে হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে কোন স্থানে হস্তান্তর করবে তা উল্লেখ করা শর্ত নয়। যদি তারা তা নির্দিষ্ট না করে, তাহলে যে স্থানে চুক্তি করা হয়েছে সে স্থানেই দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এ দুটি শর্তের ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) এবং একটি উক্তি (قَوْل) অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত সাহেবাইন (র.)-এর মতের অনুরূপ। কিন্তু হানাফীগণের নিকট ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া। –[ফতোয়ায়ে শামী]

قَوْلُهُ فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ : অর্থাৎ এখানে দুটি মাসআলা, যাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম মাসআলা হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] যদি সম্মুখে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] যদি এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা হস্তান্তর করার স্থান নির্দিষ্ট করা আবশ্যক আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا فِي الْأُولَى الخ : প্রথম মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, মূলধন [রা'সুল মাল]-এর পরিমাণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, তা হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে যেন বিবাদ না হয়। সুতরাং যদি মূলধন [রা'সুল মাল] সম্মুখে থাকে এবং ইশারা করে তা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তার পরিমাণ উল্লেখ করার আবশ্যকতা আর থাকছে না।

قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ وَالْأُجْرَةَ، وَصَارَ كَالثَّوْبِ الخ : সাহেবাইন (র.) -এর দলিলের সমর্থনে তিনটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে–

১. সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি মূল্য-দ্রব্যের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। সুতরাং এখানেও তা আবশ্যক হবে না।

২. ইজারার ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি নগদ ভাড়া-দ্রব্যের দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যেমন বলল, 'আমি এ আমগুলোর বিনিময়ে আপনার সাইকেলটি একদিনের জন্য ভাড়া নিলাম'-তাহলে সকলের ঐকমত্যে উক্ত ভাড়া-দ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। সুতরাং মূলধন [রা'সুল মাল]-এর ক্ষেত্রেও তা আবশ্যক হবে না।

৩. মূলধন [রা'সুল মাল] যদি এমন কাপড় হয় যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না; বরং সম্পূর্ণটি একটি কাপড় হিসেবে বিক্রয় হয় যেমন– শাড়ি, লুঙ্গি, জামা, চাদর ইত্যাদি তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। সুতরাং উক্ত প্রকারের কাপড় ছাড়া অন্য দ্রব্য হলেও তার পরিমাণ উল্লেখ করা আবশ্যক হবে না।

কেননা, উল্লিখিত তিনটি নজিরেই উভয় ক্ষেত্রে কারণ বা ইল্লাত একই। তা হলো, ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়ার ফলে হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। কাজেই বিধানও উভয় ক্ষেত্রে একই হবে।

وَلَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا زُيُوفًا وَلَا يُسْتَبْدَلُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ لَا يُدْرَى فِي كَمْ بَقِيَ، أَوْ رُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْمَوْهُومُ فِي هٰذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لِشَرْعِهِ مَعَ الْمُنَافِي، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ ثَوْبًا، لِأَنَّ الذَّرْعَ وَصْفٌ فِيهِ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِهِ، وَمِنْ فُرُوعِهِ إِذَا أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ أَحَدِهِمَا .

অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে– কখনও এমন হতে পারে যে, 'রা'সুল মাল' বা মূলধনের কিছু অংশ অতিরিক্ত খাদযুক্ত বের হবে এবং তা সেই মজলিসে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে না। সুতরাং যদি তার পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে জানা যাবে না যে, অবশিষ্ট কতটুকু অংশে 'বায় সলম' সঠিক থাকল। [কেননা, অতিরিক্ত খাদযুক্ত অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে গেছে।] আবার কখনও এমন হতে পারে যে, 'মুসলাম ইলাইহি' বা দাদনগ্রহীতা দাদনদ্রব্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো না, তখন তাকে মূলধন ফেরত দিতে হবে [যদি মূলধনের পরিমাণ জানা না থাকে, তাহলে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না]। আর এরূপ সম্ভাবনাময় বিষয়কে 'বায় সলম'-এর চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তবের সমপর্যায়ের বিবেচনা করা হয়। কেননা, 'বায় সলম'-এর মধ্যে নিষিদ্ধতার কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়তে অনুমোদিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'রা'সুল মাল' বা মূলধন যদি কাপড় হয় [সে ক্ষেত্রে পরিমাণ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। তার কারণ হলো,] গজের পরিমাণ কাপড়ের গুণগত বিষয়। এর পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। [উল্লেখ্য, এটা ঐ কাপড়ের কথা বলা হচ্ছে যা গজ হিসেবে বিক্রয় হয় না। যেমন– শাড়ি, লুঙ্গি।] উক্ত মতবিরোধের উপর ভিত্তি করেই এ মাসআলা নির্গত হয়েছে যে, 'রাব্বুস সলম' বা দাদনদাতা দুই শ্রেণীর দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূলধন প্রদান করল, কিন্তু প্রত্যেকটির জন্য আলাদাভাবে মূলধন বর্ণনা করল না [তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে এটা জায়েজ হবে, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না।] কিংবা দুই শ্রেণীর মুদ্রা মূলধন হিসেবে প্রদান করল, কিন্তু দুটির মধ্য হতে একটির পরিমাণ উল্লেখ করল না [তাহলে এ ক্ষেত্রেও একই রকম মতপার্থক্য]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّهُ رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, যদি মূলধন [রা'সুল মাল]-এর পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়, তাহলে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়তে পারে। আর দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অনির্দিষ্ট হলে সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হলে দাদনকৃত দ্রব্যের পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়তে পারে এভাবে যে, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] মূলধন হস্তগত করার পর তা সাধারণত একসাথে খরচ না করে ক্রমান্বয়ে খরচ করে। সুতরাং এমন হতে পারে যে, মূলধন থেকে কিছু পরিমাণ খরচ করার পর দেখা গেল যে, মূলধনের কিছু অংশ ত্রুটিযুক্ত। ফলে সে তা ফেরত দিবে। এখন মাসআলা হলো, ফেরত দেওয়ার সময় দাদনদাতা যদি উক্ত ত্রুটিযুক্ত মূলধনের পরিবর্তে ত্রুটিহীন দ্রব্য মজলিসেই নগদ দাদন-গ্রহীতার [মুসলাম ইলাইহি]-এর নিকট হস্তান্তর না করে, তাহলে উক্ত ত্রুটিযুক্ত মূলধনের অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, যদি চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়ে থাকে বরং শুধু ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে মূলধনের ত্রুটিযুক্ত অংশ বাদ দিয়ে

অবশিষ্ট কতটুকু অংশ দাদনগ্রহীতা খরচ করেছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। ফলে এটা নির্ধারণ করা যাবে না যে, কতটুকু অংশের 'বায় সলম' সঠিক রয়েছে আর কতটুকু অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়েছে। সুতরাং সঠিক অংশের দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর পরিমাণ অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ল। অতএব দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখার জন্য চুক্তির সময় মূলধন [রা'সুল মাল]-এর পরিমাণ উল্লেখ করাও আবশ্যক।

অথবা এমন হতে পারে যে, দাদনগ্রহীতা মূলধন খরচ করার পর 'বায় সলম'-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করতে সক্ষম হলো না। তাহলে দাদনদাতাকে তার মূলধন ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং যদি চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা না হয়ে থাকে, তাহলে মূলধন ফিরিয়ে দিতে জটিলতা সৃষ্টি হবে। কাজেই চুক্তির সময় মূলধন [রা'সুল মাল] -এর পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে।

قَوْلُهُ وَالْمَوْهُوْمُ فِىْ هٰذَا الْعَقْدِ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত দলিলের উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে যে সকল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হলো যেমন– মূলধনের কিছু অংশ খচর করার পর কিছু অংশ ত্রুটিযুক্ত দেখা যেতে পারে আবার তা ফেরত দেওয়ার সময় মজলিসেই তার পরিবর্তে অন্য দ্রব্য হস্তান্তর না করতে পারে, এ সকল বিষয় সাধারণত হয় না। বরং এগুলো কেবল সম্ভাবনাময় ধারণা, যা ধর্তব্য হয় না। কেননা, শরিয়তের বিধিবিধান সাধারণত যা ঘটে তার উপর নির্ভরশীল হয়।

মুসান্নিফ (র.)-এর জবাব দিচ্ছেন যে, এগুলো যদিও ধারণাকৃত বিষয় তবুও 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তব বিষয়ের মতোই ধর্তব্য হবে। কেননা, শরিয়তে 'বায় সলম' নাজায়েজ হওয়ার কারণ [অর্থাৎ 'দ্রব্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই তা বিক্রয় করা' এ কারণ] থাকা সত্ত্বেও তা বৈধ করা হয়েছে। আর এরূপ বৈধ বিষয়কে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে এক পক্ষের প্রতারিত হওয়া বা ঠক হওয়ার ধারণাও তাতে প্রভাব ফেলে। সুতরাং উল্লিখিত সম্ভাবনাময় বিষয়গুলো ধর্তব্য হবে এবং তার কারণে 'বায় সলম' নাজায়েজ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে নকলী দলিল হলো, এ মতটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আর ফকীহ সাহাবীর অভিমত কিয়াসের উপর অগ্রাধিকার পায়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের পক্ষ থেকে উল্লিখিত কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের পক্ষ থেকে উল্লিখিত তিনটি নজিরের কেবল শেষোক্ত নজিরের জবাব উল্লেখ করেছেন। জবাবের সারকথা হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] কাপড় হওয়া [যা গজ হিসেবে বিক্রয় করা হয় না] এবং মূলধন অন্য দ্রব্য হওয়া এ উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এগুলোর একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা সঠিক হবে না। পার্থক্য হলো এই যে, কাপড় বা পোশাক যা গজ হিসেবে মেপে বিক্রয় করা হয় না, তার পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না; বরং তাতে গজের পরিমাণ তার গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই কেউ যদি একটি শাড়ি বা চাদর ১০ হাত বলে বিক্রয় করে অতঃপর ক্রেতা তা ১১ হাত পায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না। আর যদি ৯ হাত পায়, তাহলে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম দিতে পারবে না। [অবশ্য বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।] কাজেই এরূপ কাপড়ের পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে না। পক্ষান্তরে অন্য দ্রব্য যেমন– ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য, পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য বা গণনা-প্রচলিত দ্রব্য এগুলোর পরিমাণের সাথে চুক্তির সম্পর্ক থাকে। কাজেই তার পরিমাণ উল্লেখ করা অপরিহার্য। সুতরাং একটির কিয়াস অপরটির উপর সঠিক হবে না।

قَوْلُهُ وَمِنْ فُرُوْعِهِ إِذَا أَسْلَمَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধপূর্ণ উপরিউক্ত মূল মাসআলার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত দুটি মাসআলা নির্গত হয়েছে–

১. কেউ দু প্রকারের দ্রব্য [যেমন– এক মণ গম ও এক মণ ধান] -এর জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] নির্ধারণ করল এবং তার পরিমাণও উল্লেখ করল [যেমন বলল, ছয় শত টাকা] কিন্তু প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যের জন্য কতটুকু মূলধন তা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করল না, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে জায়েজ হবে।

২. কেউ 'বায় সলম' হিসেবে কোন দ্রব্য ক্রয়ের জন্য দু প্রকারের দ্রব্য মূলধন [রা'সুল মাল] নির্ধারণ করল। যেমন বলল, আমি এক মণ গমের জন্য এ দিরহামগুলোর এবং এ দিনারগুলো প্রদান করব। কিন্তু সে এ দু প্রকারের মূলধনের এক প্রকারের পরিমাণ উল্লেখ করেছে, আর অপর প্রকারের দিকে শুধু ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছে তার পরিমাণ উল্লেখ করেনি, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা জায়েজ হবে। কারণ, এ দুটি মাসআলায়ও পূর্বে উল্লিখিত "দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা" বিদ্যমান।

وَلَهُمَا فِى الثَّانِيَةِ أَنَّ مَكَانَ الْعَقْدِ يَتَعَيَّنُ لِوُجُوْدِ الْعَقْدِ الْمُوْجِبِ لِلتَّسْلِيْمِ فِيْهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ مَكَانٌ اٰخَرُ فِيْهِ فَيَصِيْرُ نَظِيْرَ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فِى الْأَوَامِرِ، وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ، وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ التَّسْلِيْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِى الْحَالِ، فَلَا يَتَعَيَّنُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَالْجَهَالَةُ فِيْهِ تُفْضِىْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، لِأَنَّ قِيَمَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ، فَلَابُدَّ مِنَ الْبَيَانِ، وَصَارَ كَجَهَالَةِ الصِّفَةِ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় মাসআলায় সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তির স্থানটিই [দ্রব্য সমর্পণের জন্য] নির্ধারিত হয়ে যাবে। যেহেতু সমর্পণ ওয়াজিবকারী চুক্তি সেখানেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাছাড়া অন্য কোনো স্থান সমর্পণের ব্যাপারে চুক্তির স্থানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। সুতরাং এটা শরিয়তের আদেশাবলির ক্ষেত্রে তা পালনের সম্ভাবনার সময়গুলোর প্রথম অংশের ন্যায় হবে। [অর্থাৎ প্রথম অংশের সাথে কোনো অংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় ওয়াজিব হওয়ার 'সবব' বা কারণ হিসেবে প্রথম অংশই সাব্যস্ত হয়।] আর এটা 'কর্জ' ও 'গসব' -এর মতো হবে [কেননা, কর্জ ও গসবের ক্ষেত্রে তা সংঘটিত হওয়ার স্থানেই সমর্পণ করতে হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, [মুসলাম ফীহ চুক্তির সময়] তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করা ওয়াজিব হচ্ছে না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি [সমর্পণের জন্য] নির্ধারিত হবে না। পক্ষান্তরে কর্জ ও গসব এর ব্যতিক্রম [কেননা, তা তাৎক্ষণিকভাবে সমর্পণ করা ওয়াজিব হয়]। সুতরাং চুক্তির স্থানটি যখন নির্ধারিত হলো না, তখন স্থান সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে। কেননা, স্থানের ভিন্নতার ফলে বস্তুসমূহের মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব, স্থান বর্ণনা করে দেওয়া অপরিহার্য। আর এটা গুণাগুণ সম্পর্কে অস্পষ্টতার মতোই হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَهُمَا فِى الثَّانِيَةِ الخ : দ্বিতীয় মাসআলায় অর্থাৎ 'দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়' এ ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, কোনো স্থানের কথা উল্লেখ না করা হলে চুক্তি করার স্থানটি হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা, চুক্তিটিই দাদনদাতার উপর দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব করেছে। সুতরাং হস্তান্তর ওয়াজিব হওয়ার কারণটি যে স্থানে সংঘটিত হয়েছে, কোনো স্থান উল্লেখ করা না হলে সে স্থানটিই হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর যখন চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হলো, তখন 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করার অপরিহার্যতা থাকল না।

দ্বিতীয় দলিল হলো, দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তরের জন্য স্থানের প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে সকল স্থান সমান। কোনো স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু চুক্তির স্থানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ পাওয়া যাচ্ছে। আর তা হলো সেখানে চুক্তিটি সংঘটিত হওয়া। কাজেই অন্য কোনো স্থান চুক্তি সংঘটিত হওয়ার স্থানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। পক্ষান্তরে অন্য স্থানগুলো একটি অপরটির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সুতরাং চুক্তির স্থানটিই হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَيَصِيرُ نَظِيرُ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ الخ : যেমন– শরীয়তের নির্দেশাবলি, জোহরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبٌ [কারণ] হিসেবে নির্ধারণ করা হয় জোহরের সময়ের প্রথম অংশকে। কেননা, প্রথম অংশ যখন শুরু হয় তখন পরবর্তী অংশগুলো না থাকার কারণে প্রথম অংশের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকছে না, কাজেই সময়ের প্রথম অংশই জোহরের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য سَبَبٌ [কারণ] হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। [অবশ্য এটি ইমাম কারখী (র.)-এর মতানুসারে। কারো কারো অন্য অভিমতও রয়েছে।] সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। কেননা, সে স্থানটির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَالْقَرْضِ وَالْغَصْبِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর কিয়াসের স্বপক্ষে দুটি উপমা পেশ করেছেন–

১. কেউ যদি কারো নিকট হতে ঋণ (قَرْض) গ্রহণ করে আর তা পরিশোধের স্থান নির্ধারণ না করে, তাহলে ঋণ গ্রহণের স্থানটিই তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যায়।

২. কেউ যদি কারো কোনো বস্তু غَصَبَ [আত্মসাৎ বা অন্যায় দখল] করে, তাহলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার স্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে যে স্থান থেকে সে তা 'গসব' করেছে সে স্থানটিই তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করার জন্য চুক্তির স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) أَنَّ التَّسْلِيمَ غَيْرُ وَاجِبٍ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করা চুক্তির সময় তৎক্ষণাৎ (فِي الْحَالِ) দাদনগ্রহীতার উপর ওয়াজিব নয়; বরং তা মেয়াদ শেষান্তে তার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব। কাজেই চুক্তির স্থানটি তা হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হবে না। যদি তৎক্ষণাৎ (فِي الْحَالِ) তা হস্তান্তর করা ওয়াজিব হতো, তাহলে সে স্থানটি নির্ধারিত হতো।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ الخ : পক্ষান্তরে সাহেবাইন (র.) কিয়াস হিসেবে যে 'কর্জ' এবং 'গসব' -এর উপমা পেশ করেছেন তা যথার্থ হয়নি। কারণ, 'কর্জ' বা ঋণ পরিশোধ করা ঋণ গ্রহীতার উপর সাথে সাথে (فِي الْحَالِ) ওয়াজিব হয়। এ কারণেই যদি ঋণ পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তা ঋণদাতার জন্য রক্ষা করা অপরিহার্য হয় না; বরং সে ঋণ দেওয়ার পরপরই তা চাইতে পারে। সুতরাং যখন ঋণ গ্রহণের পর তা সাথে সাথেই পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় তাই ঋণ গ্রহণের স্থানটি তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়।

অনুরূপভাবে 'গসব' বা আত্মসাৎ করার ক্ষেত্রেও গসবকৃত বস্তু গসব করার পর সাথে সাথেই তা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়। তাই গসবের স্থানটিই গসবকৃত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় দাদনকৃত দ্রব্য সাথে সাথে হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয় না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হবে না। আর যখন চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হলো না তখন এই হস্তান্তরের স্থান অনির্দিষ্ট থাকা বিবাদ সৃষ্টি করবে। কেননা, দ্রব্যের মূল্য স্থানভেদে কমবেশি হয়ে থাকে। কাজেই দাদনদাতা চাইবে এমন স্থানে তা গ্রহণ করতে যেখানে তার মূল্য বেশি হয় এবং বহন করে নিতে খরচ লাগে, আর দাদনগ্রহীতা চাইবে এমন স্থানে হস্তান্তর করতে যেখানে তার মূল্য কম হয় এবং বহন করার খরচ লাগে না। অতএব, হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে।

قَوْلُهُ وَصَارَ كَجَهَالَةِ الصِّفَةِ : হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ না করার বিষয়টি দাদনকৃত দ্রব্য বা মূলধনের গুণাগুণ উল্লেখ না করার মতোই হলো। অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] কিংবা মূলধন [রা'সুল মাল]-এর গুণাগুণ যদি অস্পষ্ট থাকে, তাহলে যেমন বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে 'বায় সলম' সহীহ হয় না, তদ্রূপ হস্তান্তরের স্থান অস্পষ্ট থাকলেও বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহেবাইনের অভিমতের দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা বলুন তো "যদি তারা উড়ন্ত চলন্ত নৌকায় বসে 'বায় সলম' -এর চুক্তি করে, তাহলে কি যে স্থানে থাকা অবস্থায় চুক্তিটি হয়েছে সে স্থান হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে?" অর্থাৎ এটা তো কোনো জ্ঞানী বলবে না।

وَعَنْ هٰذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمَشَائِخِ : إِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِيْهِ عِنْدَهُ يُوْجِبُ التَّحَالُفَ كَمَا فِى الصِّفَةِ، وَقِيْلَ : عَلٰى عَكْسِهِ، لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ عِنْدَهُمَا، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ الثَّمَنُ وَالْأُجْرَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَصُوْرَتُهَا إِذَا اقْتَسَمَا دَارًا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيْبِ أَحَدِهِمَا شَيْئًا لَهُ حَمْلٌ مَؤُنَةٌ، وَقِيْلَ : لَا يُشْتَرَطُ ذٰلِكَ فِى الثَّمَنِ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا، وَهُوَ اِخْتِيَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِىْ (رح) وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ وَمَكَانُ تَسْلِيْمِ الدَّابَّةِ لِلْإِيْفَاءِ .

অনুবাদ : আর এ কারণেই কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন যে, স্থান [কোনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল সে] সম্পর্কে চুক্তিকারীদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরস্পরের শপথ গ্রহণকে অনিবার্য করবে। যেমন– গুণাগুণ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিলে [শপথ গ্রহণ অনিবার্য হয়]। আর কেউ কেউ বলেছেন; বরং এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ যা উল্লেখ করা হয়েছে তার বিপরীত। [অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শপথ গ্রহণ অনিবার্য নয়; আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা অনিবার্য।] কেননা, সাহেবাইন (র.)-এর মতে, চুক্তির স্বাভাবিক দাবিতেই চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাবে। মূল্য, ভাড়া ও বাটোয়ারার ক্ষেত্রেও ঠিক একই মতবিরোধ। [অর্থাৎ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এগুলো হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করতে হবে, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তির স্থান-ই নির্ধারিত হয়ে যাবে।] বাটোয়ারার সুরত হলো, দুই ব্যক্তি তাদের শরিকানা বাড়ি বাটোয়ারা করল এবং একজনের ভাগে এমন কোনো বস্তু নির্ধারণ করল যা পরিবহন ও খরচসাপেক্ষ। কেউ কেউ বলেছেন, মূল্যের ক্ষেত্রে [সকলের মতেই] স্থান নির্ধারণ করা শর্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মূল্য যদি মেয়াদি হয় তাহলে [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে] স্থান নির্ধারণ শর্ত হবে। শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে বাটোয়ারার ক্ষেত্রে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের জন্য যে বাড়ি বাটোয়ারা করা হয়েছে সে স্থানটিই নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর ভাড়ার ক্ষেত্রে যে স্থানে বাহন জন্তু হস্তান্তর করা হয়েছে সে স্থানটিই ভাড়া পরিশোধের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَنْ هٰذَا قَالَ مَنْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু হস্তান্তরের স্থানের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা গুণাগুণের অস্পষ্টতার মতো [অর্থাৎ যেমনিভাবে দ্রব্যের গুণাগুণের পার্থক্যের কারণে তার মূল্যের মাঝেও পার্থক্য তদ্রূপ স্থানের পার্থক্যের কারণেও মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়] সেহেতু কোনো কোনো মাশায়েখ বলেছেন যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যদি দাদনদাতা ও দাদনগ্রহীতার মাঝে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, [একজন বলে অমুক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল আর অপরজন বলে, না; বরং অমুক স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল] আর কারো স্বপক্ষে সাক্ষী না থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদের উভয়ের উপর তা কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। যদি একজন কসম খেয়ে বলতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার বিপক্ষে ফয়সালা হয়ে যাবে। আর যদি দুজনই

কসম খেয়ে বলে, তাহলে চুক্তিটি রহিত (فَسْخ) করে দেওয়া হবে। যেমনিভাবে কিরূপ গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছিল তা নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে উভয়ের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হয়, তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে না।

আর কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীত। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তাদের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর কথা গ্রহণ করা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তাদের উপর কসম খেয়ে বলা অপরিহার্য হবে। [ইমাম কুদূরী, ঈযাহ গ্রন্থের প্রণেতা ও 'কিফায়াহ' গ্রন্থের প্রণেতাগণ মতবিরোধটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন।]

কারণ, সাহেবাইন (র.)-এর মতে চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাওয়া চুক্তির সত্তাগত দাবি (مُقْتَضَى الْعَقْدِ)। সুতরাং তাতে মতবিরোধ দেখা দেওয়া স্বয়ং চুক্তির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার মতো। আর চুক্তির মাঝে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উভয়ের উপর কসম ওয়াজিব হয়। অতএব, স্থান নিয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়ের উপর কসম ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যেহেতু চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হয়ে যাওয়া চুক্তির সত্তাগত দাবি (مُقْتَضَى الْعَقْدِ) নয়, তাই এটা মেয়াদের ক্ষেত্রে মতবিরোধের ন্যায়। আর মেয়াদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে কসম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তান্তর করার স্থান সম্পর্কে মতবিরোধের ক্ষেত্রেও কসম ওয়াজিব হবে না; বরং যার উপর হস্তান্তর করা ওয়াজিব অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الثَّمَنُ وَالْأُجْرَةُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে উপরে যে মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এ তিনটি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-১. মূল্য ২. ভাড়া ৩. বণ্টন। এগুলোর সুরতে মাসআলা হলো নিম্নরূপ-

১. কেউ কোনো নগদ দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করল, আর মূল্য নির্ধারণ করল এরূপ বস্তু যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ। তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মূল্য পরিশোধ করার স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে স্থান উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়; বরং স্থান উল্লেখ না করলে যে স্থানে চুক্তি হয়েছে সে স্থানেই উক্ত মূল্য পরিশোধ করবে।
২. কেউ কোনো বাড়ি বাকিতে ইজারা [ভাড়া] নিল, আর ভাড়া নির্ধারণ করল এমন বস্তু, যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ [যেমন- দশ মণ গম]। তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত ভাড়া-দ্রব্য পরিশোধের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। নতুবা ইজারা সহীহ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে স্থান নির্ধারণ না করলেও সহীহ হবে। যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছে সেই বাড়িতে ভাড়া পরিশোধ করবে। আর যদি এভাবে কোনো বাহন জন্তু ভাড়া নেয়, তাহলে বাহন জন্তুটি যে স্থানে হস্তগত করেছে সে স্থানেই ভাড়া-দ্রব্য পরিশোধ করতে হবে।
৩. কেউ তার অপর অংশীদারের সাথে বাড়ি বণ্টন করল, বণ্টনের ক্ষেত্রে একজন অংশীদার কিছু অংশ বেশি নিয়ে তার বিনিময়ে সে মেয়াদের ভিত্তিতে এমন বস্তু দেওয়ার কথা বলল, যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ। তাহলে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে। অন্যথায় বণ্টন-চুক্তি সহীহ হবে না। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সহীহ হবে এবং বণ্টনের স্থানে তা পরিশোধ করবে।

قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذٰلِكَ الخ : কোনো কোনো মাশায়েখ উল্লেখ করেছেন যে, উপরে বর্ণিত মাসআলাগুলোর মধ্যে হতে প্রথমটিতে তথা বাকি মূল্যের সুরতটিতে মতবিরোধ নেই; বরং সকলের ঐকমত্যে উক্ত মূল্য পরিশোধের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) বলেন, সহীহ হলো মূল্য বাকি হলে সে ক্ষেত্রেও স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। আল্লামা সারাখসী (র.) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তিনটি মাসআলায়ই ফতোয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের উপর।

-[ফতোয়ায়ে শামী, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ. ৪৬৩]

قَالَ : وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ وَمَؤُنَةٌ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى بَيَانِ مَكَانِ الْإِيْفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ قِيْمَتُهُ، وَيُوَفِّيْهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيْهِ، قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهٰذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْبُيُوْعِ، وَ ذُكِرَ فِي الْإِجَارَاتِ أَنَّهُ يُوَفِّيْهِ فِيْ أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ كُلَّهَا سَوَاءٌ وَلَا وُجُوْبَ فِي الْحَالِ، وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا قِيْلَ : لَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّهُ لَا يُفِيْدُ، وَقِيْلَ : يَتَعَيَّنُ، لِأَنَّهُ يُفِيْدُ سُقُوْطَ خَطَرِ الطَّرِيْقِ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمِصْرَ فِيْمَا لَهُ حَمْلٌ وَمَؤُنَةٌ يُكْتَفٰى بِهِ، لِأَنَّهُ مَعَ تَبَايُنِ أَطْرَافِهِ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِيْمَا ذَكَرْنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর যে সকল বস্তু পরিবহন ও খরচসাপেক্ষ নয়, সকলের ঐকমত্যে তা সমর্পণের জন্য স্থান নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, [স্থানভেদে] তার মূল্য বিভিন্ন হয় না। এ ক্ষেত্রে তা সেই স্থানে সমর্পণ করবে যেখানে 'বায় সলম' করেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটা হলো জামিউস সাগীর এবং [মাবসূতের] বিক্রয় অধ্যায়ের বর্ণনা। পক্ষান্তরে [মাবসূতের] ইজারা অধ্যায়ে [ইমাম মুহাম্মদ] উল্লেখ করেছেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানে তা হস্তান্তর করবে। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা, [এ ক্ষেত্রে] সকল স্থানই সমান। কেননা, [চুক্তির সময়] তৎক্ষণাৎ সমর্পণ ওয়াজিব হচ্ছে না [তাহলে সে স্থান নির্ধারিত হতো]। আর যদি উভয়ে কোনো একটি স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে কারো কারো মতে তা নির্ধারিত হবে না। কেননা, এ নির্ধারণ কোনো ফায়দা বয়ে আনে না। আর কারো মতে, নির্ধারিত হবে। কেননা, তা পথকে ঝুঁকিমুক্তকরণের ফায়দা বয়ে আনে। আর যে সকল বস্তুর বহন সমস্যা ও পরিবহন খরচ রয়েছে সে ক্ষেত্রে যদি কোনো শহর নির্ধারণ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, শহরের সীমানা বিস্তৃত হলেও আমাদের উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় তা একই স্থানের ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَمْلٌ الخ : যদি দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ নয়, যেমন– অল্প পরিমাণ মেশক, কর্পূর বা জাফরান, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা হস্তান্তরের স্থান চুক্তির সময় উল্লেখ করা অপরিহার্য নয়। কেননা, স্থানের পার্থক্যের কারণে এরূপ দ্রব্যের মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয় না। [এগুলোর ক্ষেত্রে যে মূল্যের পার্থক্য দেখা যায় তা স্থানের পার্থক্যের কারণে নয়; বরং তার বিদ্যমানের স্বল্পতা ও আধিক্য এবং তার প্রতি মানুষের আগ্রহ কম বা বেশি হওয়ার কারণে হয়।] সুতরাং এ ক্ষেত্রে সকল স্থান সমান। তাই সকলের ঐকমত্যে হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। তবে কোন স্থানে তা হস্তান্তর করবে সে ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে–

১. জামিউস সাগীর এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় (بَابُ الْبُيُوْعِ) -এর বর্ণনা হলো, যে স্থানে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে সেখানেই তা হস্তান্তর করবে। কেননা, হস্তান্তর করা সে স্থানেই তার উপর অপরিহার্য হয়েছিল, সুতরাং অন্যান্য স্থানের উপর সে স্থানটি অগ্রাধিকার পাবে।

২. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাবসূত গ্রন্থের "ইজারা অধ্যায়" (كِتَابُ الْإِجَارَةِ)-এর বর্ণনা হলো, চুক্তির স্থানটি এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নয়; বরং যে-কোনো স্থানেই তা হস্তান্তর করতে পারবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাবসূত গ্রন্থের "ইজারা অধ্যায়"-এর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই অধিক সঠিক। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তির সময় তার উপর সাথে সাথে (فِى الْحَالِ) হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয়নি এবং উল্লিখিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমস্ত স্থান সমান। কেননা, তা বহন করতে খরচ ও কষ্ট নেই, ফলে স্থানের পার্থক্যের কারণে তার মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয় না। সুতরাং চুক্তির স্থানটি নির্ধারিত হবে না। অতএব, যে-কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা শামী ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণনা করেছেন যে, উল্লিখিত দুটি বর্ণনার প্রথম বর্ণনাকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন ইবনে কামাল এবং তিনি তা 'মুহীতে সারাখসী' থেকে বর্ণনা করেছেন। এরূপভাবে আল-'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং ফাতহুল কাদীরে আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ মাবসূতের ইজারা অধ্যায়ের বর্ণনাটিই সকল 'মুতুন' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং হিদায়া এবং 'মুলতাকা' গ্রন্থে এটিকেই সঠিক বলে অভিমত পেশ করা হয়েছে। –[ফতোয়ায়ে শামী, খণ্ড–৭, পৃ. ৪৬৪]

قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا الخ: উল্লিখিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি উভয়ে হস্তান্তরের জন্য কোনো স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে সে স্থানটি কি নির্ধারিত হবে নাকি যে কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে সে স্থানটি নির্ধারিত হবে না। কেননা, যে দ্রব্য বহন করতে কষ্ট বা অর্থ খরচ হয় না তা হস্তান্তরের জন্য স্থান নির্ধারণ করায় কোনো লাভ নেই। আর যা শর্ত করায় কোনো লাভ নেই তা শর্ত করা সহীহ নয়। সুতরাং হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করলেও তা নির্ধারিত হবে না।

আর অপর বর্ণনা মতে যদি তারা কোনো স্থান নির্ধারণ করে, তাহলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে এবং সে স্থানেই তা হস্তান্তর করতে হবে। কেননা, যদিও উক্ত দ্রব্য বহন করতে কষ্ট বা অর্থ-খরচ হয় না তবুও স্থান নির্ধারণ করায় পথিমধ্যে উক্ত দ্রব্য নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকার লাভ এবং স্বার্থকতা রয়েছে। কেননা, যদি কোনো স্থান নির্ধারিত থাকে আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] তা অন্য স্থানে দাদনদাতাকে হস্তান্তর করে, তাহলে দাদনগ্রহীতার জন্য আবশ্যক হবে তা উক্ত নির্ধারিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর পথিমধ্যে যদি তা কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি স্থান নির্ধারিত না থাকে আর দাদনগ্রহীতার কোনো স্থানে হস্তান্তর করার পর তা বহন করে কোনো স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে যায় এবং পথিমধ্যে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনদাতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কাজেই এভাবে দাদনদাতা কোনো স্থান নির্ধারণ করে পথের ঝুঁকি দাদনগ্রহীতার উপর দিতে পারে। ফলে স্থান নির্ধারণ করায় তার লাভ হবে। অতএব, তারা স্থান নির্ধারণ করলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এ দ্বিতীয় বর্ণনা অর্থাৎ স্থান নির্ধারণ করলে তা নির্ধারিত হয়ে যাবে– এ বর্ণনাটিকে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) অধিক বিশুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন এবং দুররে মুখতার গ্রন্থেও এটিকে অধিক বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। সুতরাং এর উপরই ফতোয়া হবে। –[ফতোয়ায়ে শামী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَلَوْ عَيَّنَ الْمِصْرَ الخ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যে সকল দ্রব্য বহন করা কষ্টসাধ্য এবং খরচসাপেক্ষ সে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। তবে এ ক্ষেত্রে যদি কোনো শহর নির্দিষ্ট করে তাহলেই যথেষ্ট হবে, শহরের কোনো মহল্লা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে না। কেননা, যদিও শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দূরে হয়ে থাকে তবুও আমাদের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের দিক থেকে অর্থাৎ স্থানের ব্যবধানের কারণে মূল্যের পার্থক্য না হওয়ার দিক থেকে একটি শহরের সকল স্থান একটি স্থানের মতো। কাজেই যে কোনো স্থানে তা হস্তান্তর করতে পারবে। উল্লেখ্য, 'মুহীত', ফাতহুল কাদীর ও আল-বাহরুর রায়িক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত বিধান কেবল এরূপ শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব এক ফারসাখ [প্রায় ৮ কিলোমিটার] না হয়। আর যদি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব এক ফারসাখ বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার নির্দিষ্ট স্থান বা মহল্লা উল্লেখ করা অপরিহার্য। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। 'নাহর' গ্রন্থে এটিকেই সঠিক বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَالَ : وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ حَتّٰى يُقْبَضَ رَأْسُ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فِيْهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنَ النُّقُوْدِ فَلِأَنَّهُ اِفْتِرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَلِأَنَّ السَّلَمَ أَخْذُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ، إِذِ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَافُ يُنْبِئَانِ عَنِ التَّعْجِيْلِ، فَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْإِسْمِ، وَلِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَسْلِيْمِ رَأْسِ الْمَالِ، لِيَتَقَلَّبَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِيْهِ، فَيَقْدِرُ عَلَى التَّسْلِيْمِ، وَلِهٰذَا قُلْنَا: لَا يَصِحُّ السَّلَمُ إِذَا كَانَ فِيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ مَانِعًا مِنَ الْاِنْعِقَادِ فِيْ حَقِّ الْحُكْمِ، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ فِيْهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيْدٍ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ، وَلَوْ أَسْقَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ وَ رَأْسُ الْمَالِ قَائِمٌ جَازَ خِلَافًا لِزُفَرَ (رح) وَقَدْ مَرَّ نَظِيْرُهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মজলিসে একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূলধন হস্তগত না করা পর্যন্ত 'বায় সলম' সহীহ হবে না। কেননা, মূলধন যদি মুদ্রা [দিরহাম-দিনার] হয়, তাহলে এটা হবে 'দাইনের বিনিময় দাইনের' চুক্তি করে পৃথক হওয়া। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকি বস্তুর বিনিময় বাকি বস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর মূলধন যদি [মুদ্রা না হয়ে] নির্দিষ্ট বস্তু হয়, তাহলে [নাজায়েজ হওয়ার] কারণ হলো, 'সলম' হলো বাকির বিনিময়ে নগদ গ্রহণ করা। কেননা, ['সলম' اَلْاَسْلَامُ থেকে নিষ্পন্ন আর] اَلْاَسْلَامُ এবং اَلْاَسْلَافُ শব্দ দুটি দ্রুত করার অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং শব্দের অর্থ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য দুটি বিনিময়ের একটি নগদ গ্রহণ করা অপরিহার্য। আরেকটি কারণ হলো, মূলধন নগদ সমর্পণ করা জরুরি যাতে 'মুসলাম ইলাইহি' [দাদনগ্রহীতা] তা কাজে লাগিয়ে 'মুসলাম ফীহ' [দাদন দ্রব্য] সংগ্রহ করে সমর্পণ করতে পারে। এ কারণেই আমরা বলেছি, যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের উভয়ের পক্ষে কিংবা তাদের কোনো একজনের পক্ষে ইচ্ছাধিকারের শর্ত [খিয়ারে শর্ত] আরোপিত হয়, তাহলে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। কেননা, ইচ্ছাধিকারের শর্ত কব্জা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কারণ, তা হুকুম তথা মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। এরূপভাবে তাতে দেখার ইচ্ছাধিকারও সাব্যস্ত হয় না। কেননা, তা কোনো লাভ বয়ে আনে না। কিন্তু দোষজনিত ইচ্ছাধিকার তার ব্যতিক্রম। কেননা, তা কব্জা পূর্ণ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। আর পৃথক হওয়ার পূর্বেই যদি মূলধন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইচ্ছাধিকারের শর্ত বাতিল করে দেয়, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। এরূপ মাসআলা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ حَتّٰى الخ : 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় একে অপরের থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করা। সুতরাং যদি দাদনগ্রহীতা মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বেই একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে 'বায় সলম' সহীহ হবে না। [উল্লেখ্য, এটি 'বায় সলম'-এর চুক্তি সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত নয়; বরং চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত।]

এ শর্তটির দলিল হলো, মূলধন [রা'সুল মাল] দু ধরনের বস্তু হতে পারে–

১. মূল্যদ্রব্য (اَلنُّقُوْدُ) যেমন– স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা-পয়সা।

২. মূল্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য বস্তু (اَلْعَيْنُ) যেমন– ধান, গম বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্য।

যদি প্রথম প্রকার বস্তু অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা কিংবা টাকা-পয়সা মূলধন [রা'সুল মাল] হয়, তাহলে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হলে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মূল্যদ্রব্য (اَلنُّقُوْدُ) হলো এমন বস্তু যা নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না; সুতরাং তা মজলিসে হস্তগত না করলে দাদনদাতার জিম্মায় তা অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব থেকে যাবে। আর এটাকে 'দাইন' (دَيْنٌ) বলে। অন্যদিকে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-ও দাদনগ্রহীতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়। সুতরাং সেটাও 'দাইন'। অতএব, যদি [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তারা পৃথক হয়ে যায়, তাহলে দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়ের পর পৃথক হওয়া হলো। অথচ পূর্বে রিবা-এর অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ "নবী করীম ﷺ বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" বাকির বিনিময় বাকি বিক্রয়ের অর্থ হলো, দাইন [যা জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়]-এর বিনিময় দাইনের বিক্রয় করা।

আর মূলধন [রা'সুল মাল] যদি দ্বিতীয় প্রকার বস্তু অর্থাৎ মূল্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হয় তাহলে তা হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হলে 'বায় সলম' জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, যদিও এ সুরতে দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয় হচ্ছে না। কারণ, মূল্যদ্রব্য টাকা-পয়সা ছাড়া অন্যান্য বস্তু নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয়, ফলে তা দাইন হয় না। তাই কিয়াসের দাবি অনুযায়ী জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু 'ইসতিহসান' (اِسْتِحْسَانٌ)-এর কারণে এ সুরতেও নাজায়েজ হবে। আর তা হলো, 'সলম' বলা হয় اَخْذُ عَاجِلٍ بِاٰجِلٍ "বাকি বস্তুর বিনিময়ে নগদ বস্তু গ্রহণ করা।" কেননা, سَلَفٌ ও سَلَمٌ উভয় শব্দের একই অর্থ। আর উভয় শব্দ থেকে 'ফে'ল' (فِعْلٌ) ব্যবহৃত হয় بَابُ اِفْعَالٌ থেকে এবং এদের ক্রিয়ামূল বা মাসদার হলো যথাক্রমে اَلْاِسْلَافُ এবং اَلْاِسْلَامُ। আর এ মাসদার দুটি اَلتَّعْجِيْلُ বা নগদ গ্রহণ করা এবং দ্রুত গ্রহণ করার অর্থ প্রদান করে। অতএব 'বায় সলম'-এ যেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] বাকি এবং মেয়াদি হয়ে থাকে, তাই মূলধন [রা'সুল মাল] নগদ গ্রহণ করা অপরিহার্য হবে। যাতে শব্দের আভিধানিক অর্থের দাবি রক্ষিত হয়। কেননা, শরিয়ত 'বায় সলম' যে অর্থে ব্যবহৃত হতো সেই অর্থেই একে বৈধ করেছে। সুতরাং উক্ত অর্থ রক্ষা করার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَسْلِيْمِ رَأْسِ الْمَالِ الخ : দ্বিতীয় আরেকটি দলিল। আর এ দলিলটি বুঝার পূর্বে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে–

১. শরিয়তে 'বায় সলম' জায়েজ হয়েছে অভাবীদের প্রয়োজনের কারণে। অর্থাৎ যার কাছে নগদ অর্থ নেই সে যাতে অন্যের কাছ থেকে তা গ্রহণ করে তা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে তার বিনিময়-দ্রব্য প্রদানে সমর্থ হয় সে জন্য 'বায় সলম' জায়েজ করা হয়েছে।

২. 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার জন্য দাদনগ্রহীতার দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করতে [পরোক্ষভাবে হলেও] সক্ষম হওয়া আবশ্যক। উক্ত দুটি বিষয় জানার পর এবার উল্লিখিত দলিলের ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু দাদনগ্রহীতাকে অভাবী ধরা হচ্ছে তাই চুক্তির মজলিসেই তার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার বিষয়টি শর্ত হওয়া আবশ্যক। যাতে সে তা কাজে লাগিয়ে চুক্তির শর্ত মোতাবেক দাদনকৃত দ্রব্য অর্জন করে তা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়। অন্যথায় তাকে দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তরে সক্ষম বলে সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে না।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا : لَا يَصِحُّ السَّلَمُ الخ : আর যেহেতু চুক্তির মজলিসেই মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করা শর্ত বা অপরিহার্য তাই আমরা বলেছি যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের উভয়ের কিংবা তাদের একজনের 'খিয়ারে শর্ত' থাকে অর্থাৎ এরূপ শর্ত করে যে, আমার দুদিন চুক্তিটি বহাল রাখা বা না রাখার বিষয়ে চিন্তা করে দেখার অধিকার থাকবে, তাহলে চুক্তির মজলিসেই মূলধন হস্তগত করলেও 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কারণ, 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে বস্তুটি হস্তগত করলেও তা পূর্ণরূপে হস্তগত হয় না। কেননা, পূর্ণরূপে হস্তগত তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বস্তুটির উপর দাদনগ্রহীতার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হবে। অথচ এক পক্ষের 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অপর পক্ষের মালিকানা সাব্যস্তই হয় না, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে যদিও মালিকানা সাব্যস্ত হয় কিন্তু তা অপূর্ণাঙ্গ। কেননা, যে পক্ষের 'খিয়ারে

শর্ত' রয়েছে সে তা বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং যখন দাদনগ্রহীতা বস্তুটি হস্তগত করা সত্ত্বেও তাতে তার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হচ্ছে না, তাই তার হস্তগত করাও পূর্ণ হয়নি। আর হস্তগত পূর্ণ না হওয়ার কারণে 'বায় সলম' সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, একরূপভাবে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে 'খিয়ারে রুইয়াত' অর্থাৎ চুক্তির পর ক্রেতা বিক্রেয়-দ্রব্য দেখার পর তা পছন্দ না হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে চুক্তি বাতিল করার অধিকার–সাব্যস্ত হবে না। [উল্লেখ্য, এখানে উদ্দেশ্য হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে মূলধন [রা'সুল মাল] -এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত হবে।] দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত না হওয়ার কারণ হলো, দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ফলপ্রসূ হবে না। কারণ, خِيَارُ الرُّؤْيَةِ-এর ফায়দা হলো, বস্তুটি পছন্দ না হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে চুক্তিটি বাতিল করা। আর এ ফায়দা দাদনকৃত দ্রব্য-এর ক্ষেত্রে অর্জিত হবে না। কেননা, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য নির্দিষ্ট হয় না, বরং তা অনির্দিষ্টভাবে দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়। কাজেই যদি خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে দাদনদাতা যদি পছন্দ না হওয়ার কারণে তা ফিরিয়ে দেয় তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না, বরং শর্ত অনুযায়ী পুনরায় তাকে দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করতে হবে। এভাবে বারবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু চুক্তি বাতিল হবে না। কেননা, চুক্তিটি নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয় যে, তা ফিরিয়ে দিলে চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, خِيَارُ الرُّؤْيَةِ-এর ফায়দা প্রকাশ পাবে না, তাই خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা শর্ত অনুযায়ী তা হস্তান্তর করবে এবং দাদনদাতা তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ الخ : পক্ষান্তরে মূলধন [রা'সুল মাল]-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الْعَيْبِ অর্থাৎ "দ্রব্যের মাঝে ত্রুটি পাওয়া গেলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার" সাব্যস্ত হবে। সুতরাং চুক্তির মজলিসে তা হস্তগত করার পর তাতে যদি ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে। কেননা, মূলধনের ক্ষেত্রে خِيَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হওয়াতে মূলধন হস্তগত হওয়া অসম্পূর্ণ থাকে না। কারণ, উভয়ের যদি পূর্ণ সম্মতি থাকে তাহলে চুক্তি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়, আর চুক্তি পূর্ণরূপে সম্পন্ন হলে কব্জা পূর্ণ হয়। সুতরাং خِيَارُ الْعَيْبِ যেহেতু এর কোনোটির জন্য অন্তরায় নয়, তাই কব্জা পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, خِيَارُ الْعَيْبِ তাতে সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ বলে মূলধনের ক্ষেত্রে خِيَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হবে এ কথা বুঝিয়েছেন নাকি দাদনকৃত দ্রব্যে خِيَارُ الْعَيْبِ সাব্যস্ত হবে তা বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْقَبْضِ বলে যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তাতে বুঝা যায় মূলধনের ক্ষেত্রে خِيَارُ الْعَيْبِ-এর কথাই তিনি বুঝিয়েছেন। এজন্য আমরা এর ব্যাখ্যায় মূলধনের কথাই উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে 'দাদনকৃত দ্রব্য'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় ফাতহুল কাদীরের উক্ত শব্দটি (أَيِ الْمُسْلَمُ فِيهِ) নুসখার ভুল।

قَوْلُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ قَبْلَ الْافْتِرَاقِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الشَّرْطِ থাকলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি এমন হয় যে, চুক্তির সময় চুক্তিকারীদ্বয় خِيَارُ الشَّرْطِ সাব্যস্ত করেছে অতঃপর মজলিসে থাকা অবস্থায়ই যার خِيَارُ الشَّرْطِ ছিল সে তা বাতিল করে দিয়েছে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মতে যদি ততক্ষণ পর্যন্ত মূলধন বিদ্যমান থাকে তবে চুক্তিটি সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে তা আর সহীহ হবে না। আর যদি ততক্ষণে মূলধন [রা'সুল মাল] ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা দাদনগ্রহীতা তা খরচ করে ফেলে, তাহলে কারো মতে চুক্তিটি সহীহ হবে না। উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমতও ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটির অনুরূপ মাসআলা একই মতবিরোধ ও দলিলসহ পূর্বে بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ-এ বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যদি অস্পষ্ট মেয়াদে [যেমন– ফসল কাটার সময়] বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়-চুক্তি করে, তাহলে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু উক্ত অস্পষ্ট মেয়াদ আসার পূর্বে যদি সে মেয়াদ বাতিল করে দেয়, তাহলে আমাদের মতে চুক্তিটি সহীহ হবে। আর ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে তা সহীহ হবে না।

وَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ جَمَعُوهَا فِيْ قَوْلِهِمْ : إِعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعْجِيلُهُ، وَإِعْلَامُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَتَاجِيلُهُ وَبَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ -

অনুবাদ : ফকীহগণ 'বায় সলম'-এর সব কয়টি শর্ত একবাক্যে এভাবে উল্লেখ করেছেন, মূলধন সম্পর্কে অবহিত করা এবং তা দ্রুত হস্তান্তর করা, দাদন-দ্রব্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং তার মেয়াদ উল্লেখ করা, হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা এবং তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ جَمَعُوهَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ফকীহগণ 'বায় সলম'-এর সব কয়টি শর্ত উক্ত একটি বাক্যে উল্লেখ করেছেন।

মূলধন সম্পর্কে অবহিত করা : অর্থাৎ মূলধন [রা'সুল মাল]-এর শ্রেণী, প্রকার, তার গুণাগুণ উল্লেখ করা এবং ওজন, পাত্র বা সংখ্যার হিসেবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা।

দ্রুত হস্তান্তর করা : অর্থাৎ মূলধন চুক্তির মজলিসেই পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তান্তর করা।

দাদনকৃত দ্রব্য সম্পর্কে অবহিত করা : দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর শ্রেণী, প্রকার ও গুণাগুণ উল্লেখ করা এবং যথাযথভাবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা।

মেয়াদ উল্লেখ করা : দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করা।

হস্তান্তরের স্থান উল্লেখ করা : অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য যদি এমন দ্রব্য হয় যা বহন করা কষ্টসাধ্য ও খরচসাপেক্ষ তাহলে তা হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করা।

সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়া : দাদনগ্রহীতার দাদনকৃত দ্রব্য অর্জন করতে সক্ষম হওয়া। অর্থাৎ দাদনকৃত দ্রব্য চুক্তির সময় থেকে মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত তা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হওয়া বা বিদ্যমান থাকা।

فَإِنْ اَسْلَمَ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ فِىْ كُرِّ حِنْطَةٍ مِائَةٌ مِنْهَا دَيْنٌ عَلَى الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ وَمِائَةٌ نَقْدٌ فَالسَّلَمُ فِىْ حِصَّةِ الدَّيْنِ بَاطِلٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ، وَيَجُوزُ فِىْ حِصَّةِ النَّقْدِ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهٖ، وَلَا يَشِيْعُ الْفَسَادُ، لِاَنَّ الْفَسَادَ طَارٍ، اِذِ السَّلَمُ وَقَعَ صَحِيْحًا، وَلِهٰذَا لَوْ نَقَدَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ صَحَّ، اِلَّا اَنَّهٗ يَبْطُلُ بِالْاِفْتِرَاقِ لِمَا بَيَّنَّا، وَهٰذَا لِاَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ فِى الْبَيْعِ، اَلَا تَرٰى اَنَّهُمَا لَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَصَادَقَا اَنْ لَا دَيْنَ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فَيَنْعَقِدُ صَحِيْحًا ـ

অনুবাদ : সুতরাং যদি এক 'কুর' গমের জন্য দুই শত দিরহাম মূলধন হিসেবে প্রদান করে এভাবে যে, একশত দিরহাম 'মুসলাম ইলাইহি'-এর নিকট পাওনা ছিল আর একশত দিরহাম নগদ, তাহলে পাওনা অংশটুকুর 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, কব্জা পাওয়া যায়নি। আর নগদ মূলধনের অংশে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, এ অংশে সকল শর্ত বিদ্যমান রয়েছে। [অপর অংশের] ফাসিদ হওয়া পূর্ণ চুক্তিতে বিস্তৃতি লাভ করবে না। কেননা, ফাসিদ হওয়াটা পরে যুক্ত হয়েছে। যেহেতু 'বায় সলম' প্রথমে সঠিক হয়েছিল। এ কারণেই যদি পৃথক হওয়ার পূর্বে [সম্পূর্ণ] মূলধন নগদ হস্তান্তর করে, তাহলে [সম্পূর্ণ অংশে] 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যাবে। কিন্তু [কব্জা না করে] পৃথক হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। [উল্লিখিত মাসআলায় আমরা যে বলেছি, 'বায় সলম' প্রথমে সঠিক হয়েছিল] তার কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য ঋণ নির্দিষ্ট হয় না। [বরং অনির্দিষ্টরূপে তার অনুরূপ বস্তুর সাথে চুক্তির সম্পর্ক হয়।] তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যদি দু জন ব্যক্তি প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করে এবং পরে তারা একমত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো ঋণ পাওনা ছিল না, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয় না। সুতরাং উল্লিখিত 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি সঠিক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كُرٌّ-এর পরিচয় : كُرٌّ এক 'কুর' সমান ষাট قَفِيْزٌ আর এক قَفِيْزٌ সমান আট মাক্কুক (مَكُّوْكٌ) আর এক মাক্কুক সমান দেড় صَاعٌ সুতরাং এক 'কুর' সমান সাতশত বিশ صَاعٌ আর এক صَاعٌ সমান প্রায় সাড়ে তিন কেজি।

قَوْلُهٗ فَاِنْ اَسْلَمَ مِأَتَىْ دِرْهَمٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, আমরের কাছে যায়েদের একশত দিরহাম পাওনা আছে। এখন যায়েদ আমরের কাছ থেকে এক 'কুর' গম 'বায় সলম' হিসেবে দুইশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল। চুক্তি করার সময় এভাবে বলল যে, তোমার কাছে আমার যে একশত দিরহাম পাওনা আছে সেই একশত দিরহাম এবং এ নগদ একশত দিরহামের বিনিময়ে আমি ক্রয় করলাম। অথবা বলল, আমি দুইশত দিরহামের বিনিময় ক্রয় করলাম, অতঃপর সে নগদ একশত দিরহাম হস্তান্তর করল আর বাকি একশত দিরহাম পাওনা দিরহামের বিনিময় কেটে নিল। এ দু সূরতের যেভাবেই করুক না কেন, বিধান একই হবে। তা হলো, নগদ যে একশত দিরহাম মজলিসে পরিশোধ করেছে সে অংশের 'বায় সলম' সহীহ হবে, আর পাওনা একশত দিরহামের অংশের 'বায় সলম' সহীহ হবে না।

পাওনা একশত দিরহামের অংশে সহীহ না হওয়ার কারণ হলো, সেই একশত দিরহাম মজলিসে হস্তগত করা হয়নি। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন [রা'সুল মাল] চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। আর নগদ একশত দিরহামের অংশে সহীহ হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য সমস্ত শর্ত এখানে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই নগদ একশত দিরহামের অংশের 'বায় সলম' সহীহ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَشِيْعُ الْفَسَادُ لِأَنَّ الْفَسَادَ طَارِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমতের জবাব দিচ্ছেন কেননা. উপরিউক্ত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) বলেন, সম্পূর্ণ অংশের 'বায় সলম' ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যেহেতু চুক্তির মূল অংশ তথা মূলধনের সাথে সম্পৃক্ত তাই তা শক্তিশালী। সুতরাং তা সম্পূর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়বে। মুসান্নিফ (র.) তাঁর এ দলিলের জবাব দিচ্ছেন যে, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি চুক্তিটি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। আর ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যদি মূল চুক্তিতে না হয়ে পরবর্তীতে যুক্ত হয়, তাহলে তা যে অংশে যুক্ত হয় সে অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, অপর অংশে তা বিস্তৃত হয় না। পরবর্তী ইবারতে মুসান্নিফ (র.) এখানে ফাসিদ হওয়ার পর কিভাবে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে তার প্রমাণ বর্ণনা করছেন।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَوْ نَقَدَ رَأْسَ الْمَالِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা বলেছি যে, এখানে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি চুক্তিটি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে, এ কারণেই উক্ত মাসআলায় যদি 'পাওনা একশত দিরহাম' মজলিস থেকে উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তান্তর করে দেয় এবং দাদনগ্রহীতা তা হস্তগত করে, তাহলে উভয় অংশের 'বায় সলম' জায়েজ হয়ে যায়। অথচ চুক্তিটি যদি প্রথমে সহীহ না হতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হতো না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ فِى الْبَيْعِ الخ : এ ইবারতে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলায় পাওনা দিরহামের দিকে চুক্তির সম্পর্ক করা সত্ত্বেও চুক্তিটি কেন সহীহভাবে সম্পাদিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করছেন। তা হলো এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'দাইন' বা পাওনাকে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না। অর্থাৎ কেউ যদি 'দাইন' বা পাওনাকে মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তাহলে নির্দিষ্টভাবে সেই পাওনা [দাইন] মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং পাওনার অনুরূপ বস্তুর সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক হয়। এ কারণেই যদি কেউ পাওনা টাকা বা দাইনের বিনিময়ে কোনো বস্তু বিক্রয় করে অতঃপর ক্রেতা ও বিক্রেতা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, আসলে কোনো পাওনা ছিল না, তাহলে উক্ত বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায় না। অথচ এমন জিনিসকে যদি মূল্য সাব্যস্ত করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে মাল না বা কিছুই না, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে যেহেতু এমন দাইনকে মূল্য নির্ধারণ করেছিল যা কিছুই ছিল না, সেহেতু চুক্তি বাতিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দাইনকে নির্দিষ্ট করলেও যেহেতু নির্দিষ্ট হয় না, তাই বিক্রয় বাতিল হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল দাইন বা পাওনা বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না।

অতএব, আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় যখন দাদনদাতা পাওনা একশত দিরহাম ও নগদ একশত দিরহামকে মূলধন [মূল্য] সাব্যস্ত করেছে, তখন পাওনা একশত দিরহাম মূলধন হিসেবে সাব্যস্ত না হয়ে সাধারণ (مُطْلَقًا) একশত দিরহামের সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে। তাই চুক্তিটি সহীহ হয়ে সম্পাদিত হয়ে যাবে। অতঃপর যখন নগদ একশত দিরহাম হস্তগত করার পর তারা পৃথক হয়ে গেছে, তখন অপর একশত দিরহাম মজলিসে হস্তগত না করার কারণে সে অংশে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। সুতরাং তা সেই অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় যদি উক্ত একশত দিরহাম দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর নিকট পাওনা না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট দাদনদাতার পাওনা হয় আর সেই পাওনাকে মূলধন [রা'সুল মাল] হিসেবে সাব্যস্ত করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উভয় অংশের 'বায় সলম' বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে পাওনা দিরহাম চুক্তিকারীদ্বয়-এর ক্ষেত্রে মাল হিসেবে গণ্য হবে না। আর যা চুক্তিকারীদ্বয় -এর ক্ষেত্রে মাল না তার দিকে চুক্তি সম্পর্কিত করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ، وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ.

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হস্তগত করার পূর্বে মূলধন কিংবা দাদন-দ্রব্যতে অধিকার চর্চা করা বৈধ হবে না। মূলধনের ক্ষেত্রে কারণ হলো, চুক্তির কারণে তাতে যে [দাদনগ্রহীতার] হস্তগত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে তা অধিকার চর্চার কারণে বিনষ্ট হবে। আর দাদন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে কারণ হলো, দাদন-দ্রব্য হলো বিক্রেয়-দ্রব্য। আর হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেয়-দ্রব্যে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الخ : 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর জন্য মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা [যেমন– ক্রয়-বিক্রয় করা, হাদিয়া দেওয়া, তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা ইত্যাদি] জায়েজ নয়। এরূপভাবে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] -এর জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়।

সূরতে মাসআলা হলো, খালেদ বকরের কাছ থেকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে পাঁচ মণ ধান 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল। কিন্তু বকর উক্ত এক হাজার টাকা হস্তগত করার পূর্বেই তা দ্বারা অপর একজনের কাছ থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করে ফেলল বা কাউকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিল, তাহলে এটা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে খালেদ উক্ত পাঁচ মণ ধান হস্তগত করার পূর্বেই তা অপর কারো কাছে বিক্রয় করে দিল কিংবা কাউকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে দিল কিংবা বকরের কাছ থেকে অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে পরিবর্তন করে নিল, তাহলে তাও জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْقَبْضِ الخ : প্রথম সুরতে তথা দাদনগ্রহীতার জন্য মূলধন [রা'সুল মাল]-এর মাঝে অধিকার চর্চা (تصرف) করা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন চুক্তির মজলিসেই হস্তগত করা অপরিহার্য। আর এ শর্তটি চুক্তিকারীদ্বয়ের কারো ব্যক্তিগত হক না; বরং তা শরিয়তের হক। সুতরাং যদি মূলধন হস্তগত করার পূর্বেই তাতে অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা হয়, তাহলে উক্ত শর্তটি বিনষ্ট হয়ে যাবে– মজলিসে তা হস্তগত করা হচ্ছে না, তাই তা জায়েজ হবে না।

আর দ্বিতীয় সুরত তথা দাদনদাতার জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে দাদনকৃত দ্রব্যই হলো– বিক্রীত-দ্রব্য। আর বিক্রীত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা [অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করা, হাদিয়া দেওয়া বা কোনো কাজে লাগানো] জায়েজ নয়। পূর্বে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং দাদনকৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়।

وَلَا يَجُوْزُ الشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيْهِ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيْهِ .

অনুবাদ : [অনুরূপভাবে হস্তগত করার পূর্বে] দাদন-দ্রব্যে কাউকে শরিক করা অথবা তা আসল মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, এটা হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ الشَّرِكَةُ الخ :

মাসআলা : দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর জন্য দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] হস্তগত করার পূর্বে তাতে কাউকে শরিক করা (شِرْكَةٌ) কিংবা ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে তা কারো নিকট বিক্রয় করা (تَوْلِيَةٌ) জায়েজ নয়। কাউকে শরিক করার সুরত হলো, যেমন– দাদনদাতা কাউকে বলল, আমি যা মূলধন [রা'সুল মাল] হিসেবে দিয়েছি তুমি তার অর্ধেক আমাকে প্রদান কর, তাহলে তুমি দাদনকৃত দ্রব্যের অর্ধেকের অংশীদার হয়ে যাবে। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের সুরত হলো, যেমন– দাদনদাতা কাউকে বলল, আমি যা মূলধন হিসেবে দিয়েছি তুমি আমাকে তার সমপরিমাণ প্রদান কর, তাহলে তুমি সম্পূর্ণ দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-এর মালিক হয়ে যাবে।

উল্লিখিত উভয় সুরত নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, কাউকে অংশীদার করার সুরতে যতটুকু অংশে তাকে অংশীদার করল, ততটুকু দাদনকৃত দ্রব্যে হস্তগত করার পূর্বে অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা হলো। আর ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়ের সুরতে সম্পূর্ণ দাদনকৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা (تَصَرُّفٌ) করা হলো। আর ইতঃপূর্বে দলিলসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধন এবং দাদনকৃত দ্রব্য এর কোনোটিতেই হস্তগত করার পূর্বে কোনোরূপ تَصَرُّفٌ করা জায়েজ নয়।

[উল্লেখ্য, উক্ত দুটি সুরত নাজায়েজ হওয়ার বিষয়টি এর পূর্বের ইবারত وَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ -এর দ্বারা বুঝা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, দাদনকৃত দ্রব্যে এ দুটি সুরত (تَوْلِيَةٌ ও شِرْكَةٌ) জন-সমাজে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পক্ষান্তরে مُرَابَحَةٌ [লাভের ভিত্তিতে বিক্রয়] এবং وَضِيْعَةٌ [ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয়] -এর সম্ভাবনা কম।

فَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ كُلَّهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ، أَيْ عِنْدَ الْفَسْخِ وَلِأَنَّهُ أَخَذَ شِبْهًا بِالْمَبِيعِ فَلَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ، وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَبِيعًا لِسُقُوطِهِ، فَجُعِلَ رَأْسُ الْمَالِ مَبِيعًا ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ مِثْلُهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْاِبْتِدَاءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ (رحـ) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

অনুবাদ : যদি উভয়ে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে দাদনদাতার জন্য সম্পূর্ণ মূলধন গ্রহণ করার পূর্বে তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে কোনো কিছু ক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তুমি তোমার দাদন-দ্রব্য অথবা মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না", অর্থাৎ 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি রহিত হয়ে যায়। আরেকটি কারণ হলো, মূলধনটি বিক্রেয়-দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে। সুতরাং [বিক্রেয়-দ্রব্যের ন্যায়] তাতেও হস্তগত করার পূর্বে অধিকার চর্চা করা জায়েজ হবে না। আর [দাদন-দ্রব্যটি যে বিক্রেয়-দ্রব্যের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করেছে] তার কারণ হলো, বিক্রয় প্রত্যাহার তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। আর [এ নতুন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] বিক্রেয়-দ্রব্য হিসেবে [মুসলাম ফীহ] বা দাদন দ্রব্যকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং মূলধনকেই বিক্রেয়-দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, মূলধন এখন 'দাইন' বা প্রাপ্য ঋণ হয়ে পড়েছে যেরূপভাবে দাদন-দ্রব্য 'দাইন' ছিল। তবে চুক্তি-প্রত্যাহার মজলিসেই মূলধন হস্তগত করা আবশ্যক নয়। কেননা, এটা সর্বদিক থেকে নতুনভাবে শুরু করা বিক্রয়ের মতো নয়। উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। আমরা যা উল্লেখ করলাম তা তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَمَ الخ : মাসআলা হলো, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা একমত হয়ে 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে দাদনদাতা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে তার দেওয়া মূলধন হস্তগত করার পূর্বে তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো কিছু ক্রয় করা জায়েজ হবে না।

[অবশ্য তা হস্তগত করার পর তা দ্বারা দাদনগ্রহীতার নিকট হতে হোক বা অন্য কারো নিকট হতে হোক-যা ইচ্ছা ক্রয় করতে পারবে।]

দলিল: মুসান্নিফ (র.) এ ক্ষেত্রে দুটি দলিল বর্ণনা করেছেন- ১. নকলী দলিল, ২. আকলী দলিল।

নকলী দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- لَا تَأْخُذْ إِلَّا سَلَمَكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "তুমি তোমার দাদন-দ্রব্য অথবা মূলধন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করো না।" এ হাদীসটির অর্থ হলো, 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি বহাল থাকে তাহলে তুমি দাদনকৃত দ্রব্য

ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবে না, আর 'বায় সলম'-এর চুক্তি যদি বহাল না থাকে তাহলে তুমি [দাদনদাতা] মূলধন ছাড়া অন্য অন্য কিছু গ্রহণ করবে না। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'বায় সলম' -এর চুক্তি প্রত্যাহার করা অবস্থায় দাদনদাতা মূলধন গ্রহণ না করে তার বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারবে না।

উল্লেখ্য, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হুবহু উল্লিখিত শব্দে আমি খুঁজে পাইনি। তবে একই অর্থের হাদীস আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (র.) اَلْعِلَلُ الْكَبِيْرُ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে حَسَنٌ বলেছেন। হাদীসটি এরূপ–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَمَ شَيْئًا فَلَا يَصْرِفْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ .

এছাড়া এ মর্মে مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ এবং مُصَنَّفُ ابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে একটি মওকূফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই– اِذَا اَسْلَفْتَ فِىْ شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ اِلَّا رَأْسَ مَالِكَ اَوِ الَّذِىْ اَسْلَفْتَ فِيْهِ

বিস্তারিত দ্র. ফাতহুল কাদীর, নসবুর রায়াহ।

قَوْلُهُ وَلِاَنَّهُ اَخَذَ شِبْهًا بِالْمَبِيْعِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। দলিলটি হলো, 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহারকালে "মূলধন" মূল্য-দ্রব্য না হয়ে বিক্রেয়-দ্রব্য (مَبِيْع)-এর মতো [অর্থাৎ مَبِيْع -এর مُشَابَه] হয়ে গেছে। আর বিক্রেয়-দ্রব্য বা مَبِيْع -এর বিধান হলো তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে কোনোরূপ অধিকার চর্চা (تَصَرُّفْ) করা [অর্থাৎ ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি] জায়েজ নয়। সুতরাং মূলধন যেহেতু চুক্তিটি প্রত্যাহার কালে বিক্রয় দ্রব্যের মতো হয়ে গেছে, তাই তা হস্তগত করার পূর্বে তা দ্বারা অন্য কিছু ক্রয় করা জায়েজ হবে না। পরের ইবারতে মুসান্নিফ (র.) কিভাবে 'মূলধন' বিক্রেয়-দ্রব্যের মতো হলো তা বর্ণনা করছেন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لِاَنَّ الْاِقَالَةَ بَيْعٌ جَدِيْدٌ فِىْ حَقِّ ثَالِثٍ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর চুক্তি প্রত্যাহার কালে মূলধন মূল্য-দ্রব্য না হয়ে বিক্রেয়-দ্রব্যের মতো হয়ে গেছে, তার কারণ হলো, 'চুক্তি প্রত্যাহার' চুক্তিকারীদ্বয় ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার হিসেবে গণ্য হয় না, বরং তা নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যখন চুক্তিকারীদ্বয় তা প্রত্যাহার করল, তখন এ প্রত্যাহার যেহেতু অন্যদের ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় সেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য কিংবা মূলধন-এর যে-কোনো একটিকে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। আর দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]-কে এ ক্ষেত্রে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, দাদনকৃত দ্রব্য নির্দিষ্ট বস্তু নয়; বরং তা দাদনগ্রহীতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব ছিল। চুক্তিটি প্রত্যাহারের কারণে তা তার জিম্মা থেকে বাদ হয়ে যায়, ফলে তা প্রত্যাহারের পর অবশিষ্ট আছে বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং তা এ ক্ষেত্রে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবে না। কেননা, مَبِيْع এমন বস্তু হতে হবে যা চুক্তিটি প্রত্যাহারের পরও অবশিষ্ট থাকবে। তাই আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে মূলধনকে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। যদিও মূলধন দাইন [জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব বস্তু], কিন্তু দাইনকে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত করতে অসুবিধা নেই। কেননা, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]ও দাইন ছিল, তা সত্ত্বেও তা 'বায় সলম'-এর চুক্তিকালে مَبِيْع হয়েছে। সুতরাং মূলধনও চুক্তি প্রত্যাহারকালে مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারবে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْضُهُ فِى الْمَجْلِسِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি চুক্তি প্রত্যাহার তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে যেহেতু চুক্তিটি ছিল 'বায় সলম'-এর চুক্তি সেহেতু এর প্রত্যাহারও তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'বায় সলম'-ই হবে। আর 'বায় সলম'-এর মাঝে মূলধন [রা'সুল মাল] তো মজলিসেই হস্তগত করা শর্ত। অথচ সকলের ঐকমত্যে চুক্তি প্রত্যাহারকালে মূলধন মজলিসে হস্তগত করা অপরিহার্য নয়; বরং তা মজলিসের পরেও হস্তগত করা জায়েজ।

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন যে, চুক্তি প্রত্যাহার যে নতুন ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য হয় তা পূর্ণরূপে ক্রয়-বিক্রয় নয়; বরং তা একদিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় আর অন্যদিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় নয়। কেননা, তা চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন ক্রয়-বিক্রয় নয়। সুতরাং মূলধন যে মজলিসেই হস্তগত করা শর্ত তা ছিল এমন 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে যা সর্বদিক থেকেই ক্রয়-বিক্রয়। কাজেই সে শর্ত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এর কারণ হলো, মূলধন মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হওয়ার কারণ ছিল যাতে بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ অর্থাৎ "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর আওতাভুক্ত না হয়, যা নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে চুক্তি প্রত্যাহারকালে যেহেতু দাদনকৃত দ্রব্য দাদনগ্রহীতার জিম্মা থেকে বাদ হয়ে যায়, তাই মজলিসে হস্তগত না করলেও بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর আওতাভুক্ত হবে না। তাই প্রত্যাহার -মজলিসে মূলধন হস্তগত করা অপরিহার্য নয়।

[উল্লেখ্য, হিদায়ার ভাষ্যকার اَلْعِنَايَةُ গ্রন্থের লেখক লিখেছেন যে, এখানে আসলে উল্লিখিত প্রশ্ন উত্থাপিতই হওয়ার কথা নয়। কারণ, চুক্তি প্রত্যাহারকালে মূলধন তো مَبِيْع হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তখন তা আর মূলধন হিসেবে গণ্য হবে না। অতএব, তা মজলিসে হস্তগত করার প্রশ্ন উঠবে না।]

قَوْلُهُ وَفِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ (رحـ) وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মাসআলায় ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফার (র.) বলেন, 'বায় সলম'-এর চুক্তি উভয়ে প্রত্যাহার করলে, দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] তার প্রাপ্য মূলধন হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে দাদনগ্রহীতার নিকট হতে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারবে। [ইমাম শারফয়ী (র.)-এর অভিমতও ইমাম যুফার (র.)-এর মতের অনুরূপ।]

ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তিটি প্রত্যাহারের মাধ্যমে 'বায় সলম' বাতিল হয়ে গেছে। ফলে মূলধন দাদনগ্রহীতার নিকট 'দাইন' বা ঋণ হিসেবে দাদনদাতার পাওনা রয়েছে। সুতরাং অন্যান্য 'দাইন' যেরূপ হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারে তদ্রূপ এ 'দাইন' হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে অন্য কিছু ক্রয় করতে পারবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা পূর্বে যে দুটি নকলী ও আকলী দলিল উল্লেখ করেছি তা ইমাম যুফার (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলিল। [উল্লেখ্য, ইমাম যুফার (র.) যা উল্লেখ করেছেন তা-ই কিয়াসের দাবি, আর আমরা যা উল্লেখ করেছি তা কিয়াসের বিপক্ষে 'ইসতিহসান'।]

قَالَ : وَمَنْ اَسْلَمَ فِىْ كُرِّ حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الْاَجَلُ اِشْتَرَى الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ كُرًّا وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، وَاِنْ أَمَرَهُ اَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُ لَهُ ثُمَّ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ، لِاَنَّهُ اِجْتَمَعَتِ الصَّفْقَتَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَلَابُدَّ مِنَ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ، لِنَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِىَ فِيْهِ صَاعَانِ، وَهٰذَا هُوَ مَحْمَلُ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَا مَرَّ، وَالسَّلَمُ وَاِنْ كَانَ سَابِقًا لٰكِنَّ قَبْضَ الْمُسْلَمِ فِيْهِ لَاحِقٌ، وَاِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اِبْتِدَاءِ الْبَيْعِ، لِاَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً، وَاِنْ جُعِلَ عَيْنَهُ فِىْ حَقِّ حُكْمٍ خَاصٍّ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْاِسْتِبْدَالِ فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِّرٰى، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَكَانَ قَرْضًا فَاَمَرَهُ بِقَبْضِ الْكُرِّ جَازَ، لِاَنَّ الْقَرْضَ اِعَارَةٌ، وَلِهٰذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْاِعَارَةِ، فَكَانَ الْمَرْدُوْدُ عَيْنَ الْمَاْخُوْذِ مُطْلَقًا حُكْمًا، فَلَا يَجْتَمِعُ الصَّفْقَتَانِ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ এক 'কুর' [নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ]-এর জন্য 'বায় সলম' করল আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় দাদনগ্রহীতা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে এক 'কুর' গম করে দাদনদাতাকে 'মুসলাম ফীহ' বা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ হিসেবে তা হস্তগত করতে বলল, তাহলে এটা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি সে এভাবে নির্দেশ দেয় যে, প্রথমে তার পক্ষ হয়ে হস্তগত করবে অতঃপর দাদনদাতা তার নিজের জন্য হস্তগত করবে। সুতরাং সে সে হিসেবে প্রথমে [দাদনগ্রহীতার পক্ষ হতে] পরিমাপ করল এরপর নিজের জন্য পরিমাপ করল, তাহলে জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, এখানে পরিমাপ শর্তযুক্ত দুটি চুক্তি একত্রিত হয়েছে। সুতরাং দু-বার পরিমাপ করা আবশ্যক। কারণ, নবী করীম ﷺ দু-বার পরিমাপ করার পূর্বে খাদ্যবস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর এটাই হলো হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র। যেমন পূর্বে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি। আর 'সলম'-এর চুক্তিটি যদিও পূর্ববর্তী, কিন্তু দাদন-দ্রব্য হস্তগতকরণ তো পরবর্তীতে হচ্ছে। আর এ হস্তগতকরণ নতুন বিক্রয়চুক্তির সমতুল্য। কেননা, [হস্তগতকৃত] নির্ধারিত বস্তু প্রকৃতপক্ষে [জিম্মায় সাব্যস্ত] অনির্ধারিত বস্তু থেকে ভিন্ন। যদিও বিশেষ এক হুকুমের ক্ষেত্রে অভিন্ন ধরা হয়। তা হলো, [হস্তগত করার পূর্বে] পরিবর্তন করা। সুতরাং [আলোচ্য মাসআলায় দাদনগ্রহীতার উক্ত গম] ক্রয়ের পর [দাদনদাতার নিকট পুনরায়] বিক্রয় বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি 'বায় সলম' না হয়; বরং কর্জ হয় আর তা পরিশোধের জন্য তাকে উক্ত এক 'কুর' গম কর্জ করার জন্য নির্দেশ দেয়, তাহলে [একবার পরিমাপ করে হস্তগত করলেই] তা জায়েজ হয়ে যাবে। কেননা, কর্জ হচ্ছে [প্রকৃতপক্ষে] 'আরিয়াত' [অর্থাৎ মূল বস্তু অবশিষ্ট রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ধার দেওয়া]। এ কারণেই কর্জ 'আরিয়াত'-এর শব্দ দ্বারা শুদ্ধ হয়। সুতরাং শরিয়তের বিধান হিসেবে [কর্জ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে] ফেরত দেওয়া বস্তুটি সর্বাবস্থায়ই হুবহু গ্রহণকৃত বস্তু বলে গণ্য হয়। অতএব, এ ক্ষেত্রে দুটি চুক্তি একত্র হচ্ছে না। [তাই দু-বার পরিমাপের আবশ্যকতা নেই।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَسْلَمَ فِىْ كُرِّ حِنْطَةٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে 'বায় সলম' হিসেবে এক 'কুর' [অর্থাৎ ষাট কফীয পরিমাণ] গম ক্রয় করল। অতঃপর যখন তা পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] অন্য এক ব্যক্তির নিকট হতে এক 'কুর' গম ক্রয় করে তা নিজে হস্তগত না করে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-কে বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট হতে এক কুর গম তোমার পাওনা হিসেবে হস্তগত করে নাও। ফলে দাদনদাতা উক্ত গম হস্তগত করে নিল। তাহলে দাদনদাতা তার প্রাপ্য গম উসূলকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং উক্ত গম যদি দাদনদাতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর গম হিসেবে ধ্বংস হবে। দাদনদাতা পুনরায় তার গম দাদনগ্রহীতার নিকট দাবি করতে পারবে।

আর যদি দাদনগ্রহীতা এভাবে বলে যে, তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট হতে [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা যার নিকট হতে উক্ত গম ক্রয় করেছে, তার নিকট হতে] প্রথমে আমার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে উক্ত গম কব্জা কর, অতঃপর তা তোমার পাওনা হিসেবে কব্জা কর। তারপর দাদনদাতা উক্ত গম প্রথমে দাদনগ্রহীতার পক্ষ হয়ে মেপে নিল, তারপর নিজের জন্য পুনরায় মেপে নিল। তাহলে সে তার প্রাপ্য গম কব্জাকারী রূপে গণ্য হবে। সুতরাং এরপর তা ধ্বংস হলে তা দাদনদাতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اِجْتَمَعَتِ الصَّفْقَتَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ الخ : উক্ত মাসআলায় দাদনদাতার যে দু-বার পরিমাপ করা অপরিহার্য তার দলিল হলো, এখানে এরূপ দুটি বিক্রয়চুক্তি একত্রিত হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে পরিমাপ করে গ্রহণ করা অপরিহার্য। দুটির একটি হলো, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] এবং সে যার কাছ থেকে উক্ত গম ক্রয় করে দিচ্ছে তাদের উভয়ের মাঝে সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তি। আর অপরটি হলো, দাদনগ্রহীতা এবং দাদনদাতার মাঝে সম্পাদিত বিক্রয়চুক্তি। আর যখন এরূপ দুটি চুক্তি একত্রিত হয়েছে তখন উভয় চুক্তির হস্তান্তর বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য দু-বার পরিমাপ করা অপরিহার্য হবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَجْرِىَ فِيْهِ صَاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِىْ-

"নবী করীম ﷺ খাদ্যদ্রব্য [ক্রয়ের পর তা] দু-বার পরিমাপ করা ব্যতীত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একবার বিক্রেতার পরিমাপ, আরেকবার ক্রেতার পরিমাপ।" এ হাদীসটির এটাই অর্থ। অর্থাৎ যখন ক্রেতা ক্রয়ের পর তা আবার দ্বিতীয় কোনো ক্রেতার নিকট বিক্রয় করে, তখন দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা পুনরায় পরিমাপ করা আবশ্যক। এমনকি সে প্রথম ক্রেতার ক্রয়ের সময় উপস্থিত থেকে তার পরিমাপ প্রত্যক্ষ করে থাকলেও। [উল্লেখ্য, উক্ত হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ-এর শেষে একটি অনুচ্ছেদ (فَصْل) -এ ৫৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে جَيِّدٌ সনদে এবং মুসনাদে বাযযার, সুনানে দারাকুতনী ও মুসান্নাফে ইবনে আবূ শাইবায় হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالسَّلَمُ وَاِنْ كَانَ سَابِقًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, উল্লিখিত মাসআলায় দাদনগ্রহীতা যে অপর ব্যক্তিটি থেকে উক্ত গম ক্রয় করেছে সে চুক্তিটি তো হয়েছে পরবর্তীতে পক্ষান্তরে দাদনগ্রহীতা ও দাদনদাতার মাঝে 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি হয়েছিল তার অনেক পূর্বে। সুতরাং উক্ত গম দাদনগ্রহীতা ক্রয় করার পর তাতে আর নতুন কোনো চুক্তি হচ্ছে না। অতএব, তাতে দুটি বিক্রয় চুক্তি একত্রিত হচ্ছে না। কাজেই দু-বার পরিমাপ করার আবশ্যকতা কেন হবে? কেননা, উল্লিখিত হাদীসের অর্থ হলো, কেউ খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের পর তা আবার বিক্রয় করলে তখন দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য তা আবার পরিমাপ করা আবশ্যক হবে।

মুসান্নিফ (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতার মাঝে সম্পাদিত 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি যদিও অনেক পূর্বে সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু তার দ্রব্য [এক কুর গম] দাদনদাতা হস্তগত করছে দাদনগ্রহীতা উক্ত গম অপর ব্যক্তিটি থেকে ক্রয় করার পর। আর দাদনদাতার এ হস্তগত করা 'নতুন বিক্রয়'-এর সমপর্যায়ের বলে গণ্য হবে। এভাবে দাদনগ্রহীতা গম ক্রয়ের পর তাতে আরেকটি বিক্রয়চুক্তি হয়েছে বলে সাব্যস্ত হলো, তাই তাতে দু-বার পরিমাপ করা আবশ্যব হবে।

বাকি রইল এ বিষয়টি যে, দাদনদাতার উক্ত হস্তগত করা কেন নতুন বিক্রয় বলে গণ্য হবে অথচ 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি তো পূর্বেই হয়েছিল। এখন তো শুধু হস্তগত করছে। মুসান্নিফ (র.) لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً বলে এর ব্যাখ্যা করছেন এর ব্যাখ্যা হচ্ছে- দাদনগ্রহীতার জিম্মায় 'বায় সলম'-এর কারণে যে এক কুর গম হস্তান্তর করা ওয়াজিব হয়েছিল, তা ওয়াজিব হয়েছিল অনির্দিষ্টভাবে শর্ত মোতাবেক যে কোনো গম।

আর এরূপ ওয়াজিব বস্তুকে দাইন (دَيْن) বলে। সুতরাং দাদনগ্রহীতার ক্রয়কৃত গম যখন দাদনদাতা হস্তান্তর করছে তখন তা নির্দিষ্ট গম হলো, আর এটাকে عَيْن বা নির্দিষ্ট বস্তু বলে। অতএব, জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া অনির্দিষ্ট বস্তু (دَيْن)-এর বিনিময়ে যখন নির্দিষ্ট বস্তু (عَيْن) প্রদান করছে তখন বিষয়টি এরূপ গণ্য হবে না যে, যা জিম্মায় ওয়াজিব ছিল এবং যা সে পরিশোধ করল উভয়টি হুবহু একই বস্তু; বরং এরূপ গণ্য হবে যে, যা জিম্মায় ওয়াজিব ছিল তার বিনিময়ে পরিশোধকৃত বস্তুটি যেন ক্রয় করে নিচ্ছে। এভাবে দাদনদাতা উক্ত এক কুর গম হস্তগত করার সময় যেন নতুনভাবে ক্রয় করল।

قَوْلُهُ وَإِنْ جُعِلَ عَيْنُهُ فِيْ حُكْمٍ خَاصٍّ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে একটি দিক থেকে উক্ত "দাদনগ্রহীতার জিম্মায় যা ওয়াজিব ছিল এবং যা সে পরিশোধ করেছে" এ উভয়কে হুবহু একই বস্তু হিসেবে গণ্য করতে হবে। তা হলো ইতঃপূর্বে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, দাদনগ্রহীতার উপর যে, দাদনকৃত দ্রব্য হস্তান্তর করা ওয়াজিব তা দাদনদাতা 'হস্তগত' করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা হারাম। অতএব, শর্ত মোতাবেক হস্তান্তরকৃত গমকে যদি জিম্মায় ওয়াজিব হওয়া গমের পরিবর্তে গণ্য করা হয়, তাহলে তা হারাম হচ্ছে। আর তাহলে তো দাদনকৃত দ্রব্য কোনোভাবেই হস্তান্তর করা সম্ভব থাকছে না। তাই এ ক্ষেত্রে এটা হুবহু একই বস্তু বলে গণ্য করতে হবে- বিনিময় বা পরিবর্তন বলে গণ্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে [যেমন আলোচ্য মূল মাসআলায় দু-বার পরিমাণ আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে] এটাকে পরিবর্তন বা বিনিময় তথা নতুন বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَمًا وَكَانَ قَرْضًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি মাসআলা বর্ণনা করছেন। তা হলো, আমাদের প্রথমে বর্ণিত মূল মাসআলাটি যদি 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে না হয়ে 'কর্জ' গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়, যেমন- কোনো ব্যক্তি কারো নিকট হতে এক কুর গম কর্জ হিসেবে নিল। অতঃপর কর্জ পরিশোধের সময় সে অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে এক কুর গম খরিদ করে নিজে তা হস্তগত না করে কর্জদাতাকে বলল, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছ থেকে এক কুর গম তোমার পাওনা গম হিসেবে হস্তগত করে নাও। আর কর্জদাতা তা একবার পরিমাপ করে হস্তগত করে নিল। তাহলে এই একবার পরিমাপ করার দ্বারা সে তার প্রাপ্য উসুলকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে দু-বার পরিমাপ করার আবশ্যকতা থাকবে না।

এর কারণ হলো, কর্জ বিধানগতভাবে 'আরিয়াত' (اَلْعَارِيَةُ) বা ধার গ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়। আর আরিয়াত বা ধার গ্রহণ বলা হয়- কোনো বস্তু কারো থেকে এ শর্তে গ্রহণ করা যে, মূল বস্তুটি মালিককে ফিরিয়ে দিবে আর কিছু সময়ের জন্য সে তা থেকে উপকৃত হবে [যেমন- রান্না করার জন্য কারো কাছ থেকে একটি পাতিল ধার গ্রহণ করল।] আর কর্জের ক্ষেত্রে যদিও মূল বস্তুটি খরচ করে তার অনুরূপ বস্তু কর্জদাতাকে দেওয়া হয় তবুও বিধানগত দিক থেকে তাকে আরিয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যথায় 'রিবা'র আওতাভুক্ত হয়ে হারাম হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, যদি কোনো ওজন-পরিমাপিত কিংবা পাত্র-পরিমাপিত দ্রব্য তার একই جِنْس -এর দ্রব্যের বিনিময় পরিবর্তন করে, তাহলে তা বাকির শর্তে হলে রিবা [সুদ] -এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই কর্জকে বিধানগত দিক থেকে (حُكْمًا) সর্বক্ষেত্রে আরিয়াত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ কারণেই আরিয়াতের শব্দ দ্বারা কর্জের চুক্তি সহীহ হয়ে যায়, যেমন কেউ যদি বলে هٰذَا الدَّرَاهِمُ اَعَرْتُكَ 'আমি তোমাকে এ দিরহামগুলো আরিয়াত হিসেবে দিলাম' তাহলে তা কর্জ-চুক্তি রূপে সহীহ হয়ে যায়। অতএব যখন কর্জ পরিশোধ করা হয় তখন তাকে আরিয়াতের ন্যায় মূল বস্তুটিই ফেরত দিয়েছে এরূপ গণ্য করা হবে। তাই তাকে নতুন বিনিময় বা বিক্রয় বলে গণ্য করা হবে না। কাজেই উক্ত মাসআলায় দুটি বিক্রয়চুক্তি একত্রিত হচ্ছে না, তাই দু-বার হস্তগত করা আবশ্যক হবে না।

قَالَ : وَمَنْ اَسْلَمَ فِىْ كُرٍّ فَاَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ اَنْ يَكِيْلَهُ الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ فِىْ غَرَائِرِ رَبِّ السَّلَمِ فَفَعَلَ، وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً، لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْكَيْلِ لَمْ يَصِحَّ، لِاَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَ الْاٰمِرِ، لِاَنَّ حَقَّهُ فِى الدَّيْنِ دُوْنَ الْعَيْنِ، فَصَارَ الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ مُسْتَعِيْرًا لِلْغَرَائِرِ مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ فِيْهَا، فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ دَيْنٍ فَدَفَعَ اِلَيْهِ كِيْسًا لِيَزِنَهَا الْمَدْيُوْنُ فِيْهِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক কুর [গমের] জন্য 'বায় সলম' করে আর দাদনদাতা দাদনগ্রহীতাকে উক্ত গম দাদনদাতার বস্তায় মেপে ভরার জন্য নির্দেশ দেয় আর সে দাদনদাতার অনুপস্থিতে তা পালন করে, তাহলে এটা দাদন-দ্রব্য পরিশোধ বলে গণ্য হবে না। কেননা, [দাদনদাতার] নির্দেশ সঠিক হয়নি। কারণ, তার নির্দেশটি তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি। কেননা, তার অধিকার হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর– নির্ধারিত সেই বস্তুর উপর নয়। ফলে বিষয়টি এমন হলো যেন দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার কাছ থেকে বস্তুগুলো ধার নিয়ে তাতে নিজের মালিকানার বস্তু রাখল। সুতরাং এটা এমন হলো যেন তার নিকট কারো কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। অতঃপর পাওনাদার একটি থলে দেনাদারের নিকট দিল যেন সে দিরহামগুলোর মেপে ভরে দেয়। এতে পাওনাদার দিরহামগুলোর কব্জাকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ اَسْلَمَ فِىْ كُرٍّ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ কারো নিকট হতে এক 'কুর' [ষাট কফীয পরিমাণ] গম 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল, অতঃপর যখন তা পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ফীহ]-কে কতগুলো বস্তা দিয়ে বলল, তুমি এগুলোতে আমার প্রাপ্য গম মেপে দাও। এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা যদি দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে উক্ত গম দাদনদাতার বস্তায় মেপে ভরে দেয়, তাহলে এটা হস্তান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। দাদনদাতা পুনরায় তার প্রাপ্য দাবি করতে পারবে। পক্ষান্তরে দাদনগ্রহীতা তা মেপে দেওয়ার সময় যদি দাদনদাতা উপস্থিত থাকে, তাহলে [বস্তাগুলো যারই হোক না কেন সর্বাবস্থায়ই] তা হস্তান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

দলিল হলো, দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] যে দাদনগ্রহীতাকে গমগুলো উক্ত বস্তায় মেপে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তার এ নির্দেশ সঠিক হয়নি। কারণ হলো, নির্দেশের সময় গমগুলোতে দাদনদাতার অধিকার সাব্যস্ত হয়নি; বরং তা দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মালিকানাধীন। দাদনদাতার অধিকার এবং মালিকানা সাব্যস্ত হবে তা হস্তগত করার পর। কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হয় অনির্দিষ্টভাবে [দাইন] হিসেবে। ফলে হস্তান্তরের পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো দ্রব্যে দাদনদাতার মালিকানা বা অধিকার হয় না। সুতরাং দাদনদাতার উক্ত নির্দেশটি তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার কারণে অকার্যকর বলে গণ্য হবে। অতএব, যখন দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে গম মেপে বস্তায় ভরেছে তখন তা হস্তান্তর এবং দাদনদাতার কব্জা হয়েছে বলে গণ্য হবে না; বরং এরূপ গণ্য হবে যে, দাদনগ্রহীতা বস্তাগুলো ধার নিয়ে তাতে নিজের মালিকানার বস্তু ভরে রেখে দিয়েছে। কাজেই তা ধ্বংস হলে দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকেই ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ الخ : উপরিউক্ত মাসআলার একটি নজির হলো, যেমন কেউ কারো নিকট হতে কিছু দিরহাম ঋণ নিল, অতঃপর ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে একটি থলে দিয়ে বলল, তুমি এ থলিতে আমার প্রাপ্য দিরহামগুলো মেপে ভরে দাও, তাহলে এ ক্ষেত্রেও যদি ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার অনুপস্থিতিতে দিরহামলো মেপে ভরে রেখে দেয় তাহলে তা ঋণদাতা হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে না। এ ক্ষেত্রেও কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করেছি।

وَلَوْ كَانَتِ الْحِنْطَةُ مُشْتَرَاةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا صَارَ قَابِضًا ، لِاَنَّ الْاَمْرَ قَدْ صَحَّ حَيْثُ صَادَفَ مِلْكَهُ، لِاَنَّهُ مَلَكَ الْعَيْنَ بِالْبَيْعِ، اَلَا تَرٰى اَنَّهُ لَوْ اَمَرَهُ بِالطَّحْنِ كَانَ الطَّحِيْنُ فِى السَّلَمِ لِلْمُسْلَمِ اِلَيْهِ وَفِى الشِّرٰى لِلْمُشْتَرِىْ لِصِحَّةِ الْاَمْرِ، وَكَذَا اِذَا اَمَرَهُ اَنْ يَصُبَّهُ فِى الْبَحْرِ فِى السَّلَمِ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُسْلَمِ اِلَيْهِ وَفِى الشِّرٰى مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِىْ، وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلِهٰذَا يُكْتَفٰى بِذٰلِكَ الْكَيْلِ فِى الشِّرٰى فِى الصَّحِيْحِ، لِاَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِى الْكَيْلِ، وَالْقَبْضُ بِالْوُقُوْعِ فِىْ غَرَائِرِ الْمُشْتَرِىْ -

---

অনুবাদ : আর পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় গম ['বায় সলম-এর' না হয়ে সাধারণভাবে] ক্রয়কৃত হয়, তাহলে ক্রেতা কব্জাকারী হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার নির্দেশ তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ, সে ক্রয়ের দ্বারাই নির্ধারিত বস্তুটির মালিক হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখ, যদি সে বিক্রেতাকে গম পেষার নির্দেশ দেয়, তাহলে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে আটাগুলো দাদনগ্রহীতার মালিকানাভুক্ত হয়। আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে তা নির্দেশ সঠিক হওয়ার কারণে ক্রেতার মালিকানাভুক্ত হয়। তদ্রূপ যদি তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় [আর বিক্রেতা সেই নির্দেশ পালন করে] তাহলে 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে তা দাদনগ্রহীতা [বিক্রেতা]-এর সম্পদ থেকে ধ্বংস হবে, আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদের উল্লিখিত কারণে [অর্থাৎ নির্দেশ সঠিক হওয়ার কারণে] তা ক্রেতার সম্পদ থেকে ধ্বংস হবে এবং ক্রেতার উপর তার মূল্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই বিশুদ্ধ মতানুসারে সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঐ একটি পরিমাপই যথেষ্ট হবে। কেননা, বিক্রেতা পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর ক্রেতার বস্তায় গম সংরক্ষিত হওয়ার দ্বারা ক্রেতার পক্ষে কব্জা বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَتِ الْحِنْطَةُ الخ : পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতাকে কিছু বস্তা দিয়ে বলে যে, আমার প্রাপ্য গম এগুলোতে মেপে দাও, অতঃপর দাদনগ্রহীতা দাদনদাতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে দাদনদাতা তা কব্জাকারী হয়েছে বলে গণ্য হবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে যে, যদি উক্ত মাসআলাটি 'বায় সলম' -এর না হয়ে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়, তাহলে ক্রেতা কব্জাকারী হবে। অর্থাৎ যদি কেউ কারো নিকট হতে 'বায় সলম' হিসেবে নয়; বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এক 'কুর' পরিমাণ গম ক্রয় করে এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে কতগুলো বস্তা দিয়ে বলল, তুমি এ বস্তাগুলোতে আমার গম মেপে ভরে দাও। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা মেপে ভরে রাখল, তাহলে ক্রেতা উক্ত গম কব্জাকারী হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং মেপে ভরে রাখার পর যদি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়ই গমগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা ক্রেতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে, পুনরায় সে তা দাবি করতে পারবে না; বরং মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاَمْرَ قَدْ صَحَّ حَيْثُ صَادَفَ مِلْكَهُ الخ : 'বায় সলম' এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে উল্লিখিত পার্থক্যের কারণ হলো, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর নির্দেশ সঠিক ছিল না, যার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যখন তার বস্তায় গম মেপে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তখন তার নির্দেশ সঠিক ক্ষেত্রে হয়েছে। কারণ হলো, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে যখন কোনো দ্রব্য ক্রেতা ক্রয় করে, তখন

ক্রয়ের সাথে সাথে বিক্রীত-দ্রব্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন ক্রেতা তার বস্তায় মেপে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তখন তার নির্দেশটি তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে নির্দেশটি সঠিক ও যথার্থ ক্ষেত্রে হয়েছে। অতঃপর যখন বিক্রেতা গমগুলো মেপে ক্রেতার বস্তায় ভরে দিয়েছে তখন বস্তাগুলো যেহেতু ক্রেতার মলিকানাধীন এবং বিধানগত দিক থেকে (حُكْمًا) ক্রেতারই কজায় রয়েছে, সেহেতু তাতে যা ভরে দেওয়া হয়েছে তাও তার কজার অধীনে চলে এসেছে বলে গণ্য হবে। এভাবে ক্রেতা উক্ত গমের কজাকারী সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ أَلَا تَرٰى أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالطَّحْنِ الخ : পূর্বে যে পার্থক্যের কথা বলা হলো, অর্থাৎ 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনকৃত দ্রব্য কজা করার পূর্বে তাতে দাদনদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য ক্রেতা কজা করার পূর্বেই তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এ পার্থক্যের উপর ভিত্তিশীল [উপরে উল্লিখিত মাসআলার অনুরূপ] দুটি উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) এখানে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম উদাহরণ হলো, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] গমগুলো কজা করার পূর্বে দাদনগ্রহীতাকে তা ভাঙ্গিয়ে আটা বানাতে বলে আর দাদনগ্রহীতা তা পালন করে, তাহলে আটা দাদনগ্রহীতার হবে– দাদনদাতার হবে না। কেননা, কজা করার পূর্বে গম দাদনদাতার মালিকানায় আসেনি, তাই তার নির্দেশ সঠিক স্থলে হয়নি। সুতরাং দাদনদাতার জন্য সে আটা গ্রহণ করা হারাম হবে। কারণ, তার প্রাপ্য 'গম' সে কজা করার পূর্বে সে তা দাদনগ্রহীতার আটা দ্বারা পরিবর্তন করেছে যা 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে জায়েজ নয়।

পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা গম কজা করার পূর্বে বিক্রেতাকে তা ভাঙ্গিয়ে আটা বানাতে বলে আর বিক্রেতা তা পালন করে, তাহলে আটা ক্রেতার হবে। কেননা, ক্রয়ের সাথে সাথেই তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই তার নির্দেশ সঠিক স্থলে হয়েছে। আর বিক্রেতা ক্রেতার নির্দেশ অনুসারে তার প্রতিনিধি হিসেবে গম ভাঙ্গিয়েছে। সুতরাং আটা ক্রেতারই মালিকানাধীন হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهُ فِى الْبَحْرِ الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত গমের ক্ষেত্রে যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] গমগুলো হস্তগত করার পূর্বে দাদনগ্রহীতাকে তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় আর দাদনগ্রহীতা তা পালন করে, তাহলে তা দাদনগ্রহীতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রেতাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে তা ক্রেতার পক্ষ থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ পার্থক্যের কারণ তা-ই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হওয়ার কারণে তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে দাদনদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ফলে তার নির্দেশ সঠিক বলে গণ্য হয় না। আর সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত দ্রব্য কজা করার পূর্বেই ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ফলে তার নির্দেশ সঠিক ক্ষেত্রে হয়েছে বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا يَكْتَفِىْ بِذٰلِكَ الْكَيْلِ فِى الشِّرٰى فِى الصَّحِيْحِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা যে বলেছি, সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়ের সাথে সাথে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়, ফলে ক্রয়কৃত দ্রব্যে তার নির্দেশ সঠিক বলে গণ্য হয়, এ কারণেই বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে গমগুলো তার বস্তায় মেপে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে বিক্রেতার এ পরিমাপই ক্রেতার জন্য যথেষ্ট হবে। ক্রেতার জন্য তা পুনরায় পরিমাপ করা আবশ্যক হবে না। আর গম ক্রেতার কজাভুক্ত হয়ে যাবে।

একটি প্রশ্ন ও তার সদুত্তর :

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ক্রেতা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় বিক্রেতা গমগুলো মেপে ভরার দ্বারা কিভাবে ক্রেতার হস্তগত হবে এবং তার জন্য উক্ত পরিমাপই কিভাবে যথেষ্ট হবে? তাহলে তো একই ব্যক্তি অর্পণকারী এবং গ্রহণকারী হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, যা অসম্ভব। মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এই বলে وَالْقَبْضُ بِالْوُقُوْعِ فِىْ غَرَائِرِ الْمُشْتَرِىْ। অর্থাৎ যেহেতু বস্তাগুলো ক্রেতার, তাই ক্রেতার নির্দেশে যখন গমগুলো তাতে ভরে দেওয়া হচ্ছে তখন ক্রেতাই কজাকারীরূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা গ্রহণকারী হচ্ছে না; বরং ক্রেতার বস্তায় গম প্রবেশ করানোর দ্বারা ক্রেতার কজা হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রেতা কেবল অর্পণকারী হলো, গ্রহণকারী হলো না।

وَلَوْ اَمَرَهُ فِى الشِّرٰى اَنْ يَكِيْلَهُ فِىْ غَرَائِرِ الْبَائِعِ فَفَعَلَ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا ، لِاَنَّهُ اِسْتَعَارَ غَرَائِرَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا فَلَا تَصِيْرُ الْغَرَائِرُ فِىْ يَدِهِ ، فَكَذَا مَا يَقَعُ فِيْهَا ، وَصَارَ كَمَا لَوْ اَمَرَهُ اَنْ يَكِيْلَهُ وَيَعْزِلَهُ فِىْ نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ ، لِاَنَّ الْبَيْتَ بِنَوَاحِيْهِ فِىْ يَدِهِ فَلَمْ يَصِرِ الْمُشْتَرِىْ قَابِضًا ـ

অনুবাদ : কিন্তু সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি ক্রেতা বিক্রেতার বস্তায় গমগুলো মেপে ভরার জন্য নির্দেশ দেয়, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা কব্জাকারী হলো না। কেননা, সে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার বস্তা ধার নিয়েছে, কিন্তু তা কব্জা করেনি। সুতরাং বস্তা যেরূপ তার হস্তগত হয়নি তদ্রূপ তার ভিতরের গমও হস্তগত হয়নি। ফলে বিষয়টি এমন হলো যে, ক্রেতা গমগুলো মেপে বিক্রেতার ঘরের কোনো এক কোণে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিল। কেননা; সকল কোণসহ ঘরটি বিক্রেতার দখলেই রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা কব্জাকারী হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَمَرَهُ فِى الشِّرٰى الخ : পূর্বের মাসআলায় বলা হয়েছিল যে, ক্রেতা যদি তার নিজের বস্তা বিক্রেতাকে দিয়ে তাতে গম মেপে দেওয়ার নির্দেশ দেয়, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে তাহলে ক্রেতা গম কব্জাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর এখানে বলা হচ্ছে, কিন্তু ক্রেতা যদি নিজের বস্তা না দিয়ে বিক্রেতাকে বলে যে, তুমি তোমার বস্তায় আমার প্রাপ্য গমগুলো মেপে ভরে দাও আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা উক্ত গমের কব্জাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না।

কারণ, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার বস্তা ধার নিচ্ছে। আর ধার করা বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ধার গ্রহণকারী কব্জা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ধার নেওয়া হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয় না। কাজেই বিক্রেতার বস্তা বিক্রেতার কব্জায়ই রয়ে গেল। ফলে সে বস্তায় যে গম রাখা হবে তা-ও বিক্রেতার কব্জাভুক্ত হবে– ক্রেতার কব্জাভুক্ত হবে না।

মাসআলাটি এরূপ হলো, যেমন কেউ কারো নিকট হতে কোনো দ্রব্য ক্রয়ের পর বিক্রেতাকে বলল, তুমি দ্রব্যগুলো মেপে তোমার ঘরের এক কোণে রেখে দাও। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তা পালন করে, তাহলে ক্রেতা উক্ত দ্রব্যের কব্জাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, সম্পূর্ণ ঘর বিক্রেতারই কব্জাভুক্ত রয়েছে, কাজেই তাতে যা কিছু রাখা হবে তাও বিক্রেতার কব্জাভুক্তই থেকে যাবে।

وَلَوِ اجْتَمَعَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ وَالْغَرَائِرُ لِلْمُشْتَرِيْ إِنْ بَدَأَ بِالْعَيْنِ صَارَ قَابِضًا ، أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ الْأَمْرِ فِيْهِ، وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلِاتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ وَبِمِثْلِهِ يَصِيْرُ قَابِضًا ، كَمَنِ اسْتَقْرَضَ حِنْطَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا فِيْ أَرْضِهِ، وَكَمَنْ دَفَعَ إِلَى صَائِغٍ خَاتَمًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيْدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِيْنَارٍ، وَإِنْ بَدَأَ بِالدَّيْنِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا ، أَمَّا الدَّيْنُ فَلِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمِلْكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ، فَصَارَ مُسْتَهْلِكًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَهٰذَا الْخَلْطُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُوْنَ مُرَادُهُ الْبِدَايَةَ بِالْعَيْنِ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوْطِ، لِأَنَّ الْخَلْطَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ عِنْدَهُمَا .

অনুবাদ : আর যদি অনির্ধারিত বস্তু [দাইন] এবং নির্ধারিত বস্তু [আইন] একত্রিত হয় আর বস্তা ক্রেতারই হয়, তাহলে নির্ধারিত বস্তু আগে মাপলে ক্রেতা [উভয় প্রকারের] কজাকারী হিসেবে গণ্য হবে। নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, তার নির্দেশ সঠিক ছিল। আর অনির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে কারণ হলো, সেটা [তার মালিকানাভুক্ত না হলেও] তার মালিকানাভুক্ত বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে গেছে। আর এভাবেও কজা সাব্যস্ত হয়। যেমন– কেউ গম ঋণ নিল এবং ঋণগ্রহীতা তার জমিতে ঋণদাতাকে উক্ত গম বপন করতে নির্দেশ দিল [তাহলে ঋণগ্রহীতা তা কজাকারীরূপে গণ্য হবে]। অথবা যেমন কোনো ব্যক্তি স্বর্ণকারের নিকট একটি আংটি দিয়ে তাতে স্বর্ণকারের পক্ষ থেকে অর্ধ দিনার যুক্ত করার নির্দেশ দিল [তাহলে উক্ত ব্যক্তি তা কজাকারী রূপে গণ্য হবে]। আর [পূর্বে উল্লিখিত মাসআলায়] যদি সে অনির্ধারিত বস্তু [দাইন] আগে মেপে দেয়, তাহলে ক্রেতা [কোনোটিরই] কজাকারী হবে না। অনির্ধারিত বস্তু [বা দাইন]-এর ক্ষেত্রে কারণ হলো, [মালিকানা না থাকায়] তার নির্দেশ সঠিক হয়নি। আর নির্ধারিত বস্তু [আইন]-এর ক্ষেত্রে কারণ হলো, বিক্রেতা তা সমর্পণ করার পূর্বেই নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তু [অর্থাৎ প্রথমে পরিমাপিত অনির্ধারিত বস্তু]-এর সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রেতা বিক্রীত মাল ধ্বংসকারী হলো। সুতরাং [হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রীত মাল ধ্বংস হওয়ার কারণে] বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এ মিশ্রণ ক্রেতার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টিসূচক ছিল বলে গণ্য হবে না। কেননা, হতে পারে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারিত বস্তুটি প্রথমে মাপা। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রয়চুক্তি রহিত করবে আর ইচ্ছা করলে সে মিশ্রিত দ্রব্যে বিক্রেতার সাথে শরিক হবে। কেননা, সাহেবাইন (র.)-এর মতে মিশ্রিতকরণ ধ্বংস করার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَوِ اجْتَمَعَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ কারো নিকট হতে এক মণ পরিমাণ গম 'বায় সলম' হিসেবে ক্রয় করল, অতঃপর যখন দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] দাদনগ্রহীতার নিকট হতে আরো এক মণ [নির্দিষ্ট] গম সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়-এর ভিত্তিতে ক্রয় করল। [এভাবে দাদনগ্রহীতার উপর দু-মণ গম হস্তান্তর করা ওয়াজিব হলো। এক মণ 'বায় সলম'-এর যা অনির্দিষ্ট [দাইন] আর এক মণ সাধারণ বিক্রয়ের বা নির্দিষ্ট [আইন)।] অতঃপর দাদনদাতা [ক্রেতা] দাদনগ্রহীতা অর্থাৎ বিক্রেতাকে কয়েকটি বস্তা দিয়ে বলল, তুমি এগুলোতে উভয় মণ গম মেপে ভরে দাও। অতঃপর দাদনদাতা [বিক্রেতা] দাদনগ্রহীতার অনুপস্থিতিতে তা মেপে ভরে রাখল। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ গম প্রথমে মেপে ভরে আর 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ পরে ভরে, তাহলে ক্রেতা উভয় মণ গমের কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهٗ أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ الْأَمْرِ فِيْهِ الخ : এ ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণের কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ পূর্ববর্তী মাসআলার দ্বারাই স্পষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য হয় নির্দিষ্ট বস্তু এবং ক্রয়ের সাথে সাথে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং ক্রেতার বস্তায় ভরে দেওয়ার নির্দেশটি তার মালিকানা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তা সঠিক হয়েছে আর গমগুলো তার বস্তায় তার নির্দেশে ভরে দেওয়ার মাধ্যমে তার কব্জা সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

আর 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত এক মণ গমের কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, [যদিও 'বায় সলম' -এর ভিত্তিতে ক্রয়কৃত দ্রব্য অনির্দিষ্টভাবে জিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং তা কব্জা করার পূর্বে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। ফলে তার নির্দেশটি মালিকানাধীন বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি, তবুও এ ক্ষেত্রে কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো,] 'বায় সলম'-এর গমগুলো ক্রেতার নির্দেশে তার অপর এক মণ গমের সাথে [যা তার মালিকানাধীন ছিল এবং ইতোমধ্যে তার কব্জাভুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে তার সাথে] মিশ্রিত করা হয়েছে। আর এভাবে সম্মতিক্রমে যদি ক্রেতার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে বিক্রীত-দ্রব্য মিশ্রিত করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রেতার কব্জা সাব্যস্ত হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.) এর দুটি উদাহরণ উল্লেখ করছেন–

১. قَوْلُهٗ كَمَنِ اسْتَقْرَضَ حِنْطَةً وَأَمَرَهٗ أَنْ يَزْرَعَهَا فِيْ أَرْضِهٖ : যেমন কোনো ব্যক্তি কারো নিকট হতে কিছু গম কর্জ নিল, কিন্তু নিজে তা কব্জা না করে কর্জদাতাকে বলল তুমি গমগুলো আমার জমিতে বপন করে দাও। অতঃপর কর্জদাতা কর্জগ্রহীতার অনুপস্থিতিতে তা বপন করে দিল, তাহলে কর্জগ্রহীতা উক্ত গমের কব্জাকারী হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, গমগুলো তার সম্মতিতে তার মালিকানাধীন বস্তুর সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে।

২. قَوْلُهٗ وَكَمَنْ دَفَعَ إِلٰى صَائِغٍ خَاتَمًا : অথবা যেমন কোনো ব্যক্তি স্বর্ণকারকে একটি আংটি দিয়ে বলল, তুমি এতে তোমার পক্ষ থেকে অর্ধ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ যুক্ত করে দিবে। অতঃপর স্বর্ণকার আংটিদাতার মালিকের অনুপস্থিতিতে তাতে অর্ধ দিনার পরিমাণ যুক্ত করে দিল, তাহলে আংটির মালিক উক্ত অর্ধ দিনারের কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রেও একই কারণ।

قَوْلُهٗ وَإِنْ بَدَأَ بِالدَّيْنِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় যদি বিক্রেতা [মুসলাম ইলাইহি] সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের এক মণ গম প্রথমে বস্তায় না ভরে; বরং 'বায় সলম'-এর এক মণ আগে ভরে আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিক্রীত এক মণ পরে ভরে, তাহলে ক্রেতা [রাব্বুস সলম] কোনো প্রকার গমেরই কব্জাকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে না।

'বায় সলম'-এর এক মণের কজাকারী না হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, অর্থাৎ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'বায় সলম'-এর ভিত্তিতে বিক্রয়কৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] বিক্রেতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে ওয়াজিব হয়, ফলে তা কজা করার পূর্বে তাতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং মালিকানা না থাকার কারণে বস্তায় মেপে দেওয়ার ক্রেতার নির্দেশটি সঠিক ছিল না। তাই ক্রেতার অনুপস্থিতিতে মেপে দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতা কজাকারী সাব্যস্ত হবে না।

আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে এক মণের কজাকারী না হওয়ার কারণ হলো, প্রথমে যে এক মণ বস্তায় ভরা হয়েছে [অর্থাৎ 'বায় সলম' -এর এক মণ] তা তো বিক্রেতার মালিকানারই রয়ে গেছে। অতঃপর যখন সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ ভরেছে তখন বিষয়টি এমন হয়েছে যে, বিক্রেতা বিক্রীত-দ্রব্য ক্রেতাকে হস্তান্তর করার পূর্বে তা আবার নিজের মালিকানাধীন এমন বস্তুর সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে যা থেকে আর পৃথক করা সম্ভব নয়। কেননা, বস্তায় একত্র করার পর উক্ত সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ আর পৃথক করা সম্ভব হবে না। আর বিক্রেতা যদি এরূপ করে, তাহলে এরূপ বিক্রীত-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রীত-দ্রব্যটি বিক্রেতা হস্তান্তরের পূর্বে ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে। ফলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দ্রব্যটি ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে না; বরং ক্রেতার ইচ্ছাধিকার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে চুক্তি বাতিল করে দিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে মিশ্রিত দ্রব্যে বিক্রেতার সাথে অংশীদার হতে পারবে। অর্থাৎ যতটুকু ক্রেতার ছিল ততটুকু পরিমাণ ভাগ করে নিয়ে নিবে।

সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাধারণ বিক্রয়ের এক মণের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে আর 'বায় সলম'-এর এক মণ বিক্রেতা পুনরায় ক্রেতাকে হস্তান্তর করবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا الْخَلْطُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে 'উক্ত বিক্রীত-দ্রব্য বিক্রেতা ধ্বংস করে ফেলেছে বলে গণ্য হবে' এর উপর একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মুসান্নিফ (র.) তার উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য মাসআলায় বিক্রেতা উক্ত গম 'বায় সলম'-এর গমের সাথে মিশ্রিত করেছে ক্রেতার নির্দেশে, কাজেই তা বিক্রেতা ধ্বংস করেছে বলে গণ্য হবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, উক্ত নির্দেশের কারণে এভাবে মিশ্রিত করার প্রতি ক্রেতার সম্মতি ছিল বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, হতে পারে ক্রেতার উদ্দেশ্য ছিল আগে সাধারণ বিক্রয়ের এক মণ মেপে বস্তায় ভরা তারপর 'বায় সলম'-এর এক মণ বস্তায় ভরা, যাতে ক্রেতার কজা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর বিক্রেতা তার বিপরীত করে 'বায় সলম' -এর এক মণ আগে ভরেছে, কাজেই তাতে ক্রেতার সম্মতি ছিল বলে গণ্য হবে না। সুতরাং তা ধ্বংস করেছে বলে সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَمَنْ اَسْلَمَ جَارِيَةً فِى كُرِّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَهَا الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمَاتَتْ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا، وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ جَازَ، لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ تَعْتَمِدُ بَقَاءَ الْعَقْدِ، وَ ذٰلِكَ بِقِيَامِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ، وَفِى السَّلَمِ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ الْمُسْلَمُ فِيْهِ فَصَحَّتِ الْإِقَالَةُ حَالَ بَقَائِهِ، وَإِذَا جَازَ إِبْتِدَاءً أَوْلٰى أَنْ يَبْقٰى إِنْتِهَاءً، لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ، وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ إِنْفَسَخَ فِى الْجَارِيَةِ تَبْعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَقَدْ عَجَزَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ قِيْمَتِهَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক 'কুর' গমের জন্য দাদনরূপে একটি দাসী প্রদান করে এবং দাদনগ্রহীতা তাকে হস্তগত করে। অতঃপর তারা উভয়ে 'সলমের' চুক্তি প্রত্যাহার করে নেয়। তারপর ক্রেতার [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতার] হাতেই দাসীটি মারা যায়, তাহলে কব্জা করার দিন দাসীটির যা মূল্য ছিল তা দাদনগ্রহীতার উপর ধার্য হবে। আর যদি দাসীটির মৃত্যুর পর তারা উভয়ে চুক্তি প্রত্যাহার করে, তবে তা-ও জায়েজ হবে। কেননা, চুক্তি প্রত্যাহার সঠিক হওয়া নির্ভর করে চুক্তি বিদ্যমান থাকার উপর। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [মা'কূদ আলাইহি] বিদ্যমান থাকার মাধ্যমে। আর 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য হচ্ছে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। সুতরাং তা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত চুক্তি প্রত্যাহার করা সঠিক হবে। আর [দ্বিতীয় সুরতে দাসীর মৃত্যুর পর] যখন সূচনা হিসেবেই প্রত্যাহার সঠিক হলো, [তখন প্রথম সুরতে পূর্বের প্রত্যাহার] দাসীর মৃত্যুর পর বহাল থাকা আরো স্বাভাবিক। কেননা, বহাল থাকা সূচনার চেয়ে সহজ হয়ে থাকে। আর যখন [চুক্তি প্রত্যাহারের কারণে] দাদনদ্রব্যের ক্ষেত্রে চুক্তি রহিত হয়ে গেছে তখন [মৃত] দাসীর ক্ষেত্রেও তা অনুবর্তী [তাবে'] হিসেবে রহিত হয়ে যাবে। অতএব, তা ফিরিয়ে দেওয়া তার উপর আবশ্যক। কিন্তু সে যেহেতু [দাসী মারা যাওয়ার কারণে] তাকে ফিরিয়ে দিতে অক্ষম হয়ে পড়েছে সেহেতু তার মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ اَسْلَمَ جَارِيَةً الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কোনো ব্যক্তি 'বায় সলম' হিসেবে এক 'কুর' গম ক্রয় করল একটি দাসীর বিনিময়ে। অর্থাৎ এক 'কুর' গম হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আর দাসীটি হলো মূলধন [রা'সুল মাল]। আর দাসীটি দাদনদাতা হস্তান্তর করে দিল। পরবর্তীতে তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে উক্ত 'বায় সলম' চুক্তিটি প্রত্যাহার (إقَالَة) করে নিল। কিন্তু দাদনদাতা দাসীটি ফেরত হিসেবে কব্জা করার পূর্বেই দাসীটি মারা গেল। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, তাদের চুক্তি প্রত্যাহার বাতিল হয়ে যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যাহার (إقَالَة) সঠিক থাকবে। আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] উক্ত দাসীটির মূল্য ফেরত দিবে। তবে মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেদিন দাদনগ্রহীতা দাসীটি হস্তগত করেছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

আর যদি এমন হয় যে, দাসীটি দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর হাতে প্রথমে মারা গেছে তারপর তারা 'বায় সলম'-এর চুক্তিটি প্রত্যাহার করেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও তাদের চুক্তি প্রত্যাহার (إقالة) সহীহ হবে। আর বিধান পূর্বের মতোই হবে। অর্থাৎ দাসীটি দাদনগ্রহীতা যেদিন হস্তগত করেছিল সেদিনের দাম অনুযায়ী তার মূল্য দাদনদাতাকে ফেরত দিবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ تَعْتَمِدُ بَقَاءَ الْعَقْدِ الخ : মুসান্নিফ (র.) আলোচ্য মাসআলা দুটির দলিল বর্ণনা করেছেন। প্রথমে দ্বিতীয় সুরতটির দলিল বর্ণনা করছেন যে, দাসীটি মারা যাওয়ার পরও তাদের চুক্তি প্রত্যাহার সহীহ হওয়ার কারণ হলো, চুক্তি প্রত্যাহার সহীহ হওয়া নির্ভর করে প্রত্যাহারকাল পর্যন্ত চুক্তিটি বহাল থাকার উপর। আর চুক্তি বহাল থাকা নির্ভর করে চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) বহাল থাকার উপর। আর 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূল বস্তু হলো দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় মূল বস্তু হলো এক 'কুর' গম, যা দাদনগ্রহীতার জিম্মায় ওয়াজিব হিসেবে বহাল আছে। কাজেই দাসীটি মারা যাওয়া সত্ত্বেও চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا جَازَ اِبْتِدَاءً أَوْلَى أَنْ يَبْقَى اِنْتِهَاءً الخ : আর প্রথম সুরতের দলিল হলো, অর্থাৎ চুক্তি প্রত্যাহারের পর দাদনদাতা দাসীটি ফেরত গ্রহণ করার পূর্বেই মারা যাওয়া সত্ত্বেও চুক্তি-প্রত্যাহার (إقالة) সহীহ থাকার দলিল বর্ণনা করছেন যে, পূর্বের সুরতের দলিল অনুযায়ী যখন দাসীটি মারা যাওয়ার পর চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হয়েছে, তখন জীবিত অবস্থায় কৃত প্রত্যাহার (إقالة) মারা যাওয়ার পর সহীহ হিসেবে বহাল থাকা আরো অধিক যুক্তিসঙ্গত হবে। কেননা, কোনো জিনিস [সহীহ হিসেবে] শুরু হওয়া যতটুকু সহজ তার চেয়ে শুরু হওয়ার পর তা বহাল থাকা অধিক সহজ।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَإِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي الْمُسْلَمِ فِيْهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, দাসীটি যখন মারা গেছে তখন দাসীর ক্ষেত্রে কীভাবে চুক্তি-প্রত্যাহারের কার্যকারিতা বাস্তবায়িত হবে? কেননা, যে বস্তুর ক্ষেত্রে প্রত্যাহার বাস্তবায়িত করা হবে সে বস্তুটি তো কার্যকারিতার ক্ষেত্র (مَحَلٌّ) হিসেবে বহাল থাকা আবশ্যক। অথচ দাসীটি মারা যাওয়ার কারণে সে ক্ষেত্র বিদ্যমান নেই।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) তথা উক্ত এক 'কুর' গমের ক্ষেত্রে যখন প্রত্যাহার সহীহ হয়েছে তখন দাসীটি বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও মূল বস্তুর অধীন বস্তু (أَصْل)-এর تَابِعٌ হিসেবে তাতে প্রত্যাহারের কার্যকারিতা সাব্যস্ত হবে। কারণ, অধীন বা تَابِعٌ হিসেবে এমন অনেক বিষয় সাব্যস্ত হয় যা أَصْل বা মূল হিসেবে শর্ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে সাব্যস্ত হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا، وَقَدْ عَجَزَ الخ : যখন উল্লিখিত দলিলের ভিত্তিতে উভয় সুরতে চুক্তি-প্রত্যাহার (إقالة) সহীহ হয়েছে তখন দাদনগ্রহীতার উপর মূলত দাসীটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর যেহেতু তা মারা যাওয়ার কারণে ফেরত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু তার মূল্য ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। তবে মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেদিন দাদনগ্রহীতা দাসীটি হস্তগত করেছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, দাসীটি দাদনগ্রহীতার জিম্মায় আসার سَبَبٌ বা কারণ হলো দাসীটি হস্তগত করা। কাজেই سَبَبٌ যেদিন সংঘটিত হয়েছে সেদিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর মধ্যে দাসীটি কত মূল্যের ছিল তা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে দাদনদাতা সাক্ষ্য পেশ করতে পারলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, আর সে সাক্ষ্য পেশ করতে অক্ষম হলে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] -এর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

وَلَوِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَقَايَلَا فَمَاتَتْ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ بَطَلَتِ الْإِقَالَةُ، وَلَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ. لِأَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فِى الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ. فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ هَلَاكِهَا. فَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ إِبْتِدَاءً. فَلَا تَبْقٰى إِنْتِهَاءً. لِانْعِدَامِ مَحَلِّهِ. وَهٰذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ حَيْثُ يَصِحُّ الْإِقَالَةُ. وَتَبْقٰى بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيْعٌ فِيْهِ ـ

অনুবাদ : আর যদি ['বায় সলম'-এর মাধ্যমে নয়; বরং সাধারণভাবে] এক হাজার দিরহামে একটি দাসী ক্রয় করে, তারপর উভয়ে বিক্রয় প্রত্যাহার করার পর ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায়ই দাসীটি মারা যায়, তাহলে প্রত্যাহার [ইকালাহ] বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দাসীর মৃত্যুর পর বিক্রয় প্রত্যাহার করে, তাহলে প্রত্যাহার [ইকালাহ] বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, সাধারণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [মা'কূদ আলাইহি] হচ্ছে দাসীটিই সুতরাং দাসীটি মারা যাওয়ার পর চুক্তিই অবশিষ্ট থাকছে না। অতএব, সূচনাতেই প্রত্যাহার [ইকালাহ] সঠিক হবে না, কাজেই পরবর্তীতেও তা বহাল থাকবে না। কেননা, চুক্তির ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই। পক্ষান্তরে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের বিধান উক্ত বিধানের বিপরীত। সেখানে [একটি পণ্য হালাক হওয়ার পর] প্রত্যাহার [ইকালাহ] সঠিক হয় এবং একটি পণ্য হালাক হওয়ার পর [পূর্বে কৃত] ইকালাহ বহালও থাকে। কেননা, উভয় বিনিময়দ্রব্য সেখানে বিক্রীত-বস্তু [বা চুক্তির উদ্দিষ্ট বস্তু]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الخ : পূর্বের মাসআলায় দাসীর মৃত্যুবরণ এবং চুক্তি-প্রত্যাহার (اقالہ)-এর বিষয়টি ছিল 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে। আর আলোচ্য মাসআলা তদ্রূপ বিষয়েরই, তবে 'বায় সলম'-এর নয়; বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে। আর এ 'বায় সলম' এবং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্যের কারণে মাসআলা দুটিতে বিধানগত দিক থেকেও পার্থক্য হয়েছে। পূর্বের মাসআলা এবং আলোচ্য মাসআলার এ পার্থক্য বুঝানোই এখানে মূল বিষয়।

সূরতে মাসআলা : এখানের সূরতে মাসআলা হলো, কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একটি দাসী ক্রয় করল এবং বিক্রেতা দাসীটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তরও করল। অতঃপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে বিক্রয়চুক্তিটি প্রত্যাহার (اِقَالَہ) করে নিল। কিন্তু বিক্রেতা দাসীটি ফেরত নেওয়ার পূর্বেই তা ক্রেতার হাতে মৃত্যুবরণ করল। তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রত্যাহার (اِقَالَہ) বাতিল হয়ে যাবে– পূর্বের বিক্রয়ই কার্যকর থাকবে। আর যদি দাসীটি ক্রেতার হাতে আগে মারা যায় তারপর তারা চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَہ) করে, তাহলে তাদের প্রত্যাহার [শুরুতেই] বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের বিক্রয়চুক্তিই কার্যকর থাকবে। উল্লেখ্য, পূর্বে উল্লিখিত 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ উভয় সূরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَہ) সহীহ ছিল, আর এখানে উভয় সূরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَہ) বাতিল হচ্ছে। দলিলের মাঝে এর কারণ স্পষ্ট হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ فِى الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ الخ : আলোচ্য মাসআলায় চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَة) সহীহ না হওয়ার দলিল হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَة) সহীহ হওয়া নির্ভর করে চুক্তি বিদ্যমান থাকার উপর। কেননা, চুক্তি যদি বিদ্যমানই না থাকে, তাহলে তা প্রত্যাহার কিভাবে সম্ভব হবে? আর চুক্তি বিদ্যমান থাকা নির্ভর করে চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) অবশিষ্ট থাকার উপর। আর আলোচ্য মাসআলায় চুক্তির মূল বস্তু তথা বিক্রেয়-দ্রব্য (مَبِيْع) ছিল উক্ত দাসীটি। সুতরাং যখন দাসীটি মারা গেছে তখন আর চুক্তি বিদ্যমান নেই, আর যখন চুক্তি বিদ্যমান নেই তখন চুক্তি-প্রত্যাহার -(اِقَالَة)ও সহীহ হবে না। আর প্রথম সুরতে অর্থাৎ প্রথমে তারা চুক্তি-প্রত্যাহার করার পর ক্রেতা দাসীটি ফেরত গ্রহণ করার পূর্বেই যদি দাসীটি মারা যায় সে ক্ষেত্রে যদিও প্রথমে প্রত্যাহার সহীহ হয়েছিল কিন্তু দাসীটি মারা যাওয়ার কারণে তা আবার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, প্রত্যাহার কার্যকর হওয়ার মূল ক্ষেত্র ছিল দাসীটি। কাজেই সে মারা যাওয়ার ফলে প্রত্যাহার কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্র বিদ্যমান নেই, ফলে চুক্তি প্রত্যাহার (اِقَالَة) বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরিউক্ত দাসীর মাসআলাটি যদি بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ হয়, অর্থাৎ দাসীটি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় না করে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তু (عَيْن) দ্বারা ক্রয় করে, তাহলে উক্ত উভয় সুরতেই চুক্তি-প্রত্যাহার (اِقَالَة) সহীহ হবে, যদি দাসীটি যে বস্তুর বিনিময় ক্রয় করা হয়েছিল তা বিদ্যমান থাকে। কেননা, بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ [পণ্যের বিনিময় পণ্যের বিক্রয়]-এর ক্ষেত্রে উভয় পণ্যই বিক্রেয়-দ্রব্য (مَبِيْع) হিসেবে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যে কোনো একটি যদি ধ্বংস হয়, আর অপরটি বিদ্যমান থাকে তাহলেও চুক্তি বিদ্যমান আছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর চুক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে প্রত্যাহার (اِقَالَة) ও সহীহ হবে।

দাসী মারা যাওয়া এবং চুক্তি-প্রত্যাহার সংক্রান্ত উপরিউক্ত মাসআলাগুলোর সারকথা এই হলো যে, اِقَالَة বা চুক্তি-প্রত্যাহার সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো প্রত্যাহারকালে চুক্তি বিদ্যমান থাকা, আর চুক্তি বিদ্যমান থাকে চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) অবশিষ্ট থাকলে। আর এ চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) হলো, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] আর সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত-দ্রব্য যা মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে। আর (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ) [পণ্যের বিনিময় পণ্যের বিক্রয়] -এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্যই চুক্তির মূল বস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ)।

قَالَ : وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَقَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ شَرَطْتُ رَدِيًّا وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ لَمْ تَشْتَرِطْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ مُتَعَنِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَّةَ، لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَرْبُو عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي الْعَادَةِ، وَفِي عَكْسِهِ قَالُوا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رحـ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الصِّحَّةَ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مُنْكِرًا، وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصِّحَّةَ، وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى -

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি এক 'কুর' গমের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম দাদন রূপে প্রদান করে অতঃপর দাদনগ্রহীতা বলে যে, আমি নিম্নমানের গম দেওয়ার শর্ত করেছিলাম। কিন্তু দাদনদাতা বলে যে, তুমি কোনো শর্ত উল্লেখ করনি, তাহলে দাদনগ্রহীতার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, দাদনদাতার চুক্তিটির বৈধতা অস্বীকার করায় 'হটকারী' [নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী] বলে বিবেচিত হবে। কারণ, দাদনদ্রব্য সাধারণত মূলধনের চেয়ে বেশি [লাভজনক] হয়ে থাকে। আর বিপরীত মাসআলার ক্ষেত্রে [অর্থাৎ দাদনদাতা নির্দিষ্ট গুণ উল্লেখের দাবি করে, আর দাদনগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, সে ক্ষেত্রে] ফকীহগণ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সে চুক্তিটি বৈধ হওয়ার দাবি করেছে, যদিও তার প্রতিপক্ষ এ ক্ষেত্রে অস্বীকারকারী [মুনকির] হচ্ছে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতানুসারে দাদনগ্রহীতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে অস্বীকারকারী [মুনকির], যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আমরা বিষয়টি আলোচনা করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ الخ : এখান থেকে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] কিরূপ মানের দেওয়ার শর্ত ছিল এ ব্যাপারে যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্যও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বুঝে নিলে আলোচ্য মাসআলা এবং এর পরবর্তী মাসআলাগুলো বুঝা সহজ হবে। মূলনীতিটি হলো−

যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের মাঝে চুক্তির পরবর্তী সময়ে চুক্তির শর্তসমূহ কিরূপ ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একজনের দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ হয়নি বলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়, আর অপর জনের দাবি অনুসারে তা সহীহ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে− যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল না সে যদি مُتَعَنِّتٌ অর্থাৎ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে গণ্য হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং অপর জনের দাবি গ্রহণ করা হবে।

আর যদি সে مُتَعَنِّتٌ বলে গণ্য না হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার বিপক্ষ مُنْكِرٌ বা 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় যে مُنْكِرٌ 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, এ মূলনীতিটি মুসান্নিফ (র.) পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, আমরা মাসআলাগুলো সহজে বুঝার জন্য তা আগেই উল্লেখ করলাম।

সূরতে মাসআলা : কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে 'বায় সলম' হিসেবে এক 'কুর' পরিমাণ গম ক্রয় করল। অতঃপর যখন উক্ত গম পরিশোধের সময় হলো তখন দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলল, আমি নিম্নমানের গম দেওয়ার কথা শর্ত

হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম। আর দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলল, গম কি মানের হবে এরূপ কোনো শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য, 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য দ্রব্যটির গুণ বা কি মানের হবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করা শর্ত। সুতরাং দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] কার্যত চুক্তিটি সহীহ না হওয়ার দাবি করছে, আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে। এ ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্যে [কারো পক্ষে যদি সাক্ষ্য না থাকে তাহলে] দাদনগ্রহীতার কথা [শপথ সহকারে] গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ رَبَّ السَّلَمِ مُتَعَنِّتٌ فِيْ إِنْكَارِهِ الصِّحَّةَ الخ : কারণ হলো, দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] যখন দাবি করছে যে, গমের গুণাগুণের শর্ত উল্লেখ করা হয়নি তখন সে কার্যত চুক্তিটি সহীহ হওয়া অস্বীকার করছে। আর এ ক্ষেত্রে সে مُتَعَنِّتٌ অর্থাৎ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে সাব্যস্ত হচ্ছে। কারণ হলো, মূল্যমানের দিক থেকে মূলধনের তুলনায় দাদনকৃত দ্রব্য সাধারণত অধিক লাভজনক হয়ে থাকে। এ কারণেই দেখা যায় দাদনকৃত দ্রব্য বাকি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ 'বায় সলম' করতে আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দাদনদাতা চুক্তিটি সহীহ না হলে কেবল তার মূলধন ফেরত পাবে, দাদনকৃত দ্রব্য পাবে না। সুতরাং সে مُتَعَنِّتٌ বা 'নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হবে। আর ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, مُتَعَنِّتٌ বা 'নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" সাব্যস্ত হলে তার কথা সকলের ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই দাদনগ্রহীতার কথাই শপথ সহকারে গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, ইমাম সারাখসী (র.) এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতার দাবি গ্রহণযোগ্য হওয়ার আরো দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. দাদনগ্রহীতাই যেহেতু 'বায় সলম'-এর মাধ্যমে উক্ত গম হস্তান্তর করা নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে নিয়েছে, তাই কীরূপ গম সে নিজের জিম্মায় নিয়েছে সে ক্ষেত্রে তার কথাই অগ্রাধিকার পাবে।

২. 'বায় সলম' -এর চুক্তি যে তাদের মাঝে সম্পাদিত হয়েছে এ ব্যাপারে উভয়ে যখন একমত হয়েছে তখন তা সহীহ হওয়ার শর্ত মোতাবেক হয়েছে এ ব্যাপারেও একমত বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন দাদনদাতা গুণ উল্লেখের কথা অস্বীকার করছে তখন সে যেন তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসতে চাচ্ছে, কাজেই তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ عَكْسِهِ قَالُوْا يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الْقَوْلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আর মাসআলাটি যদি পূর্বের সুরতের বিপরীত হয়, অর্থাৎ দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলে যে, চুক্তির সময় উৎকৃষ্ট মানের [এখানে বিপরীত সুরত বলতে 'দাদনদাতার উৎকৃষ্ট গমের দাবি আর দাদনগ্রহীতার শর্ত উল্লেখের কথা অস্বীকার' বুঝানো হয়েছে। কিন্তু হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থগুলো বিপরীত সুরত বলতে 'দাদনদাতার নিকৃষ্ট গমের দাবি আর দাদনগ্রহীতার শর্ত উল্লেখের কথা অস্বীকার' বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অধমের মতে দাদনদাতার নিকৃষ্ট গমের দাবির কোনো যৌক্তিকতা নেই।] গমের শর্ত করা হয়েছিল আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলে যে, কি মানের হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে তার বিধান কি হবে তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেননি। তবে পরবর্তী মাশায়েখগণ বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথা [শপথ সহকারে] গ্রহণ করা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে দাদনদাতা কার্যত চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে। কারণ, তার কথা অনুযায়ী চুক্তির সময় গমের গুণাগুণ উল্লেখ করা হয়েছে যা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। পক্ষান্তরে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] কার্যত চুক্তিটি সহীহ না হওয়ার দাবি করছে। কেননা, সে গুণাগুণ উল্লেখের কথা অস্বীকার করছে। আর ভূমিকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যার দাবি অনুসারে চুক্তি সহীহ হওয়া সাব্যস্ত হবে তার দাবি গ্রহণ করা হবে, যদিও তার প্রতিপক্ষ مُنْكِرٌ বা অস্বীকারকারী হয়। কারণ, মু'মিন সহীহ চুক্তি করবে এবং ফাসিদ চুক্তি করা [যা গুনাহ] থেকে বেঁচে থাকবে এটাই ظَاهِرٌ বা স্বাভাবিক দাবি, আর ظَاهِرٌ বা স্বাভাবিক দাবি যার স্বপক্ষে হয় তার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়।

আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে এ ক্ষেত্রে مُنْكِرٌ 'অস্বীকারকারী' সাব্যস্ত হচ্ছে। কারণ, দাদনদাতা তার বিপক্ষে উৎকৃষ্ট গমের দাবি করছে আর সে তা অস্বীকার করছে। আর হাদীসে আছে- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ যার সারকথা হচ্ছে, দাবিদার প্রমাণ পেশ করবে, আর প্রমাণ না থাকলে শপথ সহকারে অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং দাদনগ্রহীতার কথাই গ্রহণ করা হবে যদিও তার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

وَسَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর উক্ত মতবিরোধের মূলনীতি এবং দলিলের বর্ণনা আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, যদি দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতার মাঝে এভাবে মতবিরোধ দেখা দেয় যে, তাদের একজন দাবি করে উৎকৃষ্ট মানের গমের শর্ত করা হয়েছিল, আর অপরজন দাবি করে নিম্ন মানের গমের শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে কারো স্বপক্ষে যদি প্রমাণ না থাকে তবে উভয়ের শপথ করে বলতে হবে। যদি উভয়ে শপথ করে তাহলে চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ : وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ : بَلْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ، لِأَنَّ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ مُتَعَنِّتٌ فِيْ إِنْكَارِهِ حَقًّا لَهُ، وَهُوَ الْأَجَلُ وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْأَجَلِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ لِمَكَانِ الْإِجْتِهَادِ . فَلَا يُعْتَبَرُ النَّفْعُ فِيْ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، بِخِلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِيْ عَكْسِهِ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَمِ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ حَقًّا عَلَيْهِ، فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ الصِّحَّةَ كَرَبِّ الْمَالِ إِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ شَرَطْتُ لَكَ نِصْفَ الرِّبْحِ إِلَّا عَشَرَةً، وَقَالَ الْمُضَارِبُ لَا بَلْ شَرَطْتَ لِيْ نِصْفَ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ .

অনুবাদ : আর যদি দাদনগ্রহীতা বলে যে, কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল না আর দাদনদাতা বলে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিল, তাহলে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, দাদনগ্রহীতা তার অধিকার নির্ধারিত মেয়াদ অস্বীকার করার কারণে 'হটকারী' বলে বিবেচিত হবে। আর মেয়াদ নির্ধারিত না হলে 'বায় সলম' ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। কারণ, তাতে [ফকীহগণের] মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং মূলধন ফেরত দেওয়া তার জন্য লাভজনক হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। পক্ষান্তরে [পূর্বের মাসআলায়] গুণাগুণ বর্ণনা না করার [মতবিরোধের] বিষয়টি ভিন্ন। [কেননা, গুণাগুণ উল্লেখ না করলে 'বায় সলম' ফাসিদ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মতবিরোধ না থাকায় তা ফাসিদ হওয়া সুনিশ্চিত।] আলোচ্য মাসআলার বিপরীত সুরতে [অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা মেয়াদ উল্লেখের দাবি করলে আর দাদনাদাতা তা অস্বীকার করলে] সাহেবাইন (র.)-এর মতে দাদনদাতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে তার বিপরীতে সাব্যস্ত অধিকার অস্বীকার করছে, সুতরাং তার বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে, যদিও সে চুক্তিটির বৈধতা অস্বীকার করছে। যেমন– [মুদারাবার ক্ষেত্রে] মূলধনদাতা [রাব্বুস সলম] মূলধনগ্রহীতা [মুদারিব]-কে যদি বলে তোমার জন্য আমি দশ দিরহাম রেখে অবশিষ্ট লভ্যাংশের অর্ধেক প্রদানের শর্ত করেছিলাম, আর মুদারিব বলে না; বরং পুরো লভ্যাংশের অর্ধেক প্রদানের শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে 'রাব্বুস সলম' [বা মূলধনদাতার] বক্তব্য গ্রহণ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ الخ : আলোচ্য মাসআলাটিও পূর্বের মাসআলার ভূমিকায় উল্লিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল. সুরতে মাসআলা হলো, যদি দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ফীহ] -এর মাঝে 'চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল কিনা' এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলে যে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি আর দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলে যে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের কেউ যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে আহনাফের সকলের ঐকমত্যে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর দাবি [শপথ সহকারে] গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল বলে সাব্যস্ত হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও অভিমত

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْمُسْلَمَ اِلَيْهِ مُتَعَنِّتٌ فِىْ اِنْكَارِهِ الخ : কেননা, এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] مُتَعَنِّتٌ বা "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে সাব্যস্ত হচ্ছে। কারণ, মেয়াদ লাভ করা দাদনগ্রহীতার স্বার্থের অনুকূল। কেননা, মেয়াদের কারণে সে দাদনকৃত দ্রব্য বিলম্বে হস্তান্তর করার সুযোগ পায়। কাজেই সে তার স্বার্থ বা অধিকার অস্বীকার করার মাধ্যমে مُتَعَنِّتٌ বা "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে সাব্যস্ত হবে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, مُتَعَنِّتٌ বলে যে সাব্যস্ত হবে সকলের ঐকমত্যে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তার বিপক্ষের কথা গ্রহণ করা হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْاَجَلِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ لِمَكَانِ الْاِجْتِهَادِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, এ ক্ষেত্রে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] কেন مُتَعَنِّتٌ বা "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" সাব্যস্ত হবে? কারণ, সে তো প্রকৃতপক্ষে নিজের লাভজনক বস্তু লাভ করার চেষ্টা করছে। কেননা, 'চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি' তার এ দাবি অনুযায়ী চুক্তিটি সহীহ হয়নি। আর চুক্তি সহীহ না হলে তাকে কেবল মূলধন [রা'সুল মাল] ফেরত দিতে হবে, দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দিতে হবে না। ফলে সে লাভবান হবে। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূলধনের তুলনায় দাদনকৃত দ্রব্য সাধারণত অধিক লাভজনক হয়। এ কারণেই তো দাদনকৃত দ্রব্য বাকি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ 'বায় সলম' করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং দাদনদাতা এভাবে নিজের লাভের চেষ্টা করছে। কাজেই সে مُتَعَنِّتٌ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" কেন সাব্যস্ত হবে?

মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে, চুক্তির সময় মেয়াদ উল্লেখ না করলে যে 'বায় সলম' সহীহ হয় না এ বিষয়টি মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। কারণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মেয়াদ উল্লেখ না করলে 'বায় সলম' সহীহ হয়। আর যে বিষয়ে মুজতাহিদগণের মাঝে মতবিরোধ থাকে তা قَطْعِىْ বা 'নিশ্চিত বিষয়' বলে সাব্যস্ত হয় না; বরং তা ظَنِّىْ বা 'ধারণা-নির্ভর' বিষয় বলে সাব্যস্ত হয়। কাজেই ظَنِّىْ বিষয়ের মাধ্যমে তার লাভের দাবি ধর্তব্য হবে না। কেননা, মেয়াদ উল্লেখের কথা অস্বীকার করে مُتَعَنِّتٌ বা "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি হলো قَطْعِىْ বা নিশ্চিত। আর قَطْعِىْ বিষয়ের বিপক্ষে ظَنِّىْ বিষয় ধর্তব্য হয় না। সুতরাং 'চুক্তি সহীহ না হলে সে মূলধন ফিরিয়ে দিয়ে লাভবান হবে' এ বিষয়টি ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ : পক্ষান্তরে এর পূর্বের মাসআলায় অর্থাৎ 'গম কি মানের হবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করা হয়েছিল কিনা' এ ব্যাপারে মতবিরোধের মাসআলায় বিষয়টি ছিল ভিন্ন। কেননা, চুক্তির সময় গমের গুণাগুণ বা মান উল্লেখ না করা হলে চুক্তি সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই। কাজেই তা قَطْعِىْ বা নিশ্চিত বিষয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ عَكْسِهِ الْقَوْلُ لِرَبِّ السَّلَمِ عِنْدَهُمَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসআলাটি যদি পূর্বের সুরতের বিপরীত হয়। অর্থাৎ দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] বলে যে, মেয়াদের কথা চুক্তির সময় উল্লেখ করা হয়েছিল আর দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলে, মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে সাহেবাইন (র.)-এর মতে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] এর কথা গ্রহণ করা হবে আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ يُنْكِرُ حَقًّا عَلَيْهِ، فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর দলিল বর্ণনা করছেন। তাঁদের দলিল হলো, উক্ত সুরতে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] তার দাবি অনুসারে যদিও চুক্তিটি সহীহ হওয়া অস্বীকার করছে, কিন্তু সে এ ক্ষেত্রে مُنْكِرٌ বা অস্বীকারকারী আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] হচ্ছে مُدَّعِىْ বা দাবিদার।

আর বিধান হলো, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ অর্থাৎ "যে দাবিদার সে প্রমাণ পেশ করবে অন্যথায় যে مُنْكِرْ বা অস্বীকারকারী তার কথা শপথ সহকারে গ্রহণ করা হবে।" সুতরাং এখানে যেহেতু দাদনগ্রহীতা প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম নয়, তাই দাদনদাতার কথাই গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে مُنْكِرْ বা অস্বীকারকারী। এখানে দাদনদাতা مُنْكِرْ বা অস্বীকারকারী এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] مُدَّعِىْ বা দাবিদার হওয়ার কারণ হলো, 'মেয়াদ লাভ করা' দাদনগ্রহীতার জন্য লাভজনক। কেননা, সে মেয়াদের পূর্ণ সময়ে মূলধন কাজে লাগিয়ে বা ব্যবসা করে তার দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] অর্জনের সুযোগ লাভ করে। কাজেই দাদনগ্রহীতা 'চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল' বলে তার এ লাভের বিষয়ের দাবিদার হলো। আর 'মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া' দাদনদাতার স্বার্থের বিপরীত। কেননা, সে মেয়াদের কারণে দাদনকৃত দ্রব্য বিলম্বে লাভ করে। কাজেই 'চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করা হয়নি' বলে তার বিপক্ষে সাব্যস্ত হবে এমন বিষয়কে সে অস্বীকার করছে। সুতরাং সে مُنْكِرْ বা অস্বীকারকারী।

قَوْلُهُ كَرَبِّ الْمَالِ إِذَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ الخ : সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে একটি নজির পেশ করা হচ্ছে। তা হলো, مُضَارَبَة [মুদারাবা] -এর মাসআলার ক্ষেত্রে যদি 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী] এবং 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়; রাব্বুল মাল [মূলধন প্রদানকারী] বলে যে, আমি চুক্তির সময় এরূপ শর্ত করেছিলাম যে, লভ্যাংশ থেকে আমি প্রথমে দশ দিরহাম নিব তারপর অবশিষ্ট লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন করে নেওয়া হবে, আর 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী] বলে যে, না বরং সম্পূর্ণ লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে সমান হারে বণ্টন করা হবে এরূপ শর্ত করা হয়েছিল, তাহলে সকলের ঐকমত্যে 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। কারণ, সে এ ক্ষেত্রে মুদারিব যে সম্পূর্ণ লভ্যাংশের অর্ধেকের দাবি করছে তা অস্বীকার করছে। অথচ এ ক্ষেত্রেও 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা অনুসারে 'চুক্তিটি সহীহ না' আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, মুদারাবার ক্ষেত্রে 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী] যদি নিজের জন্য লভ্যাংশের কোনো নির্দিষ্ট অংশ শর্ত করে, তাহলে মুদারাবার চুক্তি সহীহ হয় না। তা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে مُنْكِرْ বা অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে সকলের ঐকমত্যে 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

لِاَنَّهُ يُنْكِرُ اِسْتِحْقَاقَ الرِّبْحِ، وَاِنْ اَنْكَرَ الصِّحَّةَ، وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ اِلَيْهِ، لِاَنَّهُ يَدَّعِى الصِّحَّةَ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلٰى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَكَانَا مُتَّفِقَيْنِ عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا، بِخِلَافِ مَسْاَلَةِ الْمُضَارَبَةِ، وَلِاَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ دَعْوٰى اِسْتِحْقَاقِ الرِّبْحِ، اَمَّا السَّلَمُ فَلَازِمٌ، فَصَارَ الْاَصْلُ اَنَّ مَنْ خَرَجَ كَلَامُهُ تَعَنُّتًا فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ بِالْاِتِّفَاقِ، وَاِنْ خَرَجَ خُصُوْمَةً وَ وَقَعَ الْاِتِّفَاقُ عَلٰى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الصِّحَّةِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا لِلْمُنْكِرِ، وَاِنْ اَنْكَرَ الصِّحَّةَ ـ

অনুবাদ : কেননা, সে তার নিকট হক প্রাপ্যতা অস্বীকার করছে, যদিও সে [দশ দিরহাম বা রাখার কারণে] চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাদনগ্রহীতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। কেননা, সে চুক্তিটি বৈধ হওয়ার দাবি করছে। আর তারা উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়েছে। সুতরাং তার বৈধতার ব্যাপারেও দৃশ্যত একমত বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে মুদারাবার মাসআলাটি অনুরূপ নয়। [কারণ, তারা একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হচ্ছে না। কেননা, মুদারাবা সঠিক হলে তা 'শিরকাত' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়, আর ফাসিদ হলে ইজারার অন্তর্ভুক্ত হয়।] উভয়ের মাঝে পার্থক্যের আরেকটি কারণ হলো, মুদারাবার চুক্তি বাধ্যতামূলক পালনীয় চুক্তি নয় [যে কোনো পক্ষ তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে।] সুতরাং তাতে মতবিরোধ ধর্তব্য হবে না। ফলে মুদারিব কর্তৃক লভ্যাংশের প্রাপ্যতার দাবি অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে 'সলম' হচ্ছে বাধ্যতামূলক পালনীয় চুক্তি। সুতরাং মূলনীতি এই হলো যে, যার কথা হঠকারিতামূলক [অর্থাৎ নিজের স্বার্থের পরিপন্থি] হবে সে ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার প্রতিপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর যার কথা বিবাদীর কথারূপে উচ্চারিত হবে [অর্থাৎ নিজের স্বার্থের অনুকূলে হবে] সে ক্ষেত্রে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চুক্তির বৈধতা দাবিকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে অস্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। যদিও সে চুক্তির বৈধতা অস্বীকার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اَلْقَوْلُ لِلْمُسْلَمِ اِلَيْهِ لِاَنَّهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ও তাঁর দলিল বর্ণনা করছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাঁর মতে উক্ত মাসআলায় দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ চুক্তির সময় মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এটাই সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল বুঝার পূর্বে একটি বিষয় জানতে হবে, তা হলো– 'বায় সলম' যদি ফাসিদ হয়, তাহলে তা অন্য কোনো চুক্তি রূপে গণ্য হয় না; বরং সহীহ হোক বা ফাসিদ হোক উভয় অবস্থায়ই তা 'বায় সলম' হিসেবে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে مُضَارَبَة [মুদারাবা]-এর চুক্তি যদি সহীহ হয় তাহলে তা شِرْكَة [অংশীদারিত্ব]-এর চুক্তি বলে গণ্য হয় আর যদি ফাসিদ হয় তখন তা اِجَارَة 'ইজারা' -এর চুক্তি বলে গণ্য হয়।

সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, আলোচ্য মাসআলায় দাদনদাতা এবং দাদনগ্রহীতা একই চুক্তি 'বায় সলম'-এর ব্যাপারে একমত। দুজনে দুই চুক্তির দাবি করছে না। আর মুসলমান চুক্তিকারীর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক দাবি যে, সে ফাসিদ চুক্তি থেকে বিরত থাকবে এবং সহীহ চুক্তি করবে। অতএব, যখন তারা 'বায় সলম'-এর মূল চুক্তিটি স্বীকার করছে তখন তা সহীহ চুক্তির স্বীকারোক্তি (اِقْرَار) বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] বলছে 'মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়নি' তখন সে যেন তার স্বীকারোক্তি (اِقْرَار) প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে। আর একবার স্বীকারোক্তি করলে তা আর প্রত্যাহার করা যায় না। তাছাড়া কোনো বিষয়ের شَرْط 'শর্ত' মূল বিষয়ের تَابِعْ বা অনুগত হয়ে থাকে, কাজেই মূল চুক্তির স্বীকার করলে তা তার শর্তেরও স্বীকার বলে গণ্য হবে। কেননা, মূল বিষয় সাব্যস্ত হলে তার تابع বা অনুগত বিষয়ও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] 'বায় সলম' -এর শর্ত মেয়াদের কথা প্রথমে বাহ্যত স্বীকার করার পর তা আবার প্রত্যাহার করতে চাচ্ছে। ফলে তার কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে। কাজেই তার কথা গ্রহণ করা হবে না। আর দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] যেহেতু 'মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল' বলে চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে, তাই তার কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়নি। সুতরাং তার কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُضَارَبَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইন (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত কিয়াসের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সার কথা হলো, আমাদের আলোচ্য 'বায় সলম'-এর মতবিরোধের মাসআলাটি مُضَارَبَة [মুদারাবা]-এর মাসআলার সাথে কিয়াস করা ঠিক হয়নি। কেননা, উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, مُضَارَبَة [মুদারাবা]-এর চুক্তি যদি সহীহ হয়, তাহলে তা شِرْكَة বা অংশীদারিত্বের চুক্তি বলে গণ্য হয়, আর যদি ফাসিদ হয়, তাহলে তা اِجَارَة 'ইজারা' বলে গণ্য হয়। কাজেই সাহেবাইন (র.)-এর উল্লিখিত مُضَارَبَة [মুদারাবা]-এর মতবিরোধের মাসআলায় 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী] চুক্তিটি ফাসিদ হওয়ার দাবি করছে আর 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী] চুক্তিটি সহীহ হওয়ার দাবি করছে। ফলে উভয়ের মতবিরোধের ক্ষেত্র (مَحَلْ) ভিন্ন হয়েছে। 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর দাবি অনুযায়ী তা اِجَارَة 'ইজারা'-এর চুক্তি ছিল আর 'মুদারিব' [মূলধন প্রদানকারী]-এর দাবি অনুযায়ী তা شِرْكَة বা অংশীদারিত্বের চুক্তি ছিল। আর মতবিরোধের ক্ষেত্র যদি এক না হয় তাহলে সে মতবিরোধ প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না; বরং তা কেবল ভিন্ন ভিন্ন দাবি বলে গণ্য হয়। সুতরাং উক্ত মাসআলায় বিষয়টি এমন হয়েছে যে, মুদারিব রাব্বুল মালের সম্পদের [দশ দিরহামের] মাঝে হকদার হওয়ার দাবি করছে আর রাব্বুল মাল তা অস্বীকার করছে। কাজেই নিয়ম অনুসারে অস্বীকারকারী (مُنْكِرْ)-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর মাসআলায় উভয়ের মতবিরোধের ক্ষেত্র এক। কারণ, সহীহ হওয়ার সুরতেও তা 'বায় সলম' এবং ফাসিদ হওয়ার সুরতেও তা 'বায় সলম'। কাজেই তাদের মতবিরোধ প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে। অতঃপর যেহেতু দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] -এর কথার মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে [যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি] তাই তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْاِخْتِلَافُ الخ : পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ হলো, مُضَارَبَة [মুদারাবা] চুক্তি অপরিহার্য চুক্তি নয়। এ কারণে مُضَارَبَة [মুদারাবা]-এর চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যে কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়াই চুক্তি প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সুতরাং যেহেতু তা অপরিহার্য চুক্তি নয় তাই মতবিরোধের কারণে তা এমনিতেই نَسْخ [ভঙ্গ]

হয়ে যাবে। ফলে মতবিরোধ ধর্তব্য হবে না; বরং শুধু 'মুদারিব' [মূলধন গ্রহণকারী]-এর দাবি বলে গণ্য হবে। কাজেই অস্বীকারকারী তথা 'রাব্বুল মাল' [মূলধন প্রদানকারী]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

পক্ষান্তরে 'বায় সলম'-এর চুক্তি হলো অপরিহার্য চুক্তি। এ কারণে তা সম্পাদিত হওয়ার পর এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ছাড়া তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণে তা আপনা-আপনি فَسْخ [ভঙ্গ] হবে না; বরং প্রকৃত মতবিরোধ বলে গণ্য হবে। অতঃপর যেহেতু দাদনদাতা [রাব্বুস সলম]-এর কথার মাঝে বৈপরীত্য (تَنَاقُضْ) দেখা দিয়েছে তাই তার কথা গ্রহণ করা হবে না; বরং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি]-এর কথা গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ فَصَارَ الْاَصْلُ اَنَّ مَنْ خَرَجَ كَلَامُهُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমরা পূর্বের মাসআলার ভূমিকায় যে মূলনীতিটি উল্লেখ করেছিলাম তা বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মাসআলাগুলো থেকে এ মূলনীতিটি পাওয়া গেল যে, যদি চুক্তিকারীদ্বয়ের মাঝে চুক্তির পরবর্তী সময়ে চুক্তির শর্তসমূহ কিরূপ ছিল এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং একজনের দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ হয়নি বলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয় আর অপরজনের দাবি অনুসারে তা সহীহ হয়েছে বলে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল না, সে যদি مُتَعَنِّتْ অর্থাৎ "নিজের লাভজনক বস্তু অস্বীকারকারী" বলে গণ্য হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং অপরজনের দাবি গ্রহণ করা হবে।

আর যদি কোনো পক্ষ مُتَعَنِّتْ বলে গণ্য না হয়; বরং প্রত্যেকে তার স্বার্থের অনুকূলের বিষয়ের দাবিদার হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যদি উভয়ে একই চুক্তির ব্যাপারে একমত থাকে তাহলে সর্বাবস্থায় যার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ ছিল তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার বিপক্ষ مُنْكِرْ বা 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হয়। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সর্বাবস্থায় যে مُنْكِرْ 'অস্বীকারকারী' বলে সাব্যস্ত হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তার দাবি অনুসারে চুক্তিটি সহীহ না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে।

قَالَ : وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الثِّيَابِ إِذَا بَيَّنَ طُوْلًا وَعَرْضًا وَ رُقْعَةً، لِأَنَّهُ أَسْلَمَ فِى مَعْلُوْمٍ مَقْدُوْرِ التَّسْلِيْمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ حَرِيْرٍ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزْنِهِ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ مَقْصُوْدٌ فِيْهِ وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْجَوَاهِرِ وَلَا فِى الْخَرَزِ، لِأَنَّ اٰحَادَهَا تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا وَفِى صِغَارِ اللُّؤْلُؤِ الَّتِى تُبَاعُ وَزْنًا يَجُوْزُ السَّلَمُ، لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْوَزْنِ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِى اللَّبِنِ وَالْاٰجُرِّ إِذَا سَمَّى مِلْبَنًا مَعْلُوْمًا ، لِأَنَّهُ عَدَدِىٌّ مُتَقَارِبٌ لَاسِيَّمَا إِذَا سَمَّى الْمِلْبَنَ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও কতটুকু মোটা [বা পাতলা] হবে তা উল্লেখ করা হয়, তাহলে কাপড়ের ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, সে নির্দিষ্ট এবং হস্তান্তর সম্ভব বস্তুর জন্য 'বায় সলম' করেছে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আর যদি রেশমের কাপড় হয়, তাহলে তার ওজনও উল্লেখ করা অপরিহার্য। কেননা, রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে ওজন উদ্দিষ্ট হয়। মূল্যবান পাথর ও মণি-মুক্তার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এগুলোর একেকটি [অপরটি থেকে] অনেক পার্থক্যপূর্ণ হয়। আর যে সকল ছোট মুক্তা ওজন মেপে বিক্রয় করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, ওজন করে তার পরিমাণ জানা সম্ভব। কাঁচা ইট ও পাকা ইটের ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট ছাঁচ উল্লেখ করে, তাহলে 'বায় সলম' করতে কোনো দোষ নেই। কেননা, ইট গণনা-নির্ভর ও কাছাকাছি আকারের বস্তু। বিশেষত যদি নির্দিষ্ট ছাঁচ উল্লেখ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الثِّيَابِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রেশমের কাপড় ব্যতীত অন্যান্য কাপড়ের ক্ষেত্রে যদি তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং তা কতটুকু মোটা বা পাতলা হবে তা চুক্তির সময় উল্লেখ করে, তাহলে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কারণ, উক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করার দ্বারা কাপড় সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং তা হস্তান্তর করার সময় বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে সকল বস্তু বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় এবং হস্তান্তরকালে বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যদি রেশমের কাপড় হয়, তাহলে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও কাপড়ের ওজন কতটুকু হবে তাও উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, প্রস্থের সাথে তার ওজনও ক্রেতার উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। এ কারণেই রেশমের কাপড়ের ওজন কমবেশি হওয়ার কারণে তার মূল্যের মাঝেও তারতম্য হয়। অতএব, চুক্তির সময় তার ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা অপরিহার্য হবে। উল্লেখ্য, মাসআলাটি সমাজের প্রচলনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রেও যদি ওজনের কারণে মূল্যের মাঝে তারতম্য হওয়ার প্রচলন না থাকে, তাহলে চুক্তির সময় তার ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে রেশমের কাপড়ের ক্ষেত্রে ওজন কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْجَوَاهِرِ الخ : মূল্যবান পাথর ও মণি-মুক্তার ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কারণ, মূল্যের দিক থেকে এগুলোর মাঝে অনেক তারতম্য হয়। কেননা, একই ওজনের হওয়া সত্ত্বেও দুটি মুক্তার সৌন্দর্যের তারতম্যের কারণে তাদের মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়। ফলে হস্তান্তরের সময় বিবাদ সৃষ্টি হবে। অতএব, তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে এগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যে সকল ছোট মুক্তা ওজন হিসেবে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে সেগুলোতে ওজনের ভিত্তিতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কারণ, এরূপ ক্ষুদ্র একই ওজনের দুটি মুক্তার মাঝে মূল্যের দিক থেকে পার্থক্য হয় না। কাজেই তা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিবাদের সৃষ্টি হবে না। কাজেই ওজন উল্লেখ করার দ্বারাই তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ الخ :

মাসআলা : ইট কাঁচা হোক বা পাকা হোক উভয় অবস্থায় তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। তবে শর্ত হলো, তার ছাঁচ কি আকারের হবে; কতটুকু প্রশস্ত এবং কতটুকু দীর্ঘ হবে তা উল্লেখ করতে হবে। কেননা, নির্দিষ্ট আকারের ছাঁচ দ্বারা তৈরি করার পর ইটের মাঝে যে তারতম্য থাকে তা খুবই সামান্য, তা মূল্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। কাজেই তা عَدَدِى مُتَقَارِبْ অর্থাৎ গণনা, নির্ভর কাছাকাছি আকারের বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরূপ عَدَدِى مُتَقَارِبْ বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ। কারণ, তা হস্তান্তরকালে বিবাদ সৃষ্টি করবে না। [তবে পাকা ইটের ক্ষেত্রে তা কিরূপ পোড়ানো হবে তা উল্লেখ করা আবশ্যক হবে। কেননা, পোড়ানোর তারতম্যের কারণে মূল্যের মাঝে পার্থক্য হয়।]

قَالَ : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَمَا لَا يُضْبَطُ صِفَتُهُ وَلَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِيهِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَبِدُوْنِ الْوَصْفِ يَبْقَى مَجْهُوْلًا جَهَالَةً تُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِيْ طَسْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ لِاجْتِمَاعِ شَرَائِطِ السَّلَمِ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ مَجْهُوْلٌ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সকল বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ ও তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব সে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে। কেননা, তা বিবাদ সৃষ্টি করবে না। আর যে সকল বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, দাদন-দ্রব্য হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তু [দাইন]। আর গুণাগুণ নির্ধারণ না করা হলে তা এমন অস্পষ্ট থাকে যা বিবাদ সৃষ্টি করে। তশতরি, আতরের শিশি অথবা মোজা বা এ জাতীয় অন্য কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে 'বায় সলম' করতে কোনো দোষ নেই, যদি [গুণাগুণ ও পরিমাপ বর্ণনা দ্বারা] তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, তখন সকল শর্ত বিদ্যমান পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি [বর্ণনা দ্বারা] তা সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' করায় কোনো কল্যাণ নেই [অর্থাৎ জায়েজ নয়]। কেননা, তা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট বস্তু বা দাইন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) এখানে কোন কোন দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ হবে, আর কোন কোন দ্রব্যে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না তার একটি মূলনীতি বর্ণনা করছেন। মূলনীতিটি হলো, যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব এবং তার গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, যখন পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকবে এবং গুণাগুণ সুস্পষ্ট থাকবে তখন তা হস্তান্তর করার সময় বিবাদের সৃষ্টি হবে না কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে।

আর যে সকল দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না কিংবা তার গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয় না তাতে 'বায় সলম' জায়েজ নয়। কেননা, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনকৃত দ্রব্য [মুসলাম ফীহ] দাদনগ্রহীতার জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবে [দাইন হিসেবে] ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই তা গুণাগুণ উল্লেখ করে স্পষ্ট করা না গেলে তাতে এমন অস্পষ্টতা থেকে যায় যা বিবাদ সৃষ্টি করবে। আর যে অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টি করে তা ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ করে দেয় সুতরাং তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِيْ طَسْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তশতরি, শিশি, মোজা বা এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্য [যেমন- পেয়ালা, লোহা বা পিতলের পাত্র ইত্যাদি] যদি গুণাগুণ উল্লেখের মাধ্যমে তা সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ। কেননা, তখন 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার সমস্ত শর্ত পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি তা এমন হয় যে গুণাগুণ উল্লেখ করার পরও তা সুনির্দিষ্ট হয় না [যেমন- এমন কাঁচের এমন পাত্র যার এক এক প্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির তৈরি হয়ে থাকে] তাহলে তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না। কেননা, এ সুরতে দাদনকৃত দ্রব্য অস্পষ্ট 'দাইন' [জিম্মায় ওয়াজিব অনির্দিষ্ট বস্তু।] সুতরাং তা বিবাদ সৃষ্টি করবে। কাজেই তাতে 'বায় সলম' জায়েজ হবে না।

قَالَ : وَإِنِ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ بِغَيْرِ اَجَلٍ جَازَ اِسْتِحْسَانًا لِلْاِجْمَاعِ الثَّابِتِ بِالتَّعَامُلِ، وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُوْزُ، لِاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُوْمِ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعًا لَا عِدَةً، وَالْمَعْدُوْمُ قَدْ يُعْتَبَرُ مَوْجُوْدًا حُكْمًا، وَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُوْنَ الْعَمَلِ حَتّٰى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوْغًا عَنْهُ لَا مِنْ صَنْعَتِهِ أَوْ مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ جَازَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْاِخْتِيَارِ حَتّٰى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ جَازَ، وَهٰذَا كُلُّهُ هُوَ الصَّحِيْحُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উল্লিখিত বস্তুসমূহের কোনোটি যদি মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই [বিক্রেতা পরে] প্রস্তুত করে দিবে এই শর্তে ক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে। সাধারণ প্রচলনের মাধ্যমে প্রমাণিত ইজমা [সর্বসম্মতি]-এর কারণে 'ইসতিহসান' হিসেবে। কিয়াসের দাবি অনুসারে তা জায়েজ না হওয়ার কথা। কেননা, তা অবিদ্যমান বস্তুর বিক্রয়। বিশুদ্ধ মতে এটা জায়েজ হবে 'বিক্রয়' রূপে 'ওয়াদা' রূপে নয়। অবিদ্যমান বস্তুও কখনও কখনও বিধানগতভাবে বিদ্যমান হিসেবে গণ্য হয়। আর এরূপ ফরমায়েশি চুক্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত বস্তুটিই হচ্ছে চুক্তির উদ্দিষ্ট দ্রব্য [বা মা'কূদ আলাইহি] [বিক্রেতার] কর্ম এখানে উদ্দিষ্ট বিষয় নয়। সুতরাং ফরমায়েশ গ্রহণকারী যদি এমন তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে যা তার তৈরি নয় কিংবা তার পূর্বের তৈরিকৃত এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে, তাহলে জায়েজ হবে। আর এরূপ ফরমায়েশি চুক্তি (اَلْاِسْتِصْنَاعُ)-এর দ্রব্য ফরমায়েশকারীর গ্রহণ করা ব্যতীত তা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং কারিগর যদি ফরমায়েশদাতার দেখার পূর্বে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করে, তবে তা জায়েজ হবে। উল্লিখিত বিধানগুলোই বিশুদ্ধ অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنِ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাসআলা বর্ণনা করছেন। اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি পেশাদার কারিগরের নিকট গিয়ে বলল, তুমি আমাকে এরূপ গুণাগুণ এবং এরূপ আকারের অমুক দ্রব্য এত টাকার বিনিময়ে তৈরি করে দিবে। আর কারিগর তা গ্রহণ করল। এরূপ চুক্তিকে اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি বা অর্ডারের ভিত্তিতে দ্রব্য তৈরির চুক্তি] বলে। ফরমায়েশি চুক্তি (اَلْاِسْتِصْنَاعُ) এবং 'বায় সলম' -এর মাঝে পার্থক্য হলো, 'বায় সলম'-এর মাঝে বিক্রেতার জন্য অবকাশ স্বরূপ (اِسْتِمْهَالًا) মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় আর اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাঝে বিক্রেতার জন্য এরূপ মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় না; বরং اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর মাঝে যদি সময় উল্লেখ করা হয় তাহলে তা যদি দ্রুত দ্রব্যটি গ্রহণের উদ্দেশ্য (اِسْتِعْجَالًا) হয় তাহলে তা সহীহ হবে অন্যথায় তা সহীহ হবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ অর্থাৎ তশতরি, শিশি, মোজা বা এ জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি মেয়াদ উল্লেখ না করে তা তৈরি করে দেওয়ার অর্ডার প্রদান করে, তাহলে কিয়াসের দাবি অনুযায়ী যদিও তা জায়েজ না হওয়ার কথা কিন্তু إِسْتِحْسَانٌ-এর ভিত্তিতে তা জায়েজ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতে এরূপ اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি] জায়েজ নয়। কিয়াসের দাবিও তাই। কেননা, চুক্তির সময় দ্রব্যটি অবিদ্যমান (مَعْدُوْم)। আর অবিদ্যমান বস্তু ['বায় সলম' ব্যতীত] বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, পূর্বেই এ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে– نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَ رَخَّصَ فِى السَّلَمِ "হুজুর ﷺ যা মানুষের নিকট বিদ্যমান নেই তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তবে তিনি 'বায় সলম' করার অবকাশ দিয়েছেন।" সুতরাং اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি] যেহেতু 'বায় সলম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় কাজেই তা জায়েজ না হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা إِسْتِحْسَانٌ [কিয়াসের বিপরীত نَصّ কিংবা قِيَاس خَفِيّ বা إِجْمَاع]-এর কারণে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি] জায়েজ বলেছি। এখানে إِسْتِحْسَانٌ-এর ভিত্তি হলো উম্মতের 'ইজমা'। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর জমানা থেকে আজ পর্যন্ত জনসমাজে সাধারণভাবে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর প্রচলন রয়েছে এবং কেউ এর বিরোধিতা করেনি। কাজেই এটা উম্মতের إِجْمَاع عَمَلِيٌّ হলো। এছাড়া স্বয়ং নবী করীম ﷺ اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর ভিত্তিতে আংটি বানিয়েছেন। এ মর্মে সুনানে নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ - إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

قَوْلُهُ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَجُوْزُ بَيْعًا لَا عِدَةً : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, الاستصناع [ফরমায়েশি চুক্তি] কি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বলে গণ্য হবে, নাকি চুক্তিকালে তা শুধু ওয়াদা হবে আর হস্তান্তর কালে তা আদান-প্রদান (اَلتَّعَاطِيْ)-এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হবে। এ ক্ষেত্রে ফকীহ হাকিম শহীদ, মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ, আল-মানসূর গ্রন্থের মুসান্নিফ (র.) প্রমুখদের মতে চুক্তিকালে এটি উভয় পক্ষ থেকে কেবল ওয়াদা বলে গণ্য হবে। অতঃপর যখন বিক্রেতা দ্রব্য হস্তান্তর করবে তখন আদান-প্রদানের মাধ্যমে اَلْبَيْعُ بِالتَّعَاطِيْ হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যেহেতু এটা কেবল ওয়াদা এ কারণেই اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর পর উভয়ের এখতিয়ার থাকে। অর্থাৎ চুক্তির পর যদি কারিগর উক্ত দ্রব্য তৈরি করতে না চায়, তাহলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে অর্ডার প্রদানকারী যদি দ্রব্যটি দেখার পর তা গ্রহণ করতে না চায়, তাহলে তার সে অধিকার থাকবে। আর এরূপ উভয়ের অধিকার বা এখতিয়ার ওয়াদার মধ্যে সাব্যস্ত হয়, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মাঝে সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং বুঝা গেল اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি] মূলত ওয়াদা, চুক্তি নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তবে সহীহ অভিমত [যা অধিকাংশ ফকীহ্-এর তা] হলো, اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি] সম্পাদনকালেই তা ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি বলে গণ্য হবে– শুধু ওয়াদা বলে গণ্য হবে না। কারণ–

১. ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে একে বিক্রয় বলে উল্লেখ করেছেন।

২. اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] কেবল ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে জায়েজ যা অর্ডারের ভিত্তিতে বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে। অথচ যদি কেবল তা ওয়াদা হতো, তাহলে প্রচলন থাক বা না থাক উভয় অবস্থায়ই জায়েজ হতো।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে কিয়াসের দাবি হলো জায়েজ না হওয়া আর ইসতিহসানের দাবি হলো জায়েজ হওয়া। অথচ কেবল ওয়াদা হলে এটা প্রযোজ্য হয় না। কেননা, ওয়াদা হলে তা সর্বাবস্থায়ই জায়েজ হতো।

আর উভয়ের এখতিয়ার সাব্যস্ত হয় বলে তা ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না, এটা সঠিক নয়। কেননা, দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্যের বিক্রয় (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ)-এর ক্ষেত্রে যদি চুক্তির সময় কেউ অপর পক্ষের দ্রব্য না দেখে, তাহলে উভয়ের তা গ্রহণ না করার এখতিয়ার থাকে। সুতরাং উভয়ের এখতিয়ার সাব্যস্ত হলেই তা ক্রয়-বিক্রয় হবে না, এটা আবশ্যক নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالْمَعْدُوْمُ قَدْ يُعْتَبَرُ مَوْجُوْدًا حُكْمًا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] কিভাবে বিক্রয়চুক্তি হবে? অথচ চুক্তিকালে তো দ্রব্যটির অস্তিত্বই নেই। আর যার অস্তিত্ব নেই তা কিভাবে বিক্রেয়-দ্রব্য (مَبِيْع) বলে সাব্যস্ত হবে? এ প্রশ্নের জবাব হলো, শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে যখন اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ বলে সাব্যস্ত হয়েছে তখন এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, শরিয়ত এ ক্ষেত্রে অবিদ্যমান বস্তুকে বিধানগত দিক থেকে (حُكْمًا) বিদ্যমান বলে গণ্য করেছে। আর শরিয়তে এরূপ অনেক নজির রয়েছে। যেমন– মুক্তাদি কেরাত না পড়া সত্ত্বেও তার কেরাত হয়েছে বলে গণ্য হয়, জবাইকারী ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে তার বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে বলে গণ্য হয়, مُسْتَحَاضَة মহিলা অজু করলে পবিত্র হয়েছে বলে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ وَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُوْنَ الْعَمَلِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফকীহ আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বিরদায়ীর অভিমত খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে الاستصناع [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) তৈরিকৃত দ্রব্য নয়; বরং কারিগরের কাজ হচ্ছে চুক্তির মূলবস্তু। এখানে টাকার বিনিময়ে শ্রমের চুক্তি হয়েছে। কাজেই এটা ইজারার অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাঁর উক্ত অভিমত সঠিক নয়; বরং এ ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) হচ্ছে তৈরিকৃত দ্রব্য, কারিগরের কাজ নয়। এ কারণেই কারিগর যদি চুক্তির দ্রব্য নিজে তৈরি না করে অন্যের তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে অথবা চুক্তির পূর্বে তার নিজের তৈরিকৃত দ্রব্য প্রদান করে এবং ক্রেতা [ফরমায়েশ প্রদানকারী] তা গ্রহণ করে, তাহলে তা জায়েজ হয়। অথচ যদি চুক্তির মূলবস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) কারিগরের কাজ হতো, তাহলে উক্ত দুই সুরতে اَلْاِسْتِصْنَاعُ জায়েজ হতো না। কেননা, প্রথম সুরতে কারিগরের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না আর দ্বিতীয় সুরতে তার কাজ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তা চুক্তির পূর্বের। কাজেই তা চুক্তির মূলবস্তু المعقود عليه হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْاِخْتِيَارِ حَتّٰى لَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে ফরমায়েশদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরিকৃত দ্রব্য গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফরমায়েশদাতার দ্রব্য বলে নির্দিষ্ট হবে না। সুতরাং কারিগর যদি দ্রব্যটি তৈরি করার পর তা ফরমায়েশদাতার দেখার পূর্বে অন্য কারো নিকট বিক্রয় করে তাহলে জায়েজ হবে। আর যদি দ্রব্যটি আগেই ফরমায়েশদাতার জন্য নির্দিষ্ট হতো, তাহলে তা অন্যের নিকট বিক্রয় করা জায়েজ হতো না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا كُلُّهُ هُوَ الصَّحِيْحُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে আমরা যে বিধানগুলো উল্লেখ করলাম তা হলো এই–

১. اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] ওয়াদা নয়; বরং ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি।
২. اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে চুক্তির মূলবস্তু (اَلْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ) হলো, তৈরিকৃত দ্রব্য; কারিগরের কাজ নয়।
৩. ফরমায়েশদাতা যতক্ষণ পর্যন্ত তৈরিকৃত দ্রব্য গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ফরমায়েশদাতার দ্রব্য বলে নির্দিষ্ট হবে না।

এ অভিমতগুলোই হচ্ছে সঠিক অভিমত। অর্থাৎ এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই বিপরীত অভিমতও রয়েছে, কিন্তু আমরা যা উল্লেখ করেছি তাই হচ্ছে সঠিক অভিমত।

قَالَ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، لِأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَّا بِضَرَرٍ، وَهُوَ قَطْعُ الصَّرْمِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُمَا، أَمَّا الصَّانِعُ، فَلِمَا ذَكَرْنَا وَأَمَّا الْمُسْتَصْنِعُ فَلِأَنَّ فِي إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهُ إِضْرَارًا بِالصَّانِعِ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لِلنَّاسِ، كَالثِّيَابِ لِعَدَمِ الْمُجَوِّزِ، وَفِيمَا فِيهِ تَعَامُلٌ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا أَمْكَنَ إِعْلَامُهُ بِالْوَصْفِ لِيُمْكِنَ التَّسْلِيمُ.

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফরমায়েশদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে পরিত্যাগ করবে। কেননা, সে না দেখা বস্তু ক্রয় করেছে। পক্ষান্তরে কারিগরের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাবসূত গ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছেন। আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা, সে না দেখা বস্তু বিক্রয় করেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, কারিগরেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে। কেননা, ক্ষতি ছাড়া চুক্তির দ্রব্য হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না। যেমন– চামড়া ইত্যাদি কর্তন করা। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, উভয়ের কারোরই ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কারিগরের ক্ষেত্রে কারণ হলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর ফরমায়েশদাতার ক্ষেত্রে কারণ হলো, তার ইচ্ছাধিকার থাকলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তার জন্য তৈরি দ্রব্য অন্য কেউ অনুরূপ মূল্যে খরিদ করবে না। যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে জনসমাজে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলন নেই সে সকল দ্রব্যে ফরমায়েশি চুক্তি জায়েজ হবে না। কেননা, বৈধতা দানকারী কারণ বিদ্যমান নেই। আর যে সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রচলন রয়েছে তাতে ফরমায়েশি চুক্তি জায়েজ হবে, যদি গুণাগুণ বর্ণনা দ্বারা দ্রব্যটি সুস্পষ্ট করা সম্ভব হয়, যাতে [হুবহু ফরমায়েশি বস্তুটি] অর্পণ করা সম্ভব হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اَلْاِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যখন কারিগর দ্রব্য তৈরি করে ফরমায়েশদাতার নিকট উপস্থিত করবে তখন ফরমায়েশদাতার ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ নাও করতে পারবে। পক্ষান্তরে কারিগরের কোনো এখতিয়ার থাকবে না, সে তা তৈরি করতে এবং তা হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর মাবসূত গ্রন্থে এ মতটিই উল্লেখ করেছেন এবং কোনো মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এটিই হচ্ছে 'জাহির রেওয়ায়েত' (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ)। আর

এটাই অধিক বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, কারিগর হচ্ছে বিক্রেতা, সে তার দ্রব্য দেখার পূর্বে বিক্রয় করছে। আর বিক্রেতা যদি তার দ্রব্য না দেখে বিক্রয় করে, তাহলে না দেখার কারণে তার কোনো এখতিয়ার خِيَارُ الرُّؤْيَةِ সাব্যস্ত হয় না; বরং ক্রেতা যদি না দেখে ক্রয় করে তাহলে দেখার পর তার এখতিয়ার (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) সাব্যস্ত হয়।

জাহির রেওয়ায়েত ব্যতীত অন্য রেওয়ায়েত (غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)-এ উপরিউক্ত অভিমত ছাড়া আরো দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারিগরেরও ইচ্ছাধিকার থাকবে, অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে চুক্তি সম্পাদিত করার পরও চুক্তির দ্রব্য তৈরি না করতে পারে, আবার তৈরি করার পর তা ফরমায়েশদাতাকে দেখানোর পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রয় করতে পারে। কেননা, চুক্তির দ্রব্য ফরমায়েশদাতার নিকট পেশ করতে কারিগরের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যেমন– দ্রব্যটি যদি জুতা হয়ে থাকে তাহলে তা তৈরি করার জন্য তার চামড়া কাটতে হবে, সুতা ও অন্যান্য বস্তু নষ্ট করতে হয়। আর দ্রব্যটি তৈরির পর ফরমায়েশদাতা যে তা গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। কেননা, ফরমায়েশদাতা তো (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ)-এর ভিত্তিতে তা গ্রহণ নাও করতে পারে, ফলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কারিগরের এ ইচ্ছাধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে আর ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে না। অতএব اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] কোনো পক্ষেই অপরিহার্য চুক্তি বলে গণ্য হবে না; বরং তাতে উভয়েরই এখতিয়ার থাকবে।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ফরমায়েশদাতা বা কারিগর কারোরই এখতিয়ার থাকবে না। কারিগরের এখতিয়ার না থাকার কারণ তো পূর্বেই উল্লেখ করা হলো যে, কারিগর হচ্ছে বিক্রেতা আর বিক্রেতা তার দ্রব্য না দেখে বিক্রয় করলে তার না দেখার কারণে এখতিয়ার (خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) সাব্যস্ত হয় না। আর ফরমায়েশদাতার এখতিয়ার না থাকার কারণ হলো, যদি ফরমায়েশদাতার এখতিয়ার সাব্যস্ত হয় তাহলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, কারিগর দ্রব্যটি তৈরি করার পর যদি ফরমায়েশদাতা এখতিয়ারের ভিত্তিতে তা গ্রহণ না করে, তাহলে কারিগর সেই মূল্যে তা হয়তো অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। আবার হয়তো সে দ্রব্য অন্যের নিকট বিক্রয়ই করতে পারবে না। যেমন– কোনো বক্তা মিম্বার বানাল, অতঃপর সে যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে সাধারণ জনতা তা ক্রয় করবে না। ফলে কারিগর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং কোনো পক্ষেরই এখতিয়ার সাব্যস্ত হবে না।

উল্লেখ্য, মাসআলাটি এখানে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হলো, হিদায়ার বাহ্যিক 'ইবারত' থেকে এবং মুসান্নিফ (র.) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلَّا بِضَرَرٍ وَهُوَ قَطْعُ الصَّرْمِ وَغَيْرِهِ বলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত (غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) -এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা থেকে সেরূপই বুঝা যায় এবং হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ আল-বিনায়াহ ও আল-ইনায়াহ গ্রন্থের ইবারত থেকেও এরূপই বুঝা যায়। অর্থাৎ মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখিত ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনের পর কারিগরের কোনো এখতিয়ার থাকবে না। সে চুক্তির দ্রব্য তৈরি করতে এবং তা হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ অনুযায়ী কারিগরের এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে দ্রব্যটি তৈরি করবে আর ইচ্ছা করলে তা তৈরি করবে না। [উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ বলে যে রেওয়ায়েতের কথা বলেছেন তা হলো ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ আর وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) এবং وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ (رح) বলে যে দুটি রেওয়ায়েতের কথা বলেছেন তা হলো غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ।] সুতরাং সারকথা এই হলো যে, ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ [যাতে আমাদের তিন ইমামের কারো মতবিরোধ নেই] অনুসারে চুক্তি সম্পাদনের পর কারিগরের চুক্তির দ্রব্য তৈরি করা না করার এখতিয়ার থাকবে না। আর تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ [দুররের মুখতার গ্রন্থের 'মতন']-এ ঠিক এরূপ-ই উল্লেখ করা হয়েছে, তার ইবারাত হলো,

فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَمَلِهِ .

পক্ষান্তরে اَلْبَحْرُ الرَّائِقُ , فَتْحُ الْقَدِيْرِ , بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ , اَلْكَافِيْ لِلْحَاكِمِ الشَّهِيْدِ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তির পর কারিগরের এখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে তা তৈরি করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে তা তৈরি নাও করতে পারে আবার তৈরি করার পর ফরমায়েশদাতাকে তা দেখানোর পূর্বে অন্যের নিকট বিক্রয়ও করতে পারবে। এটাই সর্বসম্মত অভিমত। তবে দ্রব্য তৈরি করার পর যদি তা ফরমায়েশদাতার সামনে উপস্থিত করে আর ফরমায়েশদাতা তা গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা হস্তান্তর করতে সে বাধ্য থাকবে। তখন আর তার এখতিয়ার থাকবে না। ফাতোয়ায়ে শামীতে আল্লামা শামী (র.) এ সকল গ্রন্থের ইবারত উল্লেখ করে এ সকল গ্রন্থের বক্তব্যই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর বলেছেন, হিদায়ার গ্রন্থকার যে উল্লেখ করেছেন وَلَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ .... وَهُوَ الْأَصَحُّ এটা ঐ ক্ষেত্রে যখন কারিগর দ্রব্য তৈরি করে তা ফরমায়েশদাতার সামনে উপস্থিত করবে। কিন্তু আল্লামা শামী (র.)-এর এ কথা অনুযায়ী হিদায়ার পরবর্তী ইবারত وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ..... لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ -এর ব্যাখ্যা করা জটিল।

–[ফাতোয়ায়ে শামী-মাকতাবায়ে যাকারিয়া, খণ্ড-৭, পৃ.-৪৭৫-৪৭৬]

সুতরাং আলোচ্য বিষয়টিতে এ কথা বলাই সম্ভবত সঠিক হবে যে, হিদায়ার মুসান্নিফ (র.) ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ -কে এ অর্থে গ্রহণ করেছেন যে, কারিগরের কোনো অবস্থাতেই এখতিয়ার থাকবে না। আর উল্লিখিত অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তা এ অর্থে নিয়েছেন যে, ফরমায়েশদাতাকে দেখানোর পর কারিগরের কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ فِيْمَا لَا تَعَامُلَ فِيْهِ لِلنَّاسِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] সহীহ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত উল্লেখ করেছেন–

১. যে দ্রব্যের জন্য ফরমায়েশ করা হবে সে দ্রব্যটি এমন হতে হবে যাতে জনসমাজে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন (تَعَامُلٌ) রয়েছে। সুতরাং যে সকল দ্রব্যে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি চুক্তি]-এর প্রচলন নেই তাতে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ হবে না। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়াসের দাবি হচ্ছে الاستصناع [ফরমায়েশি-চুক্তি] জায়েজ না হওয়া। কিন্তু تَعَامُلُ النَّاسِ বা জন-প্রচলনের কারণে إِسْتِحْسَانًا 'ইসতিহসান' হিসেবে তা জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং যে দ্রব্যে এরূপ চুক্তির প্রচলন নেই সে ক্ষেত্রে জায়েজের কারণ تَعَامُلُ النَّاسِ পাওয়া গেল না। অতএব, তা কিয়াসের দাবির উপরই বহাল থাকবে।

২. দ্রব্যটি এমন হতে হবে যা গুণাগুণ উল্লেখ করার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা সম্ভব। কেননা, গুণাগুণ উল্লেখ করার দ্বারা যদি তা সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে তা হস্তান্তরকালে বিবাদের সৃষ্টি হবে। কাজেই তা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে না।

وَإِنَّمَا قَالَ : بِغَيْرِ أَجَلٍ، لِأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَ الْأَجَلَ فِيْمَا فِيْهِ تَعَامُلٌ يَصِيْرُ سَلَمًا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيْمَا لَا تَعَامُلَ فِيْهِ يَصِيْرُ سَلَمًا بِالْاِتِّفَاقِ لَهُمَا أَنَّ اللَّفْظَ حَقِيْقَةٌ لِلْاِسْتِصْنَاعِ فَيُحَافَظُ عَلٰى قَضِيَّتِهِ، وَيُحْمَلُ الْأَجَلُ عَلَى التَّعْجِيْلِ، بِخِلَافِ مَا لَا تَعَامُلَ فِيْهِ، لِأَنَّ ذٰلِكَ اِسْتِصْنَاعٌ فَاسِدٌ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّلَمِ الصَّحِيْحِ، وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ دَيْنٌ يَحْتَمِلُ السَّلَمَ وَجَوَازُ السَّلَمِ بِإِجْمَاعٍ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ، وَفِيْ تَعَامُلِهِمُ الْاِسْتِصْنَاعَ نَوْعُ شُبْهَةٍ، فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى السَّلَمِ أَوْلٰى . وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ : আর [প্রথমোক্ত মাসআলায়] 'মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই' কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো, যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলন রয়েছে তাতে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা 'বায় সলম' হয়ে যাবে। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে 'বায় সলম' হবে না। আর যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রচলন নেই তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করলে তা সকলের ঐকমত্যে 'বায় সলম' হয়ে যাবে। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশের শব্দ প্রকৃতভাবে ফরমায়েশের অর্থই প্রদান করে। সুতরাং তার অর্থ-চাহিদা রক্ষা করতে হবে। আর মেয়াদের উল্লেখ দ্রুত চাওয়ার অর্থে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে প্রচলন নেই [সে সকল ক্ষেত্রে তা 'বায় সলম' হবে]। কারণ, তা হচ্ছে একটি ফাসিদ ফরমায়েশি চুক্তি, তাই [মেয়াদ উল্লেখের সূত্রে] তা বৈধ 'বায় সলম' বলে সাব্যস্ত করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশি দ্রব্যটি হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তু [বা দাইন] যা 'বায় সলম' হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আর 'বায় সলম'-এর বৈধতা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, যাতে কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে ফরমায়েশি চুক্তির প্রচলনের বিষয়ে এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে। [কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।] সুতরাং উক্ত ফরমায়েশি চুক্তিকে 'সলমের' অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম হবে। আল্লাহ তা'আলা-ই অধিক জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(قَالَ وَإِنِ اسْتَصْنَعَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ بِغَيْرِ أَجَلٍ الخ : قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْرِ أَجَلٍ এখানে মুসান্নিফ (র.) পূর্বের مَتْن [মতন] جَازَ اِسْتِحْسَانًا "উল্লিখিত বস্তুসমূহের কোনোটি যদি মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই [বিক্রেতা পরে] প্রস্তুত করে দিবে এ শর্তে ক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে" এ ইবারতের মাঝে 'মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই' বলার কারণ ও ফায়দা কি ছিল তা বর্ণনা করছেন। এটি বুঝার পূর্বে একটি ভূমিকা বুঝতে হবে, তা হলো মেয়াদ বা সময় উল্লেখ করার দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. اِسْتِمْهَالًا অর্থাৎ অবকাশ বা সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যেমন– 'বায় সলম' -এর মাঝে দাদনগ্রহীতাকে সময় দেওয়া হয়।

২. إِسْتِمْهَالًا অবকাশ বা সুযোগ দানের উদ্দেশ্য নয়; বরং দ্রব্যটি দ্রুত লাভের উদ্দেশ্যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন বলল, আগামী তিন দিনের ভিতর তুমি দ্রব্য তৈরি করে দিবে। اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যে, পূর্বে মতনে বলা হয়েছে "মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রথম প্রকার অর্থাৎ কারিগরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য মেয়াদ নির্ধারণ না করতে হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে বলা হয়েছে 'মেয়াদ নির্ধারণ ছাড়াই' এর কারণ হলো, اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যদি মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় এবং তা কারিগরকে অবকাশ দেওয়ার উদ্দেশ্য إِسْتِمْهَالًا হয়, তাহলে চুক্তিটি যদি এমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন রয়েছে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তা 'বায় সলম' হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তা জায়েজ হওয়ার জন্য সেসকল শর্ত আবশ্যক হবে যা 'বায় সলম' সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যক। [ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং আহমদ (র.)-এর অভিমতও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের অনুরূপ।] আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে তা اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হবে। আর যদি চুক্তিটি এমন দ্রব্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যাতে [[ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন নেই, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা 'বায় সলম' বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, যদি মেয়াদ উল্লেখ না করে কিংবা মেয়াদ উল্লেখ করে দ্রুত গ্রহণের জন্য কারিগরকে সময় বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্যে (إِسْتِعْجَالًا) তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]- বলেই গণ্য হবে।

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ اللَّفْظَ حَقِيْقَةٌ لِلْاِسْتِصْنَاعِ الخ : বিরোধপূর্ণ সুরতের ক্ষেত্রে সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো, যেহেতু চুক্তিকারীদ্বয় الاستصناع [অর্ডার প্রদান ও অর্ডার গ্রহণ] -এর শব্দ দ্বারা চুক্তিটি করেছে আর اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] হওয়াই-এর প্রকৃত অর্থ। কাজেই শব্দের প্রকৃত অর্থ হিসেবে তা اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য করা হবে। বাকি থাকল মেয়াদ উল্লেখ করার বিষয়টি। তো সে ক্ষেত্রে আমরা বলব, মেয়াদ উল্লেখ যেহেতু দুটি অর্থে হতে পারে–

১. إِسْتِعْجَالًا বা দ্রব্য দ্রুত গ্রহণের জন্য কারিগরকে সময় বেঁধে দেওয়ার উদ্দেশ্য।

২. إِسْتِمْهَالًا অর্থাৎ কারিগরকে অবকাশ বা একটা মেয়াদের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রথম অর্থ ধরা হলে তা সকলের ঐকমত্যে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হয়। সুতরাং শব্দের প্রকৃত অর্থ বহাল রাখতে আমরা মেয়াদের উল্লেখকে প্রথম অর্থে ধরে নিব। অতএব, তা اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে দ্রব্যের ক্ষেত্রে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর প্রচলন নেই, সে ক্ষেত্রে যেহেতু اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] হিসেবে গণ্য করলে চুক্তিটি ফাসিদ হয় তাই শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে তা মেয়াদ উল্লেখের কারণে 'বায় সলম' -এর অর্থে গণ্য করা হবে, যাতে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের চুক্তি যথাসম্ভব সঠিক রাখা যায়।

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رحـ) أَنَّهُ دَيْنٌ يَحْتَمِلُ السَّلَمَ الخ : এর মতবিরোধপূর্ণ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ফরমায়েশকৃত দ্রব্যটি কারিগরের জিম্মায় ওয়াজিব বা দাইন হয়ে থাকে। আর এরূপ জিম্মায় ওয়াজিব [দাইন] 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে এবং اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যখন মেয়াদের উল্লেখ করেছে তখন তা 'বায় সলম' -এর চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে এবং اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু 'বায় সলম'-এর চুক্তির অর্থে গ্রহণ করাই অগ্রাধিকার পাবে। কেননা, 'বায় সলম' -এর বৈধতা এমন ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, 'বায় সলম' জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো মতবিরোধ নেই। তাছাড়া 'বায় সলম' -এর বৈধতা কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। পক্ষান্তরে اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি]-এর বৈধতা যে إِجْمَاعٌ عَمَلِيٌّ বা تَعَامُلُ النَّاسِ -এর উপর ভিত্তিশীল তা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। কারণ, اَلْإِسْتِصْنَاعُ [ফরমায়েশি-চুক্তি] বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে। অতএব, যখন মেয়াদ উল্লেখের কারণে তাতে উভয় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন যে চুক্তির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সেই চুক্তিই গণ্য হবে।

مَسَائِلُ مَنْثُوْرَةٌ

قَالَ : وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِيْ ذٰلِكَ سَوَاءٌ، وَعَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُوْرِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رحـ) لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْكَلْبِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِنَ السُّحْتِ مَهْرَ الْبَغْيِ وَثَمَنَ الْكَلْبِ، وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ، وَجَوَازُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِيًا، وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا، فَكَانَ مَالًا فَيَجُوْزُ بَيْعُهُ، بِخِلَافِ الْهَوَامِّ الْمُؤْذِيَةِ، لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ قَلْعًا لَهُمْ عَنِ الْاِقْتِنَاءِ، وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيَحْرُمُ التَّنَاوُلُ دُوْنَ الْبَيْعِ.

বিক্ষিপ্ত কিছু মাসআলা

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুকুর, চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী বিক্রয় করা জায়েজ। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উভয়ে সমান। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে একটি বর্ণনা মতে দংশনকারী কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, দংশনকারী কুকুর দ্বারা উপকার অর্জিত হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো প্রকার কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন– "নিশ্চয়ই ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং কুকুরের মূল্য হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।" আরেকটি কারণ এই যে, কুকুর হচ্ছে সত্তাগতভাবে নাপাক, আর নাপাক হওয়া বস্তুটির তুচ্ছ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু বিক্রয় জায়েজ হওয়া তার মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই বিক্রয়ের বৈধতা নিষিদ্ধ হবে। আর আমাদের দলিল হলো, নবী করীম ﷺ শিকারের কুকুর ও পশুপাল পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া এ কারণে [জায়েজ] যে, কুকুর দ্বারা পাহারা দেওয়ানো এবং শিকার করানোর মাধ্যমে তা দ্বারা উপকার লাভ করা হয়। সুতরাং তা [মূল্যসম্পন্ন] মাল হবে। অতএব, তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তদ্দারা উপকার লাভ করা হয় না। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। [এ নিষেধাজ্ঞার] উদ্দেশ্য ছিল, তাদের কুকুর পালার অভ্যাস নির্মূল করা। আর আমরা কুকুর সত্তাগত নাপাক হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করি না। আর যদি স্বীকার করেও নিই তাহলে আমাদের জবাব হলো, এ কারণে তা খাওয়া হারাম হবে– বিক্রয় হারাম হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, যে সকল মাসায়েল পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা থেকে বাদ পড়ে যায় সেগুলোকে যখন পরিশিষ্টরূপে উল্লেখ করা হয় তখন তার শিরোনাম مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ বা "বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ" দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল মাসায়েল 'ক্রয়-বিক্রয়' সংক্রান্ত পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহে উল্লেখ করা থেকে বাদ পড়েছে, তার আলোচনা।

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الخ - মাসআলা : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুকুর, চিতাবাঘ এবং হিংস্র প্রাণীসমূহ বিক্রয় করা জায়েজ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে চাই প্রাণীটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোক কিংবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হোক উভয় অবস্থায়ই বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে [غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ -এ] বর্ণিত আছে যে, দংশনকারী কুকুর যাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না, তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, তা দ্বারা কোনো উপকার অর্জিত হয় না। উল্লেখ্য, ইমাম সারাখসী (র.) তাঁর মাবসূত গ্রন্থে এ মতটিকে আমাদের মাযহাবের সঠিক মত বলে বর্ণনা করে বলেছেন, যে সকল প্রাণী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে, আর যা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না তা বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। -[বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল কাদীর ও ফতোয়ায়ে শামী, ৭ম খণ্ড- بَابُ الْمُتَفَرِّقَاتِ] প্রশিক্ষণ গ্রহণের অর্থ হলো, প্রাণীটিকে মালিক শিকারের নির্দেশ দিলে শিকারের জন্য উদ্যত হয় এবং বারণ করলে থেমে যায়। আর শিকার করার পর সে নিজে তা থেকে ভক্ষণ করে না; বরং মালিকের অপেক্ষায় রেখে দেয়।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো প্রকারের কুকুর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। উল্লেখ্য, তাঁর এ মতবিরোধ বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে; কুকুর পোষার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, শিকারের উদ্দেশ্যে কিংবা ঘর-বাড়ি, ফসল বা পশু পাহারার জন্য কুকুর পোষা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষে নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল রয়েছে।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مِنَ السُّحْتِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নকলী দলিল হলো-

১. সহীহ ইবনে হিব্বান ও দারাকুতনীতে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ وَكَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ .

"নবী করীম ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক, কুকুরের মূল্য এবং শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জনকারীর উপার্জন হারামের অন্তর্ভুক্ত।"

২. বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং গণকের মিষ্টান্ন [গ্রহণ করতে] নিষেধ করেছেন।

৩. মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-

عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

"নবী করীম ﷺ কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।"

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিল হলো, কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক। তার প্রমাণ হলো, এর ঝুটা নাপাক। আর ঝুটা নাপাক হয় তার মুখের লালা নাপাক হওয়ার কারণে, আর মুখের লালা নাপাক হয় গোশত নাপাক হওয়ার কারণে, সুতরাং বুঝা গেল কুকুরের গোশত নাপাক। আর যা সত্তাগত নাপাক তা বিক্রয় করা হারাম হয়। কেননা, সত্তাগত নাপাক হওয়া বস্তুটি হীন ও নিকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে বিক্রয় জায়েজ হওয়া বস্তুটির মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর একই বস্তু হীন এবং মর্যাদাপূর্ণ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যেহেতু কুকুর হীন হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে সেহেতু তা বিক্রয় করা নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করছেন। আমাদের পক্ষ থেকেও নকলী এবং আকলী উভয় প্রকারের দলিল পেশ করেছেন। আমাদের নকলী দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস– أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

"নবী করীম ﷺ শিকারের কুকুর ও পশুপাল পাহারা দেওয়ার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" এ হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) যে শব্দে উল্লেখ করেছেন সে শব্দে হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ মর্মের হাদীস দুর্বল সনদে তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এবং ইবনে আদীর 'আল-কামিল'-এ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটু পরে আমরা আলোচনা করব।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَرَاسَةً وَاصْطِيَادًا الخ : আমাদের আকলী দলিল হলো, কুকুর এমন একটি মাল বা সম্পদ, যা দ্বারা উপকার অর্জিত হয়। যেমন– শিকার করা, পাহারা দেওয়া। আর শরিয়ত কুকুর দ্বারা এ সকল উপকার অর্জন করার অনুমতিও প্রদান করেছে। [কেননা, শিকার করা বা পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পোষা সকলের ঐকমত্যে জায়েজ।]। সুতরাং কুকুর শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত। আর যা শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত তা বিক্রয় জায়েজ। অতএব, কুকুর বিক্রয় জায়েজ হবে। পক্ষান্তরে কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গ বা প্রাণী বিক্রয় জায়েজ নয়। কেননা, তা দ্বারা উপকার অর্জিত হয় না। তাই তা শরিয়তসম্মত মালের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, তা বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْحَدِيْثُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাব হলো–

১. বিক্রয় নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস প্রথম দিকের, পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। এর দলিল হচ্ছে, জাহিলিয়া যুগ থেকে সাধারণত সখের কারণে কুকুর পোষার প্রবণতা ছিল। আর এ প্রবণতা সমূলে দূর করার জন্য প্রথম দিকে সব ধরনের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এ নিষেধাজ্ঞা রহিত করে শিকারি ও পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে মুসলিম শরীফ ও তাহাবী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

   عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَا أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ : مَا لِيْ وَلِلْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِيْ كَلْبٍ اٰخَرَ نَسِيَهُ سَعِيْدٌ.

   "নবী করীম ﷺ কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করলেন। পরবর্তীতে বললেন, কুকুরের সাথে আমার কী [শত্রুতা] আছে! অতঃপর তিনি শিকারি কুকুর ও অন্য একটি কুকুর–যা বর্ণনাকারী সা'ঈদ ভুলে গিয়েছেন– পোষার অনুমতি প্রদান করলেন।" এ হাদীসের ভিত্তিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে– বিক্রয় নিষেধের হাদীসটিও প্রথম দিকের, যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

২. আমাদের দ্বিতীয় জবাব হলো, উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে কুকুর বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা শিকার কিংবা পাহারার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না। কেননা, এরূপ কুকুর পোষা জায়েজ নয়, তাই তা বিক্রয়ও জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে শিকারি কুকুর কিংবা পাহারার কুকুর শরিয়তে পোষার অনুমতি দিয়েছে, কাজেই তা 'উপকারী সম্পদ'। কেননা, শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যা কাজে ব্যবহার করার এবং তা থেকে উপকার অর্জন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ক্রয়-বিক্রয় করারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, বস্তুটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু তা অর্জন করার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হলো– যা শরিয়তের সাধারণ নিয়মের পরিপন্থি। আমাদের এ বক্তব্যের সমর্থন হচ্ছে ঐ সকল রেওয়ায়েত যাতে শিকারি কুকুরকে বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞার বহির্ভূত (مُسْتَثْنٰى) করা

হয়েছে। যদিও হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল, কিন্তু তা কমপক্ষে শরিয়তের সাধারণ নিয়মের অনুকূলে সমর্থন যোগাবে। এ সকল রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে–

১. পূর্বে বর্ণিত মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখকৃত হাদীস– أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

২. তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ .

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল।

৩. ইবনে আদী 'কামিল'-এ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন– أَرْخَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ এ হাদীসটির সনদও দুর্বল।

উল্লেখ্য, আমাদের এ জবাব অনুযায়ী কেবল উপকার-উপযোগী কুকুর বিক্রয় জায়েজ; উপকার-অনুপযোগী কুকুর বিক্রয় জায়েজ নয়। আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম সারাখসী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এ অভিমতটিই আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধতম অভিমত।

قَوْلُهُ وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর আকলী দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, প্রথমত আমরা তাঁর এ দাবি স্বীকার করি না যে, কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক। কেননা, নিঃশর্তভাবে কুকুর দ্বারা উপকার অর্জন করা শরিয়ত জায়েজ করেছে, আর এটা প্রমাণ বহন করে যে, কুকুর সত্তাগত নাপাক নয়। আর দ্বিতীয়ত যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, কুকুর সত্তাগত নাপাক, তাহলেও তাঁর দলিলের জবাব হলো, সত্তাগত নাপাক হওয়ার কারণে কুকুর খাওয়া হারাম হবে, কিন্তু তা বিক্রয় করা হারাম হবে না। যেমন– আমাদের মতে গোবর বা লেদ সত্তাগতভাবে নাপাক, কিন্তু তা বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, শরিয়ত তা ব্যবহার করে উপকার গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেছে, কাজেই তা বিক্রয়ও জায়েজ। পক্ষান্তরে মানুষের পায়খানা সত্তাগত নাপাক এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, সুতরাং তা বিক্রয় করাও জায়েজ নয়। অবশ্য যে প্রক্রিয়ায় তা ব্যবহারের বৈধতার কথা ফকীহগণ বলেন, সে ক্ষেত্রে তা বিক্রয় বৈধ হওয়ার কথাও বলেন। যেমন– তা যদি মাটির সাথে মিশ্রিত করা হয় তবে ফিকহবিদগণের মতে তা ব্যবহার করা জায়েজ, তদ্রূপ তা বিক্রয় করাও জায়েজ। সারকথা, যে সকল বস্তু বা প্রাণীর দ্বারা উপকার গ্রহণ করা জায়েজ করা হয়েছে সে সকল বস্তু বা প্রাণী বিক্রয় করাও জায়েজ করা হয়েছে। কাজেই কুকুর বিক্রয় করাও জায়েজ হবে।

قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ، إِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبُهَا حَرَّمَ بَيْعُهَا وَاَكْلُ ثَمَنِهَا ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِىْ حَقِّنَا وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কেননা, নবী করীম ﷺ মদ সম্পর্কে বলেছেন, যে মহান সত্তা তা পান করা হারাম করেছেন তিনি তা বিক্রয় করা এবং মূল্য ভক্ষণ করাও হারাম করেছেন। তাছাড়া আরেকটি কারণ হলো, তা আমাদের [মুসলামানদের] জন্য মাল বলে গণ্য নয়। এ বিষয়টি আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ الخ :

মাসআলা : মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। মদ বিক্রয় হারাম হওয়ার দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর হাদীস। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : إِنَّ رَجُلًا أَهْدٰى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ شُرْبَهَا؟ قَالَ : لَا، قَالَ : فَسَارَّ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ؟ قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبُهَا حَرَّمَ بَيْعُهَا.

"আব্দুর রহমান ইবনে ও'লা বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে আঙ্গুর নিংড়ানো রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এক ব্যক্তি একটি মদের মশক নবী করীম ﷺ -কে হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করেছিল। তখন নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, তুমি কি জান যে, আল্লাহ তা'আলা মদ পান করা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন এক ব্যক্তি সেই লোকটির সাথে কানে কানে কি যেন বলল। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কানে কানে তাকে কি বললে? সে বলল, আমি তাকে এ মদ বিক্রয় করে ফেলার পরামর্শ দিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে মহান সত্তা এটা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এটা বিক্রয় করাও হারাম করে দিয়েছেন।"

উল্লেখ্য, এ হাদীসটিতে কেবল মদ বিক্রয় হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) শূকর বিক্রয় হারাম হওয়া সংক্রান্ত কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি। এ সংক্রান্ত হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُوْلُ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ الخ -

"হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় থাকাবস্থায় বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত জানোয়ার, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন।"

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِىْ حَقِّنَا الخ : মদ ও শূকর বিক্রয় করা হারাম হওয়ার আকলী দলিল হলো, শরিয়তের দৃষ্টিতে মদ ও শূকর মুসলমানদের ক্ষেত্রে মূল্যসম্পন্ন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে বস্তু মূল্যসম্পন্ন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয় তা বিক্রয় করা জায়েজ নয়। কাজেই মদ ও শূকর বিক্রয় করা জায়েজ নয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমরা 'ফাসিদ বিক্রয়' অধ্যায়ের শুরুতে [মূল গ্রন্থের ৩৩ নং পৃষ্ঠার শুরুতে] আলোচনা করেছি।

قَالَ : وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِى الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِيْنَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ : فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَلِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُوْنَ مُحْتَاجُوْنَ كَالْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ : إِلَّا فِى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ خَاصَّةً، فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيْرِ، وَعَقْدَهُمْ عَلَى الْخِنْزِيْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ فِىْ اِعْتِقَادِهِمْ، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ، دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ (رض) : وَلُّوهُمْ بَيْعَهُمَا وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهِمَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জিম্মিগণ সমস্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুসলামানদের মতোই। কেননা, নবী করীম ﷺ সেই হাদীসে বলেছেন–"তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য থাকবে সে সকল সুযোগ-সুবিধা যা মুসলমানদের রয়েছে এবং তাদের উপর থাকবে সে সকল দায়-দায়িত্ব যা মুসলমানদের উপর রয়েছে।" তাছাড়া এ কারণে যে, তারাও মুসলমানদের ন্যায় [বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে] শরিয়তের পক্ষ থেকে সম্বোধিত এবং [জীবনযাপনের জন্য লেনদেন করার] মুখাপেক্ষী। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে কেবলমাত্র মদ এবং শূকরের ক্ষেত্রে [তাদের বিধান ব্যতিক্রম]। অতএব, মদের ক্ষেত্রে তাদের চুক্তি মুসলমানদের ফলের রসের ক্ষেত্রে চুক্তির ন্যায় হবে এবং শূকরের ক্ষেত্রে তাদের চুক্তি মুসলামানদের বকরির ক্ষেত্রে চুক্তির ন্যায় হবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস মতে এগুলো [মূল্যসম্পন্ন] সম্পদ। আর আমরা তাদেরকে তাদের বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিতে আদিষ্ট হয়েছি। হযরত ওমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত নির্দেশটি এ বিষয়টির প্রমাণ– "তাদেরকে ঐ দুটি বস্তু বিক্রয় করার ক্ষমতা দিয়ে দাও এবং তার মূল্য থেকে উশর গ্রহণ কর"।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْبِيَاعَاتُ এবং أَهْلُ الذِّمَّةِ পরিচিতি :

اَلْبِيَاعَاتُ : শব্দটি اَلْبِيَاعَةُ-এর বহুবচন। আল্লামা আইনী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, اَلْبِيَاعَةُ -এর অর্থ হচ্ছে اَلسِّلْعَةُ [পণ্যদ্রব্য]। এখানে فِى الْبِيَاعَاتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে فِىْ بَيْعِ الْبِيَاعَاتِ [পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে]। বাহ্যত মনে হয় ফকীহগণ اَلْبِيَاعَاتُ বলে ক্রয়-বিক্রয় বুঝিয়েছেন, কিন্তু অভিধানে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় না।

أَهْلُ الذِّمَّةِ : জিম্মি বলা হয় এমন কাফের ব্যক্তিকে, যে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলামানদের কর্তৃত্ব ও তাদের আইন-কানুন মেনে নিয়ে বসবাস করে।

قَوْلُهُ قَالَ : وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِى الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِيْنَ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তির ক্ষেত্রে জিম্মিদের ক্ষেত্রে বিধান তাই প্রযোজ্য হবে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যে সকল ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের জন্য বৈধ তা তাদের জন্যও বৈধ হবে, আর যে সকল ক্রয়-বিক্রয় মুসলমানদের জন্য বৈধ নয় তা তাদের জন্যও বৈধ হবে না। উদাহরণস্বরূপ তারা পরস্পরে এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না, বায় সলম [দাদন-চুক্তি]-এর ভিত্তিতে পশু বিক্রয় করতে পারবে না এবং 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় করতে পারবে না।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার দলিল হচ্ছে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম ﷺ -এর বাণী- فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যখন হযরত মুয়ায (রা.)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন তখন তাঁকে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তন্মধ্যে এ নির্দেশনাটি ছিল যে, "তুমি তাদেরকে [অর্থাৎ সেখানকার কাফির অধিবাসীদেরকে] জানিয়ে দিবে যে, মুসলমানদের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও বৈধতা রয়েছে তা তারাও লাভ করবে, আর মুসলামানদের উপর যে সকল কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ রয়েছে তা তাদের উপরও বর্তাবে।"

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُوْنَ مُحْتَاجُوْنَ كَالْمُسْلِمِيْنَ الخ : উক্ত মাসআলার দ্বিতীয় দলিল হলো, জিম্মিরা সকলের ঐকমত্যে লেনদেন সম্পর্কিত বিধিবিধানের 'মুকাল্লাফ' বা আওতাধীন এবং জীবনোপকরণ অর্জন করার জন্য তারাও এ সকল ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের মুখাপেক্ষী। আর তারা আমাদের দেশের বিধি-বিধান মেনে নিয়ে বসবাস করতে সম্মতি প্রদান করেছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিধিবিধান তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ قَالَ : إِلَّا فِى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ خَاصَّةً الخ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে জিম্মিদের ক্ষেত্রে মদ ও শূকরের বিধান মুসলামানদের বিধানের ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ এ দুটির ক্রয়-বিক্রয় মুসলমাদের জন্য যদিও জায়েজ নয়, কিন্তু জিম্মিদেরকে এ দুটি ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করা হবে। তারা পরস্পরে যদি মদ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তার বিধিবিধান মুসলমানদের পারস্পরিক আঙ্গুরের রস বিক্রয়ের বিধিবিধানের অনুরূপ হবে। আর তারা যদি পরস্পরে শূকর ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তার বিধিবিধান মুসলমানদের পারস্পরিক বকরি বিক্রয়ের বিধিবিধানের ন্যায় হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ فِيْ اِعْتِقَادِهِمْ الخ : এ মাসআলার দলিল হলো, মদ ও শূকর জিম্মিদের ধর্ম-বিশ্বাস মতে মূল্যমান সম্পন্ন সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদেরকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমরা শরিয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট। সুতরাং যখন এ দুটি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসে মূল্যমানসম্পন্ন সম্পদ তখন এ দুটির ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ হবে।

قَوْلُهُ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ عُمَرَ (رض) : وَلُّوْهُمْ بَيْعَهُمَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা যে জিম্মিদেরকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিতে শরিয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট, এর প্রমাণ বহন করে গভর্নরদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর নিম্নোক্ত ফরমান- وَلُّوْهُمْ بَيْعَهُمَا وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهِمَا "তাদেরকে ঐ দুটি বস্তু বিক্রয় করার ক্ষমতা দিয়ে দাও এবং তার মূল্য থেকে উশর গ্রহণ কর।" পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ يَقُوْلُ : حَضَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ عُمَّالُهُ، فَقَالَ يَا هٰؤُلَاءِ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ تَأْخُذُوْنَ فِى الْجِزْيَةِ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْخَمْرِ فَقَالَ بِلَالٌ : أَجَلْ إِنَّهُمْ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ، فَقَالَ : فَلَا تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ وَلُّوْا أَرْبَابَهَا بَيْعَهَا ثُمَّ خُذُوْا الثَّمَنَ مِنْهُمْ وَلَا تُجِيْزُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.

উল্লেখ্য, 'হাদীসটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল খিরাজ'-এ বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রায্যাক ও আবূ উবায়েদ তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْ عَبْدَكَ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ خَمْسَ مِائَةٍ مِنَ الثَّمَنِ سِوَى الْأَلْفِ فَفَعَلَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ الْأَلْفَ مِنَ الْمُشْتَرِي وَالْخَمْسَ مِائَةٍ مِنَ الضَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ مِنَ الثَّمَنِ جَازَ الْبَيْعُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الضَّمِيْنِ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا، وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) لِأَنَّهُ تَغْيِيْرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوْعٍ إِلَى وَصْفٍ مَشْرُوْعٍ وَهُوَ كَوْنُهُ عَدْلًا أَوْ خَاسِرًا أَوْ رَابِحًا ثُمَّ قَدْ لَا يَسْتَفِيْدُ الْمُشْتَرِي بِهَا شَيْئًا بِأَنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ وَهُوَ يُسَاوِي الْمَبِيْعَ بِدُوْنِهَا، فَيَصِحُّ اِشْتِرَاطُهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ كَبَدَلِ الْخُلْعِ، لٰكِنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْمُقَابَلَةُ تَسْمِيَةً وَصُوْرَةً فَإِذَا قَالَ مِنَ الثَّمَنِ وُجِدَ شَرْطُهَا فَيَصِحُّ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لَمْ يُوْجَدْ فَلَمْ يَصِحَّ .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ অপরকে বলে 'তুমি তোমার গোলামটি অমুকের নিকট এক হাজার দিরহামে এই শর্তে বিক্রয় কর যে, এক হাজার দিরহাম ব্যতীত মূল্য থেকে পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার আমি, অতঃপর বিক্রেতা যদি তা করে তাহলে এটা জায়েজ হবে। আর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম উসুল করবে এবং দায়গ্রহণকারীর নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে দায়গ্রহণকারী যদি 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলে তাহলে এক হাজার দিরহাম মূল্য সাব্যস্ত হয়ে বিক্রয়টি জায়েজ হয়ে যাবে। আর দায়গ্রহণকারীর উপর কোনো পাওনা সাব্যস্ত হবে না। এ ক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো, আমাদের মতে মূল্য এবং বিক্রীত-দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত সংযোজন করা জায়েজ এবং তা মূল চুক্তির সাথেই যুক্ত হয়। ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলিল হলো, এটা হচ্ছে চুক্তিটিকে একটি বৈধ গুণ থেকে আরেকটি বৈধ গুণে পরিণত করা। এখানে বৈধ গুণগুলো হলো– চুক্তিটি [বিক্রয়মূল্যের সাথে বাজারমূল্যের তুলনার ক্ষেত্রে] সমান সমান হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা লাভজনক হওয়া। আর কখনো এমন হয় যে, ক্রেতা অতিরিক্ত সংযোজিত মূল্যের বিনিময়ে কোনো ফায়দা অর্জন করে না। যেমন– সে মূল্যের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন করল অথচ বর্ধিত অংশ ছাড়া প্রথম মূল্যই বিক্রীত-বস্তুর [বাজারমূল্যের] সমান ছিল। সুতরাং অতিরিক্ত সংযোজনের শর্ত তৃতীয় ব্যক্তির উপর করাও সঠিক হবে। যেমন– 'খুলা' [অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর তালাক গ্রহণ]-এর বিনিময়-বস্তুর ক্ষেত্রে [অর্থাৎ 'খুলা'কারিণী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি 'খুলা'-এর বিনিময়-বস্তু আদায় করে দিবে এরূপ শর্ত করলে তা সঠিক হয়]। তবে অতিরিক্ত সংযোজন সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উল্লেখগত দিক থেকে এবং দৃশ্যগত দিক থেকে তা [অপর বস্তুর] বিনিময় হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া [এজন্যই দায়গ্রহণকারী ব্যক্তির 'মূল্য থেকে'

কথাটি উল্লেখ করতে হবে এবং প্রথম মূল্য ও সংযোজিত মূল্য উভয়টি বিক্রীত-বস্তুর বিনিময় বলে গণ্য করতে হবে]। সুতরাং যখন দায়গ্রহণকারী ব্যক্তি 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করবে তখন শর্ত পাওয়া যাবে; অতএব তা সঠিক হবে। আর যখন 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ না করবে, তখন শর্ত পাওয়া যাবে না। অতএব তা সঠিকও হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْ عَبْدَكَ الخ : মাসআলাটির সুরত হলো, কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি গোলাম ক্রয় করতে চাচ্ছে এবং সে চাচ্ছে এক হাজার দিরহামে ক্রয় করতে, কিন্তু বিক্রেতা পনের শত দিরহামের কমে দিতে সম্মত হচ্ছে না, এমতাবস্থায় তৃতীয় এক ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলল, তুমি তার নিকট এক হাজার দিরহামে গোলামটি এ শর্তে বিক্রয় কর যে, 'আমি এ এক হাজার ছাড়াও মূল্য থেকে আরো পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার হলাম' অতঃপর বিক্রেতা বিক্রয় করে দিল। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হবে এবং তৃতীয় ব্যক্তির শর্তও সহীহ হবে। কাজেই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে আর তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে পাঁচশত দিরহাম আদায় করবে।

পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তিটি যদি উক্ত কথা বলার সময় 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলে; বরং শুধু বলে যে, তুমি তার নিকট এক হাজার দিরহামে গোলামটি এ শর্তে বিক্রয় কর যে, 'আমি পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার' অতঃপর বিক্রেতা বিক্রয় করে দেয় তাহলে বিধান হলো, কেবল এক হাজার দিরহামে গোলামটির বিক্রয় কার্যকর হবে। তৃতীয় ব্যক্তিটির জিম্মায় কোনো দিরহাম সাব্যস্ত হবে না। কাজেই বিক্রেতা কেবল ক্রেতার নিকট হতে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে কোনো কিছু আদায় করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَأَصْلُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলাটির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের পূর্বে উল্লিখিত মূলনীতি। বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা ইচ্ছা করলে নির্ধারিত মূল্যের সাথে আরো কিছু মূল্য বৃদ্ধি করে দিতে পারে, তদ্রূপ বিক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রেয়-দ্রব্য বৃদ্ধি করে দিতে পারে। তবে আমাদের মতে উভয় ক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্য নির্ধারিত মূল্যের সাথে যুক্ত হয়ে উভয়টি প্রকৃত মূল্য হিসেবে গণ্য হবে, এরূপভাবে বর্ধিত বিক্রেয়-দ্রব্যমূল বিক্রীত-দ্রব্যের সাথে যুক্ত হয়ে উভয়টি প্রকৃত বিক্রীত-দ্রব্য বলে গণ্য হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.) -এর মতে বর্ধিত মূল্য পূর্বের মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না তদ্রূপ বর্ধিত বিক্রেয়-দ্রব্যমূল বিক্রীত-দ্রব্যের সাথে যুক্ত হবে না; বরং উভয়টি স্বতন্ত্র দান বা 'হিবা' হিসেবে গণ্য হবে। [এ মূলনীতিটি মতবিরোধ ও দলিলসহ মূল গ্রন্থের بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ -এর শেষে ৫৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَصْفٍ مَشْرُوعٍ الخ : মতবিরোধপূর্ণ উল্লিখিত মূলনীতিটির ক্ষেত্রে আমাদের দলিল হচ্ছে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্য কিংবা বিক্রয়-দ্রব্য বৃদ্ধি করে দেওয়ার কারণে কেবল চুক্তির শরিয়ত অনুমোদিত একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে অপর একটি শরিয়ত অনুমোদিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ বিক্রয় তিনটি গুণের যে কোনো একটি গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। গুণ তিনটি হলো : বিক্রেয় লাভজনক হওয়া, সমান সমান হওয়া এবং লোকসান হওয়া। আর এ তিন প্রকার বিক্রয়ই শরিয়ত অনুমোদিত। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের যখন তাদের চুক্তি সম্পাদন করার পর তা প্রত্যাহার (إِقَالَة) করার অধিকার রয়েছে তখন চুক্তিকে তার এক গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন করার অধিকার থাকা অধিক যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং তাদের বর্ধিত মূল্য বা বর্ধিত বিক্রেয়-দ্রব্য মূলের সাথে যুক্ত হয়ে চুক্তির গুণাগুণ পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ ثُمَّ قَدْ لَا يَسْتَفِيْدُ الْمُشْتَرِيْ بِهَا شَيْئًا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তির পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার হওয়া জায়েজ না হওয়ার কথা। কেননা, কোনো বস্তু যদি এ শর্তে ক্রয় করে যে, 'এর মূল্য অমুক তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে' কিংবা 'এর আংশিক মূল্য অমুক [তৃতীয় কোনো] ব্যক্তির জিম্মায় থাকবে' তাহলে তা জায়েজ হয় না। অথচ আলোচ্য সুরতে তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় আংশিক মূল্য থাকার শর্তেই ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, কাজেই তা জায়েজ না হওয়ার কথা।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে– আলোচ্য মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত দিরহাম প্রদানের বিষয়টি بَدَلُ الْخُلْعِ অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক তালাক প্রদানের শর্তে স্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় টাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামঞ্জস্য হচ্ছে এদিক থেকে যে, 'বদলুল খুলা' -এর বিনিময়ে যেরূপ স্ত্রী কোনো বস্তু লাভ করে না; বরং শুধুমাত্র তার উপর থেকে স্বামীর কর্তৃত্ব রহিত হয়ে যায়, তদ্রূপ বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর ক্রেতা যদি মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে বর্ধিত মূল্যের বিপরীতে সাধারণত ক্রয়কৃত দ্রব্যের কোনো অংশ সাব্যস্ত হয় না। কেননা, যদি প্রথম নির্ধারিত মূল্য দ্রব্যটির বাজারদরের সমান বা বেশি হয়ে থাকে, তাহলে বর্ধিত মূল্যের বিপরীতে ক্রেতার কোনো কিছুই লাভ হচ্ছে না। কাজেই এটি 'বদলুল খুলা'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো। আর 'বদলুল খুলা' তৃতীয় কোনো ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে 'খুলা'-এর চুক্তি করা জায়েজ। কাজেই 'বদলুল খুলা'-এর উপর কিয়াস করে এ ক্ষেত্রেও তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় মূল্য থাকার শর্তে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তম জবাব হলো, বর্ধিত মূল্য সাব্যস্ত হয় মূল মূল্যের অনুগামী (تَابِعٌ) হিসেবে, আর যা অনুগামী হিসেবে সাব্যস্ত হয় তা তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে বিক্রয় জায়েজ হয়। পক্ষান্তরে প্রথম মূল্য আসল ও মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয়, কাজেই তা তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় থাকার শর্তে বিক্রয় জায়েজ হবে না। –[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড- পৃ. ১১৮]

قَوْلُهُ لٰكِنْ مِنْ شَرْطِهَا الْمُقَابَلَةُ تَسْمِيَةً وَصُوْرَةً الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত দুটি মাসআলার মাঝে পার্থক্য করছেন। প্রথম মাসআলায় তৃতীয় ব্যক্তি 'মূল্য থেকে পাঁচশত দিরহামের জিম্মাদার' বলার কারণে তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়েছে। ফলে বিক্রেতা তার কাছ থেকে তা আদায় করার অধিকার লাভ করেছে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় 'মূল্য থেকে' কথাটি না বলার কারণে তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়নি ফলে বিক্রেতা তার কাছ থেকে পাঁচশত দিরহাম আদায় করার অধিকার লাভ করেনি। এ পার্থক্যের কারণ হলো, আমরা যে বলেছি 'বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর মূল্য বৃদ্ধি করে দেওয়া জায়েজ'-এর জন্য শর্ত হলো, বর্ধিত মূল্যটি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এবং বাহ্যত দিক থেকে বিক্রীত-দ্রব্যের বিনিময়ে হতে হবে। উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিনিময়ে হওয়ার অর্থ হলো– এ কথা উল্লেখ করতে হবে যে, এ টাকা বা দিরহাম উক্ত বস্তুর মূল্য হিসেবে প্রদান করছি, আর বাহ্যত দিক থেকে বিনিময়ে হওয়ার অর্থ হলো উক্ত বর্ধিত মূল্য যদিও প্রকৃতপক্ষে বিক্রীত-বস্তুর বিনিময়ে হচ্ছে না, কেননা, বর্ধিত মূল্য ছাড়াই বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতা লাভ করেছে, কিন্তু দৃশ্যত তা উক্ত বিক্রীত-বস্তুর বিনিময় হিসেবেই প্রদান করতে হবে।

সুতরাং আমাদের আলোচ্য প্রথম মাসআলায় যখন তৃতীয় ব্যক্তি 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করেছে তখন উক্ত শর্ত পূরণ হয়েছে। কাজেই তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় যেহেতু সে 'মূল্য থেকে' কথাটি উল্লেখ করেনি সেহেতু উক্ত শর্ত পূরণ হয়নি। কাজেই তার দায়িত্বগ্রহণ সঠিক হয়নি; বরং তার কথাটি এরূপ হয়েছে যে, তুমি যদি এ বস্তুটি অমুকের নিকট বিক্রয় কর তাহলে আমি তোমাকে এত টাকা দিব। আর এটা হচ্ছে ঘুষ (رِشْوَةٌ) -এর অন্তর্ভুক্ত। আর ঘুষ সর্বাবস্থায়ই হারাম। সুতরাং তা কার্যকর হবে না।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتّٰى زَوَّجَهَا فَوَطِيَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ لِوُجُوْدِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ، وَهُوَ الْمِلْكُ فِى الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ، وَهٰذَا قَبْضٌ لِاَنَّ وَطْىَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ، وَاِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَالْقِيَاسُ اَنْ يَّصِيْرَ قَابِضًا، لِاَنَّهُ تَعْيِيْبٌ حُكْمِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْيِيْبِ الْحَقِيْقِيِّ، وَجْهُ الْاِسْتِحْسَانِ اَنَّ فِى الْحَقِيْقِيِّ اِسْتِيْلَاءً عَلَى الْمَحَلِّ، وَبِهِ يَصِيْرُ قَابِضًا، وَلَا كَذٰلِكَ الْحُكْمِى فَافْتَرَقَا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং তাকে হস্তগত করার পূর্বে অন্য কারো সাথে বিবাহ দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তাহলে বিবাহ বৈধ হবে। কেননা, [ক্রেতার পক্ষে] বিবাহ দানের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হওয়ার কারণ বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলো 'দাসসত্তার পূর্ণ মালিকানা'। আর স্বামীর উপর মোহর সাব্যস্ত হবে। আর এ বিবাহ দান ও স্বামীর সহবাসই ক্রেতার দাসীটি হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমেই স্বামীর সহবাস হয়েছে ; সুতরাং স্বামীর 'কর্ম' তারই 'কর্মের' ন্যায় বলে বিবেচিত হবে। আর যদি স্বামী সহবাস না করে থাকে, তাহলে শুধু বিবাহ দান হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে না। [বাহ্যিক] কিয়াসের দাবি অনুসারে [এ ক্ষেত্রেও] হস্তগতকারী হয়েছে বলে গণ্য হওয়ার কথা। কেননা, শুধু বিবাহ দানও বিধানগতভাবে ত্রুটিযুক্তকরণ বলে গণ্য হয়, কাজেই প্রকৃত ত্রুটিযুক্তকরণের [অর্থাৎ সহবাসের সুরতের] উপরই এর কিয়াস হওয়ার কথা। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের দিক হলো, প্রকৃত ত্রুটিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে পাত্রের উপর [তথা দাসীটির উপর ক্রেতার পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য] আধিপত্য অর্জন করানো হয়, আর সে কারণেই ক্রেতা হস্তগতকারী বলে গণ্য হয়। কিন্তু শুধু বিধানগত ত্রুটিযুক্তকরণের ক্ষেত্রে [আধিপত্য] অর্জিত হয় না। সুতরাং দুটির মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا الخ : **মাসআলা** : কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং দাসীটি হস্তগত করার পূর্বেই তাকে অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয় আর বিবাহের পর স্বামী তার সাথে সহবাস করে, তাহলে বিধান হলো, উক্ত বিবাহ জায়েজ হবে, স্বামীর উপর মোহর সাব্যস্ত হবে এবং ক্রেতা দাসীটিকে হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং স্বামীর সহবাসের পর যদি দাসীটি মারা যায়, তাহলে ক্রেতা হস্তগত করার পর মারা গেছে বলে সাব্যস্ত হবে, কাজেই তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। [উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে উক্ত সুরতে স্বামীর সহবাসের কারণে ক্রেতা হস্তগত করেছে বলে সাব্যস্ত হবে না। কাজেই দাসীটি মারা গেলে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।]

আর যদি ক্রেতা দাসীটিকে বিবাহ দেওয়ার পর স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকে, তাহলে শুধু বিবাহ দেওয়ার কারণে সে দাসীকে হস্তগত করেছে বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং যদি স্বামীর সহবাসের পূর্বে দাসীটি মারা যায়, তাহলে হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতার হাতে মারা গেছে বলে গণ্য হবে। কাজেই ক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।

قَوْلُهُ لِوُجُوْدِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ، وَهُوَ الْمِلْكُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত বিধানগুলোর দলিল বর্ণনা করছেন। প্রথম বিধান তথা ক্রেতার দাসীটিকে হস্তগত করার পূর্বে বিবাহ প্রদান জায়েজ হবে এর দলিল হলো, বিবাহ প্রদানের কর্তৃত্ব অর্জন হয় দাসীর দাসসত্তার পূর্ণ মালিকানা লাভ করার মাধ্যমে। আর এখানে ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা বিদ্যমান। কেননা, ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পরই ক্রয়কৃত বস্তুতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং যখন ক্রেতার দাসীর উপর বিবাহ দানের কর্তৃত্ব অর্জিত হয়েছে তখন তার বিবাহ দানও জায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, দাসীকে হস্তগত করার পূর্বে বিবাহ দেওয়া জায়েজ, কিন্তু হস্তগত করার পূর্বে তাকে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। এর কারণ হলো, হস্তগত করার পূর্বে যদি অন্য কারো কাছে বিক্রয় করে সে ক্ষেত্রে যদি প্রথম ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বে দাসীটি মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বিক্রয়চুক্তিটি রহিত হয়ে যাবে। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, চুক্তিটি আদৌ কার্যকর হবে না, সে ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি জায়েজ হয় না। পক্ষান্তরে বিবাহের ক্ষেত্রে হস্তগত করার পূর্বে যদি দাসীটি মারা যায়, তাহলে বিবাহ রহিত হবে না। আর দ্বিতীয় কারণ হলো, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, বিক্রীত-বস্তুর উপর বিক্রেতার হস্তান্তরের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকতে হবে, অথচ এ ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বে অর্জিত হয় না। পক্ষান্তরে বিবাহের জন্য তা শর্ত নয়। কাজেই হস্তান্তরের ক্ষমতা না থাকলেও বিবাহ দেওয়া জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَهٰذَا قَبْضٌ لِأَنَّ وَطْىَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيْطٍ مِنْ جِهَتِهِ الخ : দ্বিতীয় বিধান তথা 'বিবাহ দানের পর স্বামী দাসীটির সাথে সহবাস করলে ক্রেতা দাসীটি হস্তগত করেছে বলে গণ্য হবে'-এর দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে স্বামীর সহবাস হয়েছে ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদানের কারণে। কাজেই এ ক্ষেত্রে স্বামীর সহবাস [বিধানের দিক থেকে] ক্রেতার সহবাসের পর্যায় গণ্য হবে। আর ক্রেতা যদি দাসীটির সাথে সহবাস করত, তাহলে তা তার পক্ষ হতে হস্তগতকরণ বলে গণ্য হতো। সুতরাং স্বামীর সহবাসও ক্রেতার হস্তগতকরণ বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَّصِيْرَ قَابِضًا الخ : তৃতীয় বিধান তথা 'স্বামী যদি সহবাস না করে তাহলে শুধু বিবাহ দানের কারণে ক্রেতা হস্তগতকারী হবে না'-এর দলিল। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবি হচ্ছে ক্রেতা শুধু বিবাহ দানের কারণেই হস্তগতকারী হওয়া, কিন্তু 'ইসতিহসান' (اِسْتِحْسَانٌ) বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বিধান হচ্ছে হস্তগতকারী না হওয়া। কিয়াসের দবি ছিল হস্তগতকারী হওয়া তার কারণ হলো, দাসীর ক্ষেত্রে বিবাহিত হওয়া দাসী ত্রুটিযুক্ত হওয়া বলে গণ্য হয়। [এ কারণেই কেউ যদি দাসী ক্রয় করার পর জানতে পারে যে দাসীটির স্বামী আছে যদিও তার সাথে সহবাস হয়নি, তাহলে ক্রেতা দাসীকে ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারে।] আর ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত বস্তুর মাঝে ত্রুটি সৃষ্টি করে, তাহলে সে উক্ত বস্তুটির হস্তগতকারী হয়ে যায়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় ক্রেতা বিবাহ দানের মাধ্যমে দাসীকে ত্রুটিযুক্ত করার কারণে দাসীকে সে হস্তগত করেছে বলে গণ্য হওয়াই ছিল কিয়াসের দাবি। উল্লেখ্য, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় বিধানও তাই।

আর 'ইসতিহসান' (اِسْتِحْسَانٌ) বা সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে ক্রেতা হস্তগতকারী না হওয়ার কারণ হলো, বিবাহ হচ্ছে দাসীর প্রতি একটি বিধানগত অধিকার চর্চা এবং এর মাধ্যমে তার মাঝে বিধানগত ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে। দাসীর শরীরে দৃশ্যত (حِسِّىْ) কোনো কার্য সংঘটিত হয়নি। আর বিধানগত ত্রুটির অর্থ এর কারণে ক্রেতাদের আগ্রহ কমে যাওয়া, যেমন যদি দাসীর উপর অন্যদের ঋণ পাওনা আছে বলে স্বীকার করা হয় তাহলে দাসীকে ক্রেতাদের ক্রয় করার আগ্রহ কমে যায়। আর এরূপ ত্রুটিযুক্ত করার কারণে হস্তগতকারী বলে সাব্যস্ত হয় না। যেমন ক্রেতা যদি দাসীকে ক্রয় করার পর হস্তগত না করে তার উপর অন্যদের ঋণ পাওনা থাকার কথা স্বীকার করে, তাহলে সে হস্তগতকারী হয়েছে বলে গণ্য হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রেও শুধু বিবাহের কারণে তার হস্তগতকারী হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

পক্ষান্তরে দৃশ্যত কোনো কার্য সংঘটিত করার মাধ্যমে ত্রুটিযুক্ত করার বিষয় ভিন্ন। যেমন- দাসীর হাত কেটে ফেলল, কিংবা তার চক্ষু ফুঁড়ে দিল। এ ক্ষেত্রে সে এ কারণে হস্তগতকারী সাব্যস্ত হয় যে, এর মাধ্যমে সে দাসীর শরীরে কার্যত অধিকার চর্চা করেছে। আর এটাই হচ্ছে হস্তগতকরণ। সুতরাং বিধানগত ত্রুটিযুক্ত করা ও দৃশ্যত ত্রুটিযুক্ত করা এ উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَغَابَ وَالْعَبْدُ فِىْ يَدِ الْبَائِعِ وَأَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوْفَةً لَمْ يُبَعْ فِىْ دَيْنِ الْبَائِعِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إِيْصَالُ الْبَائِعِ إِلٰى حَقِّهِ بِدُوْنِ الْبَيْعِ، وَفِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِىْ، وَإِنْ لَمْ يُدْرَ أَيْنَ هُوَ بِيْعَ الْعَبْدُ وَأُوْفِىَ الثَّمَنُ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِىْ ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ، فَيَظْهَرُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىْ أَقَرَّ بِهِ مَشْغُوْلًا بِحَقِّهِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ إِسْتِيْفَائُهُ مِنَ الْمُشْتَرِىْ يَبِيْعُهُ الْقَاضِىْ فِيْهِ كَالرَّاهِنِ إِذَا مَاتَ، وَالْمُشْتَرِىْ إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا وَالْمَبِيْعُ لَمْ يُقْبَضْ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَبْقَ مُتَعَلِّقًا بِهِ، ثُمَّ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُمْسَكُ لِلْمُشْتَرِىْ، لِأَنَّهُ بَدَلُ حَقِّهِ وَإِنْ نَقَصَ يَتْبَعُ هُوَ أَيْضًا ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কেউ যদি একটি গোলাম ক্রয় করে এবং [মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই] ক্রেতা গায়েব হয়ে যায় অথচ গোলামটি বিক্রেতার হাতেই রয়েছে, আর বিক্রেতা এ মর্মে [আদালতে] সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে গোলামটি গায়েব ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার অনুপস্থিতির স্থান জানা থাকে তবে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামটি বিক্রয় করা হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে গোলামটি বিক্রয় না করেও বিক্রেতাকে তার প্রাপ্য হক পর্যন্ত উপনীত করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় করা হলে ক্রেতার হক নষ্ট করা হবে। আর যদি ক্রেতা কোথায় রয়েছে তা জানা না থাকে, তাহলে গোলামটি বিক্রয় করে [বিক্রেতাকে] মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হবে। কেননা, ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে বিক্রেতার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। সুতরাং সে ক্রেতার মালিকানা যেভাবে নিজের প্রাপ্য হকের সাথে আবদ্ধরূপে স্বীকার করছে সেভাবেই তা সাব্যস্ত হবে। আর যেহেতু ক্রেতার নিকট হতে মূল্য উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেহেতু বিচারক তা পরিশোধ করার জন্য গোলামটি বিক্রয় করে দিবে। যেমন– বন্ধকদাতা [বন্ধকি বস্তু ফেরত গ্রহণের পূর্বে] মারা গেলে [বিচারক বন্ধকি বস্তু বিক্রয় করে বন্ধক গ্রহণকারীর প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করে দেয়]। আর [অনুরূপভাবে] ক্রেতা যদি বিক্রীত-বস্তু হস্তগত করার পূর্বে দেওলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান]। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি গোলামটি হস্তগত করার পরে গায়েব হয়ে যায়, তাহলে বিধান ভিন্ন [অর্থাৎ ক্রেতার দাবির কারণে গোলাম বিক্রয় করা হবে না]। কেননা, বিক্রেতার প্রাপ্য হক বিক্রীত গোলামের সাথে সংযুক্ত নেই [বরং তা ক্রেতার জিম্মায় ঋণ রূপে সাব্যস্ত হয়ে রয়েছে]। আর [পূর্বের সুরতে] যদি [গোলামের মূল্য দ্বারা বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করার পর] কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা ক্রেতার জন্য রেখে দিতে হবে। কেননা, এটা তারই প্রাপ্যের বিনিময়। আর যদি [গোলামের মূল্য দ্বারা বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে] কিছু টাকার ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে তাও ক্রেতার কাছ থেকেই উসুল করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَغَابَ الخ : মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করে, অতঃপর তার মূল্য পরিশোধ না করে এবং তা হস্তগত না করে অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে বিধান হলো, যদি বিক্রেতা বিচারকের নিকট প্রমাণ পেশ করে যে, সে গোলামটিকে উক্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করেছে এবং সে মূল্য পরিশোধ করেনি, তাহলে ক্রেতার অবস্থানের ঠিকানা জানা থাকলে বিচারক বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামকে বিক্রয় করবে না। আর যদি ক্রেতা কোথায় অবস্থান করছে তা জানা না থাকে, তাহলে বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করে দিবে। বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করার পর যদি টাকা অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বিচারক তা ক্রেতার জন্য সংরক্ষণ করে রেখে দিবেন। আর যদি গোলামটি বিক্রয়ের টাকা দ্বারা বিক্রেতার পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা ক্রেতার জিম্মায় বহাল থাকবে বিক্রেতা তা উসুলের জন্য ক্রেতার অপেক্ষায় থাকবে।

আর যদি এমন হয় যে, ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করার পর মূল্য পরিশোধ না করে কোথাও চলে গিয়েছে, তাহলে বিচারক ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না এবং সে ভিত্তিতে গোলামটি বিক্রয়ও করবে না। বিক্রেতার পাওনা ক্রেতার উপর ঋণ হয়েই থাকবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إِيْصَالُ الْبَائِعِ إِلٰى حَقِّهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) উক্ত মাসআলায় বিধানগুলোর দলিল বর্ণনা করছেন। 'ক্রেতার অবস্থানস্থল জানা থাকলে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করবে না'-এর দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধের জন্য গোলামটি বিক্রয় করা অপরিহার্য হয়ে পড়েনি। কেননা, যখন ক্রেতার অবস্থানস্থল জানা আছে তখন তার কাছ থেকে বিক্রতার পাওনা উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েনি। কাজেই গোলামটি বিক্রয় করা ছাড়াই বিক্রেতার পাওনা উসুল করা সম্ভব। পক্ষান্তরে গোলামটি বিক্রয় করা হলে অনিবার্য কারণ ছাড়াই ক্রেতার হক বিনষ্ট করা হবে। কেননা, ক্রয়কৃত গোলামটির মাঝে তার মালিকানা ও অধিকার সাব্যস্ত হয়ে আছে। কাজেই কোনো অনিবার্য কারণ ছাড়া তা বিনষ্ট করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرَ أَيْنَ هُوَ بَيْعُ الْعَبْدِ الخ : 'ক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকলে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করবে' তার দলিল হলো, গোলামটির উপর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কেবল বিক্রেতার স্বীকারোক্তি (إِقْرَار)-এর ভিত্তিতে। কাজেই ক্রেতার মালিকানা ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত হবে যেভাবে সে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। আর বিক্রেতার স্বীকারোক্তি ছিল এরূপ যে, ক্রেতা গোলামটি হস্তগত করেনি এবং তার মূল্য পরিশোধ করেনি, কাজেই গোলামটির সাথে তার পাওনা সম্পৃক্ত রয়েছে। সুতরাং ক্রেতা কোথায় আছে তা জানা না থাকার কারণে বিক্রেতার পাওনা উসুল করা যেহেতু অসম্ভব হয়ে পড়েছে, সেহেতু বিচারক তার পাওনা উসুল করানোর জন্য গোলামটি বিক্রয় করে দিবে।

মুসান্নিফ(র.) এ মাসআলার দুটি নজির উল্লেখ করেছেন। প্রথম নজির হলো, বন্ধকদাতা যদি তার বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহণকারীর নিকট আবদ্ধ থাকাবস্থায় মারা যায়, তাহলে বন্ধকগ্রহণকারী বন্ধকি বস্তুটির উপর অন্যান্য পাওনাদারদের চেয়ে অধিক হকদার হয় এবং বস্তুটি বিক্রয় করে তার পাওনা উসুল করে নিতে পারে। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলায়ও গোলামটি বিক্রেতার হাতে বন্ধকি বস্তুর ন্যায়। কেননা, সে তার মূল্য পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত গোলামটি আটক রাখতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও সে অধিক হকদার এবং তার পাওনা উসুলের জন্য বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে দিবে।

দ্বিতীয় নজির হলো, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে এবং ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে বিক্রেতাই সেই বস্তুটির উপর অধিক হকদার হয় এবং বস্তুটি বিক্রয় করে তার পাওনা উসুল করতে পারে। সুতরাং আলোচ্য সুরতেও ক্রেতার অবস্থানস্থল অজ্ঞাত থাকার কারণে একই বিধান হবে।

উল্লেখ্য, উপরে দলিলটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, গোলামটির উপর ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কেবল বিক্রেতার স্বীকারোক্তি (إِقْرَارْ)-এর ভিত্তিতে [অর্থাৎ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়], অথচ মাসআলার সুরত বর্ণনায় বলা হয়েছিল

যে, বিক্রেতা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রেতা গোলামটি ক্রয় করেছে এবং মূল্য পরিশোধ ও হস্তগত করার পূর্বে সে কোথাও চলে গিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে, বিচারক বিক্রেতার কথা গ্রহণ করেছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। তাহলে দলিলের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা না বলে স্বীকারোক্তির কথা কেন বলা হলো? আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এর কারণ হলো, মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, এ ক্ষেত্রে বিচারক যে গোলামটি বিক্রয় করবে তা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয় নয়। কেননা, কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তার উপর কোনো ঋণ সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হয় না, বরং তার উপস্থিতি আবশ্যক হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ কেবল স্বীকারোক্তির পর্যায়। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা তার এ জন্য আবশ্যক হয়েছে যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া বিচারক তার কথায় কর্ণপাত করবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ حَقَّهُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি গোলামটি হস্তগত করার পর মূল্য পরিশোধ না করে কোথাও চলে যায় এবং তার অবস্থানস্থল জানা না থাকে, তাহলে বিক্রেতা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করলেও বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করবে না। এর কারণ হলো, ক্রেতা তার ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পর বিক্রেতার পাওনা কেবল ক্রেতার জিম্মায় ঋণ হয়ে থাকে; তা আর বিক্রীত বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে না। আর ক্রেতা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার উপর ঋণ সাব্যস্ত হবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিচারক বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করবে না এবং গোলামটি বিক্রয় করে তার পাওনা পরিশোধ করবে না।

ثُمَّ إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُمْسِكُ لِلْمُشْتَرِيْ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে সুরতের বিচারক গোলামটি বিক্রয় করে বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করবে সে সুরতে যদি তার পাওনা পরিশোধ করার পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে তা ক্রেতার জন্য রেখে দিবে। ক্রেতা আসলে তা তাকে হস্তান্তর করে দিবে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতার পাওনা ছিল আট শত টাকা আর বিচারক গোলামটি বিক্রয় করল এক হাজার টাকায়, তাহলে বিক্রেতাকে আট শত টাকা দিয়ে অবশিষ্ট দু-শত টাকা ক্রেতার জন্য রেখে দিবে। কেননা, এটা ক্রেতারই প্রাপ্য।

আর যদি বিক্রয়লব্ধ টাকা দ্বারা বিক্রেতার পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হয়, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা ক্রেতার উপরই ঋণ হয়ে থাকবে। ক্রেতা আসলে তার কাছ থেকে তা উসুল করে নিবে।

উল্লেখ্য, এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো, বিচারক ক্রেতার পক্ষ হয়ে গোলামটি বিক্রয় করছে অথচ গোলামটি ক্রেতা হস্তগত করেনি। আর বিধান হলো, স্থানান্তরযোগ্য কিছু ক্রয় করলে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। তাহলে বিচারকের বিক্রয় কীভাবে জায়েজ হবে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ ক্ষেত্রে বিচারক একজন লোক নির্ধারণ করে দিবে সে ক্রেতার পক্ষে প্রথমে গোলামটি হস্তগত করবে, তারপর গোলামটি বিক্রয় করা হবে।

আর কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ ক্ষেত্রে লোক নির্ধারণ করে হস্তগত করানো আবশ্যক হবে না। কেননা, এখানে বিক্রয় মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিক্রেতার প্রাপ্য হক পূরণ করা। আর সেই হক পূরণার্থে অনুগামী হিসেবে (ضِمْنًا) বিক্রয় বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর যে কার্য অনুগামী হিসেবে (ضِمْنًا) বাস্তবায়িত হয় তার জন্য সমস্ত শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক হয় না, যা মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বাস্তবায়িত হওয়ার সময় আবশ্যক হয়।

فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِيْ إِثْنَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ كُلَّهُ وَيَقْبِضَهُ، وَإِذَا حَضَرَ الْآخَرُ لَمْ يَأْخُذْ نَصِيْبَهُ، حَتّٰى يَنْقُدَ شَرِيْكُهُ الثَّمَنَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) إِذَا دَفَعَ الْحَاضِرُ الثَّمَنَ كُلَّهُ لَمْ يَقْبِضْ إِلَّا نَصِيْبَهُ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا بِمَا أَدّٰى عَنْ صَاحِبِهِ، لِأَنَّهُ قَضٰى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ نَصِيْبِ صَاحِبِهِ، فَلَا يَقْبِضُهُ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْتِفَاعُ بِنَصِيْبِهِ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيْعِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ الْبَيْعَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ، وَالْمُضْطَرُّ يَرْجِعُ كَمُعِيْرِ الرَّهْنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْحَبْسُ عَنْهُ إِلٰى أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، كَالْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا قَضَى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ـ

অনুবাদ : আর যদি ক্রেতা দুজন হয় আর তাদের একজন গায়েব হয়ে যায়, তাহলে উপস্থিত জন পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে গোলামটি হস্তগত করার অধিকার লাভ করবে। পরে যখন অপরজন উপস্থিত হবে তখন আগতজন তার অংশীদারকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তার অংশ নিতে পারবে না। এটি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উপস্থিত জন যদি পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তবু সে শুধু তারই অংশ হস্তগত করতে পারবে। আর অপরজনের পক্ষ থেকে যা সে পরিশোধ করেছে সে ক্ষেত্রে সে ঐচ্ছিক পরিশোধকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে অন্যের ঋণ তার অনুমতি ছাড়া পরিশোধ করেছে, কাজেই তা ফেরত দাবি করতে পারবে না। আর সে অপর ব্যক্তির অংশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তি বলে গণ্য, সুতরাং তার অংশ সে হস্তগত করতে পারবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে অনন্যোপায়। কেননা, সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত তার অংশ দ্বারা তার উপকার লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, বিক্রয়চুক্তিটি যেহেতু অভিন্ন সেহেতু মূল্যের সামান্য অংশও অবশিষ্ট থাকলে ক্রেতা বিক্রীত-বস্তুটি আটক রাখতে পারবে। আর অনন্যোপায় ব্যক্তি [তার আদায়কৃত ঋণের টাকা] ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে। যেমন– বন্ধক রাখার জন্য কোনো বস্তু ধার হিসেবে প্রদানকারী [অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা দেওলিয়া হয়ে গেলে ধার দাতা নিজে বন্ধক দাতার ঋণ আদায় করে বস্তুটি ছাড়িয়ে আনলে সে টাকা ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ করে]। আর যখন উপস্থিত ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট হতে [পরিশোধকৃত অর্থ] ফেরত পাওয়ার অধিকার লাভ হলো, তখন সে তার পাওনা উসুল হওয়া পর্যন্ত হস্তগতকৃত গোলামটি আটক রাখার অধিকার লাভ করবে। যেমন– ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি তার নিজের সম্পদ থেকে মূল্য পরিশোধ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِيْ إِثْنَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا الخ : মাসআলা : পূর্বের মাসআলাটি ছিল যদি ক্রেতা একজন হয় তার বিধান সম্পর্কিত। আর আলোচ্য মাসআলাটি হলো, যদি ক্রেতা একজন না হয়ে দুজন হয় [অর্থাৎ দুজনে মিলে একটি গোলাম ক্রয় করে] এবং মূল্য পরিশোধ ও হস্তগত করার পূর্বে তাদের একজন কোথাও চলে যায়, তাহলে তার বিধানের ক্ষেত্রে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তাঁরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রেতাদ্বয়ের যেজন উপস্থিত রয়েছে সে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তার অংশ হস্তগত করার অধিকার লাভ করবে না। আর তিনটি স্থলে তাঁদের মতবিরোধ–

১. যদি উপস্থিতজন অনুপস্থিতজনের অংশ পরিশোধ করে দিতে চায়, তাহলে বিক্রেতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে কি না? ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে না।

২. যদি বিক্রেতা উপস্থিতজনের নিকট হতে অনুপস্থিতজনের অংশের টাকা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে অনুপস্থিতজনের অংশও উপস্থিতজনের নিকট হস্তান্তর করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে কিনা? হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে বাধ্য করা হবে না; বরং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিতজন কেবল তার অংশই হস্তগত করতে পারবে। পালাবদল প্রক্রিয়ায় সে তার থেকে খিদমত গ্রহণ করতে থাকবে।

৩. যদি উপস্থিতজন অনুপস্থিতজনের অংশ পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে অনুপস্থিতজন আসলে তার কাছ থেকে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করার অধিকার পাবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করে নিতে পারবে এবং আদায় হওয়া পর্যন্ত অপরজনের অংশ আটক রাখতে পারবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সে তার পরিশোধকৃত টাকা আদায় করার অধিকার পাবে না।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) إِذَا دَفَعَ الْحَاضِرُ الثَّمَنَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উপস্থিত ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সে শুধু তার অংশই হস্তগত করতে পারবে– অনুপস্থিতজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে না। আর সে যা পরিশোধ করেছে সে ক্ষেত্রে সে ঐচ্ছিক পরিশোধকারী বলে বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَضٰى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির ঋণ তার নির্দেশ ছাড়া পরিশোধ করেছে। আর কেউ কারো ঋণ তার নির্দেশ ব্যতীত পরিশোধ করলে সে ঐচ্ছিক দানকারী বিবেচিত হয়; তা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করে না। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি পরিশোধকৃত টাকা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করবে না। আর যেহেতু তার ফেরত গ্রহণের অধিকার নেই সেহেতু সে অনুপস্থিতজনের অংশ হস্তগত করতে পারবে না। কেননা, অনুপস্থিতজনের অংশের ক্ষেত্রে সে সম্পর্কহীন ব্যক্তি। আর উপস্থিত ব্যক্তি যেহেতু এ ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক দানকারী, তাই বিক্রেতাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, ঐচ্ছিক দান গ্রহণে বাধ্য করা যায় না।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ مُضْطَرٌّ فِيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْتِفَاعُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, উপস্থিত ব্যক্তিকে এ ক্ষেত্রে বাধ্য ও অপারগ হয়ে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ পরিশোধ করতে হয়েছে। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি গোলামটির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে তার অংশ দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না। কারণ, গোলামটির বিক্রয়চুক্তি একটিই অর্থাৎ উভয় ক্রেতা একটি চুক্তির মাধ্যমেই গোলামটি ক্রয় করেছে। আর বিক্রেতা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রীত-বস্তু আটক রাখতে পারে। কাজেই উপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত তার অংশও হস্তগত করতে পারবে না। ফলে তার অংশ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে তাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশের মূল্যও পরিশোধ করতে

হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি বাধ্য ও অপারগ হয়ে অন্য ব্যক্তির ঋণ তার নির্দেশ ব্যতীত পরিশোধ করে সে তা ফেরত গ্রহণের অধিকার লাভ করে। যেমন– কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে একটি বস্তু এ জন্য ধার দিল যে, ধারগ্রহণকারী তা অন্য কারো কাছে বন্ধক রেখে কিছু টাকা ঋণ নিবে। অতঃপর ধার গ্রহণকারী তা অন্য এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রেখে কিছু টাকা ঋণ নিল। এরপর ধার গ্রহণকারী ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেল কিংবা নিখোঁজ হয়ে গেল। ফলে ধারদাতা অর্থাৎ বস্তুটির মালিক বাধ্য হয়ে ধার গ্রহণকারীর উপর বন্ধক গ্রহণকারীর যে পাওনা ছিল তা পরিশোধ করে দিয়ে তার বস্তুটি মুক্ত করে আনল। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদিও বস্তুটির মালিক ধার গ্রহণকারীর নির্দেশ ছাড়াই তার ঋণ পরিশোধ করেছে, কিন্তু সে বাধ্য হওয়ার কারণে এ ঋণ ধার গ্রহণকারীর নিকট হতে ফেরত গ্রহণ করার অধিকার পাবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও উপস্থিত ব্যক্তি তার পরিশোধকৃত টাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হতে ফেরত গ্রহণের অধিকার পাবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ الْحَبْسُ الخ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে যখন উপস্থিত ব্যক্তি তার পরিশোধকৃত টাকা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করার অধিকার লাভ করেছে তখন সে তার প্রাপ্য সম্পূর্ণ আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ আটক রাখার অধিকারও লাভ করবে। যেমন– কেউ যদি কাউকে কোনো বস্তু ক্রয় করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে কিন্তু ক্রয় করার টাকা অগ্রিম প্রদান না করে, অতঃপর প্রতিনিধি তার নিজের টাকা দিয়ে বস্তুটি ক্রয় করে আনে, তাহলে প্রতিনিধি উক্ত টাকা আদায় করার আগ পর্যন্ত বস্তুটি নিজের কাছে আটক রাখার অধিকার লাভ করে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও উপস্থিত ব্যক্তি তার প্রাপ্য আদায় হওয়ার আগ পর্যন্ত গোলামটি আটক রাখতে পারবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَهُمَا نِصْفَانِ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ، فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُ مِائَةِ مِثْقَالٍ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ، وَبِمِثْلِهِ لَوِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجِبُ مِنَ الذَّهَبِ مَثَاقِيْلُ وَمِنَ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ وَزْنُ سَبْعَةٍ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَلْفَ إِلَيْهِمَا فَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَزْنِ الْمَعْهُوْدِ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কেউ একটি দাসী এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে স্বর্ণ ও রৌপ্য অর্ধেক অর্ধেক বলে গণ্য হবে। কেননা, সে মিছকালকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দিকে সমভাবে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং কোনোটির অগ্রাধিকার না থাকার কারণে প্রত্যেকটি থেকে পাঁচশত মিছকাল আবশ্যক হবে। এরূপভাবে কেউ যদি একটি দাসী স্বর্ণ ও রৌপের এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পাঁচশত মিছকাল ওয়াজিব হবে, আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশত দিরহাম ওয়াজিব হবে প্রতি দশ দিরহাম সাত মিছকাল ওজনের। কেননা, ক্রেতা এক হাজারকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের দিকে সম্পর্কিত করেছে। সুতরাং উভয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত ওজনের মুদ্রার সাথেই তা সম্পৃক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنِ اشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفِ مِثْقَالٍ الخ - **মাসআলা :** যদি কোনো ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতাকে এভাবে বলে যে, আমি দাসীটি এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করলাম, তাহলে বিধান হলো, ক্রেতাকে স্বর্ণ ও রৌপ্য সমানভাবে পাঁচশত মিছকাল করে দিতে হবে। অর্থাৎ পাঁচশত মিছকাল স্বর্ণ এবং পাঁচশত মিছকাল রৌপ্য তার উপর সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْمِثْقَالَ إِلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ الخ : এ মাসআলার দলিল হলো, ক্রেতা এখানে এক হাজার মিছকালকে সমানভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে সম্পর্কিত করেছে। কাজেই এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বিভক্ত হবে। কেননা, কমবেশি করার জন্য কোনোটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ বিদ্যমান নেই। কাজেই উভয়টি থেকে তাকে পাঁচশত মিছকাল করে পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ইনায়াহ'-এর গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য মাসআলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য গুণগত দিক থেকে কি মানের হবে অর্থাৎ তা উৎকৃষ্ট মানের হবে, নাকি নিম্নমানের হবে, নাকি মধ্যম মানের হবে তা চুক্তিকালে উল্লেখ করা আবশ্যক হবে। মুসান্নিফ (র.)-এর এ বিষয়টি উল্লেখ করা উচিত ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামিউস সাগীর এবং মাবসূত গ্রন্থের বিক্রয় অধ্যায়ে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে মুসান্নিফ (র.) হয়তো এজন্য উল্লেখ করেননি যে, বিক্রয় অধ্যায়ের শুরুর মাসআলা থেকে বিষয়টি জানা হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, যদি দিরহাম বা দিনারের উল্লেখ করা হয় তখন তা কি মানের হবে তা উল্লেখ করার আবশ্যকতা থাকে না। কেননা, প্রচলনের ভিত্তিতে তখন উৎকৃষ্ট মানেরটিই সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ وَبِمِثْلِهِ لَوْ اِشْتَرٰى جَارِيَةً بِأَلْفٍ الخ : এরূপ আরেকটি মাসআলা হলো, কেউ যদি একটি দাসী ক্রয় করে এবং ক্রয়কালে বিক্রেতাকে এভাবে বলে যে, আমি স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে এক হাজারটির বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলে বিধান হলো, তাকে পাঁচশত মিছকাল স্বর্ণ ও পাঁচশত দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা] পরিশোধ করতে হবে। তবে দিরহামগুলো হবে এমন যার দশটির ওজন হবে সাত মিছকাল।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَلْفَ إِلَيْهِمَا الخ : এ মাসআলার দলিল হলো, পূর্বের মাসআলার ন্যায় ক্রেতা এ ক্ষেত্রেও এক হাজারকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে সমানভাবে সম্পর্কিত করেছে। কাজেই উভয়টিই সমানভাবে অর্ধেক অর্ধেক করে সাব্যস্ত হবে। তবে স্বর্ণের ক্ষেত্রে যেহেতু মিছকালের পরিমাপ প্রচলিত, তাই প্রচলনের ভিত্তিতে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পাঁচশত মিছকাল সাব্যস্ত হবে। আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু وَزْن سَبْعَة 'সাত মিছকালের দিরহাম' [অর্থাৎ যার দশ দিরহামের ওজন সাত মিছকাল] প্রচলিত সেহেতু এরূপ ওজনের পাঁচশত দিরহাম সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, কোনো দেশে যদি এর ব্যতিক্রম ওজনের স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহলে সেখানকার প্রচলিত মুদ্রাই সাব্যস্ত হবে।

قَالَ : وَمَنْ لَهُ عَلَى اٰخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِيَادٌ فَقَضَاهُ زُيُوْفًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَانْفَقَهَا أَوْ هَلَكَتْ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ (رح) وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَرُدُّ مِثْلَ زُيُوْفِهِ وَيَرْجِعُ بِدَرَاهِمِهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيٌّ كَهُوَ فِي الْأَصْلِ، وَلَا يُمْكِنُ رِعَايَتُهُ بِإِيْجَابِ ضَمَانِ الْوَصْفِ، لِأَنَّهُ لَا قِيْمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ، فَوَجَبَ الْمَصِيْرُ إِلَى مَا قُلْنَا، وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، حَتَّى لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِيْمَا لَا يَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ جَازَ، فَيَقَعُ بِهِ الْاِسْتِيْفَاءُ، وَلَا يَبْقَى حَقُّهُ، إِلَّا فِي الْجَوْدَةِ وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِإِيْجَابِ ضَمَانِهَا لِمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَا بِإِيْجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ، لِأَنَّهُ إِيْجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ، وَلَا نَظِيْرَ لَهُ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কারো যদি অপর কারো নিকট উৎকৃষ্ট দশ দিরহাম পাওনা থাকে আর সে তা নিকৃষ্ট দিরহামে পরিশোধ করে আর প্রাপক তা না জেনে খরচ করে ফেলে কিংবা তার নিকট থেকে তা হালাক হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ঋণ পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, প্রাপক [খরচকৃত] তদ্রূপ নিকৃষ্ট দিরহাম ফিরিয়ে দিবে এবং তার প্রাপ্য উৎকৃষ্ট দিরহাম পুনরায় উসুল করে নিবে। কেননা, মূল দিরহামের ক্ষেত্রে তার হক যেরূপ বিবেচ্য তেমনি গুণাগুণের ক্ষেত্রেও তার প্রাপ্য হক বিবেচ্য। আর এখানে গুণাগুণের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে গুণাগুণের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য হক রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, সমশ্রেণীর বস্তুর সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুণাগুণের কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকে না। সুতরাং আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা অবলম্বন করা অনিবার্য। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর দলিল হলো, নিকৃষ্ট দিরহাম তার প্রাপ্য হকেরই শ্রেণীভুক্ত। এ কারণেই যে সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্য হককে অন্য কিছু দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েজ নেই সে সকল ক্ষেত্রে যদি প্রাপ্য উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকৃষ্ট দিরহাম গ্রহণ করে, তাহলে জায়েজ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, নিকৃষ্ট দিরহাম দ্বারা প্রাপ্য হক উসুল হয়ে যাবে। শুধু উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষেত্রে তার হক অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার মাধ্যমে তার এ হক পূরণ করা সম্ভব নয়; যার কারণ আমরা একটু পূর্বে উল্লেখ করেছি [অর্থাৎ উৎকৃষ্টতার গুণের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই]। আবার মূল দিরহাম [পুনরায়] সাব্যস্ত করার মাধ্যমেও [হক পূরণ করা] সম্ভব নয়। কেননা, এটা হবে প্রাপকের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য প্রাপকের উপরই [ঋণগ্রহীতার] অধিকার সাব্যস্ত করা। আর শরিয়তে এর কোনো নজির নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلَى اٰخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ الخ :

মাসআলা : যদি কারো অপর এক ব্যক্তির নিকট দশটি উৎকৃষ্টমানের দিরহাম পাওনা থাকে, অতঃপর ঋণগ্রহীতা দশটি নিম্নমানের দিরহাম দ্বারা তা পরিশোধ করে দেয় কিন্তু ঋণদাতা জানতে পারেনি যে, দিরহামগুলো নিম্নমানের ছিল, ফলে সে তা খরচ করে ফেলে কিংবা তা হালাক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার

প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে, সে ঋণগ্রহীতার নিকট কিছু দাবি করতে পারবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে ঋণপ্রাপক উক্ত নিকৃষ্টমানের অনুরূপ দশটি দিরহাম ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিবে এবং তার পাওনা উৎকৃষ্টমানের দশ দিরহাম গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদবী ও অন্যান্য ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো কিয়াসের দাবি অনুযায়ী, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত হলো 'ইসতিহসান' বা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবি অনুসারে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقَّهُ فِى الْوَصْفِ مَرْعِىٌّ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হলো, প্রাপকের হক যেমনিভাবে দিরহামগুলোর পরিমাণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তেমনিভাবে দিরহামগুলোর গুণাগুণের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য। পরিমাণের ক্ষেত্রে যদি ঋণগ্রহীতা কম দিত যেমন দশ দিরহামরে স্থলে যদি সে আট দিরহাম দিত তাহলে দুই দিরহাম তার যেমন পাওনা থেকে যেত তদ্রূপ এ ক্ষেত্রেও উৎকৃষ্টতার গুণ তার পাওনা থেকে যাবে। তবে উৎকৃষ্টতার গুণের জরিমানা ঋণগ্রহীতার উপর সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কোনো দ্রব্য তার সমশ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে গুণাগুণের স্বতন্ত্রভাবে কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না। যেমন— একটি উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময়ে একটি নিকৃষ্ট দিরহাম বিক্রয় করলে সমান সমান বলে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে একটি উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময়ে দুটি নিকৃষ্ট দিরহাম বিনিময়ে দিলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন ঋণগ্রহীতার উপর স্বতন্ত্রভাবে উৎকৃষ্টতার গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় তখন আমাদের উল্লিখিত পন্থা অর্থাৎ নিকৃষ্ট দশটি দিরহাম ফেরত দিয়ে দশটি উৎকৃষ্ট দিরহাম গ্রহণ করা ছাড়া প্রাপকের হক উসূল করার আর কোনো বিকল্প নেই। কাজেই এ পন্থাই সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, নিকৃষ্ট দিরহামও ঋণপ্রাপকের প্রাপ্যের শ্রেণীভুক্ত। এর দলিল হচ্ছে, 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনদাতা [রাব্বুস সলম] যদি উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকৃষ্ট দিরহাম দেয় এবং দাদনগ্রহীতা [মুসলাম ইলাইহি] তা হস্তগত করে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে তা জায়েজ। অথচ 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে মূলধন [রা'সুল মাল] হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয় এবং মূলধন মজলিসে হস্তগত না করে পৃথক হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়ার দ্বারা বুঝা গেল নিকৃষ্ট দিরহামগুলো নির্ধারিত মূলধন তথা উৎকৃষ্ট দিরহামেরই 'শ্রেণীভুক্ত'। এরূপভাবে 'বায় সরফ' [মুদ্রা বিক্রয়চুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যদি এক পক্ষ উৎকৃষ্ট দিরহামের পরিবর্তে নিকৃষ্ট দিরহাম দেয় আর অপর পক্ষ তা হস্তগত করে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয়। অথচ 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ তাদের প্রাপ্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েজ নয় এবং হস্তগত করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হলে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বুঝা গেল যে, উৎকৃষ্ট দিরহামের স্থলে নিকৃষ্ট দিরহাম দিলে তা প্রাপ্য হকেরই 'শ্রেণীভুক্ত' গণ্য হয়। তাহলে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় এটাই সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে, ঋণদাতার মূল প্রাপ্য উসুল হয়েছে এখন শুধু তার উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষেত্রে তার হক রয়েছে। কিন্তু এ উৎকৃষ্টতার গুণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কেননা, ক্ষতিপূরণের সম্ভাব্য দুটি সুরত হতে পারে—

১. শুধু উৎকৃষ্টতার গুণের জারিমানা আদায় করা

২. উৎকৃষ্টতার গুণসহ মূল দিরহাম আদায় করা।

প্রথম সুরত সম্ভব নয়, তার কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, উৎকৃষ্টতার গুণের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য সাব্যস্ত হয় না। তাছাড়া মূল বস্তু ছাড়া তার গুণের পৃথক অস্তিত্বও হয়। কাজেই শুধু গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

আর দ্বিতীয় সুরত সম্ভব নয় তার কারণ হলো, উৎকৃষ্টতার গুণসহ মূল দিরহাম আদায় করতে হলে প্রথমে ঋণদাতার উপর তার খরচকৃত নিকৃষ্ট দিরহামগুলোর জরিমানা সাব্যস্ত করতে হচ্ছে। ফলে যার স্বার্থে জরিমানা সাব্যস্ত করা হবে তার উপরই প্রথমে জরিমানা সাব্যস্ত করা হচ্ছে। আর শরিয়তে এরূপ কোনো নজির নেই। কাজেই শরিয়তে যার কোনো নজির নেই তা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। অতএব, যখন গুণের জরিমানা সাব্যস্ত করা সম্ভব নয় এবং গুণের জন্য স্বতন্ত্র মূল্য হয় না আর প্রাপক তার মূল প্রাপ্যও উসুল করে নিয়েছে তখন প্রাপকের আর কোনো হক দাবি করার অধিকার থাকবে না।

قَالَ : إِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِى أَرْضِ رَجُلٍ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَكَذَا إِذَا بَاضَ فِيْهَا، وَكَذَا إِذَا تَكَنَّسَ فِيْهَا ظَبْىٌ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ، وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيْلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَكَذَا الْبَيْضُ، لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ، وَلِهٰذَا يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِكَسْرِهِ أَوْ شَيِّهِ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يُعِدَّ أَرْضَهُ لِذٰلِكَ، فَصَارَ كَنَصْبِ شَبْكَةٍ لِلْجَفَافِ، وَكَمَا إِذَا دَخَلَ الصَّيْدُ دَارَهُ أَوْ وَقَعَ مَا نُثِرَ مِنَ السُّكَّرِ أَوِ الدَّرَاهِمِ فِىْ ثِيَابِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لَمْ يَكُفَّهُ، أَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَسَلَ النَّحْلُ فِىْ أَرْضِهِ، لِأَنَّهُ عُدَّ مِنْ إِنْزَالِهِ فَيَمْلِكُهُ تَبْعًا لِأَرْضِهِ، كَالشَّجَرِ النَّابِتِ فِيْهَا وَالتُّرَابِ الْمُجْتَمِعِ فِىْ أَرْضِهِ بِجَرَيَانِ الْمَاءِ ـ

অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোনো পাখি যদি কারো জমিতে বাচ্চা ফুটায়, তাহলে যে [প্রথম] তা হস্তগত করবে সেই তার মালিক হবে। এরূপভাবে পাখি যদি ডিম পাড়ে কিংবা হরিণ যদি কারো জমিতে ঘর করে নেয় [সেক্ষেত্রেও একই বিধান]। কেননা, এগুলো হচ্ছে সকলের জন্য বৈধ [মালিকানাহীন] মাল এবং হস্তগতকারীর কব্জা তাতে সর্বপ্রথম হয়েছে [কাজেই সেই মালিক হবে]। তাছাড়া কৌশল ছাড়া ধরা গেলেও এগুলো মূলত শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর [হাদীসের ভিত্তিতে] শিকার যে হস্তগত করবে তারই মালিকানাভুক্ত হবে। ডিমের বিষয়টিও একই। কেননা, তা শিকারের মূল। এ কারণেই হজের ইহরামের অবস্থায় কেউ ডিম ভাঙ্গলে কিংবা ভাজলে তার উপর 'দণ্ড' আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর জমির মালিক যেহেতু তার জমি ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেনি সেহেতু এটা শুকানোর উদ্দেশ্যে জাল ছড়িয়ে রাখার মতো হলো। কিংবা [বিতরণের উদ্দেশ্যে] ছড়িয়ে দেওয়া চিনি বা দিরহাম তার কোঁচড়ে পড়ার মতো হলো; [এ ক্ষেত্রে] ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা [চিনি বা দিরহাম] তার মালিকানাভুক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কাপড় গুটিয়ে না নিবে কিংবা যদি সে হস্তগত করার জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মৌমাছি যদি কারো জমিতে চাক বানায়, তাহলে বিধান ভিন্ন হবে [সে ক্ষেত্রে জমির মালিকই তার মালিক হবে]। কেননা, তা জমির উৎপন্ন বস্তু বলে গণ্য হয়। সুতরাং জমির অনুবর্তী হিসেবে সে তার মালিক হয়ে যাবে। যেমন– জমিতে উৎপন্ন গাছ এবং পানির ঢলের কারণে তার জমিতে জমে উঠা মাটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا أَفْرَخَ طَيْرٌ فِى أَرْضِ رَجُلٍ الخ : মাসআলা হলো, কারো জমিতে যদি পাখি বাসা বেঁধে বাচ্চা ফোটায় কিংবা ডিম পাড়ে কিংবা হরিণ বাসা বাঁধে তাহলে বিধান হলো, এগুলো যে ব্যক্তি প্রথম ধরবে সেই তার মালিক হবে। জমির মালিক তার জমির মালিকানার ভিত্তিতে এগুলোর মালিক হবে না। তবে জমির মালিক যদি জমিকে এ সকল জিনিস তথা পাখি, পাখির

বাচ্চা, পাখির ডিম কিংবা হরিণ লাভ করার জন্য প্রস্তুত করে রেখে থাকে, তাহলে এগুলো যেই ধরুক না কেন জমির মালিকই তার মালিক হবে। যেমন– সে জমিতে গর্ত করে রাখল এজন্য যে, হরিণ তাতে পড়ে আটকা পড়বে, তাহলে হরিণের মালিক সে-ই হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ الخ : উল্লিখিত মাসআলার দলিল হলো, এ সকল জিনিস অর্থাৎ হরিণ, পাখি, পাখির বাচ্চা ও পাখির ডিম হচ্ছে 'মুবাহ' বা সকলের জন্য বৈধ, উন্মুক্ত মাল; যে কেউ এগুলোকে ধরে মালিক হতে পারে। সুতরাং যে-ই প্রথম এগুলোকে ধরবে সেই এর মালিক হবে।

দ্বিতীয় দলিল হলো, পাখির বাচ্চা ও হরিণ শিকারের অন্তর্ভুক্ত। আর নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَلصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ "শিকার যে ধরবে তারই হবে"-এর ভিত্তিতে শিকার প্রথম যে ধরবে সেই তার মালিক হবে। আর ডিমের ক্ষেত্রেও শিকারের বিধানই হবে। কেননা, ডিম যদিও শিকার নয় কিন্তু তা শিকারের মূল ও উৎস। এ কারণেই হজ বা ওমরা আদায়কারী ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় যদি ডিম ভেঙ্গে ফেলে কিংবা তা ভুনা করে ফেলে তাহলে তার উপর প্রাণী শিকার করলে যেরূপ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হয় তদ্রূপ কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ডিমের বিধানও শিকারের বিধানের অনুরূপ।

قَوْلُهُ وَصَاحِبُ الْأَرْضِ لَمْ يُعِدَّ أَرْضَهُ لِذٰلِكَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মাসআলায় জমির মালিক উক্ত জিনিসগুলোর মালিক না হওয়ার কারণ হলো, সে তার জমিকে ঐগুলো ধরার জন্য প্রস্তুত করে রাখেনি। পক্ষান্তরে জমির মালিক যদি ঐ সকল জিনিস ধরার জন্য প্রস্তুত করে রাখে, তাহলে যেই ধরুক না কেন জমির মালিকই ঐ গুলোর মালিক হবে। মুসান্নিফ (র.) এ ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. কেউ তার জাল যদি শুকানোর উদ্দেশে বিছিয়ে রাখে, অতঃপর কোনো শিকার তাতে আটকা পড়ে তাহলে জালের মালিক শিকারটির মালিক হবে না; বরং যে শিকারটি প্রথম ধরবে সেই তার মালিক হবে। পক্ষান্তরে জালের মালিক যদি শিকার ধরার উদ্দেশ্যে তার জাল বিছিয়ে রাখে, অতঃপর তাতে শিকার আটকা পড়ে তাহলে জালের মালিকই তার মালিক হবে; যে প্রথম ধরবে সে মালিক হবে না।
২. যদি কারো ঘরে শিকারযোগ্য কোনো প্রাণী প্রবেশ করে কিন্তু ঘরের মালিক তা জানতে পারেনি। সে ঘটনাক্রমে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম প্রাণীটি ধরবে সেই তার মালিক হবে, ঘরের মালিক প্রাণীটির মালিক হবে না। পক্ষান্তরে ঘরের মালিক যদি টের পায় যে, তার ঘরে প্রাণী প্রবেশ করেছে এবং সেটা ধরার জন্য সে ঘরের দরজা বা জানালা বন্ধ করে দেয় তাহলে সেই তার মালিক হবে; অন্য কেউ প্রথম ধরলেও মালিক হবে না।
৩. কেউ যদি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মিষ্টিদ্রব্য কিংবা রৌপ্যমুদ্রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে থাকে আর কারো কাপড়ে গিয়ে তা পড়ে তাহলে যদি সে ব্যক্তি উক্ত মিষ্টি বা রৌপ্যমুদ্রা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম তা ধরবে সেই মালিক হবে। আর যার কাপড়ে পড়েছে সে যদি পড়ার পর তার কাপড় গুটিয়ে নেয় কিংবা পূর্ব থেকে তা লাভ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে তাহলে সেই তার মালিক হবে; অন্য কেউ ধরলেও মালিক হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا عَسَّلَ النَّحْلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যতিক্রম বিধান হলো, যদি কারো জমিতে মৌমাছি বাসা বাঁধে এবং তাতে মধু সঞ্চয় করে। এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, সর্বাবস্থায় জমির মালিকই উক্ত মধুর মালিক হবে, কেউ তা সংগ্রহ করার অধিকার পাবে না। এর কারণ হলো, মধু জমির বর্ধিত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত হরিণ, পাখির বাচ্চা ও পাখির ডিমের মাঝে এবং মধুর মাঝে পার্থক্য হলো, মধু যখন কোনো জমিতে সঞ্চিত হয় তখন জমির সাথে স্থিতিশীলভাবে যুক্ত হয়, কাজেই তা জমির অনুগামী (تَابِعٌ) হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হরিণ, পাখির বাচ্চা অস্থিতিশীলভাবে জমিতে থাকে, কাজেই তা জমির অনুগামী হিসেবে গণ্য হবে না।

জমির বর্ধিত বস্তু যে জমির অনুগামী হিসেবে জমির মালিকেরই মালিকানাধীন হয় তার নজির হচ্ছে, জমিতে উৎপন্ন গাছ না বপন করলেও জমির মালিকই জমিতে উৎপন্ন গাছের মালিক হয়। এরূপভাবে ঢলের পানির সাথে চলে আসা মাটি যদি কারো জমিতে জমে যায়, তাহলে জমির মালিকই উক্ত মাটির মালিক হয়– অন্য কেউ তা নেওয়ার অধিকার রাখে না। তদ্রূপ যার জমিতে মৌমাছি মধু সঞ্চয় করবে সেই তার মালিক হবে।

كِتَابُ الصَّرْفِ

قَالَ : اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، سُمِّيَ بِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى النَّقْلِ فِي بَدْلَيْهِ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ، وَالصَّرْفُ هُوَ النَّقْلُ وَالرَّدُّ لُغَةً، أَوْ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إِلَّا الزِّيَادَةُ، إِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، وَالصَّرْفُ هُوَ الزِّيَادَةُ لُغَةً، كَذَا قَالَهُ الْخَلِيْلُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْعِبَادَةُ النَّافِلَةُ صَرْفًا ـ

অধ্যায় : 'বায় সরফ' বা মুদ্রা বিনিময়

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, 'সরফ' হলো এমন ক্রয়-বিক্রয় যার উভয় বিনিময়দ্রব্য মুদ্রাশ্রেণীভুক্ত হয়। আর 'সরফ'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে স্থানান্তর করা, ফেরত দেওয়া। সুতরাং এ ক্রয়-বিক্রয়কে 'সরফ' নামকরণ করা হয়েছে এ কারণে যে, তাতে উভয় বিনিময়দ্রব্য [তাৎক্ষণিকভাবে] হস্তান্তর করা আবশ্যক। কিংবা এ কারণে 'সরফ' বলা হয় যে, এ বিক্রয়চুক্তি দ্বারা শুধু গুণগত অতিরিক্ততাই [চুক্তিকারীর] উদ্দেশ্য থাকে। আর ভাষাবিদ খলীলের মতে 'সরফ' -এর আভিধানিক অর্থ হলো 'অতিরিক্ততা'। এজন্যই নফল ইবাদতকে 'সরফ' বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'বায় সরফ'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : صَرْف -এর আভিধানিক অর্থ–

১. اَلنَّقْلُ স্থানান্তরিত করা, ফিরিয়ে দেওয়া,

২. اَلزِّيَادَةُ বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত করা।

صَرْف -এর পারিভাষিক অর্থ– اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ "সরফ বলা হয় এমন বিক্রয়চুক্তিকে, যার উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হয় মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য।"

পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহের সাথে সম্পর্ক : মুসান্নিফ (র.) ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে 'বায় সরফ'-এর আলোচনা সর্বশেষে করেছেন। এর কারণ হলো–

১. 'বায় সরফ' হলো, মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, আর মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত মূল্যদ্রব্য হয়ে থাকে। আর বিক্রয়চুক্তিতে মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে বিক্রয়দ্রব্য, মূল্য হয় তার অনুগামী (تَابِعٌ)। আর যা অনুগামী (تَابِعٌ) হয় তা মূলের পরে হয়ে থকে। তাই অন্যান্য ক্রয়-বিক্রেয়ের আলোচনার পরে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় তথা 'বায় সরফ'-এর আলোচনা করেছেন।

২. আরোকটি কারণ হলো, 'বায় সরফ'-এর শর্ত ও বিধি-নিষেধ বেশি হওয়ার কারণে এর অস্তিত্ব কম হয়। তাই যে সকল ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব বেশি তা আলোচনা করার পর যার অস্তিত্ব কম তার আলোচনা করতে গিয়ে 'বায় সরফ'-এর আলোচনা সর্বশেষে এনেছেন।

'বায় সরফ'-এর শর্ত : এর শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হস্তগত করা। উল্লেখ্য, এ শর্তের কারণেই 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে বাকি বিক্রয় জায়েজ হয় না এবং خِيَارُ شَرْطٍ [চিন্তা করে দেখার ইচ্ছাধিকার] সহীহ হয় না। তবে বাকি চুক্তি করার পর মজলিসে থাকাবস্থায়ই যদি বাকির মেয়াদ উভয়ে বাতিল করে নগদ করে নেয়, তাহলে

চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। তদ্রূপ خِيَارُ شَرْط সাব্যস্ত করার পর মজলিসেই যদি তা বাতিল করে দেয়, তাহলে চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উভয় সুরতেই চুক্তি জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ : اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে 'বায় সরফ'-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। এর সংজ্ঞা হলো, اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ "সরফ বলা হয় এমন বিক্রয়চুক্তিকে যার উভয় পক্ষের বিনিময়দ্রব্য হয় মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য।"

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) 'বায় সরফ'-এর সংজ্ঞায় بَيْعُ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] না বলে مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য] বলেছেন, এর কারণ হলো, যাতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র বা অলংকার মুদ্রার বিনিময়ে কিংবা এরূপ পাত্র বা অলংকারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও 'বায় সরফ'-এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, এরূপ ক্রয়-বিক্রয় 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত, অথচ بَيْعُ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] বললে 'বায় সরফ' -এর সংজ্ঞায় তা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারণ, পাত্র বা অলংকার বাহ্যত মুদ্রা নয়, [এজন্যই তা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়, পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না।] কিন্তু স্বর্ণের ও রৌপ্যের পাত্র বা অলংকার مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য]। কেননা, স্বর্ণ ও রৌপ্য মূলত মুদ্রা বা মূল্যদ্রব্য হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এ দুটি মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য। অতএব, এ দুটির ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত সংজ্ঞায় بَيْعُ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ [মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা বিক্রয় করা] না বলে مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ [মুদ্রাশ্রেণীর দ্রব্য] বলেছেন।

قَوْلُهُ سُمِّيَ بِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى النَّقْلِ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখানে 'বায় সরফ' -এর নামকরণের কারণ [صَرْف -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে কি সম্পর্ক তা] বর্ণনা করেছেন। এর নামকরণের দুটি কারণের যে কোনোটি হতে পারে। **প্রথম কারণ :** صَرْف -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– স্থানান্তরিত করা, ফিরিয়ে দেওয়া। আর 'বায় সরফ'-এ উভয় পক্ষের দ্রব্য কার্যত [মজলিসেই] এক পক্ষের হাত অপর পক্ষের হাতে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক ও শর্ত। আর এ তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হওয়ার কারণেই এ ক্রয়-বিক্রয়কে 'বায় সরফ' নাম রাখা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, صَرْف -এর আভিধানিক একটি অর্থ হচ্ছে, اَلزِّيَادَةُ 'অতিরিক্ত'। ভাষাবিদ খলীল ইবনে আহমদ صَرْف-এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ অর্থ হিসেবেই নফল ইবাদতকে صَرْف বলা হয়। যেমন হাদীসে আছে– مَنِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا "যে ব্যক্তি নিজের প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে পিতা হিসেবে পরিচয় দিবে আল্লাহ তা'আলা তার কোনো নফল ও ফরজ ইবাদত কবুল করবেন না।" এ হাদীসে صَرْف -এর অর্থ হচ্ছে নফল ইবাদত। যেহেতু নফল হচ্ছে ফরজের পরে অতিরিক্ত ইবাদত, তাই একে صَرْف বলা হয়েছে। এ অর্থ হিসেবে 'বায় সরফ' -এর নামকরণের কারণ হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য সর্বদা অতিরিক্ত লাভ অর্জন করা হয়ে থাকে; ক্রয়কৃত বস্তুর সত্তার দ্বারা উপকৃত হওয়া উদ্দেশ্য হয় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য বস্তু যেমন– খাদ্য, প্রাণী ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তুটির সত্তা দ্বারা উপকৃত হওয়াও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন– খাদ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় তা ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবারণ করা, গরু ক্রয়ের উদ্দেশ্য হয় চাষ করা ইত্যাদি। আর মুদ্রাদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার সত্তা দ্বারা কোনো উপকার অর্জন করা উদ্দেশ্য হয় না; বরং কিছু লাভ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর লাভই হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়। সুতরাং যেহেতু এ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিষয় অর্জন করাই সর্বদা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে صَرْف 'বায় সরফ'। কেননা, এর আভিধানিক অর্থও হচ্ছে "অতিরিক্ত"।

قَالَ : فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًوا اَلْحَدِيثُ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جَيِّدُهَا وَ رَدِيُّهَا سَوَاءٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, তাহলে সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ ব্যতীত বিক্রয় জায়েজ হবে না। যদিও তা উৎকৃষ্টতা ও তৈরির দিক থেকে তারতম্যপূর্ণ হয়। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান সমান, ওজন সমান সমান হতে হবে, হাতে হাতে [হস্তান্তর] হতে হবে, আর অতিরিক্ত হলে তা হবে রিবা [সুদ]। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন, "এগুলোর উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমান"। এ বিষয়টি আমরা 'বিক্রয় অধ্যায়'-এ আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ الخ : মাসআলা : কেউ যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হতে হবে। অন্যথা ক্রয়-বিক্রয় হারাম হবে। এ ক্ষেত্রে এক পক্ষের দ্রব্য যদি উৎকৃষ্ট মানের হয় কিংবা উন্নত কারুকার্যবিশিষ্ট হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য তদপেক্ষা নিম্নমানের হয় তবুও ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান সমান হওয়া অপরিহার্য।

উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয়ের চুক্তিকালে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হতে হবে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনে সমান, শুধু বাস্তবে যদি সমান হয় চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিকালে তা জ্ঞাত না হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। সুতরাং যদি অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করে, অতঃপর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পরে মেপে দেখল যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না; বরং মজলিসেই উভয়ের জানতে হবে যে, উভয় দ্রব্য ওজনে সমান।

قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الخ : উল্লিখিত মাসআলার দলিল হিসেবে মুসান্নিফ (র.) দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস হচ্ছে নবী করীম ﷺ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য' এভাবে ছয়টি দ্রব্যের কথা উল্লেখ করার পর বলেছেন, مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبًوا '[তোমরা বিক্রয় কর] সমপরিমাণের বিনিময়ে সমপরিমাণ, ওজনের দিক থেকে সমান সমান এবং হাতে হাতে আদান প্রদান করে। আর [কোনো পক্ষে] অতিরিক্ত হলে তা হবে 'রিবা' [সুদ]।' এ হাদীসে নবী করীম ﷺ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

১. ওজনের দিক থেকে উভয় দ্রব্য সমান সমান হওয়া।

২. চুক্তির মজলিসেই উভয় পক্ষের দ্রব্য উভয়ে হস্তগত করা।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে একাধিক সাহাবী হতে বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় হাদীস হচ্ছে– নবী করীম ﷺ -এর বাণী جَيِّدُهَا وَ رَدِيُّهَا سَوَاءٌ 'এগুলোর [অর্থাৎ 'রিবা' দ্রব্যের] উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বরাবর।' অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে 'রিবা' সাব্যস্ত হয় তার উৎকৃষ্টতার ও নিকৃষ্টতার তারতম্য ধর্তব্য হবে না; বরং উভয়টিকে সমান সমান ধরা হবে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, এক পক্ষের স্বর্ণ যদি উৎকৃষ্ট আর অপর পক্ষের স্বর্ণ যদি নিম্নমানের হয় তবুও কমবেশি করে বিক্রয় করা যাবে না। উল্লেখ্য, এ হাদীসটি মুসান্নিফ (র.) যেভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে হাদীসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তবে এর মর্মার্থ 'রিবা' সংক্রান্ত সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কেও আমরা 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমবেশি হারাম হওয়া সম্পর্কে আমরা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে ['রিবা'-এর পরিচ্ছেদের শুরুতে মূল গ্রন্থের ৬১ নং পৃষ্ঠায়] বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قَالَ : وَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ لِمَا رَوَيْنَا ، وَلِقَوْلِ عُمَرَ (رض) وَاِنْ اِسْتَنْظَرَكَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ، وَلِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا لِيَخْرُجَ الْعَقْدُ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ثُمَّ لَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْاٰخَرِ تَحْقِيْقًا لِلْمُسَاوَاةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبٰوا ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَوْلٰى مِنَ الْاٰخَرِ فَوَجَبَ قَبْضُهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوْغِ، أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَضْرُوْبِ، أَوْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ الْاٰخَرُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا ، وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ شُبْهَةُ عَدَمِ التَّعْيِيْنِ لِكَوْنِهِ ثَمَنًا خِلْقَةً، فَيُشْتَرَطُ قَبْضُهُ اِعْتِبَارًا لِلشُّبْهَةِ فِي الرِّبٰوا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, [মজলিস থেকে] পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বিনিময়দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য। এর দলিল হলো, একটু পূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীসটি। আরেকটি দলিল হলো, হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য– "যদি অপর পক্ষ তোমার কাছে তার ঘরে প্রবেশ করার সময়টুকু অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে ততটুকু অবকাশ দিবে না।" তাছাড়া এ কারণে যে, বিনিময়দ্রব্যদ্বয়ের একটি হস্তগত করা তো আবশ্যক এজন্য যে, চুক্তিটি যাতে [হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ] বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রয় না হয়। অতঃপর সমতা রক্ষার্থে অপর বিনিময়দ্রব্যটিও হস্তগত করা আবশ্যক হবে, যাতে রিবা [সুদ] সাব্যস্ত না হয়। আর এ কারণে যে, বিনিময়দ্রব্যদ্বয়ের কোনোটিই [হস্তগতকরণের ক্ষেত্রে] অপরটির উপর অগ্রাধিকার রাখে না, সুতরাং [একই মজলিসে] উভয়টি হস্তগত করা আবশ্যক হবে। চাই উভয় দ্রব্য নির্ধারণযোগ্য হোক যেমন– কারুকার্য খচিত [অলংকার বা পাত্র] কিংবা নির্ধারণযোগ্য না হোক যেমন– মোহরাঙ্কিত মুদ্রা কিংবা একটি নির্ধারণযোগ্য আর অপরটি অনির্ধারণযোগ্য হোক [সর্বাবস্থায় বিধান এক]। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীসটি শর্তমুক্ত। তাছাড়া এ কারণে যে, দ্রব্যটি [অলংকার বা পাত্র হওয়ার কারণে] নির্ধারণযোগ্য হলেও তাতে নির্ধারণযোগ্য না হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। কেননা, [স্বর্ণ ও রৌপ্য] সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রাদ্রব্য। অতএব, তাও হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কারণ, রিবা [সুদের]-এর ক্ষেত্রে সন্দেহও ধর্তব্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الخ : **মাসআলা :** 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য উভয়ে হস্তগত করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলে একমত। মুসান্নিফ (র.) এ মাসআলার নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلِقَوْلِ عُمَرَ (رض) وَاِنْ اسْتَنْظَرَكَ الخ : মুসান্নিফ (র.) নকলী দলিল হিসেবে দুটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীস হলো, পূর্বের মাসআলার দলিলে আমাদের উল্লিখিত হাদীস। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ স্বর্ণ, রৌপ্যসহ ছয়টি দ্রব্যের বিক্রয়ের বিধান উল্লেখ করে বলেছেন– يَدًا بِيَدٍ '[উভয় পক্ষের দ্রব্য] হাতে হাতে হস্তান্তর করতে হবে'। আর হাতে হাতে হস্তান্তরের অর্থ হচ্ছে উভয়ে নগদ হস্তান্তর করা। কাজেই এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [অর্থাৎ 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে] উভয় পক্ষ নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য ও বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত।

দ্বিতীয় হাদীস হলো, হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত মওকুফ হাদীস। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন- وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ "[বায় সরফ-এর ক্ষেত্রে] যদি অপর পক্ষ তোমার নিকট তার ঘরে প্রবেশের অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে সে অবকাশ দিবে না।" অর্থাৎ অপর পক্ষ যদি বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের পর তার দ্রব্যটি হস্তান্তর করার জন্য ঘরে প্রবেশ করে এনে দেওয়ার অবকাশ চায়, তাহলে তুমি তাকে সে অবকাশ দিতে পারবে না। হযরত ওমর (রা.) -এর এ বাণী থেকেও প্রমাণিত হয় যে, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের পর মজলিসেই উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক। উল্লেখ্য, হযরত ওমর (রা.)-এর এ হাদীসটি সহীহ সনদে মুয়াত্তা মালিকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْأٰخَرُ نَاجِزٌ وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ هَاتِ وَهَاتِ إِنِّيْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الرِّبَا .

"হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, তোমরা সমান সমান ব্যতীত স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করো না। আর স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এভাবে বিক্রয় করো না যে, একটি উপস্থিত আর অন্যটি অনুপস্থিত। আর অপর পক্ষ যদি তোমর নিকট তার ঘরে প্রবেশের অবকাশ চায় তাহলে তুমি সে অবকাশ দিও না। কেবল হাতে হাতে নগদ নগদ বিক্রয় করবে। আমি তোমাদের জন্য 'রিবা' [সুদ] -এর আশঙ্কা করছি।"

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত দুটি হাদীস ছাড়াও বুখারী শরীফে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত 'রিবা' সংক্রান্ত হাদীস দ্বারাও মাসআলাটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তাতে নবী করীম ﷺ বলেছেন- "وَلَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" "আর তোমরা এ সকল দ্রব্য [অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্যসহ উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্য]-এর মধ্য থেকে কোনোটি বাকির বিনিময়ে নগদ বিক্রয় করো না।"

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন। আকলী দলিল হলো, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা তো এজন্য অপরিহার্য যে বিক্রয়চুক্তিটি যেন بَيْعُ الْكَالِي بِالْكَالِي "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যায়। 'দাইন' হলো যা জিম্মায় অনির্দিষ্টরূপে সাব্যস্ত হয়। যেমন- স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা এগুলো নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং একটি নির্দিষ্ট করলেও তার স্থলে অন্য একটি দেওয়ার অধিকার থাকে। 'বায় সরফ' -এর মাঝে যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা হয় কাজেই তা বাকি রাখা হলে জিম্মায় অনির্দিষ্টভাবেই ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়ে থাকবে। ফলে 'দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়' হয়ে যাবে। অথচ নবী করীম ﷺ 'দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়' করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ নিষেধের ভিত্তিতে যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

যখন এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক সাব্যস্ত হলো তখন অপর পক্ষের দ্রব্যও হস্তগত করা আবশ্যক হবে দুটি কারণে :

قَوْلُهُ ثُمَّ لَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْأٰخَرِ الخ : প্রথম কারণ হলো, যদি একটি দ্রব্য নগদ হস্তগত করা হয় আর অপর দ্রব্য বাকি থাকে, তাহলে যে নগদ হস্তগত করল তার লাভ সাব্যস্ত হবে। কেননা, বাকির চেয়ে নগদ হস্তগত করা লাভজনক গণ্য হয়। সুতরাং উভয় পক্ষের দ্রব্যের মাঝে সমতা রক্ষা হবে না। ফলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হবে। অতএব, উভয় পক্ষে সমতা রক্ষা করার জন্য অপর পক্ষের দ্রব্যও মজলিসেই হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَوْلٰى الخ : দ্বিতীয় কারণ হলো, যখন এক পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হয়েছে তখন প্রশ্ন দেখা দিবে যে, কোন পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা হবে? এ ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত যাতে কোনো পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দিতে না হয় সে জন্য উভয় পক্ষের দ্রব্যই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوْغِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করতে হবে' এ বিধানটি 'বায় সরফ' -এর সব সুরতেই প্রযোজ্য। এখানে জানা আবশ্যক যে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা (اَلْمَضْرُوْبُ) নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না, তাই বিক্রয়কালে কোনো মুদ্রা নির্দিষ্ট করলেও তার পরিবর্তে তদ্রূপ অন্য মুদ্রা দিতে পারে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের তৈরি পাত্র বা অলংকার

(الْمَصُوْغ) নির্দিষ্ট করা হলে তা নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই কেউ নির্দিষ্ট কোনো পাত্র বা অলংকার বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে তদ্রূপ অন্য একটি পাত্র দিতে পারে না। সুরতাং 'বায় সরফ' -এর তিনটি সুরত হতে পারে–

১. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। যেমন– উভয় পক্ষে স্বর্ণালংকার কিংবা স্বর্ণের পাত্র।
২. উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন– উভয় পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা কিংবা রৌপ্যমুদ্রা।
৩. এক পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য এমন যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। যেমন– স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণের বা রৌপ্যের পাত্র ক্রয় করল। এ তিন সুরতেই উভয় পক্ষের দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য, এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্নটি হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক হওয়ার মুসান্নিফ (র.) যে আকলী দলিল বর্ণনা করেছেন তা তো কেবল উল্লিখিত তিন সুরতের মধ্য থেকে কেবল এক সুরতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তা হলো, দ্বিতীয় সুরত তথা যখন উভয় পক্ষের দ্রব্য এমন হয় যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। কেননা, কেবল এ সুরতেই যদি কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত না করে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ "দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়" সাব্যস্ত হয়, যা নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দু সুরতে যদি কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত না করে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ "দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়" সাব্যস্ত হয় না। কেননা, এ দু সুরতে যেহেতু উভয় পক্ষে কিংবা এক পক্ষে এমন দ্রব্য রয়েছে যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়ে যায় কাজেই তা 'দাইন'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই "দাইনের বিনিময়ে দাইন বিক্রয়" সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত আকলী দলিলের ভিত্তিতে কেবল এক সুরতে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা আবশ্যক সাব্যস্ত হয়, অথচ বিধান হলো, তিনটি সুরতেই মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক।

উক্ত প্রশ্নের দুটি জবাব :

قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا : এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত প্রশ্নের দুটি জবাবের প্রথম জবাবটির বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম জবাব হলো, এ ক্ষেত্রে বিধানটি মূলত 'নস' তথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আমরা যে কিয়াস উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে উক্ত বিধানের 'ইল্লাত'। আমরা পূর্বে 'রিবা' সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ যে হাদীস উল্লেখ করেছি তাতে যে বলা হয়েছে " يَدًا بِيَدٍ 'হাতে হাতে' অর্থাৎ উভয় পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করতে হবে, নবী করীম ﷺ-এর এ নির্দেশে কোনো সরতকে বাদ রাখা হয়নি; বরং তা নিঃশর্ত ও সর্বব্যাপী। কাজেই উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই 'বায় সরফ' -এর তিনটি সুরতেই উভয় পক্ষের দ্রব্য চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত প্রশ্নের দুটি জবাবের দ্বিতীয় জবাবের বিবরণ প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় জবাব হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি পাত্র কিংবা অলংকার যদিও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়, কিন্তু তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কিছুটা সন্দেহ (شُبْهَة) থেকে যায়। কেননা, স্বর্ণ ও রৌপ্য সৃষ্টিগতভাবেই মুদ্রাদ্রব্য হিসেবে গণ্য। কাজেই তা দ্বারা পাত্র বা অলংকার তৈরি করা হলেও তা মুদ্রাদ্রব্য হিসেবে বহাল থাকার সন্দেহ (شُبْهَة) রয়েছে। আর মুদ্রাদ্রব্য সর্বদা অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর ইতঃপূর্বে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, 'রিবা' [সুদ]-এর ক্ষেত্রে সন্দেহমূলক বিদ্যমান বিষয়কে কার্যত বিদ্যমান হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া হবে যে, উক্ত দুই সুরতেও নির্দিষ্ট করা হলেও নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট হয়নি। কাজেই উভয় পক্ষের দ্রব্যই চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক হবে।

وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْاِفْتِرَاقُ بِالْأَبْدَانِ حَتّٰى لَوْ ذَهَبَا عَنِ الْمَجْلِسِ يَمْشِيَانِ مَعًا ، فِيْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ نَامَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا لَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (رض) : وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَثِبْ مَعَهُ، وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ، لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ .

অনুবাদ : আর [পূর্বে উল্লিখিত] পরস্পর পৃথক হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া। সুতরাং যদি উভয়ে মজলিস থেকে উঠে একই দিকে হাঁটতে থাকে কিংবা উভয়ে মজলিসে ঘুমিয়ে পড়ে বা বেহুঁশ হয়ে পড়ে, তাহলে 'সরফ'-এর চুক্তিটি বাতিল হবে না। এর দলিল হলো হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্য–"আর যদি অপর পক্ষ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তুমিও তার সাথে লাফিয়ে পড়বে"। আর 'বায় সলম'-এর মূলধন হস্তগত করার ক্ষেত্রেও এ অর্থই [অর্থাৎ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়াই] বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে তালাকের ইচ্ছাধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইচ্ছাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে মজলিস ত্যাগ করাই বিবেচ্য হবে]। কেননা, অনীহা প্রকাশের মাধ্যমে তালাকের ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়। [আর মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যমে অনীহা প্রকাশ পায়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْاِفْتِرَاقُ بِالْأَبْدَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে বিধান উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য' এ ক্ষেত্রে পরস্পরে পৃথক হওয়ার অর্থ হলো, শারীরিকভাবে পরস্পরে পৃথক হওয়া। সুতরাং চুক্তিকারীদ্বয় যদি চুক্তি সম্পাদনের পর উভয়ে একত্রে চুক্তির মজলিস ত্যাগ করে একই দিকে হাঁটতে থাকে কিংবা তারা উভয়ে চুক্তির মজলিসে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা উভয়ে মজলিসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে তাহলে এতে তাদের চুক্তিটি বাতিল হবে না, তারপর তারা উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করে নিলে তা জায়েজ হবে। কেননা, তারা শারীরিকভাবে পৃথক হয়নি।

قَوْلُهُ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (رض): وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ الخ : উক্ত মাসআলার দলিল হলো, হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর বক্তব্য– وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَثِبْ مَعَهُ "যদি [বায় সরফের ক্ষেত্রে উভয়ের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে] অপর পক্ষ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে তুমিও তার সাথে লাফিয়ে পড়বে।" তাঁর এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, মজলিস ত্যাগ করার পর যদি উভয়ে একই দিকে চলতে থাকে, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। অর্থাৎ শারীরিকভাবে পৃথক হওয়ার পূর্বে চুক্তি বাতিল হবে না। উল্লেখ্য, হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.), আল্লামা যায়লায়ী (র.) ও আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এ হাদীসটি হাদীসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে মাবসূতে পূর্ণ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ جَبَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : إِنَّا نَقْدَمُ أَرْضَ الشَّامِ وَمَعَنَا الْوَرِقُ الثِّقَالُ النَّافِقَةُ وَعِنْدَهُمُ الْوَرِقُ الْخِفَافُ الْكَاسِدَةُ فَنَبْتَاعُ وَرِقَهُمُ الْعَشَرَ بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ بِعْ وَرِقَكَ بِذَهَبٍ وَاشْتَرِ وَرِقَهُمْ بِالذَّهَبِ وَلَا تُفَارِقْهُ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَ وَإِنْ وَثَبَ عَنْ سَطْحٍ فَثِبْ مَعَهُ .

قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'বায় সলম' [দাদনচুক্তি]-এর ক্ষেত্রে যে, 'রা'সুল মাল' [মূলধন] চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা শর্ত সে ক্ষেত্রেও পৃথক হওয়ার অর্থ হচ্ছে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া, যেরূপ আমরা এখানে উল্লেখ করলাম। যেমন– কেউ যদি কারো নিকট হতে এক হাজার টাকায় পাঁচ মণ ধান এভাবে ক্রয় করে যে, ক্রেতা এখন মূল্য দিবে আর বিক্রেতা ছয় মাস পরে ধান দিবে তাহলে এ চুক্তিটি হলো 'বায় সলম'। আর প্রদেয় এক হাজার টাকা হচ্ছে 'রা'সুল মাল'। আর 'রা'সুল মাল' চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা শর্ত। তবে পৃথক হওয়ার অর্থ হবে শারীরিকভাবে পৃথক হওয়া; শুধু কথাবার্তা শেষ করার মাধ্যমে পৃথক হওয়া নয়।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পক্ষান্তরে স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার প্রদান করে, তাহলে এ ইচ্ছাধিকার কেবল ইচ্ছাধিকার প্রদানের মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্ত্রী যদি মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ায় তাহলে তার ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কিংবা উক্ত মজলিসেই যদি অন্য কাজে সে আত্মনিয়োগ করে, তাহলেও বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে স্বামী থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছাধিকার থাকে না। এ ক্ষেত্রে বিধানটি ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হলো, স্বামী প্রদত্ত তালাক গ্রহণের ইচ্ছাধিকার স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তাহলেই বাতিল হয়ে যায়। আর মজলিস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানো কিংবা অন্য কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করা তালাক গ্রহণে অনীহা প্রকাশ বলে গণ্য হয়। সুতরাং মজলিস থেকে উঠে দাঁড়ালেই উক্ত ইচ্ছাধিকার বাতিল হয়ে যায়।

وَإِنْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ وَ وَجَبَ التَّقَابُضُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، فَإِنْ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ، وَهُوَ الْقَبْضُ. وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَلَا الْأَجَلُ، لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا لَا يَبْقَى الْقَبْضُ مُسْتَحِقًّا، وَبِالثَّانِي يَفُوتُ الْقَبْضُ الْمُسْتَحِقُّ، إِلَّا إِذَا اَسْقَطَ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَعُوْدُ إِلَى الْجَوَازِ لِارْتِفَاعِهِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ، وَفِيْهِ خِلَافُ زُفَرَ (رح) ـ

অনুবাদ : আর যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, তাহলে কমবেশি করা জায়েজ হবে। কেননা, সমশ্রেণীতার শর্ত বিদ্যমান নেই। তবে পরস্পরে হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় রিবা [সুদ] হবে, যদি হাতে হাতে হস্তগত করা না হয়।" যদি 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয় বিনিময়দ্রব্য কিংবা দ্রব্যদ্বয়ের একটি হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, হস্তগত করার শর্তটি বিদ্যমান নেই। এ কারণেই 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকারের শর্ত এবং মেয়াদের শর্ত আরোপ জায়েজ নয়। কেননা, এ দুটির একটির কারণে [অর্থাৎ ইচ্ছাধিকারের কারণে] হস্তগত করার অধিকার থাকে না, আর দ্বিতীয়টি তথা মেয়াদ নির্ধারণের কারণে [চুক্তির দ্বারা সাব্যস্ত] হস্তগত করার অধিকার রহিত হয়ে যায়। তবে যদি মজলিসেই ইচ্ছাধিকারের শর্ত বাতিল করে দেওয়া হয়, তাহলে চুক্তিটি বৈধতায় ফিরে আসবে। কেননা, বাতিল হওয়ার কারণ 'স্থিত' হওয়ার পূর্বেই দূরীভূত হয়ে গেছে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ الخ : **মাসআলা :** যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, অর্থাৎ এক পক্ষে পরিমাপে কম আর অপর পক্ষে বেশি হলে তা জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী (جِنْس) ভিন্ন। আর 'রিবা' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হয়, তাহলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَ وَجَبَ التَّقَابُضُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হবে, কিন্তু পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের দ্রব্য হস্তগত করা এ ক্ষেত্রেও আবশ্যক হবে। এর দলিল হলো, নবী করীম ﷺ-এর বাণী- اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ "রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় 'রিবা' [সুদ] হবে যদি 'তুমি এই নাও আর তুমি এই নাও' এভাবে না হয় [অর্থাৎ নগদ আদান-প্রদান করা না হয়]।" উল্লেখ্য, এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার সকল গ্রন্থে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، اَلشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

قَوْلُهُ فَإِنِ افْتَرَقَا فِى الصَّرْفِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং যদি চুক্তিকারীদ্বয় উভয় পক্ষের কিংবা কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে পরস্পরে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, 'বায় সরফ' চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত ছিল উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা। কাজেই যখন শর্তটি পাওয়া যায়নি তখন সম্পাদিত হওয়ার পর চুক্তিটি আবার বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيْهِ وَلَا الْأَجَلُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ কারণেই অর্থাৎ চুক্তিকারীদ্বয় পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় দ্রব্য হস্তগত করার শর্তটি পূরণ না হলে যে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এ কারণেই 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে 'খিয়ারে শর্ত' [চিন্তাভাবনা করে দেখার ইচ্ছাধিকার] এবং বাকির বিক্রয় সহীহ হয় না। 'খিয়ারে শর্ত' -এর সুরত হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের কোনো একজন বলল, আমি এ শর্তে বিক্রয় করলাম যে, আমার তিন দিন চিন্তাভাবনা করে দেখার সুযোগ থাকবে। আর বাকি বিক্রয়ের সুরত হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের কোনো একজন বলল, আমি তোমার দিরহামগুলো পাঁচ দিনার দিয়ে ক্রয় করলাম তবে এ পাঁচ দিনার এক মাস পরে পরিশোধ করব।

এ দুটি সুরত জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে যদি কোনো এক পক্ষের 'খিয়ারে শর্ত' থাকে, তাহলে অপর পক্ষের দ্রব্য তার হস্তগত করার অধিকার থাকে না। অথচ 'বায় সরফ' -এর জন্য নগদ হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং এ শর্ত বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

আর বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যখন মেয়াদ উল্লেখ করা হয়, তখন চুক্তির কারণে যে হস্তগত করার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছিল তা পুনরায় বাতিল হয়ে যায়। কেননা, মেয়াদ হচ্ছে নগদ হস্তগত করার বিপরীত। ফলে এ ক্ষেত্রেও 'বায় সরফ' -এর শর্ত বিনষ্ট হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ [দেখার পর অপছন্দ হওয়ার কারণে চুক্তি প্রত্যাহার করার ইচ্ছাধিকার] এবং خِيَارُ عَيْبٍ [ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে চুক্তি প্রত্যাহার করার ইচ্ছাধিকার] সাব্যস্ত হবে। কেননা, এ দুটি ইচ্ছাধিকার নগদ হস্তগত করার ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। তবে خِيَارُ الرُّؤْيَةِ কেবল ঐ দ্রব্যে সাব্যস্ত হবে যা নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। আর যা নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না তাতে সাব্যস্ত হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا إِذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ فِى الْمَجْلِسِ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' থাকলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে যে, তবে খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে 'বায় সরফ' -এর চুক্তি সম্পাদন করার পর চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তির মজলিসে থাকাবস্থায়ই যদি যার পক্ষে 'খিয়ারে শর্ত' ছিল সে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে চুক্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করে দেয়, তাহলে আবার চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.) মতবিরোধ করেন। তাঁর মতে উক্ত সুরতে চুক্তিটি আর জায়েজ হবে না।

আমাদের দলিল হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি বাতিল হওয়ার যে কারণটি ছিল অর্থাৎ 'খিয়ারে শর্ত' তা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বেই আবার দূর হয়ে গেছে। কেননা, যদি চুক্তিকারীদ্বয় মজলিস ত্যাগ করে চলে যেত তাহলে তা সুদৃঢ় হয়ে যেত। আর যখন মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে 'খিয়ারে শর্ত' প্রত্যাহার করে নিয়েছে তখন তা সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বে দূরীভূত হয়ে গেছে। কাজেই চুক্তিটি আবার বৈধতায় ফিরে আসবে।

আর ইমাম যুফার (র.) -এর দলিল হচ্ছে, 'খিয়ারে শর্ত' -এর কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে। আর যা একবার বাতিল হয় তা আর সহীহ হতে পারে না। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে ইমাম যুফার (র.)-এর দলিলটি হচ্ছে কিয়াস। আর আমাদের দলিলটি হচ্ছে 'ইসতিহসান' বা বাহ্যিক কিয়াসের বিপরীতে সূক্ষ্ম কিয়াস।

উল্লেখ্য, বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই বিধান ও একই মতবিরোধ। অর্থাৎ বাকিতে 'বায় সরফ' -এর চুক্তি সম্পাদন করার পর যদি চুক্তিকারীদ্বয় মজলিসে থাকাবস্থায় বাকির মেয়াদ বাতিল করে দিয়ে চুক্তিটি নগদ করে নেয়, তাহলে চুক্তিটি আবার সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে সহীহ হবে না।

قَالَ : وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيْ ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ حَتّٰى لَوْ بَاعَ دِيْنَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضِ الْعَشَرَةَ حَتّٰى اشْتَرٰى بِهَا ثَوْبًا فَالْبَيْعُ فِى الثَّوْبِ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى، وَفِيْ تَجْوِيْزِهٖ فَوَاتُهُ، وَكَانَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَجُوْزَ الْعَقْدُ فِى الثَّوْبِ كَمَا نُقِلَ عَنْ زُفَرَ (رحـ) لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَتَعَيَّنُ فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ إِلٰى مُطْلَقِهَا، وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ الثَّمَنُ فِيْ بَابِ الصَّرْفِ مَبِيْعٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ لَابُدَّ لَهٗ مِنْهُ، وَلَا شَيْءَ سِوَى الثَّمَنَيْنِ فَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيْعًا لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ، وَبَيْعُ الْمَبِيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوْزُ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ كَوْنِهٖ مَبِيْعًا أَنْ يَكُوْنَ مُتَعَيَّنًا كَمَا فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হস্তগত করার পূর্বে 'সরফ'-এর মূল্যের মাঝে অধিকার চর্চা জায়েজ নয়। সুতরাং যদি কেউ দশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা বিক্রয় করে, অতঃপর রৌপ্যমুদ্রা দশটি হস্তগত করার পূর্বেই তা দ্বারা একটি কাপড় ক্রয় করে তাহলে কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি ফাসেদ হবে। কেননা, [রৌপ্যমুদ্রাগুলো] হস্তগত করা আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে চুক্তির মাধ্যমে আবশ্যিক হয়েছে। অতএব, কাপড়ের চুক্তিকে বৈধতা দেওয়া হলে আল্লাহর হকটি বিনষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি [কিয়াসের দাবি অনুসারে] বৈধ হওয়ারই কথা ছিল। ইমাম যুফার (র.) থেকে এরূপ বর্ণিতও রয়েছে। কেননা, রৌপ্যমুদ্রা নির্ধারণযোগ্য বস্তু নয় [কেননা, মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হয় না]। সুতরাং কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি অনির্দিষ্ট রৌপ্যমুদ্রার সাথে সম্পৃক্ত হবে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে মুদ্রাদ্রব্যই বিক্রয়দ্রব্য [মবী'] হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রয়বস্তু থাকা আবশ্যক। আর 'বায় সরফ' -এর মাঝে [উভয় পক্ষে] মুদ্রাদ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু নেই। কাজেই কোনো পক্ষের মুদ্রার অগ্রাধিকার না থাকার কারণে উভয় পক্ষের মুদ্রাকেই বিক্রয়বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। আর হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয়বস্তু [পুনরায়] বিক্রয় করা জায়েজ নয়। আর বিক্রয়বস্তু হওয়ার জন্য 'নির্দিষ্ট বস্তু' হওয়া অপরিহার্য নয়। যেমন– 'বায় সলম' -এর ক্ষেত্রে দাদন দ্রব্য [অনির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তা বিক্রেয়দ্রব্য]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ : وَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ الخ : অর্থাৎ 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়। আলোচ্য ইবারতে ثَمَنُ الصَّرْفِ দ্বারা উভয় পক্ষের দ্রব্যই উদ্দেশ্য। কেননা, 'বায় সরফ'-এ উভয় পক্ষের দ্রব্যই হচ্ছে ثَمَنْ বা মুদ্রাদ্রব্য। সুতরাং কোনো পক্ষের দ্রব্যই হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা জায়েজ হবে না। অধিকার চর্চা হচ্ছে যেমন– তা হস্তগত করার পূর্বে কারো নিকট বিক্রয় করা, কাউকে দান করে দেওয়া, কাউকে সদকা করে দেওয়া ইত্যাদি।

এ বিধানের উপর ভিত্তি করে একটি মাসআলা হলো : কেউ যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি দিনার বিক্রয় করে, অতঃপর দিনার বিক্রেতা অপর পক্ষের নিকট হতে দশ দিরহাম হস্তগত না করে তার বিনিময়ে দিরহামের মালিক হতে একটি কাপড় ক্রয় করে, তাহলে কাপড়ের ক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ حَقًّا لِلّٰهِ تَعَالٰى الخ : উক্ত মাসআলার দলিল হলো, 'বায় সরফ'-এর চুক্তির কারণে উভয়ের দ্রব্য উভয়ে হস্তগত করা শর্ত। আর এ শর্তটি আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে– চুক্তিকারীদ্বয়ের কারো হক হিসেবে নয়। এ কারণেই চুক্তিকারীদ্বয় যদি নগদ হস্তগত করার ব্যাপারে সম্মত হয়, তাহলেও তা জায়েজ হয় না। সুতরাং যদি কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ করা হয়, তাহলে দিনারের মালিকের উপর যে দশ দিরহাম নগদ হস্তগত করা ওয়াজিব ছিল তা বাস্তবায়ন হবে না। আল্লাহ তা'আলার হক হিসেবে যে শর্ত সাব্যস্ত হয়েছিল তা বাতিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। কাজেই নগদ হস্তগত করার শর্তটি বহাল রাখার জন্য কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত করা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ وَكَانَ يَنْبَغِىْ أَنْ يَجُوْزَ الْعَقْدُ فِى الثَّوْبِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কিয়াসের দাবি অনুসারে কাপড়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হওয়ার কথা ছিল। একটি বর্ণনা মতে ইমাম যুফার (র.)-এর মতে বিধানও তাই, অর্থাৎ কাপড়ের বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হবে।

কিয়াসের দাবি অনুসারে জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুদ্রা তথা দিরহাম-দিনার নির্দিষ্ট করা হলেও তা নির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয় না; বরং তা জিম্মায় অনির্দিষ্ট হিসেবে সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই কেউ যদি কোনো বস্তু ক্রয়কালে বলে যে, আমি এ দশ দিরহামের বিনিময়ে তোমার এ বস্তুটি ক্রয় করলাম, তাহলে তার ঐ দশ দিরহামই দেওয়া আবশ্যক নয়; বরং যে কোনো দশটি দিরহাম সে দিতে পারে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দিনার বিক্রয়কারী তার প্রাপ্য দশ দিরহামের বিনিময়ে যখন কাপড়টি ক্রয়ের চুক্তি করেছে তখন চুক্তিটি তার প্রাপ্য দশ দিরহামের সাথে নির্দিষ্ট না হয়ে অনির্দিষ্টভাবে দশ দিরহামের সাথে সম্পর্কিত হবে। সুতরাং দিনারের বিনিময়ে তার প্রাপ্য দশ দিরহাম সে হস্তগত করে নিবে আর কাপড়ের বিনিময়ে ভিন্নভাবে দশ দিরহাম পরিশোধ করবে। এভাবে কাপড়ের চুক্তিটি কিয়াস অনুসারে জায়েজ হওয়ার কথা। আর এটিই এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম যুফার (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ الثَّمَنُ فِىْ بَابِ الصَّرْفِ مَبِيْعٌ الخ : উক্ত কিয়াসের জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে মুদ্রা হলেও তাকে বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع) হিসেবে ধরতে হবে। কেননা, যে কোনো বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেয়দ্রব্য থাকা আবশ্যক। 'বায় সরফ'-এ যেহেতু উভয় পক্ষে মুদ্রাদ্রব্য তাই কোনো এক পক্ষের দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান না থাকায় উভয় পক্ষের দ্রব্যকেই বিক্রেয়দ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় দিনার বিক্রয়কারীর প্রাপ্য দশ দিরহাম বিক্রেয়দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত হলো। অতঃপর কাপড়ের বিনিময়ে উক্ত দশ দিরহাম নির্ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, উক্ত দশ দিরহামকে হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা। আর এ বিধান পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রেয়দ্রব্য যদি স্থানান্তরযোগ্য বস্তু (مَنْقُوْلِىْ شَىْ) হলে তা হস্তগত করার পূর্বে তাতে অধিকার চর্চা করা জায়েজ নয়। সুতরাং উক্ত দশ দিরহামের বিনিময়ে কাপড়ের ক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হবে না। কেননা, এতে স্থানান্তরযোগ্য বস্তু (مَنْقُوْلِىْ شَىْ) ক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বেই তাতে অধিকার চর্চা করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ كَوْنِهِ مَبِيْعًا أَنْ يَكُوْنَ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি 'বায় সরফ' -এ উভয় পক্ষের দ্রব্যকে বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع) ধরা হয়, তাহলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। কেননা, বিক্রেয়দ্রব্য সর্বদা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অথচ দিরহাম দিনার তো নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিক্রেয়দ্রব্য হলেই নির্দিষ্ট হতে হবে এ কথাটি সঠিক নয়; বরং অনির্দিষ্ট হয়েও বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع) হতে পারে। যেমন– 'বায় সলম'-এর ক্ষেত্রে দাদনদ্রব্য [মুসলাম ফীহ]। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি কারো নিকট এক হাজার টাকায় এ শর্তে পাঁচ মণ ধান বিক্রয় করে যে, টাকা এখন দিবে আর ধান ছয় মাস পরে দিবে, তাহলে এটি হলো 'বায় সলম' আর পাঁচ মণ ধান হলো 'মুসলাম ফীহ'। এ ক্ষেত্রে এ পাঁচ মণ ধান নির্দিষ্ট নয়; বরং শর্ত মোতাবেক যে কোনো পাঁচ মণ ধান সে পরিশোধ করবে। আর এই পাঁচ মণ ধান হচ্ছে সকলের মতে বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع)। কাজেই দেখা গেল যে, বিক্রেয়দ্রব্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বস্তু হওয়া অপরিহার্য নয়। সুতরাং 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে দিরহাম বা দিনার অনির্দিষ্ট বস্তু হওয়া সত্ত্বেও তা 'বিক্রেয়দ্রব্য' হিসেবে গণ্য হতে পারবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) এ জবাবটি দুর্বল বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর দুর্বলতা বর্ণনা করার পর লিখেছেন–

وَعَلٰى هٰذَا فَبُطْلَانُ بَيْعِ الثَّوْبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ جَوَابُ الْمَذْهَبِ مُشْكِلٌ –[ফাতহুল কাদীর]

وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً، لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِيْهِ، وَلٰكِنْ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا . بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيْهِ مِنْ اِحْتِمَالِ الرِّبٰوا ـ

অনুবাদ : আর অনুমানের ভিত্তিতে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা শর্ত নয়। তবে আমাদের পূর্বোল্লিখিত কারণে [উভয় দ্রব্য] মজলিসে হস্তগত করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে স্বর্ণ বা রৌপ্য তার সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন [অর্থাৎ তা জায়েজ হবে না] কেননা, তাতে রিবা [সুদ] হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ الخ :

মাসআলা : যদি রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হয় তাহলে পরিমাপ করে বিক্রয় করা আবশ্যক নয়; বরং অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করাও জায়েজ। কেননা, উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী যদি ভিন্ন হয় তাহলে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত নয়। এর দলিল হচ্ছে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত 'রিবা' সংক্রান্ত হাদীস, যার শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেছেন− فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "আর যদি [বিক্রয়ের ক্ষেত্রে] এ সকল দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা [কমবেশি করে] বিক্রয় করতে পার, [এ শর্তে যে,] যদি তা হাতে হাতে আদান-প্রদান করা হয়।" [এ হাদীসটি আমরা বিস্তারিতভাবে 'রিবা'র পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি।] সুতরাং উভয় পক্ষের দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হলে যেহেতু সমান সমান করে বিক্রয় করা আবশ্যক নয় সেহেতু অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করায় কোনো বাধা রইল না। কাজেই তা জায়েজ হবে। কিন্তু আলোচ্য সুরতেও চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা অপরিহার্য হবে। এর নকলী ও আকলী দলিল পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। নকলী দলিল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্বে উল্লিখিত হাদীস− اَلذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًوا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ "রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় 'রিবা' [সুদ] -এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদি 'তুমি এই নাও আর তুমি এই নাও' এভাবে আদান প্রদান করা না হয় অর্থাৎ নগদ হাতে হাতে আদান-প্রদান করা না হয়।"

قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً الخ : পক্ষান্তরে উভয় পক্ষের দ্রব্য যদি একই শ্রেণীর হয়, যেমন− স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য যদি বিক্রয় করা হয়, তাহলে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হারাম হবে। বাস্তবে যদি উভয় পক্ষের দ্রব্য সমানও হয় তবু বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিকালে এ ব্যাপারে জানতে হবে যে, উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনে সমান সমান আছে। এর কারণ হচ্ছে, অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হলে তখন সম্ভাবনা থাকে যে, কোনো পক্ষের দ্রব্য ওজনে বেশি হবে। আর পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'রিবা' [সুদ] -এর ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় বিষয় কিংবা সন্দেহযুক্ত বিষয় বাস্তব বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই বেশি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে বিক্রয় হারাম হবে, যদিও তা বাস্তবে সমান সমান হয়। তাছাড়া নবী করীম ﷺ যে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য সমান সমান হওয়ার শর্ত সাব্যস্ত করেছেন, এ সমান সমান হওয়ার অর্থ অবশ্যই এটা হবে না যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান অনুসারে সমান সমান। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান সমান কিনা তা বান্দার জানার উপায় নেই; বরং এ অর্থ হবে যে, চুক্তিকারীদ্বয়ের জ্ঞান অনুসারে সমান সমান হতে হবে। সুতরাং অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয়কালে যেহেতু চুক্তিকারীদ্বয় সমান সমান হয়েছে কিনা তা জানতে পারেনি, সেহেতু বিক্রয় জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রয় করার পর যদি মজলিসে থাকাবস্থায় চুক্তিকারীদ্বয় উভয় পক্ষের দ্রব্য মেপে জানতে পারে যে, তা সমান সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, মজলিসের পূর্ণ সময়কে একই মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। কাজেই যেন তারা চুক্তিকালেই সমান সমান হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেছে, কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে মজলিসের পরেও যদি তারা মেপে জানতে পারে যে, উভয় দ্রব্য সমান তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। তাঁর মতে বাস্তবে সমান সমান হওয়া শর্ত, বিক্রয়কালে চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা শর্ত নয়।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيْمَتُهَا أَلْفُ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ، وَفِىْ عُنُقِهَا طُوْقُ فِضَّةٍ قِيْمَتُهُ أَلْفُ مِثْقَالٍ بِأَلْفَىْ مِثْقَالٍ فِضَّةٍ، وَنَقَدَ مِنَ الثَّمَنِ أَلْفَ مِثْقَالٍ، ثُمَّ افْتَرَقَا فَالَّذِىْ نَقَدَ ثَمَنُ الْفِضَّةِ، لِأَنَّ قَبْضَ حِصَّةِ الطُّوْقِ وَاجِبٌ فِى الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ بَدَلَ الصَّرْفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ، وَكَذَا لَوْ إِشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَىْ مِثْقَالٍ أَلْفٍ نَسِيْئَةً وَأَلْفٍ نَقْدٍ فَالنَّقْدُ ثَمَنُ الطُّوْقِ، لِأَنَّ الْأَجَلَ بَاطِلٌ فِى الصَّرْفِ جَائِزٌ فِىْ بَيْعِ الْجَارِيَةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ عَلٰى وَجْهِ الْجَوَازِ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি দুই হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে এমন একটি দাসী বিক্রয় করে যার বাজারমূল্য এক হাজার মিছকাল রৌপ্য, আর তার গলায় একটি হার রয়েছে যার বাজারমূল্য এক হাজার মিছকাল রৌপ্য, আর ক্রেতা মূল্য থেকে এক হাজার মিছকাল নগদ প্রদান করার পর তারা উভয় পৃথক হয়ে যায়, তাহলে যা নগদ পরিশোধ করেছে তা রূপার [হারের] মূল্য ধরা হবে। কেননা, হারের মূল্য সরফ-এর চুক্তিতে বিনিময়দ্রব্য হওয়ার কারণে মজলিসেই হস্তগত করা ওয়াজিব। আর স্বাভাবিক এটাই যে, ক্রেতা ওয়াজিবই আদায় করেছে। এরূপভাবে যদি উক্ত দাসী ও তার গলার হার এক হাজার নগদ ও এক হাজার বাকি এ দু হাজার মিছকালের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে নগদ এক হাজার হারের মূল্য ধরা হবে। কেননা, 'সরফ'-এর চুক্তিতে মেয়াদ নির্ধারণ করা বাতিল, কিন্তু দাসী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েজ। আর বৈধ পন্থায় চুক্তি সম্পাদন করাই হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয়ের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً قِيْمَتُهَا أَلْفُ مِثْقَالٍ الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি একটি দাসী তার গলার এক হাজার মিছকাল ওজনের একটি রৌপ্যের হারসহ দু হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা কেবল এক হাজার মিছকাল রৌপ্য নগদ হস্তান্তর করার পর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আলোচ্য মাসআলায় দু হাজার মিছকাল থেকে এক হাজার মিছকাল হচ্ছে দাসীটির গলার হারের মূল্য, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে রৌপ্য হওয়ার কারণে এটি 'বায় সরফ', তাই এ হাজার মিছকাল নগদ হস্তান্তর করা অপরিহার্য। আর অবশিষ্ট এক হাজার মিছকাল হচ্ছে দাসীটির মূল্য। এটি 'বায় সরফ' না হওয়ার কারণে এ এক হাজার মিছকাল নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং ক্রেতা যখন এক হাজার মিছকাল নগদ হস্তান্তর করেছে এবং তা দাসীটির মূল্য হিসেবে দিয়েছে নাকি হারটির মূল্য হিসেবে দিয়েছে তা উল্লেখ করেনি তখন ধরে নেওয়া হবে যে, সে নগদ এক হাজার হারের মূল্য হিসেবে পরিশোধ করেছে। কেননা, হারের মূল্য নগদ পরিশোধ করা হচ্ছে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য অপরিহার্য, আর দাসীর মূল্য নগদ পরিশোধ করা অপরিহার্য নয়। আর স্বাভাবিকভাবে এটাই ধরে নেওয়া হবে যে, যা তার জন্য অপরিহার্য সে তাই করেছে। কেননা, চুক্তিকারী চায় তার চুক্তিটি সহীহ হোক, বাতিল না হোক।

উল্লেখ্য, যদি ক্রেতা এক হাজার মিছকাল দেওয়ার সময় এভাবে বলে যে, 'তুমি দুটির মূল্য থেকে নগদ এ এক হাজার মিছকাল গ্রহণ কর' তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং প্রদত্ত এক হাজার হারের মূল্য ধরা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে যে, 'দাসীর মূল্য হিসেবে এ এক হাজার গ্রহণ কর' তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, স্বাভাবিক হিসেবে (ظَاهِرًا) যা ধরা যেত সে স্পষ্টভাবে তার বিপরীত উল্লেখ করে দিয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ إِشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَىْ مِثْقَالٍ الخ : পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত দাসী ও তার গলার হার যদি ক্রেতা দু হাজার মিছকাল রৌপ্যের বিনিময়ে এ শর্তে ক্রয় করে যে, এক হাজার মিছকাল নগদ আর এক হাজার মিছকাল বাকি তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং নগদের শর্তটি হারটির ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে আর বাকির শর্তটি দাসীর ক্ষেত্রে ধরা হবে।

কেননা, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হারটির বিক্রয় হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ' বাকি জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে দাসীটির বিক্রয় যেহেতু 'বায় সরফ' -এর অন্তর্ভুক্ত নয় সেহেতু তা বাকি বিক্রয় জায়েজ। অতএব, যদি নগদের শর্তটি হারের ক্ষেত্রে না ধরে দাসীর ক্ষেত্রে ধরা হয়, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর হারের ক্ষেত্রে ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর ক্রেতা-বিক্রেতার এটাই কাম্য হয় যে, তাদের চুক্তিটি সঠিক হোক। সুতরাং যেভাবে ধরা হলে চুক্তিটি জায়েজ হয় সেভাবেই তারা শর্ত করেছে এটাই স্বাভাবিক হবে। কাজেই নগদের শর্তটি হারের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়ে বিক্রয়চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে।

وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُوْنَ، وَ دَفَعَ مِنَ الثَّمَنِ خَمْسِيْنَ جَازَ الْبَيْعُ، فَكَانَ الْمَقْبُوْضُ حِصَّةَ الْفِضَّةِ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذٰلِكَ لِمَا بَيَّنَّا، وَكَذٰلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هٰذِهِ الْخَمْسِيْنَ مِنْ ثَمَنِهِمَا، لِأَنَّ الْإِثْنَيْنِ قَدْ يُرَادُ بِذِكْرِهِمَا الْوَاحِدُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وَالْمُرَادُ أَحَدُهُمَا، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ حَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتّٰى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِى الْحِلْيَةِ، لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِيْهَا وَكَذَا فِى السَّيْفِ إِنْ كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ إِلَّا بِضَرَرٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ بِدُوْنِ الضَّرَرِ .

অনুবাদ : এরূপভাবে কেউ যদি রূপার কারুকাজ খচিত তলোয়ার একশত দিরহামে বিক্রয় করে, আর তার খচিত রূপার পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম হয়, আর ক্রেতা নগদ পঞ্চাশ দিরহাম পরিশোধ করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা উল্লেখ করে না দিলেও হস্তগতকৃত দিরহামগুলো খচিত রূপার মূল্য ধরা হবে। এর কারণও তাই যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। একই বিধান হবে যদি ক্রেতা [এভাবে] বলে যে, উভয়ের মূল্য থেকে এ পঞ্চাশ দিরহাম গ্রহণ কর। কেননা, [আরবি ভাষায়] কখনো কখনো দুটি উল্লেখ করে [তাদের] একটি উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–"সমুদ্র দুটি থেকে মুক্তা ও মারজান বের হয়।" অথচ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সমুদ্র থেকে [অর্থাৎ 'নোনা পানির সমুদ্র থেকে।' কেননা, মিঠা পানির সমুদ্রে মুক্তা হয় না]। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে 'উভয়ের' কথাটি 'উভয়ের একটির' অর্থে ধরে নেওয়া হবে। যদি উভয়ে তাদের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে খচিত রূপার অংশে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, রূপার অংশে চুক্তিটি 'বায় সরফ'। তদ্রূপ যদি সংযুক্ত রূপা থেকে মূল তরবারি কোনোরূপ ক্ষতিসাধন ছাড়া পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহলে তরবারির অংশেও বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন ছাড়া বিক্রেতা তরবারিটি হস্তান্তর করতে সক্ষম হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّى الخ : পূর্বের মাসআলার অনুরূপ আরেকটি মাসআলা হচ্ছে– কেউ একশত দিরহামের বিনিময়ে এমন একটি তরবারি বিক্রয় করল যাতে পঞ্চাশ দিরহাম সমপরিমাণ রৌপ্য সংযুক্ত রয়েছে। অতঃপর ক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বে কেবল পঞ্চাশ দিরহাম নগদ হস্তান্তর করল, কিন্তু সে এ কথা উল্লেখ করেনি যে, এ পঞ্চাশ দিরহাম কি তরবারির সাথে সংযুক্ত রৌপ্যের মূল্য নাকি শুধু তরবারিটির মূল্য নাকি উভয় অংশের মূল্য। তাহলে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং নগদ যে পঞ্চাশ দিরহাম হস্তান্তর করেছে তা সংযুক্ত রৌপ্যের মূল্য ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে জায়েজ হওয়ার কারণ তাই, যা আমরা এর পূর্বের মাসআলায় উল্লেখ করেছি। যার সারকথা হলো, সংযুক্ত রৌপ্যের অংশের বিক্রয় হচ্ছে 'বায় সরফ'। কাজেই তার মূল্য নগদ হস্তগত করা অপরিহার্য। আর তরবারির অংশটির বিক্রয় 'বায় সরফ' না হওয়ার কারণে তার মূল্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যক নয়। সুতরাং ক্রেতা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য যা অপরিহার্য তাই করেছে, এটাই স্বাভাবিক হিসেবে ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هٰذِهِ الْخَمْسِيْنَ مِنْ ثَمَنِهِمَا الخ : আর যদি ক্রেতা নগদ পঞ্চাশ দিরহাম দেওয়ার সময় উল্লেখ করে বলে যে, 'উভয়ের মূল্য থেকে এই পঞ্চাশ দিরহাম গ্রহণ কর' তাহলেও বিক্রয় জায়েজ হবে এবং প্রদত্ত পঞ্চাশ দিরহাম রৌপ্যের অংশের মূল্যই ধরা হবে। এর কারণ হলো, দুটি উল্লেখ করে বক্তার তন্মধ্য থেকে একটি উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ "ঐ দুটি থেকে বের হয়ে আসে মুক্তা ও মারজান।" এ আয়াতে ঐ দুটি বলে পূর্বে উল্লিখিত মিঠা পানির সমুদ্র ও নোনা পানির সমুদ্র বুঝানো হয়েছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু নোনা পানির সমুদ্র। কেননা, মিঠা পানির সমুদ্রে মুক্তা ও মারজান জন্মায় না। এরূপভাবে মালিক ইবনে হুয়াইরিছ ও তাঁর চাচাতো ভাইকে নবী করীম ﷺ বলেছেন– إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا "যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা দু-জনে আজান দিবে এবং ইক্বামাত বলবে।" এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমাদের একজন আজান দিবে এবং ইক্বামাত বলবে। এরূপ ব্যবহার মানুষের কথাবার্তায় সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং যখন দুটি উল্লেখ করে তন্মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যবহার রয়েছে তখন আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও ক্রেতার উক্তি 'উভয়ের মূল্য থেকে'-এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ধরা হবে একটির মূল্য, আর তা হচ্ছে 'রৌপ্যের অংশের মূল্য'। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হয় চুক্তিটি সঠিক হওয়া। কাজেই যে অর্থে চুক্তিটি সঠিক হয় সে অর্থ সম্ভাব্য হলে তাই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتّٰى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত সুরতে যদি রৌপ্যের অংশের মূল্য হস্তগত করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হয়ে যায় তাহলে রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর রৌপ্য ব্যতীত অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি অবশিষ্ট অংশ রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করতে ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয়ও বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করা ব্যতীত উভয় অংশ পৃথক করা সম্ভব হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় সহীহ থাকবে আর রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِيْهَا الخ : রৌপ্যের অংশের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, রৌপ্যের অংশের বিক্রয় উভয় পক্ষে রৌপ্য হওয়ার কারণে 'বায় সরফ'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর 'বায় সরফ' -এ চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। সুতরাং শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ بِدُوْنِ الضَّرَرِ : অবশিষ্ট অংশ রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করতে ক্ষতি সাধিত হলে অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া অবশিষ্ট অংশ হস্তান্তর করা সম্ভব হবে না। আর যা ক্ষতিসাধন ছাড়া হস্তান্তর করা সম্ভব হয় না তা পৃথক করার পূর্বে বিক্রয় করা জায়েজ হয় না। এ কারণেই বিক্রেতা যদি এরূপ অবস্থায় উক্ত তরবারির রৌপ্যের অংশ ছাড়া শুধু অবশিষ্ট অংশের বিক্রয়চুক্তি করত, তাহলে তা জায়েজ হতো না।

وَلِهٰذَا لَا يَجُوْزُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَالْجِذْعِ فِى السَّقْفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ السَّيْفُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِى السَّيْفِ وَبَطَلَ فِى الْحِلْيَةِ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فَصَارَ كَالطَّوْقِ وَالْجَارِيَةِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَزْيَدَ مِمَّا فِيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَا يُدْرٰى لَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ لِلرِّبٰوا أَوْ لِاِحْتِمَالِهِ، وَجِهَةُ الصِّحَّةِ مِنْ وَجْهٍ، وَجِهَةُ الْفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ، فَتَرَجَّحَتْ ـ

অনুবাদ : এ কারণেই এরূপ ক্ষেত্রে তরবারিটি পৃথকভাবে [রূপার অংশ ছাড়া] বিক্রয় করা জায়েজ নয়; যেমন ঘরের চালের কড়িকাঠ [চালের সাথে যুক্ত থাকাবস্থায় বিক্রয় করা জায়েজ নয়]। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ততা ছাড়া তরবারিটি রৌপ্যের অংশ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়, তাহলে তরবারির অংশে বিক্রয়চুক্তিটি বৈধ থাকবে। আর খচিত রৌপ্যের অংশে বাতিল হবে। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে তরবারিটি পৃথকভাবে বিক্রয় করা সম্ভব। কাজেই এটা [বৈধতার ক্ষেত্রে] দাসী ও তার গলার হারের মতো হলো। তবে এ বৈধতার বিধান তখন হবে, যখন [ক্রেতার প্রদেয়] পৃথক রূপা তরবারির সাথে সংযুক্ত রূপার চেয়ে বেশি হবে। পক্ষান্তরে যদি তা তরবারির রূপার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা তার পরিমাণ অজানা থাকে, তাহলে 'রিবা'-এর কারণে কিংবা 'রিবা'-এর সম্ভাবনার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। আর [পরিমাণ অজানার ক্ষেত্রে] চুক্তি সঠিক হওয়ার দিক হলো একটি, আর ফাসিদ হওয়ার দিক হচ্ছে দুটি। কাজেই ফাসিদ হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَالْجِذْعِ فِى السَّقْفِ : উক্ত সুরতের একটি উদাহরণ হলো, কেউ যদি তার ঘরের চালের সাথে সংযুক্ত থাকাবস্থায় চালের একটি কড়িকাঠ বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না। কেননা, উক্ত কড়িকাঠটি হস্তান্তর করতে গেলে বিক্রেতার চালের ক্ষতি সাধিত হবে। অবশ্য যদি এমন অবস্থায় থাকে যে, কড়িকাঠটি সরিয়ে নিলে কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ السَّيْفُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ الخ : আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যদি রৌপ্যের অংশ থেকে অবশিষ্ট তরবারি পৃথক করতে কোনো ক্ষতি সাধিত না হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট তরবারিটি কোনো প্রকার ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই ক্রেতাকে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা থাকছে না। এ কারণেই এরূপ সুরতে যদি বিক্রেতা কেবল অবশিষ্ট তরবারিটি বিক্রয় করে, তাহলে তা জায়েজ হয়। এ সুরতে তরবারির উভয় অংশ [রৌপ্যের অংশ ও অবশিষ্ট তরবারি] -এর বিষয়টি এর পূর্বের মাসআলায় উল্লিখিত দাসী ও তার গলার হারের মতোই হলো। সেক্ষেত্রে যেরূপ গলার হারের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার সুরতে দাসীর বিক্রয় সহীহ হিসেবে বহাল রয়েছে। সেরূপ এ ক্ষেত্রেও রৌপ্যের অংশে বিক্রয় বাতিল হওয়ার সুরতে অবশিষ্ট তরবারিতে বিক্রয় সহীহ থাকবে। কেননা, উভয় সুরতেই কারণ একই; তা হলো, একটি থেকে অপরটি পৃথক করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَزْيَدَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তরবারি বিক্রয়ের মাসআলায় আমরা যে বিস্তারিত বিধান উল্লেখ করেছি তা কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মূল্য হিসেবে ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের পরিমাণ তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়। কেননা, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া শর্ত। কাজেই তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য থেকে সমপরিমাণ ধরা হবে আর বেশিটুকু অবশিষ্ট তরবারির মূল্য হিসেবে ধরা। এভাবে চুক্তিটি জায়েজ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের চেয়ে বেশি না হয়; বরং তার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা এমন হয় যে সমান নাকি কম তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা নেই, তাহলে সম্পূর্ণ চুক্তিটিই নাজায়েজ হবে। কেননা, প্রথম দুই সুরতে অর্থাৎ ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির সাথে যুক্ত রৌপ্যের সমান হলে কিংবা কম হলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হচ্ছে। সমান হলে 'রিবা' হচ্ছে এভাবে যে, ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের বিনিময়ে যখন সে তরবারির সাথে যুক্ত সমপরিমাণ রৌপ্য পাচ্ছে তখন তরবারির অবশিষ্ট অংশ সে অতিরিক্ত পাচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে 'রিবা'।

আর ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য কম হলে 'রিবা' হচ্ছে এভাবে যে, ক্রেতা তার দেওয়া রৌপ্যের বিনিময়ে তার চেয়ে বেশি রৌপ্য তরবারির সাথে পাচ্ছে, উপরন্তু তরবারির অবশিষ্ট অংশও পাচ্ছে। কাজেই দুভাবে সে অতিরিক্ত পাচ্ছে। সুতরাং তা 'রিবা' [সুদ] হবে।

আর তৃতীয় সুরত অর্থাৎ ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির রৌপ্যের সমান নাকি কম তা ক্রেতা ও বিক্রেতার জানা নেই, এ সুরতে বিক্রয় জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, এ সুরতে 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, যখন ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য কম নাকি বেশি তা জানা নেই তখন তা কমও হতে পারে, আবার বেশিও হতে পারে কিংবা সমানও হতে পারে। যদি তা বেশি হয় তাহলে তো 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না, কিন্তু সমান বা কম হলে 'রিবা' সাব্যস্ত হবে, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ সুরতে 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, 'রিবা' [সুদ]-এর ক্ষেত্রে 'রিবা' হওয়ার সন্দেহ বা সম্ভাবনা থাকলে তা কার্যত 'রিবা' হয়েছে বলে গণ্য হয়ে বিক্রয় হারাম হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে 'রিবা'-এর সম্ভাবনা থাকার কারণে বিক্রয় হারাম হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَجِهَةُ الصِّحَّةِ مِنْ وَجْهٍ، وَجِهَةُ الْفَسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্যের পরিমাণ তরবারির রৌপ্যের সমান নাকি কমবেশি তা চুক্তিকারীদ্বয়ের জানা না থাকে, তাহলে তো বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কথা। কেননা, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক (اَلْأَصْلُ) হচ্ছে জায়েজ হওয়া। আর হারাম হয় 'রিবা' সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পক্ষে অতিরিক্ত আছে বলে জানা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম সাব্যস্ত হবে না; বরং জায়েজ হিসেবে থাকবে।

উত্তরের সারকথা হলো, না জানার সুরতে মোট তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে– ক্রেতা প্রদত্ত রৌপ্য তরবারির রৌপ্যের চেয়ে বেশি হওয়া, তার চেয়ে কম হওয়া ও উভয়টি সমান হওয়া। এ তিনটির মধ্যে একটি সুরতে অর্থাৎ বেশি হওয়ার সুরতে বিক্রয় জায়েজ আর দুটি সুরতে তথা কম ও সমান হওয়ার সুরতে বিক্রয় নাজায়েজ। সুতরাং তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি হচ্ছে জায়েজ হওয়ার সুরত আর দুটিই হচ্ছে নাজায়েজ হওয়ার সুরত। অতএব, জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে নাজায়েজ হওয়ার সম্ভাবনার দিক বেশি হওয়ার কারণে নাজায়েজ হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) যে অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'রিবা'-এর ক্ষেত্রে যদি শুধু 'রিবা' হওয়ার সন্দেহ বা সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলেই বিক্রয় হারাম হয়। সুতরাং না জানার সুরতে যেহেতু 'রিবা' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেহেতু বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে।

তাছাড়া মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লিখিত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যে দুটি কারণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এর প্রতিটি হচ্ছে বিক্রয় হারাম হওয়ার 'কারণ' (عِلَّتْ) । আর যা বিধানের জন্য 'কারণ' (عِلَّتْ) হয় তা অগ্রাধিকার দেওয়ার ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হতে পারে না। অবশ্য শামসুল আয়িম্মা আল্ কারদারী এ প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়; বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উক্ত দুটি সম্ভাবনার যে কোনো একটি থাকলেই যখন বিক্রয় হারাম হতো তখন দুটি বিদ্যমান থাকায় তো অধিক যুক্তিসঙ্গতভাবে বিক্রয় হারাম হবে।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ، وَصَحَّ فِيمَا قَبَضَ، وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ صَرْفٌ كُلُّهُ فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ شَرْطُهُ وَبَطَلَ فِيمَا لَمْ يُوجَدْ، وَالْفَسَادُ طَارٍ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ ثُمَّ يَبْطُلُ بِالْاِفْتِرَاقِ فَلَا يَشِيعُ، وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فِي الْإِنَاءِ وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ، وَلَا خِيَارَ لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি একটি রৌপ্যের পাত্র বিক্রয় করে অতঃপর তার আংশিক মূল্য হস্তগত করার পর তারা পৃথক হয়ে যায় তাহলে যে অংশের মূল্য হস্তগত করেনি সে অংশের বিক্রয় বাতিল হবে। আর যে অংশের মূল্য হস্তগত করেছে সে অংশের বিক্রয় সঠিক হবে। আর পাত্রটি উভয়ের মাঝে শরিকানা হবে। কেননা, চুক্তিটি সম্পূর্ণই 'বায় সরফ'। সুতরাং যে অংশে 'বায় সরফ'-এর শর্ত পাওয়া গেছে সে অংশে তা সঠিক হবে, আর যে অংশে শর্ত পাওয়া যায়নি সে অংশে চুক্তি বাতিল হবে। ফাসিদ হওয়ার কারণটি [চুক্তি সম্পাদনের] পরে সম্পৃক্ত হয়েছে। কেননা, চুক্তিটি প্রথমে সঠিক হিসেবে সম্পাদিত হওয়ার পর পৃথক হওয়ার দ্বারা বাতিল হচ্ছে। কাজেই ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অংশে বিস্তৃতি লাভ করবে না। আর যদি পাত্রটির কোনো অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করবে; সে ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট অংশের মূল্য দিয়ে তা নিয়ে নিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে [তার অংশও] ফেরত দিতে পারবে। কেননা, পাত্রের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব একটি দোষ। কেউ যদি রৌপ্যের টুকরা বিক্রয় করে, অতঃপর তার কিছু অংশের হকদার বের হয়ে আসে তাহলে ক্রেতা অবশিষ্ট অংশ তার মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে, এ ক্ষেত্রে তার কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না। কেননা, তা খণ্ডিত করায় কোনো ক্ষতি হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا الخ : অর্থাৎ কেউ যদি একটি রৌপ্যের পাত্র স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের আংশিক নগদ পরিশোধ করে, আর অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হয়ে যায় তাহলে বিধান হলো, যতটুকু অংশ নগদ পরিশোধ করেছে পাত্রের ততটুকু অংশের বিক্রয় জায়েজ ও কার্যকর হবে, আর অবশিষ্ট অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর পাত্রটি উভয়ের মাঝে শরিকানা হিসেবে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বিক্রেতা পাত্রটি একশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল, অতঃপর ক্রেতা কেবল পঞ্চাশ দিরহাম নগদ পরিশোধ করার পর তারা পৃথক হয়ে গেল তাহলে পঞ্চাশ দিরহাম যেহেতু মোট মূল্যের অর্ধেক সেহেতু পাত্রটির অর্ধেকের বিক্রয় সহীহ হবে, আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ফলে ক্রেতা পাত্রটির অর্ধেকের মালিক হবে, আর বিক্রেতা অর্ধেকের মালিক থাকবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرْفٌ كُلُّهُ فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ الخ : মাসআলাটির দলিল হলো, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ' সম্পাদিত হওয়ার পর তা সহীহ হিসেবে বহাল থাকার জন্য শর্ত হলো, চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা। কাজেই যে অংশের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সে অংশের ক্ষেত্রে শর্ত পূরণ হওয়ার কারণে বিক্রয় সহীহ থাকবে আর যে অংশের মূল্য পরিশোধ করা হয়নি সে অংশের বিক্রয় শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْفَسَادُ طَارٍ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ ثُمَّ يَبْطُلُ بِالْاِفْتِرَاقِ الخ : এখান থেকে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, যখন পাত্রটি কিছু অংশের মূল্য নগদ হস্তান্তর না করার কারণে সে অংশের বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেছে তখন তো একই চুক্তি হওয়ার কারণে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি পাত্রের অপর অংশেও বিস্তৃতি লাভ করার কথা এবং সম্পূর্ণ পাত্রের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কথা।

জবাবের সারকথা এই যে, ফাসিদ দু ধরনের হয়ে থাকে–

১. فَسَادٌ فِى الْأَصْلِ 'চুক্তির মূলের মাঝে ফাসিদ হওয়া।'

২. فَسَاد طَارٍ 'পরবর্তীতে যুক্ত কোনো কারণে ফাসিদ হওয়া।'

ফাসিদ হওয়ার কারণটি যদি চুক্তির সূচনাতেই বিদ্যমান হয়, তাহলে সেটি হচ্ছে প্রথম প্রকার ফাসিদ অর্থাৎ فَسَادٌ فِى الْأَصْلِ [ফাসাদ ফিল আসল] আর যদি প্রথম চুক্তিটি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর ফাসিদ হওয়ার কারণ যুক্ত হয়, তাহলে সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার ফাসিদ অর্থাৎ فَسَاد طَارٍ [ফাসাদে তরি]।

যদি প্রথম প্রকারের ফাসিদ হয় তাহলে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ বিক্রেয় বস্তুতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সম্পূর্ণ চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় প্রকারের ফাসিদ হলে অর্থাৎ চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো কারণ যুক্ত হওয়ার ফলে বিক্রয় ফাসিদ হয় তাহলে কেবল যে অংশে কারণটি যুক্ত হবে সে অংশের বিক্রয় ফাসিদ হয়। এ ক্ষেত্রে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি অন্য অংশে বিস্তৃতি লাভ করে না। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু পাত্রটির বিক্রয় প্রথমে সহীহভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তীতে কিছু অংশের মূল্য নগদ হস্তগত না করার কারণে ফাসিদ হওয়ার কারণ যুক্ত হয়েছে, সেহেতু এটি দ্বিতীয় প্রকারের ফাসিদ (فَسَاد طَارٍ)। কাজেই তা অপর অংশে বিস্তৃতি লাভ করবে না। সুতরাং যে অংশের মূল্য নগদ হস্তগত করা হয়েছে সে অংশের বিক্রয় সহীহ থাকবে।

উল্লেখ্য, এখানে কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, আলোচ্য সুরতে তো তাহলে চুক্তিটির মাঝে বিভক্তি (تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ) করা হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রয়কৃত বস্তুর অর্ধেকের বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে আর অর্ধেকের বিক্রয় কার্যকর হচ্ছে না। আর এরূপ বিভক্তির ক্ষেত্রে তো ক্রেতার নেওয়া বা না নেওয়ার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয় অথচ আলোচ্য সুরতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কারোই ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত করা হয়নি। এর উত্তর হলো, ফাসিদ হওয়ার কারণটি চুক্তিকারীদ্বয়ের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে। কেননা, তাদের পরস্পরে হস্তান্তর না করার কারণে ফাসিদ হয়েছে। সুতরাং তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কারো নিজের কার্যের ফলে চুক্তির মাঝে বিভক্তি হলে তার ইচ্ছাধিকার সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ الخ : উল্লিখিত পাত্র বিক্রয়ের মাসআলাটির সুরত যদি এরূপ হয় যে, ক্রেতা পাত্রটি ক্রয় করার পর দেখা গেল বিক্রেতা সম্পূর্ণ অংশের মালিক ছিল না; বরং পাত্রটির কিছু অংশের মালিক অন্য এক ব্যক্তি, তাহলে বিধান হলো, ক্রেতা এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাধিকার পাবে, সে চাইলে বিক্রেতা যে অংশের মালিক ছিল সে অংশের মূল্যের বিনিময়ে শুধু সে অংশের মালিকানা লাভ করবে। আর তা না চাইলে বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করে পাত্রটি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। [অর্থাৎ পূর্বের সুরত এবং এ সুরতের মাঝে বিধানগত এ পার্থক্য হলো যে, পূর্বের সুরতে পাত্রের কিছু অংশের বিক্রয় সহীহ হয়েছে কিন্তু ক্রেতা কোনো ইচ্ছাধিকার (خِيَارٌ) লাভ করেনি, আর এ সুরতেও কিছু অংশের বিক্রয় সহীহ হয়েছে কিন্তু ক্রেতা ইচ্ছাধিকার লাভ করেছে।] এর কারণ হলো, এ সুরতে যখন তৃতীয় ব্যক্তির কিছু অংশের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তখন পাত্রটি তৃতীয় ব্যক্তির মাঝে এবং ক্রেতার মাঝে শরিকানা হয়ে যাচ্ছে। আর একীভূত বস্তুর মাঝে শরিকানা সাব্যস্ত হওয়া বস্তুর ত্রুটি বলে গণ্য হয়। কাজেই ক্রেতা এ ক্ষেত্রে পাত্রটি ক্রয় করার পর তাতে ত্রুটি পেয়েছে এবং এ ত্রুটি তার কোনো কাজের দরুন সংঘটিত হয়নি। সুতরাং সে তা خِيَار عَيْب ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে পূর্বের সুরতে যদিও পাত্রটির মাঝে শরিকানা সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু তা হয়েছে ক্রেতা ও বিক্রেতার পক্ষ থেকে অর্থাৎ মূল্য নগদ হস্তান্তর না করার কারণে। সুতরাং তাদের কেউই ইচ্ছাধিকার পাবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ :মাসআলা হলো, কেউ যদি রৌপ্যের টুকরা বিক্রয় করে, অতঃপর দেখা যায় যে বিক্রেতা সম্পূর্ণ টুকরাটির মালিক ছিল না; বরং অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত টুকরাটির কিছু অংশের মালিক, তাহলে বিধান হলো বিক্রেতা যতটুকুর মালিক ছিল ক্রেতা কেবল ততটুকুর মূল্য পরিশোধ করে তা নিয়ে নিবে, আর বাকিটুকু যার মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তাকে দিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার পাবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيْضُ : এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছাধিকার না পাওয়ার কারণ হলো, রৌপ্যের টুকরা কেটে ভাগ করে নিলে তাতে কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে শরিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হবে না। সুতরাং ক্রেতার ফেরত দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَ دِيْنَارًا بِدِرْهَمٍ وَ دِيْنَارَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ، وَجُعِلَ كُلُّ جِنْسٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ، وَقَالَ زُفَرُ (رح) وَالشَّافِعِيُّ (رح) : لَا يَجُوْزُ، وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا بَاعَ كُرَّ شَعِيْرٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرَّيْ حِنْطَةٍ وَكُرَّيْ شَعِيْرٍ لَهُمَا أَنَّ فِي الصَّرْفِ إِلٰى خِلَافِ الْجِنْسِ تَغْيِيْرَ تَصَرُّفِهِ، لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ، وَمِنْ قَضِيَّتِهِ الْاِنْقِسَامُ عَلَى الشُّيُوْعِ لَا عَلَى التَّعْيِيْنِ، وَالتَّغْيِيْرُ لَا يَجُوْزُ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ تَصْحِيْحُ التَّصَرُّفِ، كَمَا إِذَا اشْتَرٰى قُلْبًا بِعَشَرَةٍ وَثَوْبًا بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُمَا مُرَابَحَةً لَا يَجُوْزُ، وَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُ الرِّبْحِ إِلَى الثَّوْبِ .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি দিনার বিক্রয় করে একটি দিরহাম ও দুটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ঐ দুটি শ্রেণীর প্রতিটি তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময়ে ধরা হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম যুফার (র.) বলেন, বিক্রয় জায়েজ হবে না। একই মতপার্থক্য হবে যদি কেউ এক 'কুর' যব এবং এক 'কুর' গম বিক্রয় করে দুই 'কুর' গম এবং দুই 'কুর' যবের বিনিময়ে। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, প্রতিটিকে তার বিপরীত শ্রেণীর বিনিময়ে সাব্যস্ত করার অর্থ হচ্ছে, চুক্তিকারীর প্রয়োগকে পরিবর্তন করা। কেননা, চুক্তিকারী সম্পূর্ণ মূল্যবস্তুকে সম্পূর্ণ ক্রয়কৃত বস্তুর বিনিময়ে সাব্যস্ত করেছে। আর তার এই সাব্যস্তকরণের দাবি হচ্ছে মূল্যবস্তু ক্রয়কৃত বস্তুর উপর সর্বব্যাপীরূপে বণ্টিত হবে; নির্দিষ্টরূপে নয়। আর চুক্তিকারীর প্রয়োগের মাঝে পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়, যদিও তাতে চুক্তিটি শুদ্ধ করার ফায়দা অর্জিত হয়। যেমন– কেউ যদি একটি 'বালা' দশ দিরহামে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামে ক্রয় করে, অতঃপর সে উভয়টিকে একই বিক্রয়চুক্তিতে 'মুরাবাহাহ' [ক্রয়মূল্যের উপর নির্দিষ্ট লাভের শর্তে বিক্রয়]-এর ভিত্তিতে বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না, যদিও এ ক্ষেত্রে মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত [করে বিক্রয়কে বৈধ সাব্যস্ত] করা সম্ভব ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَ دِيْنَارًا الخ : অর্থাৎ কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি দিনার বিক্রয় করে একটি দিরহাম ও দুটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের দুই দিরহামকে অপর পক্ষের দুই দিনারের বিনিময়ে ধরা হবে আর প্রথম পক্ষের এক দিনারকে অপর পক্ষের দুই দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, যদি এক পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিরহামই ধরা হয়, তাহলে রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয়ে কমবেশি হওয়ার কারণে 'রিবা' (সুদ) সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রয় হারাম হবে। এরূপভাবে দিনারের ক্ষেত্রেও কমবেশি হওয়ার কারণে বিক্রয় হারাম হবে। তাই চুক্তিকারীদের চুক্তি যথাসম্ভব সহীহ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে দিরহামের বিনিময়ে দিনার আর দিনারের বিনিময়ে দিরহাম ধরা হবে। তাহলে 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না। কেননা, রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা হলে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الْخِلَافِ إِذَا بَاعَ كُرَّ شَعِيْرٍ الخ : অনুরূপভাবে কেউ যদি এক 'কুর' যব ও এক 'কুর' গম বিক্রয় করে দুই 'কুর' যব ও দুই 'কুর' গমের বিনিময়ে, তাহলে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রেও পূর্বের মতো বিক্রয়কে সহীহ

সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রথম পক্ষের যবকে অপর পক্ষের গমের বিনিময়ে ধরা হবে, আর প্রথম পক্ষের গমকে অপর পক্ষের যবের বিনিময়ে ধরা হবে। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

মূল কথা হলো, যদি 'রিবা' -এর দ্রব্যাদির মধ্য থেকে একাধিক শ্রেণীর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা হয় আর সুরত এমন হয় উভয় দিকের একই শ্রেণীর দ্রব্য একটির বিনিময়ে অপরটি ধরা হলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের মতে এক পক্ষের এক শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য ধরা হবে, যাতে চুক্তিটি সহীহ সাব্যস্ত হতে পারে। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এরূপ ধরা হবে না; বরং চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ فِى الصَّرْفِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো, যদি উক্ত সুরতগুলোতে এক শ্রেণীর দ্রব্য অপর শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে ধরা হয়, তাহলে চুক্তিকারীদ্বয় চুক্তিটি যেভাবে সম্পাদন করেছে তার মাঝে পরিবর্তন এসে যায়। আর চুক্তি সহীহ সাব্যস্ত করার জন্যও চুক্তিকারীদের কৃত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাব্যস্ত করা জায়েজ নয়। পরিবর্তন আসে এভাবে যে, চুক্তিকারীদ্বয় এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে। কেননা, দিরহাম ও দিনারের মাসআলায় প্রথম পক্ষ তার দুই দিরহাম ও এক দিনার এ মোট তিনটি বিক্রয় করেছে অপর পক্ষের দুই দিনার ও এক দিরহামের বিনিময়ে। আর এর দাবি হচ্ছে, বিনিময় ও বণ্টন সাব্যস্ত হবে অনির্দিষ্টভাবে বিস্তৃতির ভিত্তিতে (عَلَى الشُّيُوْعِ)। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের প্রদত্ত দুই দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিরহাম বা দিনারের কোনো অংশ নির্দিষ্ট হবে না; বরং সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনারের মাঝে তার অনির্দিষ্টভাবে অংশ সাব্যস্ত হবে। এরূপভাবে প্রথম পক্ষের দিনারের বিপরীতেও অপর পক্ষের দিরহাম ও দিনার উভয়টির মাঝেই অনির্দিষ্টভাবে অংশ সাব্যস্ত হবে।

সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে বিস্তৃতির ভিত্তিতে বিনিময় সাব্যস্ত হয় তার দলিল হচ্ছে, কেউ যদি একটি গোলাম ও একটি দাসী ক্রয় করে একটি কাপড় ও একটি ঘোড়ার বিনিময়ে, অতঃপর দেখা গেল ক্রয়কৃত গোলামটির মালিক প্রকৃতপক্ষে অন্য এক ব্যক্তি, তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা মূল্য ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। আর এ অধিকার মূল্য হিসেবে তার দেওয়া কাপড় ও ঘোড়া উভয়টির মাঝে সাব্যস্ত হবে। যদি বিস্তৃতির ভিত্তিতে (عَلَى الشُّيُوْعِ) বিনিময় সাব্যস্ত না হতো, তাহলে ক্রেতা উভয়টির মাঝে ফেরত নেওয়ার অধিকার লাভ করত না। সুতরাং বুঝা গেল যে, সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিস্তৃতির ভিত্তিতে বিনিময় সাব্যস্ত হয়। অতএব, আমাদের আলোচ্য সুরতে চুক্তিকারীদ্বয় যেহেতু তাদের এক পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যকে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করে ক্রয়-বিক্রয় করেছে সেহেতু দিরহামকে দিনারের বিনিময়ে নির্দিষ্ট করা হলে তারা যেভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছে তার মাঝে পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়। এমনকি পরিবর্তনের মাধ্যমে যদি চুক্তিটি সহীহ করা সম্ভব হয় তবুও তা জায়েজ নয়।

নিম্নে ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে 'চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে যে তা সহীহ করার জন্যও পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়' তার প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে–

كَمَا إِذَا اشْتَرَى قُلْبًا بِعَشَرَةٍ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত কয়েকটি উদাহরণের প্রথম উদাহরণটি উপস্থাপন করা হচ্ছে– প্রথম উদাহরণ হলো, কেউ যদি দশ দিরহাম সমপরিমাণ ওজনের একটি রূপার বালা দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং একটি কাপড় দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে অতঃপর উভয়টিকে একত্রে লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় (بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) করে অর্থাৎ এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি যে মূল্যে এ দুটি ক্রয় করেছি তার চেয়ে পাঁচ দিরহাম লাভের ভিত্তিতে আমি তোমার নিকট উভয়টি বিক্রয় করলাম, তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ হলো, বালাটির ওজন হচ্ছে দশ দিরহাম এবং ক্রয়মূল্যও দশ দিরহাম এখন এটাকে যদি লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় করা হয় তাহলে মূল্য হবে দশ দিরহামের চেয়ে বেশি ফলে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, বালাটিও রৌপ্যের এবং প্রদত্ত মূল্য দিরহামও হচ্ছে রৌপ্যের, কাজেই কমবেশি করে বিক্রয় করায় 'রিবা' হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। অথচ যদি চুক্তির মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ হতো তাহলে এ ক্ষেত্রে লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বালাটিকে লাভমুক্ত ধরা যেত, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যেত। অথচ কারো মতেই এভাবে পরিবর্তন করে বিক্রয়কে জায়েজ করা হয়নি। সুতরাং বুঝা গেল চুক্তি সহীহ করার উদ্দেশ্যেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন সাধন করা যাবে না।

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ مِنَ الْبَائِعِ مَعَ عَبْدٍ آخَرَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ لَا يَجُوزُ فِي الْمُشْتَرَى بِأَلْفٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِصَرْفِ الْأَلْفِ إِلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ : بِعْتُكَ أَحَدَهُمَا لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِصَرْفِهِ إِلَى عَبْدِهِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا يُصْرَفُ الدِّرْهَمُ إِلَى الثَّوْبِ لِمَا ذَكَرْنَا ـ

অনুবাদ : এরূপভাবে কেউ যদি এক হাজার দিরহামে একটি দাস ক্রয় করে অতঃপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই আরেকটি দাসের সাথে মিলিয়ে উভয়কে বিক্রেতার নিকটই পুনরায় দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহলে এক হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয়কৃত দাসের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিটি নাজায়েজ হয়। যদিও উক্ত দাসের সাথে এক হাজার দিরহাম সম্পৃক্ত করে চুক্তিটি বৈধ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল, এরূপভাবে যদি নিজের গোলাম এবং অন্যের গোলাম একত্রিত করে এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি তোমার নিকট এ দুটি গোলামের একটি বিক্রয় করলাম তাহলে বিক্রয় জায়েজ হয় না; যদিও এ ক্ষেত্রে তার বক্তব্য নিজের গোলামের দিকে সম্পৃক্ত করে চুক্তিটি বৈধ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল। তদ্রূপ যদি কেউ একটি দিরহাম এবং একটি কাপড় বিক্রয় করে এক দিরহাম এবং একটি কাপড়ের বিনিময়ে অতঃপর হস্তগত করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যায়; দিরহামটি [মূল্য হিসেবে] কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় না। এসব ক্ষেত্রে কারণ তা-ই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, কেউ যদি একটি গোলাম এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে অতঃপর বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই গোলামটির সাথে আরেকটি গোলাম একত্র করে বিক্রেতার কাছেই দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে এক হাজার দিরহামে ক্রয়কৃত গোলামটির ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ হলো, দুটি গোলামের মূল্য যখন দেড় হাজার দিরহাম সাব্যস্ত করা হয়েছে তখন একটির মূল্য পড়েছে সাড়ে সাত শত দিরহাম। আর 'বিক্রয় অধ্যায়' -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বস্তু ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই বিক্রেতার নিকট পুনরায় তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ নয়। আর আলোচ্য সুরতে তাই করা হয়েছে। অথচ এ সুরতেও যদি দেড় হাজার দিরহাম থেকে এক হাজার দিরহাম প্রথম গোলামটির বিনিময়ে ধরা হয় আর পাঁচ শত দিরহাম অপর গোলামটির বিনিময়ে ধরা হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কথা। কিন্তু জায়েজ না হওয়ার কারণ এটাই যে, তাতে চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন সাধন করা হয়। কেননা, তারা উভয় গোলামের বিনিময়ে দেড় হাজার দিরহাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই একটি গোলামের জন্য মূল্যের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করা হলে তাতে পরিবর্তন করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ الخ : তৃতীয় উদাহরণ হলো, কেউ যদি নিজের মালিকানাধীন একটি গোলাম ও অন্য এক ব্যক্তির গোলাম একত্র করে কারো নিকট এভাবে বিক্রয় করে যে, আমি তোমার নিকট এ দুটি গোলামের একটি বিক্রয় করলাম, তাহলে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। কারণ, সে এমন জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা তার মালিকানাধীন নয়। অথচ এ ক্ষেত্রেও যদি চুক্তিতে পরিবর্তন করা জায়েজ হতো, তাহলে বিক্রয়ের বিষয়টি তার মালিকানাধীন গোলামটির সাথে সম্পৃক্ত করে বিক্রয়কে সহীহ সাব্যস্ত করা যেত। সুতরাং বুঝা গেল চুক্তি সহীহ করার উদ্দেশ্যেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَكَذَا إِذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَثَوْبًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ الخ : চতুর্থ উদাহরণ হলো, কেউ যদি একটি দিরহাম ও একটি কাপড় বিক্রয় করে অপর পক্ষের একটি দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে অতঃপর তারা উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বেই পরস্পরে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে উভয় পক্ষের দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ হলো, উভয় পক্ষের দিরহামের ক্ষেত্রে বিক্রয়টি হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা শর্ত। অথচ এ ক্ষেত্রেও যদি চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে তাদের চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে পরিবর্তন সাধন করা জায়েজ হতো, তাহলে প্রত্যেক পক্ষের দিরহামকে অপর পক্ষের কাপড়ের বিনিময়ে সাব্যস্ত করে দিরহামের ক্ষেত্রেও বিক্রয়কে সহীহ রাখা যেত। কেননা, তাহলে বিক্রয়টি 'বায় সরফ' হতো না, কাজেই নগদ হস্তগত না করার কারণে বিক্রয় ফাসেদ হতো না।

قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য হলো, উপরিউক্ত চারটি মাসআলায় সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় নাজায়েজ। আর এ নাজায়েজ হওয়ার কারণ তো এটাই যে, চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে তাদের চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে পরিবর্তন আনা জায়েজ নয়। অন্যথা প্রতিটি মাসআলায়ই পরিবর্তন এনে জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, চুক্তি সহীহ করার জন্য হলেও চুক্তিকারীদ্বয়ের সম্পাদিত চুক্তিতে পরিবর্তন আনা যাবে না।

وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ، وَإِنَّهُ طَرِيقٌ مُتَعَيِّنٌ لِتَصْحِيحِهِ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَفِيهِ تَغْيِيرُ وَصْفِهِ لَا أَصْلِهِ، لِأَنَّهُ يَبْقَى مُوجَبُهُ الْأَصْلِيُّ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هٰذَا كَمَا إِذَا بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى نَصِيبِهِ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ ـ

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, নিঃশর্তরূপে বিপরীতে সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন– সমশ্রেণীর বস্তুর বিপরীতে সমশ্রেণীর বস্তু সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে [এরূপই হয়ে থাকে]। আর আলোচ্য চুক্তিকে বৈধতা দানের জন্য 'এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত করা' হচ্ছে একমাত্র পন্থা। কাজেই চুক্তিকারীর চুক্তিকে বৈধ করার জন্য তার 'নিঃশর্ত সাব্যস্তকরণকে' এককের বিপরীতে একক সাব্যস্ত করার উপরই প্রয়োগ করা হবে। আর এতে চুক্তিকে কেবল গুণগত দিক থেকে পরিবর্তন করা হচ্ছে; চুক্তির সত্তাগত পরিবর্তন করা হচ্ছে না। কেননা, চুক্তির বিধানগত মূল দাবি বহাল থাকছে। আর তা হচ্ছে, সমগ্রের বিনিময়ে সমগ্রের মাঝে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া। আর এটা ঐ মাসআলার মতো হলো যে, কেউ তার মাঝে এবং অন্যের মাঝে শরিকানা গোলামকে বিক্রয় করল, তাহলে চুক্তিটির বৈধতার স্বার্থে বিক্রয় তার অংশের সাথেই সম্পর্কিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করছেন। আমাদের দলিল হলো, আমাদের আলোচ্য মাসআলায় চুক্তিকারীদ্বয় তাদের এক পক্ষের দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের দ্রব্য সাব্যস্ত করেছে নিঃশর্ত (مطلق) ভাবে। অর্থাৎ তারা এটা স্পষ্ট করেনি যে, এ ক্ষেত্রে–

১. এক পক্ষের সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনার অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দিরহাম ও দিনারের বিনিময়ে [পূর্বে উল্লিখিত বিস্তৃতির ভিত্তিতে]।
২. নাকি প্রথম পক্ষের দিরহাম অপর পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে আর প্রথম পক্ষের দিনার অপর পক্ষের দিনারের বিনিময়ে।
৩. নাকি প্রথম পক্ষের দিরহাম হচ্ছে অপর পক্ষের দিনারের বিনিময়ে, আর প্রথম পক্ষের দিনার হচ্ছে অপর পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে।

চুক্তিকারীদ্বয় কেবল বিনিময় সাব্যস্ত করেছে, কিন্তু এ তিনটি সম্ভাবনার কোনোটি তারা নির্দিষ্ট করেনি। কাজেই তিনটির যে কোনোটি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে আলোচ্য মাসআলায় যদি প্রথম পক্ষ বিক্রয়ের সময় এ তিনটির কোনো একটি তার উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ উল্লেখ করে, তাহলে তা সঠিক হয়। যেমন– সে যদি বলে যে, আমি এ দুই দিরহাম ও এক দিনার তোমার নিকট এক দিরহাম ও দুই দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম এভাবে যে, দিরহাম দুটি হলো তোমার দিনারটির বিনিময়ে আর আমার দিনারটি হলো তোমার দিরহাম দুটির বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় [সকলের মতে] জায়েজ হয়। এ ক্ষেত্রে তার প্রথম কথায় যদি পরবর্তী ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকত, তাহলে তার পরবর্তী ব্যাখ্যা কার্যকর গণ্য হতো না। সুতরাং বুঝা গেল আমাদের আলোচ্য মাসআলায় উল্লিখিত তিনটি সুরতের যে কোনোটি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। [উল্লেখ্য, উক্ত তিনটি সুরতের প্রথমটি হলো, مُقَابَلَةُ الْكُلِّ بِالْكُلِّ আর দ্বিতীয়টি হলো, مُقَابَلَةُ الْفَرْدِ

بِالْفَرْدِ مِنْ جِنْسِهِ আর তৃতীয়টি হলো, مُقَابَلَةُ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ। এর মধ্যে প্রথম দুটির কোনোটি তাদের উদ্দেশ্য ধরা হলে বিক্রয় নাজায়েজ হয় আর শেষেরটি ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তৃতীয়টি তাদের উদ্দেশ্য বলে ধরা হবে।

উল্লেখ্য, উপরের বর্ণনা অনুসারে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি সম্পাদন করেছে তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয়নি; বরং তারা যেভাবে চুক্তি করেছে তাতে তাদের উদ্দেশ্য হিসেবে যে কয়টি সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল তন্মধ্যে যেটিতে বিক্রয় জায়েজ হয় সেটি ধরা হয়েছে। কেননা, চুক্তি জায়েজ হোক এটাই চুক্তিকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই কোনো পরিবর্তন সাব্যস্ত করা হয়নি। এ কারণে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, মুসান্নিফ (র.) পরে যে বলেছেন وَفِيهِ تَغْيِيرُ وَصْفِهِ "এতে কেবল চুক্তিকারীদ্বয়ের কৃত চুক্তির গুণগত পরিবর্তন করা হয়েছে" একথাটি বলার প্রয়োজন ছিল না।

তবে মুসান্নিফ (র.) হয়তো এ পরিবর্তনের কথা মেনে নিয়ে জবাব দিয়েছেন এজন্য যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমাদের আলোচ্য সুরতে চুক্তিকারীদ্বয় উক্ত তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটি (مُقَابَلَةُ الْكُلِّ بِالْكُلِّ عَلَى الشُّيُوعِ) নির্দিষ্ট করেছে। তাই তৃতীয়টি (مُقَابَلَةُ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ) উদ্দেশ্য হিসেবে ধরায় গুণগত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

وفيه تغيير وصفه لا أصله، لأنه الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব দিচ্ছেন। জবাবের সারকথা হচ্ছে, তাঁরা যে বলেছেন, আলোচ্য মাসআলায় এক পক্ষের দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের দিনার সাব্যস্ত করা হলে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি করেছে তার মাঝে পরিবর্তন এসে যায়, আর তা জায়েজ নয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, এখানে পরিবর্তন আসে কেবল চুক্তিটির গুণগত বৈশিষ্ট্যের মাঝে; মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন আসে না। আর মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ নয়, কিন্তু তার গুণগত বৈশিষ্ট্য (وَصْف)-এর মাঝে পরিবর্তন করা জায়েজ। গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন তো হচ্ছে এভাবে যে, চুক্তিকারীদ্বয় বাহ্যিকভাবে যে এক পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্য সাব্যস্ত করেছিল সেখানে আমরা এক পক্ষের নির্দিষ্ট একটি অপর পক্ষের নির্দিষ্ট একটির বিনিময়ে [তথা দিরহামের বিনিময়ে দিনার] সাব্যস্ত করেছি। আর মূল চুক্তিতে পরিবর্তন আসেনি তার কারণ হচ্ছে, চুক্তিকারীদ্বয়ের এভাবে চুক্তি করার ফলাফল হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের নিজের সম্পূর্ণ দ্রব্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের সম্পূর্ণ দ্রব্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, আর তা আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহালই রয়েছে। কাজেই তাদের চুক্তির মূলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) চুক্তিতে পরিবর্তন করা জায়েজ না হওয়ার পক্ষে যে নজিরগুলো উল্লেখ করেছেন তার কোনোটি এমন নয় যে, তাতে চুক্তির গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ করা যেত কিন্তু তা সত্ত্বেও বিক্রয় জায়েজ নয়। [এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা একটু পরে আলোচনা করা হবে।]

قَوْلُهُ وَصَارَ هٰذَا كَمَا إِذَا بَاعَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ الخ : সুতরাং আমাদের মাসআলটি এ মাসআলাটির মতোই হলো যে, দু-ব্যক্তির মাঝে একটি শরিকি মালিকানাধীন গোলাম রয়েছে অতঃপর তাদের একজন গোলামটির অর্ধেক বিক্রয় করে দিল [কিন্তু সে তার অর্ধেক বিক্রয় করেছে তা উল্লেখ করেনি] তাহলে সকলের মতে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা কোন অর্ধেক তা অনির্দিষ্ট রেখেছে। কাজেই তার নিজের অর্ধেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আবার অপর জনের অর্ধেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু অপর জনের অর্ধেক ধরা হলে বিক্রয় নাজায়েজ হয়, আর তার অর্ধেক ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়। তাই বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তার অর্ধেক উদ্দেশ্য হওয়াকে নির্দিষ্ট করা হবে। এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারীর কৃত চুক্তি অনুযায়ী তার চুক্তির মাঝে গুণগত পরিবর্তন এনে চুক্তিকে জায়েজ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করা হবে।

بِخِلَافِ مَا عُدَّ مِنَ الْمَسَائِلِ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُرَابَحَةِ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ تَوْلِيَةً فِي الْقَلْبِ بِصَرْفِ الرِّبْحِ كُلِّهِ إِلَى الثَّوْبِ، وَالطَّرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ صَرْفُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ إِلَى الْمُشْتَرِى، وَفِي الثَّالِثَةِ أُضِيفَ الْبَيْعُ إِلَى الْمُنْكَرِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْبَيْعِ، وَالْمُعَيَّنُ ضِدُّهُ، وَ فِي الْأَخِيرَةِ إِنْعَقَدَ الْعَقْدُ صَحِيحًا، وَالْفَسَادُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ، وَكَلَامُنَا فِي الْاِبْتِدَاءِ۔

অনুবাদ : পক্ষান্তরে [ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষ থেকে] যে সকল মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর বিষয়টি ভিন্ন– 'মুরাবাহাহ'-এর মাসআলাটির ক্ষেত্রে কারণ হলো, সম্পূর্ণ মুনাফাকে কাপড়ের সাথে সম্পর্কিত করা হলে 'বালা'-এর ক্ষেত্রে চুক্তিটি 'তাওলিয়া-চুক্তি'-তে [অর্থাৎ ক্রয়মূল্যের শর্তে বিক্রয়চুক্তিতে] পরিণত হয়ে যাবে [ফলে চুক্তির সত্তাগত পরিবর্তন হবে]। আর দ্বিতীয় মাসআলায় বৈধতার জন্য [উল্লিখিত] পন্থাটি [একমাত্র পন্থা হিসেবে] নির্ধারিত নয়। কেননা, [বৈধতার জন্য] এক হাজার দিরহামের অতিরিক্তও ক্রয়কৃত গোলামটির সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব। [কেননা, এক হাজারের কম হলে নাজায়েজ হবে, আর এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি হলে জায়েজ হবে। কাজেই বৈধতার পন্থা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে চুক্তি ফাসেদ হবে।] আর তৃতীয় মাসআলায় অনির্দিষ্ট গোলামের সাথে বিক্রয় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর অনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের পাত্র হতে পারে না। আর নির্দিষ্ট হলো অনির্দিষ্টের বিপরীত। [সুতরাং অনির্দিষ্ট বস্তু বলে নির্দিষ্ট বস্তু উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়।] আর শেষ মাসআলায় চুক্তিটি বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে [হস্তগত না করে পৃথক হওয়ার কারণে] চুক্তিটি বহাল থাকার ক্ষেত্রে ফাসাদ [অবৈধতা] সৃষ্টি হয়েছে। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে প্রারম্ভিক শুদ্ধতা সম্পর্কে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِخِلَافِ مَا عُدَّ مِنَ الْمَسَائِلِ، أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُرَابَحَةِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত নজিরগুলোর জবাব দিচ্ছেন। প্রথম নজির তথা মুরাবাহাহ সম্পর্কিত মাসআলার জবাব হলো, উক্ত মাসআলায় যদি বিক্রয় জায়েজ করার জন্য লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তাহলে মূল চুক্তির মাঝেই পরিবর্তন সাধিত হয়ে যায়। আর চুক্তিকারীদ্বয় সম্পাদিত মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন এনে বিক্রয় সহীহ করা জায়েজ নয়। মূল চুক্তির মাঝে পরিবর্তন সাধিত এভাবে যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় রৌপ্যের বালা ও কাপড় উভয়টির ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে 'মুরাবাহাহ' বা ক্রয়মূল্যের উপর লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় করেছে। কাজেই যদি লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে বালাটির বিক্রয় হবে ক্রয়মূল্যের সমান মূল্যে। আর ক্রয়মূল্যের সমান মূল্যের ভিত্তিতে বিক্রয় করাকে বলা হয় 'বায় তাওলিয়া'। আর 'মুরাবাহাহ' ও 'তাওলিয়া' হচ্ছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চুক্তি। সুতরাং লাভের বিষয়টি কেবল কাপড়ের দিকে ফিরানো হলে রৌপ্যের বালাটির ক্ষেত্রে চুক্তিটি 'মুরাবাহাহ' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'তাওলিয়া' হয়ে যাবে। আর তা হবে চুক্তিকারীদ্বয়ের কৃত চুক্তির মূলগত পরিবর্তন। কাজেই তা জায়েজ হবে না। অতএব, এ নজিরটি আমাদের দলিলের বিপক্ষে দাঁড় করানো যাবে না। কেননা, আমাদের দাবি ছিল চুক্তির মূলগত কোনো পরিবর্তন না এনে যদি কেবল তার গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা করতে হবে।

قَوْلُهُ وَالطَّرِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত দ্বিতীয় নজির তথা গোলাম ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তা বিক্রেতার কাছে পুনরায় বিক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলাটির জবাব হলো, উক্ত সুরতে আপনাদের বক্তব্য অনুসারে ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজার ধরা হলে আর তার

সাথে যুক্ত অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও চুক্তিকারীদের কৃত চুক্তিতে পরিবর্তন আসার কারণে এভাবে ধরা জায়েজ হয়নি। এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, এ সুরতে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ না করার কারণ হচ্ছে ভিন্ন। তা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়কে জায়েজ করার জন্য পন্থা নির্দিষ্ট একটির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাম্ভাব্য একাধিক পন্থা বিদ্যমান। আর একাধিক পন্থা বিদ্যমান থাকার কারণে যেহেতু তন্মধ্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট করার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়ার ভিত্তি নেই, সেহেতু কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। জায়েজ করার জন্য একাধিক পন্থা বিদ্যমান এভাবে যে, গোলামটির ক্রয়মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। আর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে বিক্রেতার নিকট তা এক হাজার দিরহামের চেয়ে কম মূল্যে পুনরায় বিক্রয় করা নাজায়েজ। কিন্তু এক হাজার বা তার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং যখন ক্রেতা উক্ত গোলামটির সাথে আরেকটি গোলাম যুক্ত করে দেড় হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে, তখন বিক্রয় জায়েজ করার জন্য ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজার দিরহাম ধরলে আর অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত দিরহাম ধরলে বিক্রয় জায়েজ হবে। আবার ক্রয়কৃত গোলামটির মূল্য এক হাজারের চেয়ে বেশি ধরে অপর গোলামটির মূল্য পাঁচ শত দিরহামের চেয়ে কম ধরলেও বিক্রয় জায়েজ হবে। আর এ এক হাজারের বেশি ধরার ক্ষেত্রে এক দিরহাম বেশিও হতে পারে আবার দুই দিরহাম হতে পারে এভাবে চারশত নিরানব্বই পর্যন্ত হতে পারে। চুক্তিকারীদ্বয় যখন এতগুলো সাম্ভাব্য জায়েজ সুরতের মধ্য হতে কোনোটি নির্দিষ্ট করেনি, তখন আমরা কোনো একটিকে নির্দিষ্ট কীভাবে করব? সুতরাং কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো ভিত্তি না থাকার কারণে কোনোটিকে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। সারকথা এই যে, এ সুরতে জায়েজ সাব্যস্ত করার সাম্ভাব্য সুরত অনেকগুলো হতে পারে। তন্মাধ্যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তি ছাড়া একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়, আর তা জায়েজ নয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে আমাদের দিরহাম দিনার সম্পর্কিত মূল আলোচ্য মাসআলায় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য পন্থা কেবল একটাই বিদ্যমান। তা হলো, এক পক্ষের এক শ্রেণীর দ্রব্যকে অপর পক্ষের অন্য শ্রেণীর দ্রব্যের বিনিময়ে সাব্যস্ত করা। কাজেই তা নির্দিষ্ট করা হলে অগ্রাধিকারের ভিত্তি ছাড়া একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হচ্ছে না। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِى الثَّالِثَةِ أُضِيفَ الْبَيْعُ إِلَى الْمُنَكَّرِ الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত তৃতীয় নজির তথা নিজের গোলামকে অপরের গোলামের সাথে মিলিয়ে বিক্রয় করা সম্পর্কিত মাসআলার জবাব হলো, উক্ত মাসআলায় যখন বিক্রেতা বলেছে যে, আমি এ দুটি গোলামের মধ্য হতে একটি গোলাম তোমার কাছে বিক্রয় করলাম, তখন বিক্রেয়-বস্তু (مَبِيْع) 'মাজহুল' বা অনির্দিষ্ট বস্তু হয়ে গেছে। আর 'মাজহুল' বা অনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع) হতে পারে না। কাজেই বিক্রয় নাজায়েজ হয়েছে। আর আপনাদের বক্তব্য অনুসারে তার নিজের গোলামটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা, নির্দিষ্ট বস্তু হচ্ছে অনির্দিষ্ট বস্তুর বিপরীত। আর কোনো কিছু উল্লেখ করে তার বিপরীত কিছু উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব হয় না (اَلشَّئُ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ)। কাজেই 'দুটির একটি বিক্রয় করলাম' বলে 'আমার গোলামটি বিক্রয় করলাম' উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া সম্ভব হবে না। অতএব, এ সুরতে চুক্তির কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা বিদ্যমান নেই।

উল্লেখ্য, এ জবাবটি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) নিতান্ত দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।–[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَفِى الْأَخِيْرَةِ اِنْعَقَدَ الْعَقْدُ صَحِيْحًا الخ : ইমাম যুফার (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত চতুর্থ উদাহরণ তথা একটি দিরহাম ও একটি কাপড় অপর পক্ষের একটি দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রয় করে হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার মাসআলাটির জবাব হলো, এ মাসআলাটিতে প্রথমে বিক্রয় সহীহ হয়েছে; কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয় পরস্পরে হস্তগত করার পূর্বে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে চুক্তিটি পরে বাতিল হয়ে গেছে। এ মাসআলাটিকে আমাদের মূল আলোচ্য মাসআলায় আমাদের বিপক্ষে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়নি। কেননা, আমাদের আলোচনা হচ্ছে চুক্তিকারীদ্বয় যেভাবে চুক্তি করেছে শুরুতেই সেভাবে চুক্তিটি যদি জায়েজ না হয়, তাহলে তার গুণগত বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে তা জায়েজ সাব্যস্ত করার বিষয়ে। আর আপনাদের পেশকৃত উক্ত নজিরে প্রথমে তো বিক্রয় জায়েজ হয়ে সম্পাদিত হয়েছে, কাজেই তা আর পরিবর্তন করে জায়েজ সাব্যস্ত করার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং একে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা সঠিক হয়নি।

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ دِيْنَارٍ جَازَ الْبَيْعُ، وَيَكُوْنُ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّيْنَارُ بِدِرْهَمٍ، لِأَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ فِي الدَّرَاهِمِ التَّمَاثُلُ عَلَى مَا رَوَيْنَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ ذٰلِكَ، فَبَقِيَ الدِّرْهَمُ بِالدِّيْنَارِ وَهُمَا جِنْسَانِ، وَلَا يُعْتَبَرُ التَّسَاوِيْ فِيْهِمَا وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَأَحَدُهُمَا أَقَلُّ وَمَعَ أَقَلِّهِمَا شَيْءٌ آخَرُ يَبْلُغُ قِيْمَتُهُ بَاقِيَ الْفِضَّةِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَمَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيْمَةٌ كَالتُّرَابِ لَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ لِتَحَقُّقِ الرِّبٰوا، إِذِ الزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فَيَكُوْنُ رِبٰوا .

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি এগারোটি দিরহাম বিক্রয় করে দশটি দিরহাম ও একটি দিনারের বিনিময়ে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে দশ দিরহাম দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং দিনারটি এক দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, আমাদের বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে দিরহাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে [জায়েজ হওয়ার] শর্ত হলো উভয় দিকে সমান সমান হওয়া। সুতরাং বাহ্যত এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে বিক্রয়ে সমতারই ইচ্ছা করেছে। কাজেই দিনারের বিনিময়ে এক দিরহাম অবশিষ্ট রইল। দিরহাম ও দিনার দু শ্রেণীর বস্তু। আর দু শ্রেণীর বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা বিবেচ্য নয়। যদি চুক্তিকারীদ্বয় রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, আর এক পক্ষে তা কম হয় এবং কম পরিমাণের সাথে অন্য কোনো দ্রব্য থাকে যার মূল্য অপর পক্ষের অবশিষ্ট রৌপ্যের মূল্যের সমান হবে, তাহলে বিক্রেয়চুক্তিটি কোনো প্রকার মাকরূহ না হয়েই জায়েজ হবে। আর যদি অন্য দ্রব্যটির মূল্য অপর পক্ষের অবশিষ্ট রৌপ্যের মূল্যের সমান না হয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তিটি মাকরূহ হয়ে জায়েজ হবে। আর যদি ঐ দ্রব্যটি মূল্যহীন হয়, যেমন– মাটি, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কারণ, 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হচ্ছে। কেননা, [এক পক্ষের রৌপ্যের] বেশি পরিমাণটুকুর বিনিময়ে কিছুই থাকছে না, কাজেই তা 'রিবা' [সুদ] হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا الخ : সূরতে মাসআলা হলো, কেউ যদি এগারোটি দিরহাম বিক্রয় করে দশ দিরহাম ও এক দিনারের বিনিময়ে তাহলে জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের এগারো দিরহামের মধ্য হতে দশ দিরহাম অপর পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে ধরা হবে, যাতে সমান সমান হয়ে যায়। আর প্রথম পক্ষের অবশিষ্ট এক দিরহামকে অপর পক্ষের এক দিনারের বিনিময়ে ধরা হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ فِي الدَّرَاهِمِ التَّمَاثُلُ الخ : বিক্রয় জায়েজ হওয়ার দলিল হলো, দিরহাম হচ্ছে রৌপ্যের তৈরি। আর রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্যের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীস اَلْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الخ -এর

ভিত্তিতে শর্ত হলো, উভয় পক্ষে সমান সমান হওয়া। আর চুক্তিকারীদ্বয়ের যেহেতু উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে তাদের বিক্রয় সহীহ হোক, সেহেতু যেভাবে ধরা হলে বিক্রয় জায়েজ হয় সেভাবে ধর্তব্য হবে। কাজেই দ্বিতীয় পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে প্রথম পক্ষের এগারো দিরহামের মধ্য হতে দশ দিরহাম ধরা হবে, তাহলে উভয় পক্ষের রৌপ্যের পরিমাণ সমান সমান হয়ে যাবে। অতঃপর অবশিষ্ট থাকল প্রথম পক্ষের এক দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের এক দিনার। আর এ ক্ষেত্রে তো সমান সমান কিংবা কমবেশি করে উভয় প্রকারেই বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, উভয়টির শ্রেণী ভিন্ন, আর উভয় দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হলে সমান সমান করে বিক্রয় করা শর্ত নয়। এর দলিলও 'রিবা'-এর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় করে কিংবা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করে, আর এক পক্ষের দ্রব্য অপর পক্ষের দ্রব্যের চেয়ে ওজনের দিক থেকে কম হয় এবং যে পক্ষে কম রয়েছে তার সাথে অন্য কোনো বস্তু রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ এক পক্ষে রয়েছে দশ দিরহাম ও অন্য একটি বস্তু, আর অপর পক্ষে রয়েছে পনের দিরহাম, তাহলে বিধান হলো, দশ দিরহামের সাথে যে বস্তুটি রয়েছে তার মূল্য যদি অপর পক্ষের অতিরিক্ত পাঁচ দিরহামের সমান হয়, তাহলে বিক্রয় মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়েজ হবে। আর যদি বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম না হয়, তাহলে বিক্রয় বিধানগতভাবে জায়েজ হবে কিন্তু মাকরূহ [তাহরীমী] হবে। আর যদি বস্তুটি একেবারে মূল্যহীন হয় যেমন– মাটির একটি টুকরা, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

যদি বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের দশ দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের পনের দিরহাম থেকে দশ দিরহাম ধরা হবে। আর প্রথম পক্ষের অন্য বস্তুটির বিনিময়ে অপর পক্ষের অবশিষ্ট পাঁচ দিরহাম ধরা হবে, কাজেই 'রিবা' সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

আর বস্তুটির মূল্য পাঁচ দিরহাম না হলে বিক্রয় মাকরূহ [তাহরীমী] হওয়ার কারণ হলো, এভাবে বিক্রয় করা হচ্ছে 'রিবা' [সুদ] -কে হালাল করার কৌশল বা 'হিলা'। কেননা, কেউ যদি উদাহরণস্বরূপ একশত দিনারের বিনিময়ে পঞ্চাশ দিনার বিক্রয় করতে চায়, তাহলে তা 'রিবা' হওয়ার কারণে হারাম হবে। তাই সে বিক্রয়কে জায়েজ করার কৌশল হিসেবে পঞ্চাশ দিনারের সাথে দুই কেজি ধান যুক্ত করে বিক্রয় করবে। সুতরাং হারাম 'রিবা'-কে হালাল করার কৌশল হওয়ার কারণে এটি মাকরূহ তাহরীমী হবে। এজন্য ইমাম মুহাম্মদ (র.) -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– كَيْفَ تَجِدُهُ فِيْ قَلْبِكَ؟ "আপনি এরূপ বিক্রয়কে কিরূপ মনে করেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন– مِثْلُ الْجَبَلِ "পাহাড়সম অন্যায় মনে করি।"

আর যদি বস্তুটি একেবারেই মূল্যহীন হয় তাহলে বিক্রয় নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, মূল্যহীন বস্তু বিনিময়দ্রব্য হিসেবে গণ্য হয় না। কাজেই তা থাকা ও না থাকা সমান কথা। সুতরাং এক পক্ষে দশ দিরহাম হলো আর অপর পক্ষে পনের দিরহাম। ফলে অপর পক্ষের পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে প্রথম পক্ষে কোনো বিনিময়ে না থাকার কারণে তা 'রিবা' [সুদ] হবে এবং বিক্রয় হারাম হবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত মাসআলায় যে বলা হয়েছে, 'যে পক্ষের কম দিরহাম রয়েছে সে পক্ষের অন্য বস্তুটির মূল্য অপর পক্ষের অতিরিক্ত দিরহামের সমান হলে বিক্রয় মাকরূহ হওয়া ছাড়াই জায়েজ হবে', এ ক্ষেত্রে যদি বস্তুটির মূল্য সমান না হয়ে এতটুক কম হয় যা সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়কালে মানুষ ঠকতে পারে তাহলে তাও সমান বলেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি এত কম হয় যে, মানুষ বিক্রয়কালে ঠকলে এতটা ঠকে না তাহলে তা সমান হিসেবে গণ্য হবে না এবং বিক্রয় মাকরূহ হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ মাসআলার দাবি অনুসারে পূর্বে বর্ণিত দুই দিরহাম ও এক দিনার অপর পক্ষের দুই দিনার ও এক দিরহাম বিক্রয়ের মাসআলায়ও বিক্রয় মাকরূহ হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى اٰخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْعَشَرَةُ دِيْنَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ دَفَعَ الدِّيْنَارَ وَتَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ، وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ يَجِبُ بِهٰذَا الْعَقْدِ ثَمَنٌ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِيْنُهُ بِالْقَبْضِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالدَّيْنُ لَيْسَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ، فَإِذَا تَقَاصَّا يَتَضَمَّنُ ذٰلِكَ فَسْخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ إِلَى الدَّيْنِ، إِذْ لَوْلَا ذٰلِكَ يَكُوْنُ إِسْتِبْدَالًا بِبَدَلِ الصَّرْفِ ـ

অনুবাদ : যদি কারো আরেক ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম পাওনা থাকে, অতঃপর যার নিকট দশ দিরহাম পাওনা সে যদি পাওনাদারের নিকট একটি দিনার বিক্রয় করে দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং দিনারটি পাওনাদারের নিকট হস্তান্তর করে আর [উভয়ে নিজ নিজ] দশ দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নেয়, তাহলে [ইসতিহসানের ভিত্তিতে] তা জায়েজ হবে। মাসআলাটিতে ["দশ দিরহামের বিনিময়ে" কথাটির দ্বারা] উদ্দেশ্য হলো, যদি অনির্দিষ্ট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে [তাহলে উক্ত বিধান হবে]। জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, এ বিক্রয়চুক্তির কারণে ক্রেতার উপর মূল্য [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] এভাবে ওয়াজিব হয়েছে যে, তা [পরস্পরে পৃথক হওয়ার পূর্বে] হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য, যার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর ঋণের দশ দিরহাম এরূপ নয়। কাজেই সমশ্রেণীতা না থাকার কারণে কেবল বিক্রয়চুক্তির মাধ্যমে কাটাকাটি সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং যখন তারা উভয়ে কাটাকাটি করেছে তখন এটি [শুদ্ধতার দাবিরূপে] প্রথম চুক্তিকে রহিত করে চুক্তিকে নতুন করে ঋণের দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করে নিবে। কেননা, যদি এরূপ ধরা না হয়, তাহলে 'সরফ' চুক্তিতে বিনিময়দ্রব্যকে [হস্তগত করার পূর্বে অন্য বস্তু দ্বারা] পরিববর্তন করা সাব্যস্ত হয়ে যাবে [যা জায়েজ নয়]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى اٰخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ الخ : মাসআলা হলো, কোনো [ঋণদাতা] ব্যক্তির যদি অপর এক [ঋণগ্রহীতা] ব্যক্তির নিকট দশ দিরহাম পাওনা থাকে অতঃপর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট একটি দিনার দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে এবং দিনারটি হস্তান্তর করে দেয়, [ফলে ঋণগ্রহীতারও ঋণদাতার নিকট দশ দিরহাম পাওনা হলো আর ঋণদাতারও পূর্বের ঋণের দশ দিরহাম পাওনা হলো] অতঃপর ত.রা প্রত্যেকে অপরের নিকট প্রাপ্য দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মাসআলাটির দুটি সুরত হতে পারে। প্রথম সুরত হলো, ঋণগ্রহীতার এক দিনার বিক্রয় করার সময়ই তারা উল্লেখ করে নিল যে, এ দিনারটি তার কাছে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে। আর দ্বিতীয় সুরত হলো, বিক্রয়ের সময় কেবল 'দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম' এভাবে [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] উল্লেখ করেছে, তারপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল।

প্রথম সুরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে আমাদের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং কাটাকাটিও সহীহ হবে। আর ইমাম যুফার (র.) -এর মতে জায়েজ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতও ইমাম যুফার (র.)-এর মতের অনুরূপ।

উল্লেখ্য, কিতাবে শুধু দ্বিতীয় সুরত তথা মতবিরোধপূর্ণ সুরতটি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম সুরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, ঋণগ্রহীতার দিনারটি দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় হচ্ছে 'বায় সরফ'। আর 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা শর্ত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদিও বাহ্যিকভাবে শুধু এক পক্ষের দ্রব্য তথা দিনারটি মজলিসে হস্তগত করা হয়েছে আর অপর পক্ষের দশ দিরহাম মজলিসে হস্তগত করা হয়নি; কিন্তু বিধানগতভাবে অপর পক্ষের দশ দিরহামও হস্তগত করা হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, 'বায় সরফ'-এর ক্ষেত্রে প্রথমত যে কোনো এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা এজন্য শর্ত যে, কোনো পক্ষের দ্রব্য নগদ হস্তগত করা না হলে এটি بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ অর্থাৎ "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যা নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় পক্ষের দ্রব্যও এজন্য নগদ হস্তগত করা শর্ত যাতে 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হয়ে না যায়। কেননা, যদি এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা হয় আর অপর পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করা না হয় তাহলে উভয় দিকে সমতা রক্ষা হয় না, ফলে 'রিবা' (সুদ) সাব্যস্ত হয়। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় যখন এক পক্ষের দ্রব্য তথা দিনারটি নগদ হস্তগত করা হয়েছে তখন "দাইনের বিনিময়ে দাইনের বিক্রয়" -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা হয়েছে। আর অপর পক্ষের দ্রব্য তথা দশ দিরহাম যেহেতু তার পূর্ব থেকেই হস্তগত করা রয়েছে, কাজেই চুক্তিকালে উভয় দ্রব্যই হস্তগত করা হয়ে গেছে। সুতরাং উভয় দিকে সমতা সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, 'রিবা' [সুদ] সাব্যস্ত হওয়া থেকেও রক্ষা হয়েছে। কাজেই সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হবে।

দ্বিতীয় সুরত যা কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে তথা "বিক্রয়ের সময় কেবল 'দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম' এভাবে [অনির্দিষ্ট দশ দিরহাম] উল্লেখ করেছে তারপর তারা উভয়ে সম্মতিক্রমে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল" এ সুরতে ইমাম যুফার (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। আর কিয়াসের দাবিও হচ্ছে তাই। এটা কিয়াসের দাবি হচ্ছে এভাবে যে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিকারীদ্বয় প্রথমে অনির্দিষ্ট [মুতলাক] দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। তারপর তারা উক্ত দশ দিরহামের পরিবর্তে ঋণের পাওনা দশ দিরহাম কাটাকাটি করেছে। ফলে 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে তারা এক পক্ষের দ্রব্য [দশ দিরহাম] হস্তগত করার পূর্বে তা অন্য দ্রব্য [তথা ঋণের দশ দিরহাম] দ্বারা পরিবর্তন করেছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে কোনো পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কোনো দ্রব্য গ্রহণ করা জায়েজ নয়। কাজেই কিয়াসের দাবি অনুসারে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কিন্তু আমাদের মতে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে। এটি হচ্ছে 'ইসতিহ্সান' (اِسْتِحْسَانٌ)-এর দাবি অনুসারে।

قَوْلُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يَجِبُ بِهٰذَا الْعَقْدِ الخ : 'ইসতিহ্সান' -এর দাবি অনুসারে জায়েজ হচ্ছে এভাবে যে, আলোচ্য মাসআলায় ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার নিকট দিনারটি বিক্রয় করেছে তখন দিনারটির মূল্য [দশ দিরহাম] হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব হয়েছে। কেননা, 'বায় সরফ' -এর ক্ষেত্রে উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য। অপরদিকে ঋণগ্রহীতার নিকট পাওনা দশ দিরহাম হচ্ছে 'দাইন' [ঋণ] তা হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। সুতরাং দিনারের মূল্যের দশ দিরহাম হচ্ছে এক ধরনের, আর পাওনা দশ দিরহাম হচ্ছে আরেক ধরনের। কাজেই উভয় দশ দিরহামের ধরন (جِنْس) ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে কাটাকাটি সহীহ না হওয়ার কথা। কিন্তু চুক্তিকারীদ্বয় যখন চুক্তির পর উভয়ে সম্মতিক্রমে কাটাকাটি করতে চাচ্ছে তখন তা [যথাসম্ভব] সহীহ করা আবশ্যক। অতএব, তাদের এ কাটাকাটি সহীহ করার জন্য এ কথা বলতে হবে যে, তাদের কাটাকাটি দুটি বিষয়কে পরোক্ষভাবে (ضِمْنًا) শামিল করে নিয়েছে।

একটি হচ্ছে, পূর্বের অনির্দিষ্ট দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটির বিক্রয়কে রহিতকরণ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চুক্তিটি নতুনভাবে ঋণের পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্তকরণ। অর্থাৎ তারা যেন এ কথায় সম্মত হলো যে, আমরা পূর্বের চুক্তিটি বাতিল করে দিয়ে তোমার নিকট আমার পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয় করলাম। কেননা, এভাবে যদি পূর্বের চুক্তিটি রহিত করে দিনারটির বিনিময়কে পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করা না হয়; বরং দিনারটির মূল্যের অনির্দিষ্ট (مُطْلَقًا) দশ দিরহামের বিনিময়ে পাওনা দশ দিরহাম দিয়েছে বলে ধরা হয় তাহলে 'বায় সরফ' -এর মাঝে এক পক্ষের দ্রব্য হস্তগত করার পূর্বে তার পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা জায়েজ নয়। কাজেই তাদের কাটাকাটি সহীহ করার জন্য উক্ত দুটি বিষয় [অনিবার্য কারণে] পরোক্ষভাবে রয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং যখন পূর্বের চুক্তি রহিত করে নতুনভাবে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয় করেছে বলে ধরা হলো, তখন বিক্রয় ও কাটাকাটি জায়েজ হয়ে যাবে, যেভাবে প্রথম সুরতে সকলের ঐকমত্যে বিক্রয় জায়েজ হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিলটি উপরে যেভাবে বর্ণনা করা হলো এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ ক্ষেত্রে উভয়ের কাটাকাটির কারণে প্রথম চুক্তিটি রহিত করে পুনরায় নতুনভাবে পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের দলিলটি হলো এরূপ যে, যখন চুক্তিকারীদ্বয় অনির্দিষ্ট (مُطْلَقًا) দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয়-বিক্রয় করেছে তখন উক্ত দশ দিরহাম হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে আবশ্যক। অতঃপর তারা যখন কাটাকাটি করেছে তখন তার অর্থ হচ্ছে যে, দিনারের মূল্যের দশ দিরহামকে পাওনা দশ দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর পাওনা দশ দিরহাম তো ঋণগ্রহীতা [দিনার বিক্রেতা] পূর্বেই হস্তগত করেছে। কাজেই তা হস্তগত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শুধু পার্থক্য এতটুকুই হচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে হস্তগত করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আগে আর তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে পরে। কিন্তু এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট করা যাতে সমতা সাব্যস্ত হয়, আর তা অর্জিত হয়ে গেছে।

وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الدَّيْنِ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ، وَالْفَسْخُ قَدْ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْاِقْتِضَاءِ، كَمَا إِذَا تَبَايَعَا بِأَلْفٍ ثُمَّ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ وَ زُفَرُ (رح) يُخَالِفُنَا فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْاِقْتِضَاءِ، وَهٰذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا، فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا فَكَذٰلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، لِتَضَمُّنِهِ اِنْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ وَقْتَ تَحْوِيلِ الْعَقْدِ، فَكَفَى ذٰلِكَ لِلْجَوَازِ قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَ دِرْهَمَيْنِ غَلَّتَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَ دِرْهَمٍ غَلَّةٍ، وَالْغَلَّةُ مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَيَأْخُذُهُ التُّجَّارُ، وَ وَجْهُهُ تَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ فِي الْوَزْنِ، وَمَا عُرِفَ مِنْ سُقُوطِ اِعْتِبَارِ الْجَوْدَةِ ـ

অনুবাদ : পক্ষান্তরে [প্রথম চুক্তিকে রহিত করে] চুক্তিকে ঋণের দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত করলে কেবল চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমেই কাটাকাটি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। আর চুক্তি রহিতকরণ কখনো অনিবার্যতার দাবিতেও [আপনা-আপনি] সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যেমন– দু-জনে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করল, তারপর তারা চুক্তিটি পুনরায় পনের শত দিরহামের বিনিময়ে সম্পাদন করল। ইমাম যুফার (র.) এ ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতবিরোধ পোষণ করেন। কেননা, তিনি অনিবার্যতার দাবিতে [আপনা-আপনি] চুক্তি রহিতকরণ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। উপরিউক্ত বিধান হলো যদি ঋণের পাওনা বিক্রয়চুক্তির পূর্বের হয়ে থাকে। আর যদি ঋণের পাওনা চুক্তির পরের হয়ে থাকে, তাহলেও দুটি বর্ণনার বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে অনুরূপ বিধানই হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রেও [কাটাকাটির মাধ্যমে] চুক্তিটি পরিবর্তনকালে প্রথম চুক্তি রহিত হয়ে ঋণের দিরহামের সাথে চুক্তি সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি [অনিবার্যতার দাবির কারণে] অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর জায়েজ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুটি সহীহ দিরহাম ও একটি গল্লাহ দিরহামের বিনিময়ে একটি সহীহ দিরহাম ও দুটি গল্লাহ দিরহাম বিক্রয় করা জায়েজ। গল্লাহ দিরহাম (غَلَّة) হলো যা 'বাইতুল মাল' ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু ব্যবসায়ীগণ গ্রহণ করে। মাসআলটিতে বৈধতার কারণ হলো, ওজনের ক্ষেত্রে সমতা বিদ্যমান হওয়া, আর উৎকৃষ্টতার বিষয় ধর্তব্য না হওয়ার যা [রিবার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে] পরিজ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الدَّيْنِ يَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বে বলা হয়েছে যে, দিনারটির মূল্যের দশ দিরহাম এবং পাওনা দশ দিরহাম এই উভয়টির ধরন ভিন্ন হওয়ার কারণে কাটাকাটি করার সম্ভব নয়। তাহলে পরে আবার প্রথম চুক্তিটি রহিত ধরে কাটাকাটি কীভাবে সহীহ হলো?

উত্তরের সারকথা হলো, আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম চুক্তিটি রহিত ধরার পর আর কাটাকাটি ধরা হয়নি; বরং এরূপ ধরা হয়েছে যে, প্রথম চুক্তিটি রহিত করে তারা ঋণের পাওনা দশ দিরহামকেই মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। ফলে স্বয়ং দ্বিতীয় চুক্তিটিই পাওনা দশ দিরহামকে ঋণগ্রহীতা [দিনার বিক্রেতা]-কে কেটে দিয়েছে। উল্লেখ্য, عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ বলে মুসান্নিফ (র.) দু লাইন পরের তাঁর বক্তব্য لِتَضَمُّنِهِ اِنْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةُ إِلَى دَيْنٍ قَائِمٍ وَقْتَ تَحْوِيلِ الْعَقْدِ فَكَفَى ذٰلِكَ لِلْجَوَازِ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আরেকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَالْفَسْخُ قَدْ يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, যদি আপনাদের বর্ণনা অনুসারে কাটাকাটির কারণে প্রথম চুক্তিটিকে তারা রহিত বা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ধরা হয়, তাহলে তো কাটাকাটির সময় দিনারের মালিক তথা ঋণগ্রহীতা দিনারটি ফেরত গ্রহণ করে পুনরায় হস্তান্তর করা আবশ্যক হওয়ার কথা। কেননা, কোনো বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তার বিধান হচ্ছে ক্রেতা তার মূল্য ফেরত নিবে এবং বিক্রেতা তার বিক্রীত-দ্রব্য ফেরত গ্রহণ করবে। অথচ আলোচ্য মাসআলায় তো দিনারের মালিককে দিনারটি ফেরত নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে যে তারা প্রথম চুক্তিকে রহিত বা প্রত্যাহার করেছে বলে ধরা হয়েছে তা তারা স্পষ্টরূপে প্রত্যাহার করেনি; বরং অনিবার্য কারণে (بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ) ধরে নেওয়া হয়েছে। আর অনিবার্য কারণে (بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ) যা ধরে নেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে ঐ বিধান প্রযোজ্য হয় না, যা স্পষ্টভাবে সম্পাদন করলে প্রযোজ্য হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রথম চুক্তিটি প্রত্যাহার করেছে বলে ধরা হলেও দিনারের মালিকের উপর দিনারটি ফেরত গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি একটি দ্রব্য এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে প্রথমে বিক্রয় করে এবং দ্রব্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে, তারপর আবার ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে চুক্তিটি পনের শত দিরহামের বিনিময়ে করার ব্যাপারে সম্মত হয় তাহলে এটাই ধর্তব্য হয় যে, তারা প্রথম চুক্তিটি প্রত্যাহার করে পুনরায় পনের শত দিরহামের বিনিময়ে দ্রব্যটি বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। এ ক্ষেত্রেও যেহেতু তারা স্পষ্টভাবে প্রথম চুক্তিটি রহিত বা প্রত্যাহার করেনি; বরং পরের চুক্তিটি সহীহ করার জন্য অনিবার্য কারণে প্রথম চুক্তিটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে ধরা হয়েছে, সেহেতু বিক্রেতাকে দ্রব্যটি ফেরত গ্রহণ করে পুনরায় হস্তান্তর করার আবশ্যকতা নেই। তদ্রূপ আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও দিনারের মালিকের জন্য দিনারটি ফেরত নিয়ে পুনরায় হস্তান্তর করা আবশ্যক হবে না।

قَوْلُهُ وَ زُفَرُ (رحـ) يُخَالِفُنَا فِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَقُوْلُ بِالْاِقْتِضَاءِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম যুফার (র.) আমাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তাঁর মতে কাটাকাটির মাধ্যমে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধের কারণ হলো, তিনি اِقْتِضَاء অর্থাৎ অনিবার্য কারণে পরোক্ষভাবে কোনো চুক্তি কিংবা চুক্তি রহিত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়াকে মানেন না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায় তাঁর মতে কাটাকাটির কারণে পরোক্ষভাবে প্রথম চুক্তিটি রহিত বা প্রত্যাহার করা হয়নি। অতএব, চুক্তিকারীদ্বয়ের কাটাকাটি সঠিক হবে না। [বিস্তারিত দলিল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।]

قَوْلُهُ وَهٰذَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا، فَإِنْ كَانَ لَاحِقًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে মতবিরোধসহ বিধান বর্ণনা করা হলো তা ছিল 'যদি দিনার বিক্রয়কারীর নিকট দিনার ক্রয়কারীর পূর্ব থেকে দশ দিরহাম পাওনা থাকে' এরূপ সুরতে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, প্রথমে দিনার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয়েছে তারপর বিক্রেতার নিকট ক্রেতার নতুন করে পাওনা হয়েছে, অতঃপর সেই পাওনা দিরহামের বিনিময়ে দিনারের মূল্য কাটাকাটি করে নিল। যেমন- এক ব্যক্তি একটি দিনার অপর ব্যক্তির নিকট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল এবং দিনারটি হস্তান্তর করে দিল কিন্তু ক্রেতা দশ দিরহাম হস্তান্তর করেনি। অতঃপর মজলিসে থাকাবস্থায়ই ক্রেতা একটি কাপড় বিক্রেতার নিকট দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করল। এখন দিনারের মালিকের ক্রেতার নিকট দশ দিরহাম পাওনা হয়েছে আবার ক্রেতার দিনারটির মালিকের নিকট দশ দিরহাম পাওনা হয়েছে। অতঃপর উভয়ে তাদের পাপ্য দশ দিরহাম কাটাকাটি করে নিল। এরূপ সুরত হলে বিধান কি হবে? সে ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবে দুটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হবে এবং কাটাকাটি সহীহ হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে ফকীহ আবূ সুলায়মান (র.) -এর রেওয়ায়েত এবং ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদবী (র.) এটিই গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.)-এর মতে এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে কাটাকাটি সহীহ হবে না, কাজেই এমতাবস্থায় পরস্পরে পৃথক হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে ফকীহ আবূ হাফস (র.)-এর রেওয়ায়েত। ইমাম শামসুল আয়িম্মাহ ও কাযী খান (র.) এ রেওয়ায়েতই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অনুসারে জায়েজ না হওয়ার কারণ হলো, মূলত কিয়াস অনুযায়ী পূর্বের সুরতেও জায়েজ না হওয়ার কথা ছিল। জায়েজ করা হয়েছে কিয়াসের বিপরীতে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের কারণে। আর হাদীসটি কেবল ঐ সুরতের ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে, যখন পাওনা পূর্বের হবে আর কাটাকাটি সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি পরে হবে। কাজেই কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে জায়েজ হওয়ার বিধান কেবল এ সুরতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ أُكْرِيْ اِبِلًا بِالْبَقِيْعِ اِلٰى مَكَّةَ بِالدَّرَاهِمِ وَاٰخُذُ مَكَانَهَا دَنَانِيْرَ أَوْ قَالَ بِالْعَكْسِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ إِذَا افْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا عَمَلٌ .

"হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'বাকী' নামক স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত দিরহামের বিনিময়ে উট ভাড়া দেই, অতঃপর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে দিনার গ্রহণ করি অথবা তিনি এর বিপরীত বলেছেন [অর্থাৎ দিনারের বিনিময়ে ভাড়া দেই অতঃপর উক্ত দিনারের বিনিময়ে দিরহাম গ্রহণ করি]। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, যদি তোমরা এভাবে পৃথক হও যে, তোমাদের [চুক্তি সম্পাদন ও দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণের] মাঝে কোনো কাজের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি।" এ হাদীসে ভাড়ায় উট গ্রহণকারীর নিকট প্রথমে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর দিরহাম পাওনা হয়েছে। অতঃপর উট গ্রহণকারী তাঁর নিকট দিনার বিক্রয় করেছে এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) তা হস্তগত করেছেন আর দিনারের মূল্য তাঁর পাওনা দিরহামের বিনিময়ে কাটাকাটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসে কেবল প্রথমে পাওনা ঋণের বিনিময়ে পরে কাটাকাটি করার বিষয় সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, তা এ সুরতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ اِنْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَالْاِضَافَةَ اِلٰى دَيْنٍ قَائِمٍ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর মতে প্রথম রেওয়ায়েত তথা জায়েজ হওয়ার রেওয়ায়েতটি অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাটাকাটি সহীহ করার জন্য এ কথাই ধরে নিতে হবে যে, তারা কাটাকাটির সময় পূর্বের চুক্তি রহিত করেছে এবং নতুনভাবে ঋণের দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি বিক্রয়ের চুক্তি করেছে। সুতরাং আলোচ্য সুরতে যদিও প্রথমে দিনারটি বিক্রয়চুক্তির সময় দিনারটি ক্রয়কারীর কোনো পাওনা ছিল না। কিন্তু যখন তারা কাটাকাটি করেছে তখন তো কাপড়টির মূল্য হিসেবে দিনার ক্রেতার দশ দিরহাম পাওনা রয়েছে দিনার বিক্রেতার নিকট। আর "কাটাকাটি" যখন নতুন চুক্তি ধরা হলো তখন এটাই হলো যে চুক্তিকালে দিনার ক্রেতার যে পাওনা ছিল সেই পাওনা দশ দিরহামের বিনিময়ে দিনারটি ক্রয় করা হলো। সুতরাং এ সুরতটিও পূর্বের সুরতের ন্যায়ই হলো। সারকথা হচ্ছে কাটাকাটির পূর্বে ক্রেতার ঋণ সাব্যস্ত হলেই যথেষ্ট হবে, প্রথম বিক্রয়চুক্তির পূর্বে ঋণ থাকা আবশ্যক নয়। কেননা, কাটাকাটি হচ্ছে পুনরায় চুক্তির ন্যায়। কাজেই সেই সময়টি ধর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য, এ সুরতেও আল্লামা ইবনে হুমাম (র.)-এর বর্ণিত দলিল অনুসারে কাটাকাটিকে নতুন চুক্তি ধরে নেওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই; বরং এ ক্ষেত্রেও জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, পরস্পরে নগদ হস্তগত করা শর্ত হওয়ার যা উদ্দেশ্য তা ঋণের বিনিময়ে কাটাকাটির দ্বারা অর্জিত হয়। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয় পক্ষে সমতা রক্ষা করা। আর আলোচ্য সুরতে তা অর্জিত হয়েছে। কারণ, কোনো পক্ষের দ্রব্যই মজলিসের পরে বাকি থাকেনি।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيْحٍ الخ : دِرْهَمٌ صَحِيْحٌ [সহীহ দিরহাম] বলা হয় এমন দিরহামকে যা সম্পূর্ণটি একটি টুকরো। আর دِرْهَمٌ غَلَّةٌ [গল্লাহ দিরহাম] বলা হয় এমন দিরহামকে যা একাধিক টুকরোয় বিভক্ত। বর্তমানে আমাদের দেশের এক টাকার কয়েন এবং খুচরা পয়সার এক টাকার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। খুচরা পয়সার এক টাকা যেমন দুটি আধলি [৫০ পয়সা] কিংবা চারটি সিকি [২৫ পয়সা] মিলে এক টাকা হয়, কিন্তু তা এক টাকা হলেও কয়েক টুকরায় বিভক্ত, আর এক টাকার কয়েন হলে টাকাটি সম্পূর্ণ একটি টুকরা হয়। কাজেই এক টাকার কয়েন হচ্ছে পূর্বেকার সহীহ দিরহামের পর্যায়ের, আর খুচরা পয়সার এক টাকা হচ্ছে পূর্বেকার 'গল্লাহ দিরহাম'-এর পর্যায়ের। তবে সহীহ দিরহাম ও 'গল্লাহ দিরহাম' ওজনের ক্ষেত্রে সমান সমান হতো। 'গল্লাহ দিরহাম' একাধিক টুকরায় বিভক্ত হওয়ার কারণে সেকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা 'বাইতুল মাল' তা গ্রহণ করত না, তবে ব্যবসায়ীরা তা গ্রহণ করত। আর সহীহ দিরহাম উভয়েই গ্রহণ করত।

মাসআলা হলো, কেউ যদি দুটি দিরহাম ও একটি 'গল্লাহ দিরহাম'-এর বিনিময়ে একটি সহীহ দিরহাম ও দুটি 'গল্লাহ দিরহাম' বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই তিন দিরহাম করে রয়েছে এবং ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্যই সমান। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বায়ু সরফ' -এর ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ওজনের দিক থেকে উভয় পক্ষের দ্রব্য সমান সমান হওয়া। আর গুণগত দিক থেকে তারতম্য থাকলে তা ধর্তব্য হয় না। কাজেই 'বায়ু সরফ'-এর শর্ত মোতাবেক হওয়ার কারণে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে।

قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِضَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيْرِ الذَّهَبُ فَهِيَ ذَهَبٌ، وَيُعْتَبَرُ فِيْهِمَا مِنْ تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ حَتّٰى لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْخَالِصَةِ بِهَا وَلَا بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ إِلَّا مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ، وَكَذَا لَا يَجُوْزُ الْاِسْتِقْرَاضُ بِهَا إِلَّا وَزْنًا ، لِأَنَّ النُّقُوْدَ لَا تَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلِ غِشٍّ عَادَةً، لِأَنَّهَا لَا تَنْطَبِعُ إِلَّا مَعَ الْغِشِّ، وَقَدْ يَكُوْنُ الْغِشُّ خَلْقِيًّا كَمَا فِي الرَّدِيِّ مِنْهُ، فَيَلْحَقُ الْقَلِيْلُ بِالرَّدَاءَةِ، وَالْجَيِّدُ وَالرَّدِيُّ سَوَاءٌ -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দিরহামের মধ্যে যদি রৌপ্যের অংশ প্রধান হয় তাহলে তা [সম্পূর্ণ] রৌপ্য বলেই বিবেচিত হবে। আর দীনারের মধ্যে যদি স্বর্ণের অংশ বেশি হয় তাহলে তা [সম্পূর্ণ] স্বর্ণ বলেই বিবেচিত হবে। আর উভয়টিতে তখন কমবেশি করা হারাম হওয়ার বিষয়টি ঠিক সেরূপই বিবেচিত হবে যেরূপ উৎকৃষ্ট দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। সুতরাং এরূপ মুদ্রার বিনিময়ে খাঁটি মুদ্রা কিংবা এরূপ মুদ্রার একটির বিনিময়ে অন্যটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওজনের দিক থেকে সমতা ব্যতীত বিক্রয় জায়েজ হবে না। তদ্রূপ এরূপ খাদযুক্ত মুদ্রা ওজনের ভিত্তিতে না হলে কর্জ গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা, [স্বর্ণ ও রৌপ্য] মুদ্রা সাধারণত সামান্য খাদ থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, খাদ ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্য জমাট বাঁধে না। আর কখনো সৃষ্টিগতভাবেই খাদ থাকে। যেমন– নিম্নমানের স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে। অতএব, অল্প খাদকে স্বর্ণ-রৌপ্য নিম্নমানের হওয়া বলে গণ্য করা হবে। আর উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-রৌপ্য ও নিকৃষ্ট স্বর্ণ-রৌপ্য সমান বলে গণ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الخ : মাসআলা হলো, যদি দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা]-এর মাঝে খাদ হিসেবে অন্য ধাতব পদার্থ মিশ্রিত করা থাকে তাহলে যদি রূপার পরিমাণ বেশি হয় আর খাদের পরিমাণ কম হয় তাহলে দিরহামটি বিধানগত দিক থেকে রূপা হিসেবেই গণ্য হবে। কাজেই এরূপ দিরহামের বিনিময়ে যদি খাঁটি রূপা ক্রয় করে কিংবা এরূপ খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে অন্য একটি খাদযুক্ত দিরহাম ক্রয় করে, তাহলে সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যক হবে। এরূপভাবে দিনার [স্বর্ণমুদ্রা]-এর ক্ষেত্রে যদি স্বর্ণের পরিমাণ বেশি থাকে আর খাদের পরিমাণ কম থাকে, তাহলে উক্ত দিনারটি বিধানগত দিক থেকে স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে। কাজেই তা দ্বারা যদি খাঁটি স্বর্ণ ক্রয় করা হয় কিংবা অন্য একটি খাদযুক্ত দিনার ক্রয় করা হয় তাহলে উভয় পক্ষে স্বর্ণ হওয়ার কারণে উভয় দিকের দ্রব্য ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যক হবে।

আর এরূপ খাদযুক্ত দিরহাম কিংবা দিনার কর্জ দিলে তা ওজনের ভিত্তিতে দেওয়া আবশ্যক হবে; সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে তা কর্জ দেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য হচ্ছে ওজন-পরিমাপিত দ্রব্য। কাজেই তা ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। সুতরাং খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার যেহেতু বিধানগত দিক থেকে রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে সেহেতু তা ওজনের দিক থেকে সমান সমান হওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ النُّقُوْدَ لَا تَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلِ غِشٍّ الخ : খাদের পরিমাণ কম হলে দিরহামকে রৌপ্য হিসেবে গণ্য করা এবং দিনারকে স্বর্ণ হিসেবে গণ্য করার দলিল হলো, মুদ্রা তথা দিরহাম ও দিনার সাধারণত খাদ ছাড়া হয় না। কেননা, খাঁটি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের সাথে খাদ মিশ্রিত না করলে তা মজবুত হয় না, ফলে তা দ্বারা মুদ্রা তৈরি করা সম্ভব হয় না। আবার কখনও কখনও প্রাকৃতিকভাবেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের সাথে খাদ যুক্ত থাকে। যেমন নিম্নমানের স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের সাথে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু খাদ মিশ্রিত থাকে। আর হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নমানের স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং উৎকৃষ্ট মানের স্বর্ণ ও রৌপ্য বিধানগত দিক থেকে সমান বলে গণ্য হয়। কাজেই অল্প খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার নিম্নমানের রৌপ্য ও স্বর্ণের পর্যায়ের বলে গণ্য হবে। অতএব, তা খাঁটি স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করা হারাম হবে।

وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغِشُّ فَلَيْسَا فِيْ حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ اِعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ فَإِنِ اشْتَرٰى بِهَا فِضَّةً خَالِصَةً فَهُوَ عَلَى الْوُجُوْهِ الَّتِيْ ذَكَرْنَاهَا فِيْ حِلْيَةِ السَّيْفِ.

অনুবাদ : আর যদি দিরহাম দিনারের মাঝে 'খাদ'-এর পরিমাণ প্রধান হয় তাহলে তার বিধান স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিধানের ন্যায় হবে না। কেননা, প্রধান অংশের দিক বিবেচ্য হয়। সুতরাং যদি এরূপ দিরহামের বিনিময়ে খাঁটি রূপা ক্রয় করে তাহলে তার বিধান ঐ সকল সুরতের অনুরূপ হবে যা আমরা রৌপ্যখচিত তরবারির ক্ষেত্রে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغِشُّ الخ : যদি দিরহাম বা দিনারের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি হয় আর রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ কম হয় তাহলে তা বিধানগত দিক থেকে দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা] বা দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] বলে গণ্য হবে না; বরং তা রৌপ্য বা স্বর্ণ সংযুক্ত সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে খাদের পরিমাণ বেশি, আর যার পরিমাণ বেশি হয় তা ধর্তব্য হয়। কাজেই তা সাধারণ দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে, মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না।

অতএব, যদি কেউ এরূপ খাদযুক্ত দিরহামের বিনিময়ে খাঁটি রৌপ্য ক্রয় করে কিংবা এরূপ খাদযুক্ত দিনারের বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ ক্রয় করে, তাহলে তার বিধানের ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত রৌপ্য সংযুক্ত তরবারি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কয়টি সুরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে কয়টি সুরত প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ দিরহামের ক্ষেত্রে মাসআলাটি হবে এরূপ যে, যদি অপর পক্ষের খাঁটি রৌপ্যের পরিমাণ খাদযুক্ত দিরহামের মাঝে যে পরিমাণ রৌপ্য বিদ্যমান আছে তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। এ ক্ষেত্রে বেশিটুকু দিরহামের মধ্যে যে খাদ রয়েছে তার বিনিময়ে ধরা হবে।

আর যদি অপর পক্ষে খাঁটি রৌপ্যের পরিমাণ খাদযুক্ত দিরহামের মাঝে যে পরিমাণ রৌপ্য বিদ্যমান আছে তার সমান হয় কিংবা কম হয় অথবা কম না বেশি তা জানা না থাকে, তাহলে দিরহামের রৌপ্যের অংশে বিক্রয় নাজায়েজ হবে। আর খাদের অংশ যদি রৌপ্যের অংশ থেকে কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়া পৃথক করা সম্ভব হয় তাহলে খাদের অংশের বিক্রয় বহাল থাকবে। অন্যথায় খাদের অংশের বিক্রয়ও নাজায়েজ হবে। এর বিস্তারিত কারণ পূর্বে রৌপ্য সংযুক্ত তরবারি বিক্রয়ের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে মুসান্নিফ (র.) খাদযুক্ত দিরহাম দিনারের ক্ষেত্রে কেবল দুটি সুরতের বিধান উল্লেখ করেছেন–

১. খাদের পরিমাণ কম হলে তার বিধান।

২. খাদের পরিমাণ বেশি হলে তার বিধান। কিন্তু খাদের পরিমাণ রৌপ্য বা স্বর্ণের সমান হলে তার বিধান কি হবে? তা উল্লেখ করেননি। এর বিধান হলো, এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণটি রৌপ্য বা স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হবে। অর্থাৎ খাদের তুলনায় রৌপ্য বা স্বর্ণের পরিমাণ বেশি হলে যেরূপ তা রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবেই গণ্য হয় তদ্রূপ সমান সমান হলেও রৌপ্য ও স্বর্ণ হিসেবে গণ্য হবে। –[ফতোয়ায়ে শামী খণ্ড-৭, পৃ. ৫৩৪]

فَإِنْ بِيْعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلاً جَازَ صَرْفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ فَهِيَ فِيْ حُكْمِ شَيْئَيْنِ فِضَّةٍ وَصُفْرٍ، وَلٰكِنَّهُ صَرْفٌ حَتّٰى يُشْتَرَطَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِوُجُوْدِ الْفِضَّةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَإِذَا شُرِطَ الْقَبْضُ فِي الْفِضَّةِ يُشْتَرَطُ فِي الصُّفْرِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُ إِلَّا بِضَرَرٍ، قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَمَشَايِخُنَا (رحـ) لَمْ يُفْتُوْا بِجَوَازِ ذٰلِكَ فِي الْعَدَالِيْ وَالْغَطَارِفَةِ، لِأَنَّهَا أَعَزُّ الْأَمْوَالِ فِيْ دِيَارِنَا فَلَوْ أُبِيْحَ التَّفَاضُلُ فِيْهِ يَنْفَتِحُ بَابُ الرِّبٰوا .

অনুবাদ : সুতরাং যদি এরূপ খাদ-প্রধান দিরহাম সমশ্রেণীর দিরহামের বিনিময়ে কমবেশি করে বিক্রয় করে, তাহলে জায়েজ হবে : [এ বৈধতা হচ্ছে] খাদ ও রৌপ্যের প্রত্যেকটি অপর শ্রেণীর বিপরীতে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। সুতরাং দিরহামগুলো দুটি জিনিস তথা রৌপ্য ও পিতলের হুকুমভুক্ত হবে। তবে উভয় দিকে রৌপ্য থাকার কারণে চুক্তিটি 'বায় সরফ' হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং উভয় দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক হবে। আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে যখন হস্তগত করা আবশ্যক হলো, তখন পিতলের ক্ষেত্রেও হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা, ক্ষতি ছাড়া পিতলকে রৌপ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, তবে আমাদের মাশায়েখগণ [ফকীহগণ] আদালী ও গাতরেফী দিরহামের ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না। কেননা, এ দুটি হচ্ছে আমাদের দেশের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। কাজেই যদি এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিনিময় বৈধ করা হয়, তাহলে 'রিবা' [সুদ] -এর দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بِيْعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلاً جَازَ الخ : মাসআলা হলো, যে সকল দিরহামের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি তা যদি অনুরূপ অধিক খাদযুক্ত দিরহামের বিমিনেয় কমবেশি করে বিক্রয় করে তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। অর্থাৎ উভয় পক্ষে সমান সমান হওয়া আবশ্যক হবে না। দিনারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে। এ ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু খাদ বেশি হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ দিরহাম রৌপ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে না, সেহেতু উভয় পক্ষেই দুটি করে দ্রব্য সাব্যস্ত হচ্ছে–

১. রৌপ্য,

২. খাদ তথা পিতল [বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থ]।

সুতরাং যদি প্রথম পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের পিতল এবং প্রথম পক্ষের পিতলের বিনিময়ে অপর পক্ষের রৌপ্য ধরা হয় তাহলে উভয় পক্ষের দ্রব্যের শ্রেণী ভিন্ন হওয়ার কারণে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হয়। অতএব, বিক্রয় যথাসম্ভব জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য তা-ই ধরা হবে। উল্লেখ্য, এ মাসআলার অনুরূপ মাসআলা হিদায়া গ্রন্থের ৯২ নং পৃষ্ঠার শুরুতে মতবিরোধ ও দলিলসহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّهُ صَرْفٌ حَتّٰى يُشْتَرَطَ الْقَبْضُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য সুরতে যদি এক পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের পিতল ধরা হয় তাহলে চুক্তিটি 'বায় সরফ' হবে না। কেননা, 'বায় সরফ' হয় যদি উভয় পক্ষের দ্রব্য স্বর্ণ বা রৌপ্য হয়। সুতরাং যদি 'বায় সরফ' না হয়, তাহলে উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে তথা উভয় পৃথক হওয়ার পূর্বে হস্তগত করা আবশ্যক হবে না। অথচ আলোচ্য সুরতে বিধান হলো, উভয় পক্ষের দ্রব্য মজলিসে হস্তগত করা আবশ্যক।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে চুক্তিটি 'বায় সরফ'-ই হবে। এর কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে যে এক পক্ষের রৌপ্যের বিনিময়ে অপর পক্ষের খাদ তথা পিতল ধরা হয়েছে তা ছিল চুক্তিটি জায়েজ করার জন্য অনিবার্য কারণে। আর প্রয়োজনের তাগিদে অনিবার্য কারণে যা ধরা হয় তা কেবল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার প্রভাব অন্য ক্ষেত্রে পড়ে না। কাজেই 'বায় সরফ' না হওয়ার বিষয়টি কেবল কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রেই ধর্তব্য হবে। আর নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে এটি 'বায় সরফ' হিসেবেই বহাল থাকবে। কেননা, উভয় দিকে প্রকৃতপক্ষে রৌপ্য রয়েছে। আর উভয় দিকে রৌপ্য থাকার কারণে যখন উভয়ের রৌপ্য নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হয়েছে তখন অবশিষ্ট খাদ তথা পিতলের ক্ষেত্রেও নগদ হস্তগত করা আবশ্যক হবে। কেননা, ক্ষতি সাধন ব্যতীত খাদ রৌপ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। সুতরাং উভয় অংশই নগদ হস্তগত করা শর্ত হবে।

قَوْلُهُ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَمَشَايِخُنَا (رحـ) الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, দিরহাম বা দিনারের ক্ষেত্রে খাদের পরিমাণ বেশি হলে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তখন কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। কিন্তু আমাদের 'মা ওরাউন নাহর' তথা বুখারা ও সমকন্দ-এর মাশায়েখগণ 'আদালী' ও 'গাতারিফ' মুদ্রার ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না। অথচ এ দুটি মুদ্রার মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি, তাই উপরে বর্ণিত মাসআলা অনুসারে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ হওয়ার কথা। এ দুটি মুদ্রার ক্ষেত্রে তাদের কমবেশি করে বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া না দেওয়ার কারণ হলো, এ দুটি মুদ্রার ক্ষেত্রে যদি কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ ফতোয়া প্রদান করা হয় তাহলে জনগণ এ জনপ্রিয় মুদ্রার ক্ষেত্রে কমবেশি করে বিক্রয় করতে করতে ক্রমান্বয়ে খাঁটি দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা আরম্ভ করে দিবে। ফলে তারা 'রিবা' তথা সুদী লেনদেনের মাঝে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাই 'রিবা' বা সুদের পথ যাতে উন্মুক্ত হয়ে না পড়ে সেজন্য ফকীহগণ উক্ত দুটি ক্ষেত্রে কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন না।

জ্ঞাতব্য : عَدَالِيٌّ 'আদালী' হচ্ছে তৎকালীন এক বাদশার নাম। তার নামানুসারে এক প্রকার অধিক খাদযুক্ত দিরহামকে 'আদালী' বলা হতো। আর غَطَارِفَةٌ হচ্ছে– غَطْرِيْفُ بْنُ عَطَاءِ الْكِنْدِيْ -এর নামানুসারে নামকরণকৃত এক প্রকার দিরহাম। এ দিরহামেও খাদের পরিমাণ বেশি থাকত। غَطْرِيْفُ بْنُ عَطَاءِ ছিলেন বাদশাহ হারুনুর রশীদ-এর শাসনামালে খুরাসানের গভর্নর। তবে কারো কারো মতে তিনি বাদশাহ হারুনুর রশীদের মামা ছিলেন।

ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تُرَوَّجُ بِالْوَزْنِ فَالتَّبَايُعُ وَالْإِسْتِقْرَاضُ فِيْهِمَا بِالْوَزْنِ، وَإِنْ كَانَتْ تُرَوَّجُ بِالْعَدِّ فَبِالْعَدِّ، وَإِنْ كَانَتْ تُرَوَّجُ بِهِمَا فَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمُعْتَادُ فِيْهِمَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا نَصٌّ، ثُمَّ هِيَ مَا دَامَتْ تُرَوَّجُ تَكُوْنُ أَثْمَانًا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَإِذَا كَانَتْ لَا تُرَوَّجُ فَهِيَ سِلْعَةٌ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِيْنِ، وَإِذَا كَانَتْ يَتَقَبَّلُهَا الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ فَهِيَ كَالزُّيُوْفِ، لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بَلْ بِجِنْسِهَا زُيُوْفًا، إِنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا لِتَحَقُّقِ الرِّضَاءِ مِنْهُ، وَبِجِنْسِهَا مِنَ الْجِيَادِ، إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لِعَدَمِ الرِّضَاءِ مِنْهُ -

অনুবাদ : আর খাদ-প্রধান দিরহাম দিনার যদি ওজন হিসেবে প্রচলিত হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় ও কর্জ গ্রহণ ওজনের ভিত্তিতে করতে হবে। আর যদি গণনার ভিত্তিতে প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে গণনার ভিত্তিতেই করতে হবে। আর যদি ওজন এবং গণনা উভয়ের ভিত্তিতে প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে উভয়ের যে কোনোটির ভিত্তিতেই তা করতে পারবে। কেননা, খাদ-প্রধান দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে যেহেতু 'নস' [শরিয়তের স্পষ্ট বাণী] নেই সেহেতু এ দুটির ক্ষেত্রে প্রচলনই বিবেচ্য হবে। আর যে পর্যন্ত তা [মুদ্রা হিসেবে] প্রচলিত থাকবে সে পর্যন্ত তা 'মূল্যদ্রব্য' বলে গণ্য হবে, নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে না। আর যখন তা [মুদ্রা হিসেবে] প্রচলিত না থাকবে তখন তা পণ্যদ্রব্য বলে গণ্য হবে, নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট বলে গণ্য হবে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ কেউ তা [মুদ্রা হিসেবে] গ্রহণ করে আর কেউ কেউ গ্রহণ করে না তাহলে তা ত্রুটিযুক্ত মুদ্রার ন্যায় হবে। তখন চুক্তির সম্পর্ক নির্দিষ্ট মুদ্রার সাথে হবে না; বরং বিক্রেতা যদি উক্ত মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে ঐ শ্রেণীর ত্রুটিযুক্ত [অনির্দিষ্ট] মুদ্রার সাথে চুক্তি সম্পর্কিত হবে। কেননা, তার পক্ষ থেকে সম্মতি বিদ্যমান আছে। আর যদি বিক্রেতা উক্ত মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে ঐ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট [অনির্দিষ্ট] মুদ্রার সাথে চুক্তির সম্পর্ক হবে। কেননা, [ত্রুটিযুক্ত মুদ্রা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে] তার পক্ষ থেকে সম্মতি বিদ্যমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ تُرَوَّجُ بِالْوَزْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে যে খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনারের আলোচনা করা হয়েছে [অর্থাৎ যে সকল দিরহাম বা দিনারে খাদের পরিমাণ বেশি থাকে] সেগুলো যদি জনসমাজে ওজনের ভিত্তিতে লেনদেনের প্রচলন হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা তা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে হলে ওজনের ভিত্তিতেই করতে হবে; গণনার ভিত্তিতে তার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় বা তা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করা জায়েজ হবে না। আর যদি জনসমাজে এগুলোর লেনদেন গণনার ভিত্তিতে প্রচলিত হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা কর্জ হিসেবে তা আদান-প্রদান গণনার ভিত্তিতেই করতে হবে; ওজনের ভিত্তিতে করা জায়েজ হবে না। আর জনসমাজে যদি এগুলোর লেনদেন ওজনের ভিত্তিতে এবং গণনার ভিত্তিতে উভয় পদ্ধতিতেই প্রচলন থেকে থাকে তাহলে উভয় পদ্ধতিতে [অর্থাৎ গণনার ভিত্তিতে এবং ওজনের

ভিত্তিতে] এগুলোর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কিংবা কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে পারবে। সারকথা, যে পদ্ধতিতে প্রচলন হবে সে পদ্ধতিতেই তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ও কর্জ হিসেবে আদান-প্রদান করতে হবে।

এর কারণ হচ্ছে– কোনো দ্রব্য ওজন-পরিমাপিত হবে নাকি গণনা-নির্ভর হবে সে সম্পর্কে যদি শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো 'নস' [নির্দেশ-বাণী] না থাকে তাহলে তা জনসমাজের প্রচলনের উপর নির্ভরশীল হবে। সুতরাং অধিক খাদযুক্ত দিরহাম-দিনারের ক্ষেত্রে যেহেতু শরিয়তের কোনো 'নস' [নির্দেশ-বাণী] নেই, সেহেতু জন-প্রচলনের উপরই তা নির্ভরশীল হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ مَا دَامَتْ تَرُوجُ تَكُونُ أَثْمَانًا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উপরে বর্ণিত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম ও দিনার যতক্ষণ পর্যন্ত জনসমাজে সচল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিধানগতভাবে মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। আর মুদ্রা যেহেতু নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয় না, সেহেতু এ ক্ষেত্রে উক্ত মুদ্রাও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা অনির্দিষ্ট হিসেবেই গণ্য হবে। ফলে কেউ যদি এরূপ মুদ্রা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে আর ক্রয়কালে মুদ্রাগুলো নির্দিষ্ট করে বলে যে, এ দশটি মুদ্রা দ্বারা আমি ক্রয় করলাম, তাহলে তার উপর উক্ত নির্দিষ্ট মুদ্রা হস্তান্তর করা আবশ্যক হবে না; বরং এরূপ যে কোনো দশটি মুদ্রা সে হস্তান্তর করতে পারবে। কেননা, তা নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। আর মুদ্রাগুলো হস্তান্তর করার পূর্বে তা যদি হালাক হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হবে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তিতে যদি হস্তান্তর করার পূর্বে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত মুদ্রা হালাক হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হয় না।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ لَا تَرُوجُ فَهِيَ سِلْعَةٌ الخ : আর যদি উক্ত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার জনসমাজে অচল হয়ে যায় তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা সাধারণ পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আর সাধারণ পণ্য-দ্রব্য যেহেতু নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয় সেহেতু উক্ত দিরহাম-দিনারও নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। আর এরূপ অবস্থায় উক্ত দিরহাম বা দিনার যদি কেউ বিক্রয় করে আর তা হস্তান্তর করার পূর্বেই হালাক হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা মুদ্রাদ্রব্য হিসেবে গণ্য না হওয়ায় বিক্রেয়দ্রব্য (مَبِيْع) হিসেবে গণ্য হবে। আর হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেয়দ্রব্য হালাক হয়ে গেলে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, এ বিধান হবে কেবল ঐ সুরতে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিষয়টি জানে যে, উক্ত দিরহামগুলো অচল এবং তাদের প্রত্যেকে এটাও জানে যে, অপর পক্ষও অচল হওয়ার বিষয়টি জানে। পক্ষান্তরে যদি অচল হওয়ার বিষয়টি তাদের কারো জানা না থাকে কিংবা তাদের একজনের জানা না থাকে অথবা প্রত্যেকেই জানে কিন্তু এক পক্ষের জানা থাকার কথা অপর পক্ষের জানা না থাকে, তাহলে এ তিন সুরতে নির্ধারিত অচল দিরহামের সাথে চুক্তিটি সংশ্লিষ্ট হবে না। বরং সমপরিমাণ সচল দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। আর তা হস্তান্তরের পূর্বে হালাক হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَتْ يَتَقَبَّلُهَا الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ الخ : আর যদি উক্ত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনারের অবস্থা এমন হয় যে, তা জনসমাজের কেউ কেউ মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে আর কেউ কেউ গ্রহণ করে না। অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ অচলও নয় আবার সম্পূর্ণ সচলও নয়। তাহলে বিধান হলো, উক্ত দিরহাম বা দিনার ত্রুটিপূর্ণ দিরহাম বা দিনার হিসেবে গণ্য হবে। এ সুরতে যদি তা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে তাহলে যদি বিক্রেতার উক্ত মুদ্রাগুলো যে কেউ কেউ গ্রহণ করে না তা জানা থাকে তাহলে বিক্রেতা সমপরিমাণ ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রা (زُيُوْف) পাবে। কেননা, সে জেনেশুনে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রাগুলো গ্রহণে সম্মত হয়েছে। আর যদি বিক্রেতার তা জানা থাকে তাহলে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা সমপরিমাণ ভাল মুদ্রা পাবে। কেননা, ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করার ব্যাপারে বিক্রেতার সম্মতি পাওয়া যায়নি। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রেতার না জানা থাকলে বিধান হলো, চুক্তিকারীদ্বয়ের অঞ্চলে যে মুদ্রার প্রচলন সবচেয়ে বেশি বিক্রেতা তা পাবে। আর যদি এমন হয় যে, সবক'টি মুদ্রার প্রচলন সমান তাহলে দেখতে হবে সবগুলো মুদ্রার মান সমান কিনা? যদি মান সমান হয় তাহলে যে কোনো একটি দিলেই জায়েজ হবে। আর যদি মুদ্রার মান ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণনায় কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, খণ্ড-পৃ. ১৪৫]

وَإِذَا اشْتَرٰى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) عَلَيْهِ قِيْمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) : قِيْمَتُهَا اٰخِرُ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا. لَهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ صَحَّ إِلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيْمُ بِالْكَسَادِ، وَإِنَّهُ لَا يُوْجِبُ الْفَسَادَ، كَمَا إِذَا اشْتَرٰى بِالرُّطَبِ فَانْقَطَعَ، وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ وَجَبَتِ الْقِيْمَةُ لٰكِنَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) وَقْتَ الْبَيْعِ، لِأَنَّهُ مَضْمُوْنٌ بِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَوْمَ الْاِنْقِطَاعِ، لِأَنَّهُ أَوَانُ الْاِنْتِقَالِ إِلَى الْقِيْمَةِ، وَلِأَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ الثَّمَنَ يَهْلِكُ بِالْكَسَادِ، لِأَنَّ الثَّمَنِيَّةَ بِالْاِصْطِلَاحِ، وَمَا بَقِيَ فَيَبْقٰى بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَيَبْطُلُ، وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ يَجِبُ رَدُّ الْمَبِيْعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَقِيْمَتِهٖ إِنْ كَانَ هَالِكًا، كَمَا فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ـ

অনুবাদ : যদি খাদপ্রধান দিরহাম দ্বারা কোনো পণ্য ক্রয় করে, অতঃপর তা অচল হয়ে যায় এবং জনসমাজ এগুলোর মাধ্যমে লেনদেন পরিত্যাগ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বিক্রয়ের দিন দিরহামগুলোর যা বাজারমূল্য ছিল ক্রেতাকে তাই পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জনসমাজ ঐরূপ দিরহামের মাধ্যমে সর্বশেষ যেদিন লেনদেন করেছে সেদিনের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, চুক্তিটি বিশুদ্ধরূপে সম্পাদিত হয়েছে, তবে মুদ্রাগুলো অচল হয়ে পড়ায় মূল্য পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর [এরূপ] অসম্ভব হয়ে পড়া চুক্তি বিনষ্ট হওয়াকে অনিবার্য করে না। যেমন– কেউ যদি তাজা খেজুরের বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে অতঃপর তাজা খেজুর বাজার থেকে উঠে যায় [তাহলে চুক্তি বাতিল হয় না]। সুতরাং যখন চুক্তি বহাল রইল তখন সেগুলোর বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে বিক্রয়ের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, বিক্রয়ের কারণেই তার উপর মূল্য পরিশোধের দায় সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বাজার থেকে তা উঠে যাওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, এ সময়েই দিরহামগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য পরিশোধের দায় তার উপর আবর্তিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, অচল হওয়ার কারণে 'মূল্য' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত দিরহামগুলো মুদ্রা হয়েছিল জন-প্রচলনের কারণে, আর [আলোচ্য সুরতে] এখন সেই প্রচলন বহাল নেই। সুতরাং এখন চুক্তিটি বহাল থাকলে তা থাকবে মূল্য ছাড়া বিক্রয়চুক্তি। কাজেই তা বাতিল হবে। আর যখন চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেল তখন যদি বিক্রীত-বস্তুটি ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে তাহলে ক্রেতার উপর তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি তা বিলুপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। যেমন [বিধান] ফাসেদ বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً الخ : মাসআলা হলো, যে সকল দিরহাম বা দিনারের মাঝে খাদের পরিমাণ বেশি তা দ্বারা যদি কেউ কোনো দ্রব্য ক্রয় করে অতঃপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে তা জনসমাজে অচল হয়ে যায় [অর্থাৎ ক্রয় করার সময় উক্ত দিরাহম বা দিনার সচল ছিল কিন্তু ক্রয় করার পর ক্রেতা নগদ মূল্য পরিশোধ করেনি। অতঃপর পরিশোধ করার পূর্বেই তা অচল হয়ে গেছে, এখন কেউ তা মুদ্রা রূপে গ্রহণ করে না।] তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান কি হবে তা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যদি ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত না করে থাকে তাহলে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। আর যদি ক্রেতা দ্রব্যটি হস্তগত করে থাকে তাহলে যদি দ্রব্যটি তখনও তার কাছে বিদ্যমান থাকে তাহলে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। আর যদি তা ধ্বংস হয়ে থাকে বা খরচ করে থাকে তাহলে দ্রব্যটি যদি সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) যেমন– ধান, গম ইত্যাদি হয়ে থাকে, তাহলে অনুরূপ দ্রব্য বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে। আর যদি দ্রব্যটি সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্য (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) না হয় তাহলে তার বাজারদর হিসেবে মূল্য পরিশোধ করে দিবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং ক্রেতা অচল হয়ে যাওয়া দিরহাম বা দিনারগুলো সচল থাকা অবস্থায় যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করবে। তবে কোন দিনের দর অনুযায়ী সেগুলোর মূল্য ধর্তব্য তা নিয়ে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেদিন বিক্রয়চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছে সেদিন উক্ত দিরহাম বা দিনারের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ যেদিন উক্ত দিরহাম বা দিনারের প্রচলন ছিল সেদিনের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় আমাদের মাযহাবে আমাদের ইমামগণের মধ্য হতে কার মতের উপর ফতোয়া হবে, সে ব্যাপারে ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে দুই ধরনের অভিমত উল্লেখ রয়েছে। 'যখীরা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতের উপরই ফতোয়া (وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى)। আর মুহীত, তাতিম্মাহ, আল-হাকায়িক ও আল-বাহরুর রায়িক-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতের উপর ফতোয়া। –[ফতোয়ায়ে শামী খণ্ড-৭, পৃ. ৫৩৬।]

قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ صَحَّ الخ : আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল না হয়ে উক্ত অচল হয়ে যাওয়া দিরহাম বা দিনারের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে তার দলিল হলো, বিক্রয়কালে সকলের ঐকমত্যে চুক্তিটি সঠিক হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত দিরহাম বা দিনারগুলো অচল হয়ে যাওয়ার কারণে নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর বিক্রয়চুক্তি সহীহভাবে সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো কারণে নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাতে বিক্রয়চুক্তি বাতিল হয় না। এর উদাহরণ হচ্ছে, কেউ যদি তাজা খেজুরের বিনিময়ে কোনো দ্রব্য ক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা উক্ত তাজা খেজুর হস্তান্তর করার পূর্বেই তাজা খেজুর দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে [অর্থাৎ এমন হয় যে, জনসমাজে তাজা খেজুর পাওয়া যাচ্ছে না] ফলে মূল্য হিসেবে নির্ধারিত খেজুর হস্তান্তর করা ক্রেতার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে সকলের ঐকমত্যে চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং মূল্য হিসেবে নির্ধারিত তাজা খেজুরের বাজারদর হিসেবে যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করবে, কিংবা বিক্রেতা পরবর্তী বছর বাজারে খেজুর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সুতরাং আলোচ্য সুরতেও নির্ধারিত মূল্য হস্তান্তর করা অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তিটি বাতিল হবে না; বরং উক্ত দিরহাম বা দিনারের যা মূল্য ছিল তা পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যেদিন চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সেদিনের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো ক্রেতার জিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে বিক্রয়চুক্তির কারণে। কাজেই চুক্তি সম্পাদনের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। যেমন– কেউ যদি কারো কোনো বস্তু আত্মসাৎ [গসব] করে, অতঃপর আত্মসাৎকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যেদিন সে বস্তুটি আত্মসাৎ করেছিল সেদিনের দর অনুযায়ী আত্মসাৎকারীর উপর বস্তুটির মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

কেননা, আত্মসাতের কারণেই তার উপর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়েছে, তাই আত্মসাতের দিনের মূল্যই ধর্তব্য হবে। সুতরাং আমাদের আলোচ্য মাসআলায়ও বিক্রয়চুক্তি সম্পাদনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো সর্বশেষ যেদিন সচল ছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা, সেদিনই ক্রেতার উপর উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়েছে। কেননা, মূলত তার উপর উক্ত দিরহাম বা দিনার পরিশোধ করা ওয়াজিব ছিল, অতঃপর তা অচল হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোর পরিবর্তে তার মূল্য ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং অচল হয়ে যাওয়ার ঠিক পূর্বে সেগুলোর যা বাজারমূল্য ছিল তাই পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَلِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) أَنَّ الثَّمَنَ يَهْلِكُ بِالْكَسَادِ الخ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো মুদ্রারূপে সাব্যস্ত হয়েছিল জনপ্রচলনের কারণে; খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সৃষ্টিগতভাবে এগুলো মুদ্রা ছিল না। সুতরাং যখন মুদ্রারূপে এগুলোর প্রচলন জনসমাজ থেকে উঠে গেছে তখন উক্ত মুদ্রাগুলো সামগ্রিকভাবে হালাক হয়ে গেছে ধরা হবে। ফলে এরূপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, এক পক্ষে বিক্রেয়দ্রব্য আছে, কিন্তু অপর পক্ষে মূল্যদ্রব্য নেই। সুতরাং তা আর বিক্রয়চুক্তি হিসেবে বহাল থাকতে পারে না। কেননা, বিক্রয়চুক্তির জন্য এক পক্ষে বিক্রেয়দ্রব্য আর অপর পক্ষে মূল্যদ্রব্য থাকা আবশ্যক। অতএব, চুক্তি বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে।

উল্লেখ্য, এখানে কারো প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রচলন উঠে যাওয়ার কারণে উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলো মুদ্রা হিসেবে গণ্য না হলে তো বিক্রয় বাতিল হওয়ার কথা নয়। কেননা, দিরহাম বা দিনারগুলোর মুদ্রা হওয়া বাতিল হলেও সাধারণ দ্রব্য হিসেবে তো তা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই উভয় পক্ষে সাধারণ দ্রব্য হিসেবে চুক্তিটি بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ বা উভয় পক্ষে বিক্রেয়দ্রব্যের চুক্তি রূপে বহাল থাকার কথা।

এর উত্তর হলো, এভাবে উভয় পক্ষে বিক্রেয়দ্রব্য হিসেবে চুক্তিটি বহাল রাখাও সম্ভব নয়। কেননা, আলোচ্য মাসআলায় দিরহাম বা দিনারগুলো ক্রেতার জিম্মায় ওয়াজিব হয়েছিল অনির্দিষ্টভাবে [কারণ, মুদ্রা নির্দিষ্ট হয় না]। আর অনির্দিষ্ট বস্তু 'বায় সলম' ব্যতীত অন্য কোনো ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে বিক্রেয়দ্রব্য হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া জায়েজ নয়। কাজেই উক্ত দিরহাম বা দিনারগুলোকে বিক্রেয়দ্রব্য সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে যখন বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে তখন বিধান হলো, যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে বস্তুটি হস্তগত করে থাকে তাহলে সে বস্তুটি বিক্রেতাকে ফেরত দিবে। আর ক্রেতার হাতে যদি তা ধ্বংস হয়ে থাকে কিংবা সে তা খরচ করে থাকে তাহলে বস্তুটি যদি এমন দ্রব্য হয় যার অনুরূপ বস্তু [তারতম্য ছাড়া] পাওয়া যায় (ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ) যেমন– ধান, গম, ডিম ইত্যাদি তাহলে তদ্রূপ বস্তু ফিরিয়ে দিবে। আর যদি এমন দ্রব্য হয় যার তারতম্যবিহীন অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায় না (ذَوَاتُ الْقِيَمِ) যেমন– গরু, বকরি ইত্যাদি তাহলে তার মূল্য ফিরিয়ে দিবে। অর্থাৎ বিক্রয়চুক্তি ফাসিদ হলে যেরূপ বিধান হয়, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

জ্ঞাতব্য : কোনো মুদ্রা অচল হয়েছে বলে কখন সাব্যস্ত হবে এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে যদি [একটি দেশের] সকল অঞ্চলে মুদ্রাটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তা অচল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যে অঞ্চলে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যদি সেই অঞ্চলে মুদ্রাটির প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তা চুক্তিকারীদ্বয়ের ক্ষেত্রে অচল হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। সকল অঞ্চলে তার প্রচলন বন্ধ হওয়া আবশ্যক নয়।

قَالَ : وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ، لِأَنَّهُ مَالٌ مَعْلُومٌ، فَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً جَازَ الْبَيْعُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ، لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ بِالْاِصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا، حَتَّى يُعَيِّنَهَا لِأَنَّهَا سِلَعٌ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا -

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ধাতব-পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা, ধাতব-পয়সা হচ্ছে একটি পরিজ্ঞাত মাল। আর ধাতব-পয়সা যদি প্রচলিত থাকে তাহলে সুনির্দিষ্ট না করেও তার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, প্রচলনের কারণে তা মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। আর যদি তা অচল হয়ে যায় তাহলে তা সুনির্দিষ্ট করা ব্যতীত তার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, তা এখন পণ্যবস্তু, কাজেই তা সুনির্দিষ্ট করা অপরিহার্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَيَجُوزُ الْبَيْعُ الخ : فُلُوسٌ শব্দটি فَلْسٌ-এর বহুবচন। فَلْسٌ বলা হয় এমন মুদ্রাকে যা স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু দ্বারা তৈরি। জনসমাজে তা মুদ্রারূপে প্রচলিত হয়েছে। আমরা এখানে এর অর্থ 'ধাতব মুদ্রা' করেছি।

মাসআলা : মুসান্নিফ (র.) বলেন, উল্লিখিত 'ধাতবমুদ্রা' দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ। কেননা, 'ধাতবমুদ্রা' শরিয়তসম্মত 'মাল'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তা বর্ণনা দ্বারা কিংবা উপস্থিত দেখিয়ে তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণ করা সম্ভব। আর শরিয়তসম্মত মালের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েজ, যদি তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্যাবলি নির্ধারণ করা হয়।

তবে মাসআলা হলো, ক্রয়কালে যদি উক্ত 'ধাতবমুদ্রা' প্রচলিত থাকে তাহলে তা মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে না [অর্থাৎ মুদ্রাগুলো উপস্থিত করে দেখিয়ে এভাবে বলতে হবে না যে, আমি এ দশটি মুদ্রা দ্বারা তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম; বরং এভাবে বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমি অমুক প্রকারের দশটি 'ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম]। কেননা, যদিও এগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় সৃষ্টিগতভাবে মুদ্রাদ্রব্য নয়, কিন্তু প্রচলনের কারণে এগুলো মুদ্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে। আর মুদ্রার বিধান হলো তা নিদিষ্ট করা আবশ্যক নয়; বরং নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হিসেবে গণ্য হয় না। এ কারণেই কেউ যদি দশটি মুদ্রা দেখিয়ে বলে যে আমি এ দশটি মুদ্রার বিনিময়ে তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম তবুও তার উপর ঐ দশটি মুদ্রা দেওয়া অপরিহার্য নয়; বরং যে কোনো দশটি মুদ্রা দিলেই যথেষ্ট হবে।

আর ক্রয়কালে যদি উক্ত 'ধাতবমুদ্রা' অচল হয়ে থাকে এবং তার প্রচলন বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো, তা নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সে এভাবে বলবে যে, আমি আমার হাতের এ দশটি 'ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যে কোনো দশটি মুদ্রা দিতে পারবে না; বরং যে দশটি দেওয়ার কথা বলেছে, তাই হস্তান্তর করতে হবে। এর কারণ হলো, অচল হয়ে যাওয়ার কারণে উক্ত মুদ্রাগুলো এখন আর মুদ্রা হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তা সাধারণ পণ্য-দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ পণ্য-দ্রব্য হলে তা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। কাজেই উক্ত 'ধাতবমুদ্রা' নির্দিষ্ট করা আবশ্যক হবে।

وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) خِلَافًا لَهُمَا وَهُوَ نَظِيرُ الْاِخْتِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ وَلَوِ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً فَكَسَدَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (رح) يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا، لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَمُوجِبُهُ رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنًى، وَالثَّمَنِيَّةُ فَضْلٌ فِيهِ، إِذِ الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ قِيمَتُهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ وَصْفُ الثَّمَنِيَّةِ تَعَذَّرَ رَدُّهَا كَمَا قَبَضَ، فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا كَمَا إِذَا اسْتَقْرَضَ مِثْلِيًّا فَانْقَطَعَ لٰكِنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ (رح) يَوْمَ الْقَبْضِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يَوْمَ الْكَسَادِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ، وَأَصْلُ الْاِخْتِلَافِ فِيمَنْ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَانْقَطَعَ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ (رح) أَنْظَرُ لِلْجَانِبَيْنِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (رح) أَيْسَرُ.

অনুবাদ : যদি প্রচলিত ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করে অতঃপর [মূল্য পরিশোধের পূর্বেই] তা অচল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁদের মতবিরোধ আমাদের পূর্ববর্ণিত মতবিরোধের অনুরূপ। যদি কেউ প্রচলিত পয়সা কর্জ হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তা অচল হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কর্জগ্রহীতার উপর অনুরূপ পয়সা পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, "কর্জ" হচ্ছে إِعَارَةٌ বা ধার গ্রহণ, আর এর দাবি হচ্ছে গুণগত দিক থেকে অভিন্ন জিনিস ফেরত দেওয়া। আর মূল্যগুণ হলো তাতে বিদ্যমান একটি অতিরিক্ত বিষয়। কেননা, কর্জ মূল্যদ্রব্যের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কর্জগ্রহীতার উপর উক্ত পয়সার মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। কেননা, যখন তার মূল্যগুণ বাতিল হয়ে গেছে তখন যে অবস্থায় তা গ্রহণ করেছিল সে অবস্থায় তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই তার মূল্য ফেরত দেওয়া অপরিহার্য হবে। যেমন– যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু কর্জ গ্রহণ করে, অতঃপর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কর্জরূপে হস্তগত করার দিনের মূল্য [ধর্তব্য হবে] আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অচল হওয়ার দিনের মূল্য [ধর্তব্য হবে], যার বিবরণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মূল মতবিরোধ হলো ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু আত্মসাৎ করল, অতঃপর তা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি উভয় পক্ষের জন্য অধিক হিতকর। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটি [নির্ণয়ের ক্ষেত্রে] অধিকতর সহজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি প্রচলিত 'ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে কোনো বস্তু বিক্রয় করে, অতঃপর ক্রেতা উক্ত মুদ্রা পরিশোধ করার আগেই তা যদি অচল হয়ে যায় [অর্থাৎ তার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়] তাহলে এর বিধান কী হবে সে ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় বাতিল হবে না। ক্রেতা উক্ত

'ধাতবমুদ্রা'-এর যা মূল্য ছিল তা প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত 'ধাতবমুদ্রা'-এর মূল্য ধরা হবে যেদিন বিক্রয়চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল সেদিনের বাজারদর হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'ধাতবমুদ্রা'-এর মূল্য ধরা হবে সর্বশেষ যেদিন তা প্রচলিত ছিল সেদিনের বাজারদর হিসেবে। উল্লেখ্য, এ মাসআলার অনুরূপ মাসআলা মতবিরোধ এবং প্রত্যেক ইমামের দলিলসহ পূর্বর পৃষ্ঠায় [তথা হিদায়া গ্রন্থের ৯৩ নং পৃষ্ঠার শেষাংশে] বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য মাসআলায় মুসান্নিফ (র.) যেভাবে আমাদের ইমামগণের মতবিরোধের কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম কুদূরী (র.) ঠিক এভাবেই বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে 'আসল' তথা মাবসূত, শরহুত তাহাবী ও আল-আসরার গ্রন্থসমূহে আলোচ্য মাসআলায় বিক্রয়চুক্তিটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের তিন ইমামের কারো দ্বিমতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ইমাম যুফার (র.)-এর মতবিরোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার অচল হয়ে যাওয়ার মাসআলায় আমাদের তিন ইমামের মাঝে মতবিরোধের দাবি অনুসারে আলোচ্য মাসআলায় মতবিরোধ থাকারই কথা। কেননা, অধিক খাদযুক্ত দিরহাম বা দিনার অচল হয়ে যাওয়া এবং 'ধাতবমুদ্রা' অচল হয়ে যাওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কাজেই উভয় ক্ষেত্রে একই রকম মতবিরোধ হওয়ার কথা।]

قَوْلُهُ وَلَوِ اسْتَقْرَضَ فُلُوْسًا الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি কারো নিকট হতে প্রচলিত 'ধাতবমুদ্রা' ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর পরিশোধ করার পূর্বেই তা অচল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ঋণগ্রহীতা উক্ত অচল হয়ে যাওয়া 'ধাতবমুদ্রা'-এর দ্বারাই তার ঋণ পরিশোধ করবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত অচল হয়ে যাওয়া 'ধাতবমুদ্রা' দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না; বরং উক্ত 'ধাতবমুদ্রা'-এর যা মূল্য ছিল তা রৌপ্যমুদ্রা কিংবা স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উক্ত 'ধাতবমুদ্রা'-এর মূল্য ধরা হবে যেদিন ঋণ গ্রহণ করেছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার মূল্য ধরা হবে সর্বশেষ যেদিন উক্ত 'ধাতবমুদ্রা' প্রচলিত ছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের উপর ফতোয়া।-[ফতোয়ায়ে শামী, খণ্ড-৭, পৃ. ৫৩৮।]

আলোচ্য মাসআলায় মুসান্নিফ (র.) সাহেবাইনের দলিল পরে বর্ণনা করেছেন। আর দলিল বর্ণনার ক্ষেত্রে মুসান্নিফ (র.)-এর রীতি হলো, যার মতটি তাঁর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য তাঁর দলিলটি পরে বর্ণনা করা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর নিকট সাহেবাইন (র.)-এর অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ وَمُوْجَبُهُ رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنًى : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হলো, ঋণ [কর্জ] 'আরিয়াত' বা ধারগ্রহণ হিসেবে গণ্য হয়। উল্লেখ্য, ঋণ বা কর্জ হচ্ছে কোনো বস্তু নিয়ে তা খরচ করে পরে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু মালিককে ফেরত দেওয়া আর 'আরিয়াত' বা ধার হচ্ছে কোনো বস্তু নিয়ে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করে পরে মূল বস্তুটি মালিককে ফেরত দেওয়া। কিন্তু ঋণ বা কর্জকে 'আরিয়াত' হিসেবে ধরা হয়, তার কারণ হলো যদিও কর্জের ক্ষেত্রে মূল বস্তুটির পরিবর্তে তার সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এরূপ ধরে নেওয়া আবশ্যক হয় যে কর্জগ্রহীতা মূল বস্তুটিই ফিরিয়ে দিয়েছে। কেননা, যদি ধরা হয় যে কর্জগ্রহীতা মূল বস্তুর বিনিময়ে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু দিয়েছে তাহলে শ্রেণী ও পরিমাপ মাধ্যম (جِنْسٌ مَعَ الْقَدْرِ) এক হওয়ার কারণে নগদ আদান-প্রদান ওয়াজিব হয়, নতুবা 'রিবা' [সুদ]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাই অনিবার্য কারণে কর্জের ক্ষেত্রে এটাই ধরতে হয় যে, কর্জগ্রহীতা যেন মূল বস্তুটিই ফেরত দিয়েছে। সুতরাং তা 'আরিয়াত' বা ধার হিসেবে গণ্য হয়।

সারকথা কর্জ (ঋণ)-কে 'আরিয়াত' হিসেবে গণ্য করা হয়। আর আরিয়্যাতের দাবি হচ্ছে গ্রহীতা মূল বস্তুটি ফেরত দিবে। কিন্তু কর্জের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল বস্তুটি খরচ করেই উপকার গ্রহণ করা হয় সেহেতু প্রকৃতপক্ষে মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। আর বাহ্যত মূল বস্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব হলে সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তুর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মূল বস্তু পরিশোধ করা যায় [কিন্তু মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তা হয় না]। সুতরাং সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু পরিশোধের মাধ্যমেই উক্ত কর্জ আদায় করতে হবে।

قَوْلُهُ وَالثَّمَنِيَّةُ فَضْلٌ فِيْهِ الخ : এখান থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য সুরতে যেহেতু উক্ত মুদ্রা অচল হয়েছে সেহেতু অদ্রূপ অচল মুদ্রা পরিশোধের মাধ্যমে কীভাবে পরোক্ষভাবে মূল বস্তু ফেরত দেওয়া হয়। কেননা, যখন গ্রহীতা তা গ্রহণ করেছিল তখন তো মুদ্রাগুলো ছিল সচল, আর যখন সে পরিশোধ করছে তখন তা অচল হয়ে গেছে। কাজেই মানের দিক থেকে তা তো সমান হচ্ছে না।

উত্তরের সারকথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। কেননা, ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে মুদ্রা হওয়া কোনো অপরিহার্য বিষয় নয়। এ কারণেই উক্ত মুদ্রা অচল হয়ে যাওয়ার পর তা ঋণ হিসেবে আদান-প্রদান করা জায়েজ। কাজেই মুদ্রা হওয়া যখন ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় নয় তাই তা এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ قِيْمَتُهَا لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الخ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, যখন উক্ত 'ধাতবমুদ্রা' অচল হয়ে গেছে তখন তার মুদ্রা হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বিনষ্ট হয়েছে। কাজেই কর্জগ্রহীতা যেরূপ গ্রহণ করেছিল সেরূপ ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কাজেই তার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। আর মুদ্রা হওয়ার বিষয়টি যদিও কর্জের ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয়, কিন্তু কর্জ গ্রহণকালে তা বিদ্যমান থাকলে পরিশোধের সময় তা বিবেচনার বাইরে নয়। কারণ, ঋণ বা কর্জের ক্ষেত্রে বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলি ধর্তব্য হয়ে থাকে। সুতরাং উক্ত মুদ্রার মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে কেউ যদি সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু, যেমন– ধান, গম ইত্যাদি কর্জ হিসেবে গ্রহণ করে, অতঃপর তা পরিশোধ করার পূর্বেই তা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়, তাহলে কর্জগ্রহীতার উপর উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কর্জ গ্রহণের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ প্রচলনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য, এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে উভয়ের দলিল পূর্বের পৃষ্ঠায় [হিদায়ার ৯৩ নং পৃষ্ঠায়] বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ فِيْمَنْ غَصَبَ مِثْلِيًّا الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে এ ক্ষেত্রে যে মতবিরোধটির কথা উল্লেখ করা হলো, এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তাঁদের উভয়ের মাঝে মূল মতবিরোধটি হচ্ছে 'গসব' [আত্মসাৎ] সংক্রান্ত মাসআলায়। অর্থাৎ কেউ যদি কারো কোনো বস্তু 'গসব' [আত্মসাৎ] করে, আর বস্তুটি এমন হয় যার সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু পাওয়া যায় [যেমন– ধান, গম ইত্যাদি] অতঃপর গসবকারী সমপরিমাণ অনুরূপ বস্তু পরিশোধ করার পূর্বেই যদি উক্ত বস্তু বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায় তাহলে উভয়ের মতে গসবকারী উক্ত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে মূল্য ধরা হবে যেদিন 'গসব' করেছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে সর্বশেষ যেদিন বাজারে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল সেদিনের মূল্য হিসেবে।

قَوْلُهُ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنْظَرُ لِلْجَانِبَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি কর্জদাতা ও কর্জগ্রহীতা উভয়ের লাভ ক্ষতির প্রতি তুলনামূলক ভারসাম্য রক্ষাকারী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী উক্ত মুদ্রাগুলোর মূল্য নির্ণয় করা অধিক সহজতর। অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটি গ্রহণ করা হলে কর্জগ্রহীতা ও কর্জদাতা এদের উভয়ের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত গ্রহণ করা হলে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তাঁর মতানুসারে কর্জগ্রহীতা অচল মুদ্রা পরিশোধ করবে, ফলে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত গ্রহণ করা হলে কর্জগ্রহীতা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা, তাঁর মতানুসারে কর্জ গ্রহণ কালের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর মুদ্রদ্রব্য সাধারণত অচল হওয়ার পূর্বে ক্রমান্বয়ে তার মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। কাজেই কর্জ দেওয়ার সময় যে মূল্য ছিল তার চেয়ে অচল হওয়ার পূর্বে কম মূল্য ছিল। অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতটিতে কর্জদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতটিতে কর্জদাতা কেবল লাভবান হয়। সুতরাং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতটিতে উভয়ের লাভ-লোকসানের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা হয়।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী অচল মুদ্রাগুলোর মূল্য নির্ণয় করা সহজ হয়, তার কারণ হলো, যেদিন কর্জ গ্রহণ করা হয়েছে সেদিনটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট এবং উভয়ের জানা। কাজেই সেদিনের মূল্য কত ছিল তা নির্ণয় করতে কোনো সমস্যা দেখা দিবে না। পক্ষান্তরে সর্বশেষ কোন দিন মুদ্রাগুলো সচল ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে জনগণের বক্তব্যের মাঝে বিরোধ দেখা দিতে পারে। ফলে সর্বশেষ প্রচলনের দিনের মূল্য নির্ধারণ করা জটিল হয়ে যাবে।

قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوْسٍ جَازَ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفُلُوْسِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ بِدَانِقٍ فُلُوْسٍ أَوْ بِقِيْرَاطٍ فُلُوْسٍ جَازَ، وَقَالَ زُفَرُ (رحـ) لَا يَجُوْزُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ، لِأَنَّهُ اشْتَرٰى بِالْفُلُوْسِ، وَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ لَا بِالدَّانِقِ وَنِصْفِ الدِّرْهَمِ فَلَابُدَّ مِنْ بَيَانِ عَدَدِهَا، وَنَحْنُ نَقُوْلُ : مَا يُبَاعُ بِالدَّانِقِ وَنِصْفِ الدِّرْهَمِ مِنَ الْفُلُوْسِ مَعْلُوْمٌ عِنْدَ النَّاسِ، وَالْكَلَامُ فِيْهِ، فَأَغْنٰى عَنْ بَيَانِ الْعَدَدِ، وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوْسٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوْسٍ فَكَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) لِأَنَّ مَا يُبَاعُ بِالدِّرْهَمِ مِنَ الْفُلُوْسِ مَعْلُوْمٌ، وَهُوَ الْمُرَادُ، لَا وَزْنُ الدِّرْهَمِ مِنَ الْفُلُوْسِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ بِالدِّرْهَمِ، وَيَجُوْزُ فِيْمَا دُوْنَ الدِّرْهَمِ، لِأَنَّ فِي الْعَادَةِ الْمُبَايَعَةَ بِالْفُلُوْسِ فِيْمَا دُوْنَ الدِّرْهَمِ، فَصَارَ مَعْلُوْمًا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَلَا كَذٰلِكَ الدِّرْهَمُ، قَالُوْا : وَقَوْلُ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَصَحُّ لَاسِيَّمَا فِيْ دِيَارِنَا ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি অর্ধ-দিরহাম পয়সার বিনিময়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে তাহলে তা জায়েজ হবে। তাকে অর্ধ-দিরহামের বিনিময়ে যা পয়সা বিক্রয় করা হয় তা দিতে হবে। এরূপভাবে যদি সে বলে 'এক দানেক পয়সার বিনিময়ে' কিংবা 'এক কিরাত পয়সার বিনিময়ে' তাহলেও জায়েজ হবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, এ সকল সুরতে বিক্রয় জায়েজ হবে না। কেননা, সে ক্রয় করেছে পয়সার বিনিময়ে। আর পয়সার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সংখ্যার মাধ্যমে; দানেক এবং অর্ধ-দিরহামের মাধ্যমে নয়। সুতরাং তার সংখ্যা উল্লেখ করাই অপরিহার্য। আমাদের বক্তব্য হলো, দানেক ও অর্ধ-দিরহামের বিনিময়ে যা পয়সা বিক্রয় করা হয় তা মানুষের [সাধারণভাবে] জানা। আর আমাদের আলোচনাও হচ্ছে সে ক্ষেত্রেই। কাজেই সংখ্যা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আর যদি বলে 'এক দিরহাম পয়সার বিনিময়ে' কিংবা 'দুই দিরহাম পয়সার বিনিময়ে' তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে একই বিধান হবে। কেননা, দিরহামের বিনিময়ে যতটুকু পয়সা বিক্রয় করা হয় তা [জনসাধারণের] জানা। আর ক্রেতার উদ্দেশ্যও তাই; দিরহামের সমপরিমাণ ওজনের পয়সা তার উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর থেকে বর্ণিত আছে যে, এক দিরহাম পরিমাণের ক্ষেত্রে জায়েজ হবে না, কিন্তু এক দিরহাম পরিমাণের কম হলে জায়েজ হবে। কেননা, দিরহামের কম পরিমাণের ক্ষেত্রেই পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে। সুতরাং প্রচলনের কারণে তা পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এক দিরহাম [বা ততোধিক] পরিমাণ এরূপ পরিজ্ঞাত নয়। ফকীহগণ বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ, বিশেষত আমাদের [মা-অরাউন-নহর] অঞ্চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دِرْهَمْ ، فُلُوْس ، دَانِقْ ও قِيْرَاطْ পরিচিতি : دِرْهَمْ হলো রৌপ্য মুদ্রা, আর فُلُوْس হলো ধাতব মুদ্রা। دَانِقْ [এক দানেক] হচ্ছে একটি রৌপ্যমুদ্রার এক-ষষ্ঠমাংশ [ছয় ভাগের ১ ভাগ]। আর قِيْرَاطْ [এক কীরাত] হচ্ছে এক দানেকের অর্ধেক তথা এক দিরহামের বারো ভাগের এক ভাগ। উল্লেখ্য, দিরহাম, দানেক ও কীরাত এ তিনটি শব্দ রৌপ্যমুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; 'ধাতবমুদ্রা'-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ الخ : মাসআলা হলো, কেউ যদি কোনো দ্রব্য ক্রয়কালে এভাবে বলে যে, আমি তোমার দ্রব্যটি 'অর্ধ দিরহাম ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলে আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার উপর অর্ধ দিরহাম রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'ধাতবমুদ্রা' বিক্রয় করা হয় সে পরিমাণ 'ধাতবমুদ্রা' পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। এরূপভাবে যদি ক্রেতা বলে আমি 'এক দানেক ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে তোমার দ্রব্যটি ক্রয় করলাম কিংবা 'এক কীরাত ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম তাহলেও আমাদের তিন ইমামের মতে বিক্রয় জায়েজ হবে এবং ক্রেতার উপর প্রথম সুরতে এক দানেক রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'ধাতবমুদ্রা' বিক্রয় করা হয়, তা পরিশোধ করা আবশ্যক হবে, আর দ্বিতীয় সুরতে এক কীরাত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ 'ধাতবমুদ্রা' বিক্রয় করা হয় তা পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। আর ইমাম যুফার (র.)-এর মতে উল্লিখিত তিনটি সুরতের কোনোটিতে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اشْتَرٰى بِالْفُلُوْسِ، وَإِنَّهَا تُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ الخ : ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল হলো, উক্ত সুরতগুলোতে ক্রেতা 'ধাতবমুদ্রা'-এর বিনিময়ে দ্রব্য ক্রয় করেছে। আর 'ধাতবমুদ্রা' হচ্ছে গণনা-প্রচলিত দ্রব্য, অর্থাৎ তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সংখ্যা উল্লেখ করে [যেমন–পাঁচটি ধাতবমুদ্রা।] আর উক্ত সুরতগুলো ক্রেতা পরিমাণ হিসেবে যে এক দিরহাম, এক দানেক ও এক কীরাতের কথা উল্লেখ করেছে এর সবক'টিই হচ্ছে ওজনের পরিমাপ। কাজেই ক্রেতা 'ধাতবমুদ্রা'-এর সংখ্যা উল্লেখ করেনি। ফলে মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত (مَجْهُوْل) রয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত থাকার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ হবে।

ইমাম যুফার (র.)-এর পক্ষে আরেকটি দলিল হলো, উক্ত সুরতগুলোতে প্রথমত বিক্রয় সম্পাদিত হয়েছে দিরহাম, দানেক কিংবা কীরাতের বিনিময়ে। আর এর সবক'টিই হচ্ছে রৌপ্যমুদ্রার পরিমাপ। অতঃপর ক্রেতা তার বিনিময়ে 'ধাতবমুদ্রা' দেওয়ার শর্ত করেছে। ফলে একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি চুক্তির সংযুক্তি صَفْقَةٌ فِيْ صَفْقَةٍ হয়েছে। আর শরিয়তে তা জায়েজ নয়। সুতরাং বিক্রয় জায়েজ হবে না। এ দলিলটি আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন।–[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُوْلُ : مَا يُبَاعُ بِالدَّانِقِ الخ : আমাদের দলিল হলো, অর্ধ দিরহাম বা এক দানেক কিংবা এক কীরাতের বিনিময়ে কী পরিমাণ 'ধাতব মুদ্রা' বিক্রয় করা হয় তা সকলের জানা বিষয়। কেননা, বিক্রয় জায়েজ হওয়ার বিধানটি ঐ সুরতের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যখন জনগণের জানা থাকে যে, অর্ধ দিরহাম কিংবা এক দানেকের বিনিময়ে কী পরিমাণ 'ধাতবমুদ্রা' বিক্রয় করা হয়। সুতরাং ক্রেতা যখন বলেছে "অর্ধ দিরহাম ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে' কিংবা 'এক দানেক ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে' ক্রয় করলাম" তখন তার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে কিংবা এক দানেক রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যে পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা দ্বারা ক্রয় করলাম। কাজেই এ ক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ অজ্ঞাত রইল না; বরং তা চুক্তিকারীদ্বয়ের নিকট সুনির্ধারিত রয়ে গেছে। অতএব, ইমাম যুফার (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে 'মূল্য অজ্ঞাত রয়েছে' এ কথাটি সঠিক নয়। এরূপভাবে তাঁর পক্ষ থেকে যে বলা হয়েছে 'এ ক্ষেত্রে একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি চুক্তির সংযুক্তি (صَفْقَةٌ فِيْ صَفْقَةٍ) হয়েছে' এটিও যথার্থ হয়নি। কেননা, আমাদের বক্তব্যে অনুসারে ক্রেতা প্রাথমিকভাবেই ধাতবমুদ্রার মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করেছে, কাজেই তা পরিবর্তন করার শর্ত যুক্ত করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ بِدِرْهَمٍ فُلُوْسٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পূর্বে যে তিনটি সুরতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এ তিনটি সুরতেই মূল্যের পরিমাণ ছিল এক দিরহামের চেয়ে কম। কিন্তু উপরিউক্ত মাসআলায় যদি মূল্য এক দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি হয়। যেমন- ক্রেতা যদি বলে যে, 'এক দিরহাম ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম' কিংবা 'দুই দিরহাম ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম' তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিল হচ্ছে পূর্বের দলিলের মতোই। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে এক দিরহাম কিংবা দুই দিরহামের বিনিময়ে যে পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় সে পরিমাণ ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম। আর এক দিরহাম কিংবা দুই দিরহামের বিনিময়ে কী পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা জনগণের জানা বিষয়; কাজেই মূল্য সুনির্ধারিত হয়ে গেছে, অতএব বিক্রয় জায়েজ হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর দলিল হলো, জনসমাজে ধাতবমুদ্রার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন রয়েছে কেবল এক দিরহামের কম পরিমাণের ক্ষেত্রে। এক দিরহাম বা এক দিরহামের বেশি ক্ষেত্রে এর প্রচলন নেই। কাজেই এক দিরহামের কমের ক্ষেত্রে বিক্রয় হলে প্রচলনের কারণে বুঝা যাবে যে উল্লিখিত পরিমাণ বলে ক্রেতার উদ্দেশ্য সমপরিমাণ ধাতবমুদ্রা। কিন্তু এক দিরহাম বা তার বেশির ক্ষেত্রে যেহেতু প্রচলন নেই, সেহেতু তা বুঝা যাবে না। কাজেই বিক্রয় জায়েজ হবে না।

উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে যে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এক দিরহামের বেশির ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হবে না বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তাঁর থেকে বর্ণিত 'জাহির রেওয়ায়েত' (ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ)-এর পরিপন্থি। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর লিখিত 'মাবসূত' গ্রন্থে তাঁর এ মতবিরোধের কথার উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ قَالُوْا : وَقَوْلُ أَبِيْ يُوْسُفَ (رحـ) أَصَحُّ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ফকীহগণের অভিমতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা, জায়েজ হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ক্রেতার উল্লেখকৃত পরিমাণের বিনিময়ে কী পরিমাণ ধাতবমুদ্রা বিক্রয় করা হয় তা জানা থাকা। কাজেই এ ক্ষেত্রে এক দিরহামের কম হওয়া কিংবা বেশি হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, বিশেষভাবে আমাদের 'মাওরাউন নাহর' তথা বুখারা ও সমরকান্দ অঞ্চলে জায়েজ হওয়ার বিধানটিই অধিক সঠিক। কেননা, এ অঞ্চলে জনগণের মাঝে দিরহামের বিনিময়ে ধাতবমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করার প্রচলন রয়েছে। কাজেই অধিক দিরহাম পরিমাণ উল্লেখ করলেও তার বিনিময়ে কি পরিমাণ ধাতবমুদ্রা হবে তা সকলের জানা থাকে। কাজেই নাজায়েজ হওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

قَالَ : وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا وَقَالَ أَعْطِنِيْ بِنِصْفِهِ فُلُوْسًا وَبِنِصْفِهِ نِصْفًا إِلَّا حَبَّةً جَازَ الْبَيْعُ فِى الْفُلُوْسِ، وَبَطَلَ فِيْمَا بَقِيَ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّ بَيْعَ نِصْفِ دِرْهَمٍ بِالْفُلُوْسِ جَائِزٌ، وَبَيْعُ النِّصْفِ بِنِصْفٍ إِلَّا حَبَّةً رِبًوا فَلَا يَجُوْزُ، وَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) بَطَلَ فِى الْكُلِّ، لِأَنَّ الصَّفْقَةَ مُتَّحِدَةٌ، وَالْفَسَادُ قَوِيٌّ فَيَشِيْعُ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيْرُهُ، وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْإِعْطَاءِ كَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِهِمَا هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّهُمَا بَيْعَانِ، وَلَوْ قَالَ : أَعْطِنِيْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوْسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً جَازَ، لِأَنَّهُ قَابَلَ الدِّرْهَمَ بِمَا يُبَاعُ مِنَ الْفُلُوْسِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةً، فَيَكُوْنُ نِصْفُ دِرْهَمٍ إِلَّا حَبَّةً بِمِثْلِهِ، وَمَا وَرَائَهُ بِإِزَاءِ الْفُلُوْسِ . قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَفِىْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذُكِرَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ـ

অনুবাদ : ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি মুদ্রা-ব্যবসায়ীকে একটি দিরহাম দিয়ে বলে, তুমি এর অর্ধেকের বিনিময়ে আমাকে পয়সা দাও. আর বাকি অর্ধেকের বিনিময়ে এক রত্তি কম অর্ধ-দিরহাম [ওজনের ছোট দিরহাম] দাও, [তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে] পয়সার অংশে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে এবং অবশিষ্ট অংশে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, পয়সার বিনিময়ে অর্ধ-দিরহাম বিক্রয় করা জায়েজ। আর এক রত্তি কম অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে অর্ধ-দিরহাম বিক্রয় করা 'রিবা' [সুদ]-এর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তা নাজায়েজ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের দাবি অনুসারে সম্পূর্ণ অংশেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, চুক্তিটি [উভয় অংশে] অভিন্ন এবং ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী। কাজেই তা সম্পূর্ণ অংশে বিস্তার লাভ করবে। [ফাসিদ বিক্রয় পরিচ্ছেদে] এ মাসআলার উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি 'দাও' শব্দটি উভয় অংশে পুনরাবৃত্তি করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্ত সাহেবাইন (র.)-এর সিদ্ধান্তের মতোই হবে। এটাই বিশুদ্ধতম বর্ণনা। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় অংশের ক্ষেত্রে দুটি বিক্রয়চুক্তি। আর যদি বলে আমাকে অর্ধ দিরহাম পয়সা এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম দাও, তাহলে বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা, ক্রেতা দিরহামটির বিপরীতে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য পয়সা এবং এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম সাব্যস্ত করেছে। কাজেই এক রত্তি কম অর্ধ দিরহাম [ক্রেতা প্রদত্ত দিরহামটি থেকে] সমপরিমাণের বিনিময়ে হবে আর অবশিষ্ট অংশ পয়সার বিনিময়ে হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার (র.) বলেন, মুখতাসারুল কুদূরীর অধিকাংশ অনুলিপিতে কেবল দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ : وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا الخ : এখান থেকে পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত মুসান্নিফ (র.) মোট তিনটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন–

প্রথম মাসআলা হলো : কেউ যদি মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে বলে যে, তুমি এ দিরহামটির অর্ধেকের বিনিময়ে আমাকে ধাতবমুদ্রা আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিনিময়ে এমন একটি ক্ষুদ্র দিরহাম দাও যার ওজন হবে অর্ধ দিহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' পরিমাণ কম, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে প্রথম অর্ধেকের বিনিময়ে যে ধাতবমুদ্রা ক্রয় করতে চেয়েছে তার বিক্রয় সহীহ হবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেকের বিনিময়ে যে ক্ষুদ্র দিরহাম চেয়েছে এ অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হবে। প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, দিরহাম আর ধাতবমুদ্রা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য, কাজেই তাতে কমবেশি করে বিক্রয় করা জায়েজ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিক্রয় যে কোনোভাবে হলেই জায়েজ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে হচ্ছে দিরহাম, যা রৌপ্যের তৈরি। সুতরাং একই শ্রেণীর দ্রব্য হওয়ার কারণে সমান সমান হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু ক্রেতা অর্ধেক দিরহামের বিনিময়ে অপর পক্ষের অর্ধ দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' কম চেয়েছে। কাজেই 'রিবা' [সুদ] হওয়ার কারণে বিক্রয় নাজায়েজ ও বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَعَلٰى قِيَاسِ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মাসআলার বিধানের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত কি তা স্পষ্টভাবে তাঁর থেকে বর্ণিত নেই। কিন্তু অন্য মাসআলায় তিনি যে অভিমত পোষণ করেছেন সে অভিমত অনুসারে তাঁর মতে আলোচ্য মাসআলায় দিরহামটির উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর মত অনুযায়ী উভয় অর্ধেকে বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ হলো, এখানে ক্রেতা উভয় অর্ধেকের বিনিময়ে যা ক্রয় করেছে তা সে একই চুক্তির অধীনে ক্রয় করেছে। কাজেই এখানে চুক্তি একটি। আর যে কারণে দ্বিতীয় অর্ধেকের মাঝে বিক্রয় বাতিল হয়েছে যে কারণটি শক্তিশালী কারণ, তা হলো 'রিবা' [সুদ] হওয়া। এটি শক্তিশালী কারণ এজন্য যে, এ কারণে সকলের মতে বিক্রয় বাতিল হয়। সুতরাং বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণ যখন শক্তিশালী তখন চুক্তিটি একই হওয়ার ফলে তা উভয় অর্ধেকের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে। কাজেই উভয় অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَقَدْ مَرَّ نَظِيْرُهٗ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আলোচ্য মাসআলার উদাহরণ বা তদ্রূপ মাসআলা সাহেবাইন ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে উক্ত মতবিরোধসহ পূর্বে ['ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ের শেষের দিকে ৪৬ নং পৃষ্ঠায়] দলিলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الْاِعْطَاءِ الخ : এখান থেকে দ্বিতীয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা হলো, ক্রেতা মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে এভাবে বলল যে, اَعْطِنِىْ بِنِصْفِهٖ فُلُوْسًا وَأَعْطِنِىْ بِنِصْفِهٖ نِصْفًا اِلَّا حَبَّةً "আমাকে এ দিরহামের অর্ধেকের বিনিময়ে ধাতব-মুদ্রা দাও আর অর্ধেকের বিনিময়ে এমন একটি ক্ষুদ্র দিরহাম দাও যার ওজন অর্ধেক দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' কম।" অর্থাৎ এ সুরতে ক্রেতা 'দাও' কথাটি উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি করেছে। আর প্রথম মাসআলায় ক্রেতা উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে 'দাও' কথাটি একবারই বলেছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও কেবল দ্বিতীয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় বাতিল হবে। আর প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ যে অর্ধেকের বিনিময়ে ধাতব-মুদ্রা ক্রয় করেছে সে অর্ধেকের ক্ষেত্রে বিক্রয় জায়েজ হয়ে যাবে। এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.)-এর মাঝে মতবিরোধ নেই।

এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু ক্রেতা উভয় অর্ধেকের ক্ষেদ্রে 'দাও' কথাটি উল্লেখ করেছে সেহেতু এখানে উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রে দুটি বিক্রয়চুক্তি হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় অর্ধেকের বিক্রয় বাতিল হওয়ার কারণটি প্রথম অর্ধেকের মাঝে বিস্তৃতি লাভ করবে না। কেননা, উভয় চুক্তি পৃথক বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِأَنَّهُمَا بَيْعَانِ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা বর্ণনা করেছি যে, 'এ সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতেও প্রথম অর্ধেকের বিক্রয় জায়েজ হবে' এ বর্ণনাটিই সঠিক। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি দুটি সাব্যস্ত হচ্ছে। কাজেই একটি বাতিল হওয়ার কারণে অপরটি বাতিল হবে না। যদিও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, এ সুরতেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উভয় অর্ধেকের ক্ষেত্রেই বিক্রয় বাতিল হবে। কিন্তু তা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ : أَعْطِنِيْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوْسًا الخ : এখান থেকে তৃতীয় মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় মাসআলাটি হলো, কেউ মুদ্রা-বিক্রেতাকে একটি দিরহাম দিয়ে এভাবে বলল যে, أَعْطِنِيْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوْسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً "তুমি আমাকে অর্ধেক দিরহাম পরিমাণ ধাতবমুদ্রা এবং অর্ধ দিরহামের চেয়ে এক 'হাব্বা' কম পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা দাও।" অর্থাৎ এ সুরতে ক্রেতা তার দেওয়া দিরহামটিকে অর্ধেক করে ভাগ করেনি; বরং সম্পূর্ণ দিরহামটির বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট হতে উক্ত ধাতবমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা চেয়েছে। এ সুরতে [আমাদের তিন ইমামের ঐকমত্যে] সম্পূর্ণ চুক্তিটি জায়েজ হবে। কেননা, ক্রেতা সম্পূর্ণ দিরহামটির বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট হতে দুটি বস্তু চেয়েছে; আধা দিরহামে যা ধাতবমুদ্রা বিক্রয় হয় তা এবং একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা যার ওজন আধা দিরহামের চেয়ে এক হাব্বা কম। সুতরাং ক্রেতা যখন তার দেওয়া দিরহামকে অর্ধেক হিসেবে ভাগ করেনি তখন বিক্রয়কে জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য এরূপ ধরা হবে যে, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যে ক্ষুদ্র দিরহামটি দিয়েছে তার বিনিময়ে সমপরিমাণ ওজন ক্রেতার দেওয়া দিরহামটি থেকে ধরা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় দিকে রৌপ্য হওয়ার কারণে সমান সমান অপরিহার্য। অতঃপর ক্রেতার দেওয়া দিরহামটি থেকে যা অবশিষ্ট থাকে তা বিক্রেতার দেওয়া ধাতবমুদ্রার বিনিময়ে ধরা হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে এক দিকে ধাতবমুদ্রা আর অপর দিকে রৌপ্যমুদ্রা হওয়ার কারণে কমবেশি হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। কাজেই যথাসম্ভব বিক্রয় জায়েজ সাব্যস্ত করার জন্য এভাবে ধরা হবে। উল্লেখ্য, পূর্বের দুই মাসআলায় এভাবে ধরা সম্ভব নয়। কেননা, উক্ত দুই সুরতে ক্রেতা নিজেই তার দিরহামকে অর্ধেক অর্ধেক করে বিনিময় হিসেবে উল্লেখ করেছে। সুতরাং তার বিপরীত ধরা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ وَفِيْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থের অধিকাংশ অনুলিপিতে [নুসখায়] কেবল দ্বিতীয় মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে [প্রথম মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়নি]। উল্লেখ্য, এখানে মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় মাসআলাটি বলে সর্বশেষ মাসআলাকে [আমরা যেটিকে তৃতীয় মাসআলা হিসেবে উল্লেখ করেছি সেটিকে] বুঝিয়েছেন। আর প্রথম মাসআলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমাদের উল্লিখিত প্রথম মাসআলা।

উল্লেখ্য, 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, অধিকাংশ অনুলিপিতে যে প্রথম মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়নি তা অনুলিপিকারদের পক্ষ থেকে ভুলবশত বাদ পড়েছে।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত